সচিত্র শিশির

প্রথম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

১৩৩১

২[illegible]শ বৈশাখ হইতে ১৫ই কার্ত্তিক ১৩৩১

সম্পাদক

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রকাশক—

শিশির পাব্লিশিং হাউস্

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

অমৃত-সিঞ্চন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　২৯শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৩১ সাল।　　[ষড়বিংশ সপ্তাহ

বরের বাজার

(২)

ফি ট্রেড্

(১)

পূর্ব্বানুবৃত্তি:—

একজন খবর দিলে, একটি ভাল ছেলে আছে, তার নাম বংশীবদন, হেদোর ধারে কিসের ব্যবসা করে—

"স্বাধীন ব্যবসা মশাই, কোন শালার চাকর নই। নেবেন একখানা ? নিন্-না—"

অভিভাবক নেই, নিজেই অভিভাবক; বলে, বেশী কিছু চাইনে ; মনোহারী দোকান একটা করবার ইচ্ছে, হাজার দু'য়েক হলেই চলবে।

(২)

ডক্‌টর জি, জি, শী, এইচ্-এম্-বি

"আপনার মেয়ের অসুখ ? দেখি হাতটা— "

এঁরই টাঁক—একটি ডিসপেন্সারী করবার খরচ, হাজার ছয়েক, আর একখানা গাড়ী ও যেমন-তেমন একটা ঘোড়া।

(৬)

কবিবর শ্রীযুক্ত চিত্তচকোর চট্টোপাধ্যায়

পেশা—কবিতা ; রোজগার—কবিতা !

"ইজ্‌ কবিতা জমিদারী ? ইজ্‌ কবিতা বংশ পরিচয় ?"

ভোজন করেন—কাব্য-কদলী ; আশা, একটি পরী, আর গড়ের মাঠের ওপর একখানি পুরী !

(৪)

পেটো দালাল

"পেটের মধ্যে কি বাবা ? পাটের বস্তা ?"
মেয়ে যদি খুব পছন্দসই হয়, তবে মাত্র চার হাজার !

(৫)

জে, এন্, গোপ্‌তা, এম্‌-এ, বি-এল্ ; ভ্যাকিল

"নারী-চুরী! আপনারই কন্যা! দাঁড়ান, কোড্‌টা এনে দেখি—৩৪৭ সেক্‌সন্‌ই লাগবে বোধ হয়"—

ঠিক রাজকন্যা আর রাজত্ব চান্ না বটে, তবে পেলে বাধিত হন্!

(৬)

ট্রামওয়ে কণ্ডাক্টর
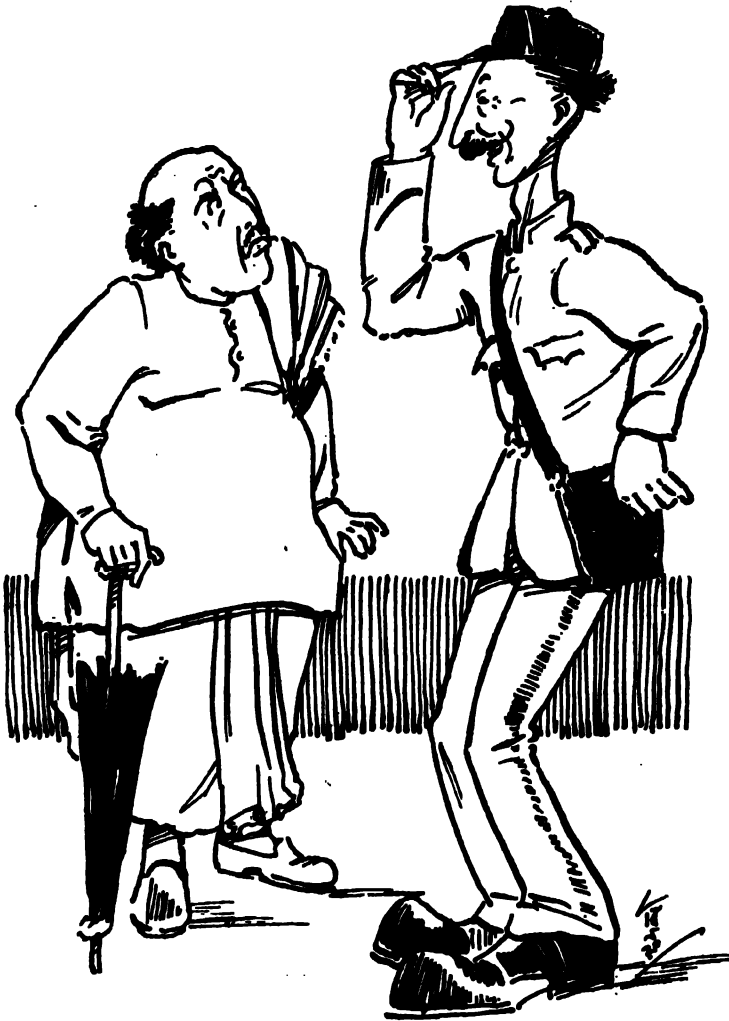
"ওরে কি করে বাবা—পিলেয় মেরেছে।"

মাইনে বটে—১৪ টাকা, উপরি ১৪ × ২ = ২৮, মোট ৪২৲

ক্যাসিয়ার হ'বার ইচ্ছে, জমা লাগে, হাজার দুই ;

শ্বশুর-কন্যা সেটা লইয়া আসিলে—**এখনই**

(৭)

ভাবী ম্যাট্রিকুলেটেড্—১৯২৪

"দেখো বাবাজী, জামাটায় আগুন না লেগে যায়!"

"আজ্ঞে না।"

পাত্রের পিতা পাশের খবর বাহির হইবার পূর্ব্বেই পুত্রকে পাত্রীস্থ করিতে উৎসুক। মাছ যতক্ষণ জলে থাকে, বড়ই মনে হয়, ডাঙ্গায় উঠিলে কদর কমিয়া যায়ই!

বেশী নয়—ছয় হাজার।

(৮)

ভগবান কি নাই ?

গিন্নি, বাংলা দেশের বরের বাজার এই !

হয় আমরা মরে বাঁচি, নয়ত.........

হ্যাঁগো, খেতে পরতে পায়, যেমন তেমন একটি ছেলে—
শোন গিন্নি, বলছি......

(ক্রমশঃ)

অসম্পূর্ণ

(গল্প)

[শ্রীশিশিরকুমার বসু]

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাপ মা'র চোখে কি রকম ঠেকিত বলা যায় না, তবে আত্মীয় স্বজন যিনিই আসিতেন, দেখিতেন, গঙ্গাধর বাবুর মেয়েটি তাঁহার চোখেই "অরক্ষণীয়া" ঠেকিত। বাপ-মা'রও একটা কিছু ঠেকিত, সন্দেহ নাই। নহিলে সকাল-সন্ধ্যা এবং রবিবার ও ছুটিগুলিতে এতটুকু বিশ্রাম না করিয়া গঙ্গাধর বাবুই বা এত ছুটাছুটি করিবেন কেন?

ছুটা-ছুটি করা এক, আর পাত্র স্থির করিয়া ফিরিয়া আসা এক। গঙ্গাধর বাবু প্রথমটা পুরামাত্রাতেই করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু শেষেরটা আজ পর্য্যন্ত কোথায় কিছু হইল না। কেন হইল না, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রধান কয়েকটির তালিকা এই :—

মেয়েটি ডাগর, বয়স্থা। দুষ্ট লোকে বলে চব্বিশ, পঁচিশ; তাহা মিথ্যা, এই উনিশে পা দিয়াছে, আমরা জানি।

মেয়েটি বেথুন কলেজের দ্বি-বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল; কাজেই শিক্ষিতা। একেলে অনেক ছেলের সেকেলে মা ইহা অপছন্দ করেন।

তাহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান অসাধারণ। সে আবার ছবি আঁকিতে পারে।

গঙ্গাধর বাবু যাহাকে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কন্যাদান করিতে পারেন না, উচ্চশিক্ষিত ত চাই-ই; সুপুরুষ হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

কন্যার ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে গঙ্গাধর বাবুর নজরটি ষোল আনা আছে, কিন্তু তাঁহার ক্যাসবাক্সটি সামান্য কয়েকখানা চিঠি ও বাজে দলীলে পূর্ণ! আসলের অভাব।

গঙ্গাধর বাবুর ছোট ভাই নিবারণ বাবু ভালোয়-মন্দয় থাকিতেন না, তবে সুরভিকে যতদিন সম্ভব এখানে রাখাটাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি অবিবাহিত, তদ্ধেতু পুত্রাদি নাই, সুরভিই তাঁহার পুত্র কন্যা।

তিনিই একদিন হাসিচ্ছলে বলিয়াছিলেন—দাদা ত বাঙ্গালা দেশটা চষে ফেল্‌লেন। আজ সকাল পর্য্যন্ত আমি হিসেব মিলিয়ে দেখেছি দু'শ তেইশটা পাত্র দাদা দেখে বেড়িয়েছেন, একটাও মনের মত মিলল না। আমি ত সেকালেই বলেছিলুম যে সুরভিকে জগদীশ্বর বিবাহের জন্য সৃষ্টি করেন নি।

কবি এবং সমালোচক বলিয়া নিবারণের একটা খ্যাতি ছিল। সেই সঙ্গে আর একদল নিবারণকে পাগল আখ্যা দিতেও দ্বিধা করিত না। নিবারণ কোন প্রলোভনেই দার পরিগ্রহ করেন নাই, তবে বন্ধু বান্ধব অনেকেরই বিবাহে ঘটকালী করিয়াছিলেন, আরও অনেক কাজ নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলির বিশেষ পরিচয় দেওয়া একেবারেই অনাবশ্যক। কেবল একটা সংবাদ উল্লেখ যোগ্য, ১৯০৫ হইতে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত নিবারণ নিজে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র চালাইয়াছিলেন। তখনকার দিনে নিবারণচালিত "প্রভাত" বঙ্গদেশে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র বলিয়া বিবেচিত হইত—এবং বাঙ্গালাদেশের অনেকগুলি পুলিস-আফিসে আজ পর্য্যন্ত তাহার ফাইল্ সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, শুনা যায়।

তিনিই প্রচার করিয়া দিলেন যে সুরভির সৃষ্টিকর্ত্তা যদি তাহার স্বামীর সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যেখানেই থাকুক না-কেন, একদিন তাহাকে ধরণা দিয়া পড়িতেই হইবে—দাদা এই সহজ সত্যটি না বুঝিয়া অকারণ ক্লেশ পাইতেছেন, কিন্তু আমি পরম নিশ্চিন্ত আছি।

তাঁহার ভ্রাতৃজায়া কহিলেন—সুরভি তোমার দাদার মেয়ে না হইয়া তোমার মেয়ে হইলে দেখা যাইত কি করিতে ?

নিবারণ এ কথার উত্তর মুখে দিলেন না, পরদিনই একখানা নামজাদা দৈনিক সংবাদ পত্রের স্তম্ভে লিখিলেন—"সমস্যা ভঞ্জন।" সুরভি তাঁহার কন্যা হইলে নিবারণ কি করিতেন, তাহার একটা ফিরিস্তি বাহির হইল। কিন্তু তাহাতে কাজ কিছুই হইল না। যিনি কবি নন এবং বয়স্থা কন্যার পিতা বলিয়া জ্ঞাত, তিনি নিয়মিত ভোরে উঠিয়া ঘটক ঘটকীর সঙ্গে পাত্র শিকারে বাহির হইতে লাগিলেন। ফিরিয়া কোন মতে নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া ট্রাম ধরিতে ছুটিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঘটক ঠাকরুণ পাণ-দোক্তার কৌটা ও গামছাখানি পাশে রাখিয়া ওপাড়ার পরেশ বাবুর বড় মেয়ের সঙ্গে রামদুলালের নাতি এবং বিনয়কৃষ্ণের প্রপৌত্রের বিবাহ দিয়া কিরূপ ঘটক বিদায় পাইয়াছিলেন, তাহারই সরস ও রঙীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতেছিলেন। গঙ্গাধর এক ছিলিম তামাক খাইয়া পুনশ্চ বাহির হইয়া পড়িলেন। গঙ্গাধর গভীররাত্রে যখন আহার করিতে বসিতেন, ভাতগুলি বরফ-ঢাকা ইলিস মৎস্যের ন্যায় এবং ডালের বাটীতে বরফ জমিয়া থাকিত।

নিবারণ সুরভিকে বলিলেন—প্রবন্ধটার কাজ কিছু হ'ল না, সুরভি, এত পরিশ্রম বৃথায় গেল।

গঙ্গাধর দুই তিনটা বিয়ের আফিসে নাম ধাম লিখাইয়া আসিলেন, একস্থানে কিছু বায়না দিতেও হইয়াছিল, কিন্তু বর যথানিয়মে গোকুলেই বাড়িতে লাগিল। গঙ্গাধর মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা দেখিয়া দু'একখানা বহি কিনিয়াও আনিলেন, কিন্তু কেহই সুরভির বরের সন্ধান দিতে পারিল না। উপরন্তু নিবারণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার ক্রীত পুস্তক দেখিয়া এমনই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন যে, গঙ্গাধর সেদিন আফিস বাহির হইবার সময় আস্তে আস্তে "অসাধুর" ন্যায় খিড়কীর দরজাটাই সমীচীন বোধ করিলেন।

আফিসে বসিয়া গঙ্গাধর ইংরেজীতে একটা প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিলেন। গঙ্গাধরের ইংরেজীভাষায় বেশ অধিকার ছিল, প্রবন্ধটা শেষও হইল। গঙ্গাধর লিখিলেন—যৌথ ও একান্নবর্ত্তী সংসারে সুবিধা কি? দেখাইলেন যে এক ভাই কন্যাদায় পীড়িত হইলে অন্য ভ্রাতার কি করা কর্ত্তব্য ? তাহাতে নিবারণকে তিনি স্পষ্টই বুঝাইয়া দিলেন যে নিবারণের উচিৎ, একটি পাত্র স্থির করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে অনতিবিলম্বে সম্প্রদান করা! কিন্তু প্রবন্ধটি কোন খবরের কাগজের আফিসে পাঠাইতেও তাঁহার সাহস হইল না। বেনামী ছাপা হইলেও, নিবারণের কিছুই অজ্ঞাত থাকিবে না, তখন সে আবার কড়া জবাব দিবে, তাহা হইতে অনেক বিপ্লব ঘটিতে পারে। তাহার আবার যে রকম ঘোলাটে বুদ্ধি সাধিও ইত্যাদি, ইত্যাদি!

সকালে নিবারণ নূতন মাসিক পত্র "কর্ম্মী"র কাপি ঠিক করিতেছিলেন, চটিজুতা ফট্‌ফট্ করিয়া গঙ্গাধর ঘরে ঢুকিলেন।

আজ যে বড় বেরোন নি ?—বলিয়া নিবারণ পুনঃ শ্রীমতী চারুলতা সিংহের "হতাশা" পড়িতে মন দিলেন।

গঙ্গাধর 'না' বলিয়া একটা চেয়ার দখল করিয়া বসিলেন ; দুইতিন মিনিট পরে বলিলেন—তোমার নতুন কাগজটা কেমন চল্‌ছে নিবারণ ?

বেশ চল্‌ছে দাদা! এ যুগে এই ধরণের কাগজেরই আদর। কথার কাল কেটে গেছে, এখন কর্ম্মের যুগ। এখন আর বক্তৃতা নয়, কাজ! আমার "কর্ম্মী" বেশ কাজ করছে।

নিবারণ কবিতাটা অমনোনীত করিয়া লাল পেন্সিলে কি লিখিলেন, বেতের ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া, বলিলেন—আপনি আজ বেরোন নি ?

গঙ্গাধর বলিলেন—না। আজ বছরের প্রথম দিনটায় আর বেরুলাম না। সারা বছরই ঘুরব ?

আজ আফিস্ যাবেন না ?

সে যেতে হ'বে বৈ-কি!

নিবারণ নিবিষ্টচিত্তে মোহিত সেনের "পথের বার্ত্তা" পড়িতে লাগিলেন। মোহিত সেনের একটা "সহজ পথ" বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। লোকটির ভাষা অপূর্ব্ব, ভাব নূতন এবং বলিবার কায়দাটি হৃদয়গ্রাহী—নিবারণ তন্ময় হইয়া গেলেন।

গঙ্গাধর মিনিট পাচেক পরে বলিলেন—তাহ'লে এই নিয়েই মেতে আছ ?

নিবারণ অন্যমনস্ক ছিলেন, বলিলেন—নিশ্চয়ই।

গঙ্গাধর করুণ কণ্ঠে কহিলেন—তাহ'লে অন্য কোন দিকে মন দেবার অবসর নেই বল?

নিবারণ বলিলেন—বাঃ বাঃ বেশ লিখেছে! চমৎকার! লোকটির দেখা পাই ত পা'র ধূলো নিই।

গঙ্গাধর বলিলেন—তা'হলে—

এটা প্রথমেই দেব, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। ওরে মধু, এইটে ছাপাখানায় দিয়ে আয় ত!

গঙ্গাধর হতাশভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন; নিবারণ বলিলেন—উঠ্‌লেন?

গঙ্গাধর হাঁ বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই অন্তঃপুরের দ্বার খুলিয়া সুরভি, এবং বহির্ব্বাটির দ্বার খুলিয়া মধু ও তৎপশ্চাৎ একটি নবীন যুবক ঘরে ঢুকিলেন।

যুবক নমস্কার করিয়া কহিল—আমার নাম মোহিত-মোহন সেন। "সহজ পথ"—

নমস্কার! নমস্কার! বসুন, বসুন! ওরে সুরভি! প্রুফটা দেখা হ'য়েছে মা? মোহিত বাবু, ইনিও "কর্ম্মীর" লেখিকা সুরভি দাস, আমার ভাইঝি! আর সুরভি, ইনি "সহজ পথের"—

সুরভি নতমস্তকে কহিল—জানি। কাল তৃতীয় বার "সহজ পথ" পড়েছি।

গঙ্গাধর বেশী দূর যান নাই,—অন্তরাল হইতে আগন্তুককে দেখিয়া লইয়া, শেষটা যেন ক্ষুণ্ণমনেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

"কর্ম্মী" আফিসে যখন সাহিত্য চর্চ্চা প্রবল ও উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই গঙ্গাধর লাঠিটি ঠুকিতে ঠুকিতে নিত্য নিয়মিত "শ্রীদুর্গা" স্মরণ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

মোহিত সেন বলিলেন—রাজসাহীতে ওকালতী করিতে করিতে ছাড়িয়া দিয়া, আপাততঃ তিনি কলিকাতায় আসিয়া নবীন যুগের নূতন কর্ম্মের সন্ধান করিতেছেন। মোটা ভাত কাপড়েই তিনি সন্তুষ্ট, তাহার বেশী আকাঙ্ক্ষা নাই—যেহেতু তিনি সিগারেটটিও খান না এবং অবিবাহিত।

নিবারণ এই ক্ষমতাশালী নূতন লেখককে হাতছাড়া করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। মাসিক একশত মুদ্রা পারি-তোষিক গ্রহণে সম্মত করাইয়া, আগামী সংখ্যা হইতে মোহিতমোহন সেন (ভূতপূর্ব্ব এম-এ, বি-এল) মহাশয়ের নাম "কর্ম্মী"র কভারে সহকারী সম্পাদক বলিয়া ছাপিবেন—স্বীকার করিয়া যখন স্নানে চলিলেন, তখন বেলা দেড়টা বাজিয়া গেছে। সুরভিও কাকার সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল।

অবিবাহিতা কন্যার মাতা রুষ্টমুখে মেয়েকে যে সাদর সম্ভাষণ করিলেন না, তাহা বোধ করি না বলিলেও চলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিত সুরভির "সমর্পণ" গল্পটির সুখ্যাতি করিয়া বলিল, সত্যি বল্‌ছি, অনেকদিনের পর আসল একটা গল্প পড়্‌লুম।

নিবারণ সোল্লাসে কহিলেন—কেমন—নয়? আমি সেকালেই বলেছিলুম যে, একটা গল্পের মত গল্প হয়েছে। কেমন সুরভি, হ'ল? আমায় যে বলেছিলি "তুমি কাকা, সুখ্যাতি ত করবেই, আপনার লোক কবে নিন্দা করে!" এখন হ'ল ত? মোহিত ত আর আপনার লোক নয়।

মোহিত বলিল—বাঃ, আমি বুঝি পর হ'য়ে গেলুম?—যাক্, আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম; "মোল্লাবাসী" কষ্টি-পাথরে শেষের পরিচ্ছেদটা সব তুলে দিয়েছে দেখেন নি?

দিয়েছে নাকি? কৈ দেখি-দেখি! সুরভি, তুই ও ত দেখিস্ নি···

সুরভি বলিল—আমি পরশুই দেখেছি।

কৈ, আমায় ত বলিস্ নি। এই যে···

গল্পটা পড়াই ছিল, তবুও নিবারণ একবার চোখ বুলাইয়া লইলেন। মোহিত সুরভির পানে চাহিয়া কহিল—এ মাসে গল্প দিচ্ছেন?

সুরভি নিবারণের পানে চাহিল, নিবারণ এক গাল হাসিয়া বলিলেন—একটা লিখ্‌ছে, এখনও শেষ হয় নি।

শেষ হ'লে দেখাবেন—বলিয়া মোহিত মৃদু মিষ্ট হাসি হাসিল।

নিবারণ বলিলেন—সেইটির হুকুম নেই, মোহিত; ছাপার অক্ষরের আগে আমি ছাড়া কেউ পড়বে না—পড়লে নাকি লজ্জা করে।

মোহিত হাসিয়া বলিল—কৈ আমাদের ত করে না। আমি ত লেখা শেষ করতে না করতে লোক পেলেই পড়তে সুরু করে দিই। আমার ত লজ্জা করে না। আমার শ্রোতাদেরই বরং লজ্জা করে, উঠি উঠি করেও তারা উঠতে পারে না, মুখ ফুটে বল্‌তেও পারে না।

সুরভি বলিল—আপনি—আর আমি!

মোহিত ভাবিয়াছিল—স্ত্রী পুরুষের পার্থক্যই সুরভি ইঙ্গিত করিয়াছে, কি বলিতে যাইতেছিল, সুরভি তৎপূর্ব্বেই কহিল—এতলোক ত লিখছে কিন্তু বাস্তবিক আন্তরিক দেশের টানে আপনার মত কটা লোক লেখে? আপনার দু'টো লেখা বেরিয়েছে, তাতেই আপনার খ্যাতি সারা বঙ্গে ছড়িয়ে, মুখে মুখে ফিরছে। আমাদের আবার লেখা—তার আবার কথা!

লেখার সমঝদার পাইয়া, সুরভি সেইদিন মধ্যাহ্নেই বহুগুণ উৎসাহে গল্পটা শেষ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু শেষটা কিছুতেই মনের মত মিলিতেছে না। এবং শেষ রক্ষা না করিতে পারিলে যে এতখানি শ্রম একেবারেই বৃথা হইবে তাহা জানিয়াই মনটি তাহার অত্যন্ত ম্লান হইয়া গিয়াছিল। একবার উঠিয়া খুল্লতাতের সন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, তিনি আহারে বসিয়াছেন। সুরভির জননী সামনে দাঁড়াইয়া কি বলিতেছিলেন, হঠাৎ থামিতে দেখিয়া, সুরভি যেন লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়াই ফিরিয়া আসিল; কিন্তু একটা কথা তাহার কাণে ঢুকিয়া ছিল, আর সেই একটা কথা হইতেই বাকীটা জানিতেও তাহার দেরী হইল না।

নিবারণ বলিতেছিলেন—মৌলিকে মৌলিকে কাজ হয় না তুমি বলছ; আমি বলছি আমি কিন্তু কম করে' হাজার হাজারটার খবর জানি। গল্প কথা নয়, প্রত্নতত্ত্বও নয়, প্রত্যক্ষ দেখা…

বৌঠান কহিলেন—হবে না—কেন হয়! তবে যে সব লোক কুলের বাইরে কাজ করে তারা প্রায়ই নীচু ঘর হ'য়ে গেছে বলে শুনেছি। আর পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, তোমার ঐ একটা ভাইঝি, তারই জন্যে কুল ভেঙ্গে কাজ করবে!

এই সময়েই সুরভি আসিয়া পড়িয়াছিল এবং মা'র যুক্তির রূতকাংশ সে শুনিতেও পাইয়াছিল।

সুরভির মা ম্লানমুখে কহিলেন—আর ওঁর যে এতে মত হ'বে—তা'ও ত মনে হয় না!

নিবারণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক—বৌঠাকরুণ, একদম নিশ্চিন্ত। দাদা অমত করবেন না, করবেন না, দেখে নিও।

বধূ ঠাকরুণ অল্পক্ষণ কি চিন্তা করিয়া লইলেন, তৎপরে কহিলেন—তাহ'লে আমিই আর অমত করে কি করব ভাই? তোমাদের মতেই মত আমার!

তিনি মত দিলেন বটে, কিন্তু মনটি যে তাঁহার খুঁত খুঁত করিতেছে তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। নিবারণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—দেখ বৌঠাকরুণ, কাজ কিছু হয়েও যায় নি, এবং আমরা শিয়ালের যুক্তি করছি বলেই যে হ'বে তারও কিছু ঠিক নেই, তবে দাদা ত অগস্তি খুঁজছেন, হাতের কাছে একটা পেয়েছি, খবর দিলাম।

নিবারণ একটু পরে আবার বলিলেন—আমি দাদাকে বরাবর বলেছি যে ধাতা যদি সত্যিই সুরভির বর গড়ে থাকেন, স্বর্গে, মর্ত্তে, রসাতলে যেখানেই কেন সে থাকুক না, দেখা দেবেই। মোহিতের সঙ্গে সুরভির মিলন যদি তাঁর ঈপ্সিত হয়, যতই কেন তোমরা কুল অকুলের তর্ক কর না—হ'তেই হবে! আর তাঁর যদি অন্য ইচ্ছা হয়, আমাদের কোন যুক্তিই কাজে লাগবে না, বৃথাই হ'বে। বুঝলে?

বধূ ঠাকুরাণী অবশ্যই বুঝিতেছিলেন, কিন্তু মুখে কথা কহিলেন না। নিবারণও আর কিছু বলিলেন না। আহার শেষ করিয়া আফিস-ঘরের আরাম কেদারাটাতেই হাত পা ছড়াইয়া দিবানিদ্রাটুকু সারিয়া লইয়া যখন প্রুফের বাণ্ডিল লইয়া বসিতেছিলেন, সেই সময়ই গঙ্গাধর ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—এ হ'তে পারে না, নিবারণ!

নিবারণ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কি দাদা?

আমাদের ঐ একটি মেয়ে! তা'কে কুল ভেঙ্গে…

নিবারণ বলিলেন—থাক্‌, যথেষ্ট হয়েছে, দাদা!

গঙ্গাধর অপ্রস্তুত না হইয়াই বলিলেন—আমি একটি পাত্র একরকম ঠিক করেছি বল্লেই হয়। চেনা-শুনো ঘর, আর দু'পয়সা বেশ আছেও।

নিবারণ সাগ্রহে বলিলেন—বেশ ত!

গঙ্গাধর বলিলেন—ছেলেটি আমাদের আফিসের বড় বাবুর ভাগ্নে। সেক্রেটারিয়েটে কাজ শিখ্‌ছে।

এপ্রেন্টিস্‌?

তাই। বাপের কিছু আছে।

নিবারণ আর কিছুই বলিলেন না। গঙ্গাধর আপন মনেই বলিয়া চলিলেন—বি-এ পাশ করেছে। গভর্ণমেণ্ট আফিসে ঢুকেছে, আখেরে ভালই হ'বে। বাপ রায় বাহাদুর…

নিবারণ বিরক্তভাবে কহিলেন—বুঝেছি। আমি অর্ডার প্রুফ্‌ দেখ্‌ছি এখন।

গঙ্গাধর উঠিয়া পড়িলেন।

মিনিট দশেক পরেই অশ্রুসজল মুখে সুরভি ঘরে ঢুকিয়া নিবারণের পিঠের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—কাকা, এখন এ সব কেন?

নিবারণ কলম ফেলিয়া দু'হাত বাড়াইয়া সুরভিকে সামনে টানিয়া জিজ্ঞাসিলেন—কি—এখন মা?

সুরভি অশ্রুসিক্ত স্বরে কহিল—এ কি আমোদ আহ্লাদের সময় কাকা?

নিবারণ সুরভির মুখের দিকে চাহিয়া এক মিনিট কাল চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর বলিলেন—না মা, আমোদ-আহ্লাদের সময় এ নয়।

সুরভি মুখখানি আবার নিবারণের কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল—আপনি বাবাকে বলুন কাকা, এ সময় আমি বিয়ে করব না।

নিবারণ নীরব। হঠাৎ যেন কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। তাহার পর বলিলেন—আমি ত কিছুই জানিনে সুরভি, সব ঠিক হয়েছে না-কি?

গুরুর কাছে শিষ্যের লজ্জা ছিল না, সুরভি কহিল—কে রায় বাহাদুর আজ দেখ্‌তে আস্‌বে…

ওঃ—দেখ্‌তে আস্‌বে! এই! তার জন্ম ভাবনা নেই মা। সে বিয়ে হ'বে না।

"সে বিয়ে" এই কথাটা যেন সুরভির মনঃপূত হইল না। সে ক্ষুণ্ণভাবে কহিল—কাকা, দেশের এই দুর্দ্দিনে, আত্মসুখের কল্পনা করাও কি উচিৎ না, আমাদের শোভা পায়?—বলিতে বলিতে হঠাৎ সে কাঁদিয়া ফেলিল। দু হাতে নিবারণের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কাকা, এ সময় বিয়ে আমি করতে পারব না।

তাই হবে সুরভি—বলিয়া নিবারণ তাহাকে টানিয়া তুলিলেন। "মুখটা মুছে ফেল মা। আর আমি যখন বল্‌ছি, নিশ্চিন্ত থাক—রায় বাহাদুরই আসুন, আর রাজা বাহাদুরই আসুন, তোমাকে এখন আমি কিছুতেই কর্ম্মীসঙ্ঘ থেকে অব্যাহতি দিতে পারব না।"

সুরভি নিশ্চিন্ত মনে প্রস্থান করিল।

রায় বাহাদুরের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু এই আসেন, এই আসেন করিয়া সারা রাত্রি কাটিয়া গেল—রায় বাহাদুর আসিলেন না।

গঙ্গাধর 'কাল-রাত্রি' কাটাইয়া পরদিন আফিসে আসিয়া বড় বাবুর মুখে যা শুনিলেন, তাঁহার পেটের পীলে শুদ্ধ চমকিয়া উঠিল।

বড় বাবু বিকৃত মুখে, ততোধিক বিকৃত স্বরে কহিলেন—ডাকাতে মেয়ে চালাতে এসেছিলে বাপু? মেয়ে স্বদেশী প্রবন্ধ লেখে, গান্ধী মহারাজ-কি জয় করে—সেই মেয়ে চাও তুমি, গভর্ণমেণ্টের রায় বাহাদুরের পুত্রবধূ হবে! তোমার সাহসকেও বলিহারি গঙ্গাধর! ভাগ্যে এটা গবর্ণমেণ্টের আফিস নয়—তাই রক্ষে পেলে, নইলে বরাতে দুঃখু ছিল!

গঙ্গাধর রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া বলিলেন—দেখ, এক সংসারে চিরটা কাল কেটে যাবে ভেবেছিলুম, তা আর হ'ল না। কালই নিবারণকে বলব, ওর কাগজ টাগজ নিয়ে যেখানে খুসী ওর চলে যাক্‌। ভাড়াটে বাড়ী, ভাগের বালাই নেই, আর জিনিষ পত্র?—যা খুসী, যত খুসী—নিয়ে ও কালই বিদেয় হ'ক্‌। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের ভাল।

গৃহিণী সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন—ঠাকুরপো কাগজ বের করেছে বলেই যে দোষী হ'বে তার কি মানে আছে? মেয়ে তোমার ডাকাতে লেখা না লিখ্‌লেই ত পারে।

সত্য কথা বলিতে কি, অকৃতদার, সুচরিত্র নিবারণের প্রতি গৃহিণীর একটা গাঢ় স্নেহ বর্ত্তমান ছিল। তিনি এক-মিনিট থামিয়া কালধর্ম্মের দোহাই পাড়িয়া বলিলেন—এই জন্যেই বাপ-মা আগেকার কালে গৌরীদান করতে

চাইত। মেয়ে ডাগর হ'লে কত উপসর্গই জোটে! আরও (একটু চিন্তিতভাবে) সুরভি নাকি বিয়ে করতেই চায় না?

গঙ্গাধর তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন—বটে!

হাসি নয়,—সত্যি—বলেছে। ঠাকুরপো···

গঙ্গাধর জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—সে ইঁপিড···

গৃহিণী, বর্ষীয়সী কন্যার জননী, স্বতঃই শীতলপ্রকৃতিসম্পন্না, কহিলেন—ইঁপিডের কোন দোষ নেই। সুরভি বলেছে।

কি বলেছে?

বলেছে, আমি বিয়ে করব না।

ও অমন বলে: নাটুকে মেয়ের নাটুকে কথা! নভেল পড়ে আর থিয়েটার দেখে ঐ-ই হয়।

বেশ—যাহ'ক। ও আবার থিয়েটার দেখ্‌লে কবে?

গঙ্গাধর পুরুষের শেষ সম্বল ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—না দেখেছে, নাই দেখেছে। মতটা ত থিয়েটারি, তা'তে সন্দেহ নেই।···দেখ, ওসব চল্‌বে না বলে দিচ্ছি; ও নিবারণকেও বল্‌তে হ'বে, তোমার মেয়েকেও বল্‌তে হ'বে।

গৃহিণী তাঁহার শেষ সম্বল অবলম্বন করিলেন, বলিলেন—তুমি তাই কর, আর আমি সব ফেলে টেলে মার কাছে আজই চলে যাই। কাজ নেই আমার আর সংসার করে। খুব সংসার করেছি, চুটিয়ে করেছি।

গঙ্গাধর এ হেন অনস্থায় বিজ্ঞজনোচিত কার্য্যই করিলেন, অর্থাৎ পাশ ফিরিয়া শুইলেন। এবং নাসিকাধ্বনি করিতে করিতে সত্যই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

গৃহিণী অন্ধকারে একাকী (যেহেতু গঙ্গাধর বাবু বিপজ্জাল হইতে মুক্তিলাভাশায় ইতি মধ্যেই নাক ডাকাইতেছিলেন) বোধ করি কক্ষ প্রাচীরের উদ্দেশেই বলিতেছিলেন—পোড়া বাংলা দেশে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কবে উঠে যাবে তাই ভাবি আমি। কুল, কুল, মান, মান, পয়সা, পয়সা,—জ্বালাতন! বিলিতি কাপড় বন্ধ করার বক্তিমে হচ্ছে, স্কুল কালেজ যাওয়া উঠিয়ে দেবার বক্তৃতে হ'চ্ছে, পোড়ার-মুখো মিন্সেগুলো এ দিকে একটু মন দিলে যে আমরা বর্ত্তে যাই গা। তা·কোন মুখপোড়া কি কথাটা কানেও তুলবে!

নির্জ্জন-কক্ষে, বদ্ধ দ্বারের ভিতরে কে আর কাণে তুলিবে? বোধ হয় যাঁহার সতর্ক কাণদু'টি জগতের সর্ব্বত্রই সজাগ হইয়া আছে তিনিই কতকটা শুনিলেন, আরও একজনের কাণে উঠিয়াছিল, তিনি না-কি নিদ্রিত, সাড়াশব্দ হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে গঙ্গাধর আফিস ঘরে ঢুকিলেন।

নিবারণ রুদ্ধশ্বাসে গল্পটা পাঠ করিতেছিলেন, সুরভির লেখা। জ্যেষ্ঠের চটির শব্দে মুখটি অল্প তুলিয়াই কহিলেন—আমি বড় ব্যস্ত আছি।

তা ত আছ!—বলিয়া গঙ্গাধর বসিলেন। একটুখানি ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—নিবারণ, তুমি ত একজন বঙ্গ-সাহিত্যের ধুরন্ধর, বল্‌তে পার, কৌলীন্যপ্রথাটা প্রথম কে সৃষ্টি করে? আর কেনই বা মানুষ এতকাল তা মেনে চলে আস্‌ছে?

নিবারণ ছাপার কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—আপনার মত মানুষই ঐ নিয়ে মাথা ঘামায়, আমরা ঘামাই নে।

অর্থাৎ আমি নিকৃষ্ট মানুষ, এই ত! তা বেশ ভাই! তোমরা যখন উৎকৃষ্টই হ'য়েছ, তোমাদের ত উচিৎ যা'তে নিকৃষ্টরা ভালো হয়, তার চেষ্টা করা। কেমন, উচিৎ নয় কি?

নিবারণ এই ব্যঙ্গোক্তির কোন উত্তর দিলেন না। গঙ্গাধর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কিন্তু আমি ভেবে দেখ্‌লাম প্রথাটা না মান্‌লেও আজকালকার লোকের কিছু ক্ষতি হ'বে না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আমি মত বদলেছি, নিবারণ!

নিবারণ কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া জিজ্ঞাসিলেন—কি মত আপনার?

গঙ্গাধর অকস্মাৎ নিবারণের মাথায় একদফা আশীর্ব্বাদের বোঝা নামাইয়া দিয়া কহিলেন—তোমাদের মতেই আমার মত ভাই। ছেলেটি ভালোই, আর ওকালতী পাশও করেছে···

কিন্তু মোহিত কখনই ওকালতী করবে না দাদা।

হ্যাঁ—তুমিও যেমন! কখনও করবে না! ও সব বাজে,

ভাই, বাজে। দু'দিন একটা হুজুগ উঠেছে, বল্‌ছে করব না, তারপর হুজুগগুলো কাট্‌লেই দেখ্‌বে সব সুড়্ সুড়্ গুড় গুড় করে চলেছে রে ভাই!

না-দাদা। মোহিতের সম্বন্ধে সে রকম শঙ্কা করা চলে না। আমি তাকে খুব ভালো করেই চিনেছি, সে আর আদালতে যাবে না।

গঙ্গাধর চেয়ারখানা টানিতে টানিতে বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, সে ভাবনা এখন থেকে ভেবে আর কি হ'বে! যে খা করুক্, ভার পড়ুক, তারপর—বেরোয় কিনা দেখা আছে আমার!—গঙ্গাধর বসিয়া দুই মিনিট ধরিয়া হাস্য করিলেন, তারপর বলিলেন—ভাই রে, অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, সব ফক্কি সব ফক্কি! হুজুগ আর হুজুগ, হুজুগ ছাড়া কথাই নেই—যত সব অল্পবুদ্ধি... ..

নিবারণ ধমক্ দেওয়ার মত বলিল—দাদা, সুরভির অন্য সম্বন্ধ দেখুন গে।

গঙ্গাধর নিবারণের আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তনে বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, না হয় নাই বেরুল আদালতে, বলি লেখাপড়া যা শিখেছে, সেটা ত আর ভুলতে পারবে না? তার ত একটা দাম আছেই।

নিবারণ বলিল—না, তারও বিশেষ মূল্য হ'বে না।

তার মানে?

মানে এই যে, পাশ করার যে পরিণাম—চাকরী, তা সে করবে না!—নিবারণ কাপি পড়ায় মন দিল।

গঙ্গাধর অল্পক্ষণ পরে চিন্তিতমুখে কহিলেন—ছেলেটি ভাল, সে বিষয়ে ত সন্দেহ নেই। তাই হ'লেই হলো।

নিবারণ কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন—আপনি কি সুরভির জন্য বলছেন?

গঙ্গাধরের কাণে এই কথা কয়টি অসহনীয় ন্যাকামী বলিয়াই বোধ হইল। তিনি মনের ভাব দমন করিতে চেষ্টা পাইয়াও, বলিয়া ফেলিলেন—কিন্তু সুরভি যে এ সময় বিয়ে করতে রাজী হ'বে, আমার ত তা মনে হয় না দাদা!

গঙ্গাধর এতক্ষণে শান্ত হইয়াছিলেন, বলিলেন—ও আবার একটা কথা হ'ল ভাই? তুমিও যেমন!

নিবারণ বলিলেন—কিন্তু দাদা...

গঙ্গাধর সহাস্যে কহিলেন—তুমি বললে...

আমার বলা যে আরও শক্ত দাদা, আরও শক্ত! ওর স্বাধীন মত ত আমি নষ্ট করতে দিতে পারি না।

স্বাধীন মতটা কি শুনি?

দেশের এই দুরবস্থার দিনে কোন ছেলে মেয়েরই আত্ম-সুখের জন্য কোন কাজ করা উচিত নয়। এ সময় আত্মোৎসর্গ করতে হবে।

বলি, উৎসর্গ ত করতেই হ'বে। সেটা সুরভি না করে সুরভির বাপ-কাকা কেউ করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? অন্ততঃ তোমাদের শাস্ত্রে কি বলছে শুনি?

নিবারণ রেহাই পাইবার জন্যই বলিলেন—আচ্ছা দাদা, আমি ভেবে দেখি।

তা দেখ। তবে মাসটা ফাল্গুণ সেটা জান ত?

জানি।

গঙ্গাধর বিড়ির বিড়ির করিয়া আরও অনেক কথাই বলিলেন, নিবারণ তাহার একটাও না শুনিয়া প্রস্থানোদ্যত জ্যেষ্ঠের পানে চাহিয়া বলিল—আচ্ছা।

গঙ্গাধরের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যাকালে আফিস হইতে ফিরিয়াই পাত্রান্বেষণে বাহির হইয়া যাওয়া, আজ আর বাহির হইলেন না। সন্ধ্যে রাত্রে বড় বধূঠাকুরাণীর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া দিলেন যে ভায়ের সঙ্গে বসিয়া অনেক দিন আহার করা হয় নাই, আজ রাত্রে নিবারণের সঙ্গেই আহার করিবেন।

কিন্তু নিবারণের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার খাপ খাইত না, নিবারণ দশটার সময় বলিয়া পাঠাইল, খাবার তাহার ঘরে ঢাকা দিয়া রাখিতে, ঘণ্টা দুয়ের আগে সে উঠিতে পারিবে না। অগত্যা গঙ্গাধর আহারাদি শেষ করিয়া শয্যাশ্রয় লইলেন!

আরো দুঃখের কথা এই যে, পরদিন মোহিত আসিতেই নিবারণ কোথায় যে বাহির হইয়া গেল, তাহার ঠিক নাই। মোহিত আপন মনে কি কতকগুলা ছাই ভস্ম লিখিল, দশটা বাজিবার আগেই প্রস্থান করিল। কিন্তু মোহিতের মন দেখিবার জন্য যাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল সেই নিবারণের দেখাও নাই। পরদিনও তাহাই হইল। গঙ্গাধর বিশুষ্কমুখে

একবার আফিস ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন, মোহিত অত্যন্ত ব্যস্ত, মাথা তুলিয়াও দেখিল না। কেবল বলিল—কাকা মশাই লেখা-টেখা জোগাড় করতেই বেরিয়েছেন, বোধ হয়।

এ ঘরে সুরভি মাটিতে অর্দ্ধশায়িতভাবে কাৎ হইয়া কি লিখিতেছিল, পিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিল। ইদানীং তাহার কেমন একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল, তাহার বন্ধু ভোলানাথ (আশুতোষ) পিতা গঙ্গাধর এই লেখা-টেখাগুলা পছন্দ করিতেন না, তাই সে পিতাকে দেখিয়াই ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া উঠিল।

গঙ্গাধরের কোনই কথা ছিল না, আসিয়া পড়িয়াছেন, একটু কিছু না বলিয়াও ফেরা যায় না। বলিলেন—লিখছিস্?

সুরভি কথা কহিল না, শুধু ঘাড়টি নাড়িল।

গঙ্গাধর বলিলেন—তোর কাকা কোথা গেলরে সুরভি? বাইরে সেই ভদ্র লোকটি একা বসে রয়েছেন।

সুরভি বলিল—কি জানি কোথায় গেছেন। আমা'কে ত কিছু বলেন নি।

গঙ্গাধর বিরক্তভাবে বলিলেন—নিবারণের কাণ্ডই ঐ! ভদ্রলোক তোর বাড়ীতে এসেছেন, তুই কি-না স্বচ্ছন্দে···

মোহিতবাবু "কর্ম্মীর" সহকারী সম্পাদক।

হ'লই বা। একলা তাঁকে মুখটি বুঁজিয়ে বসিয়ে রেখে বেরোন কি তার উচিৎ?

তিনি কি বসে আছেন? দেখি—বলিয়া সুরভি আফিস ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

মোহিত মাথাটা তুলিয়া বলিল—এই যে! কাকা মশাই কোথা?

সুরভি বলিল—তা ত জানি নে। আমি শুনলুম, আপনি একা চুপটি করে বসে আছেন, তাই এলুম।

মোহিত সহাস্যে কহিল—বসুন, বসুন। পার্শ্বের চেয়ারটায় রক্ষিত কাগজপত্রগুলি সে দুই হাতে টেবিলের উপর তুলিতে গেল।

সুরভি বলিল—আমি চেয়ারে বসি না। এই মাটীতেই বসছি।

মোহিত বেচারা উঠিবে কি বসিয়া থাকিবে, কি চেয়ার ছাড়িয়া মাটীতে বসিবে, ভাবিয়াই পাইল না। সুরভি বলিল—এবারকার কাকার লেখাটা পড়েছেন?

মোহিত বলিল—কৈ, আমি ত পাই নি এখনও! প্রেসে দিয়েছেন কি?

সুরভি বলিল—কাল ত প্রেসে দেবেন বলেছিলেন, দিয়েছেন বোধ হয়। চমৎকার হ'য়েছে। "চাওয়া ও পাওয়া।"—চমৎকার হয়েছে।

তা আর হবে না! আমি কি অপাত্র দেখে গুরু করেছি? হুঁ! আর সে আজ নয়! ওঁর যখন "প্রভাত" বেরুত, আমার বয়স তখন কতই বা, এই বছর দশ এগারো হ'বে—তখন থেকেই নিবারণ বাবুকেই মনে মনে গুরুত্বে বরণ করে রেখেছি। যাবার সময় প্রেস ঘুরে যাব'খন, প্রুফ্‌টা যদিই দেয়।···আপনার গল্প কি হ'ল—বলুন?

সুরভি সহাস্যে কহিল—এত তাড়া দিলে পারব কেন বলুন? একবার গুরুদেব, একবার চেলা······

ওঃ—ওটা আমারই ভুল। কর্ত্তা যখন আমাকেই দিনের মধ্যে পঁচিশবার তাড়া দেন···

আমাকে তা' বলে পঁচিশবার নয়, একবার, বড় জোর কোনও দিন বার দুই। আপনাকে তাড়া ত হ'বেই! লেখক আর কোন্ কালে কবে আপনি লিখ্‌তে বসে! যিনি যত বড় লেখক, তত বেশী কুড়ে—তাড়া না দিলে কাজ হ'বার যো নেই।

মোহিত হাসিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া, সকৌতুকে কহিল—তা'লে আমি বড় লেখক হ'য়ে গেছি—কি বলেন?

সুরভিও হাসিল, বলিল—কেন? আপনার সন্দেহ আছে?

মোহিত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম চিন্তার ভাণ করিয়া কহিল—হুঁ! আছে বৈকি! "বেঙ্গলী" আফিসে গেছলুম কাল। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেছি, ঘরে ঢুকেই বল্লুম, আমি, অর্থাৎ আমার নাম মোহিতমোহন সেন! লোকটা এমনি অভদ্র—চোখ্‌টা কপালে তুলে বল্লে—হাঁ, কি চান? আমি আবার নামটা বল্লুম, তাতে একদম খাড়া বসে বল্লে, কি চান? না একটা চেয়ার দেওয়া, না স্বনাম-ধন্য সাহিত্যিকের সঙ্গে সাক্ষাতে প্রীত হওয়া—ছোঃ ছোঃ!—

মোহিত হাসিতে লাগিল, সুরভি হাসিল না। গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসিল—ওখানে কেন? মোহিত বলিল—একটা প্রতিবাদ দিতে গেছলুম।…সুরভিকে তথাপি নিরুত্তর দেখিয়া কহিল—ওরা কালকে কতগুলো যা-না-তা মিছে কথা লিখেছে, সেগুলোর একটা প্রতিবাদ না করে' পারলুম না। দেখি ছাপে কি না। কাল ছাপবার দিন আছে।

সুরভি বলিল—কাকা ওদের কথার প্রতিবাদ করেন না, ওঁর মতে, প্রতিবাদ করলেই জিনিষটার কদর বেড়ে যায়। যা মিথ্যে তার আবার কদর বাড়ান কেন? আর ছাই পাঁশ হাবজা গোবজা দিয়ে যতই কেন ঢাকতে চেষ্টা করুক, আসল সত্যি কি আর বেরুবে না? বেরুবেই—মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন ত হ'বেই, অনর্থক মিথ্যাতেই মন দিয়ে কেন নিজেরা মন কলুসিত করি।

সুরভি এক মুহূর্ত্তমাত্র থামিয়া পুনশ্চ কহিল—কাকা আরও বলেন, আমরা যখন একসট্রিমিষ্ট, ওদের প্রতিবাদ করলেই ওদের সম্পর্কে যত লোক, সবাই ভাবে ওদের কাছেও বুঝি আমাদের প্রত্যাশা আছে!

মোহিত বলিতে গেল—কিন্তু…

সুরভি বলিল—কাকার এই মত। সকলের সঙ্গে হয় ত মিলবে না, আর না মিললেই যে অমনি শত্রু হয়ে গেল, তা'ত নয়।

মোহিত মেয়েটির মনের শুভ্রতায় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল। যাহারই উক্তি হোক, সুরভি একান্ত স্থির ও গদগদকণ্ঠে এমনই ভাবে বলিয়া গেল যে মোহিতের মনের তর্ক জাল টুক করিয়া ছিঁড়িয়া কোথায় লুটাইয়া পড়িল।

সে স্থিরনেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসিল—আপনারও ঐ মত?

আমারো ত গুরু তিনিই!—বলিয়া সে মাথাটি নত করিল।

মোহিত বলিল—সেটা আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

সুরভি কথা কহিল না। মোহিত চাদর শুদ্ধ দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল—এখনই চললুম—নমস্কার!

মোহিতও বাহির হইল, অন্তঃপুরের দ্বার খুলিয়া আফিসের বেশে গঙ্গাধর ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—তোমার কাকা মশাইটি ফিরলেন কি?

না—বলিয়া সুরভি অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার পিতা—পিতা ভাবিলেন, সুরভির মুখটি যেন বড়ই প্রফুল্ল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিবারণ সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া অত্যন্ত হতাশ ও ক্লান্তের মত বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—যা ভেবেছিলুম, তাই হ'ল! কংগ্রেসের কাজ করাও বেআইনী হ'ল!

সুরভি মায়ের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, অগ্রসর হইয়া কহিল—শুধু বাংলায় কাকা?

আপাততঃ, তাই মা! তবে কাল দেখ্‌বে নিখিল ভারতবর্ষেই ঐ এক আইনই জারি হ'বে। এক মিনিট পরে আবার বলিলেন—কংগ্রেস বন্ধ না করে ছাড়বে না।

সুরভি কথা কহিল না; বড় বধূঠাকুরাণী সেই অবসরে কহিলেন—বক্তৃতা আর হবে না ত, বেঁচেছি। দাঁড়াও ভাই, পোড়ারমুখী বিনীকে শুনিয়ে আসি। আহা, বাজীটা রাখলেই বেশ হ'ত ছুঁড়ী রাগতেও চেয়েছিল—বলিয়া তিনি পাশের বাড়ীর একটি অল্পবয়স্কা বিধবা বধূর উদ্দেশে ছুটিলেন।

গঙ্গাধর রাত্রে আহারে বসিলেন, গৃহিণীর বাক্যস্রোতের মধ্যস্থলেই ঘূর্ণির মত মাথা ঘুরাইয়া বলিলেন—আমি জানি গো জানি। আফিস ফেরৎ ট্রামের গলাবাজীতে মাথা ধরে গেছে। মোহিতের সঙ্গে নিবারণের দেখা হ'য়েছিল কি—বলতে পার?

গৃহিণী আহতকণ্ঠে কহিলেন—এখানে ত হয় নি, বাইরে যদি হ'য়ে থাকে, বলতে পারি নে। সেই ত মানুষ এসেই বসে আমাদের কাছে গল্প করছিল, একটা দরকারে আমি ছাদে গেছি, এসে শুনি কে ডাকতে এসেছিল, চলে গেছে।

গঙ্গাধর বলিলেন—সমস্ত দিন ফেরে নি বুঝি? এবার কিছুদিন ঘুরে আসবেন বাছাধন, বুঝতে পারছি।…দেখ সম্বন্ধটার আশাও ছাড়তে হ'বে।

গৃহিণী বিস্মিত নয়নযুগল গঙ্গাধরের মুখের পরে রাখিতেই গঙ্গাধর বলিলেন—সম্পাদক গেলে সহকারীই কি পার পাবে ভেবেছ? একদম না। আমরা আইন-আদালতের চৌকাঠও পার হই নি, তবু জানি যে চোরের সঙ্গী চোরই হয়-এ কথা বোধ করি আইনেও আছে।

তিনি বারবার গৃহিণীর দিকে চাহিতেছিলেন, কিন্তু গৃহিণী যে কিছুমাত্র বুঝিয়াছেন, এমন বোধ হইল না। গঙ্গাধর সহজ করিয়া কহিলেন—নিবারণ সম্পাদক, যে-রকম লিখ্‌ছে টিখ্‌ছে, রাস্তা ঘাটে যে রকম সব গরম শুনি তাতে গবরমেণ্ট যে এবার শ্রীমানকে শ্রীঘরে না পাঠিয়ে ছাড়বে এমন বোধ হয় না। সম্পাদক গেলেন, তখন শ্রীযুক্ত মোহিত সম্পাদক, গবরমেণ্ট আবার সারজেণ্ট পাঠিয়ে দিলে, জামাই বাবাজী—সহকারী সম্পাদকও হাজির।

গৃহিণী বলিলেন—তা বটে।

অনেকক্ষণ আর কথাবার্ত্তা হইল না। গঙ্গাধর নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে ভোজন করিতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন—একটু ডাল দিতে বলি?

'না'—বলিয়া কর্ত্তা দুধের বাটী টানিয়া লইলেন; ভাত মাখিতে মাখিতে কহিলেন—কি বল?

গৃহিণী ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—আমাকে জিজ্ঞেস্ করছ কেন? আমি ও-সবের কি-ই বা বুঝি, তোমাদেরই বা কি পরামর্শ দিতে পারি? তবে আমি বল্‌ছি কি জান—ঠাকুরপো যে যা করে নি, অমনি ডাকাবুকো কাজও করতে পারে, মোহিত যদি পরের মেয়ের ভার ঘাড়ে নেন্, তিনি কি আর সাম্‌লে চলবেন না?

কর্ত্তা যেন অকূল সমুদ্রে কূল দেখিতে পাইলেন; কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন—কথাটা বলেছ মন্দ নয়! লেখা পড়া জানা ছেলে, ওরা দায়িত্ব যদি ঘাড়ে নেয়, বুঝে সুঝেই চলবে। কিন্তু আর দেরী নয়, নিবারণকে বল্‌তে হবে যাতে শীঘ্রই একটা পাকাপাকি করে ফেলে। সকালে নিবারণ বেরিয়ে যাবার আগেই আমাকে তুলে দিও, বুঝ্‌লে?

গৃহিণী সম্মত হইলেন। ভোর না হইতেই গঙ্গাধরকে তুলিয়া দিয়া কহিলেন—ঠাকুরপো ষ্টোভে দুধ গরম করছে, খেয়ে বোধ হয় এখনি বেরুবে।

গঙ্গাধর মুখ-হাত ধুইয়া আফিস ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, নিবারণ মাথা গুঁজিয়া লিখিতেছে। গঙ্গাধরের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—আজ আমাকে মাফ্ কর দাদা।

গঙ্গাধর লেখক ভ্রাতাটিকে যথেষ্ট 'সমীহ' করিয়া চলিতেন। কিন্তু মিষ্ট করিয়া কহিলেন—সুরভির কথাটা...

নিবারণ কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—তাকে ডেকে দিন, দাদা।

গঙ্গাধর নীরবে বাহির হইয়া আসিলেন। রান্নাঘরের দ্বারের কাছে বসিয়া সুরভি পাচিকাকে কি উপদেশ দিতেছিল, গঙ্গাধর অন্ধকার মুখ করিয়া কহিলেন—কাকা বাবু ডাক্‌ছেন।

সুরভি পিতার কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া গেল। একবার মাত্র পিতার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াই সে যখন আফিস ঘরে ঢুকিল, ঠিক সেই সময়েই মোহিত অন্য দরজা ঠেলিয়া ঘরে পা দিয়াই বলিল—নমস্কার।

নিবারণ মাথা তুলিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে চাহিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং একমুহূর্ত্তকাল যেন কি-করি কি-করি গোছের ভাবিয়া চিন্তিয়া অকস্মাৎ মোহিতের ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—মোহিত! সুরভি তোমার যোগ্য স্ত্রী।—আবার একটা হাত বাড়াইয়া সুরভিকে ধরিয়া বলিলেন—সুরভি তোমার কাকার, তোমার গুরুর এই আদেশ!

মোহিত আরক্তমুখে সুরভির পানে চাহিয়া তখনই মাথা নত করিয়া লইল। নিবারণের হস্তমুক্ত হইয়া চেয়ার-টায় বসিয়া পড়িয়া মোহিত কাগজ কলম তুলিয়া লইল।

সুরভি কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল। নিবারণ নিঃশব্দে স্লিপের পর স্লিপ্ লিখিয়া যাইতে লাগিল, ঘণ্টাখানেক পরে লেখাটা শেষ করিয়া মোহিতের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল—পড় ত মোহিত।

মোহিত সাগ্রহে কাগজগুলি পাঠ করিতে লাগিল। নিবারণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বোধ করি তৃপ্তিই অনুভব করিতেছিল, মোহিত পড়া শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল; দু'হাতে নিবারণের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল; বলিল—এমন লেখা আমি পড়ি নি। এ আগুন!

নিবারণ সোৎসাহে মোহিতের বাহুস্পর্শ করিয়া বসাইয়া কহিল—তাহ'লে হ'য়েছে? অন্তরের আগুনকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি, কি বল?

মোহিত স্বীকার করিল যে হাঁ, আগুন বটে!

নিবারণ চাকর ডাকিয়া কাপিটা প্রেসে পাঠাইয়া দিল। মোহিত বেলা হইয়াছে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিতেছে, গঙ্গাধর

ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—হাঁ হে নিবারণ, বলি বড্ড না-কি ধর-পাকড় হচ্ছে রাস্তায়? বলি আফিস যেতে পারব ত?

নিবারণ সহাস্যে কহিল—আপনার ভয় কি দাদা? আপনি ত কংগ্রেসের 'অ-আ'-ও জানেন না, আপনার ভয় কি?

বলি নেই ত. তা হ'লেই হ'ল! আর সেটার কতদূর কি করলে ভাই?

সে হয়ে গেছে দাদা, তার জন্যে আপনি আর ভাববেন না।

ভাবব না ত! তা হ'লে…

তা হ'লে যে কি, তিনি নিজেই জানিতেন না, কথাটা শেষ হইল না।

নিবারণ বলিল—ওদের হাতে হাতে সঁপে দিয়েছি। বাকী শুধু মন্তর পড়া আর সিঁদুর দেওয়া।

মোহিতকে নত মস্তকে থাকিতে দেখিয়া গঙ্গাধর বাবুর বুক দশ হাত হইয়া গেল। কিন্তু মেয়ের বাপের একটা 'কিন্তু' থাকা দরকার, বলিলেন—কিন্তু ওঁর আত্মীয়স্বজনের মত হ'বে ত মৌলিকে কাজ করতে?

মোহিত বলিল—আমার আত্মীয় স্বজন বিশেষ কেউ নেই। এক খুড়তুতো ভাই আছেন, তিনি আমার পিতৃ-পরিত্যক্ত বিষয় আসয়ের বর্ত্তমান মালিক হ'য়েই সন্তুষ্ট। তাঁর মতের দরকার হ'বে না।

গঙ্গাধর চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িলেন। মিনিট দুই পরে কহিলেন—একখানা কাগজ দাও ত নিবারণ! আফিসে একটা চিঠি লিখে দিই।

গঙ্গাধর কাগজ লইয়া লিখিলেন—পেটের পীড়া!

নিবারণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোহিত মোটা চাদরখানা মাথায় তুলিয়া দিয়া রৌদ্রে বাহির হইয়া গেল।

গঙ্গাধর নিবারণের মস্তকোপরি আশীর্ব্বাদের দ্বিতীয় বোঝা নামাইয়া দিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালাদেশে কৌলীন্য প্রথাটা কতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে প্রত্নতাত্ত্বিক মহাশয়গণ তাহার সঠিক সংবাদ দিতে পারিবেন, আমরা এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যে আজ-কাল আধুনিক শিক্ষিত সমাজে ইহার ব্যতিক্রম বহুল দেখা যাইতেছে। ইহার অব্যবহিত ফলে দেশটা অধঃ বা উচ্চ স্তরে নামিবে বা উঠিবে, ইহা লইয়া গবেষণা যে শীঘ্রই সুরু হইবে তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। তা হোক্—গঙ্গাধর তেমন শিক্ষিতও নহেন, "আধুনিক" বলিতে যা বুঝায়—তাহারও বাহিরে, কাজেই তাঁহাকে একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল, সেই কথাই বলিব।

প্রথমতঃ নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হইবে কি-না? কাগজে-কলমে ধরা দিতে তিনি নারাজ। নিমন্ত্রণ পত্র ছাড়া নিমন্ত্রণ করা ত এক অসম্ভব ব্যাপার! মুখে বলা, ক'টাই বা হয়!—কাহাকেও না বাদ দেওয়া হয়।

পাত্রের জাতি গোত্র একেবারেই অজ্ঞাত। সে যে ভদ্রবংশজাত ও উচ্চশিক্ষিত তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের খবর লওয়া নিবারণ একদম অপছন্দ করিয়াছে; তাঁহার যুক্তি;, মোহিতের পূর্ব্বপুরুষকে আপনি কন্যাদান করিতেছেন না। যাহাকে করিতেছেন সে সৎ কি অসৎ—তাহাই দেখুন—গৃহিণীও সায় দিলেন।

তারপর মোহিতের মত সুপাত্র বিনাপণে এই পাত্র-দুর্ভিক্ষের বাজারে পাওয়া দুর্লভ বটে, কিন্তু স্বদেশী হাঙ্গামা যে রকম পাকাপাকি হইয়া আসিতেছে, বরাতে যে শেষে কি আছে—ইহাও সমস্যা। অবশ্য নিবারণকে এ কথা বলা হয় নাই, শুনিলে সে কি কাণ্ড করিয়া বসিত। তবে দিনে রাত্রে নির্জ্জন হইলেই কর্ত্তা গৃহিণীর মধ্যেই এই প্রসঙ্গটি উত্থিত হয়। আপাততঃ গঙ্গাধর সম্পূর্ণ বিধিলিপি অখণ্ড-নীয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হইল না (কবিতার ত কথাই নাই)—আর একটি সপ্তাহমাত্র আছে। গঙ্গাধর সোমবার হইতেই কেনা কাটা ও নিমন্ত্রণাদি সারিবেন স্থির করিয়াছেন। নিবারণের উপরেও কতক নিমন্ত্রণের ভার পড়িয়াছে। নিবারণ মোহিতের জন্য একটা ছোট খাট বাসা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

মোহিত ক'দিন আসে নাই, নিশ্চয়ই ব্যস্ত আছে। নিবারণের সঙ্গে রোজই দেখা হইয়াছে, সে'ও বাড়ী খুঁজিতেছে—কলকাতা সহরে ছোট খাট বাড়ী ভাড়া পাওয়া

দুষ্কর। ক'দিন ধরিয়া সহর চষিয়া ফেলা হইয়াছে, কোথাও সন্ধান মিলে নাই। গঙ্গাধরের এক ধনীবন্ধুপুত্র সুধীরকৃষ্ণ গুপ্ত তাঁহার কাশীপুরের বাগান বাড়ীটি নবদম্পতীর ব্যবহারের জন্য মাস দু'তিন ছাড়িয়া দিবেন বলিয়াছেন, অগত্যা তাহাতেই কার্য্য হইবে। নিবারণও তাহাতে সম্মত, সে বলিয়াছে ঐ দু'তিন মাসের মধ্যে একটা বাড়ী ঠিক হইয়া যাইবে, কোন চিন্তা নাই।

আপাততঃ কোন চিন্তাই নাই। গঙ্গাধরের মুখে হাসি ফুটিয়াছে, গৃহিণী বিবাহের পূর্ব্বেই একদিন ভাবী জামাতাকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, কেবল মোহিত অনুপস্থিত বলিয়াই হইতেছে না। নিবারণকে উপর্য্যুপরি দুইদিন বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহার এই মস্ত দোষ, বাড়ীর বাহির হইলে আর বাড়ীর কথা মনে থাকে না। আর থাকিবেই বা কিরূপে? "বাড়ীর" মর্ম্ম ত কোনদিন বুঝিল না!!

আজও নিবারণকে গঙ্গাধর বলিয়া দিলেন, দেখ ভাই, অতি অবিশ্যি মোহিতকে একবার ডেকে এসো। বিয়েটা না হয় ঘরোয়া বন্দবস্তেই হচ্ছে, শাস্ত্রীয় কাজগুলি ত করতে হ'বে। আজকের দিনটা ভালো আছে, সন্ধ্যাবেলা আশীর্ব্বাদও করব, আর রাত্রে খাওয়া-দাওয়াটাও একসঙ্গে হ'বে।—নিবারণ "তথাস্তু" বলিয়া সেই যে সাতটা বাজিতেই বাহির হইয়াছে, বেলা আড়াইটা বাজিতে চলিল, এখনও দেখা নাই! এমন অত্যাচারে যে শরীরটা দশদিনও টিঁকিবে না, বড়বধূঠাকুরাণী উঠানে রৌদ্রে পিঠ্ দিয়া বসিয়া, বারবার সেই আশঙ্কাই ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সময়ে স্নানাহার করিয়া দেশোদ্ধারে গমন করিলে কি এমন ক্ষতি তাহা তিনি কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না!

বাড়ীটি নিঃস্তব্ধ। ঠিকা ঝি তখনও আসে নাই। ভৃত্য রামদীন বাহিরের রোয়াকে রৌদ্রে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শীত নিবারণ করিতেছে, নির্জ্জন গলিটায় লোক জনেরও তেমন সাড়া শব্দ নাই—সুরভি "কর্ম্মীর" আফিস ঘরে মেঝেতে বসিয়া একখানা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। কাগজে নূতন খবর কিছুই নাই—সেই ধরপাকড় আর রাশি রাশি অত্যাচারের সংবাদ। পড়িতে পড়িতে সে অত্যন্ত শান্তিবোধ করিতেছিল। কাগজটা নামাইয়া একটা প্রুফের বাণ্ডিল তুলিয়া লইল। প্রুফ দেখার কার্য্যটা সুরভি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তবুও কাকার লেখা আর প্রথম প্রুফ্ বলিয়াই সে লালকালীর কলম বাছিয়া প্রুফ্ দেখিতেই মন দিয়াছে, শুষ্কমুখে মোহিত ঘরে ঢুকিয়া বলিল—কাকা মশাই?

সুরভি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আসেন নি ত!

আসেন নি!—মোহিত চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া কহিল—তা'হলে খবর যা শুনছি, ঠিক!

কি শুনছেন?

তাঁকে পুলিসে......

সুরভি বলিল—পুলিস আফিসে খোঁজ নিয়েছেন?

মোহিত হতাশভাবে কহিল—আমি খবর নিতে গেছলুম, তারা বল্লে, জানি নে।—বলবে না, এই মানে।

সুরভি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মোহিত তাহার দৃঢ়তায় আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সুরভি কয়েক মিনিট পরে কহিল—ঠিক খবর কাল খবরের কাগজে জানা যাবে, কি বলেন?

মোহিত উত্তর দিতে পারিল না।

সুরভি বলিল—কংগ্রেস আফিস্ ত খবর রাখছেই......

মোহিত রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—সেখানেই শুনে আসছি সুরভি।

সুরভি একবার মোহিতের দিকে চাহিয়া প্রুফের বাণ্ডিলটা টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে বলিল—কাকা এর জন্য তৈরী হ'য়েই ছিলেন। কাল রাত্রে আমায় বলছিলেন—লেখা যা লিখে, সংগ্রহ করে' রেখেছি "কর্ম্মী"র এক বছরের খোরাক হ'য়ে আছে—তখন বুঝতে পারি নি, এ কথার মানে কি, এখন বুঝছি!

মোহিত নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

সুরভি অকস্মাৎ স্থির নেত্রদ্বয় মোহিতের মুখে নিবদ্ধ করিয়া কহিল—আপনি এবার কি করবেন?

মোহিত চমকিয়া উঠিয়া বলিল—তাই ভাবছি। এখন পর্য্যন্ত এত লোক যে জেলে গেল, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে ফকিরী নিলে, সে শুধু কাগজেই পড়ছিলাম। এখন আপনার লোক

যেতেই বুকের মধ্যে যে কি করে' উঠ্‌ছে তা বল্‌তে পারিনে। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে…

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সুরভি বলিল—পারবেন?

মোহিত বলিল—তুমি কি বল, সুরভি?

আপনি পারবেন।

মোহিত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া শুনিল, আপনি পারবেন কে বলিল? এত দৃঢ়-কোমল-কণ্ঠে সম্পূর্ণ বিশ্বাসভরে কে বলিল—ঐ নারীটি? না আর কেহ?

মোহিত আবার শুনিল—কেন পারবেন না? যে ত্যাগ করতে জানে তার আবার অসাধ্য কি? আপনি ত…

মোহিত নতমুখে বলিল—পারব। কিন্তু যাঁকে আমি গুরু বলে জানি, তাঁর কাজ যে এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, সুরভি…

দাঁড়ান। বলিয়া সুরভি চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল। দুই মিনিট পরেই ফিরিয়া টেবিলের'পরে একটি ক্ষুদ্র জার্ম্মান-সিলভারের কৌটা খুলিয়া দিয়া বলিল—আপনি যান, কিন্তু তার আগে……

মোহিত সিন্দুর কৌটাটির পানে চাহিয়া যখন এদিকে মুখ ফিরাইল, তাহার সামনে তখন সুরভি নতজানু হইয়া নত মস্তকে বসিয়া পড়িতেছে। মোহিতের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে কোন কথা না বলিয়া দুই আঙুলে খানিকটা সিন্দুর তুলিয়া তরুণীর সিঁথিতে লেপিয়া দিতেই সুরভি গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

আরও দুই মিনিট কাটিয়া গেল। মোহিত বলিল—যাই সুরভি?

এসো—বলিয়া সুরভি আর একবার প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সুরভির মাতা ঠাকুরাণী এইদিকেই আসিতে ছিলেন, মেয়ের খোলা মাথার মধ্যভাগে সিঁদুরের রেখা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ওকিরে শতেক খোয়ারী…

মোহিত তখনও দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে এ দিকেই চাহিয়া ছিল, গৃহিণীর কথাটা অসমাপ্তই রহিয়া গেল!

জানা দরকার

(শ্রীসুধা দেবী)

১। যারা বেশী আলু খায় জীবনে তাদের বাত হয় না।

২। মানুষের চাইতে মাকড়সাই খুব প্রাচীন অধিবাসী পৃথিবীতে।

৩। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চশমা প্রথম আবিষ্কার হয়।

৪। চীনদেশীয় লোকেরা লাল রক্তকে সুখের চিহ্ন মনে করে।

৫। সহরের লোকদেরই বেশী চোখ খারাপ হয়।

৬। সুস্থ অবস্থায় মানুষ প্রতিমিনিটে ৭৫৩ ধাপ হাঁটতে পারে

৭। প্রথম বিলিতি ডাকটিকিটগুলো কালো রং-এর হয়েছিল।

৮। একটা হাতী দিনে ২০০ পাউণ্ড খড়পালা খেয়ে থাকে।

৯। একটা শামুকের এক মাইল পথ যেতে ১৪ দিনের কিছু বেশী সময় লাগে।

১০। লাল আলোই সব চেয়ে বেশী দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

১১। স্ত্রীলোকদের ঘুম পুরুষদের চেয়ে পাতলা এবং অল্পকাল স্থায়ী।

"নিরাশ প্রেমিক জাপান"

[শ্রীসফিয়া খাতুন বি-এ]

এই কলি যুগে এতদিন শুধু দেখতে পেয়েছি হয় একটা যুবক একটা যুবতীর একখানা বুক ভেঙ্গে দশখানা করে দিয়েছে, না হয় একটা যুবতী একটা যুবকের সেই দশখানা-করা ভাঙ্গা বুককে একখানা করে নিয়েছে। এত দিন এ সব প্রেমের লীলাখেলা মান অভিমান শুধু মানুষে মানুষেই চলছিল। এখন দেশে দেশেও সেই মান অভিমান চলছে।

জাপান ও আমেরিকার মান অভিমানের কথা এখানে বলব। এতদিন জাপান আমেরিকার রূপ, গুণ ও যৌবনের মোহে পাগল হয়ে তার দ্বারে হত্যা দিয়ে শুধু বলেছিল—

"কত আশা করে তোমারি দুয়ারে
ভিখারীর বেশে এসেছি,
খোল দ্বার খোল, দেখব চাহিয়ে" ইত্যাদি।

জাপানের এই কান্নায় যে আমেরিকার প্রাণ গলেছিল না তা নয়, কিন্তু সে মনের টান অন্তরের ছিল না, সেটা ছিল বাইরের। তার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল টাকার আর টাকার! জাপানকে হাতছাড়া করলে আমেরিকার প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য করা অসম্ভব ছিল। জাপানকে হাতে না রাখতে পারলে আমেরিকার এসিয়ায় বাণিজ্য করতে আসা কোন রকমেই সহজসাধ্য ছিল না। তাই আমেরিকা জাপানের সঙ্গে ঠিক ফুল ও ভ্রমরের সম্বন্ধ পেতেছিল। ভ্রমর যেমনি ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায়, আজ আমেরিকাও তাই করছে। জাপান হয় ত স্বপ্নেও ভাবতে পারে নাই যে একদিন চীন তার সতীন হবে, তার সুখে ভাগ বসাতে আসবে।

আমেরিকার কৃপালাভ করে জাপান নিজকে বড় গৌরবান্বিত মনে করেছিল। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে রাতারাতি একটা কিছু হয়ে যেতে চেয়েছিল! সে যেন আর গা রাখবার স্থান খুঁজে পাচ্ছিল না। জাপান তার পাশের বাড়ীর ভারতবর্ষ আর চীনকে নেহাৎ অভদ্র ছোট লোক মনে করতে লাগল। তাদের সঙ্গে কথা বলা পর্য্যন্ত অপমান বোধ করল। জাপানের এই আত্মম্ভরী অহঙ্কারের একমাত্র কারণ, তার বিশ্বাস ছিল আমেরিকার হৃদয় জয় করতে সে পেরেছিল! আমি বলব—তা পারে নাই। আমার একথা সত্যি কি মিথ্যা তা সে দিনের Immigration Bill দ্বারাই বেশ প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই Immigration Bill দ্বারাই পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতির নীচতা ও স্বার্থপরতা যথেষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাতে আমেরিকার কূটবুদ্ধি বৈ সুনাম প্রকাশ হয় নাই।

সহসাই পাঠকের মনে একটা কথা উঠবে যে শুধু জাপানীদের বিরুদ্ধে Immigration Bill পাশ করবার কারণ কি? তার উত্তর এই গুরু সাজবার লোভটা কার না হয় শুনি? এতদিন আমেরিকা জাপানের উপর বেশ ভাল করেই গুরুগিরী করে আসছিল। অবশ্য আমেরিকার নিকট হতে জাপান যথেষ্ট বিদ্যা শিখে নিয়েছে। সত্যের অপলাপ করলে চলবে কেন? জাপানের আজ এত উন্নতির আমেরিকাও এক কারণ। আমেরিকা জাপানকে যথেষ্ট শিখিয়ে দিয়েছে। তার ফলে আজ জাপানের শিল্প-বাণিজ্যে বিলেতের পরেই স্থান।

প্রতি বৎসর দলে দলে জাপানী আমেরিকায় নানা বিষয় শিক্ষা করবার জন্য যাচ্ছে। বলতে কি ক্যালিফোর্নিয়ায় আমেরিকান হতে জাপানীদের সংখ্যাই এখন বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া ইউরোপের শ্রমজীবীরা প্রাচ্য শ্রমজীবি-দেরে বড্ড ভয় করে চলে। আমাদের ভারতীয় কি জাপানী কুলীরা প্রতিদিন যত উপার্জ্জন করতে পারে, ইউরোপের নেটীভ কুলীরা তা পারে না। এ ত আর ভারতবর্ষ নয় যে অবারিত দ্বার পাবে। যার খুশী এসনা কেন—মা অন্নপূর্ণার অন্নছত্র খোলা থাকবেই। তা তুমি ইংরেজ ফরাসী, মুচি মুদ্দফরাস যাই হও না কেন—কোন বাধা নেই। দ্বিতীয়তঃ—আমেরিকা ভাবছে—বাবা, এ ত বড় সোজা লোক নয়! এ যে দেখছি, দুদিনেই গুরু মশাইকে ডিঙ্গিয়ে উঠতে চায়! কাজেই তার পথে কাঁটা দেওয়া চাই।

আমেরিকার আশা ছিল যে বোকা ভারতবাসীদের ন্যায় কোন একটা খেলার পুতুল জাপানের হাতে দিয়ে সেখানে তার ব্যবসা বাণিজ্য বেশ করে চালাতে পারবে। কিন্তু এখানে আমেরিকা ঠকেছে। তার বুঝা উচিৎ ছিল যে

জাপানী পরাধীন ভারতবাসীর ন্যায় কুড়ে—উৎসাহ হীন, পরগলগ্রহ বা পরমুখাপেক্ষী জাতি নয়। এ জাতি ভারতবাসীদের ন্যায় ভোজবাজীতে ভুলবার নয়।

তাই জাপানের গুরুমারা বিদ্যার একটু আভাস পেয়েই আজ আমেরিকা বড় হুঁসিয়ার হয়ে গেছে। বিশেষতঃ—আমেরিকার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই। আমেরিকা যখনই কোন অভিনব জিনিষ আবিষ্কার করে প্রাচ্যদেশে রপ্তানি করতে চেয়েছে, অমনি জাপানে ঠিক সেই রকম বা কোন কোন জায়গায় তার চাইতে ভাল জিনিষ অতি সস্তা-দরে বাজারে বিক্রয়ার্থ তখন তখনই বের করে আমেরিকার জিনিষটার দর একদম কমিয়ে দিয়েছে।

এখন ইউরোপের কাছে—জাপান ধুমকেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এশিয়ার যা কিছু গৌরব সবই ত ইউরোপের হাতে চলে গেছে। একমাত্র শেষ নির্ব্বাণপ্রদীপ ছিল জাপান আর চীন। কিন্তু চণ্ডুখোর চীন, নিজের কুসংস্কার নিয়েই আছে। তার দিনরাত পূর্ব্বের মতই চলছে, উন্নতি ও নাই অবনতিও বড় দেখা যায় না। চণ্ডুদেবীর কৃপায় নূতন কিছু একটা গড়ে তুলবার খেয়াল তাদের মাথায় ঢুকে না। কিন্তু জাপান দিন দিন নূতন ভাবেই তৈরী হয়ে উঠেছে। সে অস্ত্র শস্ত্র, বিজ্ঞান বাণিজ্যে ইউরোপের প্রত্যেক দেশের সঙ্গেই তাল দিয়ে চলেছে! ইউরোপের তা সহ্য হবে কেন? তার শক্তির হ্রাস করা চাই-ই। তা নইলে সাদা চামড়ার যে কোন প্রাধান্যই থাকে না। গত ওয়াসিংটন Conferenceএ সানটাং এ জাপানের প্রাধান্য নষ্ট করে চীনকে তা দেওয়া—পতিত ও অনুন্নত চীনের প্রতি সদয়, সহানুভূতি বা বন্ধুত্ব দেখান নয়। এইরূপ করার একমাত্র কারণ জাগ্রত জাপানের শক্তি হ্রাস করা।

এসিয়ায় চীনের লোকসংখ্যাই সব চাইতে বেশী। এখন পাশ্চাত্যের কূট রাজনীতির প্রবল ইচ্ছা হয়েছে চণ্ডুর কৃপায় অল্পবুদ্ধি চীনকে কি করে হাতের মুঠোয় নেওয়া যায়। তাকে হাতের মুঠোয় নিতে পারলেই জাপানকে নরম করা সহজ হ'য়ে উঠবে।

জাপানের গেল-ভূমিকম্পে তার উপর চীনাদের জাপানী মাল বয়কট, ইত্যাদিতে আমেরিকা বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে। আমেরিকার এই ব্যাপারে নেচে উঠবার প্রধান কারণ বাণিজ্য। চীনারা জাপানীমাল বয়কট করেছে বটে কিন্তু তাদেরও আমাদের ন্যায় সর্ব্বকাজ করে খাওয়ার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ কুড়েমীর জন্য। আমরাও যেমন পরের আশায় বসে থাকি, তারাও তাই করে। আমেরিকা তা জানতে পেরে সুখী হয়েছে এইজন্য যে তার জিনিষগুলি এখনি অবাধে চীনের ন্যায় এত বড়লোক পূর্ণ দেশে বিক্রী হবে। সঙ্গে সঙ্গে জাপানের শক্তিও কমে আসবে। কাজেই আস্তে আস্তে জাপান কি চীনকে ভারতের দশা করা হয় ত সহজ হয়ে আসতে পারে। আমাদের Forward বলেন "The way lies in seeking to stand with allies, allies by sympathy, culture and tradition. The Late Mr. Okakura understood it—when he said that China without Japan and India has no legs to stand on, India without China and Japan has no legs to stand on."

অতি সত্যি কথা। ভারত ভিন্ন জাপানের কি চীনের দাঁড়াবার স্থান নেই, জাপানেরও চীন কি ভারতবর্ষ ভিন্ন দাঁড়াবার উপায় নেই। বুঝতে হবে আজ যদি ইউরোপ জাপানের শক্তি হ্রাস করতে পারে তবে চীনের কি ভারতবর্ষেরও শক্তি হ্রাস করল। চীন, জাপান ও ভারত প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ডান হাত বাঁ হাত। প্রাচ্যের অতীত গৌরব আবার অভিনব সাজে জাগিয়ে তুলবার আশা ভরসা এখন একমাত্র জাপান, চীন ও ভারতবর্ষের হাতে। তাঁদের একটার অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রাচ্যের অধঃপতন এসে দেখা দিবে।

ইউরোপ চায় সমস্ত প্রাচ্যদেশকেও ইউরোপ করে ফেলে। এখনও সে যে তার পুরাণ আবাস নিয়েই আছে তা তাদের ভয়ঙ্কর হিংসার কারণ হয়ে উঠেছে। তাই একদিন লয়েড জর্জ্জ আত্মম্ভরীতা করে বলে ছিলেন 'There should be no Islam in Europe" সেদিন তুরস্ক মৃতপ্রায় ছিল। তাই এত বড় কথা লম্বা গলায় বলতে পেরেছিলেন। কিন্তু আজ সেই লয়েড-জর্জ্জ, না হয় তারই ছোট ভাই লর্ড কার্জ্জন আজ কামাল পাশাকে কতই না তোয়াজ করছেন। শক্তির কি মহিমা!

লয়েড জর্জ্জের সে কথা বলবার একমাত্র কারণ হিংসা। ইউরোপের ন্যায় আধুনিক সভ্য জগতে ও যে পুরাতন সভ্যতা নিয়ে তুরস্ক থাকতে পারে বুড়া তা সহ্য করে উঠতে পারছিল না। তাতেই এসিয়ার প্রতি ইউরোপের কিরূপ ভাব তা কি প্রমাণিত হয় না?

এখন এসিয়ার একমাত্র মুক্তির উপায় ভারত, জাপান ও চীনে ভাই ভাই হওয়া, একের দুঃখকে নিজ দুঃখ মনে করে নেওয়া, তা নইলে কোন কাজ হবে না বা হ'তে পারে না।

ঝরাপাতা

(উপন্যাস)

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দাদা টেলিগ্রাম করিয়া জানিতে চাহিয়াছে—পিসিমার অবস্থা কেমন? পড়িয়া আমার হাসি পাইল, এখনো তা হ'লে আমাদের জন্যে তার মনে এতটুকু স্থান আছে? একটা কথা মনে পড়িতেছে, মার পুরণো ঝিকে পিসিমার সেবার জন্য মাস দুই আগে কাশীতে আনাইয়াছি, তার মুখে এমন একটা কথা শুনিয়াছিলাম যাহাতে মনে সেই শৈশব-সুখের স্মৃতিটুকু একটু স্পর্শ দিয়া গিয়াছিল। আমাদের কলিকাতার বাসায় যে ঘরখানিতে আমার জীবনের কয়েকটা মূল্যবান বছরের সুখ-দুঃখ-বিরহ মিলনের ছায়াটুকু লাগিয়া রহিয়াছে, আমি আসিবার সময় সে ঘরটার ভার দাদার উপর দিয়া আসিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, আমার এ খাটে কেউ যেন কখনো না শোয়, আমার এ টেবিল চেয়ার কেউ যেন কখনো না ব্যবহার করে। দাদা সে কথা শুনিয়াছিল এবং স্বহস্তে সে ঘরে তালাচাবি দিয়া বন্ধ করিয়াই রাখিয়াছিল। ইহার পর কবে নাকি একদিন মৃণাল তার বোন ও ভগ্নীপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতিথির তৃপ্তির জন্যে আমার ঘরখানিতেই তাহাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। দাদা সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিয়া, সমস্ত ঘটনাটা দেখিয়া অত্যন্ত রাগ করিয়া আবার তৎক্ষণাৎই নিজের হাতে সে ঘর বন্ধ করিয়া আসিল। ইহার পর স্বামী-স্ত্রীতে বহুদিন মনোমালিন্য চলিয়াছে, কিন্তু দাদাই আগে ক্ষমা চাহিয়া, নানা রকমে তাহার গভীর পত্নী-প্রীতির পরিচয় দিয়া মৃণালের রাগ ভাঙ্গাইয়াছে। তথাপি, কখনো কিন্তু মৃণালের নিমন্ত্রিত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের সেবার জন্য বাড়ীর সকলের সেরা সেই সুন্দর কক্ষটি মৃণালের শত ইচ্ছা সত্ত্বেও একদিনের জন্যও খুলিয়া দেয় নাই। দাদার এই কোমল মূর্ত্তিটী আমার কাছে যত সুন্দর,—ভাবিতে যেন চোখে জল আসে! দাদাকে ত মন্দ আমি কখনো বলি না, কিন্তু সে যে আপনার পৌরুষটাকে পর্য্যন্ত পত্নীপ্রীতির তলে ডুবাইয়া রাখিয়াছে, তাহাই যে আমার কিছুতে সহ্য হয় না। আর, তাহা না হইলেও, বোধ হয় আমার কুমারী জীবনের সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মৃণালকে আমি, কিছুতেই সহিতে পারিতাম না।

যাক—দাদাকে আসিতে আমি ত কখনো লিখিব না, একবার চুপ করিয়া, শক্ত হইয়া বসিয়া দেখিব, তাহার নিজত্ব তাহার মধ্যে আর কতটুকু আছে!—

(৩৫)

—শেষ!......

সব—সব শেষ হইয়া গেল!......

কাল গভীর রাত্রিতে, ঝড়ে জলে যখন পৃথিবীখানি আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, আমার পিসিমা তখনই আমায় ছাড়িয়া গিয়াছেন! আগে হইতে ত সকলই জানিতাম, প্রস্তুত হইয়াই ত ছিলাম, তথাপি কেন বুকের ভারটা এমন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে?...সহে না গো—আর সহে না! এত কষ্টের পর এ যে আর কিছুতেই সহে না...বড় গর্ব্ব করিয়া পিসিমাকে বলিয়াছিলাম, 'আমার জন্যে ভেবোনা পিসিমা, তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আত্মহত্যা করে মরব।' পিসিমা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তাই করিস অভাগী, সংসার ভোগ কর্ব্বার মত ভাগ্য ত তোর নয়, কাউকে যখন সইতেও পারিস না, তখন মরাই তোর মঙ্গল। ওরে, আমার আগেই যদি তুই মরতিস্, মরবার সময় এ জ্বালা নিয়ে তবে আমায় যেতে হোত না!—তাই, মরিতেই গিয়াছিলাম, কিন্তু আফিংএর কৌটাটা হাতে তুলিয়াও মুখে দিতে ত হাত আর উঠিল না। এ কি রহস্য মানুষের জীবনের! মৃত্যু যখন এত কাম্য, তখন তাহাকে হাতের কাছে পাইয়াও এই চিরদগ্ধ চির-অভিশপ্ত জীবনটার উপরও মায়া আসিল! তখন কোথা হইতে সহস্র কামনারাশি নানাবিধ রঙ্গীনরূপে ফুটিয়া উঠিয়া জীবনটাকে প্রলোভিত করিতে

লাগিল! হায় রে, এ জীবনটাতেও কি আবার সুখের আশা আছে?……

কিন্তু আমি এখন কি করি? এই বাঁচিয়া থাকার ভারটা কোথায় নিয়া ফেলি! মনে মনে অহঙ্কার ছিল আমার সাহায্যের জন্ত কাহাকেও চাই না, আমি একাকীই আমার সব। সে অহঙ্কার গেল কোথায়? একি আশ্চর্য্য, আমাদের মাতা মাতামহীদের যুগ হইতে, আজন্মকাল ধরিয়া যে সংস্কার তাঁহাদিগকে বৰ্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছে, পালন করিয়া আসিয়াছে, তাহা এই দীন ভারতের আকাশে বাতাসে জলে স্থলে এমনিভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যে নারীজগতে আজ শত সহস্রভাবে বিদ্রোহের সূচনা সত্ত্বেও সমাজের কোনও গৃহ হইতে কোনও নারীর প্রকৃতি হইতে তাহা কি কিছুতেই দূরীভূত হইয়া গেল না! একি ভীষণ প্রভাব সংস্কারের!

নারী-জীবনের একাকীত্ব কি এত ভয়ঙ্কর! কিন্তু এত দিনই বা পিসিমা আমার কি কাজে লাগিতেন? তিনি বাঁচিয়া আমার ঘরটী পূর্ণ করিয়া ছিলেন এইমাত্রই নয় কি? কিন্তু তবু তিনি আছেন এই সাহসটাই যে আমার সবখানি মন পূর্ণ করিয়াছিল, আজ যে তাঁহার অভাবে চতুর্দ্দিকে কেবল দানবের রক্তচক্ষু দেখিতে পাইতেছি। ওগো, আজ আমি কি করি! শুনিয়াছিলাম বিশ্বেশ্বর নাকি দয়াময়; কিন্তু তিনিও ত পায়ে স্থান দিলেন না! তিনি যে ভ্রুকুটি করিয়া বলিলেন,—"দূর হ!"……

গা'টা যেন জলিতেছে। তাই ত, আমি যাই কোথায়? সংসার যদি নাই, আশ্রয়ও যদি নাই, ভগবানও বিরূপ, তবে কি নিজের পায়ের ক্ষুদ্র বল নিয়া আপনি একবার দাঁড়াইয়া দেখিব? তবে তাই হোক্, তাই হোক্। মনটা আমার,—একবার সংসারের বিরুদ্ধে সংহার মূর্ত্তি নিয়া দাঁড়াত' দেখি, রাজপুতনার মেয়েদের মত আপনাকে রক্ষা করিতে, সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াত' দেখি! কে বলে নারী ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, শক্তিহীন? একবার সে জাগিয়া উঠুক দেখি! পায়ের শৃঙ্খল সকলের কাটে না বটে কিন্তু, যার কাটিয়াছে সে-ই একবার দেখাক্। আমার ভয় কিসের? আমার আশ্রম আছে, আমার অর্থ আছে, বিশ্বজোড়া আমার গরীব দুঃখী ভাই বোন্ আছে, একবার তবে মনের এই জোর নিয়া, হাতের এই অর্থসম্বল নিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিতে বাহির হই।

*　　*　　*　　*　　*

রাত্রি আসিয়াছে। উঃ, আজিকার অন্ধকারটা এত ভয়ানক কেন? রাতের আঁধার কি এত কালো? বাহিরে আজ দুদিন হইতে বর্ষাই বা একি অবিশ্রান্ত ভাবে নামিয়াছে, দিনরাত কেবল ঝুপ্ ঝাপ্ ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ,—নাঃ, এ শব্দ আর ভাল লাগে না, মনে আতঙ্ক জাগিয়া উঠে। সারাটা দিন উত্তেজনায় কাটিয়া গিয়া এখন মনটা ক্রমে শান্ত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এ নীরব অন্ধকার ঘরে আবার এ কি আগুন জলিয়া উঠিল! ওগো, উত্তেজনা যে এর চেয়ে ভাল ছিল, বুক ফাটিয়া যাইতেছে, আর ত পারি না। কাল যে শয্যায় পিসিমার দেহখানি বেদনায় অবশ হইয়া পড়িয়াছিল আজ সে শয্যা খালি কেন! চাহিতে পারি না, চক্ষু যেন কেমন করিয়া আসে!

সন্ধ্যার পর দু'খানি টেলিগ্রাম পাইলাম। দাদা আসিতেছে, আর আসিতেছেন আর একজন! দাদার আসাটা সম্ভব বটে, কিন্তু তুমি কেন আসিতেছ স্বামী! আমি ত এত দুঃখেও তোমায় ডাকি নাই। এই এতদিন ধরিয়া, এতবার যে তোমার সপ্রেম আহ্বান তীব্র উপেক্ষাভরে ফিরাইয়া দিয়াছি, তথাপি কি তোমার মনে অভিমান জাগে নাই? নিজের প্রাপ্য অধিকার শত অপমান সত্ত্বেও আবার কি বিস্তার করিতে আসিতেছ?

পরীক্ষাও ত যথেষ্টই করিয়াছি, আমার নারী হৃদয়ের যত শক্তি ছিল, তাহা এই পরীক্ষাতেই ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। এখন অবশিষ্ট যে ক'টা দিন আছে তাহার জন্ম এই শূন্ত মন, অবশ দেহ পরের দয়ায় বিকাইয়া দিব কি? দাদার স্নেহ, মৃণালের ছোঁয়াচ লাগিয়া পূতিগন্ধময় হইয়া গিয়াছে। ছিঃ তাহার হাওয়া কি আর এ দেহে লাগান যায়? ভাবিতেও যে ঘৃণা আসে।

কিন্তু, তুমি কেন আসিতেছ? চির-সুখ-প্রত্যাশী, চিরদুঃখী, নিরভিমানী দেবতা আমার, আমার এ দুঃখের ঘরে কেন তুমি ভাগ বসাইতে আসিতেছ? প্রথম জীবনের মোহচঞ্চল মনটী, দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইয়া এবারে কি আমায় তাহাই দান করিতে আসিতেছ? তবে তাহাই হউক, হে আমার গোপন অন্তরের গুপ্ত দেবতা, এবারে আমার বাহিরের সমস্ত অহঙ্কারের তীব্রতা তোমার প্রেমের দৃষ্টিতে ম্লান করিয়া দিয়া, আমার অন্তরে বাহিরে আসিয়া এবারে তবে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকট হও।

নারীর অহঙ্কার শোভা পায় না,—তাহা যদি এবারে দূর করিতেই হইবে, তবে তাহা দাদা ও বধূর দয়ার আশ্রয়ে কেন? মাথা যদি হেঁট করিতেই হইবে, তোমারি পায়ে হোক্; তোমারই চরণের তলে, তোমারই প্রেমের আশ্রয়ে এবারে তবে আমার সকল তেজ, সকল গর্ব্ব লুপ্ত হইয়া যাক্

অসমাপ্ত

প্রতারণা

[শ্রীমতী চিত্রলেখা দেবী]

সচিত্র শিশির প্রতিযোগিতায় চৈত্রের পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

সমুদ্রের তীরে বসেছিলাম, অস্তগামী নিস্তেজ সূর্য্যের মৃদু আভা অসীম সমুদ্রের ওপর প'ড়ে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কথার শব্দ শুনে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম একটী তরুণী, তার কাঁধের ওপর একখানা ভাঁজ ক'রা সতরঞ্চী, একহাতে এস্রাজ, আর এক হাতে একজন যুবকের হাত ধরা। কাঁধের সতরঞ্চিটি বালির ওপর পে'তে, তার ওপরে এস্রাজটী রেখে হাত ধরে সেই পাতা-সতরঞ্চীর ওপর যুবকটীকে বসিয়ে, নিজেও তারই পাশে বসল। এত কাছে তা'রা বসেছিল, তা'দের সব কথাই আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম।

একটু পরে যুবক ব'ল্ল—"এখন কটা বাজে মুকুল ?"

তরুণী—"সাড়ে ছ'টা !"

যুবক—"সূর্য্য ডুবে গেছে ?"

তরুণী—"না, এই ডোবে আর কি।"

যুবক—"আঃ, আমি যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, নীল ঢেউগুলা সাদা কাশের মুকুট প'রে, গায়ে আধডোবা সূর্য্যের সোনালী আভা মেখে বালির ওপর দুরন্ত শিশুর মত আছ্‌ড়ে পড়ে ফিরে যাচ্ছে, মুকুল সত্যিই ত তেমনি দেখাচ্ছে ?"

তরুণী—"হাঁ, সব সেই রকম।"

যুবক—"ভালই হ'য়েছে আমার বাইরের আলো নিভে যেয়ে, হ'য়ত যদি আমি তোমার কাছে এমন করুণার পাত্র না হতেম, তবে কোনদিনই তোমার এরূপ আমার চোখে পড়তো না, ভাবতেও আমার বুকের ভেতর কেমন ক'রে, উঃ কি ব্যথা নিয়ে আমি এখান থেকে গিয়েছিলাম ? আর নিয়ে ফিরে এসেচি মুকুল, মুকুলমণি এখন তুমি আমার, শুধু আমারই"—যুবক আবেগের সঙ্গে তরুণীর হাত দুটো চেপে ধরলো। তরুণীর মুখখানি কেমন যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে উঠল, সে কি যেন ঐ অন্ধ যুবকটীকে আস্তে আস্তে বল্ল। যুবক সেই কথা শুনে অপ্রতিভ হ'য়ে তরুণীর হাত ছেড়ে দিয়ে ব'ল্ল "আমার ঠিক খেয়াল ছিল না এটা প্রকাশ্যস্থান, সবাই দেখতে পে'তে পারে; কি যে দুষ্টু ছিলে তুমি, নিজেকে এমন করেও ঢেকে রেখেছিলে ? তাই বলছিলাম চোখ হারিয়ে ভালই হয়েছে, অন্তরের দৃষ্টিতে তোমার সত্যমূর্ত্তির সন্ধান পেয়েছি। কি ক'রে এই অন্ধকে এত ভাল তুমি বাস মুকুল, তাই ভেবে আমার চোখে জল আসে, মনে হয় এত সুখ এ চির হতভাগ্যের ভাগ্যে সইলে হয়! এই সেই ওয়ালটেয়ার, এই সেই সমুদ্র তীর, এইখেনে আমি তোমায় প্রথম দেখি, কি বিচিত্র বেশে নীল সাড়ী আর কালোচুল ভিজে তোমায় জড়িয়ে ধরেচে, একহাতে গোছা ভরা কেয়াফুল, আর একহাতে উড়ে-পড়া কুচো চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরাতে সরাতে বৃষ্টি উতলা সমুদ্রতীর দিয়ে ঝড়ে-ওড়া-ফুলের মত ছুটে চলেছিলে ? অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি আমার কল্পলোকের মানসীকে এমন মূর্ত্তি পরিগ্রহ কর্ত্তে দেখে, তখন কে জান্‌ত এ সুন্দর, এ অপূর্ব্বের অধিকারী আমিই হ'ব ? আমার সব দুঃখ, সব গ্লানি তোমায় পেয়ে, সার্থকতায় ভ'রে উঠেচে" যুবকের গলা ধরে এসেছিল। তরুণী একটা কথারও উত্তর দিল না, তার দৃষ্টিহারা দৃষ্টি তখন অসীমের দিকে, রুক্ষ চুল আর চাঁপা-ফুল-রংয়ের-সাড়ীটা উড়্‌ছিল, দেখাচ্ছিল যেন

ঠিক মূর্ত্তিমতী ব্যর্থতা। যার প্রতি স্বামীর এমন প্রেম, বুঝলাম না তার ব্যথা কোথায়। আঁধার ভরে উঠেছিল, উঠে পড়লাম। তখন তরুণী এস্রাজ বাজাচ্ছিল, আর যুবক গান ধরেছিল,—

"সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার"

গলাটী ভারী করুণ ও মিষ্টি।

তারপর রোজই তাদের দেখতে পেতাম। এই তরুণী তার স্বামীর চক্ষুহীনতার সমস্ত বেদনা যেন প্রাণ দিয়ে দূর করতে চায়।

এই সমুদ্র একটু বেশী নীল দেখাচ্ছে, এই একটু যেন ফিকে হ'ল, এই ঢেউ গুলো বাতাসের দোল পেয়ে জোরে উঠছে, পাহাড়ের গায়ে ডুবে-যাওয়া সূর্য্যের আভা প'ড়ে কেমন দেখাচ্ছে! সব কথাতেই তার আমি এমন একটা প্রাণ অনুভব করতাম, আমার ভারী ভাল লাগতো এই সেবা পরায়ণা তরুণীটিকে। আমি ইচ্ছে ক'রে তাদের কথা শোন্‌বার জন্যেই, একটু কাছাকাছিই বসতাম। আমি কেন জানি না এ অন্যায় প্রলোভন কিছুতেই ছাড়তে পারতাম না। সেদিন দেখি তরুণী একা এসেছে, সঙ্গে স্বামী নেই, এই সুযোগে তার সঙ্গে আলাপ করে ফেল্লাম। তার স্বামীর কোন এক বন্ধু এসেছেন তাই আজ তিনি আসেন নি, ওঁকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। নানাকথার পর নাম কি জিজ্ঞাসায় বল্ল "পুষ্পময়ী" আমি একটু হেসে বল্লেম, "আপনার স্বামী বুঝি আপনার নাম মুকুল রেখেছেন? আমি কিন্তু ঐ নামে তাঁকে আপনাকে ডাকতে শুনেছি।" পুষ্পর মুখখানি সাদা হ'য়ে উঠল, ঠোঁট দুটো থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। আশ্চর্য্য ও অপ্রতিভ হ'য়ে গেলাম, স্বামী সম্বন্ধে কোন রহস্যের প্রশ্নে যে কোন নারী এমন হ'য়ে উঠতে পারে এ আমার ধারণার অতীত ছিল। বল্লাম "ক্ষমা করবেন, আপনি আমার প্রশ্নে ব্যথা পাবেন, তা বুঝতে পারিনি।" পুষ্প বাধা দিয়ে বল্ল "না, না, তা মনে করবেন না, আমি আপনার কথায় মোটে দুঃখ পাই নি, জানেন নাত আমার ব্যথা কোথায়!" শিশির ভেজা, বাতাসে-দোলা পাতার মত ঝরঝর ক'রে তার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। আমি সস্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেম, "তোমার ব্যথার কাহিনী আমাকে বলবে ভাই?" মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে একটু পরে বলতে লাগলো, "অনেকদিন পর আবার যখন "পাপড়ী" জন্মাল, তখন থেকেই মায়ের শরীর ভেঙ্গে গেল। মায়ের শরীর ভেঙ্গে গেল। মায়ের দুধ না পেয়ে পাপড়ীও দিন দিন রোগা হয়ে যেতে লাগলো, তারপর আমরা এখেনে "চেঞ্জে" আসি। জীবনের প্রথম কলকাতার বাইরে এসে আমরা ভারী আনন্দ পেয়েছিলাম, আমার দিদি, মুকুল, আর আমি পাপড়ীকে নিয়ে প্রায় সারাদিন সমুদ্রের তীরেই খেলা করতাম। আমরা তিন-বোন ছাড়া বাবা মায়ের আর কোন সন্তান ছিল না। সে দিনগুলো আমাদের বড় সুখেই কেটে ছিল। পূর্ব্বের স্বাস্থ্য ফিরে না পেলেও, মা অনেকটা সুস্থ হয়েছিলেন, পাপড়ীত একেবারেই ভাল হ'য়ে গিয়েছিল। সেদিন আকাশ মেঘে ভরা ছিল ব'লে, বাবা, মা বেড়াতে বেরুলেন না, আমাদেরও যেতে বারণ করলেন, দিদি শুনলো না, সকালে বেড়াতে যেয়ে অনেক কেয়া ফুটেছে দেখে এসেছিল, তাই এইদেশী একটা ঝি সঙ্গে নিয়ে ফুল পাড়তে চলে গেল। আমাকেও যেতে ডাকলো কিন্তু পাপড়ী আমায় একটুও ছাড়তে চাইত না, তাকে নিয়েওত মেঘের মধ্যে যাওয়া চলে না। তাই আমি পাপড়ীকে নিয়ে বারান্দায় যেয়ে বসলাম। বাড়ীটা সমুদ্রের ধারেই ছিল, সেখান থেকে বেশ সমুদ্র দেখা যে'ত।

একটু পরেই খুব জোরে বৃষ্টি নামলো, বাবা আর মা, দিদির জন্যে ভাবতে লাগলেন। একটু পরে দিদি এল, মাথায় একটা পুরুষলোকদের ছাতি, কিন্তু ভিজে নেয়ে উঠেছে। আমাদের কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে "এই ছাতি দিয়ে যিনি আমায় সাহায্য করেছিলেন বাবা, তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন" বলে একটা ফুল পাপড়ীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সেখান থেকে ছুটে চলে গেল। বাবা ভদ্র-লোকটিকে ডেকে এনে ড্রইং রুমে বসালেন। সেই ভদ্রলোকই এখন যিনি আমার স্বামী হ'য়েছেন তিনি, তাঁরও কাপড় চোপড় সব ভিজে গিয়েছিল, বাবা চাকরকে ডেকে তাঁকে ছাড়বার জন্যে কাপড় দিতে বল্লেন, একটু আপত্তি জানিয়ে চাকরের সঙ্গে উনি বাথরুমে গেলেন। আমি চা করতে লাগলাম। ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠল, ছেলেবেলায় মা

বাপ মারা গিয়েছেন, মামার বাড়ী থেকে পড়াশুনা কর্ত্তেন, সেইবার এম্, এস্, সি পাশ ক'রে, এখেনে বেড়াতে এসেছিলেন। আমাদের মা'কে উনি মা বলে ডাকতে আরম্ভ কল্লেন, মাও তাঁকে খুব ভালবেসে ফেল্লেন। দিদি ছিল যাকে বলে পরমাসুন্দরী তাই, উনি যে দিদির ওপর আকৃষ্ট হ'বেন এটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়, তবুও যখনি তাঁর দিদির ওপর আকর্ষণ আমি অনুভব কর্ত্তেম তখনি যেন কেমন আমার ভাল লাগতো না। উনি যখন গান ধরতেন দিদির দিকে তাকিয়ে, "তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর" তখন তার সব মাধুর্য্য আমার কাছে বিষিয়ে উঠতো।

দিদি ফুল ভালবাসে বলে উনি প্রায়ই নানা রকম ফুল নিয়ে এসে আমাদের তিন বোনকেই দিতেন, তবু আমার মনে হ'ত ওঁর কাছে পাপড়ী আর আমি সমান, দিদির জন্যেই আনা, আমাদের দেওয়া নিছক ভদ্রতা। তা'ত সত্যিই ত, সত্যিই ত আনেন দিদির জন্যেই, এত তিনি বলেনও না যে আমাদের জন্যে আনেন, তবে আমার এ রাগ এ অভিমান কেন? বাড়ী যাওয়ার সময় সবাইয়ের কাছেই বিদায় নিয়ে যেতেন, তবুও রাত্রে বালিসে মুখ গুঁজে আমি কাঁদতাম, দিদির কাছে যখন উনি বিদায় চান তখন স্বভাবতঃ মিষ্টি কণ্ঠ আরো কত মিষ্টি হয় মনে করে। আমার মনের দিকে তাকিয়ে আমিই শিউরে উঠতাম। সে তখন দিদিকে তার অনন্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। আমি দিদিকে চিনতাম, তাই ওঁর জন্যে বড় দুঃখ হ'তো, বিলাত ফেরত সিভিলিয়ান বা ব্যারিষ্টার না হ'লে যে আর কেউ ও ভাল বাসতে জানে, এ ছিল তার কাছে হাসির কথা। আর যদিও ওঁদের বিয়েই হয়, তবে কি এই মনোভাব দিদির স্বামীর ওপর নিয়েও, আবার দিদির কাছে নিজেকে লুকিয়ে, স্নেহময়ী ছোট্ট বোনের স্নেহ ঠকিয়ে ভোগ করবো? মনটা ধিকারে ভরে উঠত, তখন ত জানতাম না এ ছলনা, এ ঠকিয়ে পাওয়া আমায় চিরদিন পেতে হবে। উনি খালি দিদিকে ভালবেসেই চলেছিলেন, দিদির তাঁর প্রতি মনের ভাব কেমন, বা তার ব্যবহারটায় শুধু শিষ্টতা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় কি না, এ সব দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন নি। তারপর একদিন যখন বাবার কাছে দিদিকে বিবাহ করবার প্রস্তাব কল্লেন, তখন বাবা বল্লেন, "মেয়েরা বড় হয়েছে, তারপর লেখাপড়াও কিছু শিখেচে, মুকুলকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবো, তার যদি অমত না থাকে তবে আমাদের কোন আপত্তি নেই" সেদিন উনি খুসী হয়েই ফিরলেন, দিদি যে আপত্তি করতে পারে, এ সম্ভাবনা ওঁর মনেই হয় নি। দিদির কাছে এমন ব্যবহার তিনি কিছুই পান নি, যাতে এ কথাটা একবারও মনে না পড়তে পারে। তবুও মনে পড়েনি, তার কারণ মনে করেছিলেন তাঁর এত ভালবাসা গ্রহণ না করবার মত নিষ্ঠুরতা দিদির মধ্যে থাকতে পারে না। এ বিয়ের কথা যখন দিদিকে বলা হ'ল, সে একেবারে অস্বীকার করলো। মা অনেক করে বুঝিয়ে যখন উঠে গেলেন, তখন আমি এলাম। মা ভারী ব্যথা পেয়েছিলেন এ ব্যাপারে, ওঁকে মা সত্যিই বড় ভালবেসেছিলেন! দিদি আমার চেয়ে মোটে এক বছরের বড় ছিল, তাই তাকে আমি দিদির সম্মান দিয়ে কোন দিনই চলিনি। উনি কতখানি ব্যথা পাবেন কল্পনা করে, দিদিকে বোঝাতে বোঝাতে আত্মবিস্মৃত আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম, দিদি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকাল, কি যেন সে আমার মধ্যে খুঁজে দেখল, তারপর আমাকে একেবারে তার বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আমার চুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলিয়ে দিচ্ছিল। এমন করে সে আমায় কোন দিন আদর করেনি। আমি তার স্নেহের পরশে আরো চোখের জল অবাধে মুক্ত করে তার বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিলাম। খানিকক্ষণ এমনি করেই কেটে গেল, তারপর দিদি বল্ল "এমন ভুল কেন কল্লি পুষ্প? জানিস ত ও তোকে তেমন ইয়ে করে না? আর এমন কিই বা ওর মধ্যে তুই দেখতে পেয়েছিস তাত আমি বুঝতে পারি না।" চোখের জল মুছে বল্লাম "সে যাই হোক, তুমি ওঁকে বিয়ে করতে সম্মত হও দিদি, লক্ষ্মী আমার, উনি, উনি তোমাকে না পেলে বোধ করি পাগলই হ'য়ে যাবেন, সত্যি এমন ভালবাসা তুমি আর কারো কাছেই পাবে না!" আবার জল এল, গলা কেঁপে গেল। দিদি একটু কি ভেবে বল্ল "সে হয় না, আমি ওকে কখনো বিয়ে করতে পারি না, তবে তোর সঙ্গে যাতে হয় তার চেষ্টা একবার আমি নিশ্চয়ই করবো।" আমি তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লাম "ছোট ব'লে

যদি একটু ভালও আমায় বাসো দিদি তবে এ অপমান আমায় করো না।" একটু দম ধরে দাঁড়িয়ে থেকে দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন উনি এলেন, দিদির অসম্মতির কথা যখন শুন্‌লেন, নিমেষে যেন সমস্ত রক্ত মুখ থেকে নেমে গেল। চুপ করে খানিকক্ষণ সেইখানেই বসে রইলেন, তারপর কলকাতায় কি দরকার আছে, কালই যাবেন, আর দেখা করবার হয় ত সুযোগ হবে না, এম্‌নি কি কতকগুলো কথা জড়ানো স্বরে ব'লে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে উঠে পড়্‌লেন। আমার ভারী কান্না পাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এলাম, ছোট্ট একটা নমস্কার করে তিনি সিঁড়ি নেমে গেলেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে বল্লেন "আপনার দিদিকে বল্‌বেন—না বুঝে তাঁর মনে যদি কোন আঘাত করে থাকি, তবে অজ্ঞ ব'লে তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন"—তারপর আর একটীও কথা না বলে চলে গেলেন। বারান্দার রেলিং ধরে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। চলে গেলে? প্রিয় আমার, বন্ধু আমার, আর তোমায় কখনো দেখ্‌তে পাব না? কিছু নেই আর তোমার বল্‌বার বাকী, কিছু নেই, তবে তুমি কেন দাঁড়াবে? কিছু কি নেই, ওগো এমন একটা কথাও কি তোমার বল্‌তে বাকী নেই, সে কথাটা শুধু আমার, একলা আমারই? কখন যে দিদি এসে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে টের পাই নি। আঁচল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিদি বল্ল "পাগ্‌লামী করিস না পুষ্প, কাঁদছিস কেন, ওর চাইতে ঢের ভালো বিয়ে হ'বে তোর দেখে নিস।" তার এই অতি ছেলেমানুষের মত সান্ত্বনা শুনে অত দুঃখের ভেতরও হাসি এল! নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়্‌লাম, দিদির সঙ্গ তখন ভালো লাগ্‌ছিল না।

এর পর মা মনোভঙ্গের দুঃখে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, আর উঠ্‌লেন না। একদিন রাত যখন তাড়াতাড়ি শেষ হচ্ছিল মায়ের জীবনও সেই সঙ্গে শেষ হ'য়ে গেল। সূর্য্য যখন নূতন হয়ে উঠ্‌ল সে দিনে আমাদের মা ব'লে ডাক্‌বার আর কেউ রইল না! কল্‌কাতায় ফিরে গেলাম, বছরখানেকের মধ্যে দিদির একজন সিভিলিয়ানের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেল, সে স্বামীর সঙ্গে তার কর্ম্মস্থানে চ'লে গেল। আমি আর বাবা একা রইলাম। হ্যাঁ, একটা কথা এর মধ্যে বল্‌তে ভুল হয়েছে, পাপ্‌ড়ী আর আমাদের কাছে ছিল না, মা তাকে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। বাবা আগে প্রফেসর ছিলেন, ইদানীং শোকে দুঃখে সব ছেড়ে দিয়েছিলেন; তাই বই আর বাবাকে নিয়ে আমার জীবন মন্দ কাটছিল না।

সেদিন বাবা বেড়াতে বেরিয়েছেন, আমি আর যাইনি, মায়ের অয়েল পেণ্টীংটার উপর একটা ফুলের মালা, ধুনুচীতে করে খানিকটা ধুনো দিয়ে ছবির নীচে প্রণাম করতেই মনটা কেমন হু হু করে উঠ্‌ল, সেই ছবির তলায় পড়ে অনেকক্ষণ কাঁদছিলাম। বাহিরে এসে দেখি বাবা তখনও ফেরেন নি, চোখে মুখে জল দিয়ে বস্‌বার ঘরে গিয়ে দেখ্‌লাম বাবার নামে একটা চিঠি এ'সেছে, বাবাকে যে যে চিঠি লিখ্‌ত তাদের সবারই হাতের লেখা আমি চিন্‌তাম, কারণ বাবা খালি চোখে চিঠি পড়বার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন, সবচিঠি আমাকেই পড়ে শোনাতে হ'ত, চশমা ব্যবহার ক'রা তাঁর ভারী আলস্য ছিল। চিঠিখানা নাড়াচাড়া করছি লেখকটিকে আবিষ্কার করবার জন্যে, এর মধ্যে বাবা ফির্‌লেন, আমার হাতে চিঠি দেখে বল্লেন "কার চিঠি মা?"

"তোমার বাবা।"

"পড়না শুনি মা লক্ষ্মী" ব'লে বাবা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। "অনেকদিন আপনাদের কোন সংবাদ জানিনা, হঠাৎ কেন জানিনা আজ এ চিঠি লেখ্‌বার প্রলোভন সংবরণ কর্ত্তে পার্লেম না। বুঝি বাইরের আলো চিরদিনের মত নিভে যাওয়াতেই" ওমা একে! "চির হতভাগ্য স্নেহাকাঙ্ক্ষী বি-জ-য়।" বাইরের আলো চিরদিনের মত নিভে গেছে! সে কি! কেন? বাবা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "কি? কি? পড়তো মা ভাল ক'রে, আহা বেচারী কি করে এমন হ'ল ভাল করে পড়ত দেখি" তাড়াতাড়ি চশমা নিয়ে নিজেই পড়তে আরম্ভ কল্লেন! বোধ করি আমার বিহ্বল ভাব দেখে। হাত থেকে চিঠিটা অনেকক্ষণ পড়ে গিয়েছিল। অন্ধ হয়েছেন তিনি, আর এই পৃথিবীর বিরাট, সুন্দর কিছুই দেখ্‌তে পাবেন না! তাঁর কাছে আজ সমস্ত জগৎ একটা বিষম আঁধার? মাগো·····

পরের দিন বাবার অম্বলের ব্যথাটা বড় বাড়ল, তিনি ওঁকে দেখ্‌তে যেতে পাল্লেন না, কিন্তু আমার প্রাণ তাঁকে দেখ্‌বার জন্যে এমন অস্থির হয়েছিল যে বিকেলে যেই বাবা বল্লেন "আমিত এখন একটু ভালই বোধ কচ্ছি, তুমি না হয় একবার তাকে দেখ্‌তে যাও, জীবনের এমন সময়ে যে যতটুকু পারে তাকে সান্ত্বনা দিতে যাওয়া উচিত" আমি একটী প্রতিবাদও কল্লেম না, বেরিয়ে পড়লাম। অপরিচ্ছন্ন ঘরে উনি বসেছিলেন হাত দুটো জোড় করে, চাকর আমায় পৌছে দিয়ে বলে গেল—ইনি এসেছেন দেখা কর্‌তে।

উনি বল্লেন "কে এসেছেন দয়া করে আমায় দেখ্‌তে?"

আমার ধরা কাঁপা গলায় শুধু বেরুল "আমি।"

"কে, কে? মুকুল, মুকুল এসেছ আমায় দেখ্‌তে? আমি জানি এ খবর পেয়ে তুমি আসবেই, যদিও সে চিঠি তোমায় লিখিনি, তবু জানি তুমি মনে করবে সে খবর আমার তোমাকেই দাওয়া।" আবেগে তাঁর গলা ধরে গেল। এই আগে তিনি দিদিকে আপনি বলেই কথা বল্‌তেন, আনন্দে আবেগে তিনি কি যে বল্‌ছেন তা বোধ হয় নিজেও বুঝতে পারেন নি। "বোন মুকুল, একটা জায়গা দেখে নিয়ে নিজেই বোন, আমার অবস্থা'ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ, সম্পূর্ণ পর নির্ভর। খুব সুখী হয়েছি যে তুমি আমায় দেখ্‌তে এসেছ, কতটা যে খুসী হয়েছি তা আমি বল্‌তে পারি না কিন্তু নিশ্চয় তুমি তা বুঝতে পারছ।" চোখ তাঁর জলে ভরে এল। কি করবো? আমি কি করবো? এ ভুলের তৃপ্তি আমি কি করে ভাঙ্গব? আমাদের দু-বোনের গলার স্বর এক রকম ছিল বলেই তিনি এ ভুল করেছেন।

কিন্তু একি গভীর বিশ্বাস তাঁর দিদির ওপর যে সে তাঁকে একটু ভালো বাসেই? তাঁর এমন অবস্থাগুনে তাকে আস্‌তেই হবে এমন ধারণা হ'বার মত তিনি কি পেয়েছিলেন দিদির কাছে? অনেক চেষ্টা করে বল্লাম "দেখুন আমি"—আমার গলা ভয়ানক কাঁপছিল, এইটুকু বল্‌তেই তিনি ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—কিছু বল্‌তে হবে না, কিছু তোমাকে বল্‌তে হবে না, মুকুল, না বল্‌তেই তুমি যা বল্‌বে তা বুঝেছি, ক্ষমা চাহিবার কিছু দরকার নেই, আমি তোমার ওপর কোনদিন রাগ করিনি।" আমার মন তখন কি রকম হয়ে গেল, যেমন ক'রে হোক্ এঁকে আমি সুখী কর্‌বো এই জেদ আমায় তখন এমন পেয়ে বস্‌লো যে তার ফলে দিদির ছদ্মবেশে থাকার মনের কথা সব তাঁর কাছে উজাড় করে দিলাম। আনন্দের দীপ্তিতে তাঁর মুখখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, কি যেন বল্‌তে চাহিলেন, পারলেন্ না, ঝর ঝর ক'রে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। তাঁর কাছে বলেছিলাম আমার যেন মিঃ রায়ের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে, আর সিম্‌লা গেছে।

দিদিকে সব বিষয় খুলে একখানা চিঠি লিখে দিলাম। তার ছদ্মবেশ ধরেছি বলে যেন সে রাগ না করে। দিদি রাগ করেনি, সে আশীর্ব্বাদ করেছিল যেন যথার্থ সুখী হই। বাবাকে এই অসঙ্গত প্রস্তাবে রাজী করাতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল, শেষে আমার কাতরতা দেখে চোখের জল মুছে সম্মতি দিয়েছিলেন। আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। প্রতারণার যা শাস্তি পে'তে হয় আমি মাথায় পেতে নো'ব, তবু এ প্রেমিক অন্ধকে আমি হত্যা কর্‌তে পার্‌বোনা পারবো না।

এমন রোজ দিদির প্রাপ্য আমি ঠকিয়ে আদায় কচ্ছি, হায়, যদি জান্‌তেন আমি কে! আর পরে যদি জানেন? হায়, সারাদিন আমার বুকের ভেতর কি কান্না জমা আছে তা কি বল্‌বো। এই নিত্য মিথ্যা অভিনয় শেষে আমার জীবনে এমন প্রয়োজনীয় সত্য হ'য়ে দাঁড়াল। তবু, তবু আমার এই সান্ত্বনা যে উনি সুখী হয়েছেন।" গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে তরুণী পুষ্প তার ব্যথার কাহিনী শেষ করল। অন্ধকার তখন গভীর হয়ে উঠেছিল।

কি বিচিত্র আর করুণ এই মেয়েটীর জীবন!

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র

যে সময় বাঙলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলি বঙ্গাকাশ আলোকিত করিয়াছিলেন, সেই সময়েই একজন নীরব কর্ম্মী, স্বদেশ সেবক ও সাহিত্য সেবক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার নাম। ভোলানাথ তাৎকালীন অধিকাংশ শক্তিশালী ও প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্গীয় লেখকের ন্যায় তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী ইংরাজীতেই লিখিতেন এবং ইংরেজ সমাজেই তিনি অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী কাগজে তখনকার ইংলিসম্যান প্রভৃতি পত্রে তাঁহার বেনামা রচনাবলী পড়িয়া ইংরাজ মহলে খুব সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। লেখক যে বাঙ্গালী, এ কথা কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে পারিত না। ভোলানাথ চন্দ্র লিখিত Travels of Hindu নামক পুস্তকখানি আজও আদর্শ ভ্রমণবৃত্তান্ত বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে। ভোলানাথ চন্দ্র রাজা দিগম্বর মিত্রের একখানি সম্পূর্ণ জীবনচরিত সম্পাদনা করেন। শুনা যায়, এই গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য ভোলানাথ পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে দেশে সাহিত্যিকদিগের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য এখনও সাধারণে দিতে জানে না, সেই দেশে সেকালেও ভোলানাথের রচনা কিরূপ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

৺ ভোলানাথ চন্দ্র

"হেমচন্দ্র" প্রণেতা, খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-ই-এস্, মনীষী ভোলানাথ চন্দ্রের একখানি জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বহিখানিতে ভোলানাথের সময়ে বাঙলার যে সকল সুসন্তান জন্মিয়া দেশ ও জাতিকে ধন্য করিয়াছিলেন, প্রায় সকলকার সম্বন্ধেই কিছু না কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আছে; প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের চিত্রও সংযুক্ত রহিয়াছে! বহিখানির সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব, জীবনী হইলেও ইহা সুখপাঠ্য ও সুপাঠ্য!

ছাপা বাঁধাই, সৌষ্ঠব, সুন্দর। বরেন্দ্র লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত; মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

চৈত্র মাসের গল্প—প্রতিযোগিতার পুরস্কার পাইলেন, শ্রীমতী চিত্রলেখা দেবী। বিচারক ছিলেন, বসুমতী-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। হেমেন্দ্র বাবু যেরূপ নানা কার্য্যে ব্যস্ত. তাহাতে তাঁহার দ্বারা গল্পগুলি বিচার করি। লওয়া খুব সহজসাধ্য কার্য্য ছিল না; তা সত্বেও তিনি এতগুলি গল্প পড়িয়া, বিচার করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তবে তিনি যে দেরী করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকারা এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

এই পুরস্কারটি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে, বার বার ইহা ঘোষিত হইয়াছে। এবং পুরস্কার প্রতিযোগিতায় রচনা পাঠাইবার পূর্ব্বে নিয়মাবলী দেখিতেও অনুরোধ করা হইয়াছিল। বলিতে লজ্জা হয়, কেবলমাত্র পুরস্কারের নামগন্ধ শুনিয়াই, নিয়মাবলী না দেখিয়াই কয়েকটি পুরুষ এই গল্প-প্রতিযোগিতায় গল্প পাঠাইয়া বসিয়া আছেন। ইঁহাদের জন্য দুঃখ হয়।

রেঙ্গুন-প্রবাসিনী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবী "সতীদেবী দীনতারিণীর" জীবন-কথা ২৪শ সপ্তাহের সচিত্র শিশিরের লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 'দীন-তারিণীর' জীবনী-কবিতার লিখিবার জন্য যে ২৫৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবীই দিতেছেন। ইন্দুপ্রভা দেবীর সাধু উদ্দেশ্য ও হৃদয়ালুতায় আমরা মোহিত হইয়াছি।

"সতীদেবী দীনতারিণীর" জীবন-কথার লেখক লেখিকাগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা রচনা পাঠাইবার সময়, খামে মুড়িয়া, খামের উপর "সতীদেবী দীনতারিণী" পুরস্কার, এই কথা কয়টি লিখিয়া ৩০শে বৈশাখের মধ্যে ডাকে দিবেন। ৩১ বৈশাখের পর কোন রচনাই গৃহিত হইবে না।

সচিত্র শিশিরের প্রথম খণ্ডের সূচীতে দুইটি মস্ত ভুল থাকিয়া গেছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ অঙ্কিত "বাবুরাম" ও "শ্রীশ্রীবপু" শীর্ষক রঙ্গ-চিত্রাবলী সূচীপত্রে শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু অঙ্কিত বলিয়া ছাপা হইয়া গিয়াছে। পাঠক পাঠিকাগণ সূচীতে ভুলটি সংশোধিত করিয়া লইবেন।

"ঝরাপাতা" এই সংখ্যায় শেষ হইল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পাঠক পাঠিকাগণ ঝরাপাতাটিকে স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছেন। আমরা, নানা স্থান হইতে ইহার সুখ্যাতি শুনিতে পাইয়াছি। শ্রীমতী সুরুচিবালা রায় "মর্ম্মস্মৃতি" নামে একখানি ক্ষুদ্র গল্পের বহি লইয়া বঙ্গবাণীর মন্দির দ্বারে পূজারিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; ঝরাপাতার অর্ঘ্য তাঁহাকে মন্দির মধ্যে প্রবেশের অধিকার দিয়াছে।

তাঁহার "আহুতি" নামে একখানি মনমুগ্ধকর উপন্যাস সম্পূর্ণ হইয়াছে। আগামী সংখ্যা হইতে সেইখানিই আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিব। আশা আছে, ঝরাপাতার মত "আহুতি"ও সর্ব্বসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিবে।

ঘরের লক্ষ্মী

শ্রীযুক্ত অতুল বসুর সৌজন্যে

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　৩রা জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩১ সাল।　　[সপ্তবিংশ সপ্তাহ

বরের বাজার (৩)

সঙ্গীতবিৎ

(১)

পূর্ব্বানুবৃত্তি :—

শুন্‌লুম, দু'পয়সা আছে, কাজকর্ম্ম না কর্‌লেও চলে যাবে! দুর্গা শ্রীহরিঃ বলে বেরিয়ে ত পড়লুম!——

"শুনবেন একখানা? শুনুন—

আমি সারা নিশি তব লাগিয়া,

রব বিরহ-শয়নে জাগিয়া"

"থাক্ থাক্, ও বাবাজী, থাক।"

(২)

রস্তা নির্ম্মাতা

"ভারতীয় কলা, বোঝ,—না,'শুধু কলা খেতেই জ্ঞান !
গৃহলক্ষ্মী গৃহকর্ম্ম করিতেছেন, বুঝলে কিছু ?"
"এ বেহ্মদত্তি বাবা ! দু'দিনেই মেয়েটার ঘাড় মটকাবে"—ছুট ! ছুট।

(৩)

দেশোদ্ধার-কর্ত্তা সম্পাদক

"একটা কথা, তিনই দিন, আর আড়াই-ই দিন, কাগজে কিন্তু বিনাপণে বিবাহ বলে লিখে দিতে হবে!"

এরেই বলে দেশোদ্ধার—সাবাস্!

(৪)

পুলিসের দারোগা

মাছের সেরা ইলিস, আর মানুষের সেরা পুলিস ?

"পুলিসের শ্বশুর হতে চান ?—বিশ হাজার, পারবেন ?"

"বি-ই-ই-ই—শ-শ-শ—বাবা !"

(৫)

ঘোড়ার দারোগা

(C. S. P. C. A)

"শুধু ঘোড়া? মোস্, গরু, ছাগল, কুকুর সব জব্দ!"

অতগুলি জীব জব্দ করিয়াও আশ মিটে নাই, পাত্রীর পিতাকে জব্দ করিতে চান্—পাঁচ সহস্র রজত খণ্ড!

(৬)

"বৃহৎ লোমশাস্ত্র ঘৃত"—ছটাক ১০১

"এক বটিকাতেই লোমঃ বিচ্যুতি!"
"মশাইকে দেখেই সেটা বেশ বুঝতে পাচ্ছি।"
বিবাহে অনিচ্ছা—তবে উপরোধে ঢেঁকি গিলিতে পারেন!

(৭)

ধুকধুকি

ফ্রি ! ফ্রি !! ফ্রি !!!

(বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে)

"বাবা জটুকেশ্বরের স্বপ্নাদ্য ওষুধ পেইছি, আর ভাবি-নে !"

মেয়েটি বড়-সড় হওয়া চাই—নহিলে নিদারুণ বৈধব্য সহিতে পারিবে না।

(৮)

কুলীন—কুলমর্য্যাদা ! !

"এ তিলকা তেল—কাঁচা
চিজ্ বড়িয়া বহুৎ, ঈর সাচ্চা— —
মাথ্ নেসে বাবু বণ যায়গা ধাঁচ্চা
যো মাখে, মিলে বহুৎ বাল বাচ্ছা !"

বিয়ে—তা, এখনই ! তবে কুলীনের কুলমর্য্যাদা-টর্য্যাদাগুলো রাখতে হবে।

(৯)

পালোয়ান (মহাবীর না বীরভদ্র ?)

"সাদী ত হাম করেগা দো'দশঠো, লেকিন"......

ও বাবা! দু'দশটা!—সভয়ে পলায়ন।

(১০)

বাবাজী বেগুন-গাছে আঁকশি দেন !
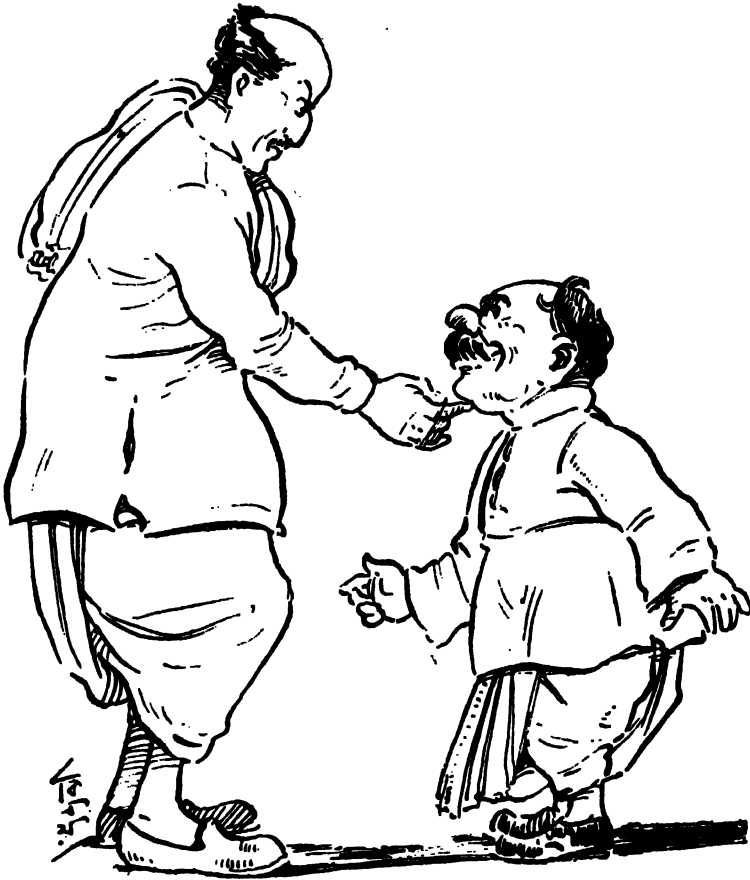
আর কোনই আপত্তি ছিল না বাবাজী, তবে আমার মেয়েটি একটু লম্বা চওড়া কি-না, তার পাশে তোমাকে——

(১১)

ন' ফুট, ন' ইঞ্চি।

As regards qualifications——

অর্থাৎ কিনা গুণের মধ্যে—রাস্তার গ্যাসে সিগারেট ধরান, দেশলাই খরচ হয় না।

(১২)

এম্-এ

"আপনি ফিলজফিতে এম্-এ ? আপাততঃ কি করা হচ্ছে ?"
"ডিপ্লোমা ভোজন করা হচ্ছে।"

প্রতীক্ষা

[শ্রীসরোজবাসিনী গুপ্তা]

(১)

ভাই জ্যোৎস্না,

তোমার চিঠি পাইয়াছি। আমি পূর্ণ তিন বছর দাদার কাছে যাই না, দাদা অমন দূর দেশ হইতে আমাকে লইতে আসিয়া বারবার ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। তবু আমি যাই নাই। তোমার সব চিঠিরও জবাব দেই নাই। এজন্য তুমি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আমার ও আমার শ্বশুর বাড়ীর সম্বন্ধে কত কি লিখিয়াছ। আমার সব কথা তো তুমি জান না; জানিলে অমন লিখিতে পারিতে না। আমার এই অখ্যাত নগণ্য জীবনের ইতিহাস নিতান্তই তুচ্ছ। তবু গভীর বেদনার মন্থনে ইহাতে যে অমৃতের উদ্ভব হইয়াছে, সে আমার কাছে তুচ্ছ নয় ভাই। ইহারই অসম্বরণীয় আবেগ আমাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তুমি আমার সব কথা শোন ভাই।

আমার বাবা যে সব-জজ ছিলেন এবং তিনি যে নেহাৎ সেকেলে ধরণের ছিলেন না, সে তুমি জান। সরকারী কাজের জন্য তাঁহাকে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, তাই তিনি আমাকে বোর্ডিংএ রাখিয়াছিলেন। ছেলেদের মত মেয়েদের শিক্ষাও তিনি একই ধরণে এবং নিরুপদ্রবে দিতে চাহিতেন। বোধ হয় বারো বছর বয়সে বোর্ডিংএ যাই। প্রথমে একটু খানি লজ্জা ও সঙ্কোচের মধ্য দিয়াই তোমাদের সহিত পরিচিত হই। উজ্জ্বল অবাধ হাসি কৌতুক, খেলা ধূলা, পড়াশুনার ভিতর দিয়া তিন বছরে সেই পরিচয় কি নিবিড়ই হইয়াছিল! বোর্ডিং জীবনের নবাগত কৈশোরকে বাস্তবে, কল্পনায় কি রঙ্গিন করিয়াই তুলিয়াছিলাম! কৈশোরটা যেন লীলায়িত নব-বসন্তের মাধুরী ও উল্লাস চাঞ্চল্য লইয়া আমাদিগকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছিল!

তারপর তিন বছর পরে আমার সুখ, আরাম, কল্পনা, বাস্তবতা, সব ওলট পালট হইয়া গেল। বাবার আকস্মিক মৃত্যু ভয়ানক একটা সাইক্লোনের মত আসিয়া সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া গেল। বাবার বাহিরের প্রচুর আদরের সহিত অন্তরের অপরিসীম স্নেহ হারাইয়া আমি যে কি হইয়া গেলাম, তা আজও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। বাবা মুক্ত হস্ত ছিলেন, তা ছাড়া 'ষ্টাইল' বজায় রাখিতে যাইয়া তিনি কিছুই সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। দাদা তখন থার্ড ইয়ারে পড়িতেন।

বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কাকা আসিয়া আমাকে ও মাকে গ্রামের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। কাকা মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, তাই তাঁহাকে জানিতাম, কিন্তু গ্রামের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। থাকিবেই বা কেমন করিয়া? পূজার ছুটিতে বাবার সঙ্গে 'পশ্চিমে' বেড়াইতে যাইতাম, গরমের ছুটিতে কর্ম্মস্থানে থাকিতাম। পাচ বছর বয়সে ঠাকুরমার শ্রাদ্ধের সময় বাবার সঙ্গে একবার মাত্র দেশে গিয়াছিলাম।

তুমি সহরের মেয়ে, বিবাহিত জীবনও সহরেই যাপন করিতেছ। পল্লী সমাজ কেমন, তা জাননা। এ এক বিচিত্র জিনিস! গ্রামে আসিয়া আমি গ্রামবাসীদের বেশী বিস্মিত করিয়াছিলাম, কি তাহারাই আমাকে বেশী বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেটা কোন মাপ কাঠিতে মাপিয়া দেখি নাই। কিন্তু বিস্ময়ের মাত্রা কোন পক্ষেই অপ্রচুর ছিলনা, তা অনুমানে বুঝিয়াছিলাম।

কাকা গ্রামে ডাক্তারী করিতেন, বাবার আয়ের তুলনায় তাঁহার আয় নগণ্য ছিল। তাই আমি আহারে বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে আশৈশবের অভ্যাস ছাড়িতে খুব চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু তবু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না। কেন, তা জানি না। ভারতবর্ষের ইতিহাস খুব যত্ন

করিয়াই মুখস্থ করিতাম, আর বার্ষিক পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম হইয়া প্রাইজও পাইতাম। কিন্তু সে ইতিহাসে আমার নূতন দেখা এই বিপুল পল্লী সমাজের কোন কথাই নাই!

(২)

একদিনের কথা বলি।

বেলা শেষ হইলে আমি রান্না ঘর হইতে শূন্য কলসী লইয়া বাহির হইলাম। কাকিমা ঘর ঝাঁট দিচ্ছিলেন। আমার কাঁখে কলসী দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওকি হচ্ছে রেবা?"

আমি বলিলাম, "জল আনতে যাচ্ছি।"

"না, না, তুই ও-কলসী বয়ে আনতে পারবি নে। আমি আনছি।"

"তোমার অতটুকু মেয়ে তরু যদি জল আনতে পারে, তবে, আমিই-বা কেন পারব না কাকিমা?"

"তরুর যে কাজ করবার অভ্যেস আছে। তোমার বাবা যে তোমাকে রাজ কন্যার হালে রেখেছিলেন মা। আমাদের দুঃখের কপাল, তাই তিনি হঠাৎ চলে গেলেন।" বলিতে বলিতে কাকিমার চক্ষু সজল এবং কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া আসিল।

আমি নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া জল আনিতে চলিলাম। চাকর, ঝি কিছুই ছিল না। কাকিমাকে সব কাজ করিতে হইত। অনভ্যস্ত কাজ করিতে যদিও আমার কষ্ট হইত, তবু বসিয়া থাকিতে পারিতাম না।

একদল তরুণী হাসি-গল্পে ঘাট ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে সবাই নির্ব্বাক গম্ভীর হইয়া গেল। কিন্তু তাহাদের মৌনব্রত বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। কিছুকাল মুখ টেপাটেপি, চোখ চাওয়া চাওয়ির পর তরলা যথা সম্ভব গাম্ভীর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রেবা, এই গরমের দিনেও চব্বিশ ঘণ্টা সেমিজ পরে থাক, তোমার গরম লাগে না?"

এই প্রশ্ন ইহারা কত দিন করিয়াছে। তবু বলিলাম, "না, আমার ও অভ্যাস হয়ে গেছে।"

চিত্তিরদের সেজবৌ বলিল, "তোমাকে তো একদিনও ঘাটে চান করতে দেখিনি। তুমি চান করনা?"

আমাকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়াই ইন্দু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "চান করবে না কেন? বাড়ীতে ব'সে তোলা জলে চান করে, তরু আমায় বলেছে।"

বিস্ময়ের আতিশয্যে সেজবৌ চোখ দু'টিকে কপালে তুলিয়া বলিল, ওমা তোলা জলে চান করে!" "তা করে বৈকি। রেবা কলকাতায় যেখানে থাকত, সেখানে সব নাকি মেম সায়েব। আমার দিদি বলেছে, মেমেরা নাকি ঘরে বসে চান করে।" সেজ বৌ আমার কাছে একটুখানি সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি মেমেদের সঙ্গেই থাকতে?" আমি বলিলাম, "না। আমাদের বোর্ডিংএ সবাই বাঙ্গালী।"

ইন্দু অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

তরলা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি একদিনও আমাদের কারু বাড়ী যাওনা কেন রেবা?"

ইন্দু তীক্ষ্ণ হাসির সহিত বলিল, "এতকাল যে মেমেদের সঙ্গে রয়েছে, ইংরিজি পড়েছে, তার কি আর আমাদের মত মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে মানষের কাছে যেতে ইচ্ছে করে? কি বল ভাই রেবা?"

আমি কিছু বলিলাম না। সরলা এতক্ষণ চুপ করিয়া ঘটি মাজিতে ছিল। এবার কথা কহিল। বলিল, "ইন্দু যে কি বলে তার ঠিক নেই। রেবা এতদিন বিদেশে রয়েছে, ক'মাস হলো দেশে এসেছে। ভাল ক'রে এখনো চেনাশোনাই হয় নি। চেনা হ'লেই তখন যাবে। বোসগিন্নী ডেকেছিলেন, সেদিন তো তাঁদের বাড়ী গিয়েছিল।"

তরলা সেজ বৌয়ের কাণের কাছে মুখ লইয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, "অত বড় ধেড়ে মেয়ের বাড়ীর বের না হও-য়াই ভাল। দেখলে লজ্জায় আমাদেরও মাথা হেঁট হয়।" তরলার গা ঘেঁসিয়া গোপন কথার রসটুকু উপভোগ করিয়া ইন্দু সরলার পানে চাহিয়া বলিল, "বলি এতখানি [illegible] খোসামোদ করছ, ব্যাপার খানা কি?"

সরলা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দিল, "খোসামোদ করতে যা[illegible] কেন লা? আমি কি তোর মত?"

কলহ আসন্ন হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি জল লইয়া বাড়ী চলিলাম।

বাড়ীতেও খুব আরাম ছিল না। যদিও কাকা কাকিমার প্রচুর স্নিগ্ধ স্নেহ আমাকে নিয়ত ঘিরিয়া থাকি[illegible]

তবু আরাম ছিল না। আমার বিবাহের জন্য গ্রামবাসীরা এত খানি ব্যগ্র ও চিন্তিত হইয়া পড়িল যে, সে জন্য কাকা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ভাবনায় মায়ের শোকাশ্রু যেন জমিয়া বরফ হইয়া গেল। কোন্ গরিবের ঘরের মূর্খের হাতে পড়িয়া আমি দুঃখ পাইব, এই শঙ্কায় কাকিমা যখন তখন চোখের জল ফেলিতে সুরু করিলেন। স্কুল কলেজের কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয়ের মত হিন্দু মেয়ের বিবাহটা এমন কম্পাল্‌সরি হইল কেন, বলিতে পার? তখন ভাবিতাম, কাকা এত ভাবেন কেন, বিবাহ না হইলে কি হয়? আমাদের অনেক টিচার তো কুমারী আছেন। বিবাহিত জীবন অপেক্ষা তাঁহাদের জীবন কি কম সুখের?

কাকার ধনুর্ভঙ্গ পণ, অন্ততঃ দু'টো পাশ না হইলে তিনি জামাই করিবেন না। পাশে বিদ্যা ও অর্থ যতটা হোক্ না হোক্, বিবাহের বাজারে তাহার খুব আদর ও কদর আছে। দু'টা পাশের দক্ষিণা তো সোজা কথা নয়। মা একদিন কাকাকে বলিলেন, "ঠাকুরপো, ভেবে ভেবে আর হাঁটাহাঁটি ক'রে তোমার শরীরটা নষ্ট হয়ে গেল। রায়গাঁর ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে ফেল। পাশটাস নয় বটে, কিন্তু বেশী দিতে থুতেও হবে না।"

কাকা বলিলেন, "তা কি ক'রে হবে বৌঠান, মূর্খ ছেলের হাতে রেবাকে দিলে দাদার আত্মার তৃপ্তি হবে না।"

কথাটা শুনিয়া আড়ালে আমি চক্ষু মুছিলাম।

আমি বোর্ডিংএ ছিলাম বলিয়া কোন কোন ছেলের মা নাকি আমাকে বধূরূপে গ্রহণ করিতে নারাজ। সব ছেলের মা নারাজ হইলে মন্দ হইত না, কাকা নিষ্কৃতি পাইতেন। আমিও!—কিন্তু তা হইল না। এক ছেলের মা ও বাবা দু'জনেই রাজি হইলেন। বিবাহের টাকা সংগ্রহ করিতে কাকাকে যে খুব কষ্ট পাইতে হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। তবু কাকার আহ্লাদ কত! পাত্র এবার বি-এ, পরীক্ষা দিয়াছে।

(৩)

বিবাহের দুইদিন পূর্ব্বে অনেক রাত্রে শুইয়াও ঘুম আসিতেছিল না। নিয়তি আমার জীবনধারা যে নূতন খাতে বহাইতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা কেমন হইবে, কে জানে? চির পরিচিত অক্ষুণ্ণ স্নেহাশ্রয় ছাড়িয়া যেখানে যাইতেছি, সেখানে সাদরে গৃহীত হইত? মায়ের স্পর্শের স্নিগ্ধতা কি সেখানে মিলিবে? মাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে! একটা অজ্ঞাত সশঙ্ক বেদনায় বুকের মাঝখানটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল। ভাবিতে ভাবিতে শেষ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলাম। খুব গাঢ় নিদ্রা হইল না। খানিক পরে গাড়ীর শব্দ শুনিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সূর্য্যোদয় হয় নাই, কিন্তু ধরার শিশিরার্দ্র গাঢ় সবুজ আঁচলের উপর উষার রক্তাভ আলোক রেখা পড়িয়া ঝল-মল করিতেছিল। মিনিট খানেকের মধ্যেই এক-খানা গাড়ী আসিয়া আমাদের বাড়ীর দরজায় থামিল, গাড়োয়ান নামিয়া দরজা খুলিয়া দিলে এক তরুণ যুবার সহিত একটি বর্ষীয়সী বিধবা গাড়ী হইতে নামিলেন। বিধবা অগ্রগামিনী হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে মা? পাবনী কোথায়?"

আমি অপরিচিতার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিলাম, "কাকিমা বোধ হয় এখনো ওঠেন নি।"

তিনি ঘরের দিকে চলিলেন। ঘরে না ঢুকিতেই কাকিমা বাহিরে আসিয়া বিস্ময় পুলকাপ্লুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "একি, দিদি! কোথা থেকে এলে?"

বলিতে বলিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ ছলে কাকিমার গায় মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "তোমাদের চণ্ডীতলায় নির্ম্মলের জন্যে পূজা মানত আছে ভাই, তাই দিতে এসেছি। নির্ম্মল, তোর মাসিমাকে প্রণাম করলি নে!…

আমি কাকিমার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া প্রভাতের আলোকে উজ্জ্বল সেই সৌম্যমূর্ত্তি বিধবার প্রসন্ন প্রশান্ত মুখখানি দেখিতেছিলাম, যুবার উপস্থিতি মনেই ছিল না। চকিতে সরিয়া দাঁড়াইলাম। মায়ের কথায় ছেলে আসিয়া কাকিমাকে প্রণাম করিলেন। কাকিমা তাঁহাদিগকে সমাদরে ঘরে বসাইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "দিদি আজ তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, এ কাজে ভালই হবে। কাল আমার ভাসুর ঝি রেবার বিয়ে। তোমার কাছে বলতে

লজ্জা নেই যে, আমরা গরিব বলে সব কুটুমদের নেমন্তন্ন করতে পারিনি। তোমার মত কাজের লোক যখন পেয়েছি, তখন এ দু'তিন দিন তোমাকে ছাড়ছি নে।"

তারপর মহিলাটি বিবাহ সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা বলিয়া মায়ের সঙ্গে কিছু সময় আলাপ করিলেন। আমাদের প্রতিবাসিনীরা মায়ের বৈধব্য এবং আমার বয়সের আধিক্য লইয়া এমন ভাষায় সমবেদনা প্রকাশ করিত যে, বর্ষণার্দ্র গাছের ডাল ধরিয়া নাড়া দিলে তাহা হইতে যেমন ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়ে, তাহাদের সহানুভূতিতেও আমার মায়ের চোখ হইতে তেমনি করিয়া জল ঝরিয়া পড়িত। কিন্তু ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া মাকে খুসী হইতেই দেখিলাম! শুনিলাম, ইনি কাকিমার পিতার জ্ঞাতি কন্যা। আমাদের গ্রাম হইতে আট দশ মাইল দূরে শ্যামপুরে ইঁহার বাড়ী। ইনি মায়ের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিবাহের আয়োজন ও কাজ-কর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন।

পরদিন, অর্থাৎ বিবাহের দিন আর এক হাঙ্গামা বাধিল। নিমন্ত্রণ রন্ধনের জন্য যে পাচক ঠিক করা হইয়াছিল, কি কারণ বশতঃ সে রাঁধিতে পারিবে না, বলিল। শুনিয়া কাকা ব্যাকুল ভাবে বসিয়া পড়িলেন। দু'তিনশ লোকের নিমন্ত্রণ! তখন পাচক খুঁজিয়া আনিয়া কাজ করান অসম্ভব। কাকিমার দিদি কাছেই ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। আমি রাঁধব। তবে আমার একজন সাহায্যকারী চাই।"

আমি বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া সেই একাহারী ক্ষীণকায়া প্রৌঢ়ার পানে চাহিয়া রহিলাম। পরক্ষণেই আমাকে বিস্ময় বিমূঢ় করিয়া দিয়া ইন্দু আসিয়া সোল্লাসে বলিল "আমি আপনার সাহায্য করব!" পল্লী নারী কি পর চর্চ্চা এবং পর কর্ম্মে সমান দক্ষ?

নিমন্ত্রিতদের খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে বেলাও শেষ হইয়া আসিল, তখন কন্যা সাজাইবার ধুম পড়িয়া গেল। এমনি সময়ে হঠাৎ উঠানে কাকার আর্ত্তকণ্ঠ শুনিয়া সবাই সেখানে ছুটিয়া গেল। উঠানে খুব গোলমাল হইতে লাগিল। বহুলোকের মিশ্রিত কথা হইতে এইটুকু বুঝা গেল যে, আজ বরের পিতার বিসূচিকা হইয়াছে, অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সুতরাং আজ কিছুতেই বিবাহ হইতে পারে না। বরের মা নাকি বলিয়াছেন যে, যে মেয়ের সঙ্গে বিবাহের কথা হওয়ায় কর্ত্তার জীবন সংশয়, তেমন অপয়া মেয়ে তিনি ঘরে আনিতে চান না। আর বরের দাদা নাকি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, কবে বিবাহ হইতে পারিবে, তাহার স্থিরতা নাই। অনির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করায় অসুবিধা বোধ করিলে কাকা অন্য চেষ্টা করিতে পারেন।

সমাগত আত্মীয় কুটুম্বগণ অনাগত বরপক্ষের প্রতি এমন সব বাণী বর্ষণ করিতে লাগিল যে, যাহার মানেই অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কাকিমা কাঁদিতে লাগিলেন, কাকা রক্তলেশ শূন্য বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, মা'র কম্পিত দেহ বিছানায় এলাইয়া পড়িল। অনভ্যস্ত উপবাসে আমার দেহ অবসাদে ভরিয়া গিয়াছিল। তাহাতে এই কাণ্ড! দাদা দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ত্রস্তে আমার মূর্চ্ছাতুর দেহ বিছানায় তুলিয়া শোওয়াইয়া দিলেন।

তারপর আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে আমি এক বিচিত্র লীলাময় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। আমার যেন বিবাহ হইতেছে। শুভদৃষ্টির সময় কে যেন আমাকে চোখ তুলিয়া চাহিতে বলিল। আমি মন্ত্র-চালিতের মত চাহিলাম। দেখিলাম, কাল ভোরের স্নিগ্ধ আলোকে যে অপরিচিত তরুণ অতিথিকে দেখিয়াছিলাম, তিনিই তাঁহার উজ্জ্বল আয়ত চক্ষুর শান্ত কোমল দৃষ্টি মেলিয়া সাগ্রহে আমার দৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছেন।

(৪)

বিবাহের পর গ্রামের সবাই বলিতে লাগিল, আমার পরম সৌভাগ্য মূর্ত্ত হইয়াই বিসূচিকা রূপে দেখা দিয়াছিল। নহিলে এরূপ অভাবনীয় রূপে, এমন রোমাঞ্চিত বিবাহ হইতে পারিত না। আমার শ্বশুর পরিবার এই অঞ্চলে সর্ব্বজন পরিচিত এবং খুব সম্ভ্রান্ত। স্বামীর স্বভাবটি নাকি তাঁহার নামকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি শুধু বি-এ, পাশ করিয়াছেন বলিলে ঠিক হয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সময় তিনি কমলাসনা বাণীর বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আমার শাশুড়ী পণ গ্রহণ করেন নাই। সেই সৌম্যমূর্ত্তি নারীর

প্রথম দর্শনেই আমার চিত্তে একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার রেখাপাত করিয়াছিল। আজ তাঁহাকে 'মা' বলিবার অধিকার পাইয়া আমার সমস্ত অন্তর মমত্ববোধ ও ভক্তিতে ভরিয়া গেল।

গুরুজনের নানারকম আশীর্ব্বাদ লইয়া শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করিলাম। সারাপথ মা আমাকে প্রায় বুকের মধ্যে জড়াইয়াই ছিলেন। মা বিবাহের সংবাদ পূর্ব্বেই বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন, সুতরাং বধূ বরণের সব আয়োজনই ছিল। যেন গ্রাম উজাড় করিয়া দলে দলে মেয়েরা আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। জনরব তাহাদের কল্পনার চোখের সামনে আমার যে ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিল, সত্যিকার মানুষের সঙ্গে তাহার কত খানি মিল বা অমিল ছিল, তাহাই দেখিবার জন্য হয়তো এত লোক আসিয়াছিল। উচ্চ গোড়ালি যুক্ত জুতার পরিবর্ত্তে তাহারা আমার পায়ে আলতা দেখিয়া যে খানিকটা হতাশ ও ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, তাহা তাহাদের কথার আভাসে আমি আন্দাজ করিয়াছিলাম।

আমার দুই ভাসুর, জা, খুড়শ্বশুরের তিন ছেলে, দুই মেয়ে, বিধবা খুড়শাশুড়ী এবং ভাসুরদের ছেলে মেয়ে লইয়া পরিবারটা নেহাৎ ছোট নয়। বুঝিলাম, আমার আকস্মিক ঔপন্যাসিক বিবাহে বাড়ীর কেহই খুশী ন'ন্। তবে মা বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, এবং তাঁহার চরিত্রে স্নিগ্ধতার সঙ্গে এমন একটা দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা ছিল যে, প্রকাশ্যে তাঁহার কাজের সমালোচনা বা প্রতিবাদ করিবার মত সাহস বাড়ীর কাহারও ছিল না। একদিন পাশের ঘরে বসিয়া শুনিলাম, বড় ভাসুর মাকে বলিতেছেন, "মা, তুমি হতভাগা নির্ম্মলটার পাগলামীতে পড়ে একি করলে বল ত?"

মা দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেন, "তুই কি মনে করিস, নির্ম্মলের কথায় আমি কিছু করেছি? সেই ভদ্র পরিবারের বিপন্ন অবস্থা দেখে আমার যা কর্ত্তব্য মনে হয়েছে, তাই করেছি।"

ভাসুর হতাশা-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "নির্ম্মলের ওপর আমার কত আশা ভরসা ছিল মা!"

মা কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "তা গেল কিসে বাবা? নির্ম্মলকে লেখা পড়া শিখিয়েছ, মানুষ হবে, টাকা রোজগার করে দেবে, এই তো কথা? সে আশা গেল কিসে? দুই ছেলের বিয়ে দিয়ে ঢের টাকা পেয়েছি, একটি অমনি দিলাম, তাতে কি হয়েছে?"

ছেলে মায়ের কথার উপর আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইতেই এক প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকিয়া মাকে বলিলেন, "দু'দিন জ্বরে পড়েছিলাম, আসতে পারিনি। কৈ গো, তোমার নতুন বৌ কোথায়?" মা আমাকে ডাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে বলিলেন। প্রৌঢ়া আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বেশ বৌ। তবে রংটা ফর্সা নয়, আর কিছু ঢেঙ্গা! আচ্ছা, তোমার বৌ নাকি এতদিন খৃষ্টানদের সঙ্গে থেকে লেখা পড়া করেছে। এখন এই বৌ নিয়ে গেরস্থালি করতে পারলে হয়!"

মা বলিলেন, "তোমাদের যত সব কথা! ইস্কুলে পড়লেই নাকি গেরস্থালি করতে জানে না! ছেলেরা ইস্কুলে কলেজে পড়ে, আমরা কি তাদের নিয়ে ঘর করি নে? একালের সহরের ঢের মেয়েই তো ইস্কুলে পড়ছে। চিনি কাঁদছে, যাও ছোট বৌমা, তাকে কোলে করে শান্ত করগে।" বলিয়া মা নিজেও কি কাজে উঠিয়া গেলেন। অগত্যা প্রৌঢ়াকেও উঠিতে হইল।

কএক দিন পরে কাকা আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। বাড়ী যাইয়া ম্যালেরিয়ার হাতে পড়িলাম। দেড় বছরাধিককাল ম্যালেরিয়া আমায় এমনভাবে আঁকড়াইয়া থাকিল যে, আর শ্বশুর বাড়ী আসিতে পারিলাম না। তারপর শাশুড়ীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আসিতে হইল। আমারি দুর্ভাগ্যে মা চলিয়া গেলেন, এই ভাবনাটা কাঁটার মত আমার মর্ম্মে বিঁধিয়া অহরহ আমাকে ব্যথা দিতে লাগিল।

শ্রাদ্ধের পর একদিন স্বামী দিদিকে ডাকিয়া নির্ব্বিকার শান্তস্বরে বলিলেন, "শোন বৌদিদি, আমি এম্, এ, ফেল করেছি। অন্যের কাছে শুনলে হয়তো বেশী বকবে, তাই আমি নিজে বলতে এসেছি।"

মুহূর্ত্তে দিদির মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি কএক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের পায় দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "ফেল যে করবে, মা যে এত শীগগির চ'লে যাবেন,

তাতো জানিই। অমন অপয়া বৌ ঘরে আনলে কি মঙ্গল হ'তে পারে ?"

স্বামী বক্তব্য শেষ করিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন, দিদি তাঁহাকে বিঁধিবার জন্য কথাগুলি বলিলেও তাঁহাকে না বিঁধিয়া আমাকেই বিঁধিল।

একদল মানুষ আছে, তাহারা ব্যথাটা বাহিরে প্রকাশ হইতে দিতে চাহে না। এই নির্ব্বাক নিরশ্রু সহনশক্তি আবার কাহারও পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়ায়। হয়তো তাই মেজ দিদি আমার মুখ দেখিয়া কি যেন অনুমান করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "কি হয়েছে ছোট বৌ ? মুখখানা অমন মেঘ ভরা কেন ভাই ? ঠাকুরপো পাশ করতে পারে নি ব'লে দুঃখ হয়েছে ? এবার হয়তো পড়া শুনো ভাল হয়নি, আসছে বারে নিশ্চয় পাশ পাবে। আয়, তোর চুল বেঁধে দি।" বলিয়াই তিনি চিরুণী ও আমাকে লইয়া বসিয়া গেলেন।

ভাসুররা দু'জন গ্রামের জমিদার বাড়ীতে কাজ করিতেন। সকাল বেলা বাড়ী হইতে খাইয়া কাছারি যাইতেন, প্রায় সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতেন।

সেদিন বড় ভাসুর বাড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নির্ম্মল কোথা ?"

দিদি বিরক্তি ভরা স্বরে বলিলেন, "আমি তার কি জানি ? ক'দিন ধরে দেখছি, সকালে খেয়ে বের হয়, আর রাত্তিরে বাড়ী আসে। কোথায় যায়, কে জানে ?" মেজ ভাসুর কাছে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "গ্রামের মাইনর স্কুলটাকে এনট্রেন্স স্কুল করবার জন্তে সে উঠে পড়ে লেগে গেছে। এই ক'দিন তার দলবল নিয়ে তারই চেষ্টা ও পরামর্শ চলছে।"

বড় ভাসুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "হতভাগা আর পড়া শুনো করবে না নাকি ?"

দিদি জবাব দিলেন, "সে তো তোমার কাছে জিজ্ঞেস করেই সব কাজ করে কিনা ! বিয়ে তোমার অনুমতি নিয়ে করেছে, পড়াশুনাও তোমার ইচ্ছায় করবে !"

দিদির কথার শেষের ঝাঁজটা হয়তো ভাসুরকে লাগিল, তাই তিনি নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। মেজ ভাসুর বলিলেন, "শুনেছ বৌদি'দি, নির্ম্মল নাকি বিনা বেতনে এক বছর স্কুলে মাষ্টারী করবে। স্কুলের তেমন টাকা নাই কিনা।"

"যা খুসী করুকগে" বলিয়া দিদি রুষ্ট ভঙ্গিতে রান্না ঘরে ঢুকিলেন।

খুড় শ্বশুরের বড় মেয়ে কএক দিন শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে। সে দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বৌদিদি, ছোট বৌ তো দেখতে তেমন সুন্দর নয়। ছোড় দা কি তার লেখা পড়ার কথা শুনেই তাকে বিয়ে করল নাকি !" দিদি অত্যন্ত জোরের সহিত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কক্ষনো নয়। ছোট ঠাকুরপো ইংরেজী, পড়া মেয়ে মানুষ আদপে পছন্দ করে না। তার মন কেমন নরম, জানতো ? ছোট বোয়ের মা-খুড়ীর কান্না কাটিতে গলে গিয়ে সে এই কাজ করেছে।"

তাই নাকি ? এত দিনে আমার চোখের সামনের আঁধার পর্দা খানা সরিয়া গেল। সংশয়কে নষ্ট করিয়া নূতন আলো ফুটিয়া উঠিল। এই আলোর তীব্রতা দুঃসহ হইলেও আমি তাহারই সাহায্যে সত্যকে দেখিতে পাইয়া অন্তরে খানিকটা শান্ত হইলাম। আমি তাঁহার প্রেয়সী স্ত্রী নই, করুণার পাত্রী! সমবেদনায় আর্দ্র হইয়া তিনি আমার কাকার জাতি মান রক্ষা করিয়াছেন ; স্ত্রী বলিয়া আমাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার অস্বাভাবিক প্রশান্তি বা গাম্ভীর্য্যের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তারুণ্যের স্বাভাবিক উল্লাস চাঞ্চল্য একটি নিমেষের জন্যও আমার কাছে ধরা দিতে পারে নাই। আমার মৌন হৃদয় যে অর্ঘ্য সাজাইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, এই তিন চার মাসেও তিনি তাঁহার খোঁজ লন নাই। যে সোণার কাঠির স্পর্শে প্রাণের ঘুমন্ত অনুভূতি সজাগ হইয়া একের সঙ্গে অন্যকে দৃঢ় বাঁধনে যুক্ত করিয়া দেয় তাহাই যে তাঁহার নাই।

আমি জানি, তিনি রূপে, গুণে, বিদ্যায় আমা অপেক্ষা বড়। কিন্তু আমার ত প্রাণ আছে। এই প্রাণের গরিমায় আমি নিজের মধ্যে কোন কুণ্ঠা, কোন দৈন্যই যে অনুভব করিনা। আমি তাঁহাকে যাহা দিতে চাই, তাহার অম্লান শুভ্রতা ও সৌন্দর্য্য সব সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে। তাঁহার প্রথম দৃষ্টিতে যে প্রাণের সাড়া পাইয়াছিলাম, তাহাতে বুঝিয়া ছিলাম, প্রাণকেই তিনি সব চেয়ে বড় বলিয়া জানেন। সেই বিশ্বাসকে দুই বছর কত শ্রদ্ধায় না পূজা করিয়াছি, কত আশায়, আনন্দে পোষণ করিয়াছি !

তিনি আমাকে যে ভালবাসা দিতে পারেন নাই, আমি তাহার একবিন্দুও যাচিয়া লইতে পারিব না। সব সহিতে পারি, কিন্তু ভিক্ষার হীনতা অসহ্য। ওগো, কেন তুমি অনুকম্পার এই বিপুল বোঝা আমার উপর চাপাইয়া দিয়াছ ? আমি তো তোমার কাছে ইহা চাহি নাই। এ বোঝা নামাইবার যে আর কোন উপায়ই রাখ নাই। কে আমি ? কেন এখানে পড়িয়া আছি ? কে আমাকে চায় ? কক্ষ ভ্রষ্ট গ্রহের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জীবনটা নিতান্তই লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্য হীন। কোথায় যাইয়া আমার জীবনগতির বিরাম হইবে, কে জানে ?

সেদিন রাত্রি দশটার পরে স্বামী দরজা ঠেলিয়া শয়ন কক্ষে ঢুকিলেন। এই রকম সময়েই তিনি শুইতে আসিতেন। প্রায়ই আমি তখন ঘুমাইয়া পড়িতাম, কারণ আটটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া চুকিয়া যাইত। খাওয়ার পরে দু'ঘণ্টা যাঁহার প্রতীক্ষা করিব, তিনি যে শুধু বিশ্রামের জন্তই শয়ন কক্ষটি চাহিতেন। আমি কোন দিনই তাঁহার বিশ্রামের বিঘ্ন হইতাম না। যে দিন হয়তো ঘুম আসত না, সে দিন তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিতেন, আমার জন্য এখনো জেগে রয়েছ কেন রেবা, ঘুমোও ঘুমোও। কাজ কর্ম্ম করাতো তোমার অভ্যাস ছিল না। এখানকার খাটুনিতে না জানি তোমার কত কষ্ট হচ্ছে ! অমুক কাজটা সেরে আসতে রাত হয়ে গেল। আহা, তোমার কষ্ট হয়েছে ! ঘুমোও রেবা" বলিয়া তিনিও অচিরে ঘুমাইয়া পড়িতেন। তাঁহার অযাচিত দয়ার কথা শুনিতে আজ আর আমার কাণ দু'খানা প্রস্তুত হইল না। আমি চোখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, তিনি বিছানার অত্যন্ত নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি আমাকে ঘুমন্তই মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃদু তপ্ত শ্বাস আমার মুখে লাগিল। বুঝিলাম, আমার ঠোঁটের কাছে তাঁহার ঠোঁট দু'খানিও অত্যন্ত নমিত হইয়া আসিয়াছে। আমার নিমিলিত চোখের সামনেও তাঁহার কোমল দৃষ্টি এবং রক্তাভ ঠোঁট দু'খানি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তেই তিনি সরিয়া গিয়া টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া কি করিতে লাগিলেন।

সকালে উঠিয়া কি কাজ করিতে ছিলাম। দিদি প্রসন্ন ভাবে আমাকে কোন দিন কোন কাজ করিতে বলিতেন না। আমায় কোন কাজ তাঁহার মনের মতও হইত না গৃহকর্ম্মে যে দিদিও মেজ দিদির মত নিপুণা ছিলাম না, তা বলাই বাহুল্য। দিদির বিশ্বাস, তাঁহার যে দেবরটির উপর তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল, কোন্ যাদু মন্ত্রে তাঁহার সেই দেবরটিকে আমি তাঁহার অধিকারের সীমার বাহিরে লইয়া গিয়াছি। হায় ! তিনি যদি জানিতেন যে, স্বামীর আমি দয়া পাত্রী ছাড়া আর কিছুই নই, এবং সে দয়াও আমার হৃদয় গ্রহণ করিতে পারে নাই, তবে বোধ হয় এক তিল ক্ষোভও তাঁহার থাকিত না। তাঁহার ভ্রান্ত বিশ্বাসই আমার প্রতি তাঁহাকে একান্ত বিরূপ করিয়া তুলিয়াছিল।

মেজদিদি রান্না চড়াইয়াছিলেন, আমি তাঁহার কাছে বসিয়াই কি কাজ করিতেছিলাম। রান্না ঘরের দাওয়ায় বসিয়া বড় ভাসুর মেজদিদির ছোট খুকীটিকে লইয়া আদর করিতেছিলেন। এমন সময় স্বামী আসিয়া নতমুখে বলিলেন, "দাদা, গ্রামের সবাই আমায় বলছে, অন্ততঃ এক বছর নতুন স্কুলে মাষ্টারী করতে। কুড়ি টাকার বেশী তারা দিতে পারবে না, নতুন স্কুল খুলছে, টাকা তো নেই বেশী।"

ভাসুর কএক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যদি পড়াশুনা ছেড়ে মাষ্টারী করবার ইচ্ছাই হয়ে থাকে, তবে স্বর্ণহাটি যাও না কেন ? সেতো সত্তর টাকার পোষ্ট। সে স্কুলের সেক্রেটারীও তো সাধছে ?"

"যেখানে আপনি বলেন, সেখানেই যেতে পারি।"

"তোর কি ইচ্ছা, শুনি ?"

"আমার আবার ইচ্ছা কি ? যা বলবেন, তাই করব।" কিন্তু তাঁহার প্রবল ইচ্ছার ছাপ তাহার মুখেই উজ্জলতর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা ভাসুরের অগোচর রহিল না। হয়তো সদ্য মা-হারা ছোট ভাইটির ইচ্ছার বিরোধী হইতে অনিচ্ছুক হইয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, ওরা যখন বলছে, তখন না হয় এক বছর এখানেই থেকে যাও। পড়াশুনা আরম্ভ কর ; পরীক্ষা দিতেই হবে, মনে থাকে যেন।" এই বলিয়া তিনি খুকীকে দোলাইতে দোলাইতে বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

দিদি তাঁহার ঘর হইতে দুই ভাইয়ের কথা শুনিতে ছিলেন। ভাসুর চলিয়া যাইতেই তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া রান্না ঘরের দাওয়ায় আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুরপো, অবাক করলে তুমি! বৌ ছেড়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে স্বর্ণহাটি যেয়েও থাকতে পারবে না? বৌয়ের জন্যে সত্তর টাকা ছেড়ে কুড়ি টাকায় গাঁয় থাকছ! বৌ আর কারু নেই নাকি? বরং এক কাজ কর, বৌ নিয়েই না হয় স্বর্ণহাটি যাও।"

স্বামী একটু খানি হাসিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন "বোয়ের জন্যে নয় বৌদিদি, গাঁয়ের গরিব লোকের চাঁদায় স্কুল খোলা হচ্ছে। তারা তো বেশী মাইনে দিয়ে অন্য জায়গা থেকে মাষ্টার আনতে পারবে না।"

"আমি তোমাদের ও-সব বুঝিনে ভাই, যা খুসী করগে।"

"তুমি এখন যত পার, অবুঝ আর গম্ভীর হয়ে থাক, তাতে আমার আপত্তি নেই। রান্নার কত দূর হলো, বল। সকালে খেয়ে বেরুতে হবে।" "মেজবৌ রাঁধছে। তার শরীর ভাল নেই, রান্না হয়নি এখনো।"

"মেজ বৌদিদি অসুখ শরীর গিয়ে কেন রাঁধছেন?"

"রাঁধবেন না, কি করবেন? এত গুলো লোক খাবে কি? আমি একলা ক'দিক সামলাব, বল। ঠাকুর পূজার কাজ, নিরামিষ রান্না, কুটনা কোটা, ছেলেদের খাবার দেওয়া, সব দেখা শোনা, এই সব করেও কি আমি সকালে যেয়ে হেঁসেলে রাঁধতে পারি? খুড়িমার হাঁপানি, তিনিতো কিছুই করতে পারেন না। আর আমরা রয়েছি, তিনি করবেনই বা কেন?"

"ছোটবৌকে সব কাজ শিখিয়ে নিতে পার না?"

"সে নিজে যা শিখেছে, তাতেই তোমার চলবে। আমাদের পাড়া গাঁয়ের ঘর কন্না তাকে আর শিখতে হবে না। কি কাজ করতে বলব তাকে? ঠাকুর ঘরের কাজ করতে দিলে, হয়তো ঘি না দিয়েই নৈবিদ্য ক'রে রাখবে। বকুল, শিউলি হয়তো রাখবে শিব পূজোর জন্যে, আর ধুঁতরো, রক্তজবা সাজাবে নারায়ণ পূজোর জন্যে। দুর্ব্বা তো তুলতেই জানে না। রাঁধতে দিলে, কি করা, না করা, তা হাজার বার বললেও হাজার ভুল করবে। যে তিথিতে যে তরকারী খাওয়া নিষেধ, সেই তিথিতেই তাই রেঁধে রাখবে। দু' কলসী জল আনতে ঘেমে ওঠে, দু'খানা বাসন মাজতে দু'দণ্ড লাগে। শুধু লেখা পড়া, গান বাজনা, আর সেলাই নিয়েই তো গেরস্থের ঘর সংসার চলে না।" দিদি আমার বিরুদ্ধে অনভিজ্ঞতার যত গুলি নালিশ করিলেন, তাহা মিথ্যা নহে। তবুও এই নির্ভেজাল সত্যের ঝাঁজে সারাদিন আমার মন উত্তপ্ত হইয়া রহিল।

(৬)

ছোট ভাইটির প্রতি বিচারহীন স্নেহের জন্য বড় ভাসুরের প্রতি সংসারের সবাই বড় খুসী ছিল না। ছোট ভাইয়ের নম্র স্বর এবং শান্ত দৃষ্টিতে যখন যে ইচ্ছার আভাস দেখা যাইত, তাহা সকলের প্রীতিকর হোক্, বা না হোক্, বড় ভাই পূর্ণ করিতেন। গ্রামের স্কুলে কাজ নেওয়ায় ঘরের সবাই স্বামী ও ভাসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া লড়াই করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু অপর পক্ষের স্তব্ধতা এবং প্রায় অনুপস্থিতিতে অগত্যা সবাইকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

বাপের বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল। আমি দিদির মেয়ে দুর্গাকে নিমন্ত্রণ সাজে সজ্জিত করিতে ছিলাম। সেদিন অসুখের জন্য বড় ভাসুর কাছারি যান নাই। এমন সময়ে মেজ ভাসুর আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "নির্ম্মল এক ভয়ানক কাণ্ড ক'রে বসেছে! কি হবে, দাদা?"

বড় ভাসুর খুব উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করেছে?"

"জমিদারের পেয়াদা রামধনের বাড়ী খাজনা আদায় করতে গিয়েছিল, রামধন তখন বাড়ী ছিল না। টাকার জন্য পেয়াদা রামধনের মাকে অনেক কটূক্তি করেছিল, রামধনের মা নাকি তাতে কি জবাব দিয়েছিল। তাই পেয়াদা রেগে তেড়ে বুড়ীকে মারতে গিয়েছিল, নির্ম্মল স্কুলে যাচ্ছিল, সে তাই দেখে ছুটে গিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে পেয়াদাকে বাড়ীর বের করে দিলে, দু'চারটে চড় ঘুসিও নাকি দিয়ে ছিল। পেয়াদা বুড়ীকে মারতে যাওয়ার কথা স্বীকার করে না। সে বলে, নির্ম্মল বিনাদোষে তাকে মেরেছে। এ সব শুনে জমিদার রাগে লাল হয়ে

গেছেন, বলছেন, নির্ম্মলকে আমি দেখে নেব।' একে জমিদার, তাতে আমাদের মুনিব, কি যে হবে, বুঝিনে!"

চিন্তাকুল স্বরে দু'ভাই কি বলাবলি করিতে করিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাহা শুনিবার জন্য আমি কিছু মাত্র উৎসুক হইলাম না। অসহায়া নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য স্বামীর এই নির্ভীকতা আমার অতীত ভবিষ্যৎ সব তলাইয়া দিয়া শুধু বর্ত্তমানকে এক অপূর্ব্ব আলোকে রঙ্গিন করিয়া তুলিল। তাঁহার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া গেল। আনন্দের আবেগে আমার দেহ যেন কম্পিত হইতে লাগিল। আমি নিজের ঘরে গেলাম। কখন্ তিনি আসিবেন? কখন্ আমি নারী জাতির প্রতিনিধি হইয়া আমার বেপমান দেহটা তাঁহার পায়ের তলায় ফেলিয়া অন্তরের পুষ্প মাল্যে তাঁহার পৌরুষকে অভ্যর্থিত করিব?

রাত্রির কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া শয়ন কক্ষে আসিয়া দেখিলাম, ঘড়িতে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি কোথায়? দিদির ঘরের বারান্দায় বসিয়া দিদির সঙ্গে যেন কি কথা বলিতেছেন। খানিক পরে তাঁহার পদ শব্দ শুনিয়া ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর বসিয়া বলিলেন, "বো'স রেবা, কথা আছে।"

আমি তাঁহার পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া নির্ব্বাক ঔৎসুক্যে রামধনের বাড়ীর ব্যাপার শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

দু'এক মিনিট তিনি চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিলেন, তারপর আমার দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিত হইতেই "ওখানে কেন" বলিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে কাছে বসাইয়া একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "বৌদিদির কাছে শুনলাম, তুমি নাকি কাল তাঁর মুখে মুখে তর্ক করেছ?"

মুহূর্ত্তে আমার সব ওলট পালট হইয়া গেল। নিজকে সামলাইয়া লইয়া অসঙ্কোচে বলিলাম, "হ্যাঁ, করেছি। তিনি আমায় যা বলেছিলেন, তা আমার অন্যায় মনে হয়েছিল, তাই তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি।"

"কেন করেছ? বৌদিদিরা কখনো মা বা খুড়িমার সঙ্গে তর্ক করেন নি। এখনো তাঁরা খুড়িমার সব কর্ত্তৃত্ব মেনে চলেন, সেতো তুমিও জান। গুরুজনের সঙ্গে তর্ক করা এ বাড়ীর রীতি নয়।"

"তবে এ বাড়ীর রীতি কি অন্যায়কে মেনে চলা? ব্যক্তিত্বকে অগ্রাহ্য করা? মানুষের দেহ মনের স্বাভাবিক বিকাশকে চেপে রেখে মানুষকে জড় করে তোলা? ব্যষ্টিকে সমষ্টির ইচ্ছা পূরণের যন্ত্রে পরিণত করা? অপরকে খাটো করতে গেলে নিজেকেও অনেকখানি খাটো করতে হয়, সেই রকম খাটো হওয়াও কি এ বাড়ীর রীতি?"

আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার কথার উত্তরে সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ, সমষ্টির পাদপদ্মে ব্যষ্টির আত্মনিবেদন হিন্দুর সনাতন রীতি, আত্ম-বিসর্জ্জনেই নারীত্বের চরম বিকাশ" প্রভৃতি অনেক কিছু বলিবেন। কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না। আমার উদ্ধত কণ্ঠ ও বাণী আমাকেই ধিক্কার দিয়া লজ্জিত করিয়া তুলিল, তাঁহার দৃষ্টির স্নিগ্ধতা একবিন্দু নষ্ট করিতে পারিল না। তিনি স্থিরকণ্ঠে স্মিতমুখে বলিলেন, "তুমি একদিন এ বাড়ীর রীতি মেনে চলায় একটা নতুন আনন্দ পাবে। আমি তা দেখব।"

ভাসুররা জানিতেন যে, স্বামী ধনগর্ব্বকে গ্রাহ্য করিতেন না। তাই তাঁহারা নিজেরা যাইয়া—কি উপায়ে জানিনা—জমিদারের কোপ শান্তি করিয়া আসিলেন।

চার পাঁচ মাস পরে মেজদিদির কাছে শুনিলাম, কলিকাতায় নাকি স্বামীর একটা ভাল চাকরীর যোগাড় হইয়াছে। বড় ভাসুরের ইচ্ছা তিনি কলিকাতায় যান। নিশ্চিত বুঝিলাম, তিনি কলিকাতায় যাইবেন। দাদাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনিতো চলিতে জানেন না। তাঁহার কলিকাতা যাওয়া যখন স্থির হইল, তখন ক'দিন ধরিয়া দিদি তাঁহার প্রিয় খাদ্যগুলি অত্যন্ত আগ্রহে রান্না করিতে লাগিলেন। অবশেষে কলিকাতা যাওয়ার দিন আসিল। যাত্রাকালে স্বামী যখন দিদিকে প্রণাম করিলেন, তখন তিনি তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া "সুখে থাক ভাই আমার, আমার মাথায় যত চুল, তত তোমার পরমায়ু হো'ক" বলিতে বলিতে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

স্বামীর পৌঁছানর খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত দিদির মুখে আর হাসি দেখি নাই।

(৭)

একমাস পরের কথা বলিতেছি। সেদিন দাদার চিঠিতে মা'র জ্বরের খবর পাইয়া মনটা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মাকে দেখিবার ব্যগ্র ইচ্ছা কোনমতেই শান্ত করিতে পারিতেছিলাম না। কেমন করিয়াই বা পারিব? সেই একটা যায়গা ছাড়া প্রাণের নিবিড় যোগ আরতো কোথাও নাই।

দিদিকে বলিলাম, "দিদি, মাকে একবার দেখতে যেতে চাই। দাদা লিখেছেন, মা'র জ্বর হয়েছে।"

দিদি তখন তরঙ্গিনীর সঙ্গে দশ পঁচিশ খেলিতেছিলেন, আমার কথা তাঁহার কাণে গেল না। সুতরাং আমাকে পুনরাবৃত্তি করিতে হইল। এবার দিদি বলিলেন, "জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে! এখন কি তোমায় সেই মেদিনীপুরে পাঠাতে পারি?"

দাদা তখন মেদিনীপুরে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌, মা ও বৌদিদি তাঁহার সঙ্গে।

আমি বলিলাম, "অনেকদিন মাকে দেখিনি, বড় দেখতে ইচ্ছা করছে। আপনি বলুন, কাকা আমায় মেদিনীপুর রেখে আসবেন।"

আমার কথা শুনিয়া প্রতিবাসিনী তরঙ্গিনী যেন বিস্ময়ের আতিশয্যে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "তুমি কেমন ধারা জেদী বৌ গা! বড় জা, ঘরের গিন্নি বারণ করছে, তবু যেতে চাচ্ছ?"

দিদি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "জেদী নয় তরু, তবে একটু আদুরে বটে। আমাদের সকলের ছোট কিনা, বাপের বাড়ীও যথেষ্ট আদর পেয়েছে।"

কিন্তু তরঙ্গিনী চলিয়া গেলে চাপা গলায় তর্জ্জন করিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি কি বারণ শোনবার মেয়ে? ইচ্ছা হয়েছিল, চলে যেতে; কে তোমায় ধরে রাখত! তরঙ্গিনীর সামনে কেন আমায় অপদস্থ করলে?"

দুঃসহ রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। বৌদের কোন কথা বলিবারও অধিকার নাই? তাহারা জেলের কয়েদী নাকি? সেই দিনই আমি কাকাকে চিঠি লিখিলাম। তিনি আসিয়া আমাকে দাদার কাছে লইয়া গেলেন। আসিবার সময় দিদির বিধি-নিষেধ কিছুই পাই নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় বাড়ীর কেহই আমাকে বারণ করে নাই!

কাকা মাকে বলিলেন, "রেবার বড় জা'র মত লক্ষ্মী মেয়ে আমি দেখিনি। দু'দিন কি সেবা যত্নই আমাকে করেছেন!"

শুধু কি আমার সঙ্গেই কুক্ষণে দিদির দেখা হইয়াছিল?

বৌদিদি ডাকিল, "ঠাকুরঝি, চা খাবে এস।"

আমি বলিলাম, "না, আমি ও ছেড়ে দিয়েছি।"

"পাওনি, তাই এতদিন খাওনি। ছেড়ে দেওয়া আবার কি?"

"না, আমি খাবনা। আমার শ্বশুর বাড়ীর কেউ খায়না।"

"পাড়া গাঁয় থাক্‌তে থাক্‌তে একেবারে বুনো হয়ে গেছ দেখছি!"

আমার বৌদিদি কলিকাতার এক নামজাদা ডাক্তারের মেয়ে।

কয়েকদিন পরে মুনসেফ বাবুর বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ পাইলাম। অনেকক্ষণ বসিয়া বৌদিদির চুল বাঁধিলাম। খোপার আধুনিক সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া বৌদিদি হাসিয়া বলিল, "বাঃ, বেশ হয়েছে। বুনো হ'লেও পূর্ব্ব সংস্কার তোমার লুপ্ত হয়নি দেখছি।"

নিজের ঘরে যাইয়া সাজসজ্জা করিলাম। মায়ের দেওয়া অনেক সুন্দর কাপড়, ব্লাউজ, জ্যাকেট প্রভৃতি ছিল। কিন্তু আমার কেমন একটা নূতন সখ হইল। আমি সাদাসিধা সেমিজটির উপর মেজ ভাসুরের দেওয়া চওড়া লালপেড়ে এক খানা আটপৌরে কাপড় পরিলাম। পল্লীবধূদের মত চুল বাঁধিয়া সীমন্তে বেশ করিয়া সিন্দূর দিলাম। বৌদিদি আমার সজ্জা দেখিয়া একচোট হাসিয়া লইল। বলিল, "শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণীর যোগ্য বেশভূষাই হয়েছে বটে।" তারপর আমার বেশভূষার সংস্কার সাধনের জন্য জেদ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা শুনিলাম না। বৌদিদির জেদে একটা অজ্ঞাত গরিমায় আমার বুক ভরিয়া উঠিল।

দাদার কাছে মাসদুই থাকিলাম। বাবার কাছে যেমন সৌখিন ব্যবস্থা ছিল, এখানেও তাই আছে। কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেছিলাম, এই আরাম ভোগ করিবার মত মনের গঠন আর আমার নাই। পল্লী

জীবনেও আমি যুক্ত হইতে পারিলাম না, সহরের সঙ্গেও আমার পূর্ণযোগ রহিল না। সত্যই কি আমি কক্ষভ্রষ্ট গ্রহ?

সস্ত্রীক দাদার স্নেহাদর প্রাচুর্য্য আমাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। স্নেহাদ্রর্তার আতিশয্যে আমার মনে হইত, যেন তাঁহাদের নির্ব্বাক্‌ভাষা আমাকে বলে, "আহা, সেখানে তোমাকে কতই কষ্ট পাইতে হয়!" আমারই কল্পনা প্রসূত আমার নবাগত অনুভূতিটা আমার অন্তরের গভীর সুপ্ত আচ্ছন্ন পত্নীত্ববোধকে প্রবল ধাক্কা দিয়া সজাগ করিয়া দিল।

মা'র হাজার নিষেধ সত্ত্বেও আমি রোজ মা'র জন্য নিরামিষ রান্না করিতাম। সেদিনও রান্না করিতেছিলাম। বৌদিদি আসিয়া বলিল, "এই নাও গো তোমার চিঠি।"

চিঠি দেখিয়াই স্বামীর হস্তাক্ষর চিনিলাম। তাঁহার নিজের কুশল জ্ঞাপন এবং আমার কুশল জিজ্ঞাসা ছাড়া চিঠিতে আর কিছু থাকিবে না, জানিতাম, তাই তেমন আগ্রহে চিঠি লইলাম না, দেখিয়া বৌদিদি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। হাতের কাজ শেষ করিয়া চিঠি খুলিলাম। লিখিয়াছেন, "বৌদিদির চিঠিতে জানিলাম, তুমি না কি তাঁহার অনিচ্ছায় মেদিনীপুরে গিয়াছ। কাজটা ভাল কর নাই। তিনি আমাকে সোদরাধিক স্নেহ করেন। তাঁহার চিরকালের সাধ ছিল, তিনি নিজে দেখিয়া পছন্দ করিয়া আমার স্ত্রী নির্ব্বাচন করিবেন। এই সাধ কত দিন তিনি মা'র কাছে ও আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিবাহটা তাঁহার ইচ্ছা ও অনুমতির কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়াই হইয়া গিয়াছে। এই ব্যথা তিনি এখনো সামলাইতে পারেন নাই, সেই ব্যথাটাই রুক্ষ আচরণ রূপে মাঝে মাঝে তোমার কাছে ধরা দেয়। তাঁহার উপরটা এখন যাই হোক্, ভিতরটা যে কত সুন্দর, তা তুমি নিজেই একদিন বুঝিতে পারিবে।

"পিতৃগৃহে তুমি যে আবেষ্টনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছ, পল্লীগৃহ ঠিক তাহার বিপরীত হইলেও আমি তোমার বা আমার ভাগ্যের নিন্দা করি না। কারণ যাঁহার ইচ্ছায় আমরা অচিন্ত্যনীয় রূপে মিলিত হইয়াছি, তিনি মঙ্গলময়। এই মিলন হইতে মহৎ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। তোমার প্রতি যে আমার স্নেহ, তাহা একদিন তোমার চোখের অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তুলিবে এবং তোমার বুদ্ধি ও শিক্ষা তোমাকে আমাদের পরিবারের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে যুক্ত করিয়া দিবে। আমি সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

আমি যাইয়া তোমাকে লইয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাতে বৌদিদি আরও বেশী রাগ করিবেন। তুমি কাকার সঙ্গে চলিয়া আসিতে চেষ্টা করিবে। আমি দোল পূর্ণিমার দিন বাড়ী যাইব। সেই দিন তোমাকে পাইলে সুখী হইব।"

সেদিন স্বামীর আড়ম্বর হীন আহ্বান বাণী অরুণালোকের মত আমার চিত্তের মুকুলিত দলগুলি যেন অকস্মাৎ মেলিয়া দিল। 'তোমার প্রতি যে আমার স্নেহ' তাঁহার এই কথাটা অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার মত আমার কাণে বাজিতে লাগিল।

(৮)

আমাদের গাড়ী যাইয়া বাড়ীর দরজায় থামিল, চৈত্রের স্তব্ধ মধ্যাহ্নে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। মধ্যাহ্নের প্রখর রুদ্ররূপে বসন্তের একতিল স্নিগ্ধতাও ছিল না। যেন আসন্ন প্রলয়ের অগ্নিমূর্ত্তি।

কাকা গাড়ী হইতে নামিয়া বলিলেন, "বাড়ীতে কারু সাড়া পাচ্ছিনে তো!"

তাই ত! গাড়ীর শব্দ শুনিয়া বাড়ীর ছেলে মেয়েরা ছুটিয়া আসিল না কেন? ব্যাপারখানা কি? কেমন একটা অজ্ঞাত শঙ্কায় চকিতে আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। দ্রুত পদে বাড়ী ঢুকিয়া আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইতেই দিদি ও খুড়িমা ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন, তাঁহাদের আর্ত্ত চীৎকারের মধ্যে স্বামীর নাম শুনিয়াই আমার মূর্চ্ছাতুর শিথিল দেহ দিদির বাহুবেষ্টনের মধ্যে লুটাইয়া পড়িল।

তারপর কয়েক দিনের কথা আমার কিছুই মনে নাই। মাঝে মাঝে যেন স্বপ্নাবেশের মধ্যে দেখিয়াছি, দিদির সজল চক্ষু দু'টি নিমেষহারা হইয়া আমার মুখ পানে চাহিয়া আছে।

ক্রমে ক্রমে শুনিলাম, স্বামী তাঁহার কোন বন্ধুর পল্লীগৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে খরস্রোতা নদী মধ্যে পতিত কোন বালককে তুলিতে যাইয়া নিজেই এক আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যান, আর উঠিতে পারেন নাই।

আজ কেউ বা আমার ভাগ্যের নিন্দা করে, আর কেউ বা আমার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। লোকগুলি কি বোকা! ওরা জানে না যে, মৃত্যু গোপনে আমাকে অমৃতের অক্ষয় ভাণ্ড দান করিয়া গিয়াছে। দীনতার অভিমানে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাই বুঝি নাই, তাঁহাকে কত ভালবাসি। আজ সে অভিমানের আবরণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ প্রেমের অমৃতবন্যা বেদনাকে ছাপাইয়া উঠিতেছে যে। ভালবাসায় কত সুখ, ওরা তা জানে না। তাই আমার জন্য দুঃখ করে।

সে দিন দিদি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিলেন, "পড়ে দেখ রেবা, ছোট ঠাকুরপো তার বন্ধু ভবতোষকে লিখে রেখেছিল, তাকে দেয় নি বোধ হয়। তার একটা বইয়ের মধ্যে চিঠিটা পেয়েছি।" চিঠি খুলিয়া পড়িলাম, তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখিয়াছেন, "তুমি লিখিয়াছ, রূপ প্রেমের জনক। কিন্তু সর্বত্র তা নয়। তুমি তোমার রূপসী স্ত্রীটিকে যেরকম ভাল বাস, আমি আমার ক্ষীণ কায়া শ্যামবর্ণা স্ত্রীটিকে তার চেয়ে কম ভাল বাসি না। সত্য, আমার জীবনের একটা দিক রেবা মিষ্ট ও পূর্ণ করিয়াই তুলিয়াছে।"

দিদি চলিয়া গেলে তরুণ জীবনের সমগ্র আগ্রহ দিয়া চিঠিখানা চুম্বন করিলাম। কিন্তু বিস্মিত হইলাম না। ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? আমরা যে জন্মে জন্মে দু'জন দু'জনকে এমনি ভালবাসিয়া, এমনি করিয়াই হাসিকান্নায়, বেদনায় আনন্দে মাধুর্য্য গড়িয়া তুলিয়াছি।

লোকে বলে, তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মরণের কি শক্তি যে, তাঁহার ও আমার মধ্যে ব্যবধান রচনা করে? কে আমার অবিচল প্রীতি হইতে তাঁহাকে কাড়িয়া লইতে পারে? নদী জলের গভীরতা আমার অন্তরের গভীরতা হইতে বেশী নয় যে, তাঁহাকে তলাইয়া ফেলিতে পারে। তিনি নিশ্চয়ই এক দোল পূর্ণিমায় আমার কাছে আসিবেন। তিনি যে মিথ্যা কথা বলেন না। এতদিন তাঁহার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা জানিতে চাহি নাই। কিন্তু আজ তাঁহার প্রত্যেক ইচ্ছা পালনের জন্যই আমার দেহ একান্ত উন্মুখ হইয়া আছে। দু'তিনটা দোল পূর্ণিমা আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। তা যাক্। আমি শত পূর্ণিমা এমনি অশ্রান্ত আগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিব।

আজও তো সেই দোল পূর্ণিমা! গলানো রূপার মত চাঁদের আলো গায় মাখিয়া শ্যামা পৃথিবী হাসিতেছে। ফুলে মুকুলে, লতায় পাতায়, আলোর কি শোভা আভরণ! মুকুলিত আম ও পুষ্পিত বকুল গাছের ছায়া দীঘির মৃদু কম্পিত কালো জলে পড়িয়া আলো ছায়ায় কি বিচিত্র ছবিই আঁকিয়াছে। আবেশ মত্ত দক্ষিণ বায়ু দেহ মনে একটা সুখময় বেদনার শিহরণ তুলিতেছে। সেই শিহরণে ঘুম ঘোরেই দু'একটা পাখী ডাকিয়া উঠিতেছে। কি মিষ্ট আবেগ ভরা সে ডাক! রূপ-রস-শব্দ গন্ধ ভরা বাসন্তী রজনী নব প্রাণ স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে।

এমনি একটি রাত্রে, ফুটন্ত সুরভি ফুলের বিচিত্র বর্ণ-লীলার মধ্যে, জ্যোৎস্নাধৌত লতাপাতার সতেজ স্নিগ্ধ শ্যামলিমার মধ্যে, আমার মুগ্ধ হৃদয়ের পুঞ্জীভূত আগ্রহ ও মৌন আহ্বান গীতির মধ্যে তিনি আসিবেন। আমার ইহকালের ধ্যেয়, লোকান্তরের আনন্দ, একদিন আসিবেন। পূর্ণিমার আলোকে দীপ্ততর করিয়া তিনি আসিয়া আমার পূজা অর্ঘ্য গ্রহণ করিবেন। তাঁহার রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ গন্ধ-স্মৃতি ঘেরা তাঁহারই গৃহে, তাঁহার পায়ের ধূলির মধ্যে থাকিয়া সেই দিনটির প্রতীক্ষা করিতেছি। কি করিয়া দাদার কাছে যাই বল?

আমি ভালই আছি, তুমি কেমন আছ? আমার ভাল-বাসা নিয়ো। ইতি—

তোমাদের—

রেবা।

আহুতি

(উপন্যাস)

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

(১)

সুদূর পশ্চিম হইতে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া দেশে আসিয়াই যখন বিপিন বাবু চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিলেন তখন তাঁহার বিধবা পত্নী, বালবিধবা কন্যা মালতীকে নিয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। দেশে জমি জমা যাহা কিছু আছে এবং নগদ টাকা কড়ি ও স্বামী যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দুই জনের পক্ষে যথেষ্ট বটে, কিন্তু এসব তত্ত্বাবধান করে কে? বহু দিন বিদেশে থাকিয়া দেশের আচার ব্যবহার প্রায় কিছুই মনে নাই, আত্মীয় স্বজনও গ্রামে কেহই নাই। নানা রকমে নানাভাবে লোকে তাঁহাদের সম্বন্ধে কত কথাই বলিতে লাগিল।

শোকদগ্ধ প্রাণে কন্যাকে লইয়া অন্নপূর্ণা দেবী বহুদিন নীরবে ঘরের কোণে বসিয়া সকলই সহ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে নানারকম উৎপাত যখন অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখনই তিনি কন্যার হাত ধরিয়া তাঁহার বাল্যসখী জমিদার—গৃহিণীর কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন!

সদাশয় বলিয়া জমিদার বাবুর গ্রামে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। খাজনা আদায় সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়া হইলেও, কত অনাথ বিপন্ন যে তাঁহার দয়ায় দিনরাত উদ্ধার হইয়া যাইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। অন্নপূর্ণা দেবীও তাঁহার দয়ায় উদ্ধার পাইয়া বাঁচিলেন। তাঁহার জমি জমা দেখা এবং মাঝে মাঝে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়া জমিদার বাবু তাঁহাদের অভয় প্রদান করিলেন।

দরিদ্রের ঘরের মাণিকটীরই মত জননীর কোলে কোলে চোখে চোখে কিশোরী মালতী বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। একদণ্ড সে চোখের আড়াল হইলে জননীর অসোয়াস্তির আর সীমা থাকিত না। সুন্দর কুসুমেই কীট প্রবেশ করে,—কন্যার এতরূপ, এত বুদ্ধি—সহায়হীনা জননীর মনে হইত, দুঃখিনীর এত রূপ কেন? ভগবান তাহার অজ্ঞাতে তাহার সকল সুখই যদি হরণ করিলেন, তবে এমন তরল বুদ্ধি, এমন চঞ্চলচিত্ত দিলেন কেন? ইহাকে কি একটা কালো কুৎসিত, বোকা করিয়া সৃজন করা যাইত না? আজ যদি ইহারাই কালসর্প হইয়া উহাকে দংশন করে, তবে তার বিষের জ্বালা ভোগ করিবে ত এই দুঃখিনী জননী!

পাড়ার ছোট ছোট মেয়েরা আসিয়া মালতীর সঙ্গে খেলা করিত, গল্প করিত, কিন্তু মালতী কখনও বাড়ী ছাড়িয়া তাহাদের সঙ্গে অন্যত্র যাইতে পারিত না। পাড়ার ছোট ছোট বৌদের সঙ্গে পুকুর ঘাটে কিম্বা অন্য কোথাও দেখা হইলে মা কখনও তাহাদের সঙ্গে বেশী কথা বলিতে দিতেন না। কন্যার অসংখ্য আব্দার রক্ষা করিলেও এমনই কঠিন শাসনের শৃঙ্খলে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, যে কখনও অবাধ্য হইবার যোটি তাহার ছিল না। এমনই করিয়া মাতার কঠোর শাসন এবং অসীম স্নেহে কুমারী বালিকার মতই বেশ-ভূষায় এবং শিক্ষায় মালতী ক্রমে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পাড়ার গৃহিণীরা অন্নপূর্ণাদেবীর এই সব ম্লেচ্ছ আচরণে ঘৃণায় তাঁহার বাড়ীর ত্রিসীমা-নাতেও কখন পা দিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের নানারকমের তীব্র আলোচনা মালতী কিংবা অন্নপূর্ণাদেবীর কানে কখনও প্রবেশ করিত না, মালতী তাই, আপন দুর্ভাগ্যের কথা কখনও শুনিতে পায় নাই।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর, জমিদার গৃহিণীর প্রেরিত ঝির সঙ্গে অন্নপূর্ণাদেবী কন্যাকে নিয়া সেখানে যাইতেন। মালতীর সুন্দর মুখখানি এবং টোলখাওয়া গাল দুটির হাসিটুকু জমিদার গৃহিণীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁহার কন্যা নাই, সবে-ধন নীলমণি একটী মাত্র পুত্র, তাঁহার কল্পনা-প্রিয় মন মাঝে মাঝে পুত্রের পাশে মালতীকে বসাইয়া তৃপ্ত হইত। কিন্তু, কত বড় দুর্ভাগ্য যে ইহাদের মাঝখানে সমুদ্র প্রায় ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে কথা ভাবিতে মন তাঁহার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত, তিনি সখীকে তিরস্কার করিয়া কহিতেন, "কি সুখ দেখবার জন্যে এই দুধের শিশুর বিয়ে দিয়েছিলে ভাই?" কন্যার মাও চোখের জল মুছিয়া ভাবিতেন, "তাই ত, কেন দিয়াছিলাম?—যে দাদাশ্বশুরের অন্তিম বাসনা মিটাইবার জন্য শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই বিবাহ হইয়াছিল, আজ কি তিনি স্বর্গ হইতে প্রপৌত্রীর এই দুর্ভাগ্য দেখিয়া অনুতপ্ত হইতেছেন না?"

(২)

সাধারণতঃ যে বয়সে মেয়েরা পুতুল খেলা পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে জড়পুতুলিটী সাজিয়া শ্বশুর ঘর করিতে যায়, মালতীর সেই বয়সেও ফ্রক্ পরা ঘোচে নাই। সংসার লইয়া উহাকে কোনদিন খেলা করিতে হইবে না জানিয়াই বোধ হয়, জননী ইহার পুতুলখেলা সহজে ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিতেন না। তাঁহার মনে হইত এমনি করিয়া ছোট্ট

শিশুটীর মতই ইহাকে রাখিতে পারিলে, বুঝিবা কিশোর যৌবনের ছাপটুকুও ইহার অন্তরখানি স্পর্শ করিতে পারিবে না, যে বয়সের বাসন্তী-নেশায় এক রঙীন আশা কুমারীর অন্তর মন প্লাবিত করিয়া সংগোপনে বহিয়া যায়, শিশুর বেশে রাখিলে, শিশুর মতই প্রতিপালন করিয়া তুলিলে, ইহার মনে বুঝিবা বয়সের সে প্রভাবটুকু আর আধিপত্য করিতে পারিবে না, তাহাকে উহার ব্যর্থতার করাল-মূর্ত্তি দেখাইয়া কি লাভ ? তাই মা কন্যাকে শিশুর বেশে রাখিয়া অন্তরে বাহিরে তাহাকে শিশু করিয়াই রাখিতে চাহিতেন।

পাড়ায় বকুল-তলায় সেবারে যখন বারোয়ারী কালীপূজায় মহাসমারোহে 'মানভঞ্জন' যাত্রার পালা আরম্ভ হইল, তখন হরিমতিঝির কাছে তাহার বর্ণনা শুনিয়া মালতী যাত্রায় যাইবার জন্য মাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। মা বলিলেন—ছিঃ মিলু, ওসব দেখতে নেই। কত দেশের, কত রাজ্যের কত লোক, কত দোকানী টোকানী, কত রকম মুটে মজুর, কত সব বাজে লোক এসে ওখানে বসে,—তাদের পাশে গিয়ে কি করে তুমি বসবে বল ত! ছিঃ মা, ও সব জায়গায় কি ভদ্দর ঘরের মেয়েদের যেতে আছে ?

মালতী বলিল, বাঃ, তবে যে কালকে দেখলুম, ওদের বাড়ীর টেঁপিরা যাচ্ছে, বেলারা গেল, তাদের মা দিদিরাশুদ্ধু সবাই ত গেল,—তুমিই খালি মা, নিজেও কোথাও যাবে না, আমায় শুদ্ধ আট্‌কে রাখ্‌বে।

মা বলিলেন, তা যাক্‌ ওরা। আমি বাপু ও সব নোংরা জায়গায় গিয়ে বস্‌তে পারব না—তা তোর ইচ্ছে হয় ত যা না তুই। ঐ যে গোয়ালা-বউ যাচ্ছে, যাবি ওর সঙ্গে ? ডেকে দেবো ?"

মা জানিতেন, কন্যাকে নিবৃত্ত করিতে ইহাই প্রকৃষ্ট ঔষধ! মালতী রাগ করিয়া, গাল ফুলাইয়া, পাশের ঘরে গিয়া খাটে শুইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর মা কন্যাকে খাইতে ডাকিলেন, দুঃখে অভিমানে এতক্ষণে মালতীর অশ্রুসাগরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবাহ বহিয়া চলিল, মা আদর করিয়া বলিলেন, 'ছিঃ মা, কি এক বাজে যাত্রার পালা, তাই দেখতে না পেয়ে তোমার এত কান্না ? ছিঃ—তার চেয়ে কাল চলো তোমার মাসীমার বাড়ী, কি চমৎকার একজন ওস্তাদ এসেচে, কি সুন্দর সে বাজায়, গায়—শুনিয়ে আনব'খন। তোমার মাসীমা তোমায় নিয়ে যেতে বলেছেন—যাবে ত মণি ?"

চোখে জল, ঠোঁটে হাসি, শিশুপ্রকৃতি মালতী নতুন উৎসাহে মার বুকে মুখ লুকাইল।

পরদিন জমিদার বাড়ীতে ওস্তাদের গান বাজনা শুনিয়া মাতাপুত্রীতে যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। মালতীর মন তখন মাসীমার প্রকাণ্ড বাড়ীর জমকালো শোভায় গীতবাদ্যের মধুর নেশায় ভরপুর। মা আহ্নিক করিতে বসিলে মালতী দালানের কোণে বৃদ্ধা দাসী হরিমতির পাশে যাইয়া বসিল। হরিমতি তখন জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া জাগ্রতেই কল্যকার যাত্রার স্বপ্ন দেখিতেছিল, মালতী তাহাকে ধাক্কা দিয়া হাসিয়া বলিল 'মাসী, গল্প বল্‌।'

কিসের গল্প ? উপকথা ?

না, তোর সেই যাত্রার গল্প বল্‌, সেই যে কি বল্‌ছিলি কাল রাধাকেষ্টর কথা ?

সম্মুখে বিস্তীর্ণ উঠান ব্যাপিয়া জ্যোৎস্নারাণীর শুভ্র অমল বিছানো শয্যাখানি,—এককোণে তুলসীতলায় একটি ম্লান প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে। আঙ্গিনার ঠিক নিম্নেই রজনীগন্ধার গাছটা যৌবনের জোয়ারে ফুল্ল হইয়া হাসিতেছে। হরিমতি তাহার স্বভাব সুলভ মনোরম ভঙ্গীতে মালতীর মনটা পূর্ণ অধিকার করিয়া তাহার রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গল্প ফাঁদিয়া বসিল। অদূরে ঠাকুর ঘর হইতে ধীরে ধীরে মৃদুভাবে ধূপধুনার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল, মালতী অন্তরে বাহিরে একটা পুলকস্পন্দন অনুভব করিয়া স্তব্ধ হইয়া রাধাকৃষ্ণের ভালবাসার কাহিনী শুনিতে লাগিল। সারাটী রাত্রি সেদিন সে আর ঘুমাইতে পারিল না। প্রাণ তাহার মদিরা রসে মাতাল হইয়া উঠিল। মাসী বলিয়াছিল 'রাধাটী মা তোরই মতন এমনি ফুটফুটে, বয়সে হয় ত বা একটু ডাগর হোতেও পারে, কিন্তু কি সুন্দর গলা তার বাছা, কি মিষ্টি গান! একখানা নীলাম্বরী সাড়ী পরে, ফুলের গয়নায় কি সুন্দরই তাকে দেখাচ্ছিল মিলু। তোর মায়ের বাছা, কি বিলিতি ঢং, বুড়ো মেয়েকে এখনো ফ্রক পরিয়ে রেখেছে,—ভাল দেখায় কি ? ছিঃ, এবার থেকে তুই বাছা সাড়ী পরিস্‌।"

বলা বাহুল্য, হরিমতি মালতীর বৈধব্যের কথা জানিত না। কিন্তু এমনি করিয়া দিনের পর দিন গল্পে উপকথায় মালতী আপনার সৌন্দর্য্যেরই ব্যাখ্যা শুনিয়া শুনিয়া আপনাকে দেখিতে, বুঝিতে, ভাবিতে শিখিল।

ঘুরিয়া ফিরিয়া বর্ষের পর বর্ষ মালতীর কিশোর দেহে যৌবনের ছাপ দিয়া যাইতে লাগিল। মাতাও কন্যাকে লইয়া ক্রমশঃ ঘরের আরও কোণে আশ্রয় লইলেন, এবং মাঝে মাঝে রামায়ণ মহাভারত নিয়া বসিয়া, সেই অতীতকালের কথায় কন্যাকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহিতেন। মালতী মায়ের এই অতিশয় সতর্কতার কারণ বুঝিত না, তাই, তাহার সমস্ত কাজেই সে একটা গভীর রহস্য প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইত।

ক্রমশঃ

বাহবা

(চিত্র)

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

পল্লীগ্রামে বারোয়ারি। যাত্রা-গান হইবে।

বায়না হইয়াছিল, রায় কোম্পানীর। রায় কোম্পানী নাম করিয়াছে, পয়সা করিয়াছে, কথার খেলাপ করিতে শিখিয়াছে, বায়না কাটিয়া ফেলিল। দুই তিন দিন আগে খবর পাঠাইল, এ সপ্তাহে তাহারা গাহিতে পারিবে না; পর সপ্তাহে পারে। পাঁচ মাথা এক হইল, বারোয়ারীর পাণ্ডারা শিবতলায় মিটিং বসাইয়া রায় দিলেন, আগামী সপ্তাহেই হোক। আগামী সপ্তাহও আসিয়া পড়িল, যাত্রার দল আসিল না। আটচালার চালা উঠিল, পাখা ঝুলিল; লাল-নীল কাগজের শিকল উড়িল ও ছিঁড়িল; গ্যাসের আলো দুলিল; পাণ্ডা মহাশয়দিগের গলা সপ্তমে উঠিল ও ভাঙ্গিয়া পড়িল; সব হইল, কেবল দল আসিল না। ভগ্নদূত খবর দিল, কটাস্! বায়না কাটিয়া গিয়াছে।

পাণ্ডাদের চক্ষু আরক্ত হইল; কাঁধের গামছা ঘামে ভিজিয়া উঠিল, মোকদমা করেন কিম্বা রায় কোম্পানীর দলের কর্ত্তাদের মাথাটাই কাটিয়া আনেন, পরামর্শ চলিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল; কোন সিদ্ধান্তই হইল না। যাত্রার দল যদিচ এই একটাই নয় কিন্তু এমন মন-মজানো, প্রাণ-মাতানো গান আর কোন দলই গাহিতে পারে না। বৎসরে একটিবারমাত্র এই বারোয়ারির উৎসব আয়োজন; দশখানা গ্রামের লোক যে রায় কোম্পানীর গান শুনিবার জন্যই হাঁ করিয়া দিন গণিয়া থাকে।

সেই ত হইয়াছে কাল। সর্ব্বত্রই যে এই এক ব্যাপার। বাঙ্গলাময় যে রায় কোম্পানীকেই চায়। আর তাহাতেই ত রায় কোম্পানীর অধিকারী নীলকণ্ঠ রায় মহাশয়ের এত অর্থ, এত প্রতিপত্তি! এত অহঙ্কার! কিন্তু আর ত সওয়া যায় না। বার-বার এমন করিয়া অপমান সহিলে যে গ্রামের দুর্ণাম রটিয়া যাইবে। লোকে বলিবে, হেলায় শ্রদ্ধায় যখন আসে, তখনই ভাল। রায় কোম্পানীও বলিবে আমরা ছাড়া ইহাদের গতি নাই যখন, তখন যখন-খুসী যাইব। এ কথা নিশ্চয়ই ভাল নহে। পাণ্ডা মহাশয়গণ একবাক্যে স্থির করিলেন, তদ্দণ্ডেই একজন লোক কলিকাতায় রওনা হোক, একটা দল বায়না করিয়া আজই ফিরিয়া আসুক। কাল সন্ধ্যায় গান নামান চাই-ই। সহরে যাওয়া, বিপদ-আপদ কাটাইয়া, ট্যাক ও জামার পকেট বাঁচাইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া, কাজ সারিয়া ফিরিতে পারে, পাণ্ডাগণের মধ্যে একটি লোকই তেমন ছিলেন। নামটি তাঁহার আমরা বলিব না, কারণ তাঁহার খেতাবেই তিনি সু-পরিচিত। চক্কোত্তী ঠাকুর বলিলেই তাঁহাকে বুঝিতে ও জানিতে পারা যায়। চক্কোত্তী ঠাকুরকে রূপকথার রাজার মত এ প্রতিজ্ঞাও করাইয়া লওয়া হইল, প্রথম প্রভাতে যাহাকে দেখিব, এ 'কন্যা' তাহাকেই দান করিব। অর্থাৎ, ভালমন্দ বাছিব না, দল একটা ঠিক করিয়া আসিবই।

দলের নামটা অকুল কাণ্ডারীর দল। মতি রায়ের দল, শ্রীচরণ ভাণ্ডারীর দল, যাদব বাঁড়ুয্যের দল, মথুর সাহার দল যেমন, অকুল কাণ্ডারীর দলও তেমনই। দলের অধিকারী মহাশয় স্পষ্টই বলিয়া দিলেন, বায়না করিয়া না যাওয়া অভদ্রতা, বায়না কাটা ততোধিক অভদ্রতা। তিনি সেরূপ অভদ্র নহেন। বরং একদিন আগে গিয়া বসিয়া থাকিবেন, তবুও অভদ্রতা করিবেন না। আগে যাইয়া বসিয়া থাকা প্রস্তাবটা চক্কোত্তী মহাশয় অনুমোদন করিতে অক্ষম হইয় পড়িলেন। অধিকারী মহাশয়ের ভদ্রতাজ্ঞানের পরিচয়টা এত মূল্যবান নহে, যার জন্য একটা পুরা দিনরাত্রি শত-খানেক কৃষ্ণের জীবকে অন্ন ধ্বংসাইবার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। স্থির হইল, তাঁহারা পরদিন সকালের গাড়ীতেই যাত্রা করিয়া, নাগাদ বেলা বারটা রুকুশপুরে পৌঁছিবেন। আহারাদি করিয়া ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করিয়া গান নামান হইবে।

চক্কোত্তী মহাশয় রাত আটটার গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। শিব-তলায় তখন পঞ্চাশজন মাতব্বর বসিয়া। অকূল কাণ্ডারী যদিও অকূলে কূল দিয়াছেন, তবুও ব্যবস্থাটা কাহারই মনঃপূত হইল না।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাক্‌বিতণ্ডা চলিয়া, অকূলকে সত্য সত্যই অকূলে প্রেরণ করা যায় কি-না তাহারই পরামর্শ হইল কিন্তু গ্রামবাসীর অধীরতা কল্পনা করিয়া, বার-বার দিন ফেরাফেরি করিতে কাহারই প্রবৃত্তি হইল না! উপরন্তু চক্কোত্তী মহাশয় যখন বলিলেন, যদিও তাহাদের সহিত দুই রাত্রির বন্দোবস্ত, তাহা হইলেও এমন কথারও উল্লেখ আছে যে প্রথম রাত্রির গান যদি ভাল না হয়, এক রাত্রির টাকা দিয়াই তাহাদের বিদায় করিতে পারা যাইবে; তখন, একটা রাত্রি দেখা যাক্, তারপর যাহা হয় হইবে, মনকে এইরূপ সান্ত্বনা প্রদান করিয়া মাতব্বরগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। বলা উচিৎ, সে রাত্রে সুনিদ্রা সে তল্লাটের নরনারীর চক্ষুপল্লব স্পর্শ করিল না। 'আয়' কোম্পানীর ভীম 'আগিলে' কি 'অকম' 'আজা' হইয়া যায়; তাহাদের শ্রী'আধিকা'টি সত্যিকারের শ্রী'আধিকার' মত কেমন সাজগোজ করিয়া আসে; তাহাদের বালকদের গোঁফ দাড়ী সত্ত্বেও কি সুন্দর মানায়—মনশ্চক্ষে এই দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে ও আলোচনা করিতে করিতেই বিভাবরী বিগত হইল।

বেলা ১০টা বাজিয়াছে। "ওরে সাজের গাড়ীর বাক্স নামা রে," "আখালকে বল্ ওনাদের সব 'আইচরণের' চণ্ডী মণ্ডপে এথে আস্থক," "লক্ষ্মীকান্তকে বল্ ভাঁড়ার খুলে ওনাদের 'অম্‌ইকর' বামুনকে জিনিষপত্তর বের করে দিক্—" ধ্বনি উঠিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই, সবস্ত্র বিবস্ত্র বালক বালিকার দল বারোয়ারী তলায় আসিয়া জুটিল। সহর-বাসীরা তখনকার অবস্থাটা হয়ত ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। সে এক মহা সমারোহ ব্যাপার! কুলবধূরা গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, বেড়ার ফাঁকে দাঁড়াইয়া লাজবর্ষণ করিতেছে; কিঞ্চিৎ বয়স্কারা একেবারে রাস্তাতেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; পুরুষদের ত কথাই নাই—দলের লোকের চুলছাঁটা হইতে সুরু করিয়া জুতার গোড়ালী পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। তাঁহাদের সেই ক্ষুর-কর্ত্তিত মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ, গুলবাগান ছিটের সার্ট, দন্তপিষ্ট কলোম্বিয়া সিগারেট, হরেক রকম পাড়ের কাপড়, পম্পস্থ, কোর্ট স্থ, ক্যানভাস, ক্রোম, মায় ভেজিটেবল্ স্থ, সবই বিস্ময়কর। গমন ভঙ্গিই বা কি বিচিত্র! আমার সহরের পাঠিকা সুন্দরী, আপনি কি জলাশয়ে মরাল সন্তরণ দেখিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন, মনে করুন, সেই দৃশ্য! একটি আধটি নয়, কম-বেশী পঞ্চাশটি মরাল মরাল-গমনে চলিয়াছেন। গঞ্জিকারক্ত চক্ষুগুলি ঢুলু ঢুলু করিতেছে, হাওয়ায় দেড়-বিঘত পরিমাণ কেশরগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া কৃষ্ণ-বদনগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে, অত্যন্ত বিরক্তি অবজ্ঞাভরে তাঁহারা মাঝে মাঝে চুলগুলিকে সরাইয়া দিতেছেন; মেঘমুক্ত শশধর প্রকাশ না হোক, তাঁহাদের ধূম্র-কৃষ্ণ বদনগুলি সুপ্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। হঠাৎ কোন অজানা লোক ইহাদের এভাবে চলিতে দেখিলেই মনে করিবে, ইহারা বুঝি দুর্ভিক্ষ-রাজার দুর্ম্মদ সৈন্য সব, রাজাদেশে যুদ্ধ করিতে চলিয়াছে। চরণগুলি শক্তিহীন, রাত্রি-জাগরণে শীর্ণ। এক ঘণ্টার পথ তিন ঘণ্টায় চলেন। ধনুকে টঙ্কার দিয়া দিয়া কটিগুলি ধনুকের আকার ধারণ করিয়াছে; উঠিতে দাঁড়াইতে একান্তই অক্ষম। কেবল পথিপার্শ্বের যে যে বেড়া নারী হস্তের স্পর্শে নড়িয়া চড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সেই স্থানেই তাঁহারা যথাসাধ্য সোজা হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

এক জমিদারের বাগান বাড়ীতে দলকে আশ্রয় দেওয়া হইল। কিন্তু হায়, দুঃখের কথা বলিব কি, আশ্রয়ে কেহই অবস্থান করিতে চাহিল না গুড়-মুড়ী খাইয়াই সব দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়িল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গ্রামের জমিদার বাড়ীতে বেয়াল্লিশটা নালিস রুজু হইয়া গেল। গ্রামবাসী সমস্বরে নিবেদন করিল, কাহারো গাছে ডাব, আম, জাম, লিচু কিছুই থাকিল না! ভাবিয়াছিলাম বুঝি বানর পড়িয়াছে; শুনা গেল, বানর বটে—তবে লেজওয়ালা বানর নয়; মানুষ বানর, সহর হইতে সদ্য আগত! লেজওয়ালা বানরের সঙ্গে ইহাদের তফাৎ অনেক। তাহারা গাছে বসিয়া দাঁত খিঁচায় মাত্র; ইহারা কাঁচা আম, ডাবের মুচি ছুঁড়িয়া লোক জখম করে; তাহাদের তীর মারিয়া ভাগান যায়, ইহারা বন্দুককেও ভয় করে না, বলে—গুলি কর্, ফাঁসী যাবি। এক বিধবা চাষার বৌ-র বাড়ীর বেড়ার গাছে ক'টি কাঁচা সোনা

ছিল, বেচারী কাঁদিয়া সারা, কিন্তু নর-বানরের দল ফল খাইয়াই ছাড়িল না; গাছটার পাতা কটাও কচ্ মচ্ করিয়া চিবাইয়া খাইয়া ফেলিল! জমিদার রসিক পুরুষ, বলিয়া দিলেন, যা গেছে তা আর পাবি নে; এখন থেকে কাচ্চা-বাচ্চা, ছেলে-পিলে গুলোকে সামলে সুমলে রাখ্, সাবধান, খিদের মুখে সামনে না পড়ে! সেদিন ভদ্রেতর সকল ঘরে শিকল উঠিল, তালা পড়িল, শিশুকণ্ঠের কাতর ক্রন্দনে গ্রাম ভরিয়া গেল।

বেলা তখন পাচটা, মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত হইল। বাবুরা বিশ্রামে মন দিলেন। বিশ্রাম-পর্বটা কিরূপ, শুনিবেন? মাথার নীচে একখানি করিয়া এগারো ইঞ্চি ইঁট, পাশে একটি করিয়া থেলো হুঁকো, কাৎ হইয়া জল গড়াইয়া পরস্পরের বস্ত্র আর্দ্র করিতেছে; পিপীলিকা, মশক, ডাঁশ, আরও বহুবিধ অজানা-অচেনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব আসিয়া ইহাদের মুখে, মাথায়, চক্ষে, বক্ষে, বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছে; কর্মঠ কোন কোন জীব নানাবিধ কর্মেও ব্যাপৃত রহিয়াছে।

আরও ঘণ্টা দুইতিন দেরী। তখন এই সব মহাপুরুষই কেহ 'আজা,' কেহ 'আণী,' কেহ মন্ত্রী, কেহ একেবারে জগদীশ্বর হইয়া পড়িবেন! এখন দেখিলে মনে হইবে, বুঝি কোন চা কোম্পানী কুলী চালানীর কাজ করে, ষ্টিমারের দেরী আছে দেখিয়া, শোওয়াইয়া দিয়াছে। অথবা খেজুর-গুড়ের নাগরী, গাড়ী আসার অপেক্ষা। হায় হায়! ইহাদেরই বাপ মা আত্মীয় স্বজন হয়ত কত সুখ চিন্তাই না করিতেছে, হতভাগ্যেরা ত জানে না ছেলে এখানে নরম নরম মকমলের ইঁট মাথায় দিয়া কি গাঢ় নিদ্রাতেই না অভিভূত!

দুড়ুম! বোমা ফাটিল। কুস্বপ্ন দেখিয়া ছেলেরা যেভাবে বাবাগো, মাগো শব্দে আঁৎকাইয়া উঠে, ঐ দুড়ুম শব্দে দলের বাবুরা সব হুড় মুড় করিয়া উঠিলেন। চক্ষু মার্জনা করিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন, সূর্য্য ডুবুডুবু, সন্ধ্যা আসন্ন। শূন্য-গর্ভ থেলো হুঁকাগুলিকে সযত্নে তুলিয়া বীরপদভরে সব ভাঁড়ারীর সন্ধানে ছুটিলেন—তামাক চাই! তামাক, বড় তামাক, ছোট তামাক, অনেক রকম তামাক ভস্মীভূত করিয়া সব শিবতলার দিকে অগ্রসর হইলেন। আর যায় কোথা, বাকদেবী বীণাপাণি কণ্ঠে আবির্ভূতা হইলেন। কেহ তিন দিনের জ্বরে মৃতা পত্নীর জন্য, কেহ ডোবার ধারে বারেকের দেখা ঘোষেদের মেয়ের জন্য সকরুণ-কণ্ঠে খেদ প্রকাশ করিতে করিতে চলিলেন।

যাত্রা আরম্ভ হইয়া গেল। আসরে তিল ধারণের স্থান নাই। চিকের আড়ালে মেয়েরা কলরব জুড়িয়া দিয়াছে; পাণ-সিগারেট বিক্রেতারা ঘুরিয়া ফিরিয়া মজাদারী বোল্ আওড়াইয়া পাণ সিগারেট বিড়ি বেচিতেছে; পাঁপড়-ওয়ালা সব্যসাচী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দু'হাতে ভাজিয়াও কুলান করিতে পারিতেছে না। পাণ্ডারা কাঁধে গামছা ফেলিয়া উচ্চ চিৎকারে গোল থামাইবার নামে গোল বৃদ্ধি করিতেছেন; মেয়েরা পাছে বেশী গোল করিয়া ফেলে, তাহাদের দিকেই পাণ্ডাদের একটু তীক্ষ্ণ, একটু বেশী, একটু সদয় দৃষ্টি!

আবার দুড়ুম! ডানা-কাটা পরীরা যেন শূন্য হইতেই নামিয়া পড়িয়া নাচ জুড়িয়া দিল। দলের মাইনে করা পরামাণিক ম্যালেরিয়ায় কাতর থাকায় পরীরা অনেকদিন ক্ষৌরকার্য্য না করায় গোঁপ দাড়ীগুলা একটু বেশীমাত্রায় প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সুউচ্চ বক্ষস্থলের কৃপায় সেদিকে আর চোখ কাহারও পড়িতে চাহিল না। নাচে নাচে ধূলা উড়িয়া গেল; যাহারা ভাল করিয়া গান শুনিবে বলিয়া, আসরে জমিয়া বসিয়াছিল, নৃত্যশীলা হুরীদের শ্রীচরণাঘাতে, স্বর্গীয় সুষমা-মণ্ডিত পোষাকের বোটকা গন্ধে ও সতরঞ্চ জাজিম ভেদিয়া ধূলার ঝড়ে পালাই পালাই করিল। রামঃ, বাঁচা গেল, কুরুরাজ দুর্য্যোধন, মাতুল শকুনির সঙ্গে গোপন পরামর্শ করিতে আসরে ঢুকিলেন। গোপন পরামর্শটা খুব গোপনেই চলিল বটে তবে দুর্য্যোধনের লাফের চোটে গোটাদুই দেয়ালগিরি কাচ-জন্মের অবসান করিয়া বাঁচিল আর টানাপাখার দড়ীতে মুকুট আটকাইয়া কুরু-রাজা দুর্য্যোধনকে ত্রিশঙ্কুর ন্যায় দুইদণ্ডের জন্য শূন্যেই ঝুলিতে হইল; যেহেতু মুকুটটির লাকলাইন-দড়ীতে আর তাঁহার গলায় প্রেমের নিগড় বাঁধন ছিল! দড়ী খুলিয়া দেওয়ায় রাজা ভূমিতে নামিলেন বটে কিন্তু নামাটাও তেমন সুবিধাজনক হইল না—রাজা ঢোলক, পাখোয়াজ, বাঁয়া তবলা হাতুড়ীর উপর সশব্দে বাত্যা-হত কদলী বৃক্ষবৎ পড়িলেন, পৃষ্ঠের অবস্থা বুঝা গেল না বটে তবে মুখে যে ভাব ফুটিল, তাহা অতীব করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী! এ্যাকসিডেণ্ট! কাজেই ঐক্যতান বাদন! দোহাই অধিকারী মহাশয়, ঐক্যতান বাদন আমরা উহাকে কিছুতেই বলিতে পারিব না! বাদন যদি ঐ হয়, তবে মারণ কাহাকে কহে? বাপ্! পল্লীগ্রামের লোকের চামড়ার জান খুব শক্ত বলিতে হইবে, সহরের লোকের যদি ঐ রকম পেটজোড়া প্লীহা থাকিত আর তার উপর ঐ গম্ভীর গর্জন সহিতে হইত—আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, প্লীহাকুল নিঃসংশয়ে স্বস্থানচ্যুত হইয়া আসিতে পথ পাইত না!

দুর্য্যোধন আহত হইলেন; তস্য ভ্রাতা দুঃশাসনের রাগটা পাণ্ডবদের উপর যত না বাড়ুক, বারোয়ারির পাণ্ডাদের উপর খুবই বাড়িয়া গেল। আসরটাকে ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় তিনি বদ্ধ পরিকর ছিলেন, কারণ তাঁহার তলোয়ার পুনঃ পুনঃ কাচের ঝাড়, ছবি, দেয়ালগিরি চুম্বন

করিতেছিল তবে সেগুলাকে ভূশায়ী করিতে চক্ষু লজ্জা হওয়াতেই বোধ হয় তিনি দমন নীতি সবেগে চালাইতে পারিতেছিলেন না, অথচ ক্রোধ চণ্ডালও ভিতরে দাউ দাউ করিয়া, জল্ জল্ করিয়া, জ্বলিতেছে—দুঃশাসন মহাশয় অবাধ্য সহোদর বিকর্ণকে গদাঘাত করিলেন, বিকর্ণ পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল, অধিকারী মহাশয় গণ-গণে আগুনে তামাক খাইতেছিলেন, গদা গিয়া পড়িল, তাঁহার মস্তকে! আগুন! আগুন!—চিকের মধ্যে মেয়েরা চ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া উঠিল; পুরুষরা 'ধর বেটা দুঃশাসনকে' শব্দ তুলিয়া হুড় হুড় করিয়া আসর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। দুঃশাসনকে ধরা গেল না, সে মখমলের পোষাক আষাক আঁটিয়াই অদূরস্থিত কালা চাঁড়ালের ডোবায় গলা ডুবাইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। আগুন নিভাইতে আধঘণ্টা কাটিয়া গেল।

রাত্রি ৯টা—গান জমিল না। লোকে ছি ছি করিতে আরম্ভ করিল। মাতব্বরগণ চক্রোত্তী মহাশয়ের সন্ধানে ছুটাছুটি করিল, তাঁহার দেখা পাইল না। গণ্ডগোল আরম্ভ হইল।

হঠাৎ সব গোল থামিয়া গেল। আসরের বাহিরে একটা স্থানে খুব ভিড় হইয়াছিল, পাণ্ডারা সেখানকার লোক তুলিয়া দিয়া, একখানা মাঝারী সাইজের চৌকী পাতিয়া দিল, তাহার উপর, সতরঞ্চি, তোষক চাদর পড়িল, তাকিয়া গড়াইল; পার্শ্বে গড়গড়া বসিল, পাণের রেকাব, গোলাপ জলের ব্যাটী, পিচকারী রক্ষিত হইল। পাঁচমিনিট পরেই একটি প্রিয়দর্শন যুবাপুরুষ আসিয়া শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন। সহস্রকণ্ঠে জয় মহাত্মা গান্ধীর জয় উচ্চারিত হইল। আশে পাশে দুই চারিটি যুবক বৃদ্ধও আসিয়া বসিলেন। সমবেত জন মণ্ডলীর দৃষ্টি সুদর্শন যুবকের দিকে পতিত হইল। অনেকেই নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিল, যুবকও সহাস্ত-মুখে কুশল প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। মেয়েরা চিকের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন। পাণ্ডারা কেহ পাণ, কেহ সিগারেট দিতে আসিলেন।

যুবক জিজ্ঞাসিলেন—কেমন হচ্ছে হে!

পাণ্ডা কহিলেন—সে কথা আর বলবেন না বাবু! পাল চাপা দিলেই হয়।

একজন মাতব্বর পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—এঁজ্ঞে, যন্তরপাতি কেড়ে কুড়ে না নিতে হয়!

বল কি হে! এমন?

এজ্ঞে!

যুবক কহিলেন—অধিকারী আছে?—ডাক ত!

যুবক যে কৃষ্ণ-বিষ্ণু কেহ, তাহা সকলেই বুঝিয়াছিল। বাস্তবিক তাই, যুবক বড়লোক নহেন বটে, গুণবান! এ দীগরের বড় কাজ, সৎকাজ, সকলের অনুষ্ঠাতা, অগ্রণী তিনি! যুবক বিদ্বান, আবার কংগ্রেস কর্মী, গান্ধীর ভক্ত!

অধিকারী মহাশয়টি বৃদ্ধ, খর্বাকার, অত্যন্ত অসভ্য! ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতে আসিতেছে পরণের কাপড়খানাকে হাঁটু হইতে বিঘৎ দুই নীচে নামাইবারও দরকার বুঝিল না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লোকটাকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, যুবক বলিলেন—থাক্, থাক্, বুড়োমানুষ; অত দেখতে গেলে কি চলে! আস্তে দাও!

অধিকারী সামনে দাঁড়াইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। যুবক নিজের পার্শ্বে স্থান করিয়া দিয়া বলিলেন—বসুন!

অধিকারী একবার সগর্বে চারিদিক চাহিয়া লইলেন। যে লোক সভায় আসিতে, সভা সরগরম হইয়া উঠিল, হাজার হাজার লোক যাহাকে অভ্যর্থনা করিতে দাঁড়াইয়া উঠিল; তাহার পার্শ্বে বসিবার সৌভাগ্য একমাত্র তাঁহারই হইল, এ-টা তাঁহার দলের লোকেরও যেমন জানা দরকার, দর্শকবৃন্দ যাহারা এতক্ষণ তাঁহাকে অবলীলাক্রমে বহুবিধ অখাদ্য ভোজন করাইতেছিল, জীবন্তে যমালয়ে পাঠাইতেছিল, দেখা তাহাদেরও তেমনি দরকার। অধিকারী মহাশয় মাথাটি উঁচু করিয়া সকলকে দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিলেন।

যুবক বলিলেন আপনাদের গান ভাল হচ্ছে না যে অধিকারী মশাই!

অধিকারী মহাশয় কোটরগত চক্ষু দু'টাকে পাকাইয়া তালের আঁটি মস্তকটিকে হেলাইয়া দুলাইয়া বলিলেন—কি করে হবে বলুন! গান কি অমনি জমে, শুন্তে জানা চাই।

এ কথার যাহা অর্থ, তাহা বুঝিয়া গ্রাম্য মাতব্বরগণ খাপ্পা হইয়া উঠিলেন; ধাঁ—মারেন আর কি! যুবক না থাকিলে বোধ হয় অধিকারীর লম্বা বদনখানি তন্মুহূর্তেই বিকৃত হইয়া যাইত। আজ পর্য্যন্ত কোন যাত্রাদলের অধিকারীর এতদূর স্পর্দ্ধা হয় নাই যে বলে ইহারা গান শুনিতে জানে না! স্পর্দ্ধা বটে!

অধিকারী নরম হইয়া গেলেন। যুবককে বলিলেন—আপনার সঙ্গে গোপনে দু'টো কথা বলতে চাই।

যুবক পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকে কি ইঙ্গিত করিলেন, সব দূরে চলিয়া গেল।

অধিকারী কহিলেন—ম'শাই, গান কি অমনি জমে? একটা বাহবা নেই, একটা হাততালি নেই, একটা কিছু নেই, গান অমনি জমে কি—আপনিই বলুন।

ভাল না লাগলে কেউ বাহবা দেয়?

ও হরি! আপনি এই কথা বল্লেন! দিতে হয় মশাই, দিতে হয়! আগেই দিতে হয়। কলকাতার থিয়েটার দেখেন নি, মাঝে মাঝে তারা আপনাদের লোক বসিয়ে রাখে তারা গোড়া

থেকেই কেলাপ টেলাপ দিয়ে জমিয়ে দেবার চেষ্টা করে,—কেলাপ ম্যান বলে তাদের। তখন অডিয়েন্সও কেলাপ না দিয়ে পারে না; আর কেলাপে কেলাপে এ্যাকটো জমে যায়—রুৎসাহ হয়—বুঝ্‌ছেন ত!

হুঁ।

এখানে মশাই, গোড়া থেকেই ছ্যা ছ্যাঃ আর ছিঃ ছিঃ যত আকাট মূখ্‌খুর দল—এতে কি আর গান জমে!

অধিকারী একটু থামিয়া আবার বলিলেন—আমাদের কেলাপ-ম্যানটা যে অসুখ হয়ে আসতে পারলে না, নইলে দেখতুম কেমন গান না জমে!

কথাগুলা নিতান্ত মিথ্যা নয়। উৎসাহ না-পাইলে খুব ভাল গানও তেমন জমে না, প্রাণ পায় না, যুবক জানিতেন; চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎপরে যুবক কহিলেন—এরা কিন্তু বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে অধিকারী মশাই। যাতে গানটা ভাল হয়, তার একটু চেষ্টা করুন।

সে চেষ্টা ত আপনাদেরই হাতে, মশায়!—বলিয়া অধিকারী মহাশয় করুণ হাস্য করিতে লাগিলেন।

আমাদের হাতে কি রকম?

নিবেদন করব?

করবেন বই কি!

অধিকারী মহাশয় নিম্নস্বরে বলিলেন—আপনি একটু তোয়াজ করে' দিন-দেখি, গান জমে কি না বোঝা যাবে। আপনি দু'দশটা বাহবা দিলে, তারিফ করলে ওদের 'রুৎসাহ' বেড়ে যাবে, গানও জম্‌বে, গাঁয়ের লোকও সন্তুষ্ট হবে। আর ওদেরও বলে দিন, একটু 'রুৎসাহ' দিয়ে দিক, অমন ছি ছি করলে মন ভেঙ্গে যায়, বুঝতেই ত পারছেন।

যুবক 'আচ্ছা' বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া, নিবিষ্টমনে গান শুনিতে বসিলেন। পাঁচ মিনিট পরেই চোগা-চাপকান-পরা উকীলদের একটা অবোধ্য সঙ্গীত শেষ হইতেই উচ্চ ও প্রবল কণ্ঠে 'বাহবা বাহবা' করিয়া উঠিলেন। যাহারা প্রবল রুৎসাহে গানভঙ্গে দলটিকে পাল চাপা দিবার সঙ্কল্প আঁটিতেছিল, তাহারা 'থ' হইয়া পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

বাহবাটা মন্ত্রের মত কার্য্যে করিয়াছিল, গাঁয়ের লোক আর টু শব্দটি উচ্চারণ করিল না। এত যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, টিটকারীর ছড়াছড়ি হইতেছিল, যাদুমন্ত্রে সব বন্ধ হইয়া গেল।

বস্ত্রহরণ দৃশ্যে ম্যাজেণ্টারমাখা দ্রৌপদী নাকিস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া ডাকিয়া হতাশ হইয়া যখন ভাঙ্গা কাঁসির আওয়াজে গান ধরিয়া দিল, যুবক আবার তারিফ্‌ দিলেন। 'বাহবা'!

পাণ্ডাদের এই প্রথম বিশ্বাস জন্মিল যে দল খুব উঁচুদরের গাওনাই গাহিতেছে, নতুবা প্রকাশবাবু কখনই তারিফ দিতেন না। তাহারা পাড়াগেঁয়ে মূর্খ মনুষ্য তাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যেই বিশ্বাস জন্মান, অমনি অভিমান! কে আর নিজেকে লোকসমাজে মূর্খ, বুদ্ধিহীন, ছোট, খাট করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় বল? যেমন দ্রৌপদীর গান থামা, আর দশদিক হইতে দশ পাণ্ডা দশরকম গলায় দশরকমের তারিফ্‌ ঘোষণা করিয়া দিলেন। বালকবালিকারা তুড়িলাফ দিয়া উঠিল; বুড়ারা হাঙ্গামার মধ্যে ভোম্বোলদাস হইয়া থাকিতে চাহিল না, তাহারা 'ঢোলকের' অনুরূপ ড্যাব-ঢেবে কণ্ঠে 'একবার হরি হরি বল ভাই' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িল। আহা, হরিনামের কি অপার মহিমা! আসরের এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল—হরি হরি বল! ছেলেরা মহোল্লাসে নৃত্য করিয়া উঠিল—বল হরি, হরিবোল!

খুব একটা হাসির হররা উঠিল। বুড়ারা ছেলেদের কাণ ধরিয়া, কচ্ছ ধরিয়া বসাইয়া দিল।

এখন হইতে মজা এই হইল, প্রতি 'বাহবার' সঙ্গে দলের লোক মাথা নীচু করিয়া অভিবাদন করিতেছিল। বারবার পাণ্ডারা এই সম্মানটা দখল করিয়া লয় দেখিয়া গ্রামের লোকের জেদ চড়িয়া গেল, উঁহাদের বেদখল করিতেই হইবে। অধিকাংশই চাষার মরদ! ভায়ে-ভায়ে কথা কাটাকাটি হইলে কেচে (কাস্তে) আনিয়া দাঁড়ায়—উরু ভঙ্গ হইবে, দুর্য্যোধন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিবে, ঈশান কোণ হইতে শব্দ উঠিল—ভ্যালা মোর ভেইরে! নৈঋত কোণের লোক দেখিল, দুর্য্যোধন ঈশান কোণের দিকে নমস্কার করিল, তাহারা ভীমকে রুৎসাহিত করিতে বলিল—"লেগিয়ে দাও ভীম-দাদা, কসে লেগিয়ে দাও। ব্যাটার ঠ্যাংটা মুইড়ে দাও!" ভীম হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঠ্যাংটা মুড়াইতেই নমস্কার করিল।

পাণ্ডারা দেখিলেন, তাঁহাদের প্রসার প্রতিপত্তি সব যায়। যাত্রাওলারা গাঁয়ের লোকেরই সুখ্যাতি রটাইয়া বেড়াইবে, তাঁহাদের আমলেও আনিবে না, তাঁহারা দশজনে মিলিয়া একেবারে গোড়া ধরিয়া টানিলেন—বেঁচে থাক কাণ্ডারী ভাই, বেঁচে থাক।

চক্রোত্তীমহাশয় এতক্ষণ কাহার ঢেঁকিশালে পড়িয়া যে হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছিলেন কে-জানে!—এখন একেবারে মরি-বাঁচি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—কেমন বাবা সেই কালেই বলি নি যে যতটা খারাপ তোমরা ভাবছ, ততটা খারাপ নয়! কেমন হল ত? মতিরায়ও কখনও এত তারিফ পায় নি। আরে ভাই, তোদের চক্রোত্তীদাদার ওপর যখন সব ভার তখন না দেখে-শুনে কি কিছু করি রে পাগলা! ঐ যে দুর্য্যোধন পোষাকটা পড়ে রয়েছে, দামটি কত জানিস্? দু'টি

হাজার টাকা নগদ, চক্‌চকে রূপোর টাকা। কাল আমি ওদের আড্ডায় থাকতে-থাকতেই পোষাকের টাকা, নিতে এল কি-না, তাই জানি।

বলা বাহুল্য, এটা ঠাকুরের স্ব-কপোল-কল্পিত। কোন যাত্রাদলের যাবতীয় পোষাক এক সঙ্গে করিলেও দু' হাজার টাকায় কেহ কিনেন না। সে কথা যাক্ - চকোত্তী ঠাকুরের কথিত দু' হাজার মুখে মুখে ফিরিয়া দশ হাজারে গিয়া হোঁচট খাইল। নারদের পোষাকেরও দাম তিন হাজারে উঠিয়াছিল কিন্তু অকস্মাৎ বৎস নারদের দাড়ীটি খুলিয়া পড়ায় কতকগুলা লোক সেটাকে লুফিয়া লইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, দুঃশালা শোনের হুড়ী রে!—কাজেই পোষাকের মূল্য আর বৃদ্ধি পাইল না।

এদিকে, বাহবার পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে দ্রৌপদী আসরে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতেই যখন অর্জ্জুনকে 'প্রাণাধিক' সম্বোধনে দাঁড়াইয়া উঠিল, তখন ঠিক বলিতে পারি না করতালির ধূমে কিম্বা দ্রৌপদীর শ্রীমুখ-বিনিসৃত ধূমে আসরটিই অন্ধকার হইয়া গেল।

পালা শেষ হইল। ভাল-মন্দ কেহ কিছু বলিবার আগেই হুড়মুড় করিয়া লোক গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। কেবল পাণ্ডারা পাঁপরের দোকানে বসিয়া জলযোগ করিতে করিতে মন্তব্য করিলেন—কাল আর কিন্তু ব্যাটাদের থাক্‌তে দেওয়া নয়! বরং পরে একদিন রায় কোম্পানীকে আনবার চেষ্টা করা যাবে। শুনছি, তাদের সিজেয় বায়না আছে।

তাহাই স্থির রহিল। প্রত্যুষেই অধিকারী মহাশয়কে একদিনের প্রাপ্য চুকাইয়া বিদায় দেওয়া হইবে ঠিক করিয়া পাণ্ডা মহাশয়গণ আসরেই ০া মোড়া দিতে লাগিলেন। ঘণ্টা দুই রাত ছিল এ পাশ ওপাশ করিতেই কাটিয়া গেল।

অধিকারী মহাশয়ের সন্ধান করিতে গিয়া শুনিলেন, তিনি প্রকাশ বাবুর বাড়ী গিয়াছেন। পাণ্ডামহাশয়গণ সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রকাশ বাবু অধিকারী মহাশয়ের সহিত গল্প করিতেছেন।

প্রথম পাণ্ডা, পাল মহাশয়, বলিলেন—আপনাদের টাকা কড়িগুলো চুকিয়ে নিন্ মশাই!

অধিকারী বিস্মিত কণ্ঠে 'কিসের টাকা বলুন তো?—' বলিয়া হাঁ করিলেন।

কালকের টাকা। পঞ্চাশটাকা আগাম দেওয়া আছে ত, আর এই নিন, পঁচিশ!—দু'খানি দশটাকার নোট ও পাঁচটি মুদ্রা তিনি অধিকারীর সম্মুখে রক্ষা করিলেন।

অধিকারী মহাশয় স্বর্ণ সম্পৎকে মৃত্তিকাবৎ দেখিতেন নিশ্চয়ই, সেদিকে একবার চাহিলেনও না, বলিলেন—আজকেও ত গান হবে মশাই।

হেড পাণ্ডা বলিলেন—আজ্ঞে না, আর নয়। কালই আপনাদের শেষ···

অধিকারী আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন—সে কি ম'শয়! হাজার হাজার লোক একবাক্যে সুখ্যাতি করে গেল, আর আপনারা এ কি বলছেন আজ! আর হেঁ হেঁ—আপনারাই ত ম'শয় এই অধীনের নামেও একটু আধটু তারিফ দিয়েছেন বলেই আমার মনে হচ্ছে! বুড়ই না-হয় হইছি, তা বলে কাণেও কি শুনতে পাইনে মশ'য়!

পাণ্ডা মহাশয়গণের তালু শুকাইয়া আসিতেছিল; চক্ষু-তারকা উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল, সব নির্বাক।

অধিকারী মহাশয় কহিতে লাগিলেন—কথা ছিল বটে, খারাপ হ'লে একদিন গেয়েই চলে যাব। একথা ত ছিল না ম'শয় লেখাপড়ায়, যে গান ভাল হলেও আপনাদের টাকা নেই বলে···

টাকা নেই!!!

আহা-হা-হা, চটেন কেন মশয়, কথার কথা বল্‌ছি বই ত নয়! কথাটা ধরুনই না ভাল করে! কাল গান ভাল বল্লেন, আবার গাইতেও যদি বারণ করেন তা হলে কি মনে হয় বলুন ত? আপনাদের টাকা জোটে নি, তাই মনে হয় না-কি? কিন্তু ম'শয়, তা বল্লে ত চলবে না। এত খরচ খরচা করে এসে আমরা লোকসান করে ত যেতে পারব না।

একজন পাণ্ডা যুবা-বয়স্ক, কিঞ্চিৎ উগ্র প্রকৃতির, কহিলেন—আমরা তোমাদের গান শুনব না।

বেশ, না শোনেন, ক্ষতি নেই, টাকা কিন্তু দু'দিনেরই দিতে হবে।

কেন?

আইন।—পালা জমিয়া উঠিতেছিল; উভয় পক্ষই 'অক্তশ্চক্ষু।'

গান ভাল না হলেও···

ও কথাটি বলবার যো নেই যাদু! গান ভাল না হলে বাহাবা দেয় কেউ? হাজার-হাজার লোক, মায় প্রকাশ বাবু!

অধিকারী সগর্বে চাহিতে লাগিলেন। পুনশ্চ কহিলেন—গান না শোন, টাকাটি দিয়ে দাও, আমরা আশীর্বাদ করতে করতে চলে যাই।

যদি না দিই?

লেখাপড়া আছে, আদালত আছে। ধাপ্পা ত চলবে না বাপু! অধিকারীর কলিকা নিবিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ব্রহ্মতেজে পুনঃ প্রজ্জলিত করিবার জন্যই তিনি সঘনে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

প্রকাশ বলিলেন—না, না, দু'দিনের নাম করে যখন আনা হয়েছে, অভদ্রতা করা যায় না। আজকেও হ'ক। তবে অধিকারী ম'শয়, আজ পালাটা একটু ভালই দেবেন।

সে আর বলতে ম'শয়! তবে আপনিও সেই গোপন কথাটা ভুলবেন না!

স্নেহ-সরিৎ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১০ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [অষ্টবিংশ সপ্তাহ

বরের বাজার—চূড়ান্ত

(১)

আলালের ঘরের দুলাল

"বাহবা বা রে আমি বাপের বেটা বাহাদুর"

(২)

বক্তা—প্যাট্রিয়ট

"স্বরাজ আমার চিন্তা, স্বরাজ আমার স্বপ্ন, স্বরাজ আমার খাদ্য"......

তুমি অতি অখাদ্য !

(শুধু অখাদ্য ?—মুসলমানের অখাদ্য।)

(৩)

অভিনেতা

(হিরো - Hero)

"এই রক্ষীশূন্য কক্ষে যদি করি তব অঙ্গ-পরশন"——

"অঙ্গ-পরশন কিরে বাবা !"

(৪)

প্রেমিক যক্ষ

(বিরহী যক্ষের অনুসরণে)

"এস প্রাণসখা এস প্রাণে
মম দীরঘ বিরহ অবসানে"......
"আমি না বাবা"————

(৫)

সৎকার্য্যের পুরস্কার।

সংকার-সমিতির সর্ব্বপ্রধান সভ্য !

"আজ্ঞে—সৎকার করি।"

"আমার মেয়েটিরও কি—"

"আজ্ঞে, এখনই ! সারা জীবন সৎকার্য্য করিছি, ভগবান পুরস্কার কি আর দেবেন না ?"

(৬)

স্পোর্টশ্-ম্যান

১৮ খানা গোল্ড, ১১ খানা সিল্ভার মেডেলের অধিকারী!

সুতরাং—একটি স্পোর্টস্-ওম্যান, আর ন্যূনপক্ষে পাঁচ……

(৭)

হাওয়া-গাড়ী-চালক

"হাওয়া খাবার ভাবনা আপনার মেয়ের কোনদিনই হবে না। প্রাণ ভরে—প্রাণ পুরে"—"যত চাও তত খাও, পয়সা নেবে না।"

(৮)

কেরাণী
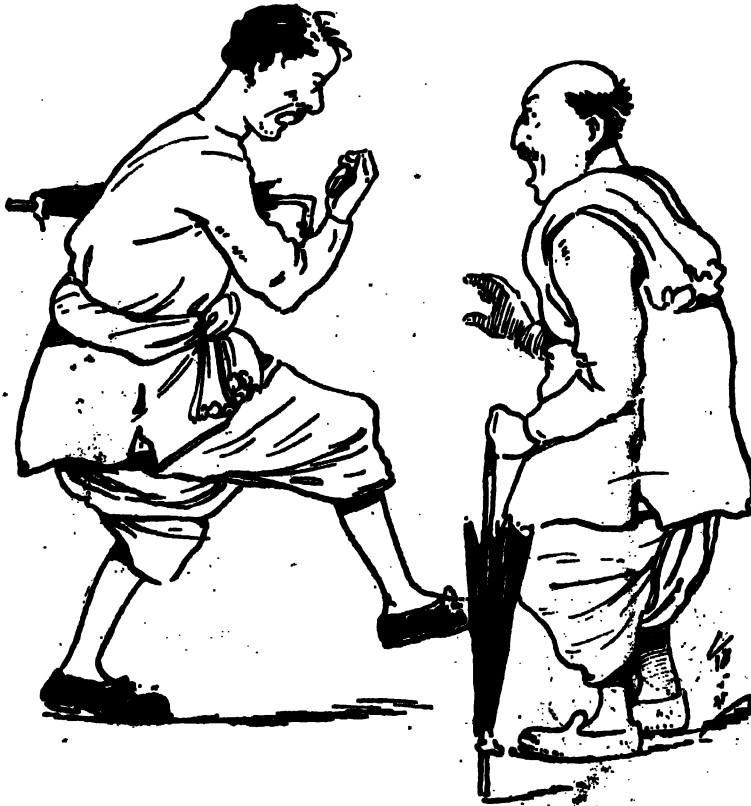
(আপনি বাঁচলে বাপের নাম)

সরুন মশাই, আগে চাকরী, তারপর বিয়ে! বেশী কথা কইবার সময় নেই—পাঁচ, পাঁচ, পারেন, রাত্রে আসবেন—পাকা—কথা কইব।

(৯)

ষষ্ঠী বাবা

"ও বাবা! "এ যে ষষ্ঠি-বুড়ীর আশ্রমে এসে পড়েছি!"
"এখনকার বিয়েটা নিজের জন্য নয় ত, কেবল এই কাচ্চাবাচ্চা গুলোর জন্যেই!
কাজেই আকাঙ্ক্ষা নিজের জন্য বিশেষ কিছুই নয়! তিনটি কন্যার জন্য তিন × তিন—নয়।"

(১০)

বাজারের শেষ —চূড়ান্ত

বাঙ্গালীর কন্যা ভাগ্য—উজ্জ্বল।

আর কন্যার ভাগ্য———এই ! ! !—অত্যুজ্জ্বল !

অর্দ্ধেন্দুশেখর

[শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি-আই-ই]

দৃশ্যশ্রব্যভেদে কাব্যশাস্ত্র দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া অলঙ্কার সূত্রে প্রচলিত আছে। শ্রব্যকাব্য প্রণয়নে দেশকাল পাত্রাদি সম্বন্ধে যথাযোগ্য বর্ণনার অবতারণা করিয়া, কবি তাঁহার অন্তর্নিহিত সকল ভাবই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিতে পারেন। সুতরাং শ্রবণমাত্রেই সে কাব্য সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। দৃশ্যকাব্যে পাত্রপাত্রীর বাক্য এবং আচরণমাত্র অবলম্বন করিয়া ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া, কবি সকল বক্তব্য প্রকাশিত করিতে পারেন না। তাহা প্রকাশিত করিবার জন্যই অভিনয় নামক ব্যাপারবিশেষের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। তাহা আর কিছু নহে,—শ্রব্য কাব্য হইলে কবি স্বয়ং যাহা করিতে পারিতেন, তাহা অনুমান করিয়া লইয়া, তাহার সহিত দৃশ্য-কাব্যোক্ত বাক্যের এবং আচরণের সামঞ্জস্য সাধিত করিয়া, তাহাকে চতুর্ব্বিধ প্রয়োগ কৌশলে অভিব্যক্ত করা।

বিভাবয়তি যস্মাচ্চ
নানার্থান্ হি প্রয়োগতঃ।
শাখাঙ্গোপাঙ্গসংযুক্ত
স্তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥

এই পুরাতন কারিকায় অভিনয়ের প্রয়োজন ও প্রকৃতি সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহা সিদ্ধ না হইলে, আড়ম্বরমাত্রকে অভিনয় বলিয়া অভিনন্দন করা যায় না। যে চতুর্ব্বিধ উপায়ে অভিনয়কার্য্য সাধিত হইতে পারে তাহা আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক, এবং আহার্য্য নামে পরিচিত।

অর্দ্ধেন্দুশেখর

আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব হ্যাহার্য্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।
জ্ঞেয় স্বভিনয়ো বিপ্রে শ্চতুর্দ্ধা পরিকল্পিতঃ॥

আঙ্গিক এবং বাচিকের অর্থ সুপরিচিত। চিত্রপটাদি, বসনভূষণাদি, অস্ত্রশস্ত্রাদি, যাহা কিছু আহরণ করিয়া আনিতে হয়, তাহার নাম আহার্য্য। ইহা ছাড়া আর একটি অঙ্গ আছে, তাহা এ সকলের অতীত,—তাহারই নাম

ব্যঞ্জনৌষধিসংযোগো যথান্নং স্বাদুতাং নয়েৎ।
এবং ভাবা রসাংশ্চৈব ভাবয়ন্তি পরস্পরম্॥
যথা বীজাৎ ভবেদ্‌বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং যথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্ব্বে ততো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥

অন্নব্যঞ্জনের পরস্পরকে স্বাদু করিয়া তুলিবার মত, রস এবং ভাবের পরস্পরকে অভিব্যক্ত করিবার সম্বন্ধ। তন্মধ্যে রসই মূল, ভাব তাহার উপরে অবস্থিত,—যেমন বীজের উপরে বৃক্ষ, বৃক্ষের উপরে পুষ্পফল।

কবেরন্তর্গতং ভাবং ভাবয়ন্ ভাব উচ্যতে।

কবির অন্তর্গত ভাবকে যদ্দ্বারা অভিব্যক্ত করা যায়, তাহাই ভাব। তাহা কিয়ৎপরিমাণে বাক্যের দ্বারা, অঙ্গভঙ্গির দ্বারা, দৃশ্যাদির দ্বারা অভিব্যক্ত করিবার উপায় থাকিলেও, সম্যক্ অভিব্যক্ত করিবার উপায় নাই। তাহার জন্যই সাত্বিকাভিনয়ের প্রয়োজন। যেটুকু প্রাণ, তাহা বাক্যাদির অতীত,—তাহাই সাত্বিকাভিনয়ের অন্তর্গত। হর্ষ শোকাদির অভিনয়ে সাত্বিকাভিনয়ের সংশ্রয় না থাকিলে, বাক্যাদিমাত্র প্রয়োগ করিয়া, দর্শকচিত্তে সেই সেই রসের অবতারণা করা যায় না;—সুতরাং অভিনয় স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে না। কবির অভিপ্রায় সম্যক্ অভিব্যক্ত করিতে হইলে অভিনেতাকে অনেক সময়ে কবিবাক্যের ইতর বিশেষ করিয়া লইতে হয়। বঙ্গনাট্যসাহিত্যে রচনাদোষ এত অধিক যে, এই অধিকারের পরিচালনা না করিলে, অভিনয়কার্য্যের স্বাভাবিকত্ব রক্ষা করা অনেক সময়ে কঠিন হইয়া পড়ে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি-আই-ই

সাত্বিক। ভাব এবং রস সম্যক্ ব্যক্ত না হইলে, কাব্যার্থ অভিব্যক্ত হয় না। ভাব কি, রস কি, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধই বা কি,—তাহা বুঝাইবার জন্য প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—

একবার ফরিদপুরে কালিদাসের শকুন্তলার অভিনয়

হইয়াছিল। তাহাতে আশ্রমমৃগবধে রাজাকে সমুদ্যত দেখিয়া, তাহা নিবারণ করিবার জন্য ঋষিকুমার গান ধরিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন! বলা বাহুল্য, বঙ্গরঙ্গভূমির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াই নূতন গান রচিত হইয়াছিল। বনবাসে পরিত্যক্তা সীতাকে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে সংজ্ঞালাভ করিবামাত্র নেপথ্যাভিমুখে কটাক্ষপাত করিতে হয়, তখন স্বরলহরী উত্থিত হয়, সীতাকেও গান ধরিয়া ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইতে হয়, দর্শক সমাজ হইতে করতালি ধ্বনিত হইয়া উঠে! অনেক গ্রন্থেই এরূপ রচনানৈপুণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গনাট্যসাহিত্যের অভিনয় ব্যাপারে নাট্যাচার্য্যকে রচনাদোষ সংশোধনের স্বাধীনতা প্রদান করিতে হয়।

বঙ্গরঙ্গভূমির জন্মলাভের অব্যবহিত পরে দিঘাপাতিয়ার বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কলিকাতা হইতে "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" নামক নাট্য সম্প্রদায় রাজসাহীতে অভিনয় করিতে আসিয়াছিলেন। যাঁহারা সে অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই পরলোকগত। সুতরাং তাহার কথা যাহা স্মরণ আছে, লিখিতেছি। তাহার বিলাতী নামের মধ্যে জাতীয় ভাব ছিল না,—অভিনয় প্রণালীর মধ্যেও জাতীয় ভাব ছিল না,—তথাপি তাহাতে অর্দ্ধেন্দুশেখর যেরূপ অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ—চিরস্মরণীয়—উল্লেখযোগ্য—উপাদেয়। সেরূপ অভিনয় যে কোনও দেশের রঙ্গমঞ্চকেই গৌরবান্বিত করিতে পারিত।

'নবীন তপস্বিনী'তে জলধরের এবং 'কৃষ্ণকুমারী'তে ধনদাসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর যে সকল অভিনয় কৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা একালের পক্ষে দিন দিন দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। দৃশ্যকাব্যের বাক্যাবলীর মধ্যে যাহা অনুক্ত থাকিয়া যায়, তাহা ধরিয়া লইয়াই অভিনয় করিতে হয়। জলধরের ন্যায় সুপণ্ডিত অনায়াসে কবিতা রচনা করিতে পারিলে, কবির চরিত্র চিত্রাঙ্কন চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িত। অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দুশেখর যে ভাবে কবিতা রচনার প্রয়াস এবং প্রক্রিয়া প্রদর্শিত করিতেন, তাহা কেবল হাস্যোদ্দীপক নহে,—প্রত্যুত প্রকৃত অভিনয় কলার উৎকর্ষ জ্ঞাপক,—অভিনেতার অসাধারণ প্রতিভা ব্যঞ্জক,—কবি বাক্যের বিশদভাষ্যরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। এরূপ অভিনয়-কৌশল অর্দ্ধেন্দুশেখরই প্রথমে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ধনদাসের অভিনয় ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। যে দৃশ্যে হৃতসর্ব্বস্ব ধনদাস ছিন্নবস্ত্রে মলিনবদনে রাজপথ পার্শ্বে উপবিষ্ট, তাহার অভিনয় কালে অর্দ্ধেন্দুশেখর কোনরূপ বাক্যব্যয় বা অঙ্গচালনা না করিয়া, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া, কেবল সাত্ত্বিকাভিনয়ে দর্শক চিত্ত অশ্রুসিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন! তিনি যে মানব প্রকৃতির কিরূপ অন্তস্তলদর্শী ছিলেন, তাহা তাঁহার অভিনয়ে নিয়ত অভিব্যক্ত হইলেও, এই উপলক্ষে তাহা বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। সেরূপ অভিনয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকটেও আর কখন দর্শন করিতে পারি নাই। যাহা কবির প্রাপ্য, কেবল সেইটুকু ব্যক্ত করিয়াই, অভিনেতা প্রশংসালাভ করিতে পারেন। যাহা কবি লিখিয়া ব্যক্ত করেন নাই, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলে, অভিনেতার গৌরব কত অধিক হইয়া পড়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর অনেকবার তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তখনও অভিনেত্রীর আমদানী হয় নাই!

অভিনেত্রীর নিকট অভিনয়ের প্রত্যাশা করা অসঙ্গত। যাহারা অস্বাভাবিকত্বের আবেষ্টনের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছে, তাহারা রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করিয়াই, চিরজীবনের ধ্যান ধারণা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না। সেই জন্য অভিনেত্রীর আবির্ভাবের পর হইতে নাটকের অভিনয় ভাল হয় না,—প্রহসনের অভিনয় ভাল হয়। উত্তম পাত্রীর অভিনয় ভাল হয় না,—দাসীর অভিনয় ভাল হয়। অভিনেত্রীর সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গরঙ্গভূমিতে যে অস্বাভাবিকত্ব প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা অভিনেতাকে এবং নাট্যসাহিত্য রচয়িতাকেও স্পর্শ করিয়াছে! তাহার প্রভাবে অবৈতনিক নাট্যসমাজ হইতেও অভিনয়-নৈপুণ্য তিরোহিত হইয়াছে; নিকৃষ্ট অনুকরণ স্পৃহাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই প্রভাবক্ষেত্রের মধ্যে আজীবন অতিবাহিত করিয়া, অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁহার অভিনয় নৈপুণ্যের অনন্য সাধারণত্ব রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন,—তাহাই তাঁহার প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় বলিয়া সুপরিচিত থাকিবে। তাঁহার অভিনয় প্রণালী বঙ্গরঙ্গভূমিতে বহুলোকে অধিগত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহার দুই একজন সহযোগী ভিন্ন, অন্যান্য অভিনেতার মধ্যে, তাঁহার প্রভাব লক্ষিত হয় না। তাঁহারা অভিনয়ের মধ্যে যে কৃত্রিমতার আড়ম্বর আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা কণ্ঠস্বরে, অঙ্গচালনায়, পাদবিক্ষেপ ব্যাপারে, সকল বিষয়েই, রুচি-বিকারের পরিচয় প্রদান করে। দর্শক সমাজে সমুন্নত সাহিত্যরুচি প্রতিষ্ঠিত না হইলে, ইহার সংশোধন হইবার সম্ভাবনা নাই! এরূপ দিনে যে সকল প্রবীণ অভিনেতা চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গরঙ্গভূমির গৌরবসূর্য্য অস্তমিত হইতেছে! *

* অর্দ্ধেন্দু নাট্য-পাঠাগারের সম্পাদক অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীযুক্ত [illegible] পণ্ডিত মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। সঃ পিঃ—সঃ

সতী

[শ্রীসুকুমারী মিত্র]

সচিত্র শিশির-গল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনা।

(ক)

গ্রামের শেষ প্রান্তে, একটি ঘন বনাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর সান-বাধানো ধাপে বসিয়া একটি বধূ পোড়া মাজিতেছিল। পশ্চিমমুখো ঘাট, অপরাহ্ন কাল, বন ভেদ করিয়া অপরাহ্নের প্রখর রৌদ্র মেয়েটির মুখে-চোখে আসিয়া জ্বালা দিতেছিল। মাঝে মাঝে সে একটি হাত জলে ধুইয়া আঁচল তুলিয়া মুখখানা মুছিয়া ফেলিতেছিল, আবার বাসন মাজিতেছিল। বয়স তাহার পঁচিশ ছাব্বিশ, গৌর তনুখানি কৃশ কিন্তু সুগঠিত; মুখখানি সুন্দর, কোমল কিন্তু বড় ম্লান। তাহার সীমন্তে সূক্ষ্ম সিন্দুর চিহ্ন বিদ্যমান, বামহস্তে একগাছি সরু লোহা ভিন্ন দেহে অলঙ্কারের চিহ্ন নাই। ঘাটের উপরেই সুলতাদের অর্দ্ধভগ্ন কোঠা বাড়ী। সুলতা বাড়ীর একমাত্র বৌ! সুলতা বড় অভাগিনী।

বৌ-দি!

সুলতা ফিরিয়া চাহিল; মুখে একটুখানি ম্লান হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—কি বৌ?

হাত ধুয়ে—শোন।

বধূ হাত ধুইয়া [illegible]র পাড়ে উঠিতেই, নবাগতা বলিল—দাদাবাবু এসেছে।

সুলতার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল; মন বলিল—মিথ্যা কথা। কিন্তু নবাগতার মুখ চোখের পবিত্রতা, একাগ্রতা দেখিয়া মিথ্যা বলিতেও তাহার সাহস হইল না।

নবাগতা গ্রামেরই মেয়ে, প্রতিবেশিনী, আবার গ্রামেই [illegible] হইয়াছে, সুলতার চেয়ে কিছু ছোট হইবে, নামটি গিরিবালা। কালো-কোলো নধর চেহারাটি, বসনখানি সামান্য, [illegible]গুলি কাচের, কিন্তু চেহারায় বেশ একটা শ্রী আছে। বলিল—ওপাড়ে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে। ডাকি?

সুলতার বুকের মধ্যে কাল-বৈশাখীর প্রভঞ্জন মাতিয়া উঠিয়াছিল; সে ঝড় যথাসাধ্য গোপন করিয়া জিজ্ঞাসিল—সত্যি?

মাইরি!

সুলতা সেইখানে বসিয়া পড়িল। এত ভাগ্য তাহার হইবে! চৌদ্দ বৎসর পরে তাহার না-দেখা, না-মনে-পড়া স্বামী তাহার—তিনি ফিরিয়া আসিবেন। চৌদ্দবৎসর তাঁহার আশা-পথ চাহিয়া কাটাইয়া, আজ কি সত্যই তাহার জীবন ধন্য হইবে, তাঁহার দর্শন মিলিবে!

গিরি বলিল—ডাকি?

সুলতা অতি কষ্টে বলিল—ডাক্।

তুমি এইখানে বোস তবে।

—গিরি বনের দিকে চলিয়া গেল।

(খ)

এই প্রথম কথা।—

বাড়ী চলুন।

চলুন! তা' হলে যাব না।

বাড়ী চল।

যাব। কিন্তু, মা কোথায়?

মা কাশী গেছেন।

কাশী কেন? বাস করতে?

না।

তবে?

আপনার খোঁজে।

রঞ্জন হাসিয়া বলিল—তোমরা তা হলে আশা ছাড় নি, কি বল সুলতা ?

সুলতা এ কথার উত্তর দিল না। অভাগিনী নারী জ্ঞান হইয়া এই প্রথম নারীর জাগ্রত-দেবতাকে কাছে পাইল, কথা মুখে আসিয়া বাধিয়া গেল।

আর বাবা ?

বাবা বাড়ীতেই আছেন। চলুন—চল।

রঞ্জন বলিল—তাঁর সঙ্গে আজ ত দেখা করতে পারব না সুলতা !

সুলতা সভয়ে কহিল—কেন পারবেন না ?

সে কেনর উত্তর তোমাকে পরে বলব সুলতা। এখন এইটুকু তুমি জেনে রাখ, আমি লুকিয়ে এসেছি, লুকিয়ে থাকব—কেউ জান্তে না পারে। গিরি দিব্যি করেছে, কাউকে বলবে না, তুমি যদি লুকিয়ে রাখতে রাজী থাক, বল ; না রাজী থাক—চলে যাই। লোক জানাজানি হয়ে গেলে আমায় জেল যেতে হবে !

সুলতা সাগ্রহে বলিল—তাই থাকবেন, কেউ জান্তে পারবে না। চলুন।

আবার চলুন।

চল।—সুলতার লজ্জারক্ত মুখখানি নত হইয়া পড়িল।

দু-জনে চলিতে আরম্ভ করিল।

কত দিন এ রকম করে থাকতে হবে ?

কোন্ রকম করে' সুলতা ?

লুকিয়ে ?

বেশী দিন নয়—আট দশ দিন, তার পরই তার টাকা তামাদী হয়ে যাবে, আর ভয় নেই। আচ্ছা সুলতা, তুমি আমাকে চিন্তে পেরেছ ?

সুলতা ঘাড় নাড়িল।

পার নি ?

না।—তখন ক'দিনই বা আপনাকে আমি দেখেছি—দু'দিন ! আর চোদ্দো বছর আগের কথা।

হ্যাঁ।

মহেন্দ্র বসু মহাশয়ের কিঞ্চিৎ অর্থ-সম্পত্তি ছিল কিন্তু গৃহিণী যেভাবে অপব্যয় করিতেছেন তাহাতে মনে হইতেছে এমন দিন শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে, যেদিন মাথা রাখিবার এই বাড়ীটুকু তাহাও হয়ত তাঁহাদের থাকিবে না। কিন্তু গৃহিণীর কার্য্যে 'না' বলিবার সাধ্য কৈ ? ঐ যে লক্ষ্মী প্রতিমার মত বধূটি, তাহার মুখের হাসিটি ফুটাইতে সর্ব্বস্ব দিতেও ত কুণ্ঠা হয় না। আর সেই এক ছেলে, আর যে একটিও নাই। মরা-হাজা, ক্ষুদ-কুঁড়া ঐ একটা !

রঞ্জন বাড়ীর ভিতরে পা দিয়াই বলিল—এ যে বন হয়ে গেছে সুলতা !

সুলতা কথা কহিল না।

বাবা কোথায় ?

ঐ পূবদোয়ারী ঘরে। দেখা করবেন ?

না, না, সুলতা না।

বাবা চোখে দেখেন না।

রঞ্জন ব্যথিতকণ্ঠে বলিল—দেখেন না !

না।

তুমি কোন্ ঘরে থাক সুলতা ?

ঐ কোণের ঘরে।

আমাকে সেইখানেই রাখবে চল, সুলতা।

চল।

সুলতা ঘরে ঢুকিয়া মাদুর পাতিয়া দিল ; রঞ্জন বসিতে যাইবে, সুলতা তাহার পায়ের কাছে শুইয়া পড়িয়া, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, জিহ্বায় দিল।

রঞ্জন আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল—ওঠ সুলতা।

সুলতা উঠিল। কিন্তু সে সুলতা সে নয়, বর্ষার আকাশ যেন ধরণীর পানে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছে।

(গ)

প্রথম যৌবনে রঞ্জন কোন একটি মেয়েকে ভাল বাসিয়াছিল। তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পত্নীত্বে গ্রহণ করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু সে বিবাহ হয় নাই। না হইবার কারণ, যাহাদের মেয়ে তাহারা পাত্র-পক্ষের নিকট পাঁচ হাজার টাকা চাহিয়া বসিয়াছিল। মেয়েটি নাকি পরমাসুন্দরী ছিল ; বাপ মেয়ে বিক্রয় করিয়া একটা দেনা শোধ করিবার আশায় ছিলেন। রঞ্জন বাপ-মা'র কাছে টাকা চাহিয়া পায় নাই ; অধিকন্তু তাঁহারাও

গ্রামের পাঁচ-সাত জন মাতব্বর মিলিয়া জোর করিয়া একটা সহরে গিয়া তাহার বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন। বিবাহের কিছু দিন পরেই লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া রঞ্জন বাপের কোম্পানীর কাগজগুলা চুরি করিয়া বাপ-মা'কে চোখের জলে ভাসাইয়া পলায়ন করিয়াছিল। তাহার একাদশ বর্ষীয়া বালিকা-বধূ তখন পিত্রালয়ে।

খবরের কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হইল; কত স্থানে লোক গেল, রঞ্জনের কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। বৃদ্ধ পিতামাতা অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। সুলতার বাপ-মা পুত্র-হারা জনক-জননীর কাছে তখনই কন্যাটিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা এই কণ্টকটীকে সহ্য করিতে পারেন নাই কিন্তু অতি শীঘ্রই সুলতা তাহার সেবা-নিপুণ হস্তের সেবায়, সান্ত্বনা-পরায়ণ হৃদয়ের সান্ত্বনায় তাঁহাদের জ্বালার প্রাণে শান্তি আনিয়া দিল।

তারপর চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রঞ্জনের ফিরিবার আশা প্রায় সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছিল, কেবল তাহার দুঃখিনী মাতাই ছাড়িতে পারেন নাই। একবার গ্রামের কোন একটি বর্ষিয়সী নারী কাশী তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া সংবাদ দেন যে কাশীতে তিনি এক সন্ন্যাসীর একটি চেলাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে তাঁহার রঞ্জন বলিয়াই বিশ্বাস। তিনি তাহাকে রঞ্জন বলিয়া ডাকিয়াছিলেনও, সে তাহাতে খুব চটিয়া ধুনি ছাড়িয়া সেই যে উঠিয়া চলিয়া গেল, যে-ক'দিন তিনি কাশীতে ছিলেন, আর তাহাকে দেখা যায় নাই। এই খবর পাইবার পর বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার রঞ্জন-জননী পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গী করিয়া কাশী গিয়া থাকেন। যত মঠ আছে, যত সন্ন্যাসী ও তাঁহাদের চেলা আছে, সকলের কাছে গিয়া বসেন, কথা ক'ন, চাহিয়া চাহিয়া দেখেন কিন্তু হারানিধির সন্ধান নাই। তবুও এই আট বছর তাঁহার চেষ্টার আর বিরাম নাই। আজও সমানভাবে তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, পূজা দিতেছেন, প্রসাদ পাইতেছেন, আশা ছাড়িতে পারেন নাই। সেই যে তুলসীদাস বলিয়াছিলেন না, সবসে বসিয়ো, সবসে রসিয়ো, সবসে মিলিয়ো ধায়—ক্যা জানে ক্যা ভিখ্‌সে নারায়ণ মিল্ যায়!—রঞ্জন-জননী তাই আজও সন্ন্যাসী দেখেন, আর আলাপ করেন।

(ঘ)

তুমি খাবে না সুলতা?

খাব, তোমার পাতে। তুমি শোবে চল; তোমাকে বাতাস করে' ঘুম পাড়িয়ে এসে তখন খাব।

না, আমি শুইগে, তুমি খেয়ে এস।

না—তুমি চল।

তাহ'লে আমি যে বড়ই রাগ করব সুলতা।

সুলতা আর কোন কথা বলিল না। রঞ্জন শয়নকক্ষের দিকে চলিয়া গেল। সুলতা আহার করিতে বসিল মাত্র, খাইতে পারিল না। আজ যে অমৃত সে পান করিয়াছে, মনে হইতেছে, সে যদি আর দশবছরও না খায়, ক্ষুধায় কষ্ট তাহাকে পাইতে হইবে না। রান্নাঘর বন্ধ করিয়া সে শ্বশুরের কাছে গেল। শ্বশুর অন্ধকারে বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, পদশব্দে জিজ্ঞাসিলেন—দু'টি খেলে কি মা?

খেয়েছি বাবা।

যাও মা, শুয়ে পড়গে।

আপনার কিছু দরকার নেই বাবা?

না, মা, কিছু না। তুমি যাও।

সুলতা অন্ধকারেই ভূমিতে মাথা নামাইয়া প্রণাম করিল। শ্বশুর বলিলেন—ভগবান যেন মুখ তুলে তোর পানে চান্ মা, প্রাতর্বাক্যে এই আশীর্বাদ করি, আর কিছু না।

সুলতা স্বামীর কক্ষে উপস্থিত হইল। ডেলকোর উপর প্রদীপ জ্বলিতেছিল, প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া শয্যার পানে চাহিল, স্বামী নিদ্রিত। গোঁফদাড়ীর আবরণ ভেদ করিয়া মুখের যতটুকু দেখা যাইতেছিল, ততটুকুই কি সুন্দর, কি উজ্জ্বল! সুলতা মুগ্ধ হইল। আলোটি আরও উজ্জ্বল করিয়া দিল। জানালার পার্শ্বেই একখানা টুলের উপর একখানি আয়না ছিল, ফিরিতে চক্ষু সেইদিকে পড়িল। সুলতা সীমন্তের সিঁদুর রেখাটিকে বড় সরু, ক্ষীণ দেখিল; ক্ষিপ্রহস্তে কৌটাটি বাহির করিয়া পুরু করিয়া একটা রেখা টানিয়া দিল; কপালে একটি সিঁদুরেরই টিপ পরিল, তারপর স্বামীর পায়ের কাছে আসিয়া বসিল। পা দু'খানার চেহারা দেখিয়া সুলতার

কান্না পাইল। এত ফাটা, এত ক্ষতচিহ্ন! সুলতা পা দু'খানাকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া সযত্নে হাত বুলাইতে লাগিল।

স্বামী জাগিলেন না; সুলতার তাহাতে দুঃখ নাই। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া তিনি যেন এইভাবে শুইয়া থাকিয়াই তাহার সেবা গ্রহণ করেন।

ভোরের দিকে রঞ্জনের নিদ্রা ভাঙ্গিল।

সেকি! তুমি কি সারারাতই…

তার আর কি হয়েছে?

হয় নি এমন কিছু। তবে আমি কি ভাবছি জান সুলতা, কোনদিন স্বামীকে না পেয়েও এত ভালবাসা তোমার! শিখলে কোথায় সুলতা!

তুমি শোও, আমি তোমার পায়ে তেল দিয়ে দিই।

ও-হরি, একি করেছ গো! পা দু'টো যে তেলে চুব্ চুব্ করছে!

সুলতা বলিল—মালিস করলে আর কিছু থাকবে না। পা দু'টো দেখ্‌লে যে বুক ফেটে যায়—কত কষ্ট পেয়েছ, কত পথ হেঁটেছ, সব বোঝা যায়।…সুলতার চক্ষু ভরিয়া জল ঝরিল।

রঞ্জন সুলতার হাত ধরিল; কি যেন বলিবে, আবার না বলিয়াই ছাড়িয়া দিল; তারপর দু'হাতে তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া এই প্রথম—সুলতার মুখ চুম্বনে ভরাইয়া দিল।

(ঙ)

সুলতা পুকুর ঘাট হইতে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসিল—রাত্রে আজ কি খাবে বল? কি করব?

ঘর অন্ধকার।

সাড়া নাই।

অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ভাবিয়া সুলতার মনটি ক্ষুণ্ণ হইল। দেশলাই আনিয়া আলো জালিয়া দেখিল, কক্ষ শূন্য, কেহ নাই। বুকটা দমিয়া গেল। হয়ত ছাদে—সুলতা ছাদে উঠিল, ছাদশূন্য; হয়ত মাঝের ঘরে—সে ঘরও শূন্য; বাহিরে—নাই! পুকুরধারে নাই। সুলতার হাতের প্রদীপটা মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, সুলতা বসিয়া পড়িল।

রাত্রি বাড়িল। শ্বশুর ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন—আমার মাকে আজ দেখছি নে কেন? মা, মা-গো!

সুলতার নেশা ছুটিল। শ্বশুরের জন্য মুড়ী মুড়কী, জল দিয়া আসিয়া সে ঘরের মেঝেয় আছাড় খাইয়া পড়িল।

গিরি আসিয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিল; দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিল—ছাড়লি কেন মুখপুড়ী?

ছাড়ি নি, ছাড়ি নি; না বলে……

চাবি দিয়ে রাখতে পারিস্ নি?

সুলতা জিব্ কাটিল।

আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বল্লে, ভাল লাগছে না, জেলে চল্লুম।

কখন্? গিরি কখন্?

সন্ধ্যেবেলা।

সুলতা মাটিতে মাথা ঠুকিতে লাগিল।

(চ)

পাঁচদিন পরে।

মহেন্দ্রবাবুর ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া প্রায় দশ-পনেরটা লোক চীৎকার করিয়া কহিল—বোস্ মশাই, দেখুন দিকি, একে চিন্তে পারেন কি-না?

বোস্-জা বৃথা এদিক ওদিক করিয়া দেখিলেন, চক্ষে দৃষ্টি ছিল না, দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন—ভগবান কি আর দেখবার যো রেখেছেন ভাই! কে—বল?

লোকগুলা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—রঞ্জন!

রঞ্জন!—দৃষ্টিহীন, শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন বৃদ্ধের বুকে যেন আনন্দের বাণ ডাকিয়া উঠিল। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিতে উঠিতে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—রঞ্জন! রঞ্জন, কৈ রঞ্জন!

এই যে আমি!

দেখি!—বৃদ্ধ সাশ্রুনয়নে তাহার গায়ে মাথায়, জটায়, দাড়ীতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আর টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আনন্দাতিশয্যে বৃদ্ধ যে বিবস্ত্র হইয়া পড়িতেছিলেন তাহাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন, মথুর দাস কাপড়খানা আঁটিয়া দিল।

আনন্দের প্রথম উন্মাদনা কাটিলে, বোস-জা হাঁকিলেন—মা! মা! মা-আমার! ওরে বেটী কোথা গেলি!

সুলতা পুকুরঘাটে বসিয়া আর একটা অপরাহ্নের চিন্তা করিতেছিল, শুনিতে পাইল না।

বৃদ্ধ প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিলেন—মা, মা, ওমা, মা গো!

সুলতা কাঁপিয়া উঠিল। বাবারই গলা ত!

সুলতা উঠান হইতে বলিল—বাবা কি আমায় ডাকছেন।

আয় মা, আয়! ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, আয়—রঞ্জন আমার ফিরে এসেছে। আয়, আয় তোর হাতে তাকে সঁপে দিই মা আয়।

সুলতা'র পা দু'টা মাটিতে বসিয়া গেল। তবে আসিয়াছেন!

মা!

যাই বাবা!

আয় মা আয়—দেরী করিসনে, দেরী করলে হয়ত তোর বাবাকে আর বেঁচে থাকতে দেখ্‌তে পাবি নে। ওরে এত সুখ কি বর তে সয় রে! বুক যে অসাড় হয়ে যাবার যো হচ্ছে! আয় মা আয়, তুলে দিই, হাতে হাতে সঁপে দিই।—বৃদ্ধ বাতে পঙ্গু, দুই পা চলিবার সামর্থ্যও নাই।

সুলতা ঘরে ঢুকিতেই জটাজুটধারী সেই সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইল; তিনিই পিতার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পায়ের নীচে বসুমতী ঘুরিয়া গেল। সুলতা ব্যাধ-ভয়ে-ভীতা-হরিণীর মত "বাবাগো" শব্দে চীৎকার করিয়া অন্তঃপুরে আসিয়া মেজেয় লুটাইয়া পড়িল।

মহেন্দ্র পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ছেলেমানুষ, কখনও দেখেনি ত, আর এত লোক, বোধ হয় ভয় পেয়েছেন মা আমার।—তিনি সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—বাবা সকল, আজকের মতন তোমরা এস বাবা, কাল শিবতলায় বিশ ঢাক দিয়ে পূজোদোব, তোমাদের নেমন্তন্ন।

প্রতিবাসীরা চলিয়া গেল।

বোস-জা ডাকিলেন—মা!

সুলতা মাটী আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

মা-লক্ষ্মী। এইবার এসো মা, সব চলে গেছে।

সুলতা উঠিল।

কে গো মা-লক্ষ্মী···

সুলতা এবার চক্ষু মুদিয়াই ঘরে ঢুকিল। কিন্তু আপনা হইতেই পল্লবদ্বয় মুক্ত হইয়া গেল। না, না, সে নয়! ইচ্ছা হইল, চীৎকার করিয়া বলে—সে নয়! কিন্তু তখন যে সবাই জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কি করিয়া জানিলে যে সে নয়, আমরা গ্রামশুদ্ধ লোক দেখিতেছি—সেই!

সুলতার হাত পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মা এসেছ?

সুলতার নিঃশ্বাসের শব্দেই বোস-জা বুঝিলেন, সে আসিয়াছে।

বলিলেন—যাও বাবা রঞ্জন, ভিতরে যাও। তোমার গর্ভধারিণী কাশী গেছেন, কালই টেলিগ্রাম করে আনাচ্ছি—যাও বাবা, মা, নিয়ে যা বেটী।

সন্ন্যাসী নিজেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সুলতার পাশ দিয়া যাইবার সময় একটা তীব্র দৃষ্টি হানিতেও ছাড়িল না।

সুলতা শ্বশুরের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া অশ্রুভার কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—বাবা, উনিই···

হ্যাঁ রে বেটী, ঐ আমার রঞ্জন।

আপনি ত দেখ্‌তে পান্‌-না বাবা!

না মা তা পাই নি। তবে যারা ওকে এনেছে, তারা যে সব গাঁয়েরই ছেলে মা। সব এক জুটি, ছেলেবেলা থেকে ভাব-সাব!···

সুলতা আর একটী কথাও কহিল না। কাল-সাপের দংশন জ্বালায় জ্বলিয়া তাহার দেহ-মন অচেতন হইয়া আসিতেছিল। এই যে কয়দিন পূর্ব্বে দস্যুর হাতে, শয়তানের চরণে সে আত্মবলি দিয়াছে, দস্যুর ছোঁয়া, অপবিত্র, ঘৃণিত এই দেহ আজ দেবতাকে সে দিবে কি করিয়া এই ভাবিয়া সে মরিয়া যাইতেছিল!

সুলতা দশ দিক শূন্য দেখিল। ধরণী তাহাকে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সুলতা অতি কষ্টে অন্তঃপুরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী জ্যোৎস্না-প্লাবিত রোয়াকে বসিয়া গুণ-গুণ স্বরে ভজন গাহিতেছিলেন; তাহাকে আসিতে দেখিয়া ডাকিলেন—সুলতা!

সুলতা স্থিরভাবে দাঁড়াইল।

ওখানে দাঁড়ালে কেন সুলতা, কাছে এস। রাগ হয়েছে? কথা কইবে না? আমি যে তোমার কচি মুখখানি ভেবেই···

সুলতা মাটিতে বসিয়া পড়িয়া অশ্রুসিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—আমি আপনার যোগ্য নই।

কে বলেছে—যোগ্য নও! আমি ত সারা গাঁখানায় শুনে আস্‌ছি, এমন লক্ষ্মী বৌ গাঁয়ে আর একটী নেই।

তারা জানে না আমি অসতী।

অসতী!!!

সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

মিথ্যা কথা!

ভগবান সাক্ষী—মিথ্যা আমি বলি নি।

সন্ন্যাসী এক মুহূর্ত্ত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন—আর নিজের মুখে তাই তুমি স্বীকার করছ?

জ্ঞানকৃত পাপ—অস্বীকার করব কেন?

তাহ'লে কি করতে চাও?

আত্মহত্যা।

অন্ত প্রায়শ্চিত্ত?

মরণই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত?

—সুলতা মাতালের মত টলিতে টলিতে ঘরে ঢুকিল।

কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া খানিকক্ষণ লাঙ্গুলাহত ফণিনীর মত গর্জ্জাইয়া বেড়াইল। তারপর কুলুঙ্গীতে শ্বশুরের আফিমের কৌটা ছিল, লইয়া খুলিয়া দেখিল, প্রায় ভর্ত্তি। তুলিয়া গালে ফেলিবে, পিছন হইতে কে তার হাতটা চাপিয়া ধরিল।

ছাড়ুন। এ পাপদেহ স্পর্শ করে কলঙ্কিত হবেন না।

যদি বলি না ছেড়েও কলঙ্কিত হব না, তা'হলে?

স্বর যে সেই স্বর! যা কাণে বাজে, প্রাণে বাজে, ভুবনময় বাজে।

সুলতা মুখ ফিরাইল।

তুমি!!!

হ্যাঁ সুলতা আমিই চৌদ্দ বছর পরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা, একটু পরীক্ষা করতে সাধ হয়েছিল!

ও কে?

ও যাত্রাদলের একটী ছেলে, আমার ছেলে বয়সের বন্ধু।

সুলতার মাথা ঘুরিতেছিল।

সেবার না বলে' চলে গেছলে কেন?

এইজন্যে। আর যাব না, সুলতা, তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি, লুকিয়েও থাক্‌তে হবে না।

সেই যে কি বলেছিলে, জেল···

সে'ও মিথ্যে কথা সুলতা। ঐ জন্যেই বলেছিলুম।

আঃ—বাঁচলুম।

(ছ)

পূর্ব্ব কথা এই, রঞ্জন কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গিয়া কলকাতায় গিয়া দেখে যে প্রেয়সীর তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। হতাশ-প্রেমিক সন্ন্যাস লইয়া তখন সারা ভারত ভ্রমণ করিল; প্রেম যখন শুকাইয়া আসিল, অর্থও নিঃশেষিত হইল, তখন—গৃহেই প্রত্যাগমন করা ছাড়া সদ্যুক্তি আর সে দেখিতে পাইল না। তবে পাড়াগাঁয়ের বৌ-ঝির সম্বন্ধে নানা-কথা শোনা যায় বলিয়াই একটা পরীক্ষা করিবার ঝোঁক তাহার চাপিয়াছিল। তজ্জন্য সে সুলতার নিকট ক্ষমা চাহিল। স্বামী পাইয়া এ ছোট কথাটা সে সত্বই ভুলিয়া গেল।

কিন্তু বন্ধু-বান্ধব মহলে নব্য-ধরণের অগ্নি-পরীক্ষার কথাটা অনেকদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিল।

আহুতি

(উপন্যাস)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

(৩)

বড় মানুষের ঘরের একমাত্র ছেলেটী হইলে যাহা হয়, নলিনের ও তাহাই হইয়াছিল, মনের কোন একটা ইচ্ছাকেই অপূর্ণ থাকিতে দেখা এতবড় দুর্ভাগ্য তাহার জীবনে কখনও হয় নাই। যতদিন ছোট ছিল স্বল্পপরিসর পল্লীগ্রামে সীমাবদ্ধ ইচ্ছা এবং তাহার সফল-নিবৃত্তিতেই তাহার পরিতৃপ্তি ছিল, কিন্তু কলেজে পড়িতে আসিয়া যখন আজব সহর কলিকাতার বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার তাড়নায় মন তাহার চঞ্চল হইয়া উঠিল, তখন পল্লীগ্রামে বসিয়া তাহার জমিদার পিতাও প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু, শৈশবাবধি কোনরকম বাধা না পাইয়া চলাই যাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, কলেজে পড়িতে গিয়া কোনরকম বাধার নামমাত্র শুনলেই তাহার উদ্ধত চিত্ত গর্জিয়া উঠিত, কিন্তু পিতার দুর্ব্বলতা যে কোথায় তাহা সে জানিত, তাই, 'টাকা পাঠাইব না' বলিয়া ভয় দেখাইলেও সে ভয় পাইত না, বরঞ্চ তাহারই চিঠির বাক্সে এমনই কিছুর খোঁচা থাকিত, যাহাতে ভয়ার্ত্ত পিতা পুত্রের সে অভিমান ভাঙ্গাইতে তিলমাত্র বিলম্ব করিতেন না।

অনেক গুলি সন্তান পর পর হারাইয়া, বৃদ্ধ বয়সের এই পুত্রটীর জন্য, স্নেহ-দুর্ব্বল পিতার মনে প্রাণে আশঙ্কার আর অবধি ছিল না। তুচ্ছ টাকার জন্য বিদেশে বাস্ত বকই তাহাকে কোন রকমে কষ্ট পাইতে হইবে, একথা মনে হইলে তাঁহার সমুদয় ক্রোধ নিমেষে উড়িয়া যাইত।—কলিকাতার আব-হাওয়ার রকমও তাঁহার বিশেষ জানা ছিল না, তাই, ম্যানেজার কিম্বা অন্যান্য কর্ম্মচারীরা যাহাতে ভীত হইত, তিনি তাহা প্রায় হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে পুত্রের একখানি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়িয়া তাহারই প্রতীক্ষার আশা-পথে চাহিয়া থাকিতেন।

সেবারে বি-এ পাশ করিয়া নলিন যখন গ্রামে আসিল, তখন পিতা পুত্রের স্বভাবের যে পরিচয়খানি পাইলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার আশাময় স্বপ্নের রাজ্যখানি হইতে হঠাৎ কয়েক ধাপ নীচে নামিয়া পড়িলেন, এবং স্থির করিলেন, পড়া যথেষ্ট হইয়াছে, যাহাকে জমিদারী দেখিতে হইবে, নামের পেছনে তাহার মিথ্যা কতগুলো 'ল্যাজ' জুড়িয়া দিবার দরকারই বা আর কি! এইবার সে গ্রামে থাকিয়া 'মহাল' গুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া জমিদারী শিখুক।

(৪)

নলিনকে দেখিয়া অন্নপূর্ণা দেবীর বুকের ভিতরটা যত বেশী পরিমাণে হাহাকার করিয়া উঠিত, কন্যাকে তিনি সেই পরিমাণে আড়ালে রাখিয়া চলিতেন। মালতীও প্রথম প্রথম নলিনদার সম্মুখে বাহির হইত না, কিন্তু, নলিন যে ভাবে ঘরের ছেলের মতই সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করিতে লাগিল, তাহাতে বহুদিন আর 'দেয়ালের আড়াল' থাকা চলিল না, মালতী প্রয়োজন মত নলিনের সম্মুখে আসিত সত্য, কিন্তু মায়ের অসাক্ষাতে কখনও কথা বলিতে সাহস পাইত না।

বাহির হইতে যত কঠোর নিয়মেই মাতা কন্যাকে তাহার নিজের মনখানি হইতেও তফাতে রাখিতে চাহিতেন, কন্যা সেই পরিমাণে নিজের স্বপ্নের জালে নিজেই আপনাকে জড়াইয়া ফেলিতেছিল। সে হরিমতীর কাছে উপকথায় মধু-মালার কাহিনী শুনিতে, হরিমতী যখন মিষ্টি করুণ গলায় গান গাহিত, স্বপ্নে দেখি মধুমালার দেশ রে—'তখন তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিত, এবং স্বপ্নে-দেখা সেই অজানা-প্রিয়ার রাজ্যের জন্য মন তাহার হাহাকার করিয়া উঠিত। হরিমতী কাছে পৌরাণিক গল্পে মালতী রাধার সেই ব্যাকুল বিলাপ শুনিত—

'কৃষ্ণ কালো তমাল কালো,
তাই তমাল বড় ভালবাসি,
(আমি) মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরই ডালে—
সখি, যেন ভুলোনা—'

হরিমতীর কাছে মালতী দময়ন্তী শকুন্তলার উপাখ্যান শুনিত,—সেই আকাশপথে হাঁস নামিয়া আসা,—সে-ই ফুলগাছের আড়ালে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার মিলন,—মালতীর মন কি এক অজানা বেদনায় ছটফট করিয়া মরিত। মাতার অতিরিক্ত সতর্কতা, তাহার চিন্তার পথ শুধু সুগমই করিয়া তুলিত,—বাধা পাইয়া তাহার মন দমিত না।—বাংলার চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কিশোরী কন্যার অন্তরে কত প্রেম যে তাহারও অজ্ঞাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকে,—কে তাহার খোঁজ রাখে! এই প্রেমের বেদনা-ঘন-আনন্দটুকু বিশ্বের চারিদিকেই ছড়াইয়া পড়ে। মালতীর চোখে মুখে দেহে—সর্ব্বত্র একটা কোমলতা মাখা হইয়া রহিল।

সারাটা দিন মালতী মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কাজ করিয়া, মাকে রামায়ণ মহাভারত শোনাইয়া কাটাইয়া দিত, কিন্তু সন্ধ্যার পর দাওয়ায় বসিলে, ঐ লক্ষ লক্ষ যোজন দূরের অনন্ত আকাশ যখন তাহার অপার-রহস্যময় হৃদয়খানি তাহার চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়া দিত, তখনই কোথা হইতে যৌবনের তরল স্রোতের ঢেউ আসিয়া তাহার রুদ্ধ-দুয়ারে আঘাত করিয়া যাইত। একধারে মা বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন, নিকটে, আশে পাশে কোথাও আর জন-মানবের চিহ্নমাত্র নাই, কেবল ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ ধ্বনি এবং ঐ অল্প পরিসর নদীটির অনির্দ্দিষ্ট কেমনতর একটা শব্দ! সম্মুখের উঠানটা আধ আলো আধ ছায়ায় ঢাকা, গাছগুলির পাতার ভিতরে ভিতরে অসংখ্য জোনাকী এদিক ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলিতেছে,—কেমন যেন একটা দৃশ্য, কেমন যেন একটা ভাব! মনটা যেন একটা অজানা উদ্দাম বেগে উধাও হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে চায়! যেন সহ্য হয় না, অথচ ভালও লাগে। বসিয়া বসিয়া স্বপ্নের ঘোরে চক্ষু কেমন মুদিয়া আসে,—ভাবনার পর ভাবনা,—যেন অন্তহীন ভাবনা মনখানি জুড়িয়া বসে,—মনে হয় একটী সঙ্গী থাকিলে যেন বেশ হইত। পাড়ার মেয়েরা আজকাল খুব অল্পই আসে,—আসে কেবল নলিনদা, তা নলিনদা ত পুরুষ মানুষ, সে যার কাছেই আসে, মার সঙ্গেই কথা কয়! তাহার পর আবার স্বপ্নের ঘোর কোথা হইতে ফিরিয়া কোথায় চলিয়া যায়! ঠিক একটা চিন্তা কিম্বা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে ভাবনা কিছু নয়, কিন্তু তবু অব্যক্ত একটা যেন কি—মালতীর মন আচ্ছন্ন করে। ঠিক সে সময় মাও যদি ডাকিয়া কোন কাজের কথা বলেন ত মালতী বিরক্ত হয়। দিনের পর দিন এই ভাবেই কাটিয়া যায়, মাতা কন্যার ভাবান্তর দেখিতে পান, কিন্তু কিছু বলেন না। এক একবার মনে হয়, ভবিষ্যৎ যাহার কেবলমাত্র এমনই মিথ্যা স্বপ্নের ঘোরেই কাটিবে, তাহার এ সুখ-স্বপ্নটুকু ভাঙ্গিয়া লাভ কি? বাস্তব যাহার এত মিথ্যা, কল্পনায় উধাও হইয়া উড়িয়াই সে বেড়াক্—আবার কখনও মনে হয়, অভাগী যদি মনে নতুন আশার সৃজন করিয়া তোলে, তাহাতে ত মঙ্গল হইবে না,—ইহার চেয়ে স্পষ্ট সব জানাইয়া দেওয়াই কি ভাল নয়? কিন্তু তবু, যে ক'দিন অমনিই চলে চলুক!

কিন্তু মাতার এই নীরবতা সত্ত্বেও মালতীর নিকট আপন অবস্থা আর অধিক দিন অপরিজ্ঞাত রহিল না। একদিন মাসীমার বাড়ীতে এক নবাগতা আত্মীয়া সবিস্ময়ে অন্নপূর্ণা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "হ্যাঁ গা, ষেঠের কোলে বাছা তোমার এত বড়টী হয়েছে, আর কি আইবুড় রাখা ভাল দেখায়?" আর একজন হিতৈষিণী অত্যন্ত দুঃখে মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন,—"আহা, কি যে বল্‌চো, শ্বশুর ঘর করবে, মেয়ে কি সে কপাল করেই এসেছে? রূপখানি যেমনি কপালখানিও যদি তেমনিই হ'ত, তবেই না মেয়ের সুখের ভরপূর হ'ত!"

"কেন গা,—?"

"আহা দিদি, জান না? মেয়ের যে কপাল পুড়েছে গো, সেও কি আজ! সে মেয়ের আট বছর বয়সে!"

"গৌরীদান করেছিলে বুঝি?"

অন্নপূর্ণা দেবী নীরবে কন্যাকে লইয়া গৃহে চলিয়া আসিলেন। পথে মাতা-পুত্রীতে একটী কথাও হইল না।

অমাবস্যার দারুণ অন্ধকারে সারাখানি পৃথিবী গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, নিকটবর্ত্তী মন্দিরে আরতির বাজনা

বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে,—মালতী স্বপ্নাবিষ্টের মত বারান্দায় একটা থামে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাশের বাড়ীতে ঘোষেদের বউ-এর ছোট-ছেলেটা মায়ের কোলে উঠিবার জন্য চেঁচাইয়া কাঁদিতেছে, সমস্ত প্রাণ দিয়া মালতী সেই কান্না শুনিতে লাগিল,—তাহার ভয় হইতেছিল এমনি একটা বিরাট-ধ্বনি কাণে না ঢুকিলে বোধ হয় সে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। প্রতিদিনকার মত সন্ধ্যা আজিও আসিয়াছে, প্রতিদিনকার মত ছেলেটা আজিও কাঁদিতেছে, মাঝে মাঝে রন্ধন-নিরতা বউটীর হাতা-বেড়ী নাড়িবার ঠন্ ঠন্ শব্দও কাণে আসিতেছে,—পৃথিবী তবে কি তেমনই আছে? দারুণ-প্রলয়ে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যায় নাই! মালতী মনে মনে একটা প্রবল আশ্বাস পাইয়া যেন সাহস পাইয়া চারিদিকে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য যাহার চিরদিনের সাথী, বাহিরের কৃত্রিমতায় তাহার তৃপ্তি কতটুকু! মা আজ বিনা প্রয়োজনে কেবলই কাজের ছল করিয়া দূরে দূরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মালতীর হাসি পাইল, তাই ত, মার আজ অত ভয় কিসের! তিনি গৌরীদানের পুণ্য ত সঞ্চয় করিয়াছেনই : আজ তবে পুণ্যলাভের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া না উঠিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি কেন শিহরিয়া উঠিতেছেন?

মালতী আপন ইচ্ছামত চলিতে লাগিল—ইচ্ছা হইলে স্নান করে। খায়, আবার কখনও একইভাবে নীরবে ঘরের কোণে বসিয়া থাকে, মাতার সঙ্গে কথা বলে না, ডাকিলে সকল সময় সাড়া পর্য্যন্ত দেয় না। দুইদিন তিনদিন এমনই ভাবে চলিয়া গেল, চতুর্থদিন সন্ধ্যার পর পূজা আহ্নিক শেষ করিয়া মা কন্যার শিয়রে যাইয়া বসিলেন। মালতী জাগিয়াই ছিল, কিন্তু কথা বলিল না। মা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বলিলেন,—"কেন আমায় অমন করে ব্যথা দিচ্ছিস্ মা? আজ ক'দিন ধরে বুকে কি আগুন জলছে আমার,—কি করেছি আমি বল্?"

মালতী চুপ করিয়া রহিল। মা কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—'তুই সন্তান, মার ব্যথা তুই কি বুঝ্‌বি! কিন্তু ওরে অকৃতজ্ঞ, তোর ব্যথা তোর দশগুণ হয়ে কি আমার বুকে জলছে না রে!"

"কেন এতদিন আমায় জানাওনি বল—"

"কি হ'ত জানিয়ে? আর কি হয়েছেই বা তাতে? তুই আমার বুক জুড়ে যেমনটী আছিস্, আমার মরণ পর্য্যন্ত এম্‌নিই তুই থাক্‌বি আমার। কোথায় তোর অভাব, কি অভাব বল্? কেন, কত মেয়ে ত চিরকাল এম্‌নি কুমারীই থেকে যায়, তাই বলে তাদের আবার কষ্ট বলে কিছু আছে কি?"

মালতী চুপ করিয়া রহিল,—তাই ত, তাহার কষ্ট কোথায়? অভাবই বা কোথায়? মালতী বহুক্ষণ ভাবিয়া দেখিল, কিন্তু ঠিক কিছুই বুঝিল না, তথাপি মনে হইতে লাগিল কোথায় যেন কোন্ ক্ষতের উপর একটা সূঁচ ফুটিয়া রহিয়াছে,—যেন নৈরাশ্যের একটা প্রবল ঝড়ে বুকের কোন্ জায়গাটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মাকে কি অত কথা বলা যায়! দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন মালতী মাকে বলিল,—"মা, তুমি যে প্রতিদিনই একই নিয়মে পূজা কর. আহ্নিক কর, তা'তে কি কিছু ফল পাও?"

মা হাসিয়া বলিলেন, "শরদিন উঠে দাঁড়াবার শক্তি পাই মা। যদি এই পূজাটুকু আমার মনে না থাকৃত, এত দুঃখের পরও তোকে কি আমি বড় করে তুলতে পারতুম?"

"তুমি কি ভগবানকে দেখতে পাও?"

"পাই-ই সে কথা কি বলতে পারি মা? পূজা করতে বসলেই ওঁর মূর্ত্তিই আমার চোখে ফুটে ওঠে ওঁর মাঝেই আমি ভগবানকে দেখ্‌তে পাই। ওঁর কাছেই আমি তোর জন্যে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

মালতী বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, মাতা নীরবে কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কন্যার অন্তরের ভিতর একটা প্রবল দ্বন্দ্ব যে অহর্নিশ চলিতেছে, মাতা তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর কি করিবার আছে? বিধাতার নিদারুণ সংহারের উপর তাঁহার স্নেহদুর্ব্বল মাতৃহৃদয় বেদনায় অস্থির হইয়া উন্মাদ হইতেও পারে, কিন্তু বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারে কি? মালতী সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল,—"মা, আমি কিসের মধ্যে ভগবানকে দেখতে পাব মা? শূণ্যের মধ্যে তাঁর কোনরূপ ত আমি দেখতে পাই না!"

মার চক্ষু ফাটিয়া উষ্ণ জল পড়িতে লাগিল,—হায়রে অভাগী বালিকা, কি সান্ত্বনার বাণী তোকে আর বলিবার আছে! ভগবানের কোন্ রূপের আদর্শ আজ তোর চক্ষুর সম্মুখে স্থাপন করিতে পারি?

"মালতী, কি বলবো তোকে মা,—রামায়ণ মহাভারত ত পড়েছিস্, নিজের অবস্থাও বুঝ্‌তে পারিস্—আমি তোকে কি বলবো বল্? ভগবানকে যদি দেখতে চাস্, পেতে চাস্, কল্পনায় মনের মধ্যে একটা মূর্ত্তি গড়ে নে, মা। তাঁর রূপের চিন্তা করতে হলে, সে কি আর অন্যের বলে দিতে হয়, মণি!"

মালতী চক্ষু মুদিয়া কল্পনায় তাহার সেই শৈশব কালের মৃত অজানা স্বামীর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে বসিল,—কিন্তু একি!—মনের অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়া এ কাহার মূর্ত্তি ফুটিয়া ওঠে! এ যে নলিন দা! এ মূর্ত্তি দূরে ঠেলিয়া মালতী বার বার আর একজন অচেনা অজানাকে ভাবিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বার বার প্রতিবারই এ কি হয়! নৈরাশ্যের বেদনায় মালতী সকল চিন্তাই দূর করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু চিন্তা যে আপনি আসিয়া মন অধিকার করিয়া বসে! বারে বারে কেন এ মূর্ত্তিই শুধু এত সহজে মনে ফুটিয়া উঠে রে? এ কি, এ কি! মালতী ভয় পাইয়া শিহরিয়া উঠিল। মা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে মালতী?"

মালতী আড়ষ্টস্বরে বলিল, "আমি চোখ বুঁজে ভগবানকে দেখতে পাইনে যে, আমার কেমন যেন হয়?"

মাতা কন্যাকে বুকে জড়াইয়া বলিলেন, "থাক্ মা, কিছু ভাবতে হবে না, আরো বড় হ'লে আপনি তখন হবে।"

কিন্তু কয়েকবার ব্যর্থ মনোরথ হইয়া অবশেষে তাহাই যেন ভাল লাগিল। মালতীর কেমন নেশার মত হইয়া গেল, সে বারবার সেই মূর্ত্তিই দেখিতে লাগিল। এক একবার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে সত্য,—কিন্তু কেন, ইঁহার মধ্যে কি ভগবানকে পাওয়া যাইবে না? মালতী আপন মনে ভাবিতে লাগিল,—যাঁহাকে চিনি না তাঁহাকে কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইব? এই অত্যন্ত চেনা, অত্যন্ত সহজ মূর্ত্তির মধ্যেই কি আমি তাঁহাকে পাইতে পারি না? মা বলিয়াছেন—নিষ্কাম পূজাই পূজা,—তবে আমার এ কামনা-হীন, স্বার্থহীন পূজা কেন তাঁহার চরণে যাইয়া পৌছিবে না? এ-ই ভাল, আমার এ-ই ভাল। মালতী প্রাণ মন পূর্ণ করিয়া সেই মূর্ত্তির মধ্যেই ভগবানকে পূজা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)
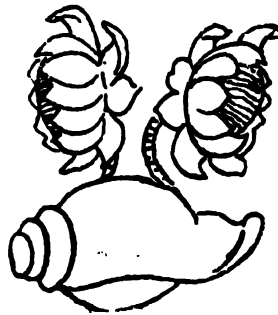
চল্‌তি-ট্রেণের গায়ক

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

(১)

চল্‌তি ট্রেণে গান গাহি ভাই
লুট করিনে আমরা ত,
ক্ষণিক তরে গীতের সুরে,
ভরি তোমার কামরা ত,
কেউ বা রাগে মুখ করে,
কেউ বা শোনে চুপ করে,
ভয় নাহি ভাই, বসবো নাক
আমরা উড়ো ভোম্‌রা ত!

(২)

কই করিনে আমরা ফেরী
চাইনে কড়ি বিষ্‌ দিয়ে,
বনের শ্যামা ভিক্‌ মাগি ভাই
মনের কোণে শিষ দিয়ে।
কয়লা ধোঁয়ার মাঝখানে
ধূপের আমেজ ঝাঁজ আনে,
ভিড়ের মাঝে বাউল নাচের
তোমরা জানো দাম কত!

(৩)

জড়াই জগৎপতির কথা
রেলের গতির সঙ্গেতে,
স্মরাই যাতায়াতের ব্যথা
পথেই নানান রঙ্গেতে।
আমরা কাঁটা জঞ্জালই
আনি ফুলের অঞ্জলি,
সন্ধ্যারতির গন্ধ নিয়ে
ফিরবে ঘরে তোমরা ত।
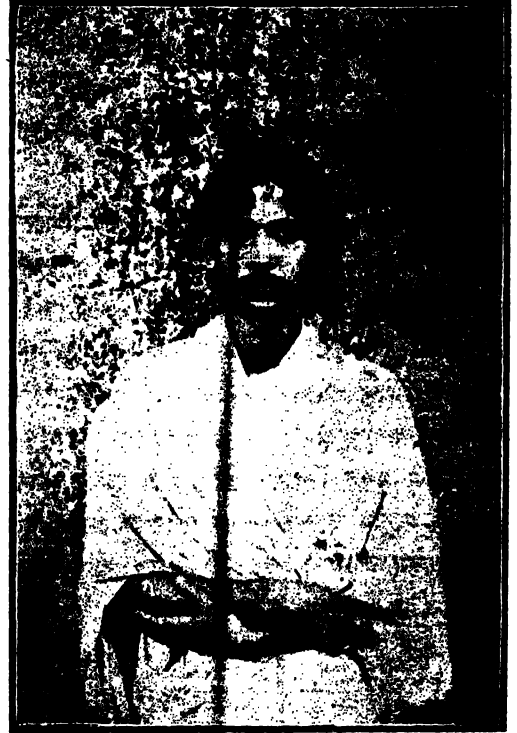
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

(৪)

মুক্ত হিয়ার মুক্তা ছড়াই
আমরা রহি বন্ধনে,
নাইক বড়াই, তিলক পরাই
বুকের হরি চন্দনে।
দিই সুদূরের সংবাদই
নই মোরা বিসংবাদী,
বেদন মোদের শুনলে পরে
চক্ষু তোমার ঝামরা ত!

ডিপুটি

[রায় শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, ডি-লিট্]

রসিক ডিপুটি স্ত্রীর শোকে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলেন। আফিসে বসে সাক্ষীর জবানবন্দী লিখ্তেন, মোক্তারদের বক্তৃতা শুনতেন, রায় লিখ্তেন—কিন্তু মন পড়ে থাক্‌ত সেই দুইখানি সোনার চুড়ি-পরা হাতের উপর, স্ত্রীর সুন্দর মুখখানির উপর ও তাঁর আচল-নাড়া বাতাসটুকুর উপর। স্ত্রী হঠাৎ মারা যান্। এ কি হোল?—"মাথাটা কেমন করছে" বলে বালিসের উপর হেলে পড়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌লেন, আর ডাক্তার ডাকবার তর্ সইল না। সেদিনটা কি ভয়ঙ্কর,—কোন সূচনা নাই, আকাশ দিব্যি নীল, রোদে ঝলক্ খেলছে, হঠাৎ যেন বজ্রপাত!

এক মাসের ছুটি নিয়েছিলেন, ফুরিয়ে গেল, এই এক মাসের একটি রাত্রিও ঘুমুতে পারেন নাই। হঠাৎ যেই চোখদুটি একটু বুঁজে এসেছে, অমনই বুকটা ধড়ফড় করে জেগে উঠেছেন, কে যেন কোমল হাতে তাঁকে ছুঁয়ে—তাঁকে পাগল করে জাগিয়ে দিয়ে গেল। ডিপুটি বাবুর চোখে ঘুম নেই, পেটে ভাত নেই। পৃথিবীটা তাঁর কাছে কেমন কেমন ঠেক্‌ছে, যা দেখ্‌ছেন তাতেই চখে জল আস্‌ছে কেন? কে যেন কাছে কাছে ছিল—চলে গেছে, তার বুকের হাড় কেটে খেলতে খেলতে প্রাণটা বার করে নিয়ে গেছে।

কিন্তু একমাস কেটে গেল, মাঘ-মাসে তিনি মরেছেন। ফাল্গুন হোল, সন্ধ্যায় লাল মালতীগুলি পুকুর পাড়ে ফুটল, আমের মুকুলের পাশে ভোম্‌রার দল গুণ্ গুণ্ করে উড়তে লাগ্‌ল। বন্ধু-বান্ধব-যাদের সঙ্গে কত কথা কইতেন, হাসি ক্রমে উচু হোয়ে বাতাস কাঁপিয়ে তুল্‌ত, গল্পের বিরাম হোত না, কথার অবধি ছিল না, তাঁরা আসেন, কিন্তু রসিক বাবু নিতান্ত অপরাধীর মত যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান। দেখা হোলে তাদের কথার উত্তর যত সংক্ষেপে পারেন দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন—যারা তাঁর স্ত্রীর কথা তুললে উঠে পড়েন এবং হাত উচু করে "তবে আসুন, নমস্কার"—বলে হঠাৎ শয়ন কক্ষে ঢুকে পড়েন। এই একমাস তাঁর চুলে চিরুনি পড়ে নি, আরসীতে তিনি মুখ দেখেন নি, কোটে বোতাম আটকান্ নি।

এই ভাবে একমাস চলে গেল, আবার আজ ধরা চুড়া প'রে আফিসে যাবার পালা। কিন্তু পা'যে আর চল্‌ছে না। গাড়ী আফিসের দোর গোড়ায় এসে লাগ্‌ল। কিন্তু ডিপুটিবাবু বসেই রইলেন, আরদালী এসে নথী পত্র নিয়ে দাঁড়াল, পাঁচ মিনিট কেটে গেল—ডিপুটি বাবু মাথা হেঁট করে কি ভাব্‌ছেন্। শেষ আরদালীটা সাহস কোরে বল্ল, "হুজুর আফিসের দোরে গাড়ী এসেছে," চমক ভেঙ্গে রসিক বাবু উঠে পড়্‌লেন এবং আফিসে এসে বসে পড়লেন। নাজীর এসে আরজীগুলি পেশ কল্ল, মাথা মুণ্ডু যা তা হুকুম দিয়ে তিনি সাক্ষীর জবানবন্দী লিখ্‌তে বসলেন। কোন সাক্ষী উত্তর দিতে দেরী করলে হাকিম বেজায় চটে যেতে লাগ্‌লেন, মোক্তারদের উপর চোখ রাঙ্গায়ে "থামুন থামুন, আমি বলছি—থামুন" বোলে তাঁর বক্তৃতা মধ্য-পথে বন্ধ করে দিতে লাগ্‌লেন; ঘরে দুটো লোক জোরে কথা বল্‌ছিল, তাদেরে কাণ ধ'রে বের ক'রে দিতে হুকুম দিলেন। এ কি ব্যাপার! এমন সদাশিব হাকিম, এমন মাটীর মানুষ, আজ এমন বেয়াড়া হোয়ে পড়্‌লেন কেন?

উকিল, মোক্তার, সেরেস্তাদার প্রভৃতি সকলে ভেবে-ছিলেন, যখন ডিপুটি বাবু টিফিন কর্‌তে খাস কামরায় যাবেন, তখন তাঁরা যেয়ে তাঁর দুঃখে দুঃখ জানাবেন, এমন কি একজন উকীলের একটি পিস্‌তুত বোন খুব ডাগর হয়ে উঠেছে, সহানুভূতি জানিয়ে পাকেচক্রে তার সঙ্গে তিনি বিয়ের সম্বন্ধটাও তুলবেন এই ছিল উদ্দেশ্য। এক মাস তো হোয়ে গেছে, এই সস্তা কণের বাজারে কোন স্বামীর শোক এক মাসের বেশী থাকতে পারে না, অন্ততঃ

এই সময়টার মধ্যে মনটা এমন তৈরী হওয়ার কথা, যাতে ক'রে বিয়ের কথাটাও কাণে তুলতে পারা যায়। কিন্তু সব সুবিধা ও আয়োজন ফস্কে গেল, হাকিম বাবু তো খাস কামরায় গেলেনই না, তার উপর এমনই রাগগোঁসা ও কাঁপুনি ঝাঁপুনি দেখাতে লাগ্‌লেন, যে কার সাধ্য তার কাছে এগোয়।

টং টং করে পাঁচটা বেজে গেল, এক মোক্তার বল্লেন, "এইখানেই কি সাক্ষীর জবানবন্দী বন্ধ করব? মোকদ্দমাটা বেজায় জটিল, এর পরের সাক্ষীকে খুব জেরা কর্ত্তে হবে, আজকার মতন তবে এইখানেই থাক্?"

"না না না, তা হোতেই পারে না—সে কথাই আজ শুনব না, মোকদ্দমা চালাতেই হবে—আপনাদের জেরা ও বক্তৃতা আরও শুনব"—এই বলে হাকিম টেবিলের উপর খুব জোরে ডিলটা কিল মেরে চুপ কোরে ব'সে রইলেন।

সুতরাং সাক্ষীর জেরা চল্‌ল, মোক্তারদের জেরা চল্‌তে লাগল, ৬টা বেজে গেল; লোক সব হয়রান হোয়ে গেল; হাকিম মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলছেন—"আরও চলুক, হরদম্ চলুক" এবং এই বলে ঘাড় হেঁট কোরে জবানবন্দী লিখছেন। সাক্ষী যখন চুপ ক'রে থাকে তখনও লিখছেন, যখন কথা বলে তখনও লিখ্‌ছেন, মোক্তাররা যখন চেঁচামিচি কোরে জেরা করে, তখনও লিখছেন। লেখার আর বিরাম নেই। আর এক সাক্ষী কাঠগড়া হোতে নেবে গেল, আর কেউ তখনও কাঠগড়ায় আসে নি, তখনও কলমের বিরাম নাই, লিখ্‌ছেন, লিখ্‌ছেন, কেবলই লিখে যাচ্ছেন; লিখতে লিখতে কাগজ লিখে ফেলছেন, আর যখন তখন একবার করে চাইছেন, জবা ফুলের মত দুইটা চোখে এমনই রাগের বাণ খেলছে, যে সমস্ত কাছারীটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়্‌ছে।

এইভাবে রাত আটটা বেজে গেল, মোক্তাররা বল্লেন "হুজুর আমাদের ছুটি দিন—আর পারি না, সেই দশটায় এসেছি!"

হাকিম বেতটা উঁচিয়ে একটা মোক্তারকে প্রায় আক্রমণ করতে যান আর কি! "চলুক—বাজে কথা বোলে সময় নষ্ট করলেন তো বুঝে নেব। জেরা চলুক, জেরা চলুক—মক্কেলের টাকা অমনই হাতাবেন—সেটি হচ্ছে না; আমি বলছি জেরা চলুক, থামাবেন না।"

মোক্তারদের বক্তৃতার ফোয়ারা ক্রমে শুকিয়ে গেল; খিদেয় পেট জলছে, ব'কে ব'কে মুখে ফেনা উঠেছে—তালু শুকিয়ে গেছে, আর কি কথা বেরোয়?" হাকিমের ভয়ে অতি কাহিল হোয়ে ছয় মাসের জ্বরের রোগীর সুরে কোঁকিয়ে যা হোক কিছু বলছেন। কিন্তু ষাট বছরের বুড় নবীন মোক্তার—নেবে এসে আর দুই একজন মোক্তারকে বল্লেন, "একি মগের মুল্লুক নাকি? ঢের ঢের হাকিম দেখেছি, এইখানে সারারাত জেগে সাক্ষীর জেরা করব, কি দায়! চলুন আমরা চলে যাই।" এই কথাগুলি হাকিম যেন শুনতে পেলেন, তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে একটা আরদালীকে বল্লেন, "ঐ দরজাটা বন্ধ ক'রে দে এবং ঐখানে দাঁড়িয়ে থাক—কেউ যাবে ত বেত খাবি।" হাকিমের হুকুম তখনই তামিল হোয়ে গেল।

নবীন মোক্তার ভ্রুকুটি করে দাঁড়িয়ে রইলেন, গতিক দেখে তাঁরও প্রাণে ভয় হোল, কি জানি জোর জবরদস্তি কল্লে যদি হাকিম অপমান করেন। কিছুকাল পরে পকেট-বুক হোতে একটুকরা কাগজ বের করে পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন—কাছারী ঘরে চোটপাট শুনে ও দরজা বন্ধ করতে দেখে কতকগুলি বাইরের লোক জানালায় ঝুঁকে প'ড়ে কি হচ্ছে তাই দেখছে, তখন রাত প্রায় ৯টা। নবীন বাবু একটা লোককে ডেকে ফিস ফিস্ কোরে বলে দিলেন—"তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই চিরকুটখানি দিয়ে এস।"

কিছুকাল পরে ম্যাজিষ্ট্রেটের আরদালী এসে দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল, ডিপুটির আরদালী তার গলার আওয়াজ চিনতে পেরে দরজা খুলে দিল। সে ঘরে ঢুকে ডিপুটী বাবুকে সেলাম করে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের লেখা এক টুকরা কাগজ তাঁর হাতে দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাউন সাহেব লিখছেন—"প্রিয় রসিক বাবু, এত রাত পর্য্যন্ত কাছারী কচ্ছেন কেন? মোক্তাররা তো ক্ষেপে গেছেন দেখি—যা তা লিখে পাঠিয়েছেন। এইবার ছুটি করুন।"

রসিক বাবু দুইটা চোখ খুব বড় ক'রে সেই কাগজের

দিকে রেখে খানিকটা চেয়ে রইলেন, তাঁর মুখের উপর যেন আগুনের হল্কা চলে গেল—তারপর সেই চিঠিটা টুক্‌রা টুক্‌রা করে ছিঁড়ে বুট জুতো দিয়ে পায়ের নীচে দল্‌তে লাগ্‌লেন,—"এত বড় আস্পর্দ্ধা, বিচারে বাধা! যা' বেটা তোর সাহেবকে এখানে নিয়ে হাজির ক'রে দে—আদালতের অপমান।"

ম্যাজিষ্ট্রেটের আরদালী, সে তো ডিপুটিদেরে থোড়াই কেয়ার করে, তারপর এতটা অপমান! সে হন্ হন্ করে বায়ুবেগে চলে গেল। এর পরে মোক্তাররা এবং আর আর সকল লোক বাড়ী ফিরবার জন্য আর ব্যস্ত হোল না, কি কাণ্ডটা বেঁধে যায়, দেখবার জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করুতে লাগ্‌ল।

এরমধ্যে ডিপুটি বেজায় ধমক্ চমক করে নবীন মোক্তারকে একবার ঘুষি তুলে মারতে গিয়েছিলেন, তখনও দুএক জন মোক্তার একটা সাক্ষীকে নাড়াচাড়া কচ্ছিলেন, সে জেরা স'য়ে স'য়ে একবার ঝড়ের নৌকার মত কাত হোয়ে পড়ে ছিল, তার উপর "তুমি যে তোমার ভগ্নিপতিকে চেন, তার প্রমাণ কি? তোমাকে যখন এয়াকুবআলি মারতে এসেছিল, তখন তোমার ভাই তাকে গাল মন্দ কেন দিয়েছিল?" এইরূপ প্রশ্নের চোট সে আর সাম্‌লাতে না পেরে সে কাঠগড়ায় একবারে বসে পড়ল, হাকিমের দিকে চেয়ে আরদালীর পিলে চমকে গেল, গরুর গাড়ীর একটা বলদ একবারে যেন লোপাট হোয়ে ভূঞে প'ড়ে গেলে গাড়োয়ান যেমন ঠেঙ্গিয়ে ও খুঁচিয়ে সেটাকে তুলে দেয়, আরদালী সেইরূপ করে সাক্ষীটাকে আবার তুলে দিল।

কাছারীতে বিচার-পদ্ধতি যখন এই আকার ধারণ কোরেছে, তখন ব্রাউন সাহেব টেনিস খেলে বেত ঘুরুতে ঘুরুতে বাড়ী ফিরেছেন; মিসেস ব্রাউন গেটের কাছ থেকে স্বামীকে এগিয়ে নিয়ে এসে খেতে বসে গেছেন। তিনি খুব সাধ্বী ছিলেন, স্বামীকে বড় ভাল বাস্‌তেন, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল স্বামী তাঁকে একবারে ভালবাসে না, তার যত আদর সকলই মৌখিক। কোন্‌দিন ব্রাউন তার কাছ থেকে একটু তাড়াতাড়ি চলে গেলেন, কোন্‌দিন বই এবং খবর-পত্রের দিকে অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে তিনি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কথা বল্লেন না, কোন্ দিন কাছারী যাওয়ার সময় তাঁর কাছে হাসি মুখে বিদায় নিলেন, একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেল্লেন না, কোনদিন্ তাঁকে তাড়াতাড়ি কোন ভোজ বা বড়লাটের আসরে বিদায় করে দিয়ে মিসেস্ গ্রিগারীর বাড়ীর দিকে প্রফুল্লমুখে চলে গেলেন—এসকল তার মনের নোট-বুকে তিনি ভাল করে টুকে রেখে-ছিলেন; এবং সর্ব্বদা সন্দেহ ও অবিশ্বাসে তিনি গুমরে গুমরে মরতেন; তিনি যখন তার পাশে বসে গল্প করবার জন্য একটু আনন্দের কাঙ্গালী হোয়ে ঘরে ঢুকতেন, তখন কাজ না থাক্‌লেও হয়ত ব্রাউন সাহেব তাড়াতাড়ি কোন অছিলায় বের হোয়ে যেতেন—মনে দাগা পেয়ে মিসেস ব্রাউন সেদিন হয়ত মাথা ধরেছে বলে খেতেনই না। সাহেব এই অভিমানের মর্ম্ম কিছু না বুঝে—সেই মাথা ধরাই সত্যি মনে কোরে এক মিনিটের জন্য তাঁর ঘরে ঢুকে সহানুভূতি জানিয়ে ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে শিশ্ দিতে দিতে বাইরে চলে যেতেন। মিসেস ব্রাউন শুয়ে শুয়ে রুমালে চোখ মুছতেন আর ভাবতেন পুরুষগুলির প্রাণ নাই।

সেদিন খেতে বসে তিনি নানা গল্প ফেঁদে শেষে স্বামীকে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—আজ টেনিস গ্রাউণ্ডে মিসেস গ্রীগারি এসেছিলেন কি?"—ব্রাউন সে কথাটা গ্রাহ্যি না করে আর আর কথা পাড়লেন; কিন্তু স্ত্রী সহজে ছাড়লেন না, আবার আর দুচারটা কথা পেড়ে শেষে সেই প্রশ্নটি আবার কল্লেন—"হঁ তোমায় না মিসেস্ গ্রীগারির কথা জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কি এসেছিলেন?" ব্রাউন অন্যমনস্ক ভাবে বল্লেন, "হাঁ এসেছিলেন।" এই বলেই অন্য অন্য কথা বলতে লাগ্‌লেন; কিন্তু দীপটা যেমন দমকা হাওয়ায় নিবে যায় সেই আগেকার কথাটায় মিসেস ব্রাউনের চোখমুখের আলোটা যেন একবার নিবে গেল; মুখের উপর যেন একটা বিষাদের ছায়া পড়ে গেল, আর গল্প জমতে পার্ল্ল না; ব্রাউন সাহেবও অন্যমনস্ক হোয়ে কি ভাবতে লাগলেন। এই সময় সাহেবের খাস্ আরদালী ঘরে ঢুকে কেঁদে ফেল্ল, সাহেব ও মেম তখন খাওয়া শেষ করছেন,—আরদালীর কান্না দেখে অবাক হোয়ে

তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন,—বহু চেষ্টার পর আরদালী থেমে থেমে ডিপুটি বাবুর কীর্ত্তির কথা সাহেবকে জানাল। সে কথাটাকে বাড়িয়ে একটা লঙ্কাকাণ্ড তৈরী কোরে তাঁকে জানালো, ডিপুটি বলেছেন সাহেব-গোষ্ঠীর মাথা তিনি খাবেন, তিনি কি তাঁর বাড়ীর চাকর যে তাঁর হুকুম তামিল করবেন? তিনি এইবার সাহেবকে বুঝে নেবেন; এবার তাঁর রক্ষে নাই।" এই সকল বলে আর্দ্দালীটাকে বেতের বাড়ী মেরেছেন ও বলেছেন, সাহেব যা কাল খাবেন, আজ তোকে তার নমুনা দেখাচ্ছি। ঘর ভরা লোক তারা সকলেই বসে বসে যেন কি পরামর্শ আটছে। তা' নৈলে একটি লোক বাধা দিল না, আমি হুজুরের আরদালী, আমাকে কুকুর বেড়ালের মত তাড়া কোরে মার্লে!"

সাহেবের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। মেম সাহেবের মেজাজ আগেই খারাপ হয়েছিল, এই কথায় যেন বারুদে আগুন লেগে গেল। তিনি একবার লাফিয়ে চেয়ার হোতে উঠে পড়্লেন, এবং হাতের ভঙ্গী কোরে বল্লেন—"এ হচ্ছে স্বদেশী ষড়যন্ত্র,—এরা "অরাজক" দলে মিশেছে, আর এদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। জেলারকে খবর দাও, সেপাই শান্ত্রি নিয়ে এখনই দলটা গ্রেপ্তার কর, লাটসাহেবকে তার কর, এই জেলা এখন নিরাপদ নয়,—এখানে সূচনায়ই এই সর্ব্বনাশের বীজ নষ্ট করতে হবে—চল আমরা দুজনেই যাই—" এই বলে মেমসাহেব একটা লোককে পুলিস সাহেবকে লোক-লস্কর নিয়ে আসতে বলে পাঠালেন। ব্রাউন সাহেব বল্লেন—"কথাটা খুব গুরুতরই বটে, কিন্তু প্রথমটা শুনে আমার যেরূপ রাগ হয়েছিল, এখন আর তা যেন তেমন হচ্ছে না, যতই ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে রসিক বাবু তো আদবেই বেয়াড়া লোক নন, তিনি আমার অত্যন্ত অনুগত ও অতি নিরীহ স্বভাব, ধীরবুদ্ধি ও ভদ্রলোক।"

মেম সাহেব বল্লেন—তুমি বুঝতে পাচ্ছনা, বিষাক্ত হাওয়া ছড়িয়ে পড়্লে যেমন-খারা সুস্থ ব্যক্তিও এড়াতে পারে না এখন দেশের হচ্ছে তেমনই একটা সময়, এখন কারুকে বিশ্বাস নাই। আর তুমি কি মনে কর রামফল আরদালী আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলছে, তার কটা ঘাড়ে কটা মুণ্ডু? এখন একটু অপেক্ষা কর, লোকজন নিয়ে পুলিস সাহেব আসুন—অমন জায়গায় একা যেতে ভরসা হোচ্ছে না।

ব্রাউন ছড়ি ঘুরুতে ঘুরুতে হেসে বল্লেন—তুমি পাগল, তাদের একশ লোক আমার এই দুটো চোখের চাউনি দেখলে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপবে, তা যতবড় ষড়যন্ত্রই না তারা করে থাকুক। তোমার হিমে যাওয়ার কোনই দরকার নেই, তুমি ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।

স্বামীর বিপদ আশঙ্কা করে মেম সাহেব কিছুতেই স্থির থাকৃতে পাল্লেন না, তিনি হ্যাটটা তাড়াতাড়ি একটা পিন দিয়ে খোঁপায় আটকিয়ে একখানি শাল গায় দিয়ে স্বামীর পেছন পেছন ছুট্‌লেন। এবার বেয়াদপ-ডিপুটিটাকে ৭ বছরের জন্য জেল দিবেন কি আণ্ডামানে পাঠাবেন,—তাই চিন্তা করতে লাগলেন।

ব্রাউন ঘরে ঢুকে দেখেন ডিপুটির প্রলয় মূর্ত্তি! ছোট একটা বেঞ্চী তুলে তিনি নবীন বাবুর মাথার দিকে ছোড়বার চেষ্টায় আছেন, মোক্তার মহাশয় আরদালীটাকে ঠেলা দিয়ে ফেলে দিয়ে দরজা ফাঁক করে বেরিয়ে পড়লেন, এবং উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে লাগলেন। এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাছারী ঘরে ঢুকে পড়েছেন, ডিপুটি তাঁর দিকে আঙ্গুল নির্দ্দেশ করে চেঁচাচ্ছেন "পাক্‌ড়ো-পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো" মেম সাহেব একটু পেছনে ছিলেন, তিনি দেখলেন, একটা শামলা মাথায় বুড়লোক পালিয়ে যাচ্ছে ও কাছারী ঘরে পৈশাচিক চীৎকার হচ্ছে, তখন বুঝ্‌লেন কাণ্ডটা সহজ নয়, ডিপুটি ও তার দলের ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝি তার স্বামীকে খুন করে ফেল্ল, তখন মুহূর্ত্ত মাত্র তাঁর মনে যে প্রাণের ভয় জেগেছিল, তা স্বামী-স্নেহে দূর হয়ে গেল; সবারে ঠেলে ফেলে তিনি মরবার সঙ্কল্প করে এগিয়ে ঘরে ঢুকে পড়্লেন। চারদিক্ হোতে চীৎকার হোতে লাগল—হুজুর রক্ষা করুন, ডিপুটি বাবু ক্ষেপে গেছেন। কে তার কাছে ঘেঁষে।—এদিকে যখন আরদালীটা ডিপুটির কথায় ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাক্‌ড়াল না, তখন তিনি এক লাফ দিয়ে রেলিং পার হয়ে সাহেবকে ঘুঁষি মারতে গেলেন এবং ইংরাজীতে বল্লেন—সরে যাও, জান তুমি আমি কে? আমি ডুমরাওনের রাজাকে হাজতে পাঠিয়ে ছিলাম—সরে যাও বলছি!

ব্রাউন বুঝলেন, ডিপুটি পাগল হোয়েছেন, তখন দৃঢ়স্বরে বল্লেন—রসিক বাবু!

রসিকবাবু সেই দৃঢ় ও উচ্চকণ্ঠ স্বরে যেন একটু ভীত ও শঙ্কিত হোয়ে স্বর নীচু করে বল্লেন—

সার, আমি বলছি—সরে যান!

কেন সরে যাব?

কমলা ঐ দোর দিয়ে আসছে, সে হিন্দুর মেয়ে, আপনাকে দেখে লজ্জায় আসতে পাচ্ছে না, ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে,—আপনি সরে যান্, নৈলে মারব ঘুঁষি।"

মেম সাহেব একজন মোক্তারকে জিজ্ঞাসা বল্লেন—"কমলা কে?" উত্তরে শুনলেন ডিপুটির স্ত্রী, একমাস আগে মারা গেছেন, তদবধি ডিপুটি আহার নিদ্রা ছেড়ে কেবল কেঁদেছেন, কমলা তার স্ত্রীর নাম, তাঁর শোকে আজ তাঁর এই দুর্গতি।"

মেম সাহেব পুতুলের মত স্থির হোয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর রুদ্রমূর্ত্তি কোথায় চলে গেল, তিনি আস্তে রুমাল উঠিয়ে এক ফোঁটা চোখের জল মুছলেন, একঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি ভেবেছিলেন, পুরুষজাতি নির্ম্মম নিষ্ঠুর, সে ধারণাটি তাঁর উল্টে গেল।

ব্রাউন মেম সাহেবকে বল্লেন—"এমিলি, বল ত এ পাগলটাকে নিয়ে কি করা যায়?" এবং সেখানকার লোকদের বল্লেন, "ওঁর এখানে আর কে আছে?"

তারা বল্লেন, কেউ নেই, স্ত্রী-মরবার পর এর আত্মীয় স্বজন সবাইকে ইনি বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন, এখানে কেবল চাকর বাকর ও আরদালী চাপরাশী।

সাহেব বল্লেন—আমি ওকে ধরে দিচ্ছি, আপনারা কেউ ওর ভার নিতে প্রস্তুত আছেন কি?

তাঁরা সকলেই অতি নম্রতার সহিত, অতি ভদ্রতার সহিত, কেউ বা পষ্ট কথায়, কেউ বা কথাটা ঘোরাল করে, কেউ হেসে কেউ কেসে অসম্মতি জানালেন।

এ পর্য্যন্ত মেম সাহেব কিছুই বলেন নি, এইবার তিনি যেয়ে ডিপুটিবাবুর হাত ধরলেন, তখন নানারূপ উৎকট অভিনয় করার পর পরিশ্রান্ত হোয়ে রসিক বাবু একটা চেয়ারে ব'সে পড়ে মাথাটা নীচু করে হাঁপাচ্ছেন। মেম সাহেব হাত ধরা মাত্র তিনি রক্তচক্ষে তাঁর দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ব্রাউন ও দশ-বার জন লোক বিপদ আশঙ্কা কোরে ও মেম সাহেবের দুঃসাহসের উপর মন্তব্য ঝেড়ে এগিয়ে এলেন। কিন্তু মেম সাহেব রসিক বাবুকে দেখে কিছু মাত্র ভয় না পেয়ে বল্লেন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনার কমলাকে আপনার নিকট এনে দেব।

সহসা ডিপুটির সে উগ্রতা কোথায় গেল, তার দুটো চোখ দিয়ে ঝর ঝর কোরে জল পড়তে লাগল, মেম সাহেবের হাত হোতে ছিট্‌কে তিনি মাটিতে প'ড়ে অজ্ঞান হোলেন।

মেম সাহেব রসিক বাবুকে নিজের বাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে এনে রাখলেন, সেখানে চিকিৎসা ও আহারাদির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হোল। তিনি রসিক বাবুর কীর্ত্তি ও তাঁহার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থার জন্য স্বামীর নামে চিফ সেক্রেটারীকে তার করবার জন্য সেই রাত্রে দুইখানি টেলিগ্রাফের ফরম সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার একখানি দিয়ে তিনি রসিক বাবুর পিতার ঠিকানা জেনে তাঁকে এসে ছেলেকে নিয়ে যেতে তার করলেন, এবং আর একখানিতে তাঁর স্বামীর নামে চিফ্-সেক্রেটারীকে তার করলেন রসিক বাবুর এক বছরের ছুটি মঞ্জুর করতে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর স্ত্রীর রসিক বাবুর প্রতি এই অত্যধিক যত্ন ও আগ্রহ লক্ষ্য করে বল্লেন—"এমিলি, তোমার সকলই বাড়াবাড়ি।"

মিসেস ব্রাউন উত্তরে বল্লেন, "এই পাগল লোকটার মধ্যে যে পদার্থ আছে, তোমার যদি তার শতাংশের একাংশও থাকতো!"

সাহিত্যের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য

[শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়]

জীব-শিশুকে ধরা-বক্ষে জন্ম দিতে যাইয়া প্রকৃতি যে বিপুল বেদনা অনুভব করেন, কবি তাহার মানসীকে মূর্ত্তিদিতে যাইয়া তার চেয়ে কম ব্যথা পান না। জননী সন্তানের কচি কোমল অধরে স্নেহের পরশ বুলাইয়া আপনার সকল বেদনা সার্থক মনে করেন, কবিও তাহার মানসী কন্যার সুকুমার সৌন্দর্য্যে অসীম আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু জননীর সন্তান সৌভাগ্য তার ব্যক্তিগত তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে, কবির সৃষ্টি নিখিল বিশ্বের আনন্দ যোগাইয়া থাকে। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে, সঙ্গীতের মাধুর্য্য আমাদিগকে তৃপ্তি দেয়, শিল্পীর চারু চিত্র দেখিয়া আমরা ভাবমগ্ন হই। মানুষের মস্তিষ্কে এই সব বিচিত্র বিকাশ আমাদিগকে বিমল আনন্দ দেয়। এমতাবস্থায় কবি বা শিল্পীর সাধনার প্রণালী কি তাহা জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। যে সব সাহিত্য-শিল্পী অলৌকিক প্রতিভার দ্বারা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী যেমন কৌতুকাবহ তেমনই বৈচিত্র্য পূর্ণ।

স্যার ওয়াল্টার স্কট অনেক গুলি কাব্য ও উপন্যাস রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি খুব দ্রুত লিখিতে পারিতেন। তাঁহার লেখনী একবার চলিতে আরম্ভ করিলে সহসা থামিত না, ভাব প্রকাশের উপযোগী কোন শব্দ মনে না থাকিলে তিনি সেই স্থান শূন্য রাখিয়া যাইতেন, ভাব প্রবাহকে বাধা দিতেন না। পরে অবসর কালে শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেন। তিনি একবার যাহা লিখিয়া যাইতেন তাহা কাটাকুটি করা পছন্দ করিতেন না। তাঁহার কল্পনার স্বতঃ স্বচ্ছন্দ প্রবাহ পূর্ণ বেগে বহিয়া যাইত। তিনি যে ঘরে বসিয়া লিখিতেন সেখানে শত গোলমাল হইলেও তাঁহার সাধনার ব্যাঘাত হইত না। অনেক লেখক নির্জ্জন স্থান না হইলে লিখিতে পারেন না, কিন্তু স্কট যখন রচনায় নিমগ্ন থাকিতেন তখন বন্ধু বান্ধবের গল্প গুজব বা শিশুদের আনন্দের কল-কোলাহল অবাধে চলিত থাকিত। স্কটের জনৈক সাহিত্যিক বন্ধু লিখিয়াছেন, "আমি অনেক সময় স্কটের রচনা প্রণালী লক্ষ্য করিয়াছি। একবার তাঁহার বাড়ী মেরামত হইতেছিল। গৃহ প্রাঙ্গনে ইট, পাথর, সুরকী, বালি, কড়ি, বড়গা, স্তূপাকারে সজ্জিত। দলে দলে রাজমজুর ও মিস্ত্রীরা হাঁক-ডাক করিতেছে। স্কটের প্রিয় কুকুরটি লাফাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে। স্কট টেবিলে বসিয়া লিখিতেছেন। তাঁহার শরীর তখন অসুস্থ, দাঁতের মাড়ী ফুলিয়া উঠিয়াছে, বেদনায় তাড়নায় তিনি তখন এক হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়াছেন, আর এক হাতে অনর্গল লেখনী চলিতেছে। প্রিয় কুকুরটি যাইয়া পাশে দাঁড়াইতেই তিনি আদর করিয়া তাঁহার মাথা চাপড়াইয়া দিতেছেন। এত উৎপাত উপদ্রবে এতটুকু বিরক্তি নাই। তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিয়া যাইতেছেন আর সেই লেখাও নীরস নহে, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সংযত পরিহাস পরিপূর্ণ রস-রচনা।"

ঔপন্যাসিক লিটন ছিলেন ইহাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার বাড়ীর এক নিভৃত অংশে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া তিনি রচনা করিতেন। সেখানে বন্ধু-বান্ধবেরও যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল। তাহার পাঠগৃহে নানা পুস্তক ও কাগজ ছড়ান থাকিত। তিনি প্রতি দিন তিন ঘণ্টা কাল রচনা করিতেন। সামান্য প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়া তিনি দশটার সময় লিখিতে বসিতেন। একটা বাজিলেই লেখাবন্ধ করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইতেন।

কার্লাইলের চেহারা যেমন কাঠখোট্টা ছিল, তাঁহার মেজাজও ছিল তেমন কর্কশ। তিনি যখন লিখিতে বসিতেন তখন গৃহমধ্যে একটা ইঁদুর নড়িলেও তাঁহার ধৈর্য্য-চ্যুতি হইত। তাঁহার বাড়ীর উপরের তলায় নির্জ্জন ছোট এক কুঠরীতে বসিয়া তিনি লিখিতেন। কার্লাইলের পত্নী ছিলেন নেহাৎ নিরীহ। স্বামীর নিঃসঙ্গ অবস্থায় ব্যথিত হইয়া তিনি মাঝে মাঝে যাইয়া স্বামীর ঘরে বসিতেন। স্বামীর কাছে বসিয়া সেলাইয়ের কাজটুকু করিবারও সাহস তাঁহার ছিল না। কার্লাইল এত দূর অসহিষ্ণু ছিলেন যে, এক দিন স্ত্রীকে বলিয়া বসিলেন, "খুব আস্তে আস্তে শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়, আমার লেখার বিঘ্ন হচ্ছে।" বেচারী বুকের ব্যথা চাপিয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া সজল চক্ষে নীচে নামিয়া আসিল!

ডিকেন্সের রচনা-প্রণালী ধরা-বাঁধা গোছের ছিল। তিনি প্রাতরাশের পর মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় পর্য্যন্ত অজস্র লিখিয়া ফেলিতেন। লেখার মালমসলা সংগ্রহের জন্যই তাঁহার অশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি চোখে যাহা দেখিতেন লেখায় তাহা নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন। একটু চোখের চাহনি, একটু মুখের ভঙ্গি, তাঁহার প্রতিভার আঁচ লাগিয়া অনিন্দ্য ছবিতে ফুটিয়া উঠিত। লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াই তিনি বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, লণ্ডনের রাস্তাঘাটই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিয়াছে।

ফরাসী ঔপন্যাসিক বালজ্যাক রচনার প্রতি খুব অবহিত ছিলেন। তিনি যে সব উপন্যাস রচনা করেন গোড়াতেই তার আখ্যানবস্তু ঠিক করিয়া লইতেন—সামান্য খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বাদ দিতেন না। বইখানির কত

অধ্যায় হইবে, কোন্ অধ্যায়ে কোন্ চরিত্র কি ভাবে ফুটিবে, কোন্ ঘটনার কোথায় সমাবেশ হইবে সব গোড়ায় গুছাইয়া পরে লেখা আরম্ভ করিতেন। ডিকেন্সের ন্যায় তিনিও উপকরণের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সমাজের সকল স্তরের লোকের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতেন। যখন যেখানে কিছু অসাধারণ ব্যাপার দেখিতেন তাহা নোটবুকে টুকিয়া লইতেন। রচনার মালমসলা সংগ্রহ হইলে তিনি নিভৃত স্থানে লিখিতে বসিতেন। তখন বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখাসাক্ষাতও বন্ধ থাকিত—চিঠিপত্র আসিলে তাহাও খুলিয়া পড়িতেন না। অনেক সময় দিনের বেলা দোর জানালা বন্ধ করিয়া বাতি জ্বালিয়া লিখিতেন। রচনাকালে পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও খেয়াল থাকিত না—সাধু সন্ন্যাসীর ন্যায় একটা আলখেল্লা গোছের গাউন গায়ে, পা-জামা পরিয়া স্লীপার পায় দিয়া লিখিতে বসিতেন। রাত্রি দুইটার সময় লেখা আরম্ভ করিয়া ভোর ছয়টায় শেষ করিতেন। তারপর স্নান সারিয়া এক ঘণ্টার বিশ্রাম করিতেন। আটটার সময় কাফি পান করিয়া পুনরায় এক ঘণ্টা বিশ্রাম। দুপুরবেলায় এক ঘণ্টা আহার ও বিশ্রাম বাদে ছয়টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে লেখা চলিত। ছয়টায় পর নৈশাহার করিয়া প্রকাশকের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিতেন। রাত্রি আটটার সময় শয্যাশায়ী হইতেন।

এইভাবে দুইমাস পরিশ্রম করিয়া তাঁহার উপন্যাসের খসড়া তৈয়ার হইত। তারপর সেই খসড়ার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতেন, নূতন অধ্যায়ের সংযোগ করিতেন। লেখার শেষে প্রুফের পালা। তাঁহার প্রুফের দুই পাশে যথেষ্ট স্থান রাখিবার জন্য ছাপাখানার উপর আদেশ থাকিত। প্রুফে এত কাটা কুটি ও পরিবর্ত্তন থাকিত যে বালজ্যাকের বই কম্পোজ করিতে হইলে কম্পোজিটারদের আতঙ্ক জন্মিয়া যাইত। অধিকন্তু তাঁহার হাতের লেখা ছিল কদর্য্য। কোন কম্পোজিটারই প্রতিদিন এক-ঘণ্টার বেশী বালজ্যাকের বই কম্পোজ করিতে রাজী হইত না। ৪।৫ বার প্রুফ দেখিয়াও বালজ্যাকের মন খুঁত খুঁত করিত। বালজ্যাক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর ষোল ঘণ্টা খাটিয়াও আমি রচনা মনের মত সুন্দর করিতে পারি না।"

রুসিয়ার ঋষিকল্প লেখক টলষ্টয় প্রথম একটি 'চুম্বক' তৈয়ার করিয়া লইতেন। পরে সেই ছোট আখ্যান বস্তুটি ডাল পালা জুড়িয়া তিনখণ্ডে সমাপ্ত বিরাট উপন্যাসে পরিণত করিতেন। টলষ্টয় লেখার অনেক কাটাকুটি করিতেন। তাঁহার একান্ত অনুরক্ত পত্নী স্বামীর সাহিত্য সাধনার নিত্য সঙ্গিনী ছিলেন। তিনিই ছাপাখানার জন্য কাপি লিখিয়া দিতেন। গল্প আছে যে কোন একখানি উপন্যাস তাঁহাকে ষোলবার নকল করিতে হইয়াছিল। টলষ্টয় পুনঃ পুনঃ লেখা সংশোধন করিতেন—প্রুফে অজস্র কাটাকাটি করিতেন। অনেক সময় শেষ প্রুফ ছাপিতে অর্ডার দিয়া ডাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, পরে "একটি শব্দ" বদলাইবার জন্য, কি একটি কমা বসাইবার জন্য ছাপাখানায় টেলিগ্রাফ করিতেন, অমুক পৃষ্ঠার অমুক লাইনে এই পরিবর্ত্তন হইবে। প্রতিভা যে উদ্যমতার নামান্তর, ইহা ঠিক কিনা তা কে জানে!

সাময়িক প্রসঙ্গ

গল্প-প্রতিযোগিতা

সচিত্র শিশির প্রতিযোগিতার বৈশাখের ফল বাহির হইয়াছে। শ্রীমতী মনুমারী মিত্র রচিত "সতী" গল্পটি পুরস্কার পাইয়াছে। অপ্রতিম সাহিত্যিক, পরম শ্রদ্ধাস্পদ রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর এই মাসের বিচারক ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ ছিল, তাহা সত্ত্বেও দাদা আমাদের কাজটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে করিয়া দিয়াছিলেন। এমন একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধক, এমন স্নেহপ্রবণ, সরলতাময় সাহিত্যিক দাদা বাংলায় অতি অল্পই আছেন। শ্রীভগবান আমাদের বৃদ্ধ দাদাকে দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন দান করুন।

সতীদেবী পুরস্কার

"সতীদেবী দীনতারিণীর" জীবন কথা পদ্যে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, ১৭ জন। বাংলায় কবিযশঃপ্রার্থী ও প্রার্থিনীদের সংখ্যা ঠিক কত, বলা দায়। ১৭টির মধ্যে গুটি দশেক কবিতা বলিতে যা বুঝায়, তাহাই ছিল; বাকীগুলা গদ্য কি পদ্য, তাহাও বুঝিয়া উঠা কঠিন।

শ্রীমতী মানসী ঘোষজায়া "সতীদেবী দীনতারিণী পুরস্কার" প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার রচনাটি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

এই সম্পর্কে আমরা পুরস্কার দাত্রী শ্রীমতী ইন্দুপ্রভা দেবীকে ও কলিকাতার ডেপুটি প্রেসিডেন্সী পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। সতীর জীবন কথা লইয়া আলোচনা করিবার শুভ সুযোগ তাঁহারাই দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে এমন চেষ্টা খুব কমই দেখা যায়।

কর্ণার্জ্জুন

অস্ত ষ্টার থিয়েটারে কর্ণার্জ্জুন নাটকের শততম অভিনয় উৎসব। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এরূপ উৎসব—এই প্রথম। একসঙ্গে একাদিক্রমে, একাকী, কোনও নাটক, নাটিকা, প্রহসন এমন রঙ্গ নাট্যেরও সাহায্য না লইয়া কোন নাটক ইতিপূর্ব্বে একশত রজনীর পরমায়ু পায় নাই। আর্ট থিয়েটার কোম্পানী বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একটি নূতন গৌরবময় ঘটনা উপহার দিয়াছেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয় হোক।

মূর্ত্তি ও মন্দির

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, এফ. এ. এস. বি, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র, দি বুক কোম্পানী। ৪।৪ এ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

বঙ্গভাষায় সুকুমার কলা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বেশী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। 'মূর্ত্তি ও মন্দিরের' প্রথিতনামা সুপণ্ডিত লেখক মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিয়া এ সম্বন্ধে পথপ্রদর্শন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। আমরা আশা করি তিনি ময়ূরভঞ্জের অনুসন্ধান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া একখানি ভারতীয় শিল্পকলার বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধি করিবেন।

এই পুস্তিকাতে অতি সুন্দর চারিখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে—তাহা হইতে আমরা ভারতীয় ভাস্কর্য্যের গৌরব উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন যে বঙ্গে কুষাণ যুগ হইতেই মূর্ত্তিপূজার বহুল প্রচার হইয়াছে—এ সম্বন্ধে আরও ঐতিহাসিক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। চন্দ মহাশয় জাতীয় শিল্পের renaissance সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলেরই অনুধাবনযোগ্য। গ্রন্থখানি বাঙ্গলার সাহিত্যিক মহলে উপযুক্ত সমাদর লাভ করুক, ইহাই আমরা কামনা করি।

আলেখ্য দর্শন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত এস্, দত্ত
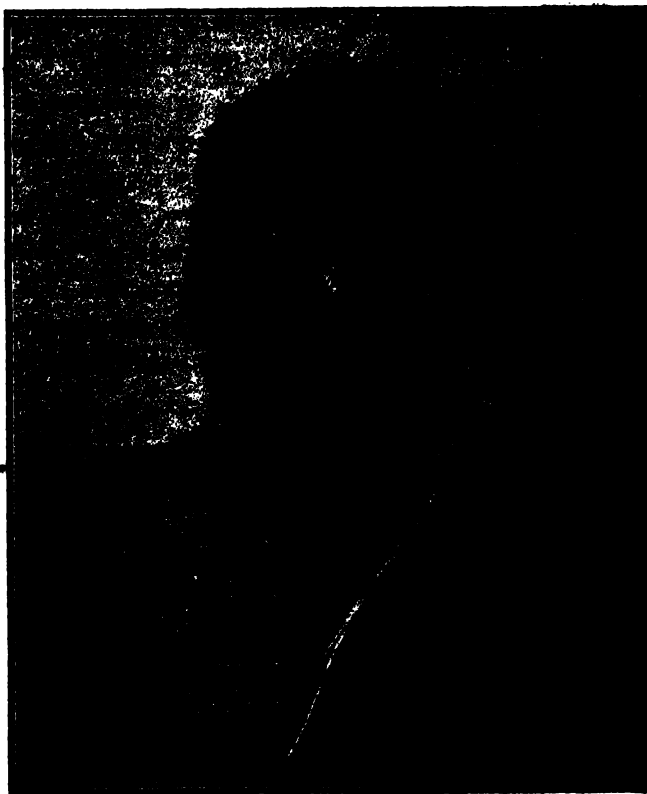
বঙ্গ-গৌরব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জন্ম—১৮৬৪, ২৯শে জুন

তিরোধান—১৯২৪, ২৫শে মে

পরলোকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বাংলার শিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে।

আকাশ ছিল নীল; বাতাস ছিল শান্ত, প্রকৃতি ছিল হাস্য মধুর। বাংলার দুর্ভাগ্য, বাঙালীর দুর্ভাগ্য, বিনা মেঘেই বজ্রাঘাত হইল। আশুতোষ নাই! করাল কাল বাংলার অভ্রভেদী গর্ব চূর্ণবিচূর্ণ করিল,—বাংলার আশুতোষ, বাঙালীর আশুতোষ, দেশের আশুতোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ আর নাই! গত রবিবার সন্ধ্যায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার তিরোধান ঘটিয়াছে। বঙ্গজননী তাঁহার পুরুষোত্তম সন্তান হারাইয়াছেন।

বাংলার আশুতোষ একটি জন্মিয়াছিল; একার প্রভাবেই সারা বাংলা আলোকিত করিয়াছিল, তাঁহার অন্তর্ধানে সারা বাংলা অন্ধকারে মুখ ঢাকিল। দেশজননীর প্রিয় সন্তান, বাক্‌দেবী সরস্বতীর বরপুত্র, বাংলার মুকুটমণি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অকালে তিরোহিত হইয়াছেন। এ যে দেশের, দেশবাসীর কত বড় দুর্ভাগ্য তাহা আজ সমগ্র দেশবাসী অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া, ব্যথায় বেদনায়, দুঃখে, শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।

সুসন্তান দেশে আগেও অনেক জন্মিয়াছেন, পরেও জন্মিবেন কিন্তু আশুতোষ এই একটিই জন্মিয়াছিলেন। অত বড় আর একটা চরিত্র বাঙালীর মানসপট এমন করিয়া উজ্জ্বল করিতে পারে নাই। তাঁহার তিরোধান আজ বাঙালীকে গভীর শোক-সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে, তাঁহার বিয়োগ দুঃখ বাঙালী কোন কালে কোন [illegible] না। বাঙালীর জাতীয় মহাভারতে আশুতোষ বিরাট পুরুষ, তাঁহার মহাপ্রস্থান মহাভারতের মহাপ্রস্থানের মতই শোকাবহ!

এক সূর্য্যের আলোকপাতেই যেমন দিবসের পরিচয়, তাহার অন্তর্ধানেই যেমন রাত্রির প্রকাশ, বাঙালীর জাতীয় গর্বের ভাস্কর ছিলেন আশুতোষ; সে গৌরব সূর্য্যের তিরোধানেই তেমনি বাংলা অন্ধকারাবৃত হইয়া গিয়াছে।

আশুতোষ কে ছিলেন? কি করিয়াছিলেন?—এ সকল প্রশ্ন আজ কাহারও মনে উঠিতেছে কি না জানি না আজ বাংলার নরনারীর বক্ষ ভেদিয়া একই সুর কাঁদিয়া উঠিতেছে, আশুতোষ নাই! আশুতোষ নাই! বাংলার তরুণগণ আজ পিতৃহীন, অভিভাবকহীন হইয়া আপনাকেই আপনি প্রশ্ন করিতেছে সত্যই কি স্যার আশুতোষ নাই? নিজেই উত্তর দিতেছে, বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না। আশুতোষ নাই, এ কথা বাংলার তরুণরা প্রাণ গেলেও বিশ্বাস করিতে পারিবে না। এ নাই যে কি নাই, কতখানি নাই, তাহা আজ বাঙালী মাত্রেই মর্মে মর্মে বুঝিতেছে; প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছে। বাংলার কোন তরুণের নিকট আশুতোষ ত মানুষ ছিলেন না; তিনি ছিলেন তাহাদের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হৃদয়-দেবতা। তাহারা তাহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতির অঞ্জলি যে হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেবতাকেই দিয়া আসিয়াছে। সে দেবতার ত বিনাশ ছিল না, মৃত্যু ছিল না। দেবতা যে অজর, অমর! আশুতোষ যে আশুতোষের মতই মৃত্যুঞ্জয়, ইহাই যে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ধ্যান-জ্ঞান-ধারণা ছিল। কেমন করিয়া আজ তাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহাদের হৃদয়-দেবতা জন্ম-মরণের অধীন ছিলেন; দুর্জ্জয় কাল তার অসীম শক্তির বলে বাংলার শ্রেষ্ঠ শক্তিধর পুরুষকেও অকালে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে! আজ কোন্ প্রাণে তাহারা এই নিষ্ঠুর, অতি নিষ্ঠুর সত্যকে গ্রহণ করিবে? তাহাদের হৃদয় যে শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

মাত্র তিনদিন পূর্ব্বে বাঙলার আর একটি মনস্বী মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনিও আশুতোষ। সে শোক সহিবার সময় টুকু পর্য্যন্ত বিধাতা বাঙালীকে দিলেন না; সে শোকের অশ্রু বাঙালীর নয়নে শুষ্ক হইবার পূর্বেই বাঙালীর গর্বের ধন, মাথার মণি অপহৃত হইল; বাঙালীর বুকের মাঝে বান ডাকিল। সমগ্র বঙ্গদেশকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া বাংলার গৌরব গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কর্মজীবনের অপরাহ্ন বেলাতেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করিলেন।

এ শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই, থাকিতে পারে না; এ দুঃখে বাঙালীকে সহানুভূতি দিতে পারে এমন ভাষাও ত দেখি না। আজ তাহার সকল ভাষা, ভাব, বাক্‌পটুত্ব—সব ঘুচিয়া গিয়াছে। শোকাহত কণ্ঠ আজি নীরব, নিথর! বাংলার গৌরব, বাঙালীর গৌরব স্যার আশুতোষকে হারাইয়া দেশ-জননী যে পুত্রহীনা হইলেন, তাহা বর্ণনার অতীত।

আজ আমরা শোকবিহ্বল হৃদয়ে আশুতোষের শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, বাংলার, বাঙালী-জাতির মুকুটমণির পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন।

স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উভয়ে বন্ধু ছিলেন। হাইকোর্ট উভয়ের ব্যবসা স্থান ছিল; হাইকোর্টই তাঁহাদের উভয়ের কর্মক্ষেত্র ছিল; বিদ্যা-মন্দিরে উভয়েরই বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ছিল। উভয়েই ছিলেন, সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন জননেতা। তাঁহাদের এ-জীবনের বন্ধুত্ব চিরদিনই অটুট ছিল। অতি বড় বিস্ময়ের বিষয় হইলেও ইহাই প্রত্যক্ষ করা গেল যে একজন অপরের বিয়োগ-বার্তা শুনিবামাত্র ইহলোকের সকল সম্পর্ক ঘুচাইয়া ফেলিলেন। স্যার আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যুর পর দুইটি রাত্রি মাত্র কাটিয়াছে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করিলেন। বাংলার উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। নহিলে পর পর দুইটি মনস্বী এমন করিয়া বাংলাকে, বাঙালীকে ফাঁকি দিবেন কেন?

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [ঊনত্রিংশ সপ্তাহ

ক'নের হাট

(১)—'ঘটক'

ঘটক—

হুঁ, ক'নে আবার নাকি পছন্দ হয় না! চলুন ত আমার সঙ্গে দেখি, —ক'-গণ্ডা চান? ক'কুড়ি? ক' পোণ, ক'শো, ক' হাজার··· চলুন,চলুন!···

—ডানা-কাটা ডানা-ওলা পরী অপ্সরী কিন্নরী মেনকা রম্ভা উর্ব্বশী— যেমনটি চান, যাকে চান!

(২)

ম্যাগ্নিফায়িং গ্লাস—

(ধূলি দিবার চেষ্টা বৃথা !)

"এই ত বাবা সবেদা আর সাজিমাটি—ধরে ফেলেছি ।"
সাজিমাটির খেসারত বাবদ ক'নের বাপ ধরিয়া
দিতে প্রস্তুত—৫০০৲
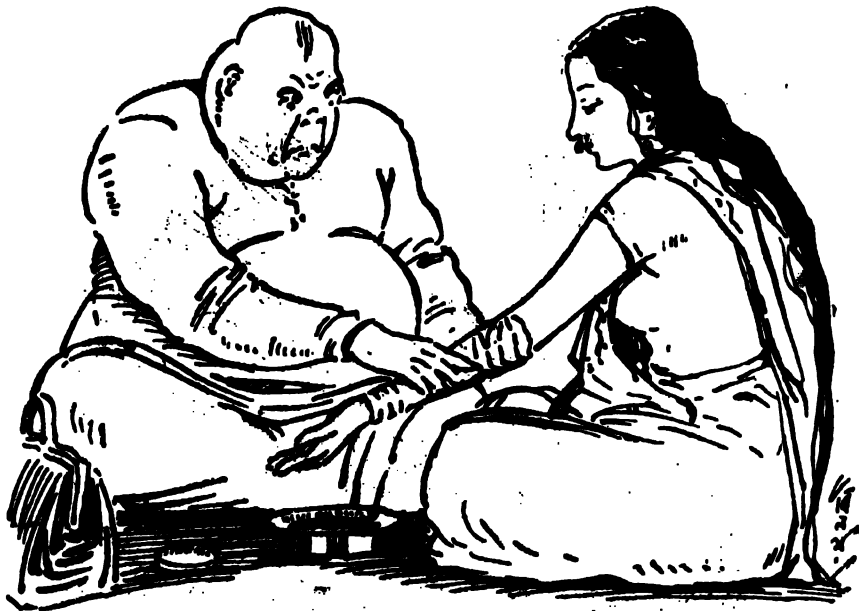
(৩)

ঠিক আছে ত?

"বিশ্বাস নেই বাবা! জল দিয়ে ঘসে দেখতে হচ্ছে।"

(৪)

অনুবীক্ষণ

"ঠোঁট দুটো অত সাদা দেখাচ্ছে কেন ? ধবল-টবল.নয় তো ?"
ঠোঁট সাদা ; অতএব—১০০৲ বেশী।

(৫)

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি !

"কৈ বাবা, আগুলফ-লম্বিত ত হয় না !—
ঘটকা ব্যাটা গেল কোথায় ?"

কন্যার পিতা। মশায় অত জোরে টানবেন না ; বরং কিছু ধরে দিতে রাজী আছি।

(৬)

একজোড়া খড়মের দাম—৫০০৲

(তাতেও খদ্দেরের অভাব)

"ইস্—পা যে একেবারে খড়ম!"

"মশাই—"

"নাঃ—এঃ একেবারে খড়ম!"

(৭)

পরীক্ষা

(ওয়েবষ্টার)

ওয়েবষ্টার বাবা পড়েন, আমি কথামালা পড়ি।

—ফেল।

(৮)

ফুট্‌রুল

"ইস্—সাড়ে তিন ইঞ্চি ! গড়ের মাঠ না হোক্, ছোট খাট মাঠ বটে !"

মাঠে ঘাষের চাষের খরচ—১২০০৲

(১)

গজ

"চার ফুট—ন' ইঞ্চি। আমার ছেলে মোটে চার ফুট তিন ইঞ্চি। ছ ইঞ্চি কম, ছ'হাজার দেয় ত দেখা যায়। নইলে নাঃ।"

(১০)

"ম্যায় ভুখা হুঁ !"

"যাত্রা দলের ছেলে নয় ত বাবা !"

(১১)

Any Port ?

(ঝটিকাবর্ত্তে তরণী)

"সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই
তুমি হও সব সুখের ভাগী——"

(১২)

ঝড়ো পাখী

"বলি বাছা, কাল-বৈশাখীর ঝড় লেগেছিল কি?"

(১৩)
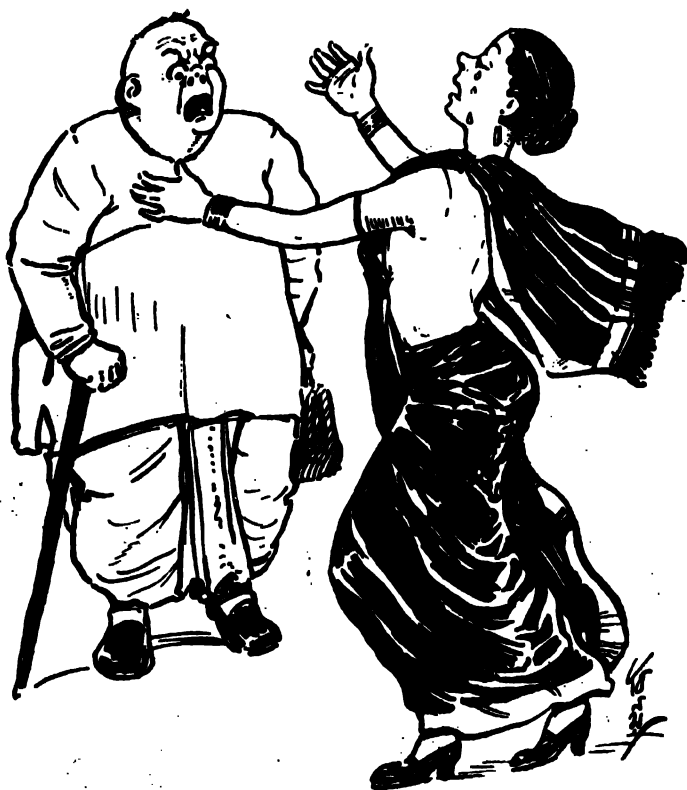
পোষাকী নাম—তরুলতা,

আটপৌরে নাম—তমুলতা।

(দুইটিই বেশ মানায়)

"তোমার কি কখনও অসুখ বিসুখ হয় না বাছা ?"

গম্ভীরস্বরে—না। (হৃৎকম্প ও পলায়ন)

(১৪)

দন্তরুচি কৌমুদী

"এ ত খুব সুবিধেজনক বলে মনে হচ্ছে না বাবা !"

কনের বাপ—হীরের উকোব দো মশাই, ক্ষয়ে যাবে।

(১৫)

শ্রীমতী নৃত্যশীলা দেবী

(ঠিকানা C/o হিন্দুস্থান)

"লে সখী দে ভর পিয়ালা
পিলাও দারুফিণ—"

শিকারী।—খুব কাজই করেছ বাবা "হিন্দুস্থান"। বেঁচে থাক।

(ক্রমশঃ)

সতীদেবী দীনতারিণী

[শ্রীমানসী ঘোষজায়া]

সতীদেবী দীনতারিণী পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা।

বিশাল বিপুল ধরণীর বুকে
নরনারী মিলে করিছে খেলা,
করিছে কত না সুখ পরিহাস,
বসাইছে কত সাধের মেলা।

কালের প্রবাহে চলিয়াছে ভাসি,
এ চলার বুঝি বিরাম নাই,
অবিরাম এই ধরণীর গতি
অপ্রতিহত দেখিতে পাই।

যেদিন প্রথম উঠেছিলে ফুটি
ধরার নিভৃত নিরালা কোণে,
সেদিন আপনি গেয়েছিল পাখী,
ফুটেছিল ফুল কুঞ্জবনে।

তোমার অমৃত-পরশে ধরণী
সহসা শিহরি উঠিল কেঁপে,
পবনে পবনে ছুটিল বারতা
উঠিল সে ধ্বনি আকাশ ব্যেপে।

কোন্ স্বরগের পারিজাত তুমি,
কেন এসেছিলে ধরার কূলে?
কাহারে খুঁজিতে বাহিরিলে পথে—
এলে কি হেথায় পথটা ভুলে?

জন্মিলে তুমি দত্তবংশে
পিতা সে প্যারীমোহন নাম,
নিভৃত পল্লী 'চিত্রকোটে'
বিক্রমপুরে জন্মগ্রাম।

শৈশবে তব ঢল ঢল রূপ,
অপরূপ সেই রূপের বিভা,
পুরবাসীগণ করে আলাপন
তব রূপ-কথা রাত্রিদিবা।

দেখিতে দেখিতে অলখিতে বুঝি
তব রূপ-জ্যোতি উঠিল ফুটে,
সৌরভ তার ছুটে চারিধার,
ভৃঙ্গ সে মধু নিবে না লুটে?

কুসুম ফুটিলে, গন্ধ উঠিলে,
ছুটিলে মৃদুল মলয়-হাওয়া
কুঞ্জবিতানে মধুলোভীদের
যাবে নিশ্চয় দেখাটা পাওয়া।

জন্মের পর তাই ত তোমার
নয়টী বরষ যেতে না যেতে
তোমারি আশায় দাঁড়াইল আসি
একটী যুবক দু'হাত পেতে।

নব-বধূ বেশে নবম বরষে
নব-রূপ তব দেখিল সবে,
দেখিল তোমার দিব্যকান্তি
স্বর্গের ছবি নিখিল ভবে।

হীরালাল সনে হইল মিলন
বাজিল মিলন-বাদ্য যত,
কেহ দিল উলু উল্লাসভরে,
কেহ ফুকারিল শঙ্খ কত।

স্বামী সনে তুমি জন্মভূমিরে
ছেড়ে গেলে দূর ব্রহ্মদেশে,
স্বামীর প্রীতির ছায়াতলে বসি
কত না বরষ কাটালে হেসে।

ষষ্ঠবিংশ বৎসর কাল
বিদেশেই তুমি রহিলে সতী,
তোমার স্মৃতির উদ্দেশে আজ
নরনারী সবে করিছে নতি।

রমণীরে যাহা করে রমণীয়
সেই স্নেহ প্রীতি মমতা দিয়া
সবারে টানিয়া লইয়াছ কাছে
মুগ্ধ করেছ সবার হিয়া।

পরের কারণে যে পারে কাঁদিতে,
মুছাতে যে পারে নয়নধারা,
ব্যথিত জনের দুঃখ দেখিয়া
যে হয় আকুল আত্মহারা।—

তারি কাছে যায় কত না আশায়
পৃথিবীর যত ব্যথিত প্রাণী,
তারি মুখপানে আকুল পরাণে
চেয়ে থাকে সবে শুনিতে বাণী।

তুমি শুনায়েছ বাণী সুমধুর
আশাহত জনে দিয়েছ আশা,
অতিনিষ্ঠুর শত্রুকে তুমি
ভুলায়েছ দিয়ে মিষ্টভাষা।

এমনি করিয়া কেটেছে বরষ,
পেয়েছ হরষ কত না মনে,
পরের দুঃখে পেয়েছ বেদনা—
কাঁদিয়াছ কত সঙ্গোপনে।

চিরদিন হায় কভু নাহি যায়
কারো অনাবিল শান্তিসুখে,
একদিন বুঝি দীপ নিভে যায়
ঝড় উঠে তার শান্তবুকে।

সে ঝড় উঠিল, দীপ নিভে গেল,
শেষ করে দিল যত না আশা,
চিরপ্রিয় তব স্বামীর বক্ষে
যক্ষা আসিয়া বাঁধিল বাসা।

কাল-ব্যাধি হায়, ত্রাণ পাওয়া দায়,
প্রাণ নিয়ে তার নিঠুর খেলা,
একদিন হায় শেষ হয়ে গেল—
ভেঙ্গে গেল এই ভবের মেলা।

সতীর ললাটে মুছিল সিঁদুর,
হাতের শঙ্খ পড়িল খসে,
হিন্দুনারীর শ্রেষ্ঠ চিহ্ন
তিরোহিত হ'ল দৈববশে।

জন্মমৃত্যু দৈবের খেলা—
বেঁচে থাকা সেও দৈবলীলা,
মানব-হৃদয়-সিন্ধু-সলিল
দৈবেরই বলে নৃত্যশীলা।

তব দুঃখে মাগো কাঁদিছে সবাই
কারো মুখে নাহি হাসির রেখা,
তোমার বয়ান বিষাদ মলিন,
তোমার নয়নে অশ্রুলেখা।

আজ কাঁদে তব বৃদ্ধা জননী,
কাঁদে ভাই বোন তোমারে হেরি,
কান্নার রোল উঠে বক্ষেতে
বাংলার প্রতি সন্তানেরই।

স্বামী সোহাগিনী অভাগিনী আজ
অসহ্য ব্যথায় ভাঙ্গিছে হিয়া,
মৃত্যু-দগ্ধ ব্যথিত বক্ষে
সান্ত্বনা দিব কি কথা দিয়া?

আমাদেরই দেশে ছিল একদিন
মৃত সোয়ামীর সাজায়ে চিতা
অম্লানমুখে সহধর্ম্মিণী
স্বামী সনে হ'ত সহ-মৃতা!

আইনের বলে সে প্রথা উঠেছে
দূর হয়ে গেছে জুলুম-বাজী,
স্বেচ্ছায় শুধু শোকদাবানলে
তনুত্যাগ করা রয়েছে আজি।

সেই পথই তুমি করিলে গ্রহণ
ত্যাজিলে জীবন স্বেচ্ছাবলে,
হাসিমুখে হেন স্বর্গ-যাত্রা
দেখিল সকলে কৌতুহলে।

কোন ব্যাধি নাই, কোন গ্লানি নাই,
কাঁদে হিয়া শুধু স্বামীর শোকে,
তিনদিবসের বিরহে দহিয়া
গেলে কি চলিয়া স্বর্গলোকে?

স্বর্গেরই কোন দেবী ছিলে তুমি
এসেছিলে মাগো ধরার কূলে,
স্বর্গবাসীরা পেয়ে সন্ধান
তোমারে আজিকে লইল তুলে।

সন্তান তব ছিলনা যদিও—
তবু তুমি ছিলে ছেলের মাতা,
পরের ছেলের দুঃখে তোমার
সদা খোলা ছিল আঁখির পাতা।

লক্ষ্মীরূপিণী, দীনের তারিণী!
তুমি ছিলে মাগো মোদের ঘিরে,
সতীহারা হ'য়ে মাতা বসুমতী
ভিজিছে আজিকে অশ্রুনীরে।

নারীরূপে তুমি দেবীর প্রতিমা,
তোমারে পূজিব কি ফুল দিয়া?
তুমি নিখিলের ফুল চন্দন,
তুমি সকলের বন্দনীয়া।

অবসান

[শ্রীপূর্ণিমা দেবী বি-এ]

(এক)

'আকস্মিক দুর্ঘটনা' বিভাগে নূতন যে রোগী এসেছিল তার দিকে চেয়ে শিউরে উঠ্‌লুম! মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখখানার মলিন ছবি, মৌন মূক অতীতের কোন এক বিষাদ করুণ স্মৃতির ব্যথা জাগিয়ে দিলে আমার বুকে! কেবলি মনে হ'তে লাগ্‌ল এ মুখ আগে যেন কোথাও দেখেছি!

লোকটা মাতাল। পথের ধারে পড়েছিল। 'কর্মী সঙ্ঘের' সেবকেরা গাড়ীতে করে রেখে গেছেন। পোষাক পরিচ্ছদে ভদ্র বলেই মনে হয়। স্পষ্টই বুঝ্‌লুম অনেকদিনের অত্যাচারের ফলে এরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আর একটা দিনও বাঁচে কি না সন্দেহ। চোখ মুখ বসে গেছে। অতি দুর্ব্বল। যকৃতের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশা রাখা উচিত ভেবে উপস্থিত ক্ষেত্রে যা করা উচিত করে গেলুম।

তখনকার মত একটু সুস্থ হলে 'গৃহবাসী' রোগীদের তালিকাভুক্ত করে ৫৩ তালার একটা ঘরে ইহাকে পাঠিয়ে দিলুম।...

কিন্তু ব্যাকুল মন কেবলই জিজ্ঞাসা করছিল।—কে গো তুমি? আমার পরিচয়ের সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তোমার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে! তুমি কে গো?

(দুই)

সন্ধ্যার সময় জাপান থেকে নিকুঞ্জর লেখা একখানি চিঠি পেলুম। বায়স্কোপের ফিল্মের মত স্নেহ ভালবাসা মান অভিমান সমস্তের কত কাহিনী যেন চোখের সামনে দিয়ে খেলে গেল!

নিকুঞ্জ ছিল আমার প্রতিবেশী, আত্মীয়, বন্ধু ও সতীর্থ। সদাই হাসিমাখানো মুখখানা তার আজও যে দেখতে পাচ্ছি! কতই না তাকে ভালবাসতুম! দেশোদ্ধার ও সমাজ সংস্কার নিয়ে তার সঙ্গে রাতদুপুর পর্য্যন্ত জেগে কত বড় বড় আদর্শ গড়ে যুক্তি তর্ক ও আলোচনা করতুম।

সে বড় লোকের ছেলে। প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ে করবে না; সারা জীবন ধরে দেশের সেবা করে জীবন ধন্য করবে। কিন্তু জমিদার পিতা ছিলেন ভারী একরোখা। তাঁর কেবলি সন্দেহ হত ছেলেটা দলে পড়ে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বি, এস্‌, সি, পরীক্ষার একমাস আগে হঠাৎ একদিন জরুরি তার করে ছেলেকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। সেখানে নিয়ে সে দেখে ইতিমধ্যেই তার বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে! বারংবার আপত্তি করেও যখন পিতার মত বদলাতে পারলে না তখন সে বড় গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল। বিয়ের দিন সকালে আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না! তার বাবা ত সেইদিনই তাকে ত্যাজ্যপুত্র করে সমস্ত সম্পত্তি কন্যা ও জামাতাকে লিখে দিলেন। মাস কয়েক পরে আমায় সে লিখেছিল সে গিরিডিতে আছে; আমি যেন তার বাবাকে একথা না জানাই, আর সম্ভব হয়ত একবার নিজে গিয়ে দেখা করে আসি। ......চিঠি পেয়েই আমি গিয়েছিলুম। কোনও খবর না দিয়ে হঠাৎ তার বাসায় গিয়ে আশ্চর্য্য করব ভেবেছিলুম। কিন্তু নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম এই দেখে যে, যে লোক বিয়ে করবে না বলে পিতার স্নেহময় আশ্রয় ও বিরাট জমিদারীর মায়া ত্যাগ করে পালিয়েছে, তারই বুকের নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ এক কিশোরী সুন্দরী! কেমন যেন একটা ধিক্কারে আমার আপাদমস্তক জলে গেল। নিকুঞ্জ মোটেই লজ্জিত না হয়ে গর্ব্বোদ্ধত কণ্ঠে আমার দিকে চেয়ে রইল। একবার একটু করুণ হাসি হেসে বল্লে 'তুমিও কি আমায় ত্যাগ করলে ভাই?' আমি কথার উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে এলুম।......

তারপর এই দশ বছরের মধ্যে আর তার খবর রাখিনি। ওরকম দৃঢ়চিত্ত মহাপ্রাণের এই নীচ লক্ষ্যচ্যুতির কথা ভেবে নীরবেই শুধু কেঁদেছি, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে এসেছি 'মার্জ্জনা ক'র প্রভু! শাস্তি দিও তাকে।' তার

বিদায় কালের সেই করুণ স্বর 'তুমিও কি আমায় ত্যাগ করলে ভাই' আজও আমায় ব্যাকুল করে তোলে। .....

আজ সে লিখেছে—"দেশের সকল স্মৃতির মাঝখেকে শুধু তোরই মুখখানা কেবল মনে পড়ছে! কিন্তু দুঃখ রইল তুইও আমায় ত্যাগ করেছিস্! আজ আমি ভারী দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি ভাই! পিতার, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধুর, ও স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির অভিশাপ কুড়িয়েও যে অবলম্বনের জোরে আমি মাথা উঁচু করে ছিলুম এতদিন, আজ তাকেও চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে। যাবার সময় 'সুলতা' আমার মনের সমস্ত শক্তি ও সাহস কেড়ে নিয়ে গেছে। এ সময় তোকেও যদি কাছে পেতুম! অভাগিনী আজ সব প্রশংসা নিন্দার বাইরে মহাপ্রস্থান করেছে। তবু তার সম্বন্ধে দুটো কথা তোকে না জানিয়ে থাকতে পারলুম না।···পিতার আশ্রয় ছেড়ে আমি গিরিডিতে অজ্ঞাতবাস করব ভেবেছিলুম। মাস খানেক সেখানে থাকবার পর এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে আমার জীবনের ধারটাই বদলে দিলে। দীঘির জলে ডুবে আত্মহত্যা করছিল দেখে আমি ছুটে গিয়ে বাধা দিয়েছিলুম। সুলতা তখন কেঁদে বলেছিল, 'আমার জীবনে বড় জ্বালা, মৃত্যু বিনা শান্তি নেই, কেন আমায় বাধা দিলেন ?' আমি তার দুঃখের কাহিনী শুনতে চাইলে সে বললে 'দুর্ব্বৃত্তেরা আমাকে জোর করে ধরে এনেছিল। আমাকে ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করবার জন্ম তারা নিত্য পীড়ন করত। খুব কষ্টে আমি তাদের ব্যূহভেদ করে পালিয়ে এসেছি। এ কোন দেশ আমি জানি না। আমার বাড়ী কত দূরে—? কেমন করে সেখানে যাব? এদের হাত থেকে কেমন করে কতদিনই বা আর লুকিয়ে থাকব? কিছুই ভেবে ঠিক করতে না পেরে পথে পথে কেঁদে বেড়িয়া শেষে এই পথই যে আমি বেছে নিয়েছিলুম।' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তার বাড়ী কোথায়,—সেখানে কে আছে? এর উত্তরে সে তার পিতা মারা যাবার পর বিমাতার ভাইএদের কাছে এসে থাকত কিন্তু তাঁরা বড় যন্ত্রণা ও গঞ্জনা দিতেন। আর তার এই অত্যাচারে দুর্ব্বৃত্তদের সঙ্গে তাঁদেরও যে যোগ ছিল একথাও সে জানে। মৃত্যু ভিন্ন তার কোন গতিই নেই।···অভাগিনী আমারি মত জগতের অভিশাপ কুড়িয়ে, অজস্র নয়নাশ্রু মাত্র পাথেয় সম্বল করে সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল। আমি তাকে বরণ করে নিলুম যখন, তখন আর্ত্তের চিরসহায় ভগবান, সর্ব্বংসহা জননী পৃথিবী, গোধূলীর ম্লান আলো আর নীল আকাশের কয়েকটী তারা শুধু সাক্ষী ছিল। স্বর্গের অম্লান কুসুমের মত সে পবিত্র ছিল;—কিন্তু অকালেই ঝরে গেল! ······আজ আমি কলঙ্কিত, উদ্ধত ও অসংযত। শরীর আমার ভেঙে পড়েছে। শেষের দিন আমার খুব নিকটে এসেছে, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি! ডাক্তারে বলে এখনও সাবধান হ'তে। কিন্তু কেন? কার আশাপথ চেয়ে আমায় বাঁচতেই হবে? আমি কারুর একবিন্দু সহানুভূতি চাই না। সকলকার ঘৃণা ও উপেক্ষার দৃষ্টি থেকে আমি নীরবে সরে যাব! তবু কেন জানি না একটীবার দেশে ফিরে যেতে বড় ইচ্ছা হয়! একটীবার দূর থেকে শুধু তোদের দেখে আসব! শুধু দূর থেকেই দেখে চলে আসব!·····আজ তোকে যে এত কথা লিখছি, জানি না এ পড়বার তোর ধৈর্য্য থাকবে কি না! অথবা আমার হাতের লেখাও অস্পৃশ্য ভেবে তুই এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলবি! সব জেনেও যে আবার তোকে লিখছি, এর প্রকৃত কারণ আমি নিজেই বুঝে উঠছি না। কিন্তু মন যে আমার বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছে ভাই!·········

এতদিনের পর তাকে ফিরে পাবার জন্ম এ ব্যথিত আঁখি যুগ কত না ব্যাকুল আগ্রহেই সামনের পথের দিকে চেয়ে রইল! মনে অনুতাপ জাগল—কেন তাকে তার সব কথা শুনে বিচার না করে ছেড়ে চলে এসেছিলুম! আর কি তাকে ফিরে পাব?

(তিন)

রাত্রে সেদিন আমার কর্ত্তব্য ছিল না। তবু কিসের যেন একটা আকর্ষণ ফের খুঁজে খুঁজে সেই মাতাল রোগীটারই ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে!

মরণের আগের অরিষ্ট লক্ষণ তখন একে একে প্রকাশ হচ্ছিল। অসংলগ্ন কথা যা সে কইছিল, তার মানে হয় না। কখনো বা আপন মনে গান গাইছিল। কখনো বা আবার নিঝুম হয়ে চুপ করে ছিল।

নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করবার জন্ম ডান হাতের কব্জিটা তার তুলে ধরতেই হঠাৎ চমকে উঠলুম—হাতে উল্কি দিয়ে লেখা রয়েছে 'নিকুঞ্জ'!

আর একবার তার পাংশু মুখের পানে চেয়ে দেখলুম। সেই না? নিশ্চয়ই এ সেই নিকুঞ্জ! তাই বলি, এ মুখ যে বড় চেনা নিকুঞ্জ! ভাই! ফিরে আসবে বলেছিলে বলে কি ভাই এমনি দীনের বেশে আসতে হয়?

তার মাথাটী কোলে করে ভাবছিলুম,—ভগবান্! এ কি লীলা তোমার! এত বড় একটা প্রাণ পথহারা হয়ে স্বজাতি ও বিজাতীর শত লাঞ্ছনা সয়ে দেশে দেশে কেঁদে বেড়িয়ে বাংলা মায়ের দুয়ারে ফিরে এসে আজ লুটিয়ে পড়ল; কিন্তু তাকে বুকে টেনে নেবার জন্ম একজনও কেউ এগিয়ে এল না! জীবনের যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে ছেলেবেলার মত তেমনি নির্ভর হয়েই কি তাই আজ আমার কোলটীতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে?

আহুতি

(উপন্যাস)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

(৫)

ভোরবেলা ছেঁড়া ছেঁড়া এলোমেলো স্বপ্নের ঘোর হইতে মালতী চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য, কাল এত কাণ্ড ঘটিয়া গেল তথাপি মনে যেন কোন অবসাদ নাই। আজিকার নতুন উষার রঙ্গীন আলো, ফুলের সুবাস মাখা মৃদু হাওয়া সবই যেন কেমন সুন্দর। কে যেন ভোরবেলা মালতীকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছে, কে যেন বলিয়াছে—ভয় কিসের? তোমার অভাব কি? ধ্যানের দেবতাকে পূজা করিয়া নির্ভয়ে চলিয়া যাও, ধরণী তোমার জন্ত অমৃতভাণ্ড সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে।—মালতী দিনরাত্রি কেমন একভাবে একেবারে তন্ময় হইয়া রহিল। মাতা কন্তার এই আত্মগত ধ্যানটি বুঝিতে পারিলেন না, তাই বালিকার জীবনে এই প্রৌঢ়ত্বের আভাসটুকু তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে খোঁচাইতে লাগিল, যার কথার চোটে এবং হাসির আধিক্যে তাঁহাকে দিনের মধ্যে কতবার বিরক্ত হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে হইয়াছে, যার অভিমান ভাঙ্গিতে, আব্দার মিটাইতে, যাকে কত বাজে অবান্তর কথার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, আজ তাহার এ হেন নীরব শান্তিপ্রিয়তা তাঁহাকে কেবলই বারম্বার পীড়া দিতে লাগিল। কন্তার কোন কিছুই যেন আর তাঁহার কাছে সহজ বলিয়া মনে হইত না, কথায় তার ঝঙ্কার নাই, হাসির ফোয়ারা আজ তার রুদ্ধ, চলনের ভঙ্গিতে সে তরল গতিটুকুও যেন নাই, দেখিয়া দেখিয়া মার অনুতপ্ত মনখানি ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এতদিন একাকী মালতীর যে উচ্ছল হাসিরাশিতে প্রকাণ্ড বাড়ীখানি পূর্ণ হইয়াছিল, আজ তাহারই সে হাসির এবং চেঁচামেচির অভাবে, সে বাড়ীখানির শূণ্যতা মায়ের বুকে পাথর চাপা হইয়া বসিল, খাওয়া দাওয়া এবং পূজা আহ্নিকে কতটা সময় বা যায়, বাকী সময়টা অন্নপূর্ণাদেবীর এক দুঃসহ জ্বালায় ভরিয়া উঠিল, কন্তার নীরব ধ্যানে যে নীরব তৃপ্তি তাহা তিনি বুঝিতেন না, তাই সে শৈশবাবধিই অশান্ত ও চঞ্চল, হঠাৎ একদিনের ব্যবহারেই তাহার এই অস্বাভাবিক ধীরতা মাতাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

কন্তার নিঃসঙ্গ জীবনখানি ভরিয়া তুলিবার জন্য অন্নপূর্ণাদেবী বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার কামনা করিলেন, এবং জমিদার গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে সম্বন্ধে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। ক'দিন ধরিয়া তাহারই উৎসাহে মালতী যেন বহুদিন পরে আবার সজাগ হইয়া উঠিল।

(৬)

নলিন সম্বন্ধে গ্রামে আজকাল কাণাঘুঁসার আর অন্ত ছিল না, বড়লোকের আবদারে-ছেলে কলিকাতায় স্বাধীনমতে প্রশ্রয় পাইয়া থাকিলে যাহা হয় তাহারও তাহাই হইয়াছিল। গ্রামের লোকে তাই ইহাতে আর আশ্চর্য্যান্বিত বিশেষ কিছুই হয় নাই, বি-এ কিম্বা এম্-এ পাশও এ গ্রামে খুব নতুন একটা কিছু নয়,—কিন্তু সে সবই কষ্ট করিয়া, চেষ্টা করিয়া পড়া—তাই নলিনের চরিত্রগত বিশেষত্ব দু'একটা যাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল, লোকের কাছে তাহা খুব একটা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল না, কিন্তু যখনই তাহা অত্যাচার কিংবা কদাচাররূপে গ্রামেরই দু'একটা নিম্ন জাতীয় লোকের গৃহে প্রতিফলিত হইয়া পড়িল, তখনই গ্রামবাসীকে আপনা হইতেই একটু সজাগ হইয়া উঠিতে হইল। কথাটা যখন লোকের মুখে মুখে—গোপনেই—সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িতেছিল, অন্নপূর্ণাদেবীর কাণেও কথাটা ঢুকিতে তখন আর বিলম্ব হইল না, তিনি মনে মনে যথেষ্ট পরিমাণে সন্ত্রস্ত হইয়া, কন্তাকে বলিলেন,—নলিন সম্বন্ধে

ছেলের মতই যায় আসে, কিছু ত বলা যায় না মুখ ফুটে,—তা মা, ওর সামনে তুই আর বেরুস্ নি বাছা,—আর দরকারই বা কি বেরুবার,—কিন্তু ওই বা কেন ঘুরে ঘুরে অতবার আসে বাপু,—জানিনে তা। মালতী মায়ের কথায় উত্তর দিল না, একটীবার শুধু তাকাইয়া, মায়ের মুখের ভাবটী বুঝিতে চেষ্টা করিয়াই কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

সেদিন প্রতি কাজে,প্রতি কথায় মালতীর মনের তলদেশে কেমনই একটা কিসের বেদনায় পীড়া বোধ হইতে লাগিল কোথায় যেন একটা কাঁটা ফুটিয়াছে, তাহার সেই খোঁচার ব্যথাটা অনুক্ষণ মনে জাগিয়াই আছে, অথচ কাঁটাটি যে কোথায়,—তাহার সন্ধান মিলিতেছে না।

শীতকালের মেঘাচ্ছন্ন বিশ্রী দিনটা নিতান্ত অবসাদে কাটিয়া সন্ধ্যাবেলায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উঠানখানিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মালতী প্রতিদিনকার মত সেইদিনও বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছে, আজ মার কাজ এখনও সারা হয় নাই, মালতী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরের ঐ জ্যোৎস্নাস্নাত নতনেত্র নিস্তব্ধ প্রকৃতির পানে চাহিয়া কি একটা গূঢ় বেদনার মালতীর অপরিতৃপ্ত জীবন ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল,—মনে হইল, জ্যোৎস্না কেন ওঠে? এত আলো ত আর সহ্য হয় না! আঁধারের মত এমন করিয়া সারাখানি প্রাণে মিশিয়া থাকিতে আর কি কিছুতে পারে? মালতীর চোখ বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

উঠানে জুতার শব্দ হইল, মালতী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—সর্ব্বনাশ, এ যে নলিন দা! মালতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"মাসীমা,—"

"মা ঘাটে গিয়েছেন।"

"এখনই আস্‌বেন ত?"

মালতী কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। নলিন নূতন শেখা একটা থিয়েটারের গানে শিস্ দিতে দিতে উঠানে পায়চারি করিতে লাগিল। মালতীর অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল—ঘরে চলিয়া যায়, আবার মনে হইল, ঘরে গেলে যদি সেও যাইয়া ঘরে ঢোকে! তার চেয়ে এই পরিষ্কার আলোর খোলা উঠান—এই ভাল।

মালতী নতনেত্রে বারাণ্ডার কোণ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা নলিন কি মনে করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং মালতীর দিকে চাহিয়া প্রায় আদেশের ভঙ্গিতে বলিল, "আচ্ছা বল ত, আমায় কেন তুমি এত লজ্জা কর? আমি কি বাঘ না ভালুক?"

মালতী ভয় পাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, ঠিক সেই সময়ই কলসী কাঁখে অন্নপূর্ণাদেবী আসিয়া ধীরে ধীরে উঠানে দাঁড়াইলেন। নলিন পদশব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল,—"ওঃ, এই যে মাসীমা,—আমি ভাব্‌ছিলাম ফিরেই যাই।"

"সে কি, ফিরবে কেন, বসো,—তা এত রাত্তিরে কি দরকার নলিন?"

নলিন বারাণ্ডা হইতে মাদুরটা টানিয়া উঠানের জ্যোৎস্নালোকে আনিয়া আপনি পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

মালতী ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল, এবং অন্নপূর্ণাদেবী অশেষ ধৈর্য্যসহকারে বসিয়া বসিয়া, নলিনের সেই কলিকাতার থিয়েটার দেখার গল্প, কোন্ থিয়েটারের দল কিরূপ, কোন্ অভিনেতা বা অভিনেত্রীই বা কেমন, কাহার ক'টা মোটর, কাহার ক'টা গাড়ী সূর্য্যগ্রহণের দিন ভলাণ্টিয়ার হইয়া স্নানার্থিনীদের স্নানের সে কতখানি সুবিধা করিয়া দিয়াছিল,—সেই সব পরমাশ্চর্য্য কাহিনী শুনিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে মালতীর সেদিন সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে তখন ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, খোলা জানালার ভিতর দিয়া চক্ষু-কাটা বিদ্যুতের আলো তাহাদের মশারির মধ্যে ঢুকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে,—মালতী বাহিরে চাহিয়া রহিল,—ঘোর নিস্তব্ধতায় অবিরাম বারিপাতের শব্দে,—বিরাট অন্ধকারে, মালতীর মনের সুপ্ত ব্যথাটি হঠাৎ মাথা তুলিয়া জাগিয়া উঠিল। মালতী ঘুমাইতে চেষ্টা করিল, ঘুম আসিল না, ঘুরিয়া ফিরিয়া চোখের উপর তখনকার সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত উঠানটির দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল, সেই বিকটস্বর,—'কেন আমায় তুমি ভয় কর, আমি কি বাঘ না ভালুক!'

মাস দুই তিনের মধ্যেই অন্নপূর্ণাদেবীর "রাধাবল্লভের" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। গ্রামের অনেকে হাসিয়া চুপি চুপি বলিল, "ম্লেচ্ছগিরি করে, আবার ওসব লোক-দেখান ভক্তি

কেন ?” অনেকে বলিল, “তা বেশ হয়েছে, মেয়েটা যদি ও নিয়েই থাকতে পারে, তাহলেই ভাল।”

হইলও তাহাই,—মালতী আপনার সর্ব্বস্ব ঠাকুরের পায়ে ডালি দিয়া একেবারে তাহাতেই তন্ময় হইয়া রহিল। এই কয়দিন সে যে অভিশপ্ত মুখখানি তাহার, লোকের সম্মুখে বাহির করিতে মনে মনে সঙ্কোচ বোধ করিত, আজ সে মুখে পবিত্রতার দিব্যশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে,—সকালে বিকালে কত লোক আসিয়া ঠাকুর দেখিয়া যায়, মালতী অসঙ্কোচে তাহাদের মুখপানে চাহিয়া দেখে, তাহাদের কথাবার্ত্তার উত্তর দেয়। মালতী বেশ সহজ শান্ত হইয়া গেল।

নলিনী এই দুই তিনমাস বাড়ী ছিল না, পিতার আদেশে নিকটবর্ত্তী মহালগুলি পরিদর্শন করিতে গিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেখান হইতে তাহার নানারূপ কুৎসিত অত্যাচারের কথা পিতার কাণে আসিয়া পঁহুছিতে লাগিল। অবশেষে একবার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইলে এবং অনেক কিছুরই যথার্থ প্রমাণ পাইয়া, তিনি পুত্রকে বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নলিন পিতার আদেশে গৃহে আসিল সত্য, কিন্তু এবার পিতা তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—সে যেন সকল সময় পিতাকেও মানিতে চাহে না। তাহার আচার ব্যবহার এবং অন্যায় উৎপীড়নের কথা বলিয়া পিতা তাহাকে তিরস্কার করিলে সে উদ্ধত-ভাবে পিতার কথার উত্তর প্রদান করিতে লাগিল। পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, দ্বিতীয়বার এরূপ ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইলে তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবেন বলিয়া শাসাইয়া দিলেন।

ইহার পর একদিন দুপুরবেলা মালতী স্নানের পর ঘরে বসিয়া পশমের সুতা দিয়া ঠাকুর ঘরের আসন সেলাই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—নলিন হাসিয়া বলিল,—“উঠ্‌তে হবে না, বসো। মাসীমা কোথায় ?”

“ওধারে কাজে আছেন, ডেকে দেবো ?”

“না, তোমার কাছেই আমার দরকার।—ওকি ! পালাচ্ছ কেন ?—বসো, বসো,—”

কি ভাবিয়া মালতী একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, নলিন হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হচ্ছে এটা ? আসন ?—আমায় দাওনা দুচার খানা রুমাল সেলাই করে,—কি বল, দেবে ?

তারপর একটু সরিয়া আসিয়া আসনখানি হাতে তুলিয়া, হাসিয়া বলিল,—বাব্বাঃ—এ আসন তোমার ঠাকুরের জন্যে ! কি বুঝবেন তিনি এটা ! অত খাটুনী, অত পরিশ্রম সে ঐ একটা পাথরের মূর্ত্তির জন্যে ! ধন্য বাবা তোমাদের ভক্তি ! —তার চেয়ে ঐ অত ভক্তির এক আধ কণাও যদি আমাদের দাও ত’ পেয়ে আমরা বেঁচে যাই।

রক্তিমমুখে মালতী আসন খানি তুলিয়া, অন্য দ্বার খুলিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেই নলিন আর একটু অগ্রসর হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল,—কি, রাগ হোল না কি ? আচ্ছা, থাক তবে ও সব কথা। কোলকাতা থেকে থিয়েটারের পার্টি আনিয়েছি, শুনেছ বোধ হয় ? দু’রাত্রি এর মধ্যে উর্ব্বশী হ’য়েও গেল, পাড়ার ত বাকী কেউ ছিল না যেতে কিন্তু, তোমাদের ত কই দেখলুম না, আমি ক’বার করেই খুঁজে গেলাম !……

নত মস্তক আরো নত করিয়া বিপন্ন মালতী আসনখানি পাট করিতে বৃথাই চেষ্টা করিতে লাগিল। জানালার ওপাশে ঘন পাতাবৃত কাঁঠাল গাছটীতে একটা কাক বসিয়া বারম্বার চীৎকার করিতেছিল, সেদিকে চাহিয়া নলিন সহাস্যে বলিল—কাকটা ছাই মরতে আর জায়গা পেলে না !—আর শুনেছ মালতী, বেলগাঁয়ে সেদিন হরিচরণ মুখুজ্জের বিধবা মেয়েটার বিয়ে হ’য়ে গেল ! প্রথমে ত বামুন পণ্ডিতের খুব চেঁচামেচি হৈ চৈ শুনেছিলুম,—তা মুখুজ্জে না কি সে কেয়ারও করলে না, কাশী থেকে বামুন পণ্ডিত আনিয়ে দিব্যি ত মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়ে গেল, কে আর আটকাতে পারলে ! মেয়েটাও ভাই ভাজের গলগ্রহ হয়ে মরত, এবারে তারও একটা হিল্লে হোল।

মালতী নত মস্তক খানি তুলিয়া ধীর শান্তভাবে কহিল—পথ ছাড় নলিন দা,—ও ধারে বারাণ্ডায় ঐ মাদুর পাতা রয়েছে বসগে যাও, মা এক্ষুণি আসবেন।

নলিন সহসা মালতীর হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল,—কিন্তু কথা আমার তোমার সঙ্গেই মালতী!

মাসীমার সঙ্গে হবে—সে পরে—আগে আমি তোমার যদি মত পাই,—

জোরে হাতখানি টানিয়া দৃপ্ত কম্পিতকণ্ঠে মালতী কহিয়া উঠিল—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—এমন তুমি নলিন দা যাও! তুমি এক্ষুনি, এই মুহূর্ত্তে—বেরিয়ে যাও, সাবধান আর কক্ষনো এ বাড়ী তুমি আসতে সাহস করোনা। বলিয়া মালতী দ্রুতপদে নিজেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিস্ময় বিমুগ্ধ নলিন মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন অপমান তাহাকে কখন কেহ করে নাই; এবং এ অপমানের তেজে তাহার অন্তরের লালসা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, এবং ক্রোধের প্রথম মুহূর্ত্তে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'ঈশ, বড় যে অহঙ্কার,—তাইত, আমায় তুমি চেন নি চাঁদ, আচ্ছা, দেব এবার চিনিয়ে!

প্রায় একমাস মালতী অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কাটাইয়া দিল। আবার কখন নলিনদা আসে কে জানে! সত্যিই যদি মার কাছে কোন প্রস্তাব করিয়া বসে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ—মালতী ভাবে আর লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠে।

একদিন সন্ধ্যার পর মালতী আপনিই আসিয়া মার কাছে বসিল। মা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন মালতীর মুখখানা আজ বড় ম্লান, যেন সে কি একটা বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু কোথা হইতে একরাশ সঙ্কোচ ও ভয় আসিয়া যেন মুখখানা বন্ধ করিয়া দিতেছে। প্রায় সাত আট মাস মালতী মার কাছ হইতেও দূরে দূরেই থাকিত, মা-ই আপনা হইতে নানা ছলে, নানা কাজে কেবলই কন্যার পেছন পেছন ঘুরিতেন; আজ তাই তাহাকে আপনি আসিতে দেখিয়া রুদ্ধ বেদনার চাপে তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। আপনাকে সম্বরণ করিয়া তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কি হয়েছে মালতী?"

"না মা, হয়নি ত কিছু!"

আবার বহুক্ষণ নীরবে কাটিল। রাত্রি ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে, আকাশে একটা একটী করিয়া তারাগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মাতা নীরবে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—সম্মুখে যে অনন্ত রাত্রি, এ রাত্রির শেষ কোথায়? মালতী অত্যন্ত মৃদুস্বরে আবার ডাকিল,—"মা—"

"কেন, মা?"

"মা, চল আমরা গ্রাম ছেড়ে আর কোথাও চলে যাই।"

"সে কি, মা! তোর এই রাধাবল্লভকে ছেড়ে কোথায় তুই যাবি, বল্!"

মালতী রাধাবল্লভের উপর দারুণ অভিমানে অশ্রুসজল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"রাধাবল্লভ আমার কিছু করতে পারবেন না, মা; মা, নলিনদা আমায় ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছে—"

মাতা অত্যন্ত চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কি, নলিন তোকে ভয় দেখিয়েছে! চিঠি লিখেছে! কই সে চিঠি?"

মালতী ভীত হইয়া বলিল, "সে আমি ছিঁড়ে ফেলেছি, মা। আগে একদিন লিখেছিল, আবার আজ লিখেছে।"

মাতা আহতা ফণিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "আগে একদিন লিখেছিল, হতভাগী বলিস্‌নি কেন আমায়? সে চিঠি কই? কি লিখেছে?"

"সেও ত নেই, মা—সেও আমি ছিঁড়ে ফেলেছিলুম।"

মাতা ক্ষিপ্তের ন্যায় বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"এত সাহস,—এত সাহস নলিনের! এমনিভাবে আমার অপমান করে যাওয়া?"

মালতী ভীত বিবর্ণমুখে নত মস্তকে বসিয়াছিল। জ্যোৎস্না-লোকে তাহার অপূর্ব্ব রূপজ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া মাতার ক্রোধ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল, তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অভাগী, কেন তোর মরণ হ'ল না? ওরে, এত লোক মরে, যম কি তোকে চোখে দেখতে পায় না? তুই মর, মর, মর—"

পলকে পলকে, প্রহরে প্রহরে রাত্রি বাড়িয়া চলিল। মাতা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত দারুণ দুঃখ বেদনা ও ক্রোধের বোঝা কন্যার নত মস্তকে ঢালিয়া অবশেষে একেবারে মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন, ঘরের একধারে মৃন্ময়পাত্রে একটী ক্ষুদ্র আলো মিটি মিটি জ্বলিয়া দারুণ অন্ধকারের মধ্যে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। চন্দ্র অনেকক্ষণ অস্তমিত হইয়া গিয়াছে, সারাটী পৃথিবী একটা কালোছায়ায় ঢাকা পড়িয়াছে, এদিকে বাজারও বহুক্ষণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কোথাও আর জীবনের

কোন চিহ্নমাত্র নাই, মাতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অন্ধকারে পরস্পরের মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে, অন্নপূর্ণা দেবীর ভয় করিতে লাগিল। একটা যেন কেমনতর আশঙ্কা বিপদের অস্পষ্ট মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি গায়ে হাতে মাথায় তাহার নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে, আতি ধীরে সরিয়া আসিয়া তিনি শায়িতা কন্যার গায়ে হাত রাখিয়া বসিয়া রহিলেন। একবার মনে হইল, 'কাল সকালে উঠেই আমি মালতীর এই গোছা চুল নিজের হাতে কেটে ফেল্‌ব, এই পেড়ে সাড়ি ছাড়িয়ে বিধবার থান ধুতি পরিয়ে দেব, দেখব, কে আমার মালতীর দিকে চোখ তুলে চায়!'

মাতা সারাটি রজনী একইভাবে বসিয়া রহিলেন, অবশেষে কাল রজনীর অবসান হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রভাতের সূচনা দেখা দিল। একটা অনির্দ্দিষ্ট আশার ভাব মন হইতে দূর করিয়া মাতা দিব্য সহজভাবে কন্যার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। মালতী তখন তাহার মস্ত উদ্বেগ সমস্ত ভয় মাতার স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এই একান্ত স্নেহের পুত্তলি নিতান্ত দুর্ভাগিনীর দিকে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে এতক্ষণ পরে জলধারা নামিয়া আসিল। হায়রে, এই রূপের বোঝা লইয়া তিনি কি করিবেন! ইহাকে ত আর বহিয়া চলা যায় না; আবার ফেলিয়া দেওয়াও ত চলে না। তাঁহার রাত্রির সেই দারুণ উৎকণ্ঠা চোখের জলে গলিয়া পড়িয়া শীতল হইয়া আসিল।

সকাল হইয়া গেল, মালতী ঘুম ভাঙ্গিয়াও ঠিক তেমনি ভাবেই পড়িয়া রহিল। দিনের আলোয় তাহার নিজের অবস্থা চোখের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ায় সে আর মাথা তুলিতে পারিতেছিল না। যে দেহে মুখে বিলাসীর পাপময় লোভদৃষ্টি পড়িয়াছে সে দেহ সে মায়ের চোখের সম্মুখে কেমন করিয়া তুলিয়া ধরিবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

ক্রমে রোদে আঙ্গিনাখানি ভরিয়া উঠিল, চাকরদের ঘরে কোলাহল স্পষ্টতর হইয়া আসিল, মাতা মৃদু কোমলস্বরে বলিলেন, "ওঠ্ মালতী, চল্ নেয়ে আসি—"

মালতী বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া করিয়া একটা উপায় স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল, সে সলজ্জ কুণ্ঠিতস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "মা একবার মাসীমার কাছে গেলে হয় না?"

মাতার মুখে ধীরে ধীরে আবার দুশ্চিন্তার ছায়া নামিয়া আসিল, কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "তাতে কি ফল হবে? তাঁর নিজের ছেলে!"

মালতী ধীরে ধীরে বলিল, "তা হোক্ মা, তিনি ত এসব কখনো পছন্দ করবেন না, তাছাড়া তিনিও আমায় ভাল বাসেন।"

(ক্রমশঃ)

"চুট্‌কী"

[শ্রীরামেন্দু দত্ত]

(১)

ভট্‌চায্‌ মহাশয় আর হরি দুলের মধ্যিপথে দেখা হয়ে গেছে। দুজনেই হাট করে' ফিরছেন। হরি দুলের হাতে কলাপাতার মোড়কের ফাঁক দিয়ে দু' একটা জ্যান্ত চিংড়ি আত্মপ্রকাশ করছিল! ভট্‌চায্‌ মহাশয় চট্‌ করে বলে উঠলেন "হারে হরে, চিংড়ি মাছ কি হবে রে?"

হরি। "দাদাঠাকুর গো, পুড়িয়ে খাবো।"

ভট্‌চায্‌। "এ্যাঁ, জীব হত্যে?"—হরির মুখ পরজন্মের ভাবনায় এতটুকু হয়ে গেল। "তার চেয়ে আমায় দে, চচ্চড়ি হবে!"

(২)

পণ্ডিত মশাই ক্লাসে এসে ছেলেদের পানে চেয়ে হুঙ্কার ছেড়ে বল্লেন "হাটের বিষয় একটা সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ্"—ছেলেরা সবাই বড়ই ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে লেগে পড়ল। কেবল হরিশ বলে একটা বখাটে ছোক্‌রা বেমালুম ডেস্কে মাথা রেখে বেশ এক ঘুম ঘুমিয়ে নিলে। ঘন্টা পড়ে গেল। সব ছেলেরা যে যেমন পেরেছে, রচনা লিখে টেবিলে রেখে এল। হরিশ তখন লাফিয়ে উঠে খাতা নিয়ে তাড়াতাড়ি কি লিখে, সেটা দিয়ে এল। পণ্ডিত মশাই খাতা খুলে হাটের সংক্ষিপ্ত রচনা পড়লেন:—

"ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল, হাট বসে নাই।"

ষোড়শ শতাব্দীর একজন বঙ্গ মহিলা।

[শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার, এম্‌-এ, ভাগবতরত্ন]

বাঙ্গলায় তখন ঘোরতর বিপ্লব চলিতেছিল। পাঠান সম্রাট-হুসেন সাহ তাঁহার প্রতিভাবলে বঙ্গদেশে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাহার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পাঠান ও মোগলের মধ্যে বাঙ্গলার অধিকার লইয়া তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। এই রাজনৈতিক অশান্তির সময়ে একজন বঙ্গ-মহিলা অন্তঃপুরের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার জীবনের মহিমময় ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্ম বাহির হইলেন। তাঁহার জীবন-দেবতা নিত্যানন্দ প্রভু আচণ্ডালে প্রেমভক্তি দান করিয়া কতশত পাপী তাপীর হৃদয়ে শান্তির মন্দাকিনী ধারা বহাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু আজ তাঁহার তিরোভাবের পর সেই মহৎ অথচ বাধাবিপত্তিসঙ্কুল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে কে? স্বামীর জীবনের সাধনার ধনকে নিজের অন্তরের মধ্যে পাইতে চেষ্টা করাই তো যথার্থ পতি-ব্রতার কাজ। তাই নিত্যানন্দের যথার্থ সহধর্ম্মিণী জাহ্নবা দেবী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্ত প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম ঘরে ঘরে বিলাইবার জন্ম জীবন উৎসর্গ করিলেন।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন বঙ্গ-রমণীর পক্ষে এরূপ কার্য্যে-ব্রতী হওয়া যে কতদূর-সাহসের কথা, তাহা সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার কথা স্মরণ না করিলে ঠিক উপলব্ধি হইবে না। অবরোধ প্রথা তখন বাঙ্গলার মেয়েদের শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে। মুসলমান আগমনের পূর্ব্বেও আমাদের দেশে অবরোধ প্রথার অস্তিত্ব ছিল; কিন্তু একদিকে মুসলমানী প্রথার প্রভাব, অপর দিকে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির বিজেতাদিগের হাত হইতে হিন্দুরমণীদের রক্ষার চেষ্টা, এই উভয়ে মিলিয়া সেই অবরোধপ্রথাকে আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর আবার তখন সমাজের নূতন প্রতিবন্ধন। মুসলমানের নিকট হইতে হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্ম স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তখন অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব-রচনা করিতেছেন। তাহার মধ্যে "ন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি" কথাটার উপর খুবই জোর দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সেই-বাঙ্গালীর মেয়ের পক্ষে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করাকে সামাজিক বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কিন্তু যে সমস্ত নরনারী সামাজিক-নিয়মের গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া নব নব পথে ভ্রমণ করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা সমসাময়িকগণ কর্ত্তৃক বিদ্রোহী নামে অভিহিত হইলেও, পরবর্ত্তীকালে যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া পূজিত হন। আজ বঙ্গদেশে নারী জাগরণের এই প্রথম প্রভাতে জাহ্নবা ঠাকুরাণীর জীবনের আদর্শ আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে আশায়, তাঁহার পূত চরিতকাহিনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

জাহ্নবাদেবী নবদ্বীপের অনতিদূরবর্ত্তী সালিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সূর্য্যদাস মুসলমান শাসন-কর্ত্তার অধীনে কার্য্য করিয়া বিস্তর ধন সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আজকাল যেমন গবর্ণমেণ্টের বড় বড় চাকুরেরা রায় বাহাদুর, রায় সাহেব প্রভৃতি খেতাব পান, সেকালেও উপযুক্ত সুদক্ষ কর্ম্মচারীদিগকে সুলতানগণ সেইরূপ উপাধি প্রদান করিতেন। সূর্য্যদাস মুসলমান সরকার হইতে সারখেল উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী কন্যা—একটীর নাম বসুধা, অপরটীর নাম জাহ্নবা। উভয়েই অপরূপ সুন্দরী। যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাস আসিয়া তাঁহাদের উভয়েরই দেহলাবণ্যকে অপূর্ব্ব সুষমায় বিমণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। তাহা দেখিয়া সূর্য্যদাস একদিকে যেমন পরম আনন্দিত হইলেন, অপরদিকে তেমনি কন্তা দুইটীর বিবাহের জন্ম চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। বড়লোকের কন্তা, তাহাতে আবার সুন্দরী! তাই নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু একটীও সূর্য্যদাসের মনের মতন হয় না। তাঁহার প্রতিভা-শালিনী কন্তা দুইটী যাহার-তাহার হাতে তো দিতে পারেন

না! এমন স্বামী তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যে, তাঁহার কন্যাদ্বয়ের অন্তর্নিহিত প্রতিভাকে সম্যক্‌রূপে তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। এরূপ পাত্র তো সহজে জুটে না—তাই সর্ব্বত্র অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

এমন সময়ে নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের আদেশে নবদ্বীপে আসিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং তখন নীলাচলে বিরলে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-মাধুরী স্মরণ করিতেছেন, আর অঝোরে কাঁদিতেছেন। কে যেন তাঁহাকে একেবারে পাগল করিয়া দিয়াছে—তিনি সকল কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। তাই লোকসমাজে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তিনি নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশে পাঠাইলেন, আর বলিয়া দিলেন যে নিত্যানন্দ যেন বিবাহ করিয়া সংসারী হয়েন। বার বৎসর বয়সের সময় যে বালক বিশ্বের মধ্যে ভগবানকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল, যৌবনে যে সন্ন্যাসী অবধূত হইয়া জগতের শত দুঃখ ক্লেশের মধ্যে শান্তির সুবিমল কিরণ ফুটাইয়াছে, আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়া তাহাকে একি আদেশ শুনিতে হইল! কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ আদেশ যতই কঠিন হউক না কেন, জীব-জগতের কল্যাণ কামনায় তাহা প্রতিপালন করিতেই হইবে। হিন্দু সুপ্রজনন বিদ্যায় (Eugenics) চিরদিনই আস্থাবান, নিত্যানন্দের অলৌকিক শক্তি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয়, সেই জন্য শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে বিবাহ করিতে আদেশ দিলেন।

সূর্য্যদাস লোকমুখে শুনিলেন যে নিত্যানন্দ বিবাহ করিবেন। তাই তিনি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া নিত্যানন্দকে আহ্বান করিয়া উভয় কন্যাকেই একযোগে সম্প্রদান করিলেন। বসুধা ও জাহ্নবা নিত্যানন্দের গুণ ও কীর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এখন তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণ মন সমস্ত সমর্পণ করিলেন। নিত্যানন্দ পত্নী-দ্বয়কে লইয়া খড়দহে আসিলেন। কিছুকাল পরে বসুধার গর্ভে বীরভদ্র নামে একপুত্র ও গঙ্গা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহার পর নিত্যানন্দের তিরোধান হইল।

তখন নব প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের নেতৃত্বভার কে গ্রহণ করিবে এই সমস্যা উপস্থিত হইল। শ্রীচৈতন্য দেবের অপ্রকটের পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই অদ্বৈত নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় পরিবারবর্গ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শ্রীচৈতন্যের উপেক্ষিতা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী শোকে দুঃখে মুহ্যমানা হইয়াছেন—তিনি আর ঘর হইতে বাহির হন না। নির্জ্জনে গভীরতম দুঃখের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণের শেষদিনে স্বামীদেবতা তাঁহাকে যেমন ভাবে সাধন করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে তিনি ভগবদারাধনা করিতেছেন। সুতরাং তিনি আর বৈষ্ণব জগতের পরিচালনাভার গ্রহণ করিতে সমর্থা নহেন। জাহ্নবা দেবী তখনও যৌবনের সীমা অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু নিত্যানন্দের নিকট শিক্ষালাভ করিবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার মনে সাধারণ নারীর ন্যায় অহৈতুকী লজ্জা ও কুণ্ঠা স্থান পায় নাই। জাহ্নবা দেবী নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও সামাজিক গ্লানির আশঙ্কাকে উপেক্ষা করিয়া বৈষ্ণব সমাজের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর যশোধরা ও খৃষ্টের তিরোভাবের পর ভার্জ্জিন মেরী বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু উভয় স্থলেই ধর্ম্ম সম্প্রদায় তখন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তবে সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের নেত্রী হইবারও অধিকার বুদ্ধ-পত্নী বা যীশুমাতা লাভ করেন নাই; কিন্তু নিত্যানন্দের সহধর্ম্মিণী বাঙ্গলার অবরোধ-ব্যূহ ভেদ করিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেত্রীত্ব লাভ করিতে যে পারিয়াছিলেন, ইহা বঙ্গরমণীর পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।

জাহ্নবা দেবী প্রথমেই বৃন্দাবনে যাইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দের নিকট উপদেশ ও পরামর্শ লইয়া আসিতে চাহিলেন। তখন জাহ্নবা নিত্যানন্দের পত্নী বলিয়াই সম্মান লাভ করিতেছিলেন, তাঁহার নিজের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তখনও লোকে ভাল করিয়া পায় নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজের আচার্য্যবৃন্দ—এই অনতিক্রান্তযৌবনা মহিলাকে বৃন্দাবনে আসিতে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে ইঁহার প্রতিভা কি অসাধারণ! সেই অরাজকতার-দিনে কয়েকজন মাত্র অনুচর সঙ্গে করিয়া বঙ্গদেশ হইতে সুদূর বৃন্দাবন গমন করা বড় কম সাহসের কথা নহে। তাহার উপর আবার জাহ্নবাদেবী যে ভাবে রঘুনাথদাস গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির সহিত

আলাপ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে নিত্যানন্দ তাঁহার পত্নীকে বৈষ্ণবশাস্ত্র বেশ ভাল করিয়াই পড়াইয়াছেন। জাহ্নবার সহিত নিত্যানন্দদাস নামে তাঁহার একটী প্রিয় শিষ্য বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন—তিনি পরবর্ত্তীকালে জাহ্নবারই আদেশে "প্রেম বিলাস" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থ হইতে শ্রীরূপের সহিত জাহ্নবার কথোপকথন একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। জাহ্নবা শ্রীরূপকে বলিতেছেন—

"কিবা লীলাগ্রন্থ তুমি করিলা বর্ণন।
শুনাইঞা তাহা সুখী কর মোর মন॥
"ভক্তি রসামৃত সিন্ধু" "বিদগ্ধ মাধব"।
"দানকেলীকৌমুদী—আর "ললিত মাধব"॥
ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসিল কোন অভিপ্রায়।
কিরূপে কেমন ক্রম বর্ণিন তাহায়॥
ভাগবতে নাহি সেই লীলার বর্ণন।
শুনিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মোর মন॥ ১৬ বিলাস

ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন যে জাহ্নবাদেবী শ্রীমদ্ভাগত খানি বেশ ভাল করিয়াই পড়িয়াছিলেন। আর যে গ্রন্থগুলি তিনি শুনিতে চাহিলেন সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা—নাটক দুইখানির মধ্যে-আবার প্রাকৃত মিশ্রিত। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সহিত সুপরিচিত না থাকিলে "ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু" ভাল করিয়া বুঝা কঠিন। জাহ্নবা দেবী এরূপ বিদুষী হইয়াছিলেন যে শ্রীজীব যখন ঐ গ্রন্থগুলি শুনাইতে-ছিলেন, তখনই তিনি সঙ্গে-সঙ্গে উহা উপলব্ধি করিতেছিলেন।

"শ্রীরূপের ব্যাখা শুনি বসি ঠাকুরাণী।
ভাবের বিকারে কান্দি গড়ি যায় ভূমি॥"

বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় জাহ্নবাদেবী রূপসনাতন, লোকনাথ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। সকলেই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে এই মহীয়সী মহিলা যেন বঙ্গের বৈষ্ণব সমাজকে যথার্থ ভাবে পরিচালন করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশে প্রেমের যে প্লাবন বহাইয়াছিলেন, তাহার স্রোত তখনও মন্দীভূত হয় নাই। তখনও নরোত্তমের ন্যায় ধনীর সন্তান বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া সহসা শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা শুনিয়া গৃহ ত্যাগ করিতেছিলেন। এমনি আর একটী বালক মূর্ত্তিমান প্রেমস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে ছুটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেখানে যাইয়া শুনিল কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে তিনি লীলা সম্বরণ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তখন বালক পাগলের ন্যায় বঙ্গদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল, বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজের বিজ্ঞজনেরা তাঁহাকে জাহ্নবাদেবীর নিকটে যাইয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে বলিলেন। জাহ্নবাদেবী নারী হইলেও সকলে তখন তাঁহাকে প্রভু আখ্যায় অভিহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মিশরের রাণী হাটশেপও বা আমাদের সুলতানা রিজিয়া পুরুষের বেশ ধরিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন শুনা যায় বটে, কিন্তু নারীর বেশ বজায় রাখিয়াও এইরূপে পুরুষের সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করা বোধ হয় একমাত্র ষোড়শ শতাব্দীর ঐ বঙ্গমহিলার ভাগ্যেই জুটিয়াছিল। যাহা হউক, বালক শ্রীনিবাস খড়দহে জাহ্নবার নিকট আগমন করিল। জাহ্নবাদেবী দেখিলেন বালকের যেমন ভক্তি, তেমনি প্রতিভা। ইহার দ্বারা বৈষ্ণব সমাজের অনেক উপকার হইতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষাদ্বারা জীবন গঠিত না হইলে ভাবের উচ্ছ্বাস যে স্থায়ী হয় না, এ কথা জাহ্নবা ঠাকুরাণী বেশ ভালরকমই জানিতেন। তাই তিনি শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিলেন।

শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে অধ্যয়নকালে দুইটী সাধক-বন্ধু লাভ করিলেন। ইঁহাদের একজনের নাম নরোত্তম, অপরের নাম শ্যামানন্দ। এই তিনটী যুবকের উপর বৃন্দাবনের বৃদ্ধ আচার্য্যবৃন্দ গৌড়দেশে বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারের ভার অর্পণ করিলেন। বৃন্দাবনে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সেগুলি এই তিন জনের সহিত বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল। ইঁহারা বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যখন গ্রন্থগুলি লইয়া দেশে ফিরিলেন, তখন একটী বৈষ্ণব সম্মিলনী করা প্রয়োজন হইল। Church বা ধর্ম্মসম্প্রদায় যখন নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে তখন এইরূপ সম্মিলনী আহ্বান করা হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য যেমন বৈশালী প্রভৃতি স্থানের সঙ্ঘের প্রয়োজন হইয়াছিল, তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের জন্য একটী সম্মিলনীর প্রয়োজন হইল

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থে তাঁহার মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ তাঁহার ধর্ম্মের যেরূপ ব্যাখ্যা নূতন গ্রন্থগুলিতে করিলেন, তাহা সকলে মিলিয়া গ্রহণ করা এই সম্মিলনীর একটী উদ্দেশ্য ছিল। সম্মিলনীর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কীর্ত্তন প্রচার করা। আজকাল আমরা মৃদঙ্গ করতাল সহকারে যে কীর্ত্তন গীত হইতে শুনি, তাহার উদ্ভাবক নরোত্তম ঠাকুর। তিনি এই বৈষ্ণব মহা-সম্মিলনীতেই সেগুলি সর্ব্বপ্রথমে লোকসমাজে প্রচার করেন। বঙ্গদেশের সকল স্থানের লোকই এই সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন—আর নরোত্তমের কীর্ত্তনপ্রথা অতীব হৃদয়গ্রাহী। তাই দেখিতে দেখিতে কীর্ত্তন সঙ্গীত বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল। সম্মিলনীর তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল বিষ্ণুপ্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা। ইহার পূর্ব্বে কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিত ও উড়িষ্যায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার বহুল প্রচার তখনও হয় নাই।

এই সম্মিলনীর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নরোত্তমঠাকুর মহাশয়, আর তাঁহার ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত ইহার সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিলেন। রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী খেতরী গ্রামে মহাসম্মিলনীর স্থান হইল। এই সম্মিলনীর প্রাণস্বরূপ হইলেন জাহ্নবাদেবী। তাঁহার ইঙ্গিতেই ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটী কাজ হইতে লাগিল। বাঙ্গলার ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসে এই সম্মিলনীর স্থান অতি উচ্চে। একজন বঙ্গমহিলার পরিচালনাধীনে যে সম্মিলনীর কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহার বিবরণ সাধারণের জানিবার কৌতূহল হইতে পারে বলিয়া ইহার একটু বর্ণনা করিতেছি।

খেতরীর মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য জাহ্নবাদেবী সদলবলে খড়দহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল প্রধান ব্যক্তি ছিলেন "ভক্তিরত্নাকর", (দশম তরঙ্গ ৬৩৩ পৃষ্ঠা) তাহার একটী মস্ত বড় ফর্দ্দ দিয়াছেন। প্রথমে জাহ্নবাদেবী পদব্রজেই সকলের সহিত যাইতে লাগিলেন—কিন্তু খানিকটা যাইয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন বলিয়া পাল্কীতে আরোহন করিলেন। যে গ্রাম দিয়া তিনি যাইতে লাগিলেন, সেই গ্রামেই লোক ভিড় করিয়া আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।

"শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর গমন দর্শনে
গ্রামে গ্রামে লোকের সংঘট্ট স্থানে স্থানে॥"
(ভঃ রঃ ৬৩৩ পৃঃ)

তাহার পর পথে যাইতে যাইতে যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, সকলকে সঙ্গে লইলেন। এইরূপে তাঁহারা নবদ্বীপে আসিলেন। নবদ্বীপ তখন বিষাদে আচ্ছন্ন—সেখানকার ভক্তবৃন্দ শ্রীচৈতন্যের বিরহে জীবন্মৃত হইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে লইয়া জাহ্নবাদেবী অগ্রসর হইতে লাগিলেন—ওদিকে আবার অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দ শান্তিপুর হইতে দলবলসহ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। জাহ্নবাদেবী খুব বড় কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও, তিনি বঙ্গরমণীর চিরন্তন মাতৃস্বভাব ভুলিতে পারেন নাই। তাই কাটোয়ায় পৌছিয়া তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ঐ বিপুল জনসঙ্ঘকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া কয়েক দিন চলিতে চলিতে খেতরী গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

সেদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা—শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি। জাহ্নবা-দেবী শ্রীনিবাসকে নূতন বিগ্রহের অভিষেক করিতে বলিলেন। অভিষেককালে ভক্তবৃন্দের জয়ধ্বনিতে দিগন্ত পরিপূরিত হইল। তাহার পর শ্রীনিবাস আসিয়া—

"শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরে চরণে প্রণময়।
তেঁহো অতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশয়॥
পরম আনন্দে কহে মধুর বচন।
সবে দেহ পুষ্পমালা প্রসাদি চন্দন॥"

তারপর নরোত্তম তাঁহার নবাবিষ্কৃত কীর্ত্তন গান আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া সকলের হৃদয় একেবারে বিগলিত হইল। সকলেই বলিতে লাগিলেন, স্বর্গের এ কোন সুষমা নরোত্তম নরলোকে প্রকাশ করিলেন! তাহার পর জাহ্নবা দেবী শ্রীনিবাসকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে সেদিন আবার দোল উৎসব—ফাগ খেলাইতে হইবে। শ্রীনিবাস সুবাসিত ফাগ লইয়া আসিলেন। জাহ্নবা দেবী প্রথমেই তাহা লইয়া মন্দিরের মধ্যে শ্রীবিগ্রহদের অঙ্গে আবীর দিতে প্রবেশ

করিলেন। সেইখানে শ্রীচৈতন্যের অঙ্গে ফাগ দিতেই তাঁহার প্রাণের ঠাকুর নিত্যানন্দের কথা স্মৃতিপথে প্রবলভাবে জাগরিত হইল। তিনি—

"হইয়া অধৈর্য্য পুনঃ আসিয়া নির্জ্জনে
নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দুনয়নে।"
(নরোত্তম বিলাস—১৬২ পৃঃ।)

সমবেত ভক্তগণ যখন আনন্দে অধীর হইয়া আবীর খেলায় মগ্ন, তখন এই ব্যথিতা বিরহিনী নারী বিরলে বসিয়া অশ্রুজলে গণ্ড দুইটী ভাসাইতে লাগিলেন।

পরদিন মহোৎসব। কত শত রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে। জাহ্নবা দেবী নিজে সহস্র সহস্র লোকের পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সকলকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া জাহ্নবার মাতৃস্বভাব সার্থকতা লাভ করিত।

খেতরীর মহোৎসব পরমানন্দে সম্পন্ন হইল। জাহ্নবা দেবীর পরিচালনাগুণে তাহাতে কোন প্রকার ত্রুটী বিচ্যুতি হইল না। পরদিন তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন বলিয়া ভক্তবৃন্দকে জানাইলেন। সন্তোষ দত্ত শ্রীজাহ্নবার বৃন্দাবন গমনোপযোগী সকল দ্রব্যের সংস্থান করিয়া দিলেন।

এবার জাহ্নবা দেবীর বৃন্দাবন গমনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। বৈষ্ণবধর্ম্ম তখনও সর্ব্বসাধারণে গ্রহণ করে নাই। যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়া জাহ্নবা দেবী গমন করিবেন, সেই সকল স্থানে যাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। আর বৃন্দাবনে যে সকল বৈষ্ণবাচার্য্য তখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া লইবেন।

বৃন্দাবন যাইবার পথে প্রথমেই একখানি বৃহৎ গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে লোকে তাপসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হিংসাদ্বেষের পঙ্কে নিমগ্ন ছিল। তিনি তাহাদিগকে প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

"শ্রীঈশ্বরী অনুগ্রহ কৈলা অতিশয়।
পাষণ্ডিগণের হৈল উল্লাস হৃদয়॥" ভঃ রঃ ৬৬২পৃঃ।

এইরূপে যে গ্রামে যাইতে লাগিলেন, সেইখানেই কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ যেমন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রেমধর্ম্ম দান করিয়াছিলেন, জাহ্নবা দেবীও তাঁহাদের ন্যায় উদারতা দেখাইয়া মুসলমানদিগকেও প্রেমের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

শুনি ঠাকুরাণী মনে হরিষ অন্তরে।
অনুগ্রহ করিলেন সর্ব্ব যবনেরে॥
হেন কালে হরিধ্বনি উঠিল তথায়।
সকল যবন নাচে কৃষ্ণগুণ গায়॥

জাতিধর্ম্ম কিছুরই অপেক্ষা না রাখিয়া সমস্ত জীবজগতকে প্রেমের সূত্রে বন্ধন করিবার এই প্রয়াস নিত্যানন্দের পত্নীরই উপযুক্ত কার্য্য। জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে আসিয়া যে সকল বস্ত্র আভরণ ভক্তগণের নিকট উপহার পাইয়াছিলেন, তাহার সমস্তই দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন। বৃন্দাবনের সাধকগণের সহিত কিছুদিন যাপন করিয়া তিনি আবার গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বঙ্গদেশে বহুস্থানে পর্য্যটন করিয়া তিনি অনেককে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ফলকথা এই যে শ্রীচৈতন্যের যুগের পর জাহ্নবা দেবীই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণস্বরূপা হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনুপ্রেরণাতেই শ্রীনিবাস ও নরোত্তম বঙ্গদেশে ও শ্যামানন্দ উড়িষ্যাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহার তিরোভাবের পর বৈষ্ণবগণ তাঁহার বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। নদীয়ার অন্তঃপাতী সুখসাগর নামক স্থানে তাঁহার এক মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। অধুনা সেই বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে থাকিয়া চাকদহের নিকটবর্ত্তী চান্দুড়ি নামক স্থানে পূজিত হইতেছেন। সেখানকার লোকেরা আজও জাহ্নবা দেবী সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করিয়া থাকে।

জাহ্নবা দেবী বঙ্গের এক নব জাগরণের যুগে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের রাজ্যে নর নারীর সমান অধিকার ঘোষনা করিয়াছিলেন—বিশেষতঃ নারীর হৃদয়ের সুকোমলভাব জাগ্রৎ সাধনার পক্ষে প্রকৃষ্টতর এই বাণী প্রচার করায় সেইযুগে নারীশক্তি বিশেষরূপে উদ্বোধিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে আমরা জাহ্নবা দেবীর ন্যায় মহীয়সী মহিলাকে পাইয়াছিলাম।

প্রমানপঞ্জী—১। নিত্যানন্দ দাস কৃত 'প্রেমবিলাস' ২। মনোহর দাস কৃত 'অনুরাগবল্লী' ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তীকৃত ভক্তি রত্নাকর ৪। নরোত্তম বিলাস ৫। কবি কর্ণপুর কৃত—গৌর গনোদ্দেশ দীপিকা ৬। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ৮ম বর্ষ।

শুভ-দৃষ্টি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু।

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [ত্রিংশ সপ্তাহ

ক'নের হাট (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১)—ঔপন্যাসিকা

"ভয় পাবেন না, কবিতা নয়, উপন্যাস! দু'টো পরিচ্ছেদ হয়েছে, শুনুন-না একটু, মুগ্ধ হ'য়ে যাবেন। জানেন—নিশ্চয়ই, বঙ্গদেশের পাঠক আমার উপন্যাস পাঠে বিমোহিত, বিস্মিত, স্তম্ভিত!"

"না পড়ে—আমিও!"

(২)

ললিত-কলা

"পোর্ট্রেট পেন্টিং করাতে চান্? তা বেশ। কিন্তু মশাই, যদি কিছু মনে না করেন ত বলি, আপনার চেহারাটা ছবির যোগ্য একদম নয়।"

"তাই দেখ্‌ছি।"——সরোষে প্রস্থান।
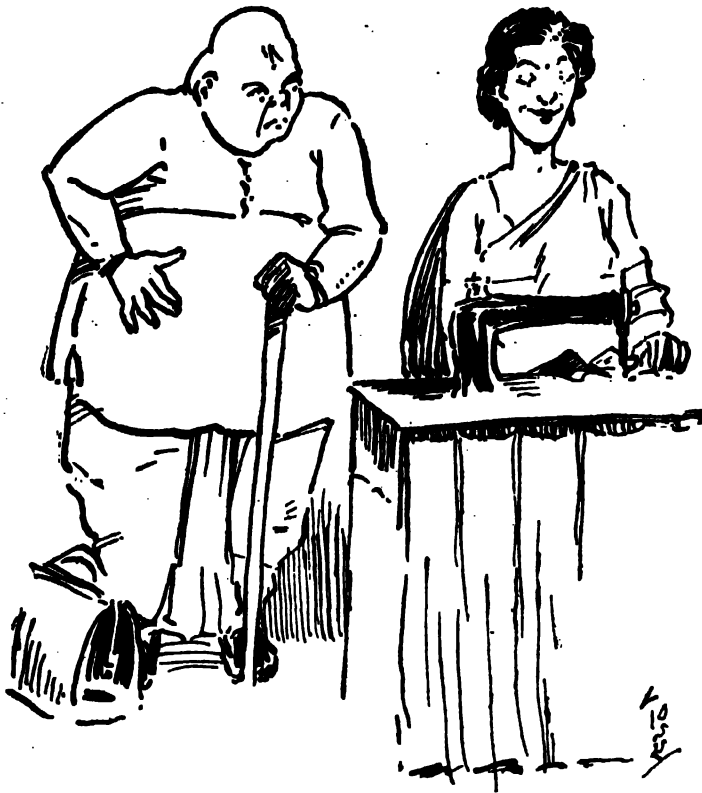
(৩)

চারু-শিল্পী

কনে। "আই ওয়াণ্ট এ ক্যাপিট্যালিষ্ট !"
শিকারী। "আমার উপর যায় যে !"
উল্টা বুঝিলি রাম !

(৪)

কমল দলের অভাব আছে।

দ্রিম-তা দেরে দেরে না———হাঁ!
কাজকর্ম্ম কিছু জানেন না, শুধু ঐ ধিড়িম, ধিড়িম, তা ধিড়িম!

(৫)

বাদন না ব্যাদান ?

সহানুভূতি সঙ্গীত

"তুমি—
কোন সুদূরের ধন, অ্যাঁ ?"

(৬)

একঠেঙ্গে

"দেখুন খোঁড়া নয়, একটু শির টান্!"

"হুঁ। শিরটান্ বলেই সাড়ে তিনে রেহাই দিচ্ছি!"

"আজ্ঞে—অসুখে… "

"আমিও কোন্ সুখে!"

(৭)

সর্ট হ্যাণ্ড (উইদাউট্ টাইপরাইটিং)

[কেরাণী-বাবুরা জানেন,
আজকাল সর্টহ্যাণ্ডেরই
কদর]

"বাঁ হাতটা একেবারেই অকর্ম্মণ্য যখন, সংসারের আদ্ধেক কাজকর্ম্ম লোক দিয়ে করাতে হবে। চিরকালের জন্মে সে খরচটা ত কম নয়। বুঝে সুঝে ধরে দিন—আমার আপত্তি নেই।"

(৮)

প্যারালেটিক।

"দেখুন, ছেলেবেলায় একবার প্যারালিসিস্"——
"ও বাবাঃ! প্যারালিসিস্ – থাইসিসের বাবা!"

(৯)

চলনসই

"চলে" তবে পাঁচে নয়, পনেরো পেলে দেখ্‌তে পারি।"

(১০)

কুব্জ—দরজী
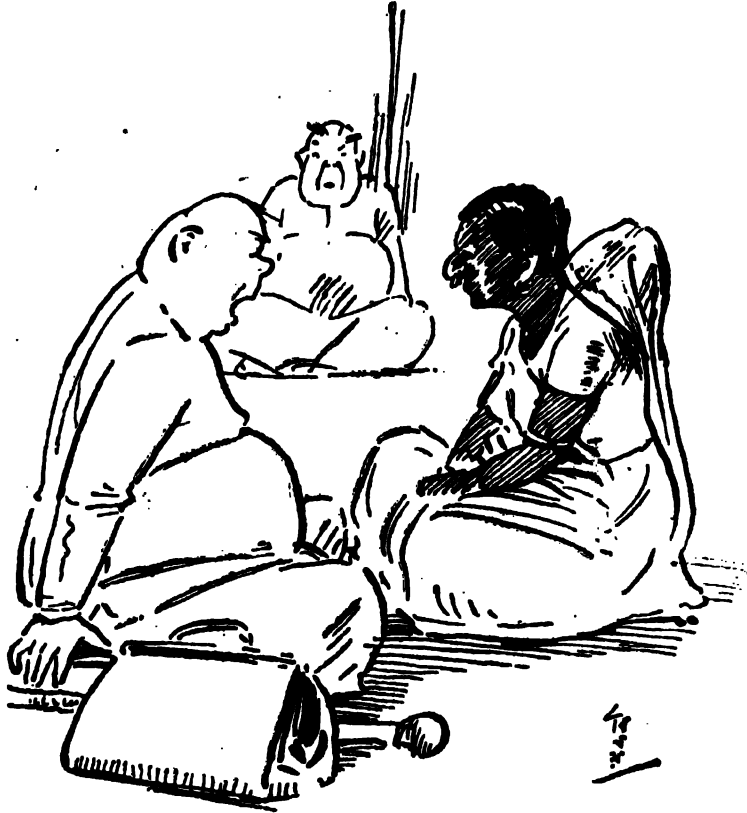
"পিঠে আবার ওটা কি বাবা! ঘটোৎকচন্
ত্রিশ হাজার নগদ—তবে তরাতে পারি।"

তের! তের!

(১১)

ভক্তি-বিনোদ

পিতা। মেয়েটি একটু ময়লা বটে বুঝলি ননী, এদিকে তেমনি সর্ব্বশুদ্ধ তের হাজার! কেমন রে,—রাজী ত?

পুত্র। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম···ঐ যাঃ, আর মনে নেই ত!

জনক-জননী। হয়েছে, হয়েছে, ঐতেই হয়েছে!

পুত্র। জননী গরিয়সীশ্চ···ছুঃ শা···

(১২)

পরামাণিক

"ভাল মন্দ লোক থাক ত সরে যাও,—ভাতার পুতের মাথা খাও—"

(১৩)

বরের বন্ধু

"ছাদনা-তলায় ঢুকতেই হবে !"

(১৪)

নিতবর

"এ যে একেবারে চাঁদের হাট-বাজার বাবা !"

(১৫)

পুরোহিত

চর্ব্ব-চুষ্য + দক্ষিণা + ছাঁদা + কাপড় গামছা + গাড়ীভাড়া

— শুভাশীর্ব্বাদ।

(১৬)

সম্প্রদান

ম্যাও! (স্বগতঃ) এ যে বন-বেড়ালের বাচ্ছা বাবা!

শুভ-দৃষ্টি—প্রথমে আছে—
দেখুন!!!

আমরা কি অবলা ?

[শ্রীমতী সফিয়া খাতুন বি-এ]

"চরিত্রহীনে" সতীশ ক্রুদ্ধ হয়ে সরোজিনীকে বলেছিল—আপনি কি মেমসাহেব যে, টম্‌টম্‌ হাঁকিয়ে এতদূরে এসেছেন ? আপনি কি ইংরাজের মেয়ে যে, যেখানে ইচ্ছা একলা গেলেও কোন ভয় নেই ? আমাদের দেশীলোক অসহায় দেশীমেয়ে পেলেই তাকে অপমান করবে, তার উপর অত্যাচার করবে—এই এ দেশের নিয়ম, তাকি আপনার বাপ মায়েরা জানেন না ?

যেদিন এই জায়গাটা পড়ি সেদিন আমাকে অনেকগুলি কথাই ভাবতে হয়েছিল। ভাবছিলাম যে সত্যই কি আমরা এত অবলা বা বলহীনা ? আর তা ছাড়া আমাদের ছেলেদের উপর যে লোকে এতবড় একটা বদনাম দিয়েছেন—আমাদের দেশীলোক অসহায় দেশীমেয়ে পেলেই তাকে অপমান করবে, অত্যাচার করবে—এই এ দেশের নিয়ম—একি সত্যই ঠিক কথা, না লেখকের মিথ্যা কল্পনা ? তাই নিয়ে আমাকে অনেক মাথা ঘামাতেও হয়েছিল।

লেখক আমাদেরই বুঝাতে চেয়েছেন—যেহেতু আমাদের ছেলেরা রাস্তায় মেয়েদেখেই অপমান করবে, অত্যাচার করবে অতএব আমাদের আর রাস্তায় বেরুবার দরকার নেই।

যেহেতু অপমান করবে সেহেতু বেরুবার দরকার নাই।—একথা মোটেই মানতে রাজী নই। নরওয়ে ভ্রমণ কাহিনী লিখতে গিয়ে বিমলা দাসগুপ্তা মহাশয়াও বলে গেছেন—অনেকে বলিতে পারেন যে,স্বদেশে এত স্থান থাকিতে বিদেশে, বিশেষতঃ সাত সমুদ্র তের নদী পারে যাওয়ার আবশ্যকতা কি ? কথাটা খুবই সত্য এবং স্বদেশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিবার আগে আমাদের মনে এই বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছাটা যে বড়ই অস্বাভাবিক এবং লজ্জাকর তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তবে কথাটা তলাইয়া দেখিলে অনেকেই হয়ত বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের দেশে আজও স্ত্রীলোকের পক্ষে সকল জায়গায় যাতায়াত তত সহজ ও সুবিধাজনক হয় নাই। এজন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকের কোথাও যাওয়া ঘটে না। কিন্তু ইউরোপের প্রায় সকল স্থানেই সকল রকম যাত্রীদের সুখ ও সুবিধার জন্য বেশ সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। এমন কি একজন প্রাপ্ত বয়স্কা রমণীও নির্ভয়ে একাকিনী দূরদেশে যাতায়াত করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ অবমানিত বা লাঞ্ছিত হওয়ার কোনই আশঙ্কা নাই।

কথাগুলি অতি সত্য বটে কিন্তু কথা হচ্ছে ইউরোপের ছেলেরা দাঁওয়ে পেলে কোন যুবতীকে অপমান কি অত্যাচার করতে ছেড়ে দেয় কি ? আমাদের ছেলেরা না হয় দেখিয়ে জল খাচ্ছে, আর তারা না হয় ডুব দিয়ে জল খাচ্ছে ! এই ত তফাৎ ! আমাদের ছেলেদের মধ্যে বর্ব্বরতা কাপুরুষতা যথেষ্ট আছে, তার জন্য ছেলেদের মা'রাই দায়ী। তাঁরা শুধু ছেলের জন্ম দিতেই শিখেছেন, মানুষ করে দিতে শেখেন নি। কিন্তু এ অবস্থায় ও আমি আমাদের ছেলেদেরই সাহেব ছোকরাদের চাইতে অনেক ভাল মনে করি। কারণ আমাদের ছেলেরা সাহেব ছোকরাদের মত তলে তলে সর্ব্বনাশ করতে জানে না। যদি অন্যায় করে ত জানিয়ে শুনিয়েই করে থাকে।

বিলিতী সুন্দরী যুবতীর হাতের ব্যাগটা কি রুমালটা তুলে দিতে অনেক বিলিতী যুবককে পাগল হয়ে ছুটে আসতে দেখেছি। এমনও দেখেছি যুবক স্বীয় বক্ষস্থলোপরি যুবতীর পা তুলে নিয়ে জুতার ফিতা বা বোতাম্ লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই যুবককেই দেখেছি কোন অশীতি বর্ষীয়া দন্ত বিহিনা লোলচর্ম্মা অসহায়া নারীকে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত রাস্তায় ফেলে এসেছে। বৃদ্ধা যুবকের কাছে বারবার সাহায্য চেয়েও সাহায্য পায় নাই।

আমাদের ছেলেদের যুবতীর বেলায় হয়ত তাদের মাথায় ভূত চেপে যেতে পারত, কিন্তু বৃদ্ধাকে এমনি অবস্থায় কোনদিনই ফেলে আসত না। এইটী-ই হচ্ছে আমাদের ছেলেদের বা দেশের রীতি।

সতীশচন্দ্র সরোজিনীকে যা বলেছেন তা মোটেই সত্য নয়। আর যদি সত্যই হয়, তাহলে এমন সত্যকে কোনদিনই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

ছেলেরা অত্যাচার করবে তাই ঘর হতে বেরুব না, এ কেমন কথা ! বরং এ অবস্থায়ই আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের উচিত যে সে সব ছেলেদের সঙ্গে মিশা এবং তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া যে আমরা আর কেহ নই, তাদেরই এক একটী বোন, মা। আমাদের অপমান বা অত্যাচার করলে তাদের ঘরের মা কি বোনকেও অত্যাচার বা অপমান করা হয়।

স্নেহ ভালবাসায় মানুষ তো দূরের কথা, বনের পশু, বাঘ, ভাল্লুক, হাতী প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ও পোষ মানে। যে সব ছেলেরা মেয়েদের অপমান করে, তারা বোধ হয় বাঘ

ভাল্লুক চাইতে অনেক গুণে ভাল। যদি বাঘ ভাল্লুককেই পোষ মানান যায়, তবে সে সব ছেলেদের আর পোষ মানান যাবেনা কেন?

আমরা এই মনে করে' ছেলেদের হতে দূরে দূরে থাকি বলেই ছেলেরা আমাদের কি একটা অদ্ভূত জীব মনে করে। অনেক মেয়েদের দেখেছি ছেলেদের সম্মুখে হঠাৎ পড়লেই সে ছেলেটা বাঘ কি ভল্লুক মনে করে সাত হাত লম্বা ঘোমটা টেনে দৌড় দেন! এসব দৃশ্য ছেলেদের কাছে এমনি বিশ্রী হয়ে দাঁড়ায় যে তা নিয়েই তারা নানারকম কথা বলে! এদিকে যিনি সাতহাত ঘোমটা দিয়ে চল্লেন তিনি কিন্তু ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ছেলেটাকে একবার দেখে নেবার লোভ ছাড়তে পারেন নাই! মেয়েরা এসব করেই ছেলেদের মনে নানা মন্দ চিন্তা ঢুকিয়ে দেন। এসব অভিনয় না করে সাদা সিধি ভাবে চলে গেলে ছেলেদের মাথা অত সহজে বিগড়ে যায় না। পরের মা বোনকে নিজের মা বোন মনে করবার সুযোগ আমরা আমাদের ছেলেদের দিচ্ছি কই! একথা ত সহজেই বুঝা যায় যে ছেলেরা বাড়ীতে নিজের মা বোনের উপর অন্যায় বা অপমান করবার কথা চিন্তাও করতে পারে না কেন? তার প্রধান কারণ, দিনরাত এঁদের সঙ্গে চলাফেরা করে এঁরা যে তার কাছে কে তা বুঝতে পারে; অবশ্য পরের মেয়ের বিষয় এরকম ধারণা হওয়া বড় সোজা কথা নাও হতে পারে, কিন্তু অনেকটা হওয়া খুবই সম্ভব।

সতীশ চন্দ্র যে বলেছেন "আপনি কি ইংরাজের মেয়ে যে যেখানে ইচ্ছা একলা গেলেও কোনও ভয় নেই?"

অবশ্য লেখক, বেচারী সরোজিনীকে যে ছাঁচে গড়ে তুলেছেন তাতে একথা মানায় বটে। কারণ সরোজিনী যদি স্বাধীন মেয়েই হ'ত তাহলে তার এভাবে এত নিরুপায় হয়ে গাড়ীর দিকে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সত্যিই আমার কাছে যেন বড় বেখাপ্পা লাগে। অন্তত আমি হলে ত তা মোটেই সহ্য করতে পারতাম না। মরি আর বাঁচি, পায়ের জুতা খুলে পটাপট্ হিন্দুস্থানিকে নাকে মুখে লাথি দিয়ে তার মায়ের দুধ নাক দিয়ে এনে তবে ছাড়তুম।

অবশ্য এত লোকের সঙ্গে পেরে উঠতাম কিনা তা সন্দেহ ছিল কিন্তু নিজে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার পূর্ব্বে অন্তত: একটা কি দুটার জান নিয়ে তবে হয়ত মরতাম। সরোজিনী এটাই করেছিল মস্ত বড় ভুল। সে স্বাধীন হয়েছিল বটে কিন্তু স্বাধীন হবার মত তার শক্তি ছিল না। আজকাল শত-করা ৯৯টী মেয়েই সেই শক্তি, মায়ের শক্তি না নিয়ে স্বাধীন হতে চান বলে নিজেদের ছেলেরা নিজেদেরই লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে সাহস পায়। তার জন্য ছেলেদের কোন দোষ নাই। সব দোষই আমাদের নিজেরই। আমরা ছেলের মত করে ছেলে তৈরী করতে এখনও শিখি নাই।

আজকাল নারী-নির্য্যাতনের পালা পাঞ্জাব মেলের মত এত বেদম চলছে যে তা দেখে কি যে বলব তাই ভেবে পাচ্ছি না। প্রতিদিন একটী করে পুত্রশোক পেলে মানুষ যেমন আর কাঁদতে পারে না, এসব সংবাদ পেয়েও আমাদের অবস্থা ঠিক তেমনি দাঁড়িয়েছে।

যে সব গ্রামে নারী নির্য্যাতন হয়েছে সে সব গ্রামে পুরুষ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু নাই যে তাও ত বলতে পারি না। যারা আছে তারা হচ্ছে সবই পুরুষত্ব বিহিন পুরুষ। সেদিন কোন ষ্টেশন মাষ্টারের সম্মুখে একটী মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল। মাষ্টার বল্লেন"মশাই চুপ থাকুন। চেপে যাওয়াই ভাল।" আমার ইচ্ছা করে একবার সেই মাষ্টারটিকে দেখি! আমার মনে হয় ও বেচারা না হয় দাড়ী গোঁপ কামিয়ে,একখানা সাড়ী পরে ঘরের কোনে বসে থেকে যদি তার স্ত্রীকে বলতেন' ওগো বাইরে যেন কি হচ্ছে। একটু দেখে এসনা"— বলে একটু কাঁদলে তার স্ত্রী আর বসে থাকতেন না। নারীর মান পুরুষ রাখতে না জানলেও নারী রাখতে জানে। সেই পুরুষত্বহীন ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রী তাহলে আর বসে থাকতেন না। নিশ্চয়ই সেই হতভাগাটার জন্য আত্ম বিসর্জ্জন দিতেন।

আমি আশ্চর্য্য হই এই সাহস নিয়ে পুরুষ যে কি করে এখনও আমাদের বন্দিনী করে রাখতে সাহস করেন তাই বুঝে উঠতে পারি না। আরে বাপু, নারীর সম্মান রক্ষা করতেই যদি না পার তবে তাদের ভারটা না হয় তাদের হাতেই ছেড়ে দাও না। তোমরা পুরুষত্বহীন হয়েছ বলে মেয়েরা আজও শক্তিহীনা হয় নাই।

যেখানে যতগুলি মেয়েকে এমন করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়েছে সেইখানেই দেখা গিয়েছে মেয়েদের নিজ আত্ম শক্তিতে বিশ্বাস নেই বলে তাদের এতবড় সর্ব্বনাশটা হয়েছে। আত্মশক্তিতেই যদি বিশ্বাস থাকত তাহলে হয়ত শুনতে পেতাম যে সে সব লাঞ্ছিত মেয়েদের মধ্যে একটীও মেয়ে দুর্বৃত্তদের কোন একটীর বুকে ছুরী বসিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু কৈ, তাত একটি মেয়েও করল না! তার জবাব এই— আমরা অবলা।

ঋণী

[শ্রীকৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য্য]

(১)

দুঃখের পর সুখটা যত মিষ্টি লাগে, সুখের পর দুঃখ সেই পরিমাণে, কি তার চেয়েও বেশী কষ্টের,সেটা সে রকম অবস্থায় না পড়্‌লে কেউ বুঝতে পারে না।

সুখের প্রস্রবনে হাবুডুবু খেতে খেতে, মাধুরীর যখন কপাল পুড়্‌ল, তখন একমাত্র সতীনপোর হাত ধরে বাপের বাড়ী গিয়ে দাঁড়াতে তার যে ক'খানা বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গেছল, তা তার বাপের বাড়ীর কেউ বোধ হয় অনুমানও করতে পারে নি।

কাঙ্গালিনী'র বেশে একটা নেংটা ছেলের হাত ধরে উঠোনে মাধুরীকে দাঁড়াতে দেখে, বড় বউ বিস্ময়ের স্বরে বলে উঠ্‌ল "ওমা! দিদি যে! কি মনে করে?" পিছন হ'তে সেজ বউ বল্‌লে "পেছনে ও ছেলেটা আবার কে গো!"

স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়েও যখন ভায়েরা তার খোঁজ নিতে যায় নি, ভয়, পাছে বোন এসে ঘাড়ে চাপে! তখন তাদের অর্দ্ধাঙ্গিনীরা যে এমন প্রশ্ন করবে তাতে মাধুরীর কোন সন্দেহই ছিল না।

এমন ভগ্নী-বৎসল ভায়ের বাড়ীও মাধুরী জেনে শুনেই এসেছিল। তার তখন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, নরেনকে মানুষ করা।

তার স্বামী মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তার দুটী হাত ধরে বড় আশায় বলে গেছে "মাধুরী, ছেলেটীকে মানুষ কর।" তাই সে ভাজেদের এ নিষ্ঠুর আবাহনেও বিচলিত হ'ল না। সে বেশ শান্ত স্বরেই বল্‌লে "ও আমার ছেলে দিদি।—আমার কাছে থাক্‌বে এখানে, তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

(২)

তারপর অনেক অত্যাচার, অনাদর ও অপমানের মধ্য দিয়ে নরেন বড় হয়ে উঠেছে। তার প্রধান সান্ত্বনা ছিল বিমাতা। সে বিমাতার কাছে যে আদর পেত, তাতে সে হৃষ্টচিত্তে সব অপমান, সব অনাদর হজম করে ফেলত।

সে দিন পরের গাছে কাঁচা আম পেড়ে কাণমলা খেয়েও তার এতটুকু লজ্জা বা ঘৃণা হ'ল না, কিন্তু বাড়ীতে বিমাতা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে, তাকে ভৎর্সনা করে বললেন "তুই যদি এম্‌নি করে জ্বালাস্‌ আমায়, তবে দূর হয়ে যা। তুই গেলে বন্ধন আমার কিসের! যা মরে, আমি বাঁচি।"

তখন নরেনের মনে শত শত ধিক্কার মাথা তুলে দাঁড়াল। সে বিমাতার পায়ে মাথা রেখে বললে, "আর আমি করব না মা, এবার তুমি মাপ কর।"

মাধুরী তার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লে "পাগল ছেলে আমার! একটু মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করিস্‌ বাবা। কেন পরের কাছে কথা শুনতে যাবি! তোর জন্যে আমার কতখানি বেদনা তা কি তুই বুঝিস্‌ না বাবা!"

(৩)

তার দুদিন পর মাছ ধরতে গিয়ে, সামান্য কারণে যখন বড় বউয়ের ছেলে নরেনকে গালাগাল দিলে, তখন নরেন মার উপদেশ ভুলে গিয়ে, তাকে দু'ঘা দিতে গিয়ে হুড়মুড় করে দুজনেই জলে পড়ে গেল। মাছের বদলে, ছেলেকে কাদা মেখে বাড়ী ফিরতে দেখে বড় বউ বাড়ী মাথায় করলে।

নরেন বাড়ী ফিরতে সকলে একবার চুপ করল বটে, কিন্তু নরেন ব্যাপার দেখে বুঝলে বাড়ীতে নিশ্চয় একটা কিছু হয়েছে।

রান্না ঘরের সাম্‌নে যেতেই মাধুরী ডাক্‌লে, "নরেন।" নরেন চমকিত হ'ল। এ স্বর সে মাধুরীর মুখে কখন শোনে নি; সে কম্পিতস্বরে বলিল "কেন মা!" সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিক হ'তে পিঠে একটা বেত পড়ল। তারপর চাবুকের উপর চাবুক মারতে মারতে মাধুরীর বড় ভাই বললে "জাননা পাজী ছুঁচো, জানোয়ার কোথাকার!—আবার কেন?"

মাধুরী রান্নাঘর থেকে বললে "মার, মার, মেরে ফেল হতভাগাকে। আপদ চুকে যাক্। আমার হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে।"

তখনও নরেনের পিঠে বেত পড়ছিল, উপর থেকে বড় বউ চীৎকার কর্‌ছিল, "বুড়ো দামড়া ছেলে, একটা কাজের বেলা নেই।" যার খাস্, যার পরিস্, তারই সর্ব্বনাশ করা—নেমক হারাম কোথাকার!"

পাড়ার একটি ভদ্র মহিলা, বড় বউয়ের শুভাকাঙ্ক্ষিণী নাক উঁচু করে বল্লেন, "তাও বলি দিদি, ও ছোঁড়ারই বা দোষ কি? ওকে যেমন শেখান হচ্ছে, ও সেই রকমই ত শিখ্‌বে? যত সব তোমার ঠাকুরঝির কারসাজী, ওর শেখান না হ'লে কি আর এত সাহস!"

নরেন একবার অশ্রুপূর্ণ নয়নে চারিদিক চেয়ে দেখ্‌লে, কিন্তু আজ আর তার ব্যথার ব্যথী, স্নেহময়ী বিমাতাকে দেখ্‌তে পেলে না। সে একবার ভাব্‌লে তার মারে বাধা দেয়, কিন্তু পাছে মাধুরী রাগ করেন, এই ভয়ে সে একটুও নড়্‌ল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে মার খেতে লাগ্‌ল।

মাধুরী তখন রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু বড় বউয়র কথাগুলো তার প্রাণে একটা একটা করে ছুঁচের মত বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল। কতদিন এমন ভাবের কথা সে শুনেছে; কত ভাবে সে অপমানিত হয়েছে, কিন্তু ভায়ের সাম্‌নে পাড়ার লোকে যখন তার কুখ্যাতি করে গেল, তখন তার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত পুড়ে খাক্ হয়ে যেতে লাগ্‌ল।

সে চীৎকার করে বল্‌লে, "দাও, হতভাগাকে দূর করে দাও। এত লোক মরে, ও বাঁদরের মরণ নেই। তোর জন্যে আমায় এত কথা শুন্‌তে হয় কেন রে হতভাগা! তুই আমার কে? কোকিলের বাচ্ছা কাকের বাসায় আছো, দুদিন বাদে উড়তে শিখ্‌লেই চলে যাবে! তবে তোর জন্যে আমার এত জ্বালা কেন? একটি একটি করে গহনা ভেঙ্গে তোর পিণ্ডির বন্দোবস্ত কর্‌ছি, কি তোর কথা শুন্‌বার জন্যে?"

নরেনের মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ল। এমন ধারা নিত্য নিত্য খাওয়া পরার খোঁটা তার ভাল লাগল না, ক্ষুদ্র প্রাণের মাঝে এতটা বেদনাভার সে আর সইতে পারল না। সে ঘরের মধ্যে আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

মাধুরী সেদিন আর তাকে খেতে ডাকলে না, নিজেও খেলে না। সে রান্না ঘরের সামনে আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল। ব্যথিত বেদনাতুর মনটা কখন সুপ্তির মাঝে অচৈতন্য হ'য়ে পড়েছিল, সে টের পায় নি। বিকেলে যখন বড় বউয়ের তিক্তস্বর তাকে জাগিয়ে তুলল, তখন দেখল অনেকখানি বেলা পড়ে গেছে। বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে সে তার কাজগুলো সেরে নিতে উঠে পড়ল।

আগের দিন একাদশী ছিল, আজও এখনো পেটে অন্ন পড়ে নি। অভুক্ত অবসন্ন দেহে সে আর একটু হ'লে পড়ে যেত; তাড়াতাড়ি দেয়াল ধরে ফেললে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল আজ দুপুরের কথাটা। তাইত, সে রাগ করে নরেনকে খেতে ডাকলে না! কি চণ্ডাল রাগ তার! সে যার জন্যে এত অপমান, এত অনাদর সহ্য করছে, তাকে সে আজ সমস্তদিন অনাহারে রেখেছে। ছিঃ ছিঃ, এ কি করেছে সে!

মাধুরী ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। একবার ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে, পুত্রের অভিমান ভাঙ্গতে, তার ঘরে গেল।

দরজার কাছে গিয়ে ডাক্‌লে, "নরেন!" ভিতর হ'তে কোন শব্দ এল না। মাধুরী তখন ধীরে ধীরে কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকল। কিন্তু "কৈ, নরেন কৈ!"

নরেন ত গৃহের মধ্যে নেই। তাই ত! সে গেল কোথায়? মাধুরী ব্যাকুল হ'য়ে পড়ল। বাহিরে আস্‌বার সময় দেখতে পেলে, বিছানায় একটা চিঠি পড়ে আছে।

মাধুরী পড়লে, "মা! তুমি আমায় বড় ভালবাস, বড় স্নেহ ক'র, না মা? তাই নিত্য নিত্য আমায় বিদেয় হ'তে বল, মৃত্যু কামনা কর, খাওয়া পরার খোঁটা দাও। আজকে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হল মা। নরেন আর তোমাকে জ্বালাতে আসবে না।

মামার কাছে শুন্‌লুম তুমি আমার খাবার জন্য পাঁচটাকা ক'রে খোরাকী দাও। এই দশ বৎসরে সেটা ছয় শত টাকায় দাঁড়িয়েছে। তুমি আমায় মাপ কর মা। আমি

যত শিগ্‌গির পারি, তোমার এ ঋণ শোধ করে দিয়ে, আমি ঋণ-মুক্ত হব।

আমার প্রণাম নিও মা। মনে কষ্ট কর না, তুমি জান ত মা, আমি তোমার পেটের ছেলে নই। ইতি

তোমার ছেলে—
"নরেন"

(৪)

এই ত সন্তান!

যা'র জন্য সে শত অপমান, শত অনাদর ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত মাথা পেতে নিয়েছিল, যাকে মানুষ করার জন্য সে স্বামীর ভিটে ছেড়ে কাঙ্গালিনীর মত ভায়ের বাড়ীতে একটু আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হয় নি ;—সেই তারই এই ব্যবহার!

"মনে কষ্ট কর না, তুমি জান ত মা, আমি তোমার পেটের ছেলে নই।" এই কি তোর শেষ কথা রে? বাবা! তুই কি জানিস্ না, তুই পেটের ছেলের চেয়েও যে কত বেশী রে! এই এতটুকু থেকে তুই যে এই কোলে শুয়ে মানুষ হয়েছিস্ রে। সব ভুলে গেলি। মায়ের উপর কিসের অভিমান বাবা! আয়, ফিরে আয় বাপ্ এসে দেখ তোর জন্যে এই মায়ের মনটা কত ব্যাকুল হ'য়ে আছে!

কিন্তু হায়; দিনের পর দিন কেটে গেল, মাধুরীর সে প্রাণের কান্না, তার নিরুদ্দেশ ছেলের কাণে পঁহুছিল না। দিনের কর্ম্মক্লান্ত মনের মাঝে নরেনের কথা মনে না পড়লেও, দুমুঠো ভাত মুখে তোলবার সময় কিন্তু তার কথা মনে পড়ে যায়, আর তার খাওয়া হয় না। অভুক্ত উঠে পড়তে হয়। মনে হয়, কি-মরণ-ঘুমই সে সেদিন ঘুমিয়েছিল—ছেলেটা দিন-দুপুরে না খেতে পেয়ে, হয়ত কত কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে, সে তার একতিলও জানতে পারে নি! আজ সে বিদেশে কোথায় কি করছে, খিদের সময় দু'মুঠো খেতে পাবৃছে ত? থাকবার একটা আশ্রয় মিলেছে ত?

এমনিতর কত কথাই না তার মনের মাঝে জেগে উঠে, আর তার চোখ দুটী জলে ভেসে যায়। হায়! সে তার স্বামীর শেষ ইচ্ছাটুকুও পালন করতে পাল্লে না! কত আশায় না তাঁর স্বামী তার হাত দুটো ধরে বলে গেছে "মাধুরি, ছেলেটাকে মানুষ ক'র।" সে কত কষ্টে সেই বেগবতী অশ্রু চেপে রেখে, কতটা আশ্বাস দিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে! কিন্তু হায়! এই কি তার সেই আদেশ পালন করা! মাধুরী কাঁদতে কাঁদতে যুক্ত করে উপরের দিকে চেয়ে বলত "ওগো! তুমি ত সবই দেখতে পাচ্ছ, তোমার এ শেষ স্মৃতিটুকু আমি বড় যত্নে, বড় আশায় বুকে রেখে আস্‌ছিলুম। একটু অসতর্ক হ'তে সব টুটে গেছে! দাও তুমি, তাকে ফিরিয়ে দাও গো! আবার তেম্‌নি তাকে বুকে রেখে তোমার আদেশ পালন্ করি।" এমনি করে ৬ মাস কেটে গেল, কিন্তু নরেনের কোনও সন্ধান হ'ল না। মাধুরী ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদে শেষকালে অসুখ ক'রে বসল।

(৫)

নরেন বুদ্ধিমান ছেলে। বাটীর বার হ'য়ে সে একেবারে মুস্‌ড়ে পড়্‌ল না। সে নিজের কর্ত্তব্য ঠিক্ ক'রে নিয়ে কলিকাতা চল্‌ল।

নিজের দারিদ্র্যের উপর তার ধিক্কার জন্মে গেছ্‌ল। সে দরিদ্র না হ'লে, তার কোনও উপায় থাকলে কি "মা" তার, অত স্নেহময়ী যে, সে কখন অমন ক'রে তাকে দূর দূর করতে পারে! অমন ক'রে তাকে টাকার খোঁটা দিতে পারে! তাকে কোকিলের বাচ্ছা বল্‌তে পারে! হায়! টাকা নেই বলে কি তার "মা"ও পর হ'য়ে গেল!

এমনি করে কত কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে কলিকাতায় গিয়ে পৌছল। তারপর এক ধনী মাড়োয়ারীকে হাত করে সে এক কাঠের দোকানে চাকরী নিলে।

নরেন কাজের লোক, সে কাজকে কখনও ভয় করত না। অক্লান্ত পরিশ্রমে সে ক্রমে ছোট একটী কাঠের ব্যবসা চালাতে লাগ্‌ল।

ছয় শত টাকা জমিয়ে সে একবার তার বিমাতার সঙ্গে দেখা ক'রে দেনা পাওনা মিটিয়ে আসবে ভাব্‌লে।......
...এক বছর পর সে ঘরের দিকে যাত্রা করলে।

(৬)

মাধুরীর তখন অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। অবস্থা ভাল নয় বুঝে মাধুরী বড় ভাইকে ডেকে পাঠালে। দাদা এলেন। মাধুরী বললে, "দাদা! আমার ত আর বেশী দেরী নেই। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি এবার আমি বাঁচব না। তুমি উকিল ডেকে পাঠাও, জ্ঞান থাকতে থাকতে উইল্‌টা করে যাব।"

স্বার্থান্বেষী ভাই হৃষ্টচিত্তে বললে "উইল করবে? এই কথা! তার জন্যে ভাবনা কি? আমি এখনি উকিল ডেকে পাঠাচ্ছি।"

উইল প্রস্তুত হ'ল। বড়দাদা পড়্‌লে, "আমার শ্বশুর কুলের স্থাবর, অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি, আর আমার নিজস্ব ছয় শত টাকা, আমি আমার পুত্র শ্রীমান্‌ নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে দান ক'রে গেলাম।" বড় দাদা মুখ বিকৃত করলে। এই উইল!

(৭)

নরেন গ্রামে প্রবেশ করলে যখন, তখন অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে। পথে লোকচলাচল বন্ধ হ'য়ে এসেছে। সে ধীরে ধীরে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একা চলতে লাগ্‌ল তার বিমাতার উদ্দেশ্যে।

মনে পড়তে লাগ্‌ল, তার শৈশবের কথা—তার বিমাতার ভালবাসার কথা। তার জন্য তার বিমাতার অপমান, তার জন্য তার বিমাতার দুঃখ, তার ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য তিনি কতদিন অভুক্ত থেকে খাইয়েছেন!

ঘরের উঠানে পা দিতেই দেখতে পেলে বড় বউ মুখ বিকৃত ক'রে সরে গেল। তার চোখের মাঝে অসন্তোষ ও বিস্ময় যেন রূপ পরিগ্রহ ক'রে নরেনকে বল্‌ছিল "বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা।" নরেন আর কাকেও দেখ্‌তে পেলে না, সে সোজা সুজি মাধুরীর ঘরে গিয়ে পৌঁছল। ঘরের ভিতর বিছানার উপর একটী বাতি জ্বল্‌ছিল। তার আলোকে মাধুরীর শীর্ণ মুখে একটি কিসের মাধুর্য্যের আভা ফুটে উঠেছিল। সে দেখ্‌লে তার বিমাতা বসে বসে কি লিখ্‌ছে, আর বিছানার চারিদিকে সেই দিকে ঝুঁকে পড়ে তিন চার জন লোক দেখ্‌ছে।

সে ঘরে ঢুকতেই পাড়ার দুজন ভদ্রলোক বলে উঠ্‌লো "এই যে নরেন এসেছে, নরেন এসেছে!" মাধুরী বলে উঠ্‌ল, "কৈ! কৈ নরেন এসেছে? কৈ বাবা, এগিয়ে আয়। এই নে বাবা, তোর সম্পত্তি তুই বুঝে নে। আমার দুর্ভাবনা ছিল, তোর সম্পত্তি আমি এতদিন আগ্‌লে আগ্‌লে আস্‌ছিলুম—এইবার তুই বুঝে নে বাবা!" সঙ্গে সঙ্গে মাধুরী তার হাতের কাগজখানা নরেনের দিকে এগিয়ে ধর্‌লে।

নরেনের চক্ষে অশ্রুর স্রোত বইল। যার ঋণ সে আজ শোধ কর্‌তে এসেছে, তার এ অকৃত্রিম স্নেহের ঋণ সে কেমন ক'রে শোধ কর্‌বে?

সে তার মায়ের পায়ে মাথা রেখে বললে, "মা, মা, তুমি আমায় মাপ কর মা। তোমার পায়ে কত অপরাধ করেছি মা, আজকে তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

মাধুরীর অতৃপ্ত মাতৃ-হৃদয় আজ এ বহুপূর্ব্বশ্রুত মাতৃ সম্বোধনে ভরে উঠ্‌ল। বহুদিন এ মধুর ডাক তার কাণে বাজে নি—সে শুধু তার পায়ে নত মাথার উপর হাত দিয়ে ডাকলে, "বাবা!..." তার কণ্ঠ তখন রোধ হয়ে গেছে, আর কিছু বলতে পার্‌লে না—কেবল তার চোখ হ'তে ফোঁটা ফোঁটা জল নরেনের নত শিরে আশীর্ব্বাদের মত ঝরে পড়তে লাগ্‌ল।

অশ্রু-হারা

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

জানালার পাশে একখানি ইজি চেয়ারের গায়ে হেলান্ দিয়া অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে সুধাংশু কি ভাবিতেছিল, কে জানে; দৃষ্টি তাহার অর্থহীন —বাহিরের দিকে স্থস্ত। সন্ধ্যার ম্লানিমা তখন ধরণীর বুকে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়াছিল, ভৃত্য আসিয়া সুইচ্‌টা নামাইতেই রুক্ষকণ্ঠে সুধাংশু বলিল—ব-ন্ করো!...

ত্রস্তভাবে আলোটা নিবাইয়া দিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল; সুধাংশু আবার বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইল।...

পাঁচ মিনিট আবার নিঃশব্দে কাটিয়া গেল; আলস্য-জনিত একটা হাই তুলিয়া উঠিয়া গিয়া সুইচটা টিপিয়া দিল। টেবিল হইতে সুদৃশ্য মরক্কো বাঁধান প্যাড্‌খানি লইয়া আবার চেয়ারে আসিয়া বসিল। .. কিন্তু কি লিখিবে? .. একটা দুঃস্বপ্নের মতই শত বেদনাজড়িত যে অতীত জীবনটা কাটিয়া গিয়াছে, সুধাংশু বারেক তাহারই দিকে ফিরিয়া তাকাইল। .. নাই, লিখিবার মত সেখানেও কিছু নাই।

ভৃত্য দ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বিনীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—চা হুজুর?...মায়িজী—

বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে সুধাংশু বলিয়া উঠিল—নেই—নেহি মাংতা, যাও!...

পকেট হইতে ফাউণ্টেনটা বাহির করিয়া সে ক্ষণেক কি ভাবিল, পরে একখণ্ড কাগজ ছিঁড়িয়া তাহাতে লিখিল—

"বড় ব্যথা পাইয়াই চলিলাম। কোথায় যাইব জানি না, ফিরিব কি না তাহারও ঠিক নাই। বিদায়—চিরবিদায়!

তোমার হতভাগ্য স্বামী

"সুধাংশু"

পত্রখানি ভাঁজ করিতে করিতে সুধাংশু ধরা-ধরা গলায় ডাকিল—বেয়ারা! .. বেয়ারা ড্রয়িংরুমের বাহিরেই একখানি টুলের উপর বসিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিল, ত্রস্তপদে ঘরে ঢুকিতেই সুধাংশু বলিল—একঠো 'টিক্সি' বোলাও। জল্‌দী!

সুধাংশুর প্রিয় টু-সীটার খানি সেইদিনই মিস্ত্রীখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিনীতভাবে প্রভুর নিকট তাহাই সে বলিতেছিল, সুধাংশু আরক্তনয়নে রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—নেহি ট্যাক্সি বোলাও!...

বেয়ারা চলিয়া গেল,—দেরাজ হইতে কয়েকটী বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্য, একটী গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগে পুরিয়া সুধাংশু আলমারী হইতে রিভলভার খানা বাহির করিল। উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া সেটীকে প্যাণ্টালুনের জেবে রাখিয়া সুধাংশু গাড়ীতে গিয়া উঠিল। পত্রখানি বেয়ারার হাতে দিয়া কোমলস্বরে বলিল—মায়িজীকো দে'না, আচ্ছা? ..

জী!...

গাড়ী ফটক ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিধারা তখন আকাশ ভেদিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল—ঝম্, ঝম্, ঝম্!...

* * *

এক দুই করিয়া দশটা দিন কাটিয়া গেল,—সুধাংশুর কোনই সংবাদ নাই, কোথায় গিয়াছে তাহাও বলিয়া যায় নাই যে লোক পাঠাইয়া বা 'তার' করিয়া সংবাদ লইবে। রেণুকা চারিদিক অন্ধকার দেখিল।...কিন্তু ইহার কারণ কি?...স্মৃতির অতল প্রদেশে গিয়া সন্ধান করিল। না, সেখানেও এমন কোন কারণ সে পাইল না। কৈ, এক-দিনের জন্যও তো সে কোন মন্দ ব্যবহার করে নাই,—নিমেষের তরেও তো অভাগিনী তা'র স্বামীর অবাধ্য হয় নাই,—তবে? রেণুকা বিহ্বল হইয়া পড়িল।

বাড়ীতে পুরুষ মানুষ এমন কেহই নাই যে বিপদ-সাগরে একখানি সুযোগ্য তরণী ধার দিতে পারে—এ সূচীভেদ্য অন্ধকারে ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকরেখা দেখাইতে পারে!...

রেণুকা পিতাকে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া জানাইল, এবং কন্যা-প্রাণা পিতাও দুই একদিনের মধ্যেই সস্ত্রীক আসিয়া হাজির হইলেন!...

আসিলেন বটে,—কিন্তু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়া সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিয়া তদনুযায়ী যে বুদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন, জামাতার অনুসন্ধান তাহার কোনটীর এলাকাতেই আসিল না। কন্যার মুখের সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন—ঝগড়া টগড়া হয়েছিল বুঝি নয় রে?

সজলকণ্ঠে রেণুকা উত্তর দিল—না, তেমন কিছুই হয় নি!

পিতা ছাড়িলেন না, জেরা আরম্ভ করিলেন—বন্ধু টন্ধু কেউ আস্ত? বাড়ী ফিরত কখন?

তীব্রস্বরে রেণুকা উত্তর দিল—না, সে সব কিছুই নয়!

হতাশস্বরে পিতা বলিলেন—তাই ত, বড় ভাবিয়ে তুললে দেখছি! আচ্ছা দেখি।

সেইদিনই সহরের এক বিখ্যাত পত্রে তিনি বিজ্ঞাপন দিলেন—

"সুধাংশু বাড়ী এসো, স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়।"

রেণুকার ছোটবোন মণিকার বিবাহ কলিকাতাতেই হইয়াছে। স্বামী কয়েক বৎসর ধরিয়া কোর্টে হাঁটাহাঁটী করিতেছেন। উকীল-পত্নী বলিয়া কিছু বুদ্ধির ধার সে রাখে বলিয়াই সকলের বিশ্বাস, পিতার বুদ্ধি-দর্শনে মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—স্ত্রীকে যে ছেড়েই গেছে,সেই স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদে তা'র তো বয়েই গেছে! হুঁ,—এতক্ষণে সে অন্য কোথাও আর একটাকে বিয়ে করে বসে আছে! আমি হলে—

'মণি!' —তীব্র দৃষ্টিতে রেণুকা মণির মুখের পানে তাকাইল, মণিকা ভয় পাইবার মেয়ে নহে, মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—তা যা-ই বল দিদি, হক্ কথা বল্‌তে—

পিতা নিকটেই ছিলেন, বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন—তুই থাম্ বাপু, আর তোর হক্ কথায় দরকার নেই। হাঁ রেণু, কি করা যায় বল দেখি মা? রেণুকা নীরব রহিল।"

হাঁপানি রোগে সুধাংশু অনেকদিন ধরিয়াই ভুগিতেছিল। ডাক্তার কবিরাজ কিছুই করিতে পারে নাই।—শেষে বাড়ীর পুরাতন ঝি কামিনীর মা-কে সঙ্গে লইয়া রেণু একদিন গোপনে নিকটস্থ দেব-মন্দিরে গিয়া বুকের রক্ত মানত করিয়া আসিল। মন্দিরের বৃদ্ধ স্থবির পুরোহিত তাহাকে আশ্বাস দিল—এ ভিক্ষা তাহার পূর্ণ হইবেই। তাহার পর হইতেই রেণুকা প্রায় প্রত্যহ কামিনীর মা বা পুরোহিতের সহিত গিয়া পূজা দিয়া আসিত। আজও রেণুকা সেখানে চলিল। হিন্দুর মেয়ে সে দেব দ্বিজে ভক্তি করা-ই যে তাহার ধর্ম্ম!

রেণুকা অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—একবার কাশী গিয়ে দেখলে হয় না বাবা?..

পিতা হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—পাগলী আর কি! সন্ন্যাসী হ'বার বয়েস কি তার, যে—?

রেণুকা অপ্রস্তুতভাবে বলিল না, তাঁর এক বন্ধু সেখানে থাকেন, তাই বলছিলুম!..

পিতা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—তা বেশ তো, বলিস্ তো যাই...আমার কি বল্ না,—কাশী কেন, পৃথিবীর এক মুড়ো থেকে অন্য মুড়ো পর্য্যন্ত তোর জন্যে আমি খুঁজে বেড়াতে পারি।.. তবে, জানিস্ তো মা—"

রেণুকা চঞ্চলভাবে বলিল—না বাবা, টাকার জন্যে ভাবতে হবে না, তুমি আজই যাও!

সেইদিন রাত্রীতেই তিনি কাশী-গামী ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন!..

* * * *

বেনারস্-ক্যাণ্টনমেণ্টের রেলওয়ে ষ্টেশনে একটী বেঞ্চে বসিয়া দুইটী যুবক কথোপকথন করিতেছিল।

প্রথম যুবক বলিল—ঠিক্ দেখেছিস্ চেনা নয় তো?...

দ্বিতীয় যুবক ইহাতে যেন একটু রুষ্ট হইল, বলিল ঠিক্ না হলে আমি কি তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছি?........চেনা সে কোন জন্মেই নয়!

—রোজই আস্ত?

চিন্তান্বিতভাবে মাথাটা একটু নাড়িয়া যুবক বলিল—ঠিক নয়, তবে একদিন অন্তর ত নিশ্চয়ই!

কতদিন সুরু হয়ে ছল?

সেই যেবার আমার হাঁপানি ভয়ানক বাড়ে।

প্রথম যুবক মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন—হুঁ!

মিনিট তিন চার নীরবেই কাটিয়া গেল। প্রথম যুবক ডাকিল—সুধাংশু,—এই?...

সুধাংশু উত্তর দিল - কেন ?

—জিজ্ঞেস্ করলি নি কেন একদিন !...

সুধাংশু উত্তর দিল—করেছিলুম।...

আগ্রহভরে লাফাইয়া উঠিয়া যুবক বলিল—করেছিলি ! কি বললে ?...

—কি আবার বল্‌বে ? প্রথমে ত স্বীকার করতে চায় না। অনেক পেড়াপিড়ীর পর বললে—সে সব তোমায় শুনতে হবে না।

—হুঁ ! তারপর ?

সুধাংশু ম্লান মুখখানিকে যথাসম্ভব পরিস্কার করিয়া বলিল—তারপর আর কি ? সেই কুৎসিত দৃশ্য দেখলুম আসবার দিন সকালে !

—সকালে ? যুবক উদ্বেগপূর্ণকণ্ঠে বলিল—সকালে কি আবার দেখলি !

সুধাংশু বলিল—সকালবেলা উঠে দেখলুম—মুখ চোক তা'র একেবারে শুকিয়ে গেছে।—গাল দুটো বসে গেছে—আর বুকের কাপড় রক্তে—"

যুবক শিহরিয়া উঠিল, মুখ দিয়া অস্ফুটস্বরে বাহির হইল —ছি !

সুধাংশু ভগ্নকণ্ঠে বলিল—আমি স্বপ্নেও কখন ভাবিনি, রেণুকা—তাই ! এতদিন শুধু চোখে ঠুলী দিয়ে—

যুবক তাহার ঘাড়ে একটা ঝাঁকানী দিয়া বলিল—নে, নে ওঠ,—চল্। কাল যা হয় একটা করা যাবে'খন !

বেঞ্চ ছাড়িয়া উভয়েই উঠিয়া গেল।

* * * *

—গোপনে রবিকে সমস্ত দৃশ্যই দেখাইবে স্থির করিয়া পরদিন উভয়েই কলিকাতা যাত্রা করিল। রবি বলিল—এই, উঠ্‌বি কোথা ?

সুধাংশু উত্তর দিল—কেন, হোটেলে ? একটা—বড় জোর দুটো দিন বইত নয় ! হোটেলেই হয়ে যাবে !

—'তা-ই বেশ !' রবি একখানি উপন্যাস খুলিয়া বসিল। চলন্ত ট্রেণের ঝাঁকুনীতে সুধাংশু ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সুধাংশু স্বপ্ন দেখিল—সে যেন সাহারার তপ্ত বুকের উপর দিয়া চলিয়াছে। কেহ কোথাও নাই, চারিদিকে মাঠ,—ধূ ধূ প্রান্তর ; তৃষ্ণায় বুক জ্বলিয়া যাইতেছে, মুখ শুকাইয়া আসিতেছে। নাই—নাই, এক বিন্দু জল দিবার জন্য কেহ দাঁড়াইয়া নাই। মরণ-পিয়াসী পথিকের মত সে লক্ষ্যহীন পথের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিল ! কিন্তু কোথায় যাইবে ?—হঠাৎ দেখিল, দূরে—ওকে। রেণু দাঁড়াইয়া নয় ? কিন্তু তাহার পার্শে ?—সুধাংশু শিহরিয়া উঠিল ! পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া সে ডাকিল—রেণু রেণু !..

শুনিল না। রেণু তাহাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া অপরের হাত ধরিল। সুধাংশুর চক্ষুদ্বয় ধাঁধিয়া গেল। আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।...

হঠাৎ একটা কিসের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, বইখানি বুকে লইয়াই রবি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এবং নাসিকাধ্বনিতে তৃপ্তিটা ব্যক্তও করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি ডাকিল—রবি—এই রবি !..

* * *

হোটেলেই একটা দিন সুধাংশু কাটাইয়া দিল। পরের দিন কি একটা প্রয়োজনে সে রাস্তায় বাহির হইয়াছিল—নিতান্ত অনাকাঙ্খিতের মতই শ্বশুর মহাশয়ের বৃদ্ধ গোমস্তার সঙ্গে দেখা হইল। পাগলের মত আছড়িয়া পড়িয়া তিনি বলিলেন—দোহাই বাবা তোমার, একটীবার চলো ; রেণুকে বুঝি বাঁচানো যায় না !...

ঘৃণায় সুধাংশুর মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। সে যেন কি বলিতে গেল,—পারিল না !...

যখন বাড়ী ঢুকিল, একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ আসিয়া তাহার বুকে ঘা দিল। তাহা হইলে সত্য সত্যই কি রেণু ..

ঘরে ঢুকিয়া সুধাংশু দেখিল—দলিত কুসুমের মত ম্লান অসাড় দেহে রেণুকা নিস্পন্দভাবে পড়িয়া আছে ! ডাক্তার ম্লানমুখে উঠিতেই সুধাংশু উন্মত্তের মত তাঁহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—দাঁড়াও ডাক্তার, কি হয়েছে বলতে হবে !

ডাক্তার হতাশপূর্ণ দৃষ্টিতে সুধাংশুর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন - হোপ্‌লেস্, সেপটিক হয়েছে !

সেপটিক্! - বিস্ফারিতচক্ষে আকুল আগ্রহে সুধাংশু জিজ্ঞাসিল—কিসে সেপটিক্ হ'ল ডাক্তার?

বুকের ঘা—সেপ্টিক হয়ে উঠেছে!

মণিকা নিকটেই বসিয়াছিল, বলিল—মন্দিরে মানত করে বুকের রক্ত দিতে—" মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সুধাংশু আগ্রহান্বিত স্বরে বলিল—মানত! কিসের মানত, মণিকা?" মণিকা ধীরস্বরে বলিল আপনার হাঁপানির জন্যে! কেন আপনি জানেন না? আপনি চলে যাবার আগের দিন সারারাত জেগে মন্দিরে সে রক্ত দিয়েছিল; পরদিন সকাল থেকেই 'ব্লিডিং' সুরু হয়েছিল!

সুধাংশু কাতরভাবে বলিল—মন্দিরে! এতদূরে সে রোজ কি করে যেত মণিকা?

মণিকা ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল—চুপ,—চুপ করুন। পাশ ফিরতে দিন ওকে! কি বলছিলেন? হাঁ, পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে সে পূজো দিয়ে আসতো!

সুধাংশুর অনুরোধে ডাক্তার তাঁহার শেষ চেষ্টা প্রয়োগ করিতেছিলেন, হঠাৎ মুখ বিকৃত করিয়া উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরশুদ্ধ লোক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রেণুকার মাথাটা কোলে লইয়া সুধাংশু গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। কে জানে কেন একবিন্দু অশ্রুও আজ আর তাহার চোখে আসিল না! বিরাট মৌন পুরুষের ন্যায় নিস্পন্দ নির্ব্বাকদৃষ্টিতে চাহিয়া নিশ্চল পাষাণের মত স্থিরভাবে সে বসিয়া রহিল!

জুতাবদল

[বেতালভট্ট]

দিলীপ রায়ের গান শুনতে সুধীন ভাস্কর বাড়ী
গিয়েছিলাম, ফেরার সময় পরতে তাড়াতাড়ি
বদ্‌লে গেলো জুতো অর্থাৎ একপাটি হলো আমার,
আর একপাট রামা শ্যামার কিংবা কারো মামার।
একটি পাটী প্রতিপদেই জানায় অসন্তোষ,
একপাটী কয় ক্যাঁচর এবং অন্য পাটী ফোস্।
আগন্তুকের বয়স বেশী এবং বেজায় ঢিলে,
নৌকা হয়ে ঝুল্লো পায়ে একবারে না মিলে।
এ যে হলো বৃদ্ধজনের বালাবধূর প্রায়,
'এমন অঘটনটা বলো! কে ঘটালো হায়?
পড়েছিলাম ডি, এল, রায়ের "আষাঢ়ে" যৌবনে,
বৌ-বদলের রসের কথা কেবল পড়ে মনে।
কে ঘটা'লে এ প্রহসন, কোথায় রসিক ভাই?
তোমার কি ভাই আমার চেয়েও হুঁস বা হদিস্ নাই?
আমার পাটী তোমার পায়ে ঢুকলো কেমন করে?
তুমি কি ভাই নিয়ে গেছ বদল দেবে ওরে?
নূতন পেয়ে তোমার ত ভাই হয়নি কিছু লাভ
বৃদ্ধা সনে তরুণ কি আর করিবে সদ্ভাব?
তোমার চরণ চালাও যদি আমার পাটীর পেটে,
গোচর্ম্ম যে তোমার পা'রই চর্ম্ম হবে এঁটে।
আমার পাটীর হাম্বারোদন পশ্‌ছে না কি কানে?
প্রাচীন প্রণয় তোমার পাটীর কেমন কেবা জানে?
অনেক জোড়াই জুতো আছে হয়ত তোমার ঘরে
নয়ত জুলুম করছ তুমি ভাইএর জুতোর পরে।
তা' যদি হয়, বিপদ আমার, ভাবনা তোমার কিসে?
বদল ভাঙার নেইক আশা দ্বিতীয় মজ্‌লিসে।
আস্তাকুঁড়ের পাশ হতে ভাই জীর্ণ জোড়া এনে
কাঁটার বিঁধন সয়ে আমি বেড়াচ্ছি তায় টেনে।
কেমন করে বেরুই দিনে অমিল পায়ে পথে
বদল ভাঙো, জানাই আমি শিশিরের মারফতে।

আহুতি

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

(৭)

মালতীর বুকের ভিতরটা অন্ধকার করিয়া আসিতেছিল. যতক্ষণ মা কিছুই জানেন নাই, ততক্ষণই একটা ভয়ানক আতঙ্ক ভিতরে ভিতরে তাহাকে কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। এখন মায়ের উপর সে ভার তুলিয়া দিয়া সে মনে প্রাণে একটা আরাম অনুভব করিল।—সে ভয় নাই, তাহার যাহা কিছু ভালমন্দের চিন্তা সে ত মাই নিলেন, কিন্তু ইহাছাড়াও আর একটা যে গভীর বেদনা অনুক্ষণ মনে মনে তাহাকে পচাইয়া তুলিতেছিল, তাহার সে কি করিবে! তাহার এ নিজস্ব বেদনা যা মাকেও জানানো চলে না, কাহাকেও না,—তাহার সে কি করিবে?

আজ সকালে রাধাবল্লভ তার পূজার ফুল লইলেন না, ফুলগুলি দিতে দিতে পা হইতে পড়িয়া গেল, তাহার পায়ে সে মনের গুরুভারখানি ঢালিয়া দিতে গিয়াছিল, তিনি চরণ তাঁর সরাইয়া লইলেন। সকালে হাত হইতে খসিয়া চামরখানি পড়িয়া গেল,—হায় প্রভু এ সকল অলক্ষণ কেন?

মালতী দেখিল, তাহার বুকের ভিতর যে প্রেমের মন্দির ছিল, তাহা যেন চুরমার হইয়া গিয়াছে,তাহার মনে যে দেবতা তাঁহার অপরূপ মূর্ত্তি লইয়া প্রসন্ন হাস্যে বিরাজ করিতেছিলেন, তিনি আজ ধুলায় লুটাইয়া পড়িয়াছেন,—সংসারে প্রিয়কে দিয়া বিশ্বের ভগবানকে যে প্রিয়তম করিয়া তুলিবে, হায়, তার সে প্রিয়ের অঙ্গে একি কালীর ছাপ?

মালতী ছট্‌ফট্‌ করিয়া এঘর ওঘর ঘুরিতে লাগিল। শান্তি যেন কোথাও নাই। পৃথিবীটাত চূর্ণ হইয়া ছিলই, আজ যেন সেই চূর্ণিত গুড়াগুলিও দুরন্ত ঝড়ে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে,—একাকী সে শূন্যের উপর ঝড়ের উপর দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। মানুষকে বিশ্বাস করিতে পারিলে ঈশ্বরকেও আমরা বিশ্বাস করিতে পারি, মানুষকে ভক্তি করিতে পারিলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিটুকু আমাদের সহজলভ্য হইয়া আসে। তাই আজ মালতী মানুষের উপর বিশ্বাস হারাইয়া তাহার রাধাবল্লভকেও মনের মধ্যে হারাইয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার পর মা কন্যার হাত ধরিয়া জমিদারবাড়ী চলিলেন। এবং কন্যাকে আড়ালে রাখিয়া যতদূর সম্ভব কোমল ভাষায় সখীর কাছে তাঁহার পুত্রের কথাগুলি পাড়িলেন! জমিদার গৃহিণী চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বল কি ভাই, সত্যি কথা?"

চোখের জলে ভাসিয়া অন্নপূর্ণাদেবী বলিলেন, ভাই, তোমার ধীরেনকে আমি যে ভালবাসতুম না, আর সে ভালবাসা যে আজই চলে গিয়েছে, তাও নয়। কি বলবো, মেয়ের অদৃষ্টে নেই, নইলে তোমার ধীরেনকে দেখেই প্রথম দিনই আমার মনে কি দুরাকাঙ্খা জেগে উঠেছিল, সে সব এখন আর ভাবতেও নেই। পাছে মনের এ ভাব মেয়েও টের পায়, তাই কত সাবধানে আমি তার সঙ্গে কথা কইতুম, ধীরেনের সঙ্গে কখনো দেখা করতে দিতুম না। তবু দেখ অদৃষ্ট, যা ভয় ছিল তাই হ'ল।"

জমিদারগৃহিণী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তাইত, এখন এ নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড না হয়ে বসে।"

মালতীর মা কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দিদি, লজ্জা তাতে আমারই,ছেলেদের নামে অমন কত ওঠে,কত যায়,কে তা মনে

করে বসে থাকে, ভাই? কিন্তু আমায় মেয়ে নিয়ে যে শেষে গলায় দড়ী দিয়ে মরতে হবে।"

নলিনের মা মালতীকে বাস্তবিকই ভালবাসিতেন, তাই তিনিও চিন্তিত হইয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, "চিন্তা নেই ভাই, ঘরে যাও, মেয়েকে চোখে চোখে রেখো, আমার কাণে যখন কথাটা এসেছে, তখন সে ভার আমিই নিলাম, তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

মালতীর মা উঠিলে তিনি আবার কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেখ, একটা কাজ করলে হয় না? মালতীকে আমার কাছে রেখে যেতে পার?"

"কাজ নেই ভাই, তাতে নিন্দে হতে পারে—"

"তবে থাক্, কিন্তু ভাই সাবধানেই থেকো'—কি করবে সে—ভয় দেখালেই কি হোল;—তবু-কি-না—বুঝলে ত?—"

(৮)

স্নেহ-দুর্ব্বল হস্তের কোমল শাসনেই সে বাল্যাবধি অভ্যস্থ ছিল, সহসা তাহার পরিবর্ত্তনের আভাসেই নলিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ পিতার স্নেহ সমুদ্র মন্থন করিয়া, তাঁহার অগাধ রত্ন ভাণ্ডারের যাহা কিছু উদ্ভব হইত, তাহারই সহিত যাহার আজন্মকালের পরিচয়, সহসা সে তাঁহার কঠিন মূর্ত্তি এবং ব্যয়সংকুলানের হিসাব দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

প্রথমতঃ এই থিয়েটার এবং তাহার সাজ পোষাক ও ইহার জন্য অনর্থক যে কতকগুলি টাকা নদীর জলের মত বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িল, ইহা নিয়াই পিতাপুত্রে একটু মনান্তর হইয়া গেল,—স্নেহের শাসন অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে, শাসকের সেখানে স্বভাবতঃই যে কাঠিন্যটুকু প্রকাশ হইয়া পড়ে, এক্ষেত্রে জমিদার বাবুকেও শুধু তাহাই করিতে হইয়াছিল, কিন্তু উদ্ধত পুত্রের যে ভীষণ মূর্ত্তিখানি পিতার চক্ষের সুমুখে সুপ্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহাতে পিতার চক্ষেও আত্মসম্বরণ করা সহজ হইল না—এবং ইহা নিয়াই ক্রমাগত কয়দিন ধরিয়াই জননীর সঙ্গে পুত্রের একটু বাদ বিসম্বাদ তর্ক বিতর্ক চলিল।

ইহার পর জমিদারী পরিদর্শন করিতে গিয়া, দীন পল্লী-গ্রামের শান্তিপ্রিয় কুটীরগুলিকে নলিন এমনি করিয়া নানাভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল যে, শুনিয়া পিতা লোকের সম্মুখে আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। পুত্রকে বলিবার আর তাঁহার কিছু ছিল না, বলিয়া, কহিয়া কিংবা তিরস্কার করিয়া সংশোধনের যে বয়স, সে বয়স তাহার চলিয়া গিয়াছে। আবার এই সব ঘটনা নিয়া সম্মুখে ডাকিয়া কোন কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করাও পিতার পক্ষে সম্ভব নহে—দারুণ হতাশায় বুক তাঁহার ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার এই এতকালের গড়া পিতা-পিতামহের সম্পত্তি, এক দুশ্চরিত্র মাতালের হস্তে পড়িয়া, কি করিয়া যে ধ্বংশের পথে যাইয়া পড়িবে, ভবিষ্যতের সেই নিদারুণ চিত্রখানি চোখের সম্মুখে তাঁর ফুটিয়া উঠিল।

মালতী-সংক্রান্ত ঘটনা গৃহিণী স্বামীর নিকটে প্রথমে গোপন করিয়াই ছিলেন, কিন্তু সহসা একদিন পুত্রের এমনই ভীষণ চক্রান্তের কথা তাঁহার কাণে আসিয়া পড়িল, যে তন্মুর্ত্তেই সেগুলি স্বামীর কর্ণগোচর না করিয়া থাকা তাঁহার আর চলিল না,—জমিদার বাবু শুনিয়া পুত্রের অধঃপতনের শেষ অবস্থা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। এবং এইবারে তিনি পিতৃহৃদয়ের সহজ-স্নেহ-ধারা রুদ্ধ করিয়া, জমিদার ও দুশ্চরিত্র প্রজা হিসাবে পুত্রের বিচার করিতে বসিলেন।—তাঁহার সেই রুদ্রমূর্ত্তি এবং কঠিন বিচারের সম্মুখে গৃহিণীরও অগ্রসর হইবার সাহস হইল না।

ইহার দিন চারি পরে, সহসা একদিন সন্ধ্যার পর জমিদার বাড়ী হইতে একজন ঝি আসিয়া মালতীর মাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—"হ্যাগা মাসীমা, শুনেছো কথা? দাদাবাবুকে যে কর্ত্তাবাবু বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে গো!

ও মা, সে কি রে, বলিস কি বিন্দি! কবে?

পরশু রাত্তির বেলা,—

কেন রে, কি হয়েছিল?

কি যে হইয়াছিল, তাহা কেহই জানিত না। কিন্তু বাড়ীর দাসদাসীগণ তাহাদের সুনিপুণ কল্পনাশক্তি দ্বারা নিজেরাই অনেক কিছুরই আবিষ্কার করিয়া নিয়াছিল,—বিন্দি অনেক কথাই বলিল, কিন্তু সে সব কথার অধিকাংশই

অন্নপূর্ণাদেবীর কাণে আর প্রবেশ করিল না। রাত্রি বাড়িতে লাগিল, অন্নপূর্ণা দেবী স্তম্ভিত হইয়া দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া রহিলেন। আহ্নিক হইল না, কন্যাকে খাবার দেওয়া হইল না,—রান্নাঘরের আলো নিভান হইল না, দরজা জানালা বন্ধ হইল না,—অন্নপূর্ণা দেবী সব ভুলিয়া—সকল ফেলিয়া বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়াই রহিলেন। মনে তাঁহার কেবল এই কথাটাই সত্য হইয়া রহিল যে, এও কি সম্ভব?—এ কি ভীষণ ঘটনা! কে জানে এ ঘটনা তাঁহাদেরই জন্য কি না!—ইহার পর তিনি কি করিয়া আঁর বাল্যসখীকে মুখ দেখাইতে যাইবেন? ছেলের দোষ যতই থাক্ ছেলের মা প্রতিবাদীকে অত সহজে ক্ষমা করিতে পারিবে কি? নিশ্চয় না?

মালতী নিকটেই বসিয়াছিল, বিন্দি চলিয়া যাইতেই সে ক্লান্তভাবে বাহুতে মাথা রাখিয়া সেখানেই শুইয়া পড়িল। মাতা একবার ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—এই অলক্ষণা কন্যার প্রতি, একটা দারুণ বিতৃষ্ণায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। সময় যাইতে লাগিল, রান্নাঘরের প্রদীপটী জ্বলিতে জ্বলিতে কখন এক সময় আপনি নিবিয়া গেল, মাতা একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কন্যার দিকে বারেক তাকাইয়া দেখিলেন; জীবনীশক্তিবিহীন কন্যার নিথর নিশ্চল এই পাষাণ মূর্ত্তিটী সেই তখনকার মত একই ভাবে শূন্য আকাশের পানে চাহিয়া আছে,—করুণায় মার মন গলিয়া গেল, তিনি আঁচলপানি বিছাইয়া পার্শ্বে শুইয়া পড়িলেন।

দিন কাটিতে লাগিল, সুখে নয়, সোয়াস্তিতেও নয়,—কেমন এক ভাবে—হাসি নাই, আনন্দ নাই,—পরস্পরকে আরাম দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে বাজে কথাও কিছু নাই,—আবার কান্নাকাটির গোলমালে পরস্পরকে দোষী করিবার বাজে কোলাহলও কিছু নাই, উভয়েরই মনের ভাব, এমন ভাবে দিন আর কাটে না,—হায় রাধাবল্লভ, হায় নিষ্ঠুর বিধিলিপি! এ কর্ম্মভোগের শেষ কোথায়?—

মাস দেড়েক বাদে সহসা একদিন খবর আসিল, নলিন এ পোড়া পেট্‌টা কোনমতেও টিকাইয়া রাখিবার জন্য ইউরোপের ভীষণ যুদ্ধে রওনা হইয়া গিয়াছে। পিতামাতার ব্যাকুল স্নেহ, প্রাণপণ চেষ্টা কোন কিছুই আর তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না,—দারুণ অভিমানে, পিতার ত্যজ্যপুত্র হতভাগ্য নলিন, ইউরোপের প্রাণঘাতী যুদ্ধের নিষ্ঠুর আলিঙ্গনে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

এই ক'দিন অন্নপূর্ণাদেবী লজ্জায় এবং দুঃখে সখীর সঙ্গে আর দেখা করিতে যান নাই, কিন্তু এই ভীষণ সংবাদ পাইয়া, এবার আর কিছুতেই সে বাড়ী তাঁহার না যাওয়া চলিল না। নিতান্ত অপরাধীর ন্যায়, তিনি সখীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। পুত্রহারা জননী আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন,—ভাই আমি নিজেই যেন তাকে যমের মুখে ঠেলে পাঠালুম! সে যে রাগ করে গেছে, সে যে না খেতে পেয়ে, যমের দোরে চাকরী খুঁজতে গেছে, সে কথা যে আমি কিছুতে ভুলতে পাচ্ছি না।" অন্নপূর্ণাদেবী কান্না থামাইতে গিয়া নিজে কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিলেন। যেখানে তিনি নিজে অপরাধী, সেখানে তাঁহারই মুখে সান্ত্বনার বাণী কি শ্রোতার কানে অভিনয়ের ন্যায় শোনাইবে না?—সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া কন্যার পানে তাকাইতেই তাঁহার সমস্ত দেহ মন যেন ঐ অলক্ষণা অপয়া মেয়েটার বিরুদ্ধে দারুণ ক্রোধে ঘৃণায় বিমুখ হইয়া উঠিল।

মাঘী পূর্ণিমার তিথি—চাঁদের হাসিতে, পৃথিবীখানি ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে, উঠানের একপাশে সযত্ন বর্দ্ধিত চারা গাছ গুলিতে ফুলগুলি ঝিক্‌মিক্ চিক্‌চিক্ করিতেছিল। মাতা চাহিয়া দেখিলেন, মালতী সে দিকটা ঘুরিয়া, ফুলগুলি স্পর্শ করিয়া করিয়া, কোনটা বা নাকের কাছে নিয়া গন্ধ শুঁকিয়া, অন্যমনস্কভাবে অদূরের ঝাউগাছটার তলায় যাইয়া বসিল। মালতী চুল বাঁধে নাই, আজকাল আর প্রায় বড় একটা চুল সে বাঁধে না। এলো খোঁপাটা একটু খুলিয়া কাঁত হইয়া ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, কপালের উপর চূর্ণ কুন্তলগুলি এধারে ওধারে মৃদুভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। মাতা চাহিয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন,—একি রূপ অভাগীর! দিনে দিনে এযে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, এযে জ্বলন্ত আগুন—এ আগুন তাঁহার ঘরে কেন? এইযে সখীর ওখান হইতে আসিয়া এতক্ষণ ধরিয়া কত তিরস্কারই না ইহাকে করিলেন, একটী কথারও সে উত্তর দিল না, একটুও সে কাঁদিল না, ইহার যে প্রাণ আছে তাহাও ত তাঁহার মনে হয় না। এ যেন তাঁহারই প্রাণের সমস্ত নীরব বেদনা মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার

সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে পড়িল, সেই আট বৎসর আগের দেখা স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে নিটোল দেহ, হাসিতে উজ্জল সুন্দর সুকুমার দ্বাদশবর্ষের বালকটী! মাত্র দিন কয়েকের দেখা, চেহারাখানি খুব স্পষ্ট-রূপে চোখের সম্মুখে ফুটিতেছে না, অন্নপূর্ণাদেবী চক্ষু মুদিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহারই চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেলেন। বিবাহের দিন কয়েক পরেই সে পিতার কার্য্যস্থান সুদূর আসামে চলিয়া গিয়াছিল, সেখানে শত সাবধান সত্ত্বেও যে কেমন করিয়া দুরন্ত কালাজ্বরে তাহাকে আক্রমণ করিল কে জানে! সেখানে বহুদিন চিকিৎসাতেও যখন কোন ফল হইল না, তখনই পিতামাতা তাহাকে লইয়া চিকিৎসার্থে কলিকাতা আসিলেন। মালতীর বাবা তখন সেখানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। সুখ সম্মান আনন্দ কোন কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। পুত্রকে লইয়া বেহাই আসিয়া তাঁহার ওখানেই উঠিলেন! তাহার পর বহুদিন ধরিয়া সেই একটী সর্ব্বজন বাঞ্ছিত পরম প্রিয় প্রাণটীর জন্য কি অজস্রধারে অর্থব্যয় এবং যমের সঙ্গে কি ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। কিন্তু কিছুই হইল না। একদিন অকস্মাৎ অষ্টম-বর্ষীয়া অবোধ অজ্ঞান মালতীর মাথায় বজ্রপাত হইল। অভাগী সে সংবাদ জানিল না, বুঝিল না। কিন্তু পিতামাতার এ চির সুখের ঘরখানি আঁধার হইয়া গেল। সমাজের শাসনের ভয়ে, এবং পাছে মালতীর মনে কোন কথা জাগিয়া উঠে, সেই ভয়ে তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া বিদেশে পলাইলেন। মালতী তাঁহাদের কুমারী কন্যার মতই শিক্ষা পাইয়া দিনে দিনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পিতার মনে কন্যা সম্বন্ধে একটা গোপন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁহার মনেই রহিয়া গেল, তিনি স্ত্রী কন্যাকে সংসারের কঠোর নিয়মের হাতে সঁপিয়া আপনি একদিন সকল চিন্তার হাত এড়াইলেন।

মাতার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে পড়িল কবে কোন্ সুন্দর শৈশবে সখীর সঙ্গে তাঁহার পুতুল বিবাহের খেলা চলিয়াছিল, এবং তখন দুই সখীতে গুপ্তভাবে কথা হইয়াছিল, 'সই, ঠিক এমনি করে বড় হয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদেরও কিন্তু বিয়ে দেবো।' সে কথা শৈশবের সেই ধূলাখেলার সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় কোন্ শূন্যে ভাসিয়া গিয়াছে, আজিকার এই ভ্রষ্টলগ্নে বিস্মৃতময় সেই কাহিনীই যে বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল। সখীর বিবাহ হইয়াছে, ছেলে হইয়াছে, তাঁহারও মেয়ে হইয়াছিল, এবং নলিন তথাপি সাধিয়া আসিয়া তাহার সেই বাগ্‌দত্তা পত্নীর আশায় রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া গিয়াছে কিন্তু হায়,বড় দেরী হইয়া গিয়াছে যে! তথাপি নলিন পুরুষ মানুষ, সে দুদিনেই ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু মালতীর এই কিশোর হৃদয় যে কোন একটা অবলম্বন পাইবার জন্য ধীরে ধীরে নূতন আশায় আশায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, আজ তুচ্ছ সমাজের ভয়ে কি করিয়া সে ইহাকে আপনি পদদলিত করিয়া ধূলায় মিশাইয়া ফেলিবে? আপনার দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া, নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক সঙ্কোচ এবং সংযম তাহার হৃদয়কেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে সত্য—কিন্তু এ ক'দিনের জন্য? সম্মুখের দীর্ঘ দিনের শত সহস্র প্রলোভনের সম্মুখে আপনাকে স্থির রাখিতে পারিবে কি? জননী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মনের সমস্ত বেদনা এবং কোমলতা দূর হইয়া নৃশংস সমাজ এবং কন্যার বিরুদ্ধে কঠিন হইয়া উঠিল। আকাশে চন্দ্র তখন মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, অদূরে ঝাউগাছতলায় ধ্যানাসীনা মালতীর উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ইদানীং কন্যার রূপ তাঁর চক্ষুশূল হইয়া উঠিতেছিল, তাই ফুটন্ত জ্যোৎস্নালোকে ফুটন্ত ফুলটীর মতই মালতীকে শূন্যে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি নিকটে যাইয়া কঠোরস্বরে ডাকিলেন,—'মালতী'!

মালতী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। সন্ধ্যাবেলা মাতার তিরস্কারে মনটা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বাগানের খোলা জায়গায় গাছপালার মধ্যে বসিয়া বাগানের মৃদুমধুর স্পর্শে এবং অনাবিল জ্যোৎস্না-ধারার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া তাহার মাথা ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতেছিল। ধীরে ধীরে মালতীর মনে কত শত কথা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। একবার মনে হইল, কেন তাহার এমন দুরবস্থা হইল, তা, অবস্থাটা যেরূপই হোক্ না কেন কল্পনায় উড়িয়া স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিনটা ত হাল্কাভাবেই বেশ চলিতেছিল। নলিন দা যদি এত কাণ্ড না করিত তাহা হইলে কি সহসা জীবনটা তাহার এমনিভাবে শুষ্ক

মরুভূমি হইয়া পড়িত ?—আচ্ছা, নলিনদা তারপর গেল কোথায় ? যুদ্ধে ! কে জানে যুদ্ধ কেমন ! মালতী যুদ্ধের নানাবিধ চিত্র কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। আচ্ছা যুদ্ধে নাকি কত শত রকমের কত অস্ত্রই আছে। গায় যদি একটা তার লাগিয়া যায় !—যদি—মালতী আশঙ্কায় কাঁপিতে লাগিল। মালতী ভাবিল,—কেন গেল, না গেলেই ত সব ভাল ছিল। বাপে অমন কত বকে, তার জন্যে এত রাগ করতে হয় কি ? কিন্তু যদি থাকতই, আর যদি সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ী আস্‌ত ? মালতীর বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল, মনে হইল গিয়াছে, ভালই হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধে না গেলেও ত চল্‌ত !…আচ্ছা নলিনদার চোখের চাউনীটা ও রকম ছিল কেন ? অমন করে তাকাত কেন, ও সব কি কথা সে বল্‌ত, সত্যি কি তবে?…মালতীর বিবেক মনকে ধমক দিয়া উঠিল, 'ছিঃ, ও সব ভাবনা কেন ?' মালতী অন্যমনস্ক হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আবার কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ঐ কথাই মনে আসিয়া পড়িল কে জানে ! মালতী দুই একবার মনকে শাসন করিল, কিন্তু ক্রমে কোথা হইতে কেমনতর একটা আবেগের মত কি আসিয়া মালতীর বিবেককে স্তব্ধ অসাড় করিয়া ফেলিল। মালতী মনে মনে বলিল, 'আমি ত কিছু চাহিতেছি না, আমার মনে ত কোন কামনা নেই, শুধু শুধু ভাবতে দোষ কি ? শূন্য মন যে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে থাকে, তাতে ত রাধাবল্লভের আসন বসাতে পারি না। তার চেয়ে এই-ই আমার ভাল—' মালতী সর্ব্বান্তকরণে নলিনদার চিন্তায় ডুবিয়া গেল।

মাতার রূঢ়স্বরে সে চমকিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—আজ খেতে হবেনা নাকি ? রাত হয় নি ? ঘুমোতে হবে না ?

মালতী ধীরে ধীরে মায়ের পেছনে ঘরে ফিরিয়া চলিল।—

পাশের বাড়ীতে তখন গ্রামের ছেলেদের সখের থিয়েটারের রিহার্সলে চলিতেছে—

"কেন তারার মালা গাঁথা
কেন ফুলের শয়ন পাতা
কেন দখিন—হাওয়া গোপন কথা
জাগায় কাণে কাণে ॥"

মালতী একবার সে দিকে চাহিল—মাতা ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন।

(ক্রমশঃ)

তরুণী ভার্য্যার প্রতি

[শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম্‌.এ, বি-এল্‌]

যদি বারণ কর, তবে
হাসিব না।
যদি গরম লাগে, কাছে
আসিব না।
যদি দ্বিতলে গলা সাধা
সহসা পায় বাধা
তোমার প্রিয়জনে
শাসিব না।

যদি ধমকি ধেয়ে যাও
নথ নাড়ি,
আমি চমকি চুলকাব
পাকা দাড়ি
যদি তোমার প্রতিকূলে
কথাটি কেউ তুলে
আমার জরিমানা
কাশিব না।

চৌরস্তুতি

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

চোর ধরা পড়িয়াছে। প্রথম অপরাধ নহে, দস্তুরমত দাগী চোর, অনেকবার চুরী করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে— এমন চোর। কিন্তু আপনারা কি কেহ কখনো শুনিয়াছেন যে সেই চোর চূড়ামণিকে পুলিশের হাতে না দিয়া, ফাঁড়ীতে না পাঠাইয়া তাহার স্তব-স্তুতি করিয়া তাহারই প্রসন্নতা উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতেছে ?

চোর আবার যে-সে চোর নয়, যেমন-তেমন চোরও নহে, চোরের সম্রাট, সাহানসাহ পাৎসাহ ! তিনি রাজ্যের সর্বপ্রধানা রমণীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পত্তি চুরী করিয়া ধৃত হইয়াছেন ; যে অপরাধের উচিৎ সাজা ফাঁসীকাঠে ঝুলাইলেও হয় কি-না সন্দেহ, যে অপরাধে অপরাধীর দিকে চাহিতেও ঘৃণা হয়, ক্রোধে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, শুনুন - আপনারা, সেই চোরকে কি-ভাবে স্তুতি করা হইতেছে—শুনুন।

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং
গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলচৌরম্।
অনেকজন্মার্জ্জিতপাপচৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি।

ব্রজপুরে যিনি প্রসিদ্ধ ননীচোর, গোপনারীগণের যিনি বসন-চোর ; পাপীগণের যিনি জন্ম জন্মের পাপ চোর, সেই চোরের অগ্রগণ্য পুরুষকে আমি নমস্কার করি।......দেখিলেন, ব্যাপারটা ! ননীচুরীটা না হয় অল্প অপরাধ স্বীকার করিলাম ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারা যায়, জুভেনাইল কোর্টেও পাঠান যাইতে পারে কিন্তু তার পরের কাণ্ডগুলা ? নারীগণের বসন-চুরি ! ট্রান্সপোর্টেসন না লাইফ সেণ্টেন্স—আপনারাই বলুন, কোনটা বিধেয়।

তারপর শুনুন :

শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং
নবাম্বুদশ্যামলকান্তিচৌরম্।
পদাশ্রিতানাং চ সমস্তচৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি।

যিনি শ্রীরাধিকার হৃদয় চুরি করিয়াছেন, নবজলধরের সুন্দর শ্যাম-কান্তি চুরী করিয়াছেন ; যিনি পদাশ্রিত জনের সর্বস্ব চুরী করেন, সেই চোর-শ্রেষ্ঠকে আমি নমস্কার করি। দেখুন, The same কি-না ! শ্রীরাধিকার হৃদয় চুরি ! ওঃ—horrible !

তারপর—

অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ
করোতি ভিক্ষুং পথি গেহহীনম্।
কেনাপ্যহো ভীষণচৌর ঈদৃগ্-
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগত্ত্রয়েঽপি।

যিনি অর্থাৎ যে মহানুভব পুরুষ, পদাশ্রিতজনের সর্বস্ব চুরি করিয়া তাহাকে অকিঞ্চন, গৃহশূন্য ও পথের ভিখারী এবং 'টুকনী-সম্বল' করিয়া ছাড়েন, এমন ভীষণ চোর কেহ কখনও ত্রিজগতে দেখেও নাই, শুনেও নাই।...... ঠিক কথাই ত। Criminal Procedureএ অন্যূন বিশ পঞ্চাশটা Section ই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

যদীয়নামাপি হরত্যশেষং
গিরিপ্রমাণানপি পাপরাশীন্।
আশ্চর্য্যরূপো ননু চৌর ঈদৃগ্-
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন ময়া কদাপি।

যে চোরের নামটিও পর্বতপ্রমাণ রাশি রাশি পাপ চুরি, এমন চোর কখনও দেখি নাই, শুনিও নাই !—আমিও না মহাশয়, আমিও না ! এ সর্বনেশে চোর ! এর তুলনা নাই, জোড়া নাই।

ধনঞ্চ মানঞ্চ তথেন্দ্রিয়াণি
প্রাণাংশ্চ হৃত্বা মম সর্ব্বমেব।
পলায়সে কুত্র ? ধৃতোঽদ্য চৌর
ত্বং ভক্তিদাম্নাসি ময়া নিবদ্ধঃ।

হে মহাত্মা চোর, তুমি আমার ধন, মান, ইন্দ্রিয়-সমূহ, ও পরাণটি চুরি করিয়া কোথায় পালাইবে ? অদ্য তোমাকে ধৃত করিয়াছি ; তোমাকে আমি ভক্তিরজ্জুতে বাঁধিয়াছি।—সব মাটি, ভক্তিরজ্জু বলিতেই সব মাটি ! বলিলেই হইত - হাতকড়ায় বাঁধিয়াছি ! পুলিশে দিব !

যদি বা চোর ধরা হইল —

ছিনৎসি চোরং যমপাশবন্ধং
ছিনৎসি ভীমং ভবপাশবন্ধম্।
ছিনৎসি সর্ব্বস্য সমস্তবন্ধং
নৈবাত্মনো ভক্তকৃতং তু বন্ধম্।

তুমি ঘোর যমপাশবন্ধন ছেদন করিয়া দিতে পার, ভীষণ ভবপাশবন্ধনও তুমি ছেদন করিতে পার, সকলের সকল বন্ধনই তুমি ছেদন করিতে পার কিন্তু ভক্ত তোমাকে বন্ধন করিলে সে বন্ধন তুমি কিছুতেই ছেদন করিতে পার না।

বন্ধনের কথা ত ঐ গেল, এইবার শাস্তির কথাটা শুনুন আর প্রাণে প্রাণে সেকালের সুখটাও অনুভব করুন।

মন্মানসে তামসরাশিঘোরে
কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধঃ।
ভজস্ব হে চৌর হরে ! চিরায়
স্বচৌর্য্যদোষোচিতমেব দণ্ডম্ !

আমার হৃদয় ঘোরতর অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ; তুমি এই দুঃখময় হৃদয়-কারায় চির-রুদ্ধ থাকিয়া, হে চোর হরি তোমার নিজ কৃত অপরাধের দণ্ড ভোগ করিতে থাকহ।...যাক্ এ ব্যবস্থাটা নেহাৎ মন্দ নহে। আলোবাতাসহীন হৃদয়-কারাগারে চিররুদ্ধ থাকিল চোর-সম্রাটের সাজা কতক-মতক উচিৎ হইতে পারে বটে !

কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়ে
মদ্ভক্তিপাশদৃঢ়বন্ধননিশ্চলঃ সন্।
ত্বাং কৃষ্ণ হে ! প্রলয়কোটিশতান্তরেঽপি
সর্ব্বস্বচৌর ! হৃদয়ান্নহি মোচয়ামি।

হে কৃষ্ণ, তুমি আমার হৃদয় কারাগারে অনন্তকাল বাস কর ; আমার ভক্তিপাশের বন্ধনে তোমার আর পাশটি ফিরিবার শক্তি নাই, একদম নিশ্চল ; হে আমার সর্বস্ব চোর ! শত শত কোটি কোটি মহাপ্রলয় হইয়া গেলেও আর আমি তোমাকে হৃদয়-কারাগার হইতে মুক্তি দিব না। —শাস্তি হইল বটে, তবে একালের তুলনায় কিছু নাঃ ! হা রে সেকাল ! সোনার সেকাল !

শ্রীতারাকুমার-রচিত চৌরাষ্টকম্ হইতে।

হংস-দূত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [একত্রিংশ সপ্তাহ

ভাব-বৈচিত্র্য
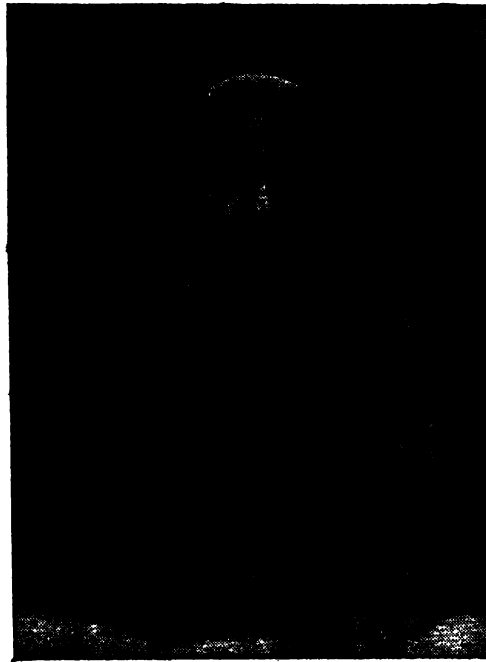
স্বরূপ মূর্ত্তি

অভিব্যক্তা—শ্রীযুক্ত ধীরাজকুমার ভট্টাচার্য্য

"সে কেন ফিরে ফিরে চায়—"
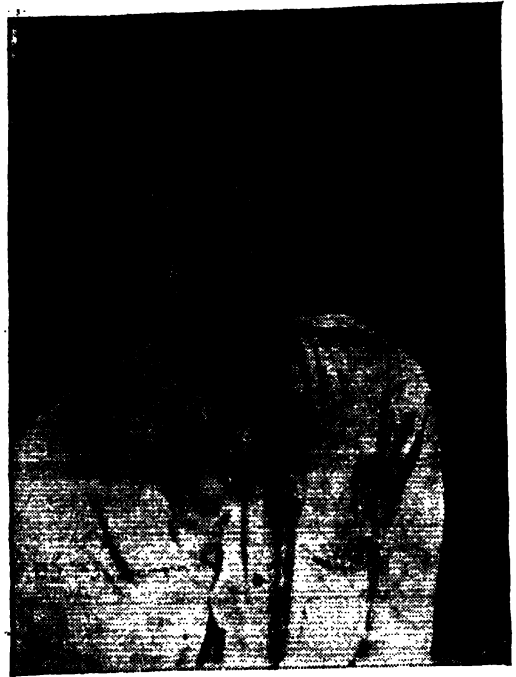
"যাব কি যাব না মিছা এ ভাবনা"

"প্রাণের পথ বেয়ে গিয়াছে সে গো—"

"সুন্দর! অতি সুন্দর!"
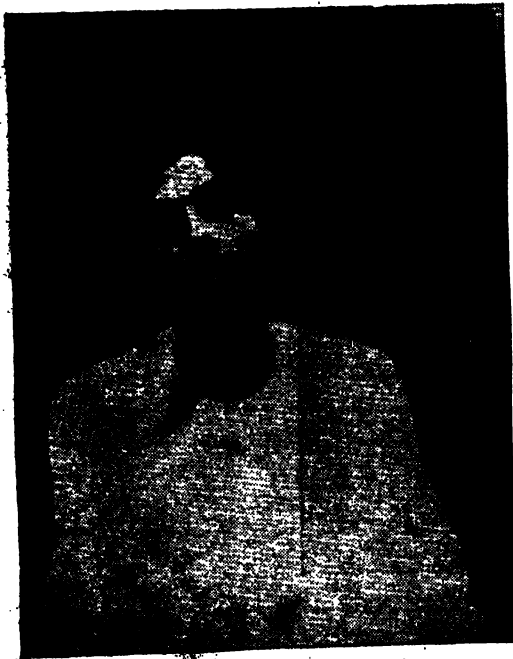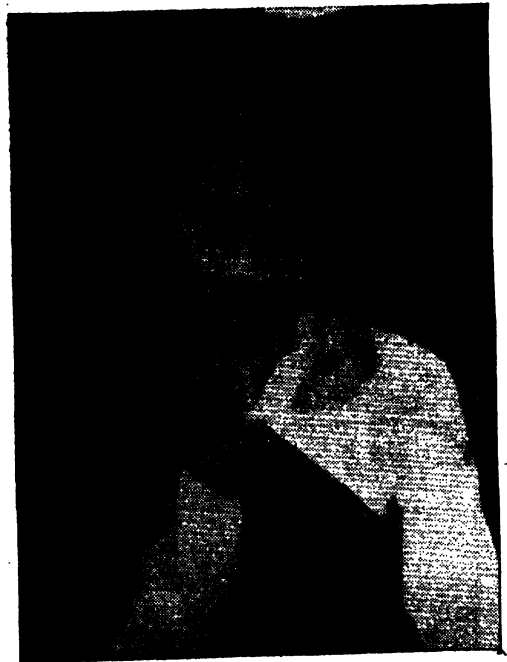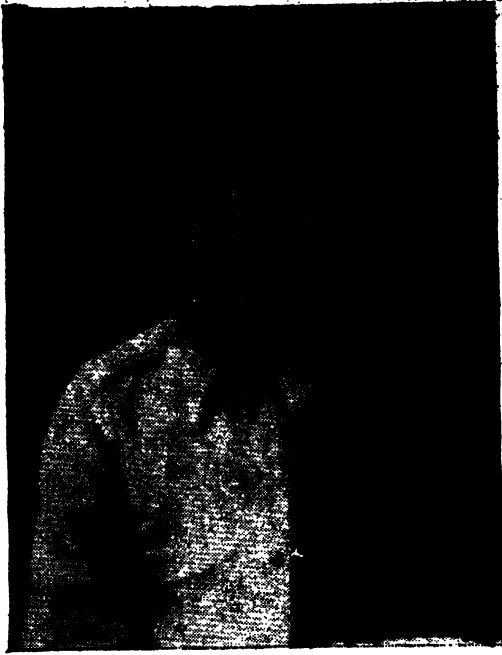
মার দিয়া! বেল্লা ফতে!
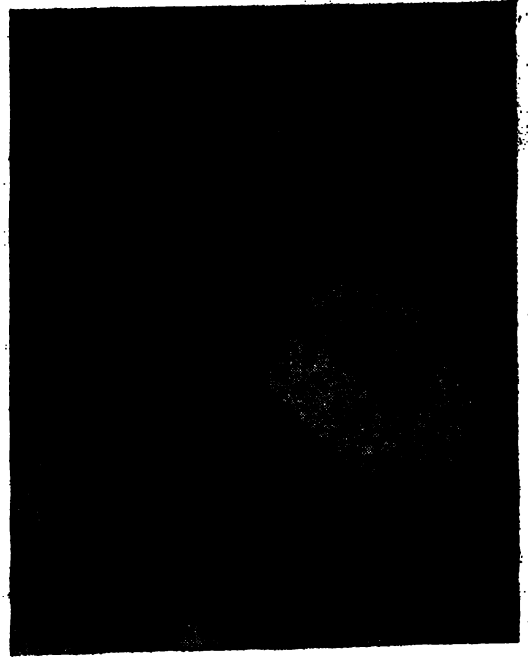
"তুমি কোন্ কাননের ফুল গো—
তুমি কোন্ গগনের তারা—"

ওঃ কি করেছি! কি করেছি—

আকুল।

উন্মাদ।

উন্মাদ-বিভীষিকা

"একটী পয়সা বাবা।"

দুশ্চিন্তা
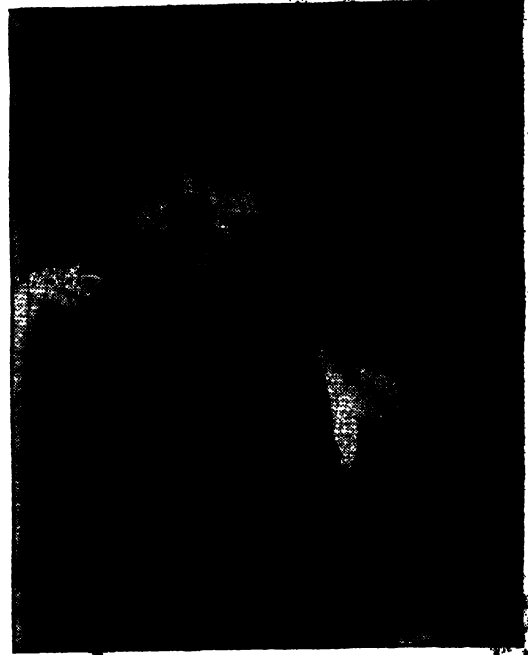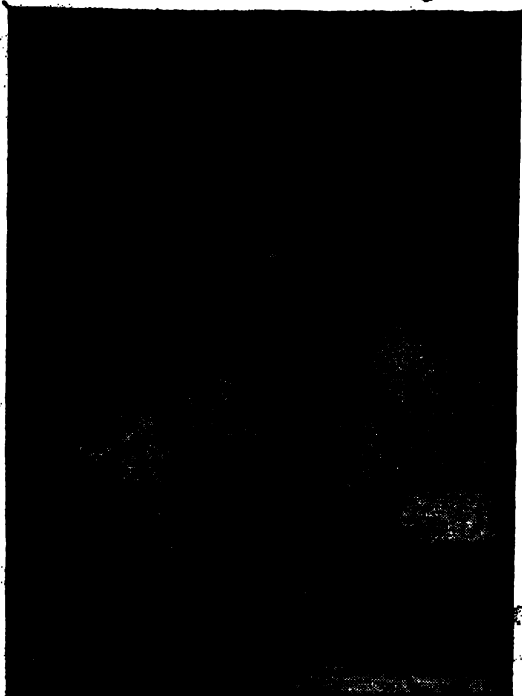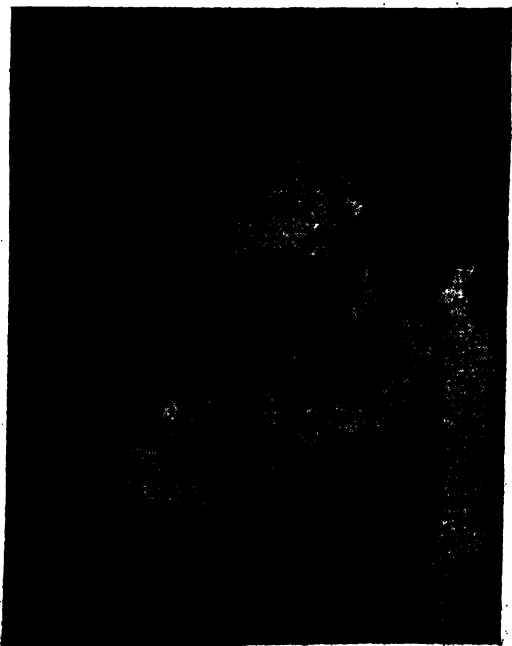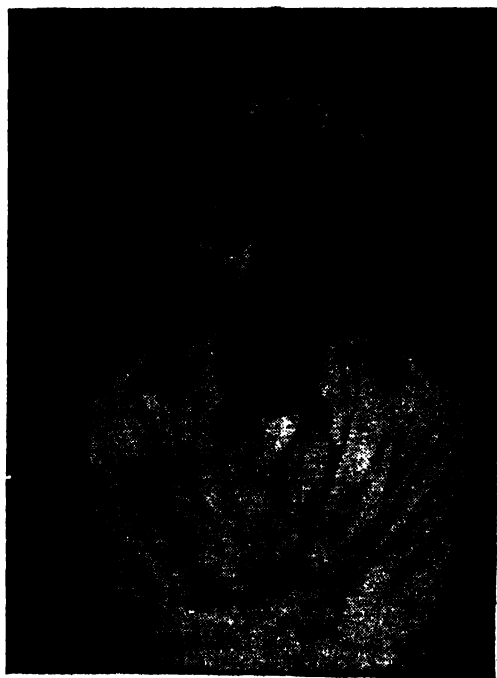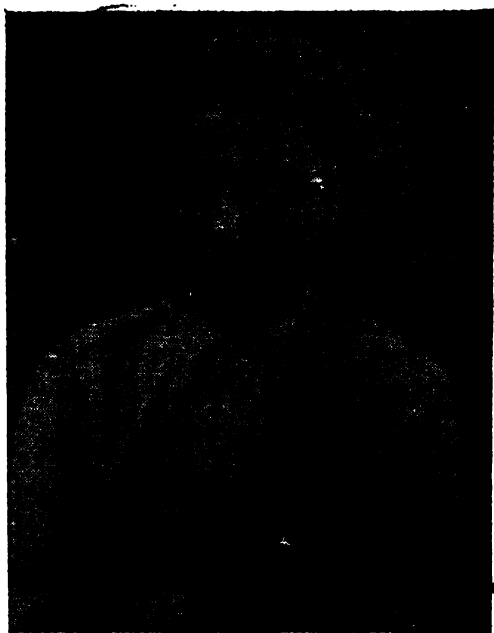
অভিমান।

ব্যথা

"তাইত!"

"বটে!"
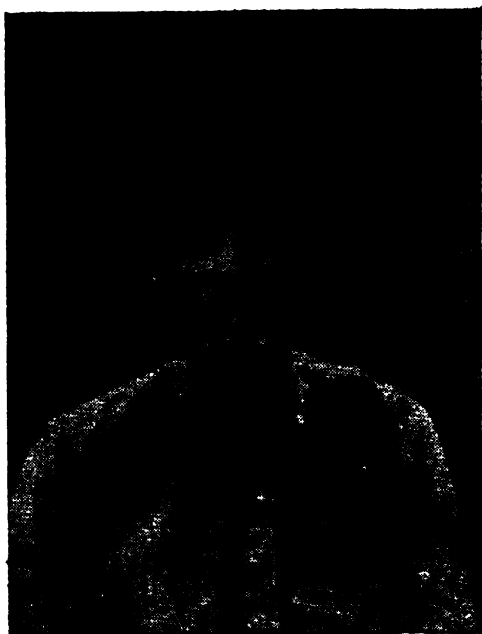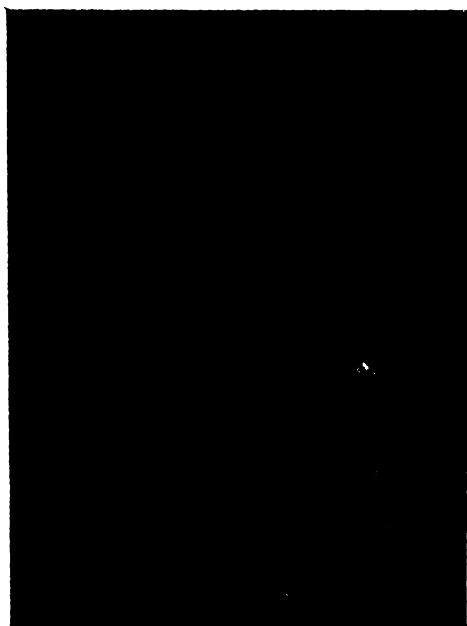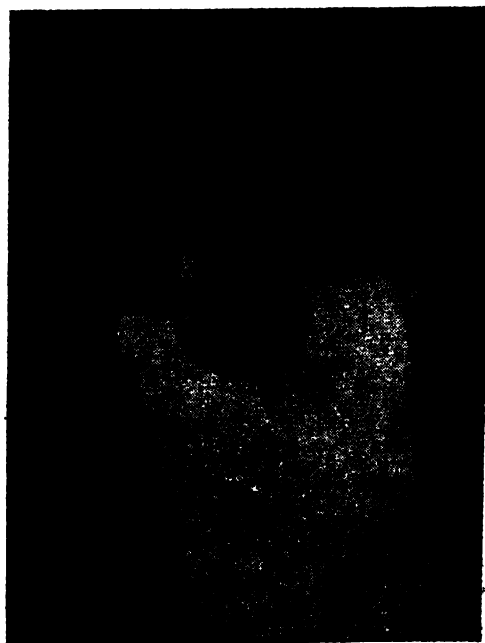
"আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই, তুমি তাই গো !"

ভাস্কর-শিল্প
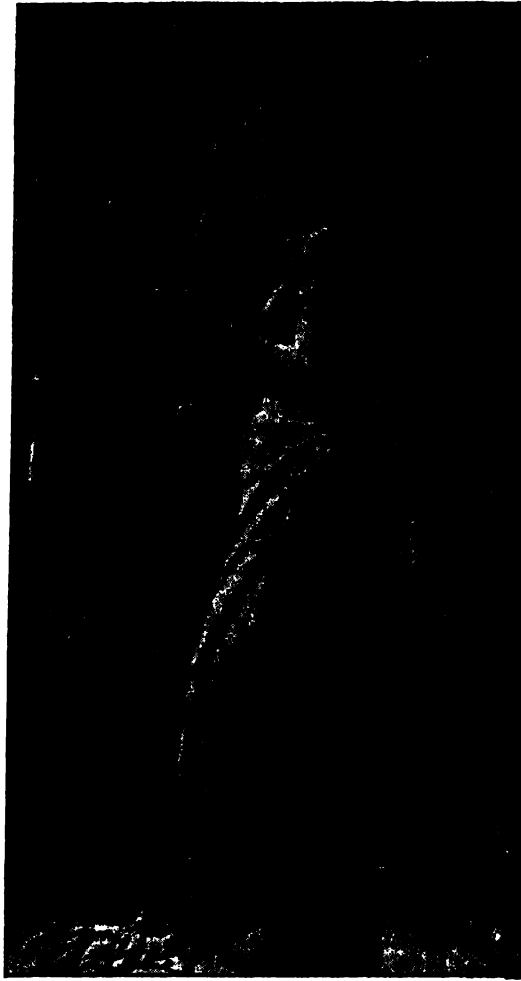
সতীর সিন্দূর

কাণের ভুল

পল্লী বাটে

সন্ধ্যা-দীপ

"স্বামী আর বাঁচাও না প্রাণ।"

গরল না সুধা

বিষ্ণু

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন

মহাত্মা গান্ধী
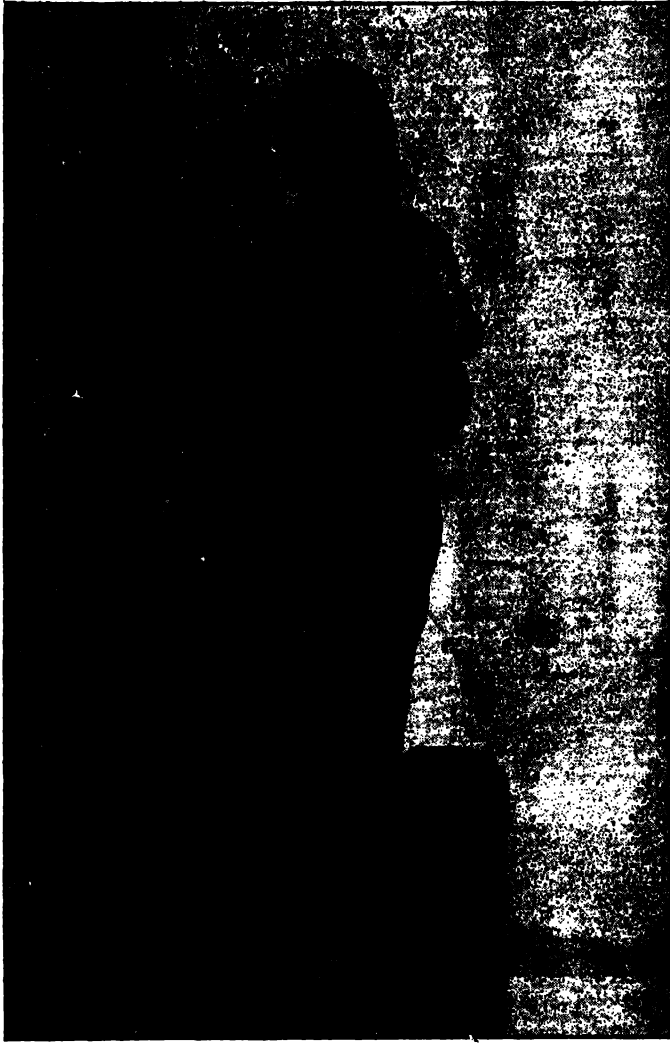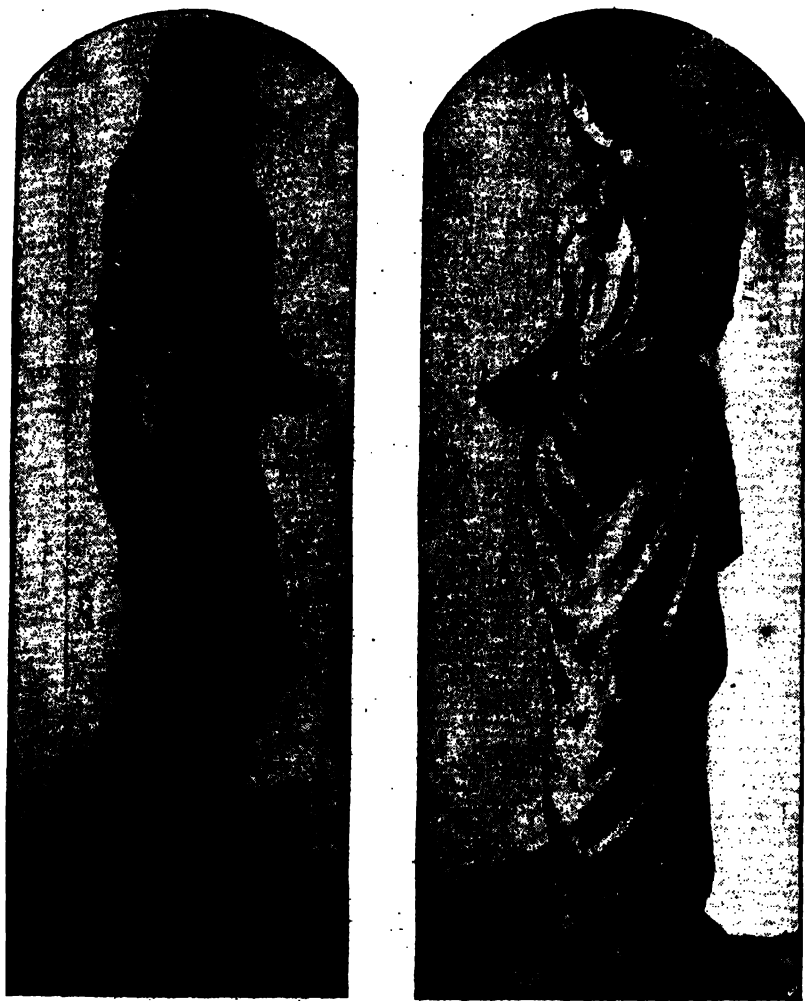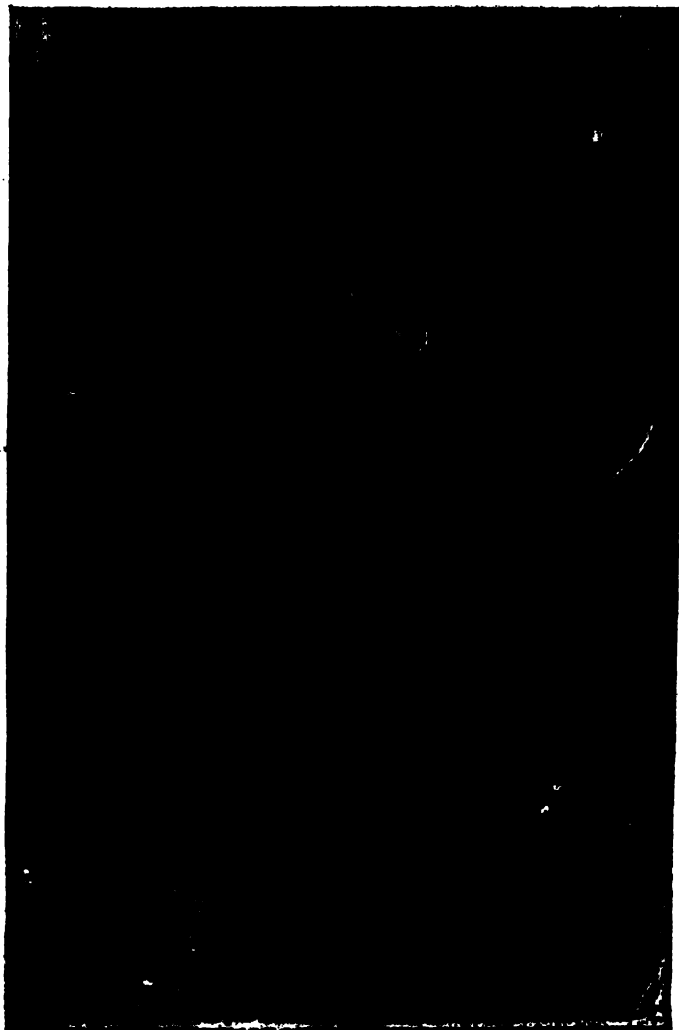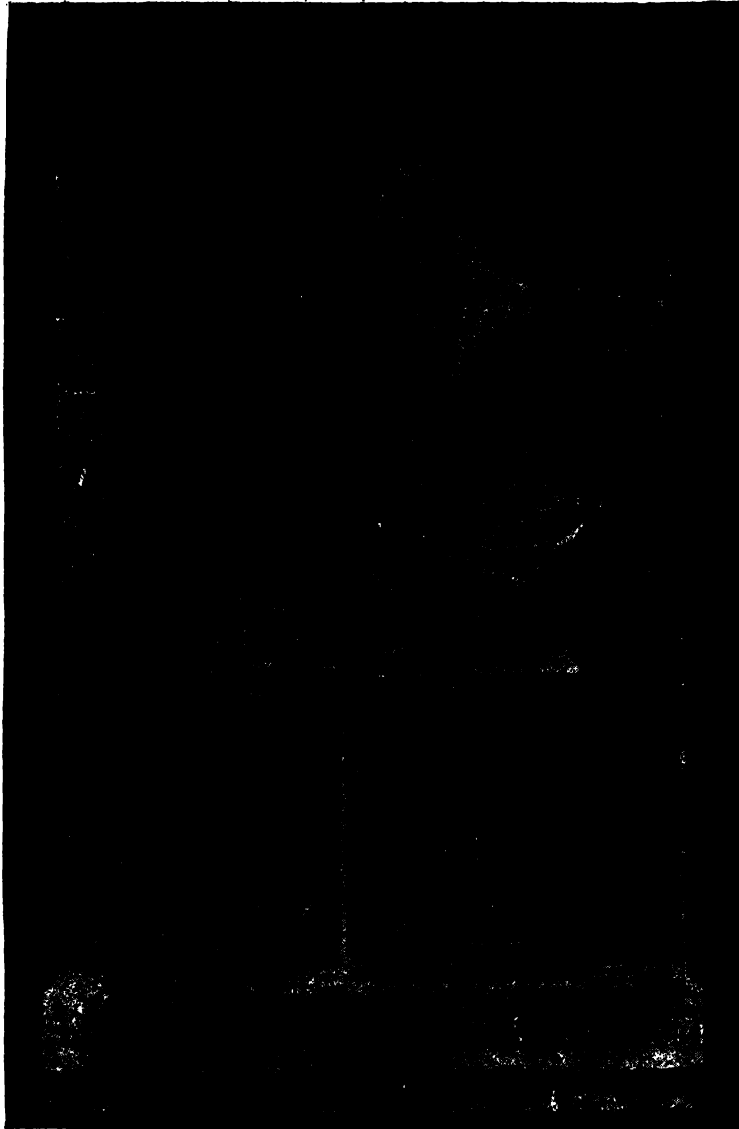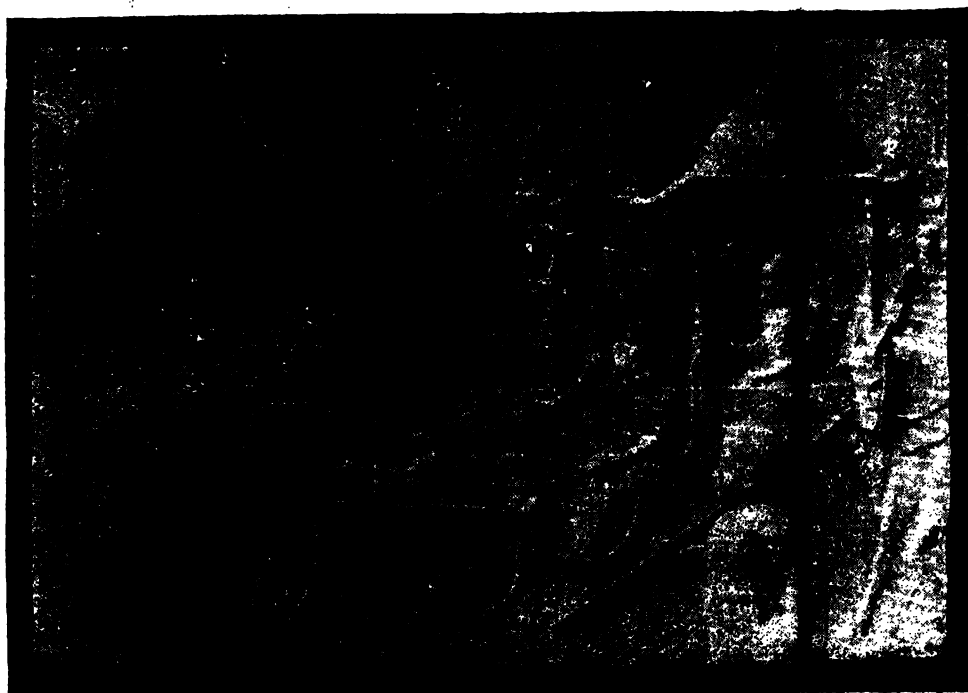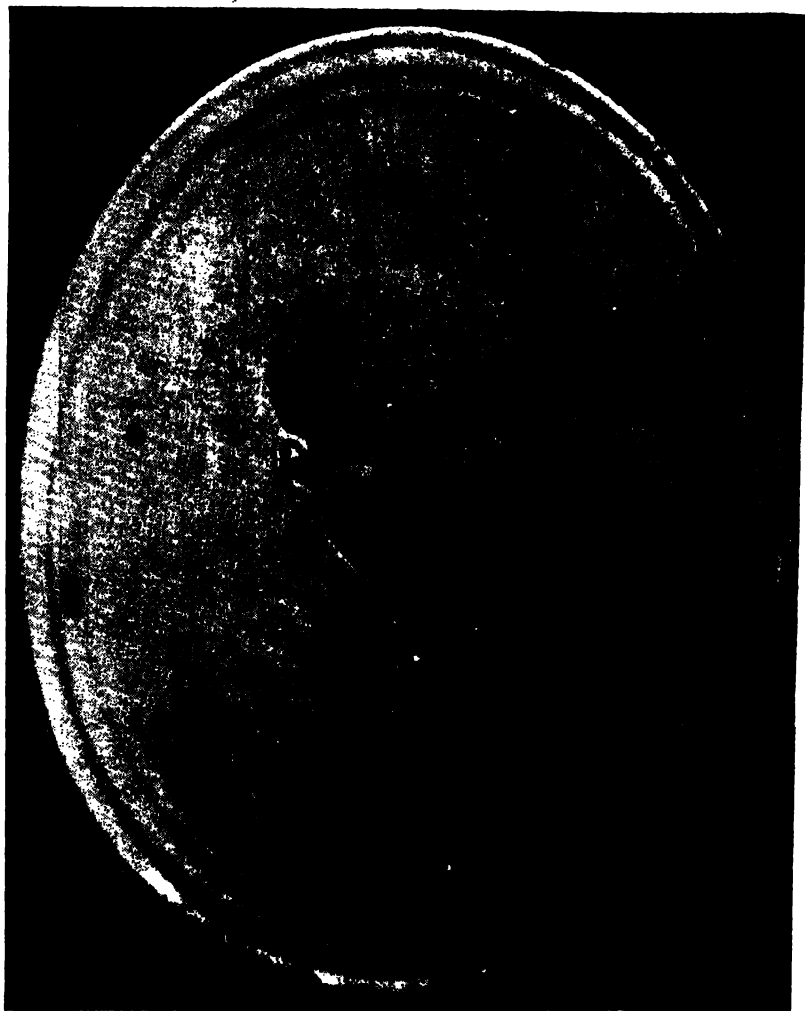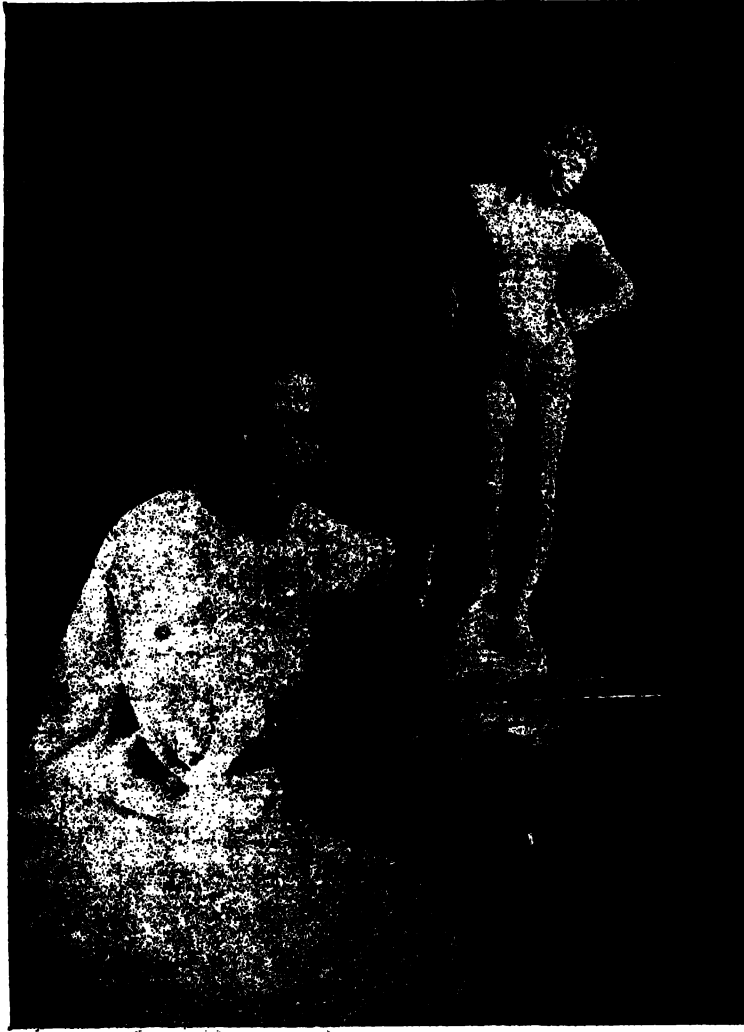
ভাস্কর মাটীর প্রাণ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক।

ভাস্কর, শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ মল্লিক ভাস্কর্য্য শিল্পে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা এই সংখ্যায় যে কয়খানি চিত্র-প্রতিকৃতি দিলাম, সকলগুলিই তাঁহার খোদিত।

বাংলার নৃত্যকলা ও নর্ত্তকী

[শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্-এ, ভাগবতরত্ন]

রসের সন্ধানে, আনন্দের উদ্দেশে ধায় সেই জাতি, যার দেহে প্রাণ আছে, মনে স্বাধীনতা আছে। দারিদ্র্য, অপমান ও অবসাদ যখন চারিদিক হইতে আসিয়া কোন জাতিকে বিব্রত করিয়া তুলে, তখন সে জীবনটাকেই ভার বলিয়া মনে করে। তাহার আর আনন্দ করিবার অবসর কোথায়?

আমাদের দেশ ছিল যখন স্বাধীন, মনের গতি ছিল যখন বাধাহীন, তখন লোকে আনন্দ লাভ করিবার জন্য কলাবিদ্যার অনুশীলন করিত। নৃত্য ও গীত এই দুইটী বিদ্যা মানবপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দেহের অপরূপ বিচিত্র ভঙ্গিমায়, লাস্যে ও তাণ্ডবে, যে অপূর্ব্ব রস উছলিয়া উঠে, তাহা পান করিবার জন্য দেবতারাও বুঝি লালায়িত। তাই আদিমযুগে, যখন মানব সুখবিলাসের অন্য উপকরণ আবিষ্কার করিতে পারে নাই, তখনও নৃত্য করিয়া মনের ভার লঘু করিয়াছে। আজও পৃথিবীর অসভ্যজাতিরা ধরণীর বুক যখন জ্যোৎস্নায় ভরিয়া যায়, তখন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

কিন্তু বহু দিনের পরাধীনতার ফলে আমাদের জাতীয় মনে এমন একপ্রকার জড়তা আসিয়াছে, যে আমরা নৃত্যকলাকে ভদ্রসমাজ হইতে নির্ব্বাসন করিয়াছি। দেহের রূপটী বুঝি অপবিত্র জিনিষ—তাহার মধ্যে যে অমৃতের মাধুরী রহিয়াছে, তাহা বুঝি দানবের দলনের জন্য,—তাই আমরা, ভদ্র মহিলাদের নাচিবার কথা যদি কেহ ভ্রমেও মুখে আনেন, তবে শিহরিয়া উঠি।

কিন্তু এমন ভাব চিরদিন আমাদের মনে ছিল না—থাকা স্বাভাবিকও নহে। চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার মধ্যে আমরা নৃত্যকে প্রধান স্থান দিয়াছিলাম। বাৎস্যায়নের কামসূত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে সম্ভ্রান্ত ঘরের কুমারীদিগকে রীতিমত নৃত্যকলা অভ্যাস করিতে হইত। নৃত্যগীতে পারদর্শিনী না হইলে, তাঁহাদের ভাল বর জুটিত না। আজকাল ইউরোপেও ঐ রকম হইয়া থাকে। সেই জন্যই বলিয়াছি যে, দেশ যখন স্বাধীন থাকে তখনই লোকে নৃত্যগীত করিয়া আনন্দ করিতে চাহে।

প্রাচীন ভারতে নৃত্যকলার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে মহামুনি ভরত নাট্য-কলার ও নর্ত্তনবিদ্যার আদি গুরু। প্রাচীন ভারতে যে নৃত্যকলা সবিশেষ আলোচিত হইত, তাহা নৃত্যবিদ্যা সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থের রচনা দেখিয়াই বুঝা যায়। ভারতের বুকের উপর দিয়া কত বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে—কত গ্রন্থ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তথাপি আমরা নৃত্যকলা সম্বন্ধে "নর্ত্তকনির্ণয়" "নৃত্যপ্রয়োগ" "নৃত্য-বিলাস" "নৃত্য-সর্ব্বস্ব" "নৃত্যশাস্ত্র" "নৃত্যাধ্যায়" ও "সঙ্গীত দামোদর" নামে গ্রন্থগুলি এখনও দেখিতে পাই। মল্লিনাথ "কিরাতার্জ্জুনীয়ের" টীকায় "নৃত্য-বিলাস" ও "নৃত্য-সর্ব্বস্বের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ঐ সকল গ্রন্থে নৃত্যকলা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করা হইয়াছে। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া নৃত্যকে নানারূপ ভাব প্রকাশের উপযোগী করিয়া তোলা হইয়াছিল। ভারতীয় নৃত্যকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল—তাণ্ডব ও লাস্য। পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব কহে, আর নারীর নৃত্যকে লাস্য বলে। লাস্য নৃত্য আবার দুই প্রকার ছুরিত ও যৌবত। যে নৃত্যে নায়ক নায়িকা ভাবরস প্রকাশ করিয়া চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি প্রদর্শন করেন তাহার নাম ছুরিত নৃত্য। আর কেবল নর্ত্তকী যেখানে নিজে লীলাসহকারে নৃত্য করেন, তাহাকে যৌবত নৃত্য কহে। এই দুই প্রকারের আবার শতাধিক বিভাগ আছে। সকল গ্রন্থের বিভাগ আবার একরূপ নহে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বাংলার নৃত্যকলা ও নর্ত্তকী সম্বন্ধে কিছু বলা। বাংলার সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতারই অঙ্গ বলিয়া সাধরেণভাবে ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলাম। যদি "সচিত্র শিশিরের" পাঠক পাঠিকারা সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ভারতীয় নৃত্যকলা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে আমার সাধ্যমত তাঁহাদের আগ্রহ চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিব। আমার মনে হয় যে এটা যখন সকল বিষয়েই জাতীয় জাগরণের যুগ—তখন আমাদের নৃত্যকলাও যাহাতে বিদেশীর অনুকরণ মাত্র না হইয়া, জাতীয় ভাবে প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করে, তাহার চেষ্টা করা উচিত। ভারতীয়

নৃত্য যে কিরূপ বিচিত্র ছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত কয়েকটী নাচের নাম হইতেই বুঝিতেই পারিবেন—"কমলবর্ত্তনিকা নৃত্য" "মকরবর্ত্তনিকানৃত্য" "মায়ুরী নৃত্য" "ভানবী নৃত্য" "মৈনী নৃত্য" "মৃগীনৃত্য" "হংসী নৃত্য" "কুক্কুটী নৃত্য" "রঞ্জনী নৃত্য" গজ-গামিনীনৃত্য" "নেরিনৃত্য" "করণনেরিনৃত্য" "মিত্রনৃত্য" "চিত্রনৃত্য" প্রভৃতি।

বাংলাদেশে প্রাচীনকালে নৃত্যকলার যথেষ্ট অনুশীলন হইত; বাংলার দেবদেবীর মন্দিরে শিক্ষিতা নর্ত্তকীরা নৃত্য করিয়া দেবতার তুষ্টি বিধান করিতেন। রাজসভা নর্ত্তকীর নূপুর নিক্কনে মুখরিত হইয়া উঠিত। বাংলার নৃত্য-কলার খ্যাতি সুদূর কাশ্মীরেও পৌছিয়াছিল।

কাশ্মীরের ইতিহাস রচনা করিয়া যিনি অমর হইয়া গিয়াছেন, সেই কল্‌হন এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন। কল্‌হন ১১৪৮—৪৯ খ্রীষ্টাব্দে "রাজতরঙ্গিনী" রচনা করেন। সে সময়ে আমাদের দেশে সেন রাজারাই প্রধানতঃ রাজ্য করিতে-ছিলেন। কল্‌হনের "রাজ-তরঙ্গিনীর" প্রথম অংশ কবিকল্পনায় পরিপূর্ণ—সত্যঘটনার সহিত বহু কল্পনা সেখানে স্থান পাই-য়াছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস। তথাপি তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে যদি লেখেন যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাংলা দেশে নৃত্যকলা সবিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল—তাহা হইলে তাঁহাকে একেবারে অবিশ্বাস করা চলে না। হয়তো অষ্টম শতাব্দীর কথা তিনি ভাল জানিতেন না—কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে যদি বাংলাদেশে নৃত্যকলার উন্নতি তিনি না দেখিতেন, তবে প্রাচীন বাংলাকে প্রশংসা করিবার তাঁহার কোন কারণই থাকিত না। আর আমরা অন্য প্রমাণ দ্বারাও দেখাইব যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশ সত্যসত্যই নৃত্যকলার চর্চ্চায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। প্রথমে কল্‌হনের কাহিনীটী বলিয়া লই। এই কাহিনীটী উপন্যাস অপেক্ষাও কৌতুকাবহ। তাই আগাগোড়া সমস্ত গল্পটী বলিতেছি।

কাশ্মীরের রাজা জয়াপীড় পিতৃ-সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। জজ্জ ষড়যন্ত্র করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছেন। জয়াপীড় পুরুষসিংহ, তিনি নিজের ক্ষমতাবলে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে চান। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য যেমন বিদেশ জয় করিয়া আনিয়া নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন, জয়াপীড়ও তেমনি অন্য দেশ জয় করিয়া শক্তি সঞ্চয় করিবেন ও সেই শক্তি দ্বারা জজ্জকে বিতাড়িত করিবেন—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

জয়াপীড় একা ভ্রমণে বাহির হইলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে আসিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন গৌড় দেশের অন্তর্গত। তাহার রাজার নাম জয়ন্ত। একদিন জয়াপীড় কার্ত্তিকেয়র মন্দিরে আসিয়া দেখেন যে সেখানে অতি অপূর্ব্ব নৃত্য হইতেছে। নর্ত্তকী দেশের মধ্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার নূপুর নিক্কনে সকল লোক মোহিত হইয়া গিয়াছে। জয়াপীড় স্বয়ং নৃত্যকলায় পারদর্শী। তিনি দেখিয়াই বুঝিলেন যে কমলা ভরতকৃত নৃত্যশাস্ত্র বেশ ভাল করিয়াই অধ্যয়ন করিয়াছেন।

কমলা দেখিতে কেমন ছিলেন, তিনি দেব-মন্দিরে কেন নৃত্য করিতেছিলেন—এ সকল কথা কল্‌হন বলা প্রয়োজন মনে করেন নাই কিন্তু আজ আমরা ভারতের প্রাচীন কথা সব ভুলিতে বসিয়াছি। তাই আমাদের পক্ষে ঐ দুইটী প্রশ্ন করা স্বাভাবিক। দেবায়তনে নৃত্য করা আমাদের দেশের চিরন্তন রীতি ছিল। বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, যাহারা দেবোদ্দেশে নৃত্য করে, তাহারা সংসার সাগর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করে। আমাদেরই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরমভক্ত গোপালভট্ট বাঙ্গলার বৈষ্ণবদিগের জন্য যে "হরিভক্তিবিলাস" রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিয়াছেন

"নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশম্।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্ব্বেপাতকপক্ষিণঃ॥"

অর্থাৎ যাহারা শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখে তালসহকারে নৃত্য করে, তাহাদের শরীরস্থ সকল পাতক বিদূরিত হয়। কমলা দেখিতে কেমন ছিলেন তাহা আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিব—

"নৃত্যনালমরূপেন সিদ্ধির্নাট্যস্য রূপতঃ।
চার্ব্বধিষ্টানবন্নৃত্যং নৃত্যমন্যদ্বিড়ম্বনা॥"

অর্থাৎ যাহার রূপ নাই—তাহার নৃত্য নৃত্যই নহে। সুন্দর যাহাদের রূপ তাহাদের নৃত্যই যথার্থ নৃত্য। অন্যের নৃত্য করা বিড়ম্বনা মাত্র।

তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে কমলা সুন্দরী ছিলেন। কমলার যেমন ছিল দৈহিক সৌন্দর্য্য, তেমনি ছিল বুদ্ধির প্রাখর্য্য। একজন অপরূপ সুন্দর যুবক তন্ময় হইয়া তাহার নৃত্য দেখিতেছে—ইহা লক্ষ্য করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কমলা বিজয়িনী হইয়া আনন্দে আরও নৃত্য করিতে লাগিলেন। আবার জয়াপীড়ের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি দেখিলেন যে তিনি বারবার কি জন্য যেন পিছনদিকে হাত বাড়াইয়া দিতেছেন। কমলা রাজসভায় প্রতিপালিতা—রাজাদের আচার ব্যবহার তিনি ভাল রকমই জানেন। তিনি বুঝিলেন যে উনি কোন রাজকুমার হইবেন উঁহার তাম্বুল করঙ্কধারিণী সর্ব্বদা উঁহার পশ্চাতে থাকিয়া পান জোগাইয়া থাকে। তাই অভ্যাসবশে উনি ঐরূপ পিছনদিকে হাত বাড়াইতেছেন।

কমলা তৎক্ষণাৎ তাঁহার একজন সহচরীকে রাজপুত্রকে পশ্চাৎ হইতে তাম্বূল দিতে আদেশ করিলেন। সহচরী যেই জয়াপীড়কে পান দিলেন—অমনি জয়াপীড়ের মনে হইল এখানে তাঁহাকে এমনভাবে শুশ্রূষা করে কে? তিনি তৎক্ষণাৎ সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কে তাহাকে ঐরূপভাবে পান দিতে আদেশ করিয়াছে? সহচরী কমলার নাম করিল। জয়াপীড় কমলার রূপ ও নৃত্য দেখিয়া আগেই মোহিত হইয়াছিলেন—এখন তাহার বুদ্ধি দেখিয়া তাহার সহিত পরিচয় করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। সহচরী তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কমলার গৃহে লইয়া যাইলেন। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কমলাও নৃত্য সারিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

তারপর স্বর্গে অর্জ্জুন ও উর্ব্বশীতে যে ব্যাপার হইয়াছিল, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে কমলার আবাসে গভীর নিশীতে তাহারই পুনরভিনয় হইল। জয়াপীড় অর্জ্জুনেরই ন্যায় সত্যসঙ্কল্প, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ পুরুষ। তিনি কমলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখন তো তাঁহার বিলাসের সময় নহে। পতিতা নারীর পবিত্র প্রেম আমাদের ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিছক কল্পনা নহে। "দেবদাসের" চন্দ্রমুখী চরিত্রে তিনি যাহা অঙ্কন করিয়াছেন, কমলার জীবনে ঠিক তাহাই হইল। কমলা জয়াপীড়ের ভালবাসা পাইয়াই তৃপ্ত—সে আর কোন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি চাহে না।

তখন জয়াপীড় কমলার বাটীতেই থাকিলেন। ইতিমধ্যে কমলার অনুরোধে এক দুর্দ্দান্ত সিংহ বধ করিয়া, তাঁহার খ্যাতি রাজার কানে পৌছিল। তিনি রাজকন্যা কল্যানীকে জয়াপীড়ের হাতে সমর্পণ করিলেন। জয়াপীড় জয়ন্তকে গৌড়দেশের একচ্ছত্র নৃপতি করিবার জন্য আর চারিজন নৃপতিকে পরাস্ত করিলেন। জয়ন্ত পাঁচজন নরপতির উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। তাহার পর কান্যকুব্জের রাজাকে জয় করিয়া জয়াপীড় দেশে ফিরিলেন। তাঁহার সহিত আসিলেন রাজকুমারী কল্যাণী, আর নর্ত্তকী কমলা। জয়াপীড় অনায়াসে কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন।

জয়াপীড় নিজে মল্হানপুর নামে একটী নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। কল্যাণীদেবী কল্যাণপুর ও কমলা "কমলা" নামে নগর স্থাপন করিলেন। রাজার স্থাপিত "মল্হানপুরের" সন্ধান প্রাত্নতাত্ত্বিকেরা পাইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলার প্রসিদ্ধা নর্ত্তকী কমলার স্থাপিত কমলাপুরী কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কমলা নর্ত্তকী হইয়াও, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছেন। তাহাতেই মনে হয় যে সেকালে নর্ত্তকীরাও দেশের ও দশের কাছে সম্মান পাইতেন।

কল্হনের বাংলার নৃত্যকলা সম্বন্ধে প্রশংসা যে নিছক কল্পনা নহে—তাহা আমরা ধোয়ী কবির "পবনদূত" পড়িয়া জানিতে পারি। "গীতগোবিন্দের" অমরকবি জয়দেব এই ধাবক কবির নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ধোয়ী রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। তিনি তাঁহার "পবনদূত" লক্ষ্মনসেনের রাজধানী "বিজয়পুরের" বর্ণনায় বলিয়াছেন যে নগরের রাজপথে নৃত্যপরা নর্ত্তকীর নূপুর নিক্কণ শুনা যাইত। বাংলাদেশে তখনও প্রাণ ছিল।

আগামীবারে আমরা মুসলমান ও ব্রিটিশযুগের বাংলার নৃত্যকলা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

বঙ্গবীর *

[শ্রীদেবেন্দ্রমোহন লাহিড়ী এম-এ]

বাংলা দেশের পরে
য়্যুনিভার্সিটী বরে
দেখিতে দেখিতে গোলামী মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিছে বীর—
চঞ্চল অস্থির!
হাজার কণ্ঠে গোলামীর জয়
ধ্বনিছে তুলিয়া শির!
নূতন জাগিয়া বীর
নূতন আশায় কেরাণী পেশায়
বহে আনন্দ নীর।

"ইওর অনার স্তার"—
মহারবে ছোটে কাছা কোঁচা এঁটে
কেরাণীরা চারিধার;
সাহেব সকাশে ঘন উল্লাসে
আসে যায় বারবার।
বাংলা আজিকে গরজি উঠিল
"ইওর অনার স্তার!"

এসেছে আজি সে দিন
লক্ষ পরাণে সাহেব সদনে
ভিক্ষা মাগিছে দীন;
যশ ও অর্থ মান ও স্বাস্থ্য
চিত্ত গোলামী লীন;
বঙ্গ মাতার ঘিরি চারিধার
এসেছে আজি সে দিন।

আফিস সৌধ কূটে
হোথায় কাদের বড় সাহেবের
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে,
কাদের কণ্ঠে গগন মন্দ্রে
আফিস বুঝি বা টুটে।
কাহাদের গোলে সাহেবের ভালে
ভ্রূকুটী উঠিছে ফুটে!

সারাটা আফিস ঘিরে
যত ক্ষুধাতুর ক্ষিপ্ত কুকুর
মুক্ত হইল কিরে?
লক্ষ লোকের ভীড়ে
সারাটী দুপুর লড়িয়া প্রচুর
ফিরে গেল নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
গোলামী তিলক ললাটে পরাল
সারাটী বাংলা ঘিরে।

সেদিন কঠিণ রণে
গোলামী আলিঙ্গনে
সবুট পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
সাহেবের শ্রীচরণে।
গর্ব্বোদ্ধত মত্ত হস্তী
চাহে পিপীলিকা পানে।
সেদিন কঠিণ রণে
"হুজুরের জয়" বীরবর কয়
সকরুণ নিঃস্বনে;
রক্ত বদনে নেটিভ সদনে
"ড্যাম্ ড্যাম্" গরজনে।

---

* কবিবর রবীন্দ্রনাথের "বন্দীবীর" অনুকরণে।

দশটা বাজিলে পরে
কেরাণী বাবুর মাথার ভিতরে
টনক উঠিল নড়ে।
চুম্বক গত লোহের মত
টানি লয়ে গেল ধরে
আফিসের সেই ঘরে।
কেরাণী বাবুর টনক নড়িল
দশটা বাজিলে পরে।

রাজপথে চলে কেরাণী সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধুলি ;
ছিন্ন ছাতাটী মুণ্ডে লইয়া
কাঁধের উপরে তুলি,
গাড়ী ট্রাম শতে আসে পশ্চাতে
বাজায়ে ঘণ্টাগুলি
বীর গরজয় "হুজুরের জয়"
পরাণের ভয় ভুলি।
কেরাণী বাবুরা উড়াল বুঝিবা
নগর পথের ধুলি।

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি
কে করিবে সহি হাজিরার বহি
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে সাঁঝে শেষ করি কাজে
কেরাণীরা সারি স
ছাতিতে নথিতে পুরিয়া বগল
ফিরে গেল নিজ বাড়ী।

মাস গেলে পরে ফাইল্ হাজারে
নিঃশেষ হয়ে গেলে
কেরাণীর হাতে চাপরাশী এসে
মাহিয়ানা দিল ফেলে ;
কহিল,—"বাবুজী তলব্ আপকো"
অতিশয় অবহেলে,
দিল তার হাতে ফেলে—

এক আনা কম তিরিশ মুদ্রা
নোটে ও টাকায় মিলে।"

কিছু না কহিল বাণী,
বীরবর ধীরে টাকা কয়টীরে
লইল পকেটে টানি,
ক্ষণকাল তরে মাথার উপরে
রাখি দক্ষিণ পাণি
শুধু একবার চিন্তিল কার
ক্ষুধিত বদন খানি।
তারপর ধীরে পকেট হইতে
মুদ্রা খসায়ে আনি—
মুদ্রার দিক চাহি
কি জানি কি ভাবি উঠিল গরজি
"আর কোন ভয় নাহি।"

মলিন বদনে অভয় কিরণ
জলি উঠে উৎসাহি'—
শুষ্ক কণ্ঠে কাঁপে "রেস্ কোর্স্"
বীরবর উঠে গাহি—
"এবার সঠিক নির্ঘাৎ টিপ্"—
অশ্বের মুখ চাহি।

মুদ্রা যখন খসিল অনেক
ঘোড়দৌড়ের ফলে—
দক্ষিণ কর নিজের বক্ষে
হানিল আপন বলে—
শুষ্ক অধর ধীরে বীরবর
বসিল ধরণী তলে।
"রেস্ কোর্স্" নিস্তব্ধ।
ফিরে গেছে লোক ; জলিছে আলোক
রজনী হয়েছে অর্দ্ধ।
বাংলার বীর ফিরিল, করিয়া
একটী কাতর শব্দ।
দর্শকজন ফিরিছে কখন
"রেস্ কোর্স্" নিস্তব্ধ।

বাংলার মেয়ে

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

...লতা যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বিধাতাপুরুষ তাহার ললাটে লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে দুইটী ভগিনী, তাহাদের পরে এক ভাই; মা বাপ আশা করিয়াছিলেন এবারেও তাঁহাদের একটী পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।

সূতিকাগারে লতা ভূমিষ্ঠ হইতেই তাহার ক্রন্দনে পূর্ণশেখর বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সন্তান হল দাই"

মনটা আশায় পূর্ণ, নিশ্চয়ই পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে কন্যা কিছুতেই নয়।

দাই উত্তর দিল—ছেলে।

এদেশে একটা সংস্কার আছে সূতিকাগারে জননীকে প্রথমে শুনাইতে নাই কি সন্তান হইল, পুত্রকে কন্যা এবং কন্যাকে পুত্র নামে অভিহিত করা হয়। উচ্চাশায় মনটা তখন মুগ্ধ, তাই পূর্ণশেখর সহজেই ধরিয়া লইলেন ছেলেই হইয়াছে, আনন্দে উৎফুল্ল পিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধীকে ডাকিয়া বলিলেন "ওরে শাঁখটা বাজিয়ে দে, বাজিয়ে দে, তোদের ভাই হয়েছে।"

শাঁখও বাজিল, উলুও পড়িল, অবশেষে প্রকাশ পাইল ছেলে নয়, মেয়ে। বিশ্বের অন্ধকার পূর্ণশেখরের মুখে ঘনাইয়া আসিল, গর্জ্জন করিতে করিতে তিনি চলিয়া গেলেন; এ গর্জ্জন দাইয়ের উপরে নয়, কন্যার উপর এবং তাহার মাতার উপর।

প্রাপ্তির আশায় ছাই পড়িয়া গেল, দাই তথাপি নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিল।

মুহ্যমানা জননী এতক্ষণ পড়িয়াছিলেন, স্বামীর গর্জ্জনে তন্দ্রালু ভাবটা দূর হইয়া গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে দাই, ছেলে না...?"

দাই উত্তর দিল "না, মেয়ে।"

"আ মর, আবার মেয়ে।"

জননী মুখখানা আচ্ছাদন করিলেন।

সেদিনটা যেমন তেমন করিয়া কাটিয়া গেল, পরদিন দাই যখন তাঁহার কোলে মেয়ে দিয়ে গেল, তিনি মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন "ওখানে শুইয়ে ফেলে রাখ, আর কোলে নিতে হবে না।"

বিস্মিতা দাই বলিল "সে কি কথা গো? সন্তান কোলে করবে না, দুধ দেবে না?"

মা উত্তর দিলেন "মেয়েকে আর বুকের রক্ত খাওয়াতে হবে না। ওটা জন্মাল কেন, মরুক এখন, আমার বালাই যাক।"

এমন আশ্চর্য্য কথা দাই কখনও শুনে নাই, মা যে এমন কথা মুখে আনিতে পারে তাহা একেবারে ধারণারও অতীত। সে বিস্ফারিত চোখে মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল, একটা কথাও সে আর বলিতে পারিল না।

মেয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, পিতা বাহির হইতে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন "ওটার গলা টিপে মেরে ফেল না কেন, চীৎকারে প্রাণ যায় যে।"

মা চোখের জল ফেলিয়া কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইলেন তাহার মুখে স্তন দিলেন, শিশু চক্ষু মুদিয়া মহা আরামে স্তন্যপান করিতে লাগিল। তাহাকে লইয়াই যে সংসারে একটা মহাপ্রলয় সূচনা হইতেছে তাহা সে একটুও জানিতে পারে নাই।

ধীরে ধীরে সে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পিতার দারুণ ঘৃণা, মায়ের অবহেলা সব সহিয়াও সে বাড়িতে লাগিল। বড় ভাই সুরেন—তার অত্যাচারই কি কম ছিল? সে তিনটী বোনের উপর অবাধ প্রভুত্ব চালাইত, মারিয়া ধরিয়া একাকার করিত, বোনেদের সে সব নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হইত, নহিলে উপায় কি? বাপ মায়ের আদরের ছেলে সে, সে যাহা করিবে তাহাই শোভা পায়। ঘরের জিনিষ

পত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সে একাকার করে, বাপ তাহা আদরের দৃষ্টিতে দেখেন, মা তাহা সম্পূর্ণ অবহেলার চোখে দেখিয়া উড়াইয়া দেন।

বড় দুইটী বোন বুঝিয়াছিল তাই তাহারা তেমনি সংযত ভাবেই থাকিত, লতা বুঝিত না তাই সে সমান আবদার করিত, ঝগড়া করিত, মারামারি করিত। ইহাতে শেষে শাস্তি পাইতে হইত তাহাতেই সুরেনের জয় সর্ব্বত্র।

এমনি করিয়া ধীরে ধীরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল।

(২)

দুই বোনেরই বিবাহ হইয়া গেল, তাহারা শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল, পিতা দুই আপদের শান্তি করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। এখন কোনও ক্রমে ছোটটাকে পার করিতে পারিলেই তিনি বাঁচিয়া যান।

এই সময়ে লতার আবার একটী ভাই ভূমিষ্ঠ হইল। সে আনন্দ দেখে কে? পিতার মুখ দীপ্ত, মায়ের মুখে হাসি, লতা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল। ইদানিং সে যেন ছেলে মেয়ের পার্থক্য কতকটা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিল। বাপের কাছে কখনও সে একটা ভাল কথা পায় নাই, মায়ের কাছে ও প্রায় তাই, কিন্তু সুতেনের বেলা বা খোকার বেলা তো তা নয়। রাগ করিয়া সে যদি একদিন না খায়,ঠকে সেই-ই কারণ পিতা মাতা কেহই বলেন না ভাত খা; কিন্তু সুতেন যদি একটু রাগ করে, পিতা মাতার সে কি ব্যস্ততা।

সে আরও লক্ষ্য করিল অসুখের সময় সে একটীবার ঔষধ পায় নাই, যন্ত্রণায় কাঁদিতে গিয়া পিতার তর্জ্জন গর্জ্জনে মুখের মধ্যে অঞ্চল পুরিয়া দিয়া কোনও ক্রমে আর্ত্তস্বরটাকে সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মায়ের কাছে মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতে গিয়াছে, মা তীব্রকণ্ঠে বলিয়াছেন "অসুখ হলে অমনিই হয়ে থাকে, তার জন্যে বুড়োমেয়ের কান্না কোনও ক্রমেই মানায় না।"

কিন্তু সুতেনের যদি একটু মাথা ধরে, সে আলাদা।—সে যে ছেলে, তাহার জন্য পিতা মাতা কতদূর ব্যস্ত, কতদূর উৎকণ্ঠিত।

খোকার সে বার একদিন একটু গা গরম হইয়াছিল, মা সারারাত কোলে করিয়া বসিয়া, পিতা সারারাত ঘুমান নাই।

ক্ষুদ্র বালিকার ও অভিমান হয়। মা যে কথায় কথায় তীব্র বিষ বর্ষণ করেন তাহা আসিয়া তাহার বক্ষ ও দীর্ণ করিয়া যায়।

সে দিন খোকার জন্য দুধ আনিতে গিয়া বাটীটা অত্যন্ত গরম হইয়া গিয়াছিল, ভাল করিয়া সে বাটীটা ধরিতে পারে নাই, কাজেই হাত গরম লাগিতেই বাটী পড়িয়া গেল, দুধ পড়িয়া গড়াইল।

বাটী গড়ার শব্দেই মা কতকটা বুঝিয়া ছিলেন ব্যাপারটা কি ঘটিয়া গেল, তথাপি তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞানিত ভাবেই ডাকিতে লাগিলেন "লতি, দুধ আনছিস নাকি? খোকা যে এদিকে কেঁদে যায়।"

পিতা গৃহ হইতে বলিলেন "করছে কি?"

মা অবহেলার স্বরে বলিলেন "আবার কি করছে, রান্না ঘরে দুধ আন্‌তে গিয়ে কি খেলা পেয়েছে, মেয়ে তাই নিয়ে ভুলে গেছে, আর কি?"

ঘটাঘট—ঘটাঘট, খড়মের শব্দ হইতে লাগিল, লতা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। যমের চেয়ে ও সে তাহার পিতাকে বেশী ভয় করিত। আজ এই মুহূর্ত্তে ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি ভয়াবহ কোনও জীব যদি তাহাকে মুখ ব্যাদান করিয়া ভক্ষণ করিতে আসিত, তাহা হইলে ও সে এত ভয় পাইত না।

পূর্ণশেখর দরজার উপর হইতে মুখ বাড়াইয়া ব্যাপারটা দেখিয়াই চিৎকার করিয়া বলিলেন "ওগো, শীগগির একবার এসো, দেখে যাও তোমার আদরের মেয়ের কাণ্ডটা। আঃ হতভাগী, একবাটী দুধ ফেলে মরেছিস?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রহার।

নীরবে পড়িয়া সে প্রহার সহ্য করিতে লাগিল। কাঁদিবার সাধ্য কি তাহার, কাঁদিলে আরও প্রহার সহ্য করিতে হইবে, মেয়ে প্রহার সহ্য করিবে নীরবে, একটী শব্দ তাহার মুখে ফুটিবে না।

ব্যাপারটা কি ঘটিয়াছে দেখিবার জন্য জননী ছুটিয়া আসিলেন, এতখানি দুধ নষ্ট করা দেখিয়া তিনি ও জলিয়া গেলেন বেশ হয়েছে, আরও মারা উচিৎ। আস্কারা পেয়ে মেয়ে

খিঙ্গী হয়ে উঠেছেন, হাত পা সব অসাড় হয়ে গেছে। ছুদিন বাদেই যে বিয়ে দিতে হবে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে না, ঘর করতে হবে না ? এমনি অপ্‌চ তো তাদের ঘরে ও করবে, তখন তারা গালাগালি করবে তো আমাদেরই ; বলবে এমন ছোটলোকের ঘরের মেয়ে ও এনেছি, কাজ করতে জানে না, একখানা করতে গিয়ে আর একখানা করে বসে! আ মর হস্যি আবার তবু তাকিয়ে আছে। মার ঝাঁটা মুখে, সাতঝাঁটা মারি। এখন ছেলেটা খায় কি ?”

এই দারুণ প্রহারের পর সে একটু শান্তির প্রত্যাশা করিয়াছিল, মায়ের কাছে গিয়া বেদনা জুড়াইবে ভাবিয়া ছিল, কিন্তু মিথ্যা তাহার আশা।

এমনি করিয়া মারিয়া, পীড়ন করিয়া তাহাকে ভাবি শ্বশুর গৃহের উপযোগী করিয়া তৈয়ারী করা হইতেছিল, শ্বশুর বাড়ী সে কি বড় কম কথা বাঙ্গালায় শ্বশুর ঘর সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে ভেদ নাই।

লতা যতই বড় হইতে লাগিল, সাংসারিক অভিজ্ঞতা ততই তাহার বাড়িতেছিল। তাহার বড় দুটি বোন বিবাহের পরে সেই যে শ্বশুরালয়ে গিয়াছে, পিতা মাতা আর তাহাদের আনিবার নামও করেন নাই, দেখিয়া শুনিয়া লতা ও মনে ঠিক জানিয়াছিল বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও এ বাড়ী হইতে সকল সম্পর্ক উঠিয়া যাইবে। গভীর আবেগে সে তখন খোকাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিত, কাহারও অভাব তাহার মনে ব্যথা দিতে সে পারিলেও খোকার অভাব যে ব্যথা দিবে, সে বিষয়ে তাহার অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এমনি করিয়া একদিন তাহার বাঞ্ছিত বিবাহের দিনটী আসিয়া পড়িল।

সত্য কথা এ—বড় লাঞ্ছিতা বড় পীড়িতা হইয়া ভবিষ্যৎ কল্পনা করিত, শ্বশুরালয়ের কথা ভাবিয়া সে মনে একটু শান্তি পাইত।

চিরটাকাল ঝাঁটা লাথি খাইয়া দিন যাইতেছে, সেখানেও যে খাইতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। তাহার দিদিরা বাঁচিয়াছে, সে ও বাঁচিবে।

কিন্তু সে তো জানে না বাংলায় মেয়ে হইয়া জন্মানই মহাপাপ ; বরং পিত্রালয়ে তবু যেটুকু স্বাধীনতা আছে, শ্বশুরালয়ে তাহাও নাই।

আর এ তো শুধু তাহার একার অদৃষ্ট নয়, বাংলার মেয়ে মাত্রই এই এক অবস্থার অন্তর্ভুক্ত, তাই মেয়ে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেরই মুখটা অন্ধকার হইয়া যায়। মুখে যে কিছু প্রকাশ না করে, তাহার অন্তরেও ধ্বনিত হয়—আঃ ছেলে নয়, মেয়ে ?

এ যে বাংলার মেয়ের অদৃষ্টে বিধাতার অভিশাপ, পদে পদে তাহাকে লাঞ্ছিতা অপমানিতা হইতেই হইবে। তাহার বেদনা শেষ হইতে পারে না, তাহার মান অপমান জ্ঞান থাকিতে পারে না, সে গাধার মত সব সহ্য করিয়া যাইবে, সে মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলিতে পারিবে না।

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, যেখানে যাও, অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যাইবেই, এটা লতাতেই প্রত্যক্ষমান হইয়াছিল।

স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি প্রভৃতির চিন্তায় সে যে মনটাকে শান্তিরসে অভিষিক্ত করিয়াছিল, সে ভুল দু দিনে ভাঙ্গিয়া গেল, সে দীপ্ত নেত্রে চাহিয়া দেখিল জগতে তাহার ব্যথার ব্যথী কেহ নাই। এ জগতে যে পিতামাতার স্নেহ পাইল না, আর কে তাহাকে স্নেহ করিবে, কাহার নিকট সে স্নেহ পাইবার আশা করিতে পারে ?

এত দিন তবু একটা আশা ছিল, ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া বর্ত্তমানের ব্যথা কষ্ট ভুলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু শেষটায় আর তাহার কিছু রহিল না। নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় যথার্থ ই সে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল “আমায় একেবারেই ব্যর্থ করে দিলে প্রভু, আমার জীবনে একটুও সার্থকতা দিলে না ?

বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল, সে মৃত্যুকে কায়মনে ডাকিতে লাগিল। স্বামী ঘোর মদ্যপায়ী, দুশ্চরিত্র, স্ত্রীকে সে কঠোর শাসনেই রাখিতে চায়, এতটুকু তাহাকে আলগা করিয়া দিতে নাই, এই তাহার বিশ্বাস, এবং সে প্রাণপণে নিজের মতানুসারেই চলিত। এমন দিন যাইত না লতা যে দিন প্রহারে জর্জ্জরিতা না হইত।

শাশুড়ী অত্যন্ত কটুভাষিনী, কার্য্যে সামান্ত একটু ত্রুটী ঘটিলে তিনিও পুত্রবধূকে প্রহার করিতে নিরতা থাকিতেন না; সময় সময় একদিন দুইদিন আহার বন্ধও ক'রিয়া দিতেন।

লতার মনটা আজকাল অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল। মায়ের কাছে থাকিতে যদিও সে এমনি প্রহার উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে, মা কোনও দিন খাইতে না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। যদিও দিন রাত তাহাকে দাঁতের উপর দিয়া রাখিতেন তথাপি স্নেহ ছিল; স্নেহ নাই এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

এই প্রহার উৎপীড়নের মধ্যে তাই মায়ের কথাই লতার মনে জাগিয়া উঠিত, ছোট ভাইটীর হাসিমাখা মুখখানা, আধ আধ দিদি সম্বোধন মনে পড়িত, লতা অধীর হইয়া উঠিত।

সামান্ত সামান্ত ত্রুটি ধরিয়া এত লাঞ্ছনা অবমাননা সে সহ্য করিয়া যাইত, একটা কথাও সে বলিত না, কিন্তু কথাতেই আছে, গর্ত্তের সাপকে খুঁচাইতে গেলে সে ফণা ধরিয়া কামড়াইতে আসে; অপরাধে বিনা অপরাধে লাঞ্ছনা প্রহারে ক্রমে লতাও উত্তর করিতে শিখিল।

সে দিন শাশুড়ী সামান্ত একটা ছল ধরিয়া প্রথমটায় তাহাকে খুবই গালাগালি করিলেন, উত্তরে সেও গোটাকত শুনাইয়া দিল। বর্দ্ধিতরোষা শাশুড়ি নিজে যতদূর পারিলেন প্রহার করিলেন এবং শেষে শাসাইয়া রাখিলেন, পুত্র আসিলে ইহার যথোপযুক্ত সাজা প্রদান করিবেন।

অশ্রুমুখী লতা রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলিল "আর কি বেশী সাজা দেওয়াবেন মা, সাজা দেওয়ার কম আপনি কিছু করেছেন যে আর ভয় দেখাচ্ছেন? আপনার ছেলেও এসে দুই ঘা মারবে, এই বই আর তো কিছুই নয়। কোন্‌দিন মার থেকে বঞ্চিতা হই মা, আমার গায়ের কোন জায়গাটা আর বাকি আছে মারের দাগ যেখানে নেই।"

বধূর উত্তরে শাশুড়ি অত্যন্ত রাগত হইলেন, কিন্তু তখনকার মত তাহাকে কিছু বলিলেন না।

রাত্রে মাতাল শ্রীপতি টলিতে টলিতে বাড়ী আসিবামাত্র মা সাশ্রু নয়নে বধূর কথা সব জানাইলেন।

শ্রীপতিও তো ইহাই চায়। সে স্ত্রীর চুল ধরিয়া উঠানে টানিয়া আনিয়া পদাঘাতে চড়ে কীলে জর্জ্জরিত করিল, শেষে টানিতে টানিতে সেই রাত্রে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া উঠানের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

নির্জ্জীব লতা পড়িয়া রহিল। এত প্রহার সে নীরবে সহ্য করিল, ক্রন্দনের ক্ষমতা আর তাহার ছিল না। এক ফোঁটা জলও তাহার নয়ন হইতে পড়িল না, তাহার বুকের অশ্রু-নির্ঝর শুখাইয়া গিয়াছিল।

চারিদিক নিস্তব্ধ, বাড়ীর আলোগুলি সব নিভিয়া গেল, কোথাও একটী আলো নাই, চারিদিক অন্ধকার। নিশীথ-নক্ষত্রগুলি শুধু ঝিকিমিকি করিয়া জ্বলিতেছিল, নৈশবায়ু ঝর ঝর করিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

ভগবান—আর্ত্তকণ্ঠে অভাগিনী কিশোরী ডাকিল প্রভু— দেখছ কি? আমার সকল আশ্রয় ঘুচালে নাথ, এখন আমি যাই কোথায়? আমার বুক দগ্ধই করলে, একটু সান্ত্বনা দেবার মত কিছুই রাখলে না প্রভু!"

(৪)

পিত্রালয়ের দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া সে বসিয়া পড়িল। এতক্ষণ তাহার এ ভাবনা ছিল না এখানে তাহার স্থান হইবে কি না, এইবার তাহার এ ভাবনা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এখন আর ফিরিবার যো কই, বেদনায় সে নড়িতে পারিতেছে না, যে কষ্টে সে এতখানি পথ কাল রাত্রি হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে—তাহা সে-ই জানে।

আর ফিরিয়াই বা যাইবে কোথায়, এই আশ্রয় ছাড়া আর কোথায় তাহার আশ্রয় আছে? শ্বশুরালয়ে—প্রাণ থাকিতে সে সেখানে আর যাইবে না।

ভিতরে নৃপেন খেলা করিতেছিল। দেড় বৎসর পরে লতা আজ তাহাকে দেখিতে পাইল; অতৃপ্ত নয়নে সে দেখিতে লাগিল। এই দেড় বৎসরে নৃপেন অনেকটা বড় হইয়াছে, ভাল করিয়া কথাও বলিতে শিখিয়াছে।

খেলা করিতে করিতে এক সময় বাহিরে আসিয়াই সে লতাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পরই— দিদি বলিয়া সে লতার ক্রোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বড় যাতনায় শান্তিলতা ছোট ভাইটীকে বুকের মধ্যে টানিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ভুলতে পারিস নি ভাই, এখনও তোর দিদিকে মনে আছে?"

উভয়ের কথা শুনিতে পাইয়া মা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—একি লতা ?

লতা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "হ্যাঁ মা, আমি।"

"তুই কি করে এলি ?"

লতা উত্তর দিল না, মাথা নত করিয়া রহিল। মা এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন—বাড়ী আয়, তারপর সব শুনব এখন।

মায়ের পিছনে পিছনে লতা ভিতরে প্রবেশ করিল।

পিতা গৃহমধ্য হইতে কন্যাকে দেখিতে পাইয়া দারুণ বিরক্তিতে অধর দংশন করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন "তুই আবার কোথা থেকে এলি ?"

লতার বুক কাঁপিতেছিল,কম্পিতকণ্ঠে বলিল"চলে এসেছি।"

"চলে এসেচিস," পিতা গর্জ্জিয়া উঠিলেন "তারা পাঠায় নি তোকে ?"

লতা ভাইকে কোলে লইয়া বসিয়া পড়িল, উত্তর দিতে পারিল না।

অধিকতর চেঁচাইয়া পিতা বলিলেন "কেন চলে এলি তার উত্তর দে। শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে আসা অমনি মুখের কথা কিনা, যে চলে আসব বললেই অমনি চলে এল ?"

অশ্রুপূর্ণ দুটি চোখ পিতার মুখের উপর স্থাপন করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে লতা বলিল "তোমার জামাই আমায় খুব মেরে বাড়ীর বার করে দিয়েছে বাবা,তাই আমি রাত্রে চলে এসেছি।"

বিদ্রূপের সুরে পিতা বলিয়া উঠিলেন "এখানে আশ্রয় পাবি, আমায় কৃতার্থ করে দিবি বলে তাই এসেছিস নয় ? দূর হ এখুনি, শ্বশুর বাড়ী হতে যে মেয়ে পালিয়ে এসেছে তাকে আমি জায়গা দিয়ে রাখব না।"

বাবা—"লতা পিতার পায়ের তলায় আছড়াইয়া পড়িল তবে আমি কোথায় যাব ?"

মুখ বিকৃত করিয়া পিতা বলিলেন "সেখানেই তোকে ফিরে যেতে হবে, যে কালামুখ নিয়ে চলে এসেছিস সেই কালামুখ আবার তাদের দেখাতে হবে। ওঠ বলছি,দূরহ এখনি।

লতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল "বাবা, আমার সারা গা দেখ, তারপর সেখানে যেতে বল। তোমার পায়ে পড়ি বাবা,আমায় এখানে পড়ে থাকতে দাও, আমি নৃপেনের ঝি হয়ে থাকব।"

তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচাইয়া উঠিয়া পিতা বলিলেন "হবে না, হবে না, শ্বশুরবাড়ী হতে পালিয়ে আসা মেয়েকে আমি আশ্রয় দিতে পারব না। এখনই বেরো বলছি লতা, একমুহূর্ত্ত আমার বাড়ীতে থাকতে দেব না।"

"মাগো"—লতা উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, মাতৃহৃদয় আর সহ্য করিতে পারিল না, রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "আহা, কেন ওকে তাড়াচ্ছ ? তোমার পায় পড়ি, এমন করে শিয়াল কুকুরের মতন তোমার মেয়েকে তাড়িয়ো না। সত্যি দেখ দেখি ওর গা-টা, কি দাগ পড়েছে আহা—"

গর্জ্জিয়া উঠিয়া পিতা বলিলেন "যাও-যাও, তোমায় আর মায়া দেখাতে হবে না। ওই মেয়েকে আদর করে আমার মত না নিয়ে বাড়ীর মধ্যে আনা হয়েছে। কে আমার মেয়ে ? শ্বশুরবাড়ী হতে রাতের অন্ধকারে যে পালায়, সে আমার মেয়ে নয়। বদমায়েসী করে, কাজেই মার খায়। হিন্দুর ঘরের মেয়ের এটাত নতুন কথা নয়। স্বামী দেবতা, দেবতার হাতে যদি মরতে পারে, ইহজগতেও একটা নাম, পরজগতেও পুণ্য। পালানো হয়েছে, সইতে পারেন না ? দূর হ—দূর হ !

"ভগবান—"

লতা যে মুখে আসিল, সেই মুখে ফিরিল।

সমস্ত জগতের উপর তাহার দারুণ বিদ্বেষ চাপিয়া গিয়াছিল। প্রথমে সে মরিবে বলিয়াই ঠিক করিল,ডুবিবে বলিয়া পুষ্করিণীর ধারে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেন সে মরিবে ? স্বামী তাহাকে তাড়াইয়াছে, পিতা তাহাকে তাড়াইয়াছেন, তাই সে মরিবে !

যাক সমস্ত যাক, সে কাহাকে ডাকিতেছে ভগবানকে ? ভগবান কি যথার্থ আছেন ? না, তিনি নাই, যদি থাকিতেন তবে লতার জীবন এত দুঃসহ কেন ? লতা ধর্ম্মপথে থাকিয়া ভগবানকে ডাকিয়া একটু সুখ লাভ করিল না, তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল।

সয়তানের প্রবঞ্চনায় লতা ভুলিল, সে মরিল না, সে বাঁচিল, কিন্তু সে বাঁচার চেয়ে মরণই তার ভাল ছিল বোধ হয়। জানি না পরবর্ত্তী জীবনে সে তাহার জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছিল কিনা, কারণ আর কখনও তাহার সহিত আমার দেখা হয় নাই।

অশুভ যোগ

[শ্রীসত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

একদিন আমি বাবার কাছে বসে আছি। বাবা ছেলেদের কতকগুলো পরীক্ষার কাগজ দেখিতেছেন। এমন সময় মা আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিলেন। বাবা তাঁকে দেখিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন "কি খবর গো!"

"খবর একই! মেয়ের দিকে দেখ দেখি। তার পানে ত আর চাওয়া যায় না গো। তার বিয়ের যা হয় একটা ব্যবস্থা দেখ।"

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বল্লেন "আমার অমু মাকে তা হলে এবার সত্যিই পর করে দিতে হচ্ছে?"

মা যেন একটু রাগত ভাবে বল্লেন "না ঐ রকম করে তোমার কোলের কাছে বসিয়ে রাখ্‌তে হবে।"

বাবা বেগতিক দেখে আমার বিবাহের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া স্কুলের বেলার অছিলায় উঠিয়া পড়িলেন।

(২)

তারপর একদিন সকাল বেলায় হঠাৎ একটু বিশেষ রকমের রান্নার আয়োজন হইতে লাগিল। পরম্পর শুনিলাম যে আমাকে দেখিতে আসিবেন। ইঁহারা নাকি কোন গ্রামের মস্ত বড় জমিদার। ইঁহারা টাকা চান না—কেবল মেয়ে পছন্দ হইলেই হইল। আমি যে দেখিতে খুব খারাপ ছিলাম তাহা নহে। বরং পাড়া প্রতিবেশীরা আমার নাম দিয়াছিল "সুন্দরী অমু"। সেই জন্যই বোধ হয় বাবা সাহস করিয়া ইহাদিগকে আনিতে পারিয়াছিলেন। শুনিলাম পাত্র নিজে দেখিতে আসিবেন। পাত্রের নাম "অনিলকুমার।"

তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ার পর আমার ডাক পড়িল। তাঁহারা বলিয়া দিয়াছিলেন যে মেয়েকে যেন সাজান না হয়। সাধারণ অবস্থায় দেখিতে চান। তথাপিও মা আমাকে যথাসম্ভব সাজাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ডাক পড়ায় বাবা আমাকে ধীরে ধীরে লইয়া গেলেন। আমার অবস্থা তখন শারদীয়া পূজার অষ্টমী তিথির ছাগবৎসের ন্যায়। কারণ কি—তাহাও কি আর বলিতে হইবে! যাহা হউক কোনও রকমে গিয়া আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া নতমুখে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে কি-জানি-কেন আমার মন যেন কাহাকে দেখিবার জন্য একবার মুখ তুলিয়া চাহিল। চাহিবামাত্র এক সুন্দর দিব্যকান্তিসম্পন্ন যুবার সহিত চারিচক্ষের মিলন হইল। আমরা উভয়েই যেন থতমত হইয়া মুখ নীচু করিলাম। বুঝিলাম ইনিই অনিলকুমার।

তাঁহারা চলিয়া যাইবার সময় আমার কোষ্ঠী চাহিলেন। এবং বলিলেন যে যদি কোষ্ঠী মিল হয় তবে আর তাঁহাদের কোনও অমত নাই।

আমাদের সকলেরই যেন বিশ্বাস হইয়া গেল যে ওখানেই বিবাহ ঠিক হইবে।

(৩)

আমি মায়ের কাছে বসিয়া কি একটা সেলাইয়ের কাজ করিতেছি। কিন্তু মন আমার সেলাইয়ে ছিল না। আমি আনমনে সেই চারিচক্ষের মিলন ভাবিতেছি। আর যেন আমার মনে হইতেছে যে সেই আমাদের শুভদৃষ্টি। এইরকম আরো কত কি ভাবিতেছি এমন সময় বাবা বিষণ্ণ-বদনে ঘরে ঢুকিয়া একখানা চিঠি মায়ের কোলের দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "এই নাও—তাঁরা লিখেছেন যে কোষ্ঠী মিল হয় নি, সুতরাং তাঁহারা বিয়ে দিতে পারেন না।" কথাটা শুনিবামাত্র যেন আমার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রহিত হইয়া আসিতে লাগিল। যাহাকে আমি একদিন মনে মনে আমার স্বামীত্বে বরণ করিয়াছি তাহার সঙ্গে কেবল ঐ পোড়া কোষ্ঠীর জন্য আমার বিবাহ হওয়া অসম্ভব? মনে মনে শাস্ত্রকারদিগকে অযথা গালি দিতে লাগিলাম। কারণ তখন উহা ভিন্ন আর আমার দ্বিতীয় কোনও সম্বল ছিলনা। আমি অন্তঃঘরে উঠিয়া গেলাম; মনে মনে রাগে ক্ষোভে ফুপিয়া ফুপিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

(৪)

সেদিন ২০শে বৈশাখ। সকাল বেলা হইতেই আমাদের বাড়ীতে নহবত বসিয়াছে। সকলেই ব্যস্ত। কেবল আমি ঘরের এককোণে বসিয়া কত কথাই ভাবিতেছিলাম। কেবল কোষ্ঠীর মিল হইল না বলিয়াই আজ আমাকে এক দরিদ্রের গলে বরমাল্য দিতে হইবে। কি করিব—ইহাই সমাজ-বাঁধন। ওগো তোমরা এই পোড়া হিন্দু সমাজকে একবার বুঝাইয়া দাওনা গো, যে হিন্দু কন্যাদেরও একটা নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে। তাহাদিগকে তোমরা নির্ম্মমের মত হাতে পায়ে বাঁধিয়া যাহার তাহার ঘাড়ে অমন করিয়া ফেলিয়া দিও না। পোড়া বাঙ্গালা দেশে এই কথাগুলা শুনাইয়া দেয়, এমন লোক কি কেহ নাই? কিন্তু কে আমার কথা শুনিবে। রাগে ক্ষোভে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কারণ তখন কান্নাই কেবল আমার সম্বল। আপনমনে এইরূপ কতকথাই ভাবিতেছি এমন সময় হঠাৎ বাবার টেবিলের ওপর একখানা লালরংএর কাগজে ছাপা চিঠির উপর আমার নজর পড়িল। তুলিয়া লইয়া দেখিলাম যে ওপাড়ার মুখুজ্যেরা তাহাদের কন্যা সুধারাণীর সহিত অনিল-কুমারের বিবাহের জন্য বাবাকে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিন্তু একি! সেইদিনই আমাদেরই গ্রামে অনিলকুমারের বিবাহ—তাও আবার আমারই বাল্যসখী সুধারাণীর সঙ্গে। আমি যেন সত্যসত্যই পাগলের মত হইয়া গেলাম। তখনি-তখনি সুধারাণীরউপর যেন আমার একটা আক্রোশ দাঁড়াইয়া গেল। কিন্তু আমি যে নিরুপায়। চোখে জল আসিল।

নিয়মিত সময়ে আমাকে ছাদনাতলায় লইয়া যাওয়া হইল। সাতপাক ঘুরাইবার পর শাস্ত্রানুসারে শুভদৃষ্টি হইল। তিনি বোধহয় আমাকে শুভদৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমার মনের ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল—আমি বোধহয় তাঁহাকে তখন শুভদৃষ্টিতে দেখিতে পারি নাই।

(৫)

শুভকার্য্য সমাধার পর প্রথামত কান্নার রোলের মধ্য দিয়া আমি শ্বশুর বাড়ী চলিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া বসিয়া আছি এমন সময়ে আরও দুইটা বরক'নে ষ্টেশনে আসিল। দেখি—এ যে সেই অনিলকুমার সুধারাণীকে লইয়া ষ্টেশনে আসিল। সারা বুক ভাঙ্গিয়া যেন আমার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

ট্রেণ আসিল—আমরা একটী ইণ্টার ক্লাস গাড়ীতে উঠিলাম। মুখ বাড়াইয়া অনিলকুমারেরা একটী সেকেণ্ড বা ফার্ষ্ট ক্লাস গাড়ীতে উঠিল।

ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া হু হু শব্দে চলিয়াছে আর আমি গাড়ীর এক কোণে ক্ষুণ্ণ মনে ঈর্ষার বিষে জ্বলিতেছি। হঠাৎ একটা বিকট রকমের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ীগুলা ভয়ঙ্কর রকম নাড়া পাইল। আমি উণ্টাইয়া আমার স্বামীর কোলে পড়িয়া গেলাম। তারপর আর কি হইল, জানি-না; পরে জানা গেল যে কোনও ষ্টেশনে ঢুকিবার সময় পয়েণ্ট ভুল থাকায় একটী দণ্ডায়মান মালগাড়ীর সঙ্গে আমাদের গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়াছে। তাহাতে ইঞ্জিন ও সামনের ২খানা গাড়ী মায় সেকেণ্ড ও ফার্ষ্ট ক্লাস উণ্টাইয়া গিয়াছে। আমরা সকলেই ষ্টেশনে নামিয়া গেলাম। গিয়া দেখি কতকগুলি লোক আহত ও হত অবস্থায় পড়িয়া আছে। একি? ওধারে শুইয়া রহিয়াছে ও কে? চার পাঁচজন লোক ওর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছে কে ও? অনিলকুমার কি? সেই ত! শুনিলাম সে মৃত। তাহার পাশে পতিসোহাগিনী সুধারাণীও মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ভয়ে আমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; আমি আমার স্বামীকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিলাম। তিনি আমার দিকে সান্ত্বনাসূচক দৃষ্টিতে তাকাইলেন। আমাদের চারি চক্ষের মিলন হইল। এই বুঝি আমাদের প্রকৃত শুভদৃষ্টি হইল। যে শাস্ত্রকারদিগকে একদিন পোড়া কোষ্ঠীর অমিলের জন্য গালাগাল দিয়াছিলাম সেই শাস্ত্রকারদিগকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। একটা সন্দেহ আমার আজও ঘুচিল না যে সুধারাণীর সঙ্গে উঁহার কোষ্ঠির যোগ হইয়াছিল যদি, অশুভ-যোগ তবে কেন ঘটিল? তবে কি কোষ্টি কিছু না? শাস্ত্র সেও কি তাই? এ প্রশ্নের মীমাংসা আছে কি?

আহুতি

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

(৮)

মালতীর মনখানি আবার অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল, একদিন অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে, নিজেরই মনের মধ্যে যাহার মীমাংসা হইয়াছিল, আজ যেন ততটা সহজে আর সে কথাটা ভাবা চলে না,—মনের সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া কতদিন আর চলে ? এই যে মত এবং মনের অহর্নিশ এই প্রবল সংঘর্ষণ, তাহাতে মালতী অন্তরে বাহিরে একটা নৈরাশ্যের বেদনায় পীড়িত হইতে লাগিল। মন যদি বা তাহার আশৈশবের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতে চায়, মতটা তাহাকে মাতা মাতামহীদের চিরপ্রচলিত কথা স্মরণ করাইয়া দেয়,—আশ্চর্য্য, কথকতাতে সেদিন পুরুতঠাকুর এ কি কতগুলো কথা বলিয়া গেলেন, যার জন্য মনের ভিতরটায় এমনি করিয়া, সমস্ত-কিছুই এলোমেলো হইয়া গেল ?

মা মহাভারত রামায়ণ পড়িতে উপদেশ দিয়াছিলেন, -কিন্তু কই, ক-বার, কত-বার ত সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা দময়ন্তীর জীবনী পড়া হইয়া গেল,—কিন্তু আশ্বাস মিলিল কই ?—মহাকবিরা মহাকাব্যই লিখিয়া গিয়াছেন সত্য,—চরিত্রগুলিতে ঘটনা-বৈচিত্র্যেরও অভাব নাই, ঠিক,—কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া ত সেই একই ধারায় সকলে চলিয়াছেন, জ্ঞানসঞ্চারের পর বিবাহের বন্ধন দিয়া যে আকর্ষণ শত প্রতিকূল ঘটনা সত্ত্বেও নারীর মন হইতে তাহার উচ্ছেদ করা চলে না,—যেখানে ভালবাসা আত্মোৎসর্গ সেখানে ত স্বাভাবিক,—নারীর জীবনে যাহা কিছু সহজ সত্য,—ইহাদের জীবনে তাহাই ঘটিয়াছিল,—তথাপি যুগধর্ম্মের মাহাত্ম্যে যে সব অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি ইঁহারা করিয়াছিলেন, কলি-যুগের নারী তাহা পা.রবে না বলিয়াই তুচ্ছ হইবে কেন ?—যাক্, সে কথা কিন্তু এই একই নিয়মের ভিতর দিয়াই ত যুগে যুগে নারীর মাহাত্ম্যবর্ণন চলিয়াছে,—এই মহাকবিদের রচনাই যদি সংসারের মানুষের জীবন পরিচালনের মন্ত্র হয়, তবে সে রচনায় তাঁহাদের এতভ্রম হইয়াছিল কেন ?—বইগুলি ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া, এমন একটা লাইনও মালতীর চোখে পড়িল না,—এ ছন্নছাড়া জীবনটা তার, যাতে উপদেশ পাইয়া বাঁচিয়া যায়! এই একই নিয়মে তাহার জীবনও ত চলিতে পারিত,—চলিতে ত ছিলই—কিন্তু, কে জানিত, যে তাহার এই অজ্ঞাত কুৎসিত জীবনটা একটা কালো পাহাড়ের ন্যায় আসিয়া সম্মুখে তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইবে ? জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মনের গোপন মন্দিরে যে নির্দ্দোষ আরাধনা তাহার ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, তাহাই হইল আজ তাহার মিথ্যা,—হায় রাধাবল্লভ, যে সত্য তাহার চির অজানিত, মহান্ধকারে আবৃত, আজ তাহাই কি তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে ?—অসম্ভব, অসম্ভব—মনের এ বন্দী অবস্থা আমরণ ধরিয়া কিছুতেই সে সহিবে না,—কিছুতেই না!

কোটি কোটি,—কোটি কোটিবার নমস্কার এই মহাঋষি এবং তাঁদের সৃষ্ট এ মহাকাব্যগুলির পায়ে,—চিরকাল ভক্তি-প্রীতির পূত পুষ্পাঞ্জলী দিয়া মালতী মাথায় রাখিয়া এই সতী দেবীদের পূজা করিবে—কিন্তু, যুগযুগান্ত ধরিয়া একই নিয়ম কখনও কি জগতে সম্ভব হয় ? আর এ যে ভুল পথ তাই বা কে বলিবে ? জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহাকে অন্তরের মধ্যে জানিয়াছিলাম, তাঁহার কাছে ত অপরাধী হই নাই,—সেই আমার সত্য সেই আমার ন্যায়—সেই আমার সব, স-ব!

মুদ্রিত চক্ষু হইতে মালতীর ঝর ঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল,—কোথায় তুমি কোথা-য় তুমি, প্রিয় আমার, দেবতা আমার, আজ এ সমুদয় চিত্তখানি যে তোমারই পায়ে লুটাইয়া পড়িতেছে,—আমার এ নীরব ধ্যান অত দূরে থাকিয়াও তুমি বুঝিবে কি ?

সংসারে পাওয়াটাই কি সব চেয়ে বড় ? আমায় তুমি চাহিয়াছিলে, কিন্তু এ সংসারের যে মিলন - সে মিলন এ পৃথিবীতে আমাদের হবে না, জানি,—না-ই বা হইল!

(৯)

"ওগো মাসী মা, কর্ত্তাবাবু যে দিদিমণিকে একবার নিয়ে যেতে বলেছে গো। আজ একবার যেয়ো।"

অন্নপূর্ণাদেবী সবিস্ময়ে বলিলেন—কেন রে বিন্দি ?"

"তাত জানিনে মাসীমা, কে জানে, কিছু বলবে বুঝি।"

সারাটা দিন অন্নপূর্ণাদেবীর উদ্বেগের সীমা রহিল না; নলিনের পিতা মালতীকে ডাকিয়াছেন,—কেন ? সেই সব সম্বন্ধে কিছু বলিবেন না-কি ? মালতী নিজেই মনে যথেষ্ট বেদনা পাইতেছে, আবার সে সব কথা তুলিয়া তাহাকে কেন তিরস্কার করা ? দোষ ত তাঁহারই ছেলের, মালতীর কি ?

তাঁহার মন কঠিন হইয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন, 'যাব না ত, আমি কক্কনো মেয়ে নিয়ে, ভারী সব হুকুম।' কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মনে আবার কি হইল, কৌতুহলী হইয়া ভাবিলেন, 'যাই, দেখাই যাক্ না—কি বলে।"

অন্ধকারে সমস্তখানি গ্রাম ঢাকিয়া গিয়াছে। মাতা

কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "চল্ ত মালতী, তোর মেসো-মশাই বুঝি ডেকেছেন, শুনে আসিগে।"

"কেন, মা ?"

"তা ত জানিনে মা, চল্, গায়ে একটা চাদর দিয়ে নে।"

গাছপালার সারির ভিতর দিয়া পল্লীগ্রামের অপরিসর ক্ষুদ্র পথে মাতা ও কন্যা ধীরে ধীরে চলিলেন, আগে আগে চাকর আলো হাতে নিয়া চলিল। লজ্জায় সঙ্কোচে মালতীর আড়ষ্ট পা দুখানি যেন আর চলি ত চাহিতেছিল না, কেমন করিয়া সে মেসোমশাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইবে, কে জানে তিনি কি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন !

জমিদার বাবু অন্দরের পেছন দিকে প্রশস্ত বারান্দায় একখানি ইজি চেয়ারে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিলেন, সম্মুখে পুকুরের জলে অন্ধকার আকাশের তারাগুলি জল্ জল্ করিয়া উঠিতেছিল, পুকুরের একধারে একটা হাস্নাহানার গাছ,—কিছু দূরে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ উঁচু মাথা তুলিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পিসিমা মালতীকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল, জমিদার বা্বু পদশব্দে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন এবং প্রণতা মালতীর দিকে সস্নেহ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া তাহাকে বসিতে বলিয়া আবার চক্ষু মুদিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। মালতী নতনেত্রে একটা জলচৌকীর উপর বসিয়া রহিল ! বহুক্ষণ পরে বুকের ভিতরের প্রবল ঝড় অতি সাবধানে সামলাইয়া লইয়া জমিদার বাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং মালতীর দিকে চাহিয়া নিকটে সরিয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। মালতী কাছে আসিলে, তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন—

"মালতী, ভাল আছ ত মা ? তোমার মাও ভাল আছেন ?"

"হ্যাঁ,"—

"বেশ। আজকাল সারাদিন কি কর, পড়াশুনা কিছু কর কি ?"

"কই, বিশেষ কিছু না।"

জমিদার বাবু খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "মালতী, তোমার বাবাকে মনে পড়ে ?"

"পড়ে,—"

"তিনি যাবার সময় আমায় বলে গেছলেন,—'মালতীর ভালমন্দের ভার তুমি নিজহাতে নিও।' তাঁর সঙ্গে আমার কতখানি বন্ধুতা ছিল, তা তুমি জান বোধ হয়।"

"হ্যাঁ, শুনেছি।"

"ছেলেবেলায় আমরা প্রায় এক সঙ্গেই থাকতুম, তারপর বড় হয়ে তিনি বিদেশে চলে গেলেন, তাঁর ধর্ম্মমতেরও একটু একটু পরিবর্ত্তন হ'ল। তা তাতেও তিনি আমায় কখনো ভোলেন নি, তাঁর শেষ সময়েও তাঁর মেয়ের সুখ দুঃখের ভার আমারই উপর দিয়ে গেলেন।"

মালতী নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল,—মেসোমহাশয় যে কি কথা বলিবার জন্য এত পুরাণো কথার পত্তন করিতেছেন, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

"আমি ভাবতুম তোমরা বেশ আছ, তোমার মাসীমার কাছেই তোমাদের খোঁজ খবর আমি সর্ব্বদাই পেতুম, তাই নিজে আর বড় একটা তোমাদের ওখানে যেতুম না, যাক্ সে সব। কিন্তু আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয়, তোমার বাবা থাকলে তোমার সম্বন্ধে একটু অন্য বন্দোবস্ত করতেন বোধ হয়, তাই আমি একটা কথা ভাবচি।"

মালতী সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিল, জমিদার বাবু আবার বলিলেন, "আমি যা ভাবচি তা কর্ত্তে গেলে তোমায় এবং তোমার মাকেও বোধ হয় একটু কষ্ট সইতে হবে, কিন্তু তাতে তো'র মঙ্গল বই অমঙ্গল কখনো হবে না। মা, জান ত, সব কাজেই মানুষকে ত্যাগ স্বীকার কর্ত্তে হয়, তার জন্যে অনেক সময় লোকের নিন্দা এমন কি সব দিকেই ঢের কষ্ট সইতে হয় ! সে সব যে কাটিয়ে উঠতে পারে, ভবিষ্যতে সেই সুখ পায়। আমি ভাবচি, তোমায় কলকাতায় কোন একটা মেয়েদের বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়। অবিশ্যি তোমার মা বোধ হয় প্রথমে মত দেবেন না, তোমারও শুনে হয় ত ভাল লাগবে না, কিন্তু বোধ হয় তাতেই তোমার সব চেয়ে ভাল হবে। ভেবে দেখ, মা কিছু তোমার কাছে চিরদিনই থাকবেন না, তখন পাড়াগাঁয়ে একলাটি তুমি কি করে থাকবে ? তারচেয়ে ইস্কুলে গিয়ে যদি লেখাপড়া শেখ, এবং পরে নিজের যা দরকার নিজেই তা উপার্জ্জন করে নিতে পার, তবে তোমার আর ভাবনা কি ? ভাল লেখাপড়া শিখে কোন একটা বোর্ডিংয়ে চাকরী নিয়ে থাকলে, এক মুঠো ভাতের জন্যে কিম্বা একটুখানি দাঁড়াবার জায়গার জন্যে কারোও কাছে তোমায় সাহায্য চাইতে হবে না, নিজের ইচ্ছে মত দিব্যি স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে। তোমার বাবারও তোমায় পড়াবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বড্ড শীঘ্র তাঁকে চলে যেতে হ'ল কি না, সে ইচ্ছে তাঁর আর পূর্ণ হ'ল না। যাক্, সে জন্য আর দুঃখ করে ত কিছু লাভ নেই, বরং তাঁর ইচ্ছে তোমায় পূর্ণ কর্ত্তে দেখেই তিনি স্বর্গ থেকে কত সুখ পাবেন।"

মালতী বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল,—এ কি অসম্ভব কথা, বোর্ডিংয়ে যাইবে সে ! দুঃখিনী বিধবা মাতার একমাত্র কন্যা, মাতা যাহাকে দিবারাত্রি চোখে-চোখে রাখিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তাহাকেই বোর্ডিংয়ে পাঠাইবেন তিনি ! তাহার জন্য জমিদার বাবুর এই ব্যর্থ ব্যস্ততায় তাহার চোখ দুটী ছল ছল করিয়া উঠিল, সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তেমনি নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। জমিদার বাবু তাহাকে চিন্তা করিবার অবসর দিয়া চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন,

মালতী তাহা বুঝিতে পারিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা, মাকে সব বলবো!"

জমিদার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "মাকেত অবিশ্যিই বলবে, কিন্তু তোমার ইচ্ছেটা কি তাই যে আগে শোনা দরকার মালতী।"

মালতী মেসোমহাশয়ের মন-যোগান কথাই বলিয়া ফেলিল, "সে আমি বেশী কি বুঝি। আপনারা ভাল বুঝে যা করবেন, তা-ই আমার ভাল।"

মেসোমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তবে তাই ভাল, তোমার মা এসেছেন ত? চল একবার তাঁর কাছে যাই।"

* * * *

ইহার পর দিন সাতেক মার ভাবিতে ভাবিতেই সময় গেল, তাঁহার জীবনে এযে এক মহাপ্রশ্ন সমাধানের সময় আসিয়াছে, এক মুহূর্ত্তে বা একদিনে ইহার কি হইতে পারে? সমাজ এবং তাহার প্রাচীন সংসারকে তিনি চিরকালই বিদেশের শিক্ষায় অনেকদিকেই তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আজিকার এ প্রশ্ন ত এত সহজ নয়!

মালতী এ কয়দিনে তাহার মন স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। মাতার আয়চারিদিকে এতসব ভাবিবার প্রয়োজন সে কখনো বোধ করে নাই, তাহার তরুণ হৃদয় একটা নতুন কিছুর আশায় পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু যে পড়াশুনা করিবারই উৎসাহ তাহা নয়, কিন্তু এতগুলি মেয়ের সঙ্গে একসঙ্গে থাকা, এবং ভবিষ্যতে একটা কিছু উচ্চপদ লাভের সম্ভাবনায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, আর কিছু না হোক, পাড়াগাঁয়ের এই একঘেয়ে নিরানন্দ জীবনটা কিছুদিনের জন্য দূর হইবে ত? সেই ভাল! এক ভাবনা—মা। মাকি কন্যাকে দূরে পাঠাইয়া তাঁহার এই বয়সে বেশীদিন সুস্থ থাকিতে পারিবেন! কিন্তু সে সম্বন্ধে মেসোমহাশয়ের অভয় বাণী তাহাকে নিরুদ্বিগ্ন করিয়া দিল, মালতী বোর্ডিংয়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। একদিন মালতী নিতান্ত ভয়ে এবং লজ্জায় ধীরে ধীরে বলিয়া ফেলিল, "মা কেন কিছু বলছো না, দাও না মা, একটীবার যেতে—"

মাতা সহসা অকারণেই ক্রুদ্ধ হইয়া কঠিনস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যাওনা, আমি কি বারণ করছি?"

মালতী নতমুখে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। এবং অন্ধকার ঘরে নিজের বিছানায় শুইয়া মার কথাগুলি ভাবিতে লাগিল। মা আজকাল যখন তখন অকারণেই কেবল রাগিয়া উঠেন, যেন এপর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, সে সবই তাহারই অপরাধ, তাহার এত রূপ—সে তাহারই দোষ, সে বিধবা সেও তাহারই দোষ, এবং সর্ব্বোপরি সে যে বাঁচিয়া আছে এবং দিবারাত্র মাতার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিলে তিলে বড় হইয়া উঠিতেছে—সে দোষও তাহারই। মালতী বুকে বেদনা অনুভব করিতে লাগিল এবং আপনা আপনি তার দুই গাল বাহিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মালতী ভাবিল,—বিনাকারণে মা আমার উপর এতদিন রাগ করিয়া আছেন, কিন্তু শুনিয়াছি দেবতার রাগ ত চিরদিন থাকে না। আজ ভাগ্যদোষে দেবতাও অসন্তুষ্ট আছেন বটে, তথাপি এ অসন্তোষ একদিন দূর হইবেই। মার বেদনার বোঝা এবং রাগ চিরদিনই থাকিবে না, কিন্তু আমি আপন চেষ্টায় সংসারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব এবং একদিন বড় হইয়া উঠিব।

এমন এক একটা ঘটনা মানুষের সম্মুখে মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহার মীমাংসা মানুষের শত চেষ্টার ফলেও কিছুতেই হইয়া উঠে না, কিন্তু ইহারই মধ্যে হয়ত নিতান্তই অতর্কিতে কোথা হইতে কেমন করিয়া আলোর রেখা ফুটাইয়া দিয়া সমস্ত বিষয়টা আপনা আপনিই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; মানুষ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মালতীর মাতারও তাহাই হইল। কন্যার সম্বন্ধে কোন কিছু ভাবিয়া যখন তিনি আর কোনদিকে কূল দেখিতেছিলেন না তখনই একদিন দেখিলেন তাঁহাদের সম্মুখের ঘোষেদের বাড়ীর বৈঠকখানায় অত্যন্ত জাঁক জমকের সহিত গ্রামের ছেলেদের অপেরা পার্টী বসিয়া গিয়াছে, সেদিন সমস্ত রাত্রি তাহাদের উচ্চহাসির এবং গানবাজনা ও নানারকমের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার ভয়ের আর অন্ত রহিল না, এবং প্রভাত হইতেই কন্যাকে জাগাইয়া তুলিয়া ভূমিকামাত্র না করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "মালতী, তোমার মেসোমশাইকে আজই একবার বলে এসো, বোর্ডিং সম্বন্ধে চিঠিপত্র লিখে সবই যেন ঠিক করে ফেলেন। দেরী করেত কিছু লাভ নেই, মা।"

মালতী সবিস্ময়ে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ইহার পর মালতীর বোর্ডিং যাত্রার আয়োজন এবং চিঠিপত্রে সেখানকার সমস্ত খোঁজ খবর চলিতে লাগিল। তাহার মন প্রথম কদিন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া মাকে ছাড়িয়া যাইবার দুঃখ পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে দিন যখন ক্রমেই আসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, মালতীর মনও তখন ক্রমেই দমিয়া পড়িতে লাগিল। মাতার মনেও বিচ্ছেদের আশঙ্কা ও বেদনা অল্প ছিলনা বটে, কিন্তু তিনি সে সমস্ত সবলে ঝাড়িয়া মুছিয়া স্থির হইয়া আপনি সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। মালতী তাঁহার অন্তর বুঝিল না কিন্তু বহুদিন পরে তাহার সহিত মাতার সহজ সরল ব্যবহার দেখিয়া এবং গম্ভীর প্রকৃতি মাতার মুখে প্রসন্ন মধুর হাসি দেখিয়া আপন অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

পরলোকগত রাজা বনবিহারী কপূর

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহাতাব বাহাদুরের জনক। বর্দ্ধমানের মুকুট-মণি রাজা বনবিহারী গতপূর্ব্ব মঙ্গলবার শেষরাত্রে, ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

অচেনা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৭ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [দ্বাত্রিংশ সপ্তাহ

বাঙ্গালীর ছেলে

(১)

ঘেটের বাছা !

"ঘেটের বাছা, ষষ্টির দাস !"

(২)

ভবিষ্য-গঠন

"বেটা গাধা, প[illegible]বোনী আন্‌বার বেলাই যত ভুল!"

(৩)

অগাধ জলের মাছ

(কত লোকের যে মজার আছে বলা দায়)

"একেই বলে বরাত বাবা! আমিও এপিয়ার হলুম আর আশুমুখুজ্জেও মারা গেলেন!"

(৪)

মা পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া বাঁচিলেন—(অর্থে, মরিলেন)

—"প্রিয়ে চারুশীলে"—

(৫)

পড়ে পড়ে পড়ে—
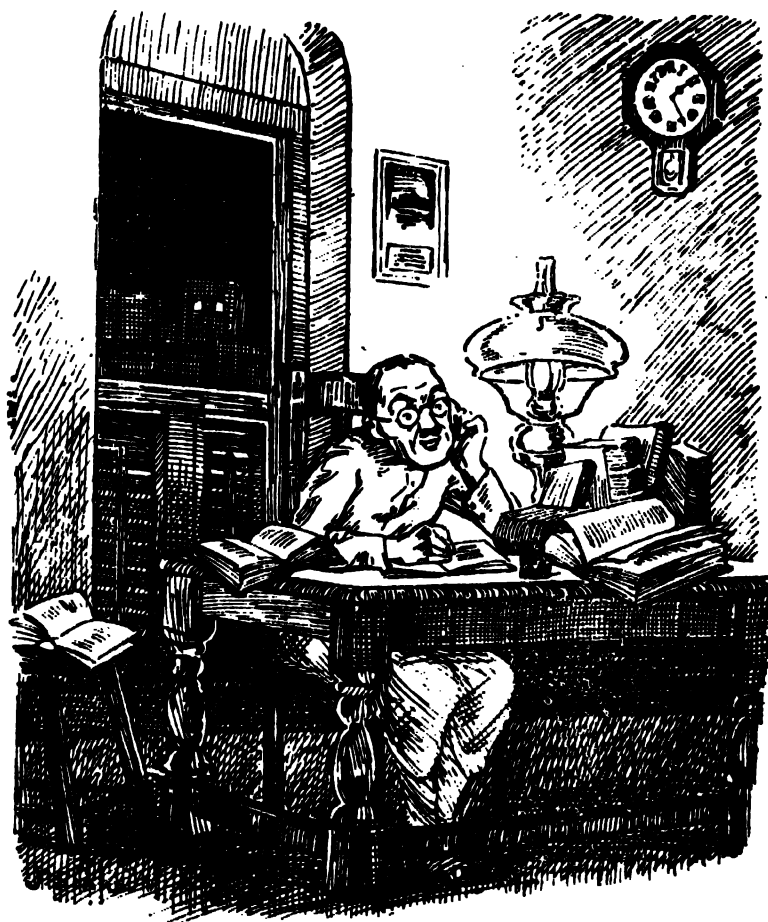
"কিস্কিন্ধ্যা—কলিকাতার রাজধানী!—উঃ নোট্ মুখস্থ করে করেই মারা পড়লুম!"

(৬)

পাশের উল্লাস
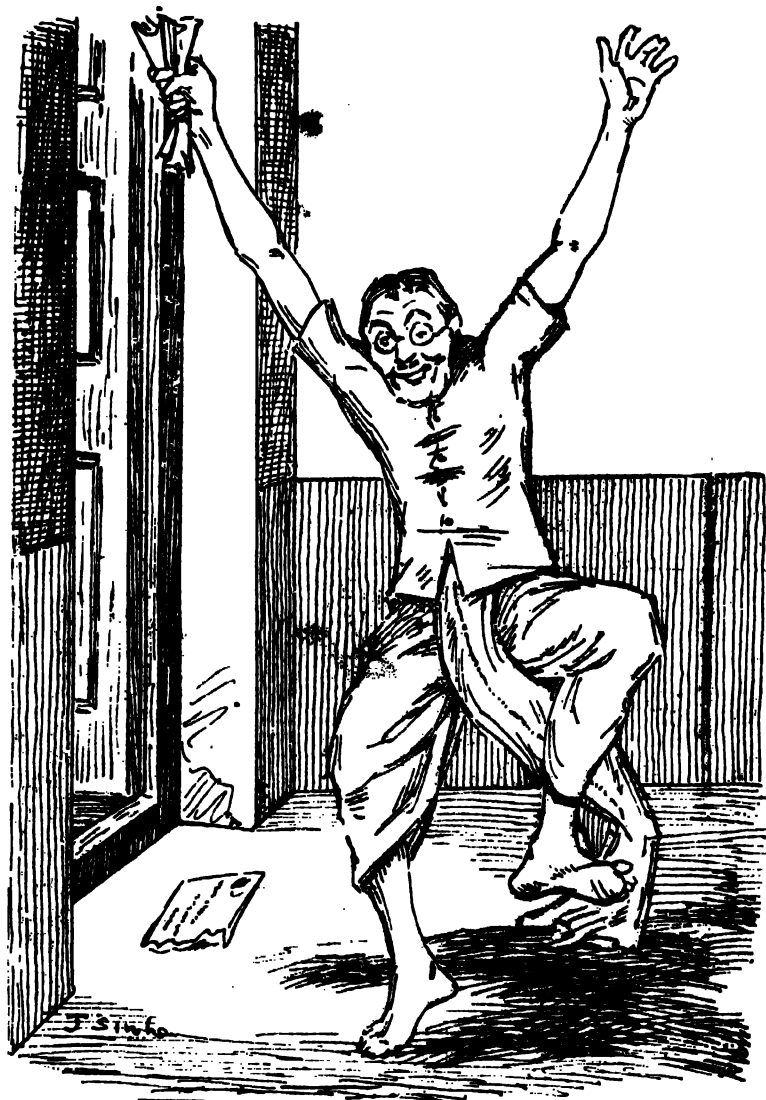
মার দিয়া! কেল্লা ফতে!

এক দরখাস্তে—পোর্ট কমিশনারের জেটি-সরকার!

তন্‌খা—৩০৲

(৭)

কামনার ধন

"প্রাণ আর বাঁচে কেমনে"—

(৮)

বাবা ষষ্ঠী

"গিন্নীকে বলি বাছা, ষষ্টিপূজোটা রেহাই কর"—

(৯)

পাওনাদার সম্মিলন

"হে মা ষষ্ঠি! তোমার ঠেলাতেই ত যত কাণ্ড বাবা! এর বেলায় একটু দয়া করবে না কি?"

(১০)

ফণ্ড-ফণ্ডানন্দ স্বামী
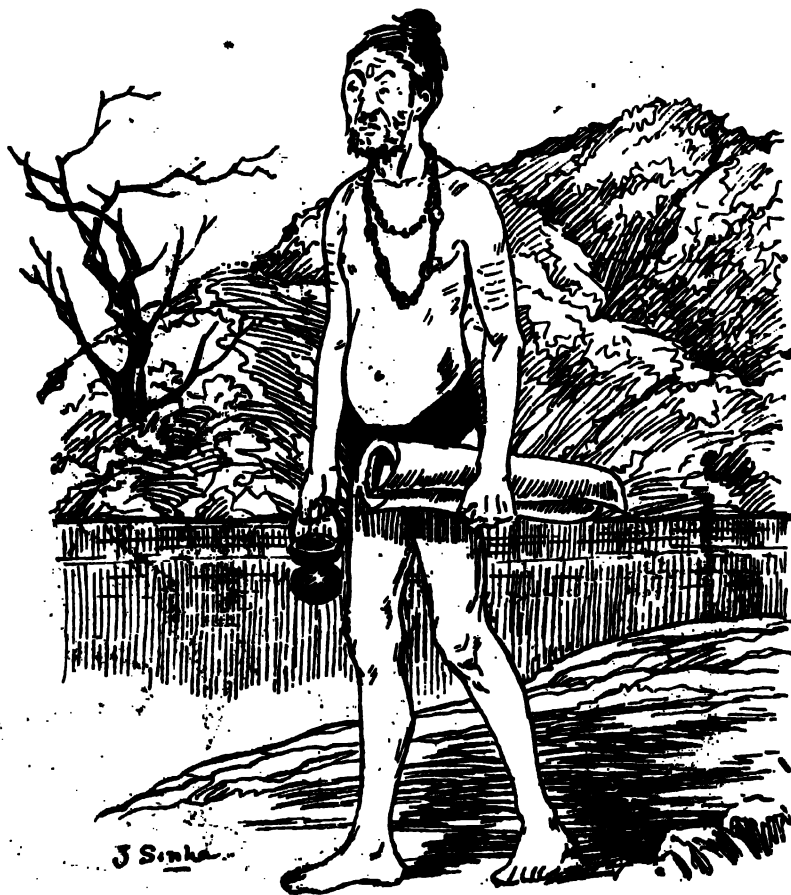
"করেছি সম্বল—লোটা ও কম্বল।"

বিধবা

শ্রীমতী স্নেহশীলা বসু।

(সচিত্র শিশির গল্প-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)

(১)

সুক্ষণে অথবা কুক্ষণে জানি না, দেখা হইয়াছিল।

উপন্যাস-হজম-করা মন, ধরিয়া লইল, ভালবাসা জন্মিয়াছে। নহিলে অতবার করিয়া চাহিয়াই বা সে দেখিবে কেন? অসুখ গায়ে বিছানা ছাড়িয়া দ্বারের আড়ালে আসিয়াই বা বসিবে কেন? তাহার মা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া যে সকল কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহা শুনিবার জন্যই ত সে বিছানা ছাড়িয়া আসিয়াছিল—অজিত বোকাও নয়, মূর্খও নয়, ঠিক বুঝিল, এতখানি আগ্রহ, আকুলতা অমনি-অমনি অকারণে হয় না।

সে এক বর্ষার পর শরতে অজিত তাহার জমিদারীর দেশে বেড়াইতে গিয়াছিল। শরতে পল্লী-শোভা দর্শনই ছিল তাহার ইচ্ছা। কিন্তু কর্দমাক্ত পল্লীপথ তাহার মনের বাসনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে দিল না। তখন সে নিজের গ্রামখানির ভিতরেই এক হাঁটু কাদা মাখিয়া, ইতর ভদ্র সকলের বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনই একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে বুড়া রাইমণির বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। রাইমণির মেয়ে কুঞ্জা ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিল; রাইমণি কপালে করাঘাত করিতে করিতে, জমিদারের কাছে যদি কোন ঔষধ থাকে, ভিক্ষা করিল। জমিদার নাড়ী টিপিয়া, জ্বরের ইতিহাস ও রোগিনীর ইতিহাস শুনিয়া লইয়া জিহ্বা পরীক্ষা করিতে চাহিল।

সেই দেখা।

পাড়াগাঁয়ে আসিতেছে বলিয়া একটা ছোট হোমিওপ্যাথিকের বাক্স অজিত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। দিন দুই তিন বাছিয়া বাছিয়া ভাল-ভাল ঔষধও দিল কিন্তু জ্বর বন্ধ হইল না। ইতিপূর্ব্বে অজিত শুনিয়াছিল, পাড়াগাঁয়ের লোক জ্বরেও ভোগে, ভাতও খায়, অত্যাচারও করে। একদিন রোগিনীর ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মেঝেময় মুড়ি ছড়াছড়ি। বুড়া বাড়ী ছিল না; রোগিনীকেই ভৎর্সনা করিয়া বলিল—নিশ্চয় তুমি জ্বরের ওপর মুড়ী খেয়েছ, রোজই খাও, তাই জ্বর ছাড়ছে না।"

লজ্জা সরম ছিল না,—কুঞ্জা হাসিয়া কহিল—ঘরে যদি গরুর দড়ী পড়ে থাক্‌তো, তা হ'লে কি খেয়েছি বল্‌তেন? সে ঘোম্‌টাটা বাড়াইয়া দিয়া জোরে হাসিয়া উঠিল। একটু পরে বলিল—দোহাই কবরেজ মশায়ের, দড়ী দেখেই পথ্যি ঠিক করবেন না। মাঠের কৃষাণকে মা মুড়ী দিয়েছে, তাই গোটাকতক মেঝের পড়েছে বোধ হয়।

কুঞ্জা যে দুর্ভাগা কবিরাজের গল্পটার ইঙ্গিত করিল, অজিত সে গল্পটা জানিত। এক হাতুড়ে কবিরাজ রোগী দেখিতে আসিয়া দেখে, ঘরময় কাঁচা আমের খোলা ছড়ান, রোগীই কুপথ্য করিয়াছিল, তাহাকে ধমক-ধামক দিল। আর একদিন দেখে একগাছা গরুর দড়া পড়িয়া। কবিরাজ মহাশয় দেখিয়াই হুতাশনবৎ জলিয়া উঠিলেন। অহিন্দু-খাদ্য-খাদক রোগীকে চিকিৎসা করিয়া জাতিধর্ম্ম হারাইতে প্রস্তুত নহেন; ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া ঘর ছাড়িয়া যান আর কি! তখন রোগীর আত্মীয় স্বজন সকলে বুঝাইল যে অহিন্দু খাদ্য খাওয়া হয় নাই; গরুটাকে মাঠে চরিতে দেওয়া হইয়াছে, রাখাল দড়াটা এইখানেই ফেলিয়া গিয়াছে। অতএব কবিরাজ মহাশয় নিশ্চিন্ত হৌন।

অজিত এই খোঁচা খাইয়া লজ্জাও পাইল; আনন্দও

হইল। পাড়াগাঁয়ের মেয়েগুলির সম্বন্ধে তার কেমন একটা বিকৃত ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। তাহাদের প্রাণ বলিয়া পদার্থটি যেন নাই-ই। ঘর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, জল তোলে, গরু বাঁধে,—সব সত্যি; কেবল এমন কিছুই করে না, যাহাতে তাহাদের জীবনীশক্তির কিছু পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাহারা পুরুষ দেখিলে পথ হইতে খানায় নামিয়া পড়ে; কথা কওয়া ত পাপ মনে করেই, ছাওয়া মাড়ানও অন্যায় বিবেচনা করে। অথচ নিজেদের ঘরে এমন গলা ছাড়িয়া এমন ঝগড়া করে যে তখন তাহাদের লজ্জা সরম কিঞ্চিৎ পরিমাণেও যে আছে এমন মনে করা দুরূহ হইয়া উঠে। এই মেয়েটা তাহার সে ধারণা বদলাইয়া দিল।

অজিত বলিল—তুমি যে আমাকে কবরেজ মশাই বলে ঠাট্টা করলে, জান, আমি কবিরাজ নই। আমি হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়েছিলুম তোমাকে। বিশ্বাস না থাকে, খেয়ো না।

কুজা গম্ভীরভাবে—বলিল—জ্বর না হলেই বিশ্বাস করতুম যে ওষুধ খেয়েছি।

ওষুধ খেলেই কি জ্বর বন্ধ হয়?

হুঁ। তা নইলে আর ওষুধ খাওয়া কেন? যে ওষুধে জ্বর বন্ধ হয় না, সে ওষুধ গঙ্গায় টান মেরে ফেলে দিলেই ত হয়।

অজিত কি বুঝিল কে জানে, জবাব দিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল : তোমাদের যা খুসী তাই করো গে, আমি জানিনে।

কুজা তাহাতেও দমিল না; বলিল—তাই করব।

পাঁচ সাত দিন পরে অজিত স্নান করিতে চলিয়াছে, দেখিল, কুজার মতই একটি মেয়ে কলসকক্ষে জল আনিতে চলিয়াছে। অজিত দ্রুত পা চালাইয়া তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইল। কুজাই বটে। কুজার পাতলা ঠোঁট দু'খানি পাণ দোক্তার-দৌলতে লাল। মুখখানি তৈলসিক্ত, চিক্কণ। দেহে স্বাস্থ্যের সর্ব্বলক্ষণ প্রকাশিত।

অজিত জিজ্ঞাসিল—ভাল আছ কুজা!

কুজা ঘাড় নাড়িয়া পথের ধারে সরিয়া গিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আজ আর সে প্রগল্‌ভা কুজা ছিল না। আজ সে পল্লী-বালাদেরই একজন।

তেমাথার মোড়ে আর একটি কৃষ্ণাঙ্গী বধূ দাঁড়াইয়াছিল, দু'জনে মিলিত হইতেই একটা হাসির রোল উত্থিত হইল। অজিত যথেষ্ট দূরে থাকিয়াও তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া, মরমে মরিয়া গেল। মনে হইল, তাহার সেই মুড়ী দেখিয়া পথ্য নির্ণয়ের গল্পটাই ইহাদের পরিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অজিত গঙ্গায় গলা ডুবাইয়া নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় ক্রমাগত ঢোঁক গিলিতে লাগিল।

কিন্তু ঘাট সেই একটি, তাহারাও সেই ঘাটে আসিয়া নামিল। অজিত মুখ ফিরাইয়া লইল। অজিত ডুব সাঁতার জানিত না, জানিলে ডুব দিত, অনেক দূরে গিয়া উঠিত। অজিত শুনিতে পাইল, ফিসফাস করিয়া ইহারা কি কথা কহিতেছে, পাছে সেগুলা স্পষ্ট শুনিতে হয় সে দুই হাতে খুব শব্দ করিয়া ডুব ফুঁড়িতে লাগিল। খানেক ডুব পাড়িয়া গামছাখানাকে কুণ্ডলী আকারে গঙ্গায় ফেলিয়া উঠিতে যাইতে, কুজা জলের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—বাবু, নন্দরাণীর ছেলেটি বড় ভুগছে, একবার দেখবেন কি?

অজিত এটাকেও পরিহাস ভাবিয়া লইয়া, গম্ভীরস্বরে বলিল—না।

কুজার মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। সে আর কিছু বলিল না। অজিত যথাসাধ্য আড়ষ্ট হইয়া জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিবার চেষ্টা করিলেও, চোখ দু'টা কুজাকে দেখিয়া লইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিল না। নীল জলের উপর যেন একটি রৌদ্র-ম্লান পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে গরীবের ঘরের কুজা এত সুন্দর! তাহার শ্যাম দেহে এত শোভা! অজিত এমন সুন্দর একখানা মুখ যে কল্পনাতেও দেখে নাই। কিন্তু বড় মলিন, বড় [illegible]

অজিত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিজের মনেই বলিল—আমাদের কাছারিতে আনলে ছেলেটিকে দেখতে পারি [illegible]

কুজা প্রসন্ন আননে চাহিয়া বলিল—তাই [illegible] বলব।

অজিত আর একবার চাহিয়া দেখিল—সুন্দর! সুন্দর!

কুজা তখনই ডুব দিয়া উঠিয়াছে; মাথায় ঘোমটা নাই

অজিত দেখিল তাহার চোখের পাতায় জল লাগিয়া টলমল করিতেছে, মুখখানি ভিজা-ভিজা, যেন বৃষ্টির জলে পদ্মটি ভিজিয়াছে। তবে একটা বড় খটকা লাগিয়া গেল, কুঞ্জার সীমন্ত সিন্দুর-রেখা-শূন্য কেন? সে কি অবিবাহিতা? এত বড় মেয়ে! আশ্চর্য্যই বা কি! বরপণ ত ইহাদের ঘরেও আছে।

অজিত ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।

(২)

নন্দরাণীরও ছেলে ভাল হইয়া গিয়াছে, গঙ্গায় জলে অত্যন্ত ঘোলা বাড়িয়াছে, কুঞ্জাকে আর দেখা যায় নাই। ছেলে-টাকে ক'দিন সে ও নন্দরাণী সঙ্গে করিয়া আনিত, ঔষধ লইয়া যাইত; মধ্যে মধ্যে গঙ্গার ঘাটেও দেখা হইত, এখন আর দেখা হয় না। অজিত একটু বিচলিত হইয়া পড়িতেছে। এবং মনকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছে যে বিচলিত হইবার একমাত্র কারণ, নূতনত্ব। পল্লী-জীবনের সহিত তাহার কখনই কোন পরিচয় ছিল না; এখানকার পুরুষরা তাহার সঙ্গে অবাধে আলাপ করিয়াছে কিন্তু এক কুঞ্জা ছাড়া কোন রমণীর সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য তাহার হয় নাই। তাই কুঞ্জাকে তাহার এত ভাল লাগিয়াছে।

মন কিন্তু অধিকদিন একথা মানিল না। মন তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, অন্য কারণ আছেই! অজিত সেই কারণের সন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন সে মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইল। মন বলিল—দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার খালি পায়ে, খালি গায়ে কুঞ্জাদের বাড়ীর সামনে দিয়া যাওয়া আসা করা, যেন সেই পথেই তাহার জমিদারীর যা কিছু কাজ সব পড়িয়া আছে, কেবলমাত্র 'নূতনত্বের বশে' নয়, দুরভিসন্ধিও কিছু আছে। অজিত সরোষে প্রশ্ন করিল—কি দুরভিসন্ধি? মন বলিল—গুপ্তপ্রণয়। গাঁয়ের লোকেও কথাটা লইয়া নাড়াছাড়া করিতেছে। সেদিন ত সুখারণ মালিক ও তিনচার জন লোক জিজ্ঞাসাই করিল—বাবু এ পথ দিয়ে কাদের বাড়ী যান? আগে একঘর কায়স্থের বাস ছিল, যেই পথটার শেষ প্রান্তে, অজিত্র তাহাদের মামা লইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল! কিন্তু বাপু, সে কথা বলিলে আর ত চলিবে না, সেই কায়স্থ পরিবারটি সম্প্রতি কাশী চলিয়া গিয়াছে। এখন কি অছিলায় ঐ পথে আনাগোনা করিবে? অজিত বলিল—করিব না। মন বলিল—পারিবে? অজিত বলিল—না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। মন ব্যঙ্গ করিল, দেখিলে ত, নূতনত্ব শুধু নয়, প্রেম, ভালবাসা, প্রণয়!—যাহাকে দুরভিসন্ধি বলে। অজিত জিজ্ঞাসিল—দুরভিসন্ধি কিসে? মন বলিল—ভিন্‌ভিন্ন বিয়ে ত পল্লীতে এখনও চলে নি; কুঞ্জা নাপিতের মেয়ে। অজিত ওষ্ঠ দংশন করিল; বলিল—তবে কি ভালবাসিব না? মন উত্তর দিল—না।

অজিত কলিকাতা চলিয়া গেল। পড়াশুনায় মন দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু হায়! সেই মুখখানি! সে যে ভুলিতে পারিতেছে না; চোখের পাতায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে; মনের ফাঁকে ফাঁকে ছাপা রহিয়া গিয়াছে। সেই মুখখানি!

অজিত পড়া-শুনা ফেলিয়া জমিদারী পরিদর্শনে চলিল। ছেলের মা এতদিনে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে চলিয়াছে জানিয়া ভগবানকে একান্ত মনে খুব ধন্যবাদ দিলেন, বিষয় আশয় ভালো এখন হইতেই অজিত দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিয়া-শুঝিয়া লয়, আখেরে ভালই হইবে। মা ছেলের সুবুদ্ধির প্রশংসা করিলেন।

ছেলে জমিদারী পরিদর্শনে গ্রামে আসিয়াই, সেই কায়স্থ পরিবারটি কাশী হইতে ফিরিলেন কি-না দেখিতে ছুটিলেন। হতভাগ্য কায়স্থ-পরিবার তখনও দেশে ফিরে নাই; ফিরিলে, তাহাদের জন্য জমিদারের এতখানি উৎকণ্ঠা দেখিলে নিশ্চয়ই সুখানুভব করিত। প্রথম দিন সে যখন তাহাদের সন্ধানে গিয়াছিল, কেহই তাহাকে দেখে নাই; অজিত দ্বিতীয় দিনেও তাহাদের আসা-না-আসার সংবাদ লইতে চলিল। ভাবিল, আজ যদি কেহ দেখে, বলিলেই হইবে, এদের সহর থেকে, এঁদের খোঁজটা একবার নিতে গেছলাম।

কুঞ্জা দাওয়ায় বসিয়া, ফিতাটা দাঁতে চাপিয়া আরসীর সামনে চুল বাঁধিতেছিল। অজিতকে দেখিয়াই লজ্জায় ফিতাটাকে ছাড়িয়া দিয়া কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল। অজিত এক মুহূর্ত্ত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর ডাকিল—তোমার মা কোথায় কুঞ্জা?

মা হাটে গেছে, এখনও ফেরে নি।

তোমরা ভাল আছ ?

কুন্তা বেশ বাস সংযত করিয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল—হ্যাঁ, আপনি ভাল ছিলেন ?

তা ছিলাম।

এক স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে অজিতের লজ্জা করিতেছিল, সে পায়চারি করিবার উদ্দেশ্যে পা তুলিয়াছে, কুন্তা বলিল—কোথা যাবেন ?

অজিতের ইচ্ছা ছিল বলে, কোথায় আর যাবো কুন্তা, তোমাকে দেখবার জন্তেই ত আসা; পারিল না, জোর করিয়া তাহার জিহ্বা বলিয়া দিল—এই একবার…কুন্তা তাহার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া, হাসি-হাসি মুখে কহিল—মিত্তির মশাইয়ের খবর কাল ত দেখে গেছেন, আসেনি; আজও আসেনি। শুনিছি ও মাসের প্রথমে আসবে।

"কাল ত দেখে গেছেন আসে নি"—তবে কুন্তা কাল তাহাকে এ-পথে যাইতে দেখিয়াছে! মাথাটা যেন কাটা পড়িয়া গেল। মিথ্যা বলিয়া এ লজ্জা ভোগ করার চেয়ে সত্য কথাটা বলিয়া ফেলিলেই ত হইত, অজিত জিহ্বা দংশন করিল। এখন আর কোন কথাই বলা চলে না—অজিত জড়িত স্বরে—কে বললে যেন, আজ কালের মধ্যেই ওরা আসবে, তাই—বলিয়া কোন গতিকে লজ্জারক্ত মুখখানাকে টানিয়া চলিয়া আসিল।

গজাই মোড়ল তরুণ বয়স্ক যুবক। 'ফাষ্টবুক' শেষ করিয়া গ্রামের সেরা বিদ্বান হইয়া সে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছে। সন্ধ্যার পর বাবুর সঙ্গে গল্প করিতে আসিল। এ কথা সে-কথার পর বলিল—কুন্তা যে নিন্দে রটাচ্ছে বাবু।

কি বলছে ?

বলছে, বাবু কেবল লোকের বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়।

মিথ্যে কথা।

আমরা ত তা জানি। ঐ মাগীই বলে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা বাবু, কেন বলুন ত আপনার নামে ও অমন করে মিছে কথা রটায় ?

অজিত গম্ভীরভাবে বলিল—তা আমি কি করে জানব ?

গজাই মোড়ল চুপে-চুপে জিজ্ঞাসিল—আপনি কি ওদের ওদিকে…

তা-তা…

গজাই গম্ভীরভাবে বলিল—নিজে যেতে আছে! আমাকে বল্লেই হোত।" অজিত যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল; বলিল—গজাই, আমি কুন্তাকে ভালবাসি! একথাটা কুন্তাকে বলতে পার ?

পারি বৈ-কি!

আজই পার ?

পারি।

বলে—সে কি বলে আমায় খবর দেবে ?

দোব।

অজিত গজাই মোড়লের হাতদুটো চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তবে যাও জগাই। আমি তোমার জন্তে হাঁ করে বসে রইলুম।

গজাই উঠিল। কর্ম্মের অভাবে নিকর্ম্মা গজাই বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছিল। চাষার ছেলে হইলে কি-হয়, লেখাপড়া শিখিয়াছে, মাঠে, ক্ষেতে খামারে কাজ করা আর শোভন বলিয়া তাহার মনে হয় না; পল্লীগ্রামে নিকর্ম্মা সঙ্গীরও অত্যন্ত অসদ্ভাব। গজাই একা একা হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। আজ একটা পরম রুচিকর কার্য্যের সন্ধান সে-যেন বাঁচিয়া গেল। পরম উৎসাহে, উল্লসিত মনে রাইমণিদের বাড়ীর পথ ধরিয়া মেঠো গলায় গান গাহিতে গাহিতে চলিল।

(৩)

অজিত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া, হতাশ হইয়া শুইয়া পড়িল। গজাই মোড়ল ফিরিল না। একটা অজানা শঙ্কা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা সারারাত্রি তাহার মনটিকে উৎপীড়িত করিতেছিল, নিদ্রা হইল না। গজাইয়ের না ফিরিবার যত রকম কারণ থাকিতে পারে সব মনে করিয়া অজিত আরও শঙ্কিত হইয়া পড়িল। অনিদ্রায়, দুশ্চিন্তায় রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যুষে যখন সে শয্যা ত্যাগ করিল, তখন শয়ন-কক্ষের আরশীতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেই শিহরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ক্ষৌরকার্য্য করিয়া তোলা জলেই স্নান শেষ করিয়া কাছারী বাড়ীর সামনে খোলা

বাজপাটায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পল্লীগ্রামের পথ এ সময় জনশূন্য। পুরুষরা অতি প্রত্যুষেই মাঠে চলিয়া গিয়াছে; মেয়েরা যে-যার ঘরে গৃহকর্ম করিতেছে; ন'টা দশটার সময় গৃহ কাজ সারিয়া দলে দলে সব স্নান করিতে যাইবে; পথঘাট সেই সময় একবার সচকিত হইয়া উঠিবে।

রৌদ্র কড়া হইয়া উঠিয়াছে, অজিত গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছে, শিবতলা দিয়া যাইতে যাইতে মনে হইল যেন কুব্জা আসিতেছে। ঠিক করিয়া দেখিয়া লইয়া অজিত সরিয়া পড়িতেই চাহিল কিন্তু তাহার অতিমাত্রায় অবাধ্য পা দুইটা আর অবশ চিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অজিতকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

কুব্জা কাছে আসিয়া বলিল—আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

অজিত ব্যগ্রস্বরে বলিল—কি কুব্জা?

কুব্জা সরম-জড়িতকণ্ঠে বলিল আমাদের একটা বড় বিপদ হয়েছে।

কি হয়েছে কুব্জা, খুলে বল। আমার কাছে তুমি ..

কুব্জা যেন সবটাই শুনিয়া লইয়াছে; বলিল—তা জানি বাবু; তাই ত ভরসা করে এসেছি। জানি, আপনি আমাদের ফেরাবেন না।

না, না, না,—নিশ্চয়ই অজিত তাহাকে ফিরাইবে না।

অজিতের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

বলিল— সে সত্যি কথা কুব্জা!

কুব্জা বলিল আমাদের বড় বিপদ! কিছু টাকা পেলে উদ্ধার হতে পারি।

অজিত সানন্দে বলিল—তার আর কি কুব্জা! দোব; কত টাকা দরকার বল, এনে দিই।

তিনশো!

তাতেই হবে ত?

হ্যাঁ।

দাঁড়াও। না, তুমি ভেতরেই এস; দিচ্ছি।

দেখুন, আমাদের বাড়ীটা আপনার নামে...

পাগল আর কি! বাড়ীর আমার কি দরকার!

কুব্জা দ্বারের পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইল; অজিত একশ টাকা করিয়া তিনখানা নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, খুচরো নোটের যদি দরকার হয়, দুপুরে কাছারী খুললে ভাঙিয়ে নিয়ে যেও, বুঝলে।

এইতেই হবে।—বলিয়া সে নত হইয়া, মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া ধীর মন্থরগতিতে চলিয়া গেল। যতদূর দৃষ্টি চলে, অজিত দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর বিজয়-গর্ব্বে পা ফেলিয়া সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু বাড়ীতে থাকিতে আজ মন চাহিল না। আজ যেন ছুটাছুটি করিবার জন্যই সে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল।

অজিত গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইল। মোড়ল পাড়া দিয়া চলিয়াছে; দেখিল, গজাই মোড়ল পথের ধারে বসিয়া কঞ্চি ছুলিয়া ছিপ প্রস্তুত করিতেছে। গজাই জমিদারকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল।

অজিত জিজ্ঞাসিল—কৈ হে গজাই, তুমি যে আর এলে না।

আজ্ঞে না।

কেন হে! কি খবর? বলেছিলে?

হ্যাঁ।

কি বল্লে?

গাল দিলে।

কাকে হে?—তাহাকে যে নয়, অজিত তাহা বেশ জানে।

তা জানিনে আজ্ঞে; বল্লে, কথা শুনলে প্রাচিত্তির করতে হয়!

অজিতের মনটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। বলিল—তুমি কি বলেছিলে?

গজাই ম্লানস্বরে কহিল আমি সেই ভালবাসার কথাই বলেছিলুম। বলেছিলুম, বাবু পাগল হয়ে গেল তোমার জন্যে কুব্জা; আর তুমি···

তাতে কি বল্লে?

বল্লে, ফের যদি ও কথা বল গজাই, তোমার বাপকে বলে দোব। তখনই মশাই, আমার পিসতুতো বোন্ নন্দরাণীকে ডাকে আর কি! ছুটে, বন দিয়ে পালিয়ে একেবারে বাড়ী!

হুঁ।—অজিত আর দাঁড়াইল না। তাহার মন-আকাশে

মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল। গজাইয়ের কথা সত্য হইলে সমস্যা ত বিশেষ জটিল বলিয়াই বোধ হইতেছে। কিন্তু না, তাহা হইলে কুঞ্জা নিজে আসিয়া টাকা চাহিতে পারিত কি! কখনই না। তাহা বোধ হয় না। এই প্রণয় বৃত্তান্তটা সে পৃথিবীর তৃতীয় প্রাণীকেও জানাইতে চাহে না; তাই গজাইয়ের সামনে [illegible] করিয়াছে। সত্যই ত, লোক জানাজানি হইলে [illegible]টা রটিয়া যাইতে কতক্ষণ? তখন যে বেচারীর ঘরে থাকা দায় হইবে, জাতি লইয়া টানাটানি হইবে। অজিত নিজ মনেই স্বীকার করিল যে ইহা খুব ভালই হইয়াছে।

কিন্তু একি হইল? দিনের পর দিন চলিয়া গেল,—কুঞ্জার দেখা নাই কেন? অজিতের মনটা ক্রমেই নিরাশায় ভরিয়া উঠিতেছিল। নিজে গিয়া যে সন্ধান লইবে, অজিতের সে সাহস হইল না। পথে বাহির হইলেই যে লোকে তাহার পানে চাহিয়া থাকে। অজিতের সন্দেহ হয় বুঝি ঐ টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা তাহারা জানিতে পারিয়াছে। ইহা লইয়া হয়ত গ্রামে খুবই আন্দোলন চলিতেছে। সে জমিদার, প্রতাপশালী, সেই জন্যই হয়ত সামনে তাহার কেহ কিছু বলিতেছে না কিন্তু কুৎসিৎ আলোচনায় সকলেরই মন বিষাইয়া উঠিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোক, ভালবাসা, নিঃস্বার্থ প্রেম. এ সকলের তাৎপর্য্য ত বুঝিবে না, সকলেই অযথা সন্দেহ করিতেছে। অজিতের মনটি লজ্জায়, বিরক্তিতে, দুঃখে ভরিয়া গেল। তাহার মনে হইল, এখনই গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়া তবেই যেন সে নিষ্কৃতি পাইবে।

কিন্তু যাইবার আগে একবার কি তাহাকে দেখিতেও পাইবে না? একটি মুখের কথায় বিদায়ও লইতে পারিবে না? সে-যে বড় কষ্ট হইবে; কলিকাতায় ফিরিয়াও ত তাহা হইলে সে মনঃস্থির করিয়া উঠিতে পারিবে না। লোকের মিথ্যা সন্দেহের ভয়ে অজিত তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ-কামনাটিকে ত্যাগ করিতে পারিল না।

অজিত অতি প্রত্যুষে উঠিয়া কুঞ্জার বাড়ীর দিকে গেল। তখনও গ্রাম্য বধূরা কলস-কক্ষে নত হইয়া জলাশয়ে চলে নাই; তখনো পল্লী কৃষকগণ লাঙ্গল কাঁধে মাঠে যায় নাই, পল্লীখানি কেবল মাত্র পক্ষী-কূজনে জাগিয়া উঠিয়াছে; পূর্ব্বাকাশ সবে মাত্র রক্তিমরূপ ধারণ করিয়াছে—অজিত কুঞ্জার বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারে যে তালা-বন্ধ! অজিতের বুকখানা কে যেন পিশিয়া দিল। অজিতের বিশ্বাস হইল, সে ভুল দেখিয়াছে; মনে হইতেই সে বেড়া দেওয়া আঙিনাটিতে ঢুকিয়া পড়িল। তালাই ত! হয়ত কুঞ্জা গ্রামেই কোথাও বাহির হইয়াছে, তালাবদ্ধ করিয়া গিয়াছে—এই কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে সে বেড়া ডিঙাইতেছে, বিপরীত দিক হইতে একটি কৃশকায়া গাভীর গলার দড়ী ধরিয়া নন্দরাণী সেই দিকেই আসিতেছিল।

নন্দরাণী ঘোমটা বাড়াইয়া দিয়া, গায়ের কাপড় গুছাইয়া আড়ষ্ট হইয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘোমটার মধ্য হইতেই অজিত তাহাকে নন্দরাণী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া দুলিয়া সে বেচারী বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; আর যেন একটু ক্ষণও সে সহিতে পারিতেছিল না।

নন্দরাণী তাহার সহিত কথা কহিত না, অজিত তাহা যে না জানিত এমন নয়; কিন্তু এখন সে কথা সে ভুলিয়া গিয়া নন্দরাণীর খুব নিকটে গিয়া বলিল নন্দরাণী কুঞ্জা কোথায়?

নন্দরাণী কথা কহিল না; আড়ষ্টভাবটি তাহার আরও বাড়িয়া উঠিল।

অজিত নীরবতা সহিতে পারিল না; কাতর কণ্ঠে মিনতি জানাইয়া বলিল—দোহাই নন্দরাণী, ব্যগ্রতা করি বল, কুঞ্জা কোথায়? আর কোন দিন কথা কয়ো না, আজ শুধু এই কথাটি আমাকে বলে দাও।

নন্দরাণী মৃদু কণ্ঠে কহিল—তারা চলে গেছে বাবু। এখানকার বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে গেছে। পাটুলিতে না কোথায় তার মামার বাড়ী আছে, সেইখানে ঘর করবে, টাকা কড়ি নিয়ে—

অজিত জিজ্ঞাসিল—গেল কেন?

নন্দরাণী চুপ করিয়াছিল। অজিত আবার মিনতি জানাইয়া বলিল—বল নন্দরাণী!

সে বলছিল, এখানে থাকলে তার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

সর্ব্বনাশ! সে কি নন্দরাণী?

নন্দরাণী একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—সেত আপনি ভাল জান গো বাবু!

অজিত কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল—নন্দ আমি ..

নন্দরাণী মুচকি হাসিয়া বলিল—জানই ত বাবু!

অজিত জিজ্ঞাসিল—তবে কি আমার জন্মেই···

সে ত তাই বলে গেল!

আমাকে ভয় কিসের নন্দরাণী! আমি তাকে ভাল বেসেছিলুম; দরকার হলে তা'কে—আমি বিয়ে করতুম। জান ত, নন্দ, আমি জাত মানি নে।

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল—বিধবার কি আবার বিয়ে হয় বাবু?

কে বিধবা?

কেন কুঞ্জা!

অজিতের মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িল। কুঞ্জা বিধবা! সে যে তাহাকে বয়স্থা কুমারী বলিয়াই জানিত! তাহার হাতের চুড়ী, পরণের শাড়ী নাকে নাকছাবি দেখিয়া অজিতের যে দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়াছিল, কুঞ্জা অবিবাহিতা কুমারী! এই সূত্রে জাতীয়ত্বের উচ্চপ্রাচীর ভঙ্গ করিয়া প্রেমের মহান্ আদর্শ স্থাপন করিবে ইহাই যে অজিতকুমার তাহার মানসে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল।

নন্দরাণী গরুটাকে টানিতে টানিতে, চলিতে চলিতে বলিল, কাকেও কিছু বলেনি, তার মাকেও না। গাঁয়ের লোক যে শুধিয়েছে তাকেই বলেছে, মামাদের কেউ নেই; তাদের বাড়ী ঘরদোর আমরা পাব, তাই উঠে যাচ্ছি। আমিই কেবল জানি, সে মিছে কথা, কারু বাড়ী ঘর পাবে না; তাই ঘর করবার টাকাও ..

কোথায় পেলে?

যে তাকে ভালবাসে, তার ঠেঞে নিয়েছে। নিয়ে চলে গেল; আমাকে চুপিচুপি বলে গেল, না গেলে তার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

অজিত একমুহূর্ত্ত জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর নন্দরাণীর দিকে চাহিয়া অনুনয়ভরাকণ্ঠে বলিল—আমি জানতুম না নন্দ, আমি জানতুম না। অন্যায় হয়ে গেছে, জানতুম না, না জেনে অন্যায় করে ফেলেছি তাই!—বলিয়া চলিয়া গেল। চোখে তাহার জল আসিয়া পড়িয়াছিল।

পরদিন আর কেহ অজিতকুমারকে তাহার জমীদারীর ত্রিসীমানায় দেখিতে পাইল না।

বন্ধু

[শ্রীউমালতা ঘোষ]

সেবা, যখন তার রাতের সমস্ত কাজগুলো সেরে, শোবার ঘরের জানলায় গিয়ে দাঁড়াল, তখন রাত ১১টা বাজে। সমস্ত পাড়াটা প্রায় নিঝুম হয়ে পড়েছে, শরতের লঘু বর্ষণ থেমে গিয়ে, তখন নীল আকাশে সবে মাত্র চাঁদটী উঁকি মারছে; সিক্ত ধরণীর বক্ষভূষণ লতাপল্লবের উপর চাঁদের কিরণ পড়ে চিক্ চিক্ করছে, তাদের সুমুখের গলির অপর পারের দোতলা বড় বাড়ীটার রাস্তার ধারের জানলা-গুলা খোলা; একজন তরুণ যুবক সেই জানলার ধারে বামপাশ করে চেয়ারের ওপর বসে, একটু দুলে দুলে টেব্‌লে রাখা বই-খানা পড়ছিল, মেঘদূতের বিরহাতুর করুণ গাথা—যুবকের কণ্ঠে কোমল গম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হ'য়ে সেবার কানে ভারী সুন্দর লাগছিল, আর শুধু এইটুকু শোনবার জন্যই সে একাগ্রভাবে সেখানে দাঁড়িয়েছিল।

সেবা [illegible] ভালই জানত তার বাপ পণ্ডিত রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে সে সংস্কৃত খুব ভালরকম শিখেছিল, লেখাপড়া আর সাহিত্যচর্চ্চা, এই ছিল তার তরুণ জীবনের আনন্দ, একমাত্র সম্পদ, প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ ক'রে সে তারই মধ্যে ঢেলে দিয়েছিল। তরুণী সেবা তার সমস্ত কাজকর্ম্মের অবসরের পর, রোজ এইখান-টীতে এসে দাঁড়ায়; কারণ পাশের বাড়ীর ছেলেটীর পড়াগুলো শুনতে তার খুব ভাল লাগে, স্নিগ্ধমধুর গম্ভীর স্বরে তার কলেজের পড়াগুলো, ভাবমুগ্ধা তরুণী সেবার কানে ঠিক তপোবনের ঋষিকুমারদের সামগানের মত পবিত্র ও মিষ্ট শোনাত, সমস্ত দিনের নীরবতার গ্লানি এই সময়টুকুর স্পর্শে কর্পূরের মত উবে যেত।

সেবা, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তরুণটীর পানে একবারও ভাল করে চেয়ে দেখেনি, সে এমন ভাবে দাঁড়াত, যে সে তাকে না দেখতে পায়, অথচ তার তৃষিত প্রাণের অতৃপ্ত পিয়াসা, তার কণ্ঠস্বরে মিটে যায়। সেবা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, কর্ণ তার আকুল আগ্রহে সম্মুখের খড়খড়ির মধ্যে সমস্ত শক্তির প্রেরণা দিয়েছিল, কিন্তু চোখ দুটো পড়েছিল সেই বাড়ীর ফটকের সাম্‌নে, যেখানটায় পাঁচীলের গায়ে হেলেপড়া, অজস্র-ফুলে-ভরা শিউলি গাছের ওপর গ্যাসের উজ্জ্বল আলোর ঝরণা ঝরে পড়ছিল।

তরুণ, প্রায় আধঘণ্টা ধরে প'ড়ে চল্লো, তারপর বইখানা টেবিলের ওপর ফেলে রেখে, চেয়ারের ওপর বেশ করে আলস্য ভেঙে নিয়ে দু চারবার হাই তুলে—গুণ গুণ ক'রে গাইতে লাগল, 'নীরব রাতে কেমন তোমার গোপন অভিসার, পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।' গাইতে গাইতেই সে উঠে সুইচ্‌টা টিপে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে, জানলার ধারে এসে দাঁড়াল, তার দৃষ্টি সহজেই সম্মুখের বাড়ীর জানলায় এসে পড়ল। সে দেখলে একটী সুন্দরী তরুণী সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, আধ-আঁধারের মাঝে, তাকে যেন স্বপ্নলোক-বাসিনীর মত মনহরা দেখাচ্ছিল, এলায়িত এলান কাল চুলের রাশ, মুখের চারিদিকে নেমে এসে. তার অনাবৃত সুন্দর মুখ-খানাকে যেন ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করছিল। তরুণ, মুগ্ধনেত্রে সেই অপরূপাকে দেখতে লাগল, আর ভাবতে লাগল, তার এইমাত্র পড়া, বিরহী যক্ষের প্রিয়তমা বধূর কথা, এই তরুণীর মতই সে আপনভোলা হ'য়ে দূর প্রবাসী বঁধুর পথ চেয়ে, এই স্তব্ধ নিশীথের ব্যথা বুকে বয়ে এম্‌নি বাতায়ন তলেই কাটিয়ে দিত। সেবার ঢলঢলে পদ্মপাপড়ীর মত চোখ দুটী এইবার ফিরে এল, সেই আলো-ফুলের মেলা থেকে; কিন্তু পথ থেকেই তাকে আকর্ষণ করলে, সেই তরুণের উজ্জ্বল কালো কালো চোখ দুটী—লাজের লালিমামাখা—রঙীন মুখে! সেবা জানলার তলাতেই বসে পড়লো, [illegible] অপ্রতিভ তরুণ মৃদু হেসে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে, শুতে চ'লে গেল।

সেবার বয়স যখন এগার, সেই সময় এক পল্লীগ্রামে তার বিয়ে হ'য়েছিল, স্বামীর নাম ছিল দেবেশ। অবস্থা ভাল হ'লেও সে ছিল চূড়ান্ত লম্পট, মাতাল অবস্থায় এসে, সে ক্ষুদ্র বালিকা পত্নীর উপর এমন সব অমানুষিক অত্যাচার

ক'র্ত্তো, যা বাংলার বেশীর ভাগ—"অস্ত্রহীন বীরেদের" নারীরা নীরবে নির্ব্বিচারে সহ্য ক'রে যায়। কিন্তু সেবা ছিল তখন বড়ই ছোট, সেই দুর্ভাগ্যে বা সৌভাগ্যে সে ছয়টী মাস স্বামীর ঘর করবার পর, শরীরে নানারকম প্রীতি-সম্ভাষণ-চিহ্ন নিয়ে স্নেহময় বাপের বুকে ফিরে এল। মাকে সে ছোট্ট বেলাতেই হারিয়েছিল; এসেই সে তার ছোট্ট সুগোল হাত দুখানি দিয়ে বাপের কোমরটী জড়িয়ে ধরে কেঁদে ব'ল্লে, "বাবাগো—আর আমি শশুর বাড়ী যাব না, তারা যে আমায় মেরে মেরে গুড়িয়ে দিয়েছে বাবা।" রাধাকান্ত বাবুর সারা প্রাণটা তখন অনুশোচনার তীব্র আগুনে জলে পুড়ে ক্ষার হয়ে যাচ্ছিল; তিনি তার ক্ষুদ্র মাথাটীতে হাত বুলুতে বুলুতে করুণকণ্ঠে বল্লেন, "না মা, আর তোমায় যেতে হবে না, তুমি বড় হ'তে হ'তে যদি সে ভাল হয়,তবেই তোমায় পাঠাব,নইলে তোমার এই ছেলের ঘরেই তুমি ব্রহ্মচারিণী হ'য়ে, চির-শান্তিতে জীবন কাটাবে।" কিন্তু সেবার ভাগ্যে স্বামীর ঘর করা আর জোটেনি। দুই তিন বৎসরের মধ্যেও যখন দেবেশ, কিছুতেই সেবাকে নিয়ে যেতে পারলে না, তখন সে রাগ ক'রে শ্বশুরকে এক চিঠি দিলে, 'যদি আপনি মেয়েকে না পাঠান তা হ'লে আমি আবার বিয়ে করবো।' একে জামায়ের অসচ্চরিত্রের কথা নানাজনের মুখে নানাভাবে শুনে রাধাকান্ত বাবু হতাশ হ'য়ে পড়ছিলেন, এই চিঠি পেয়ে তিনি তার ওপর আরো বিতৃষ্ণ হ'য়ে উঠলেন। বুঝলেন মনুষ্য নামধারী এই জীবটীর মধ্যে মনুষ্যত্ব বলে যে একটা জিনিষ তা একটুও নেই, যাতে যে কোন মানুষ তার সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য রাখতে পারে! খুব কড়া ভাবে তিনি তাকে চিঠির উত্তর দিলেন, যে দিন তিনি বুঝবেন, সে, সেবার মত মেয়েকে নিযে ঘর করবার উপযুক্ত হ'য়েছে, স্ত্রীর মর্য্যাদা রেখে সংসার কর্ত্তে পার্ব্বে সেদিন তিনি নিজেই গিয়ে তার বাড়ীতে মেয়ে রেখে আসবেন, তার আগে নয়। 'লিখলেন, যে ভুল আমি একবার করেছি—তা আর দ্বিতীয় বার করবো না; আমার সেবা-মাকে, পুণ্যের জীবন্ত ছবিকে তোমার পাপের আগুনে পুড়ে মরতে দিতে বাপ হ'য়ে কিছুতেই পারব না; ভিক্ষা ক'রেও যদি তাকে পালন কর্ত্তে হয়—সেও আমার ভাল।

এই চিঠি যাবার তিনমাস পরেই একখানা রঙীন্ খামে নিমন্ত্রণ পত্র এলো। খুলে পড়েই রাধাকান্তবাবু বুঝলেন, বাংলার পুরুষদের ভাগ্যে যতই দরিদ্রতা থাক, এই বিষয়ে পৃথিবীর আর কোন সভ্যজাতীর পুরুষেরা তাদের চেয়ে ধনী নয়; স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি—তখন ছিল বোধ হয়, যখন মেয়েদের বাপেরা এক একটী মেয়ের বিয়ে দেবার সময় অসম্ভব ও কঠোর পণ ক'রে বসতেন।

বজ্রের মত একটা কঠিন ব্যথার আঘাত তাঁর হৃৎপিণ্ডে এসে লাগল। হায়! তাঁর কর্ম্মফলেই তাঁর বড় আদরের মাতৃহীনা কন্যা সেবার অদৃষ্টের এই ভীষণ পরিণাম! তিনি চিঠিটা নীরবে সেবার হাতে তুলে দিয়ে, বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লেন, কিন্তু যখন একটু পরেই একগাল হাসি নিয়ে, মধুরকণ্ঠে সেবা এসে তাঁকে ডাকলে—বাবা! তখন যেন তাঁর প্রাণের অর্দ্ধেকখানি ব্যথা ক'মে গেল, অবাক দৃষ্টিতে মেয়ের পবিত্র, কোমল, ফুলের-মত ফুল্ল মুখপানে চেয়ে, সস্নেহে বললেন—কেন মা? শয্যাপ্রান্তে ব'সে সেবা তাঁর পিঠে মুখটা লুকিয়ে ব'ল্লে, বাবা! ভালই-ত হ'য়েছে, আমার জন্যে ত' তবে আর কারু কষ্ট রইল না, আমার সঙ্গ তাঁরা ত আজ আমাকে ফিরিয়ে দিলেন, কর্ত্তব্যের কাছে আমি আজ মুক্ত, স্বাধীন; তুমি কেন মিছে দুঃখ করছ বাবা? আর কিছুই ভয় নেই, তোমার কাছ থেকে আর আমায় কোনও দিন কেউ ছিনিয়ে নেবে না।" তারপরেই সে শিশুর মত সরল উচ্চহাস্যে বল্লে, "অবশ্য যমরাজার কথা আলাদা!" রাধাকান্তের মনপ্রাণ এই অনাবিল হাস্যে প্রসন্ন হ'য়ে উঠল, তিনি বুঝলেন, সেবা কোনও দিন তার স্বামীকে তার কিশোর প্রাণের একটু কোনেও ঠাঁই দিতে পারে নি, কর্ত্তব্যের কাছে মুক্তি পেয়ে তাই তার আজ এত আনন্দ হয়েছে। যাক্, তিনি একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সেই ভাল মা! ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই, অবোধ আমরা বুঝতে পারিনা। যা, তোর বই-গুলো নিয়ে আয়, একটু পড়্বি। সেইদিন থেকে রাধাকান্তবাবু সেবার শিক্ষার সকল ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি কোনও কলেজের পণ্ডিত ছিলেন, জ্ঞান পিপাসা তাঁর অত্যন্ত প্রবল; তাঁর জীবনের যতকিছু অভিজ্ঞতা, মেয়ের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য তার শিক্ষার মধ্যে সব ঢেলে দিলেন।

সেবা আর আজকাল রাত্রে তেমন ক'রে জানলায়

দাঁড়ায় না কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেই স্বর-সুধামৃত সে পান করে; ভাষা সব বোঝা যায় না, কিন্তু তাতেও তার সুখ। এক একবার সে এক্‌থা ভাব্‌তে নিজেই অবাক হ'য়ে যায়, এ কি তার মনের নেশা, এ কি তার প্রাণের খেয়াল! এই স্বরটুকু শোন্‌বার জন্যে তার মন এমন উতলা কেন হয়? সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাণ আকুল উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, তার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হ'য়ে যায়। তার জীবনের সকল আকাঙ্খা শুধু যেন এই স্বরটুকুতে সন্নিবেশিত হ'যে যায়! কি এই সুর? এমনই কি তার মদিরা-মাখান আকুলতা? ভাব্‌তেও যে সারা শরীরটা শিউরে ওঠে, হৃদয়ের প্রত্যেক স্তরে স্তরে, পুলকের নৃত্য, সুখের মঞ্জীর বাজিয়ে তোলে! বুঝি এমনই নিশীথে শ্যামের বাঁশীর আকুল সুরে ব্যাকুল হয়ে রাধারাণী কুঞ্জের পথ ধ'রে ছুটে ছিলেন? তা না হ'লে তার প্রাণ কেন আজ আবার ওই বাতায়নে ছুটে যেতে চায়? কি নবীন আলোক নিয়ে, সেদিনের সেই মধুর দৃষ্টির স্মৃতিটুকু আজও থেকে থেকে কেন তার প্রাণে জেগে ওঠে? কেন এমন হয়? সে যে ব্রহ্মচারিণী, পিতার জ্ঞান-শিষ্যা, সাহিত্য চর্চ্চাই যে তার জীবনের ব্রত, সে যে নীরবে জগতের এককোণে পিতার স্নেহের কোলটীতে বসে, যেখানে কোন দ্বন্দ্ব নেই, দ্বেষ নেই, হিংসা নেই, গ্লানি নেই, জগতের সমস্ত শক্তি যেখানে পরাভূত হয়, সেই অসীম জ্ঞানরাজ্যের দ্বারে, আপনাকে লুঠিয়ে দিতে চায়! তবে কেন আবার তার প্রাণ মানুষের হাসি খেলা খুঁজে বেড়ায়? সামান্য সেই দৃষ্টিটুকু ভুলতে পারে না? ভাব্‌তে ভাব্‌তে সেবার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, চোখ দুটো মুদে আসে। এম্‌নি ক'রে একটীর পর একটী করে দিন কেটে যায়।

সে দিন বিকেলে, সেবা ছাদ থেকে শুক্‌নো কাপড়গুলো তুলে আন্‌তে গেল। কাপড়গুলো তুলে সবে সে জমা ক'রছে, এমন সময় দেখলে সুমুখের বাড়ীর ছাদ থেকে সেই পরিচিত তরুণ তারই পানে চেয়ে তন্ময় হ'য়ে তাকে দেখছে। সমস্ত মুখটায় যেন তার অসম্ভব আগ্রহ, দৃষ্টিতে তরল লালিত্য। সেবা মুহূর্ত্তেই ঘাড়টা নামিয়ে নিলে, মসৃণ কপোলে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো, কিন্তু আশ্চর্য্য ঐ চাহনি তার প্রতি কি যেন একটা সুখের মোহস্পর্শ বুলিয়ে দিলে, বুকের সমস্ত রক্ত তার উত্তাল হ'য়ে নেচে উঠলো, দৃষ্টি যেন তার কোন এক অজ্ঞাত শক্তির আকর্ষণে আবার সেই তরুণের পানে উঠে স্থির হ'ল! সে দেখলে তরুণ একটা চেয়ারের ওপর স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে—আর তার সেই তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি—অনন্ত, অসীম নীল অম্বর ভেদ ক'রে কোন অজ্ঞাত লোকে চ'লে গেছে। পড়ন্ত রোদের এক টুকরা সোণালী আভা তার মুখে চোখে আর সমস্ত শরীরে দেবকন্যাদের হাসির মত ছড়িয়ে পড়েছিল, কোঁকরা কালো চুল গুলোয় ঝুরঝুরে হেমন্তের হাওয়া এসে চুম্বন ক'রে ক'রে খেলা করছিল। সে মুগ্ধভাবে অতি সন্তর্পণে কতক্ষণ চেয়ে রইল। একি অসীম আনন্দ! অগাধ তৃপ্তি! শুধু দেখার মধ্যে এত সুখ? তাই কবি গেয়েছেন, "জনম অবধি হাম, রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" এই দেখা ছেড়ে নীচে নাম্‌তে যে আর ইচ্ছা হয় না—কয়েক দিন আগেও যখন সে পাঠরত ঐ তরুণের মূর্ত্তি ছায়ার মত দেখতে পেত, কই, তখন ত তা৷ এমন অতৃপ্ত দর্শন পিয়াসা ছিল না, তবে কে এর উদ্বোধন করলে? সেবার মনে জেগে উঠলো, সে দিনের সেই মুগ্ধদৃষ্টি; সেই ত তার সুপ্ত মনোবৃত্তিকে—কোন সোণার কাঠির স্পর্শে জাগ্রত করে দিয়েছে, তার নির্ব্বিকার চিত্তকে লুব্ধ ক'রে তুলেছে! সেবা ফিরতে চাইলে—কিন্তু তার মন ব'ল্লে,আর একটু আর একটু—এখনও যে আমার তৃপ্তি হয়নি গো! সহসা এই চুরি ক'রে দেখা তার ধরা পড়ে গেল, তরুণের চঞ্চল আঁখির ফাঁদে, মুহূর্ত্তে তার সারা মুখটায় যেন সুখের বিদ্যুৎ খেলে গেল। দুজনের দৃষ্টি নীরবে দুজনকে অভিনন্দন করলে। নীরব বটে—কিন্তু দুজনেরই মনে হ'ল কত যুগের কত দিনের আপন তারা, এ বিশ্বের মাঝে তারাই যেন চিনে ফেলেছে পরস্পরকে, বেঁধে ফেলেছে আপনাদের তরুণ প্রাণের কাঁচা সোণার তারে। সেবা নীরবে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে নীচে চ'লে গেল! এইবার তার মন লজ্জায় ভরে উঠলো, ছিঃ ছিঃ সে কি করলে? কেন সে এমন অসাবধান হ'ল, তিনি কি মনে করলেন? মনে করলেন—কি বেহায়া মেয়ে! ছিঃ, তিনি পুরুষ, আমি কেন তাঁকে লুকিয়ে দেখতে গেলাম?

তারপর থেকে তাদের দেখা হ'ত এমন প্রায়ই দিনে

রাতে কতবার—বিশ্বের চক্ষের অন্তরালে শুধু দৃষ্টি দিয়ে তারা প্রত্যেককে ব্যক্ত কর্‌তো; সারা বিশ্বটা যেন তাদের কাছে তরুণ হ'য়ে উঠেছিল! প্রাণে তাদের বসন্তের সবুজ আলো ঝিলিক্ মার্‌ছিল, আনন্দের মত্ত হাওয়া তাদের প্রেমের সুরা পিইয়ে মাতাল ক'রে রেখেছিল, তারা ছিল দূরে দূরে—কিন্তু তাদের দুটী তরুণ প্রাণ, একেবারে এক হ'য়ে জড়িয়ে গিয়েছিল প্রেমের কোমল বাঁধনে, এরপর, যখন তরুণ তার ঘরে ব'সে এস্রাজ বাজিয়ে গাইত—আঁখির পলকে—

যে ফুল ফোটে আমার প্রাণে,
দুল্ হবে সে তোমার কাণে
অশ্রু আমার মুক্তা হবে তোমার নোলকে –

তখন সেবা নিঃসঙ্কোচে এসে জানালায় দাঁড়াত, আর গানটা শেষ হ'য়ে গেলে তার পানে চেয়ে হেসে ফেল্‌ত, সেবা মুগ্ধ হ'য়ে ভাবত, কবির ভাষাকে সে তখন তরুণের প্রাণের ভাষায় গ্রহণ ক'রে মনকে অমৃতে অভিষিক্ত কর্‌তো।

তাদের এই রকম দিনগুলা নিয়ে পাণ্ডুর শীত আপনার হিমজীর্ণ বাস,এবারকার মত ধরার বুকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। অসাড় ধরণীর বুকে পুলক স্পন্দন তুলে, রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে, বসন্ত তার শ্যামল আসন খানি বিছিয়ে দিলে, সেই বসন্তের উজ্জল দুপুরে, সেবা তার ঘরে একটা মাদুর পেতে শুয়েছে, শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়্‌ছিল এমন সময় একটী ছোক্‌রা চাকর এসে তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল, সে খুলে ফেলে পড়্‌লে—মূহূর্ত্তে তার সারা মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা হ'য়ে উঠ্‌লো, তার পরই একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল; এ চিঠি তরুণ লিখেছে, তার প্রাণের ভাব ভাষায় ফুটিয়ে তুলে, সে ভবিষ্যতের একটা সুন্দর সুখের চিত্র এঁকে দিয়ে, তাকে পাবে কি না জিজ্ঞাসা ক'রেছে। হায়, সে ত জানে না সেবা কুমারী নয়, সেবা এই প্রকাণ্ড বিশ্বের মাঝে একটা বিরাট অভিশাপ! সেবা এতদিন এ কি ক'রেছে, এত' শুধু কল্পনার ভাবের রাজ্যে ঘুরে বেড়ান নয়, বাস্তব পৃথিবীতে আজ যে সে আত্মপ্রকাশ করেছে! সেবার সমস্ত মাথাটা ঘুর্‌তে লাগল; চোখের সাম্‌নের সব বস্তুগুলা ধূসর মনে হ'তে লাগল, মুখে যদিও তারা প্রাণের পরিচয় দেয় নি, কিন্তু প্রাণে প্রাণে কত কথা নিতিনিতি তারা ক'য়েছে, অন্তর যেখানে মুখর হয়, ভাষা যে সেখানে মূক হ'য়ে যায়। সেবা আজ ভাল করে দেখ্‌লে, বুকের মধ্যে তার সমস্তটা জুড়ে তরুণের ছবি আঁকা হ'য়ে গেছে, তার যা কিছু অর্ঘ্য, ভক্তি, প্রেম, বাসনা, আনন্দ, সকলি সে নিঃশেষ ক'রে পূজা ক'রেছে সেই ছবিকে—আজ সে যে নিঃস্ব রিক্ত, কিন্তু তার সে রিক্ততা ভ'রে দেবার জন্যে এই যে ব্যাকুল আশায় তার তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে সেই দেবতা আজ তাকে বর দিতে চেয়েছেন সে যে তাঁর দান গ্রহণের নিতান্ত অযোগ্যা—সে যে চির অভিশপ্তা, চির দুঃখিণী! দু'ফোটা জল তার দু'কপোল বেয়ে মাটীতে ঝরে পড়্‌লো।

ওগো—ভগবান্! প্রাণ যে আমার ভেঙ্গে চুরে যেতে চায়, কি কঠিন ক'রেই তুমি এই অসহায়া নারীর বুককে তৈরী ক'রেছিলে! সংসারের হাসি গান আজ যে আমার সব ফুরিয়ে গেছে, বসন্তের মাতাল হাওয়া আজও তেম্‌নি ক'রে ছুটে আস্‌ছে ফুটন্ত বেলার গন্ধ নিয়ে, কিন্তু প্রাণের ফুল যে আমার আজ শুকিয়ে গেছে, বাড়ীটা'র পানে আজ যে আর চেয়ে দেখা যায় না, আমার জীবনের প্রথম প্রিয়পীঠ ঐ ঘরখানাও যে আজ শূন্য পড়ে আছে—প্রিয়তমের কলগুঞ্জনের ধ্বনি আর ত' শোনা যায় না, আমিই ত' তাঁকে তাড়িয়েছি, কঠোর লিপির নিষ্ঠুর আঘাতেই তিনি এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন, বাড়ীওয়ালা বাড়ীতে চাবি দিয়ে গেছে! সেবার দুচোখ বেয়ে মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার নিষ্ফল জীবন তার কাছে আজ দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছে। বাইরে থেকে রাধাকান্ত ডাক্‌লেন, মা! সেবা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল। তিনি তার মুখের পানে চেয়ে অবাক হ'য়ে বল্‌লেন, তোর চোখ দুটো ভিজে ভিজে কেন মা? বুকের ব্যথা কণ্ঠে ঠেলে আস্‌ছিল, প্রাণপণ যত্নে তাকে চেপে রেখে সেবা ব'ল্লে—চোখে কি প'ড়েছে বাবা! তুমি আমায় ডাক্‌ছ কেন বাবা? তিনি ব'ল্লেন আমার বোধ হয় জ্বর হয়েছে মা!—বিছানাটা পেতে দিয়ে একটু কাছে বস্‌বি চল্। সেবা তাড়াতাড়ি তাঁর কপালে হাত দিয়ে ব'ল্লে, ওমা! বেশ ত' জ্বর হ'য়েছে। কেন বাবা হঠাৎ তোমার জ্বর এল? তোমার জ্বর ত কখনও আমি দেখিনি

বাবা! রাধাকান্ত সস্নেহে হেসে বল্লেন, তবে ত' এ একটা দেখ্‌বার জিনিষ হ'ল মা! আমার জন্যে তোর, বড় ভাবনা হ'চ্ছে না?" সেবা চিন্তিত মুখে উত্তর কর্লে, খুব হ'চ্ছে, জরটা যে বড্ড বেশী।

* * *

বাড়ীওয়ালাদের সাহায্যে পিতার সৎকার ক'রে শ্মশান থেকে ফিরে এসে, সেবা তার বাপের ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে আকুল হ'য়ে কাঁদ্‌ছিল। জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি ছিলেন তার একাধারে সখা, পিতা, গুরু, সঙ্গী সেই বাপের কোল হারিয়ে সেবা আজ তাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিঃসহায় ব'লে মনে করছিল; শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর, তার মনে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা জেগে উঠেছিল। এমন নিকট আত্মীয় তার কেউ নেই, যাদের কাছে গিয়ে সে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারে! রাধাকান্ত বাবু সঙ্গতি যা কিছু রেখে গিয়েছিলেন তা তার একার প'ক্ষে যথেষ্ঠ, কিন্তু তার এই বয়সে, সে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারে? কাকে বিশ্বাস করতে পারে? সে আকুল হয়ে ভাবছিল,—একজনের কথা—যার চিত্র তার প্রাণের মধ্যে জেগে উঠেছিল, সে যে আজ কোথায়, তাও যে সে জানে না! কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে উঠে ব'সে, সে এলো চুলগুলো দুহাত দিয়ে বাঁধছিল, ঠিক্ সেই সময় দোরের কাছে, মনে হল—কে যেন একজন এসে দাঁড়াল, সেবা ফিরে দেখলে, এ'কি! মুহূর্ত্তে তার শোকের উচ্ছ্বাস যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠল, নিতান্ত আপনার জনকে দেখলে শোকার্ত্তা যেমন ক'রে চীৎকার ক'রে ওঠে, সেই রকম চীৎকার করে উঠে সেবা, তার প্রিয় তরুণের পায়ের কাছে উৎসর্গীকৃত শুভ্র একরাশ ফুলের মত লুটিয়ে পড়ল। তরুণ তাকে ধীরে ধীরে তুলে বসিয়ে দিলে, সুমুখে একটা পাখা পড়েছিল, সেইটা তুলে নিয়ে, সে তার মাথায়, গায়ে, বাতাস দিতে লাগল। একটু পরেই সেবা শান্ত হ'ল, তখন তরুণ তার কাতর মুখের পানে চেয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে ব'ল্লে, আমি আপনার নাম জানিনা, কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে আমরা ভাল ক'রেই জানি, আমাদের পরিচয় হ'য়েছিল আমাদের প্রাণের মধ্য দিয়ে, একটা দৃঢ় প্রেমের বাঁধন আমাদের দুজনের অন্তরকে বেঁধে ফেলেছিল, যা এ জীবনে—বোধ হয় মরণের পরে ও তা বিমুক্ত হবে না। আমি বাড়ী ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলাম, শুধু আপনার কথাতেই, নইলে আমার নিজের পক্ষে এমন কোন ভয়ের কারণ ছিল না যাতে আমি চ'লে যেতে পারি, কিন্তু একটী দিনের জন্যও আপনাদের সংবাদ রাখতে ভুলিনি, শুধু দিন পাঁচেক আমার মাকে কাশীতে রাখতে গিয়েছিলাম, আপনাদের বাড়ীতে তার মধ্যেই এই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে, এমন বিপদের সময় আপনার কোন সাহায্যেই আমি লাগতে পাল্লাম না! আমার আজ এইটুকু মিনতি, আপনি আজ সন্ধ্যের গাড়ীতেই আমার সঙ্গে কাশী চলুন, সেখানে আমার মা আছেন, তাঁর কাছে আপ্‌নি থাক্‌বেন, আর আমরা পরস্পরে আজ থেকে বন্ধুর মতই থাক্‌ব! শুধু বন্ধু! আমাদের দুজনের প্রাণ দুজনের হিতার্থে চির উৎসৃষ্ট থাক্‌বে; স্নেহভালবাসার জন্যে চির অবারিত থাক্‌বে; বন্ধুত্বের অমল শুভ্র প্রেমে, আমাদের জীবন মহিমায় মণ্ডিত থাক্‌বে; আমরা এই সংসার সমুদ্রে পরস্পরের ওপর নির্ভর ক'রে আনন্দের অনুকূল হাওয়ায় আমাদের জীবনতরী দু'টি বেয়ে নিয়ে যাব, পাপের কোন ছায়া আমাদের স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না; নারীর সঙ্গে পুরুষের যে অম্লান কোন সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে, পরস্পরকে বন্ধুর মত প্রাণভরে ভাল বাস্‌বার অধিকার থাকতে পারে, কৃষ্ণ-দ্রৌপদীর মত আমরা বিশ্বকে তা দেখিয়ে দোব। বলুন, আপনি আমার বন্ধু—বলুন!" সেবার প্রাণে কে যেন অমৃতের উৎস ছুটিয়ে দিলে, সকল ব্যথা যেন তার জুড়িয়ে দিয়ে, মনশ্চক্ষুর ওপর থেকে একখানা কালো আবরণ খসিয়ে দিলে! করুণ মুগ্ধস্বরে বল্লে—বন্ধু! বন্ধু!—সে যেন নিজের মনেই কথাটা জপ করতে লাগল,—

বন্ধু! বন্ধু! বন্ধু!

আহুতি

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

(১০)

অবশেষে একদিন সত্য সত্যই দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। মায়ের ব্যথিত হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিয়া তাঁহার চোখের জলে দেহ অভিষিক্ত করিয়া এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার দেওয়া রাধাবল্লভের প্রসাদ আঁচলে বাঁধিয়া মালতী তাহার এক সুদূর-বর্ত্তী অজানা ভবিষ্যতের মঙ্গল কামনায় কলিকাতা যাত্রা করিল।

মালতী বোর্ডিংএ আসিল—কিন্তু একি, বোর্ডিং না কারাগার, উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, নড়িতে চড়িতে,—এমন কি হাসিতে, কথা বলিতেও এখানে সময় যেন ঘণ্টার ভিতরে বাঁধা!—দুদিনেই মালতীর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, মাগো, এখানে এই এতগুলি মেয়ে আছে কি করিয়া! অভাবটা যে কোন্ দিকে, মালতী খুব স্পষ্ট করিয়া সেটা বুঝিতে পারিত না, কিন্তু অতৃপ্তির একটা নিদারুণ বেদনা চারিদিক দিয়া তাহাকে যেন ঘেরিয়া ধরিত,—এখানে ভাঁড়ার দেখিতে, রান্নার ব্যবস্থা করিতে 'মাসীমা' আছেন, চার পাঁচ রকম তরকারী প্রতিদিন দুবেলাই হয়, খাইতে বসিয়া পেট তবু ভরে না, চোখ ভরিয়া জল আসে। অসুখ করিলে নিয়মিত ভাবে ডাক্তার আসেন, 'মেট্রন' আসেন, রীতিমত ভাবে ওষুধ পথ্যি যোগান,—তবু মালতী মাথা ব্যথার কথা মুখ ফুটিয়া বলে না, বাটি বাটি পথ্য শয্যার নীচে জড় হয়,—'মেট্রন আসিয়া উপদেশ দেন, 'খেয়ে নাও, ছিঃ! না খেলে সারবে তবে কি করে? ভাল হলে তবেত পড়তে পাবে, নইলে কতদিন শুয়ে অমনি ভুগবে?'—মালতী কথার জবাব কিছু দেয় না, তিনি চলিয়া গেলে শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠে,—বুকটায় যে কান্নার প্রতিধ্বনি বাজে—মা মা, মা, ওমা, মাগো আমার!—

• • • •

শুধু তাহাই নয়, ক্লাসে বসিয়া সহপাঠীদের সহিত সমবয়সীদের তুলনা করিয়া মালতীর ক্ষুব্ধ মন বিকল হইয়া উঠিল, তিন চারি খানি বেঞ্চ জুড়িয়া, হাসিখুসী চপল চঞ্চল যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি তাহার পার্শ্বে এবং সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, তাহাদের সঙ্গে পড়া! এরচেয়ে পড়িতে না আসিলেই যে ছিল ভাল। এখন এ দুর্ভোগ সে কেমন করিয়া বহন করিয়া চলিবে! তার চেয়ে আপন গর্ব্বে আপনি মাথা উঁচু করিয়া পল্লীগ্রামের কোলে নিজের মূর্খতার সীমায় নিজেই আবদ্ধ থাকিতাম, তাইত ছিল ভালো।

একি এ দারুণ লজ্জা, একটা কিছু একবার বুঝিয়া, ভুলিয়া গেলে দ্বিতীয়বার আবার তাহাই নিয়া শিক্ষয়িত্রীর সম্মুখে দাঁড়াইতে লজ্জা করে যে—কিন্তু না শিখিয়া ক্লাসে গিয়াই কি দাঁড়ান যায়? ছোট ছোট মেয়েরা তাহার উপরে উঠিয়া যায়, তাহার চেয়ে ভাল উত্তর দেয়,—মালতীর সেই বোকা বোকা বিপন্ন ভাব দেখিয়া ক্লাসের শিক্ষয়িত্রী মুখ ফিরাইয়া হাসেন। মালতীর চোখে তাহা এড়ায় না, লজ্জায় সে আরক্ত হইয়া মাথাখানি প্রায় কোলের উপর নামাইয়া বসিয়া থাকে, এবং ক্লাসের ছুটির পর নির্জ্জনে বসিয়া চোখের জলে বই ভাসাইয়া দেয়। এতবড় মেয়ের পক্ষে কিছুই না জানিয়া, পড়িতে আসায় যে কি দারুণ লজ্জা, মালতী তাহা হাড়ে হাড়েই বুঝিতে লাগিল।

(১১)

মন দিয়া মন ধরা যায়, কর্ত্তব্যের কঠোর নিয়ম যাহাকে নরম করিতে পারে না,—বিদ্রোহী করিয়া তোলে,—একটী পলকের সস্নেহদৃষ্টি তাহাকে শান্ত করিয়া দেয়।

ক্লাসে সেদিন পড়াইতে বসিয়া নীরজাদি মালতীর এই বিপন্ন ভাবটুকু লক্ষ্য করিলেন, অতবড় মেয়েকে ক্লাসের এই

ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে একই ভাবে পড়াইয়া গেলে, তাহার যে কিছু সার্থকতা হইবে না, তিনি তাহা বুঝিলেন। ইহার জন্য বোর্ডিংএ অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা করিতে মনে মনে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই নবীনা শিক্ষয়িত্রীর বয়স খুব কম, এবং মাত্র মাস কয়েক আগে নিজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, বাড়ী ছাড়িয়া, ঘর ছাড়িয়া, ছোট ছোট ভাই-বোন গুলি এবং মা-বাপকে ছাড়িয়া নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাঁহাকে এ চাকুরী গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখন তখনই তাই তার মনে পড়িত, গৃহকোণে কর্ম্মরত রুগ্না তাঁহার মাকে, আর গৃহপ্রাঙ্গনে নির্দ্দোষ খেলায় রত, ছোট ছোট তাঁর ভাইবোন গুলিকে; তাই মালতীর এ অন্যমনস্ক ভাবটুকু তিনি বিদ্রূপ বা বিরক্তির চক্ষে কখনও দেখিতেন না, বরঞ্চ নিজের মনের সঙ্গে তুলনা করিয়া করুণায় মনটি তাঁহার গলিয়া যাইত।

সেদিন সন্ধ্যার পর, হলের বারাণ্ডায় একাকী বসিয়া মালতী তার অভিশপ্ত জীবনের কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় নীরজাদি তাহাকে তাঁহার নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং আদর করিয়া পাশে বসাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,"কি হয়েছে তোমার মালতী, কেন তুমি এমনি করে একলাটি ঘুরে বেড়াও ?"—কতদিন—কতদিন পরে নিতান্ত অচেনা অজানা জায়গায় অপ্রত্যাশিত ভাবে স্নেহের এ আহ্বান!—মালতীর চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। নীরজাদি সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, পড়া পার না, বোঝ না, বেশ ত, তাতে লজ্জাই বা কিসের এত, দুবেলা 'উপাসনার' ঘণ্টার পর তুমি আমার কাছে এসো, আমি তোমায় পড়া শিখিয়ে দেবো, বুঝিয়ে দেবো। দুবছরে আমি তোমায় দুক্লাশ উপরে প্রমোশন পাইয়ে দেবো, তুমি মন দিয়ে ক'দিন আমার কাছে পড় দেখি।

মন দিয়া পড়া! হায় কে পড়িবে, একলাইন পড়িতে যাকে পাঁচবার মায়ের কথা মনে করিয়া চোখ মুছিতে হয়,—সে দুবছরে দুক্লাশ উপরে প্রমোশন পাইবে! ইউরোপে কোথায় কোন পর্ব্বত ক'ফিট্ উঁচু, কোন্‌দিকে কোন্ নদী কোন্ প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া, কোন্ দেশকে শস্তশালিনী করিয়া কোন্‌দিকে আবার বাহির হইয়া গেল,—কোন্ প্রদেশের লোক সংখ্যা কত, মোগল পাঠানের বাদসারা কবে কোন্ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন, মালতীর চঞ্চল মন সে কথা কিছুতেই মনে রাখিতে পারিত না।

কিন্তু অধ্যবসায়ে নাকি সবই হয়, নীরজা দিদির আপ্রাণ চেষ্টায় মালতীও ক্রমে ঠিক হইয়া আসিতে লাগিল,—মালতীর পড়ায় ক্রমে মন বসিতে লাগিল, বোর্ডিং ক্রমে ভাল লাগিল, কিন্তু সবচেয়ে যেখানটায় তার চঞ্চল মনটী দৃঢ়ভাবে বাঁধা পড়িল, সে নীরজাদির স্নেহভরা বুক। বিদ্যার্জ্জনের নূতন স্পৃহায় মালতী ক্রমে ক্রমে মনের সমস্ত লজ্জা এবং জড়তা দূর করিয়া, বোর্ডিংএর অন্য মেয়েদেরই মত পড়াশুনা করিয়া, গান বাজনা শিখিয়া, বেড়াইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াই দিন কাটাইতে লাগিল। নির্জ্জনে বসিলে কদাচিৎ কি একটা কথা স্বপ্নের মত মনের কোণে জাগিয়া উঠে বটে, এবং জোর করিয়া সে-ই প্রধান হইয়া মালতীকে অনুক্ষণ অধিকার করিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু সুদূরে এক ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ে অবস্থিত দুঃখিনী মায়ের স্নেহমাখা উজ্জল চক্ষুদুটী মনে পড়িতেই মালতী সবলে তাহা দূরে ঠেলিয়া দেয়, এবং নবীন উৎসাহে আবার তাহার কল্যকার পড়া শিখিতে আরম্ভ করে। মনটা যখন খুব খারাপ হইয়া যায়, চক্ষু মুদিয়া মনে মনে সে তার রাধাবল্লভের কাছে বল ভিক্ষা করে—কবে কোনদিন কোন্ একটী মেয়ে গান গাহিয়াছিল,—

> বন্ধ দুয়ার দেখ্‌বি বলে
> অম্‌নি কি তুই আস্‌বি চলে,
> তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি
> হয়ত বাতি জ্বল্‌বে না,
> —তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।

মালতী চক্ষু মুদিয়া এই কথাগুলি হইতে মনে মনে জোর অনুভব করিতে চেষ্টা করে।

কন্যার দিন কাটে, কিন্তু মাতার দিন আর কিছুতে কাটিতে চায় না। তাঁহার নিরানন্দ জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল মালতী, তাহারই যত্ন করিয়া, তাহারই সঙ্গে কথা বলিয়া এবং সময়ে অসময়ে বকিয়া ঝকিয়া, কারণে অকারণে আদর করিয়া, তাঁহার সারাটী দিন কাটিয়া যাইত। আজ সে কাছে নাই, মাতার হাতের কাজও সব ফুরাইয়া গিয়াছে, দীর্ঘদিনের নিরানন্দ অবসরের ক্লান্তি এবং দীর্ঘ রজনীর অনিদ্রা

বা দুঃস্বপ্নের অবসাদ ক্রমে তাঁহাকে দুর্ব্বল এবং মলিন করিয়া তুলিতে লাগিল। সপ্তাহের যে দিনটী বোর্ডিং হইতে মালতীর চিঠি আসিবার নিয়ম, উন্মুখ আগ্রহে সেই দিনটী মাতা আর কিছুতে তাঁহার মনের চঞ্চলতা নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন না। কখনও কখনও মনে হয়,—'এমন যে করি, মালতী যদি শ্বশুর বাড়ী যেত, তবে ত এতটা দিনও কাছে রাখ্‌তে পারতাম না।' আবার মনে হয়,—'আহা, শ্বশুরবাড়ীতে যে মা ছাড়া আপনার লোক আরও থাকে, কন্যার মনে মাতার বিচ্ছেদ বেদনা ছাড়া অন্য সুখের কামনা এবং আকাঙ্খাও যে থাকে, কিন্তু তাঁহার মালতীর যে আর কিছুই নাই।' কিন্তু তথাপি একটা কথা সগর্ব্বে তাঁহার মনে জাগিয়া থাকে যে কন্যার ভাগ্যসম্পদ দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সমস্ত সর্ব্বনাশের কবল হইতে, সমস্ত অমঙ্গলের হাত হইতে,—সমাজের মিথ্যা নিন্দার ভয় তুচ্ছ করিয়া—কন্যাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছেন।

* * * *

নলিনের সংবাদ বহু চেষ্টাতেও কোথাও পাওয়া যাইতে ছিল না, কিন্তু সহসা যুদ্ধ ফেরতা, পাশের গ্রামের একটী মুসলমান যুবক আসিয়া বলিল, একবার কয়েকটী বাঙ্গালী যুবক ভয়ঙ্কর রকমে আহত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মারা গিয়াছে। কিন্তু এইদলে নলিন ছিল কি না তাহা সে বলিতে পারে না। এই সংবাদের পর নলিনের মাতাকে কিছুতে আর গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা গেল না; তিনি দেশ ছাড়িয়া অন্য কোথাও গিয়া কিছুদিন সব ভুলিয়া থাকিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। জমিদারবাবু বিশেষ আপত্তি করিতে পারিলেন না এবং একদিন সস্ত্রীক বাড়ীঘর ছাড়িয়া তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু দেহের প্রতি নানা অত্যাচার এবং অসহ্য মানসিক যন্ত্রনা নলিনের মাতাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল, বেশীদিন আর তাঁহাকে শান্তি খুঁজিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইল না। কাশীধামে একদিন রাত্রিবেলা বুকে একটা বেদনা বোধ করিতে করিতে সহসা শ্বাসরোধ হইয়া তাঁহার অনুতপ্ত ব্যথিত ব্যর্থ জীবন শেষ হইয়া গেল। ভগ্নমনে জমিদারবাবু একাকী তাঁহার নিরানন্দ ভবনে ফিরিয়া আসিলেন।

কাহারও সুখ-দুঃখের মাপকাটি লইয়া দিন চিরকাল কখনও বসিয়া থাকে না। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল, বৃদ্ধ জমিদার বাবুর শোকজীর্ণ দেহে প্রাণটী যেন যাই যাই করিয়াও আরও কয়েকটা দিন কাটাইয়া দিতেছে,—তাঁহার মন শূন্য, গৃহ শূন্য। মাহিনা করা চাকর ঝির অভাব নাই, কিন্তু তাহাদের দেখিলেই জমিদার বাবুর মন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত। আদর করিয়া দু'টি সান্ত্বনার বাণী শোনাইতে, পরমস্নেহে তাঁহার পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহখানি নাড়িয়া চাড়িয়া সরাইয়া দিতে ইহাদের মধ্যে কেহ ত নাই! ইহারা অর্থের সঙ্গে সমান ওজনে কাজ মাপিয়া লয়, সুবিধা পাইলে ফাঁকি দিতেও ছাড়ে না, সুতরাং ইহাদের সেবায় জমিদার বাবুর ভগ্নমনে সান্ত্বনা ত আসিতই না, বরঞ্চ অনেক সময় শত সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও একটা দারুণ ঘৃণায় ইহাদের সঙ্গে কথাটীও বলিতে তাঁহার ইচ্ছা করিত না। মাঝে মাঝে বড় দুঃখের সময় দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি তাঁহার বুকে ফুটিয়া উঠিত, মনে হইত—একটীবার কি সে কাছে আসিতে পারে না? একটী দিন কি সে তাহার কোমল স্পর্শটুকু দিয়া এই অর্দ্ধমৃত দেহটাকে একটু আরাম দিয়া যাইতে পারে না?—কিন্তু আজ তাহাকে ডাকিয়া আনিবার কি অধিকার তাঁহার আছে? কোন্ দাবীতে তিনি তাঁহার এই নিরানন্দ ভবনে তাহার সহস্র ক্ষতি জানিয়াও তাহাকে ডাকিয়া আনিতে পারেন? হায়রে,—আজ তাঁহার যদি অন্ততঃ একটীমাত্র মেয়েও থাকিত! স্নেহবুভুক্ষু বৃদ্ধের বুক গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিত। মনে হইত, হতভাগ্য নলিনটা অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়া বিদেশে বিভুঁয়ে একলাটী গিয়া অপঘাতে প্রাণ হারাইল, আজ সেও যদি কাছে থাকিত! বাপের বুকভরা এত স্নেহ ত সে দেখিল না, একদিনের তিরস্কারটাই কি তাহার চোখে এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল? অর্থের তাহার অভাব ছিল না, লোকে তাহার বাড়ী পূর্ণ, কিন্তু হতভাগার কি তেমন চিকিৎসা হইয়াছে, না তেমন সেবা হইয়াছে?

মালতীর মা প্রতিদিনই আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া যাইতেন, ও দূরে থাকিয়া যতখানি সম্ভব হয় চাকর-ঝিদের ডাকিয়া সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া

দিতেন, এবং সহর হইতে প্রতিদিনই বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করাইয়া লইতেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইত না। বৃদ্ধের জীবন প্রদীপ নিবু নিবু করিয়াও কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতে লাগিল।

একদিন সহসা মালতীর মা আসিলে বৃদ্ধ মালতীকে একটীবার বোর্ডিং হইতে আনাইবার অনুমতি চাহিয়া বসিলেন; মালতীর মাও কয়দিন হইতে এই কথাই ভাবিতে-ছিলেন, কিন্তু জমিদারবাবু পাছে অমত করিয়া বসেন, তাই এতদিন আর কথাটা পাড়িতে পারেন নাই। আজ তাঁহার নিজেরই ইচ্ছা জানিয়া মালতীকে আনানোই তাঁহার কর্ত্তব্য মনে হইল, কিন্তু তাঁহার মনে মনে আর একটা ভয়ও খুব ছিল, জমিদার বাবুর এক যুবক ভাগিনেয় ক'দিন হইতে সর্ব্বদাই কলিকাতা হইতে আসিয়া মামার খোঁজ খবর লইয়া যায়, বড় বড় ডাক্তার ডাকা এবং তাঁহাদের পরামর্শানুসারে কাজ করা এবং দরকার বোধ হইলে দুই তিন দিন নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষাদিও করে। নিজেও সম্প্রতি সে ডাক্তারি পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে, তাই সেবা শুশ্রূষাদির সুবিধার জন্য মামা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কলিকাতায় তাহার কি একটা কাজ ছিল তাই সে সর্ব্বদা এখানে থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রতিদিনই একবার আসিয়া নিজের হাতে সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়া যায়। মালতীর মাতা কন্যাকে আনাইবার পূর্ব্বে একবার এই তরুণ বয়স্ক সুন্দর যুবকটীর কথা মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু অবশেষে বৃদ্ধের অন্তিম বাসনা এবং আপনাদের প্রতি তাঁহার শত সহস্র উপকারের কথা স্মরণ করিয়া তাহার কৃতজ্ঞচিত্ত আপনিই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল।

পৌষ মাস, বড়দিনের ছুটী হইয়া গিয়াছে, মালতী পরীক্ষার পর এবারে ম্যাট্রিক ক্লাসে প্রমোশন পাইয়া বাড়ী আসিল, মাতা তাহাকে লইয়া জমিদার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার আদেশে মালতী প্রথমদিন হইতেই মেসো মহাশয়ের শয্যাপার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল।

বোর্ডিংএ 'সেবা বিভাগে' কাজ শেখা, লেখাপড়ার মতই একটা অবশ্য করণীয় কাজ, সুতরাং মালতী তাহার নিপুণ ক্ষুদ্র হাত দুখানিতে মেসো মহাশয়ের যাহাই কিছু করিত, তাহাতেই তিনি পরম পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতেন; অবশেষে এমনই হইয়া উঠিল যে মালতী ছাড়া তাঁহার কোন কাজই চলে না; যখন কোন কাজ না থাকে তখনও মালতীকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বেই বসিয়া থাকিতে হয়। তিনি কখনও মালতীকে নীরবে শুধু চাহিয়া দেখেন; কখনও মালতীকে আদর করিতে গিয়া বালকের ন্যায় উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে তাহাকেও অস্থির করিয়া তোলেন; কখনও বা নানা কথা বলিয়া নিজের দুর্ব্বল মাথা গরম করিয়া তোলেন, এবং কখনও বা আপনি শ্রোতা হইয়া মালতীর কথা শুনিতে চান।

নরেনের কলিকাতার কাজ এতদিনে শেষ হইয়া গিয়াছিল, এবার হইতে সেও আসিয়া মামার ঘরেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। মালতীর মাতা প্রথমে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং অহর্নিশ কন্যাকে চোখে চোখে রাখিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। মালতীর নিজের সেদিকে কোনও দৃষ্টিই নাই, সে নরেনের দিকে চাহিয়াও দেখিল না। নরেন মালতীর সাহায্য করিতে গেলে সে তাহাতেও আপত্তি করিল না, এবং প্রয়োজন হইলে কথাও বলিতে লাগিল; কিন্তু অন্য সময় তাহার মুখের দিকে একবার চোখ তুলিয়াও তাকাইত না। তাহার নিতান্ত সহজ সরল ব্যবহারে লজ্জার জড়তা ছিল না। কিন্তু নরেনের আপনাকে সতর্ক রাখিবার কোনও চেষ্টাই ছিল না, সে মালতীর আশ্চর্য্য সেবা-পরায়ণতা এবং সুন্দর শিক্ষা ও অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া বিস্ময়ে-স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিত। এই অল্পভাষিণী মৃদুপ্রকৃতি সেবিকাটীর মধ্যে কি যেন একটা জিনিষ ছিল যাহার আকর্ষণে নরেনের সমস্ত চিত্ত প্রতিমুহূর্ত্তে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে তাহার সম্মুখে লুণ্ঠিত হইতে চাহিত। তাহাদের দেশে এবং সমাজে এমনটী ত সে আর কোথাও দেখে নাই; তাহার মনে হইল, যেন যুগযুগান্ত ধরিয়া তাহার পিপাসু তরুণ-হৃদয় এমনই একটী তরুণী রূপসীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, যেন জীবনের সঙ্গিনী করিতে এমনই একটী সর্ব্ববিষয়ে সহকর্ম্মিনী এবং সহযোগিনী না হইলে জীবনটা অসমাপ্তই রহিয়া যায়,—কিন্তু নরেনের যৌবন-বনে বসন্তের হিল্লোল অতি গোপনেই বহিয়া চলিল, এবং তাহার চঞ্চল মনে আশা ও নৈরাশ্যের এক প্রবল সংগ্রাম অহর্নিশ সমানভাবে রহিয়া রহিয়া চলিল, নরেনের সম্বন্ধে নিতান্ত অমনোযোগিনী তাহার এই পার্শ্ববর্ত্তিনী সেবিকাটীও সে বিষয়ে আভাষমাত্র জানিতে পারিল না।

কিন্তু এমনই সময়ে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বৃদ্ধ জমিদারের জীবন মরণ সমস্যা লইয়া সংসারে যখন একটা প্রবলভাবে নাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং মালতী তাহাতেই সমস্ত প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া দিয়া সংসারের আর সকলই ভুলিয়া গিয়াছে, তখনই একদিন, মাত্র তিনদিনের ইনফ্লুয়েঞ্জায়, বিনা চিকিৎসায়, এবং বিনা সেবায় মালতীর মা কন্যার ভালোমন্দের চিন্তা সঙ্গে লইয়াই চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিলেন।

(ক্রমশঃ)

মলুয়া *

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

আশ্বিনের জলপ্লাবনে দেশে দুর্ভিক্ষ হইল। চাঁদবিনোদ সর্ব্বনাশ গণিল।

মায়ে কান্দে, পুত্র কান্দে, শিরে দিয়ে হাত,
সারা বছরের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত।
টাকায় দেড় আড়া ধান, পইড়াছে আকাল,
কি দিয়া পালিব মায় দুধের ছাওয়াল।

টাকায় ৬ মণ ধান, দারুণ আকাল, হালের গরু, জমি জমা বেচিয়া চাঁদবিনোদ কিছুদিন চালাইল। জ্যৈষ্ঠ মাসেতে জননীর অনুমতি লইয়া চাঁদবিনো'দ 'কুড়া' পাখী শিকারে বহির্গত হইল। পথে ভগ্নীর বাড়ী হইয়া পালা কুড়া লইয়া চাঁদবিনোদ কুড়া শিকারে গেল।

একেলা থাকিয়া ঘরে কান্দে তার মায়
কি জানি যাদুরে মোরে সাপে বাঘে খায়।

২

কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে,
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে।

চাঁদবিনোদ আড়ালিয়া গ্রামে উপস্থিত হইল। কদম গাছে একগাছ কদম ফুল ফুটিয়া আছে, তাহার তলে এক পুষ্করিণীর পাড়ে বিনোদ দিনের দুপুর কাটাইল। এদিকে সন্ধ্যা হইল তবু ঘুম ভাঙ্গে না। মলুয়া সুন্দরী জল আনিতে সেই ঘাটে আসিল। তাহার জল ভরণের শব্দে চাঁদবিনোদের ঘুম ভাঙ্গিল।

ভিন দেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইল কন্যার প্রথম যৌবন।

৩

মলুয়ার বাপ জাতিতে কৈবর্ত্ত দাস, নাম হীরাধর। তার পাঁচ পুত্র, ঘরে দশটী দুধ বিয়ানী গাই আছে, সারি সারি গোলাভরা ধান আছে, দোল দুর্গোৎসব হয়, বাপ মায়ের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করায়। মলুয়ার বয়স বার বছর, কন্যা পরমা সুন্দরী। ভাল ঘর ও ভাল বরের অভাবে এখনো বিয়া হয় নাই।

৪

আবার সন্ধ্যাবেলা সেই পুষ্করিণীর ঘাটে চাঁদবিনোদের সঙ্গে মলুয়ার দেখা—

কিসের ছান, কিসের পাণি, কিসের জল ভরা,
দুইএর প্রাণে টান পইড়াছে এমন প্রেমের ধারা।

চাঁদবিনোদ এবার তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল—

বিয়া যদি হইয়া থাকে হও পরের নারী,
সেও কথা কও কন্যা আজি সত্য করি।

মলুয়া তাহার পরিচয় দিল এবং বলিল :—

সাধুমন্ত বাপ আমার, মাও যে সুজন,
ঘরেতে আমার আছে ভাই পঞ্চ জন।
পঞ্চ ভাইএর বউ আছে, ইষ্টি কুটুম করি,
আজ নিশি অতিথ হইয়া রইবা আমার বাড়ী।

৫

সন্ধ্যাবেলা চাঁদবিনোদ হীরাধরের বাড়ী অতিথ হইল। ছত্রিশ জাতি বেন্নুন, পুলি পিঠা প্রভৃতিতে চাঁদবিনোদ পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিল। আবের পাখা হাতে শীতল

---

* ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুরের 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মলুয়া একটী অপূর্ব্ব চরিত্র। সচিত্র শিশিরের পাঠক পাঠিকার নিকট আমার অনুরোধ যেন প্রত্যেকেই উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করেন; মূল্য পাঁচ টাকা একটু অধিক বটে কিন্তু পাঁচ টাকা মূল্যের নভেল পাঠ করিয়া ইহার শতাংশের এক অংশ আনন্দও পাইবেন না, ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি। বঙ্গভাষায় এই গীতিকার মতন সুন্দর জিনিষ বিরল।

পাটীতে শয়ন করিয়া পরদিন সকলকে প্রণাম করিয়া পরিচয় দিয়া চাঁদবিনোদ বিদায় লইল।

৬

মলুয়ার সহিত চাঁদবিনোদের বিবাহের প্রস্তাব উঠিল—

বর ত পছন্দ হয় কার্ত্তিক কুমার,
বংশেতে কুলীন সেই যত হালুয়ার।
হালুয়া গোষ্ঠীর মধ্যে বড় বাপের বেটা
বংশেতে কুলীন সেই নাই কোন খোঁটা।
এক কাঠা ভুঁই নাই লক্ষী পাতিবারে
কেমন করে বিয়া দিব সে কন্যা এই ঘরে।

৭

কুড়া শীকার করিয়া বিনোদ অনেক জমি জমা টাকা কড়ি পাইল, তাহার ঘরে লক্ষী অচলা হইলেন। হীরাধর যাচিয়া মলুয়ার সহিত চাঁদবিনোদের বিবাহ দিল। খুব ধুমধামের সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বাড়ীর শোভা বাগ বাগিচা, ঘরের শোভা বেড়া,
কুলের শোভা বউ—শাশুড়ীর বুকজোড়া।

৮

পরে কি হইল শোনো। লুচ্চা ছুবমণ কাজী বিড়ম্বন কৈল।

বড়ই ছুরন্ত কাজী ক্ষমতা অপার
কুলের বধু বাহির করে অতি দুরাচার।

একদিন পুকুর ঘাটে মলুয়াকে দেখিয়া কাজী পাগল হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া নিতাই নামে একটা হীনচরিত্রা বৃদ্ধাকে তাহার বেদন মলুয়াকে জানাইতে বলিল। একশত টাকার লোভে নিতাই মলুয়ার কাছে গেল এবং তাহার শাশুড়ী বাড়ীতে নাই দেখিয়া কাজীর কথা পাড়িল।

নিখা যদি কর তারে ভাল যত চাইয়া
তার ঘরের যত নারী রইবে বান্দী হইয়া।
সোণা দিয়া বেইরা দিবে সর্ব্বাঙ্গ শরীর
সাত খুন মাপ তোমার বিচারে কাজীর।
সোণার পালঙ্ক দিবাম সাজুয়া বিছান
গলায় গাথিয়া দিবাম মোহরের থান।

মলুয়া রুখিয়া বলিল :—

স্বামী মোর ঘরে নাই কি বলিবাম তোরে,
থাকিলে মারিতাম ঝাঁটা তোর পাকনা শিরে।
ফুল বেচে খাইছ তুমি বয়সের কালে,
সেই মত দেখ বুঝি নাগরিয়া সকলে।
কাজীরে কহিও কথা, নাহি যাই আমি
রাজার দোসর সেই আমার সোয়ামী।
আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চূড়া,
আমার সোয়ামী যেমন রণ দৌড়ের ঘোড়া।
আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান
না হয় ছুবমন কাজী নখের সমান।
ছুবমন কুকুর কাজী পাপে দিল মন,
ঝাঁটার বাড়ী দিয়া তারে করতাম বিড়ম্বন।
বেঁচে থাকুক সোয়ামী আমার লক্ষ পরমাই পাইয়া
থানের মোহর ভাজি কাজীর পায়ের লাথি দিয়া।
জাতে মুসলমান কাজী, তার ঘরের নারী
মনের আপছুস মিটাক তারা সাত নিকা করি।

নিতাই অপমানীত হইয়া কাজীর নিকট সব কথা জানাইল। কাজী প্রতিশোধ লইবার জন্য চাঁদবিনোদের উপর বিবাহের নজর 'মবেয়া' দেওয়ানের প্রাপ্য ৫০০ পাঁচশত টাকার জন্য পরোয়াণা জাহির করিল। না দিলে বাড়ী জমি সব বাজেয়াপ্ত হইবে।

পঞ্চ শত রূপা সেত কম বেশী নয়
কোথায় পাইবে বিনোদ ভাবয়ে চিন্তয়।

কাজী ঝাণ্ডা গারি দিয়া জমী বাজেপ্ত করিল। হালের বলদ দুধের গাই রঙিন আটচালা ঘর, সব বেচিয়া বিনোদ দিন চালাইতে লাগিল। বিনোদ মলুয়াকে একদিন বলিল—

পঞ্চ ভাইয়ের বইন তুমি দুঃখ নাহি জান
ফুল ছিটকি নাহি সয় তোমার পরাণ।

অতএব তুমি বাপের বাড়ী গিয়া রাজার হালে সুখে থাক, এত দুঃখ সহিতে পারিবে না। মলুয়া বলিল :—

বনে থাক ছনে থাক গাছের তলায়
তুমি বিনে মলুয়ার নাহিক উপায়।

সাত দিনের উপাস যদি তোমার মুখ চাইয়া
বড় সুখ পাইলাম চন্দ্রমূর্ত্তি খাইয়া।
শাক ভাত খাই যদি গাছতলায় থাকি
দিনের শেষে দেখলে মুখ হইব যে সুখী।
পৃথিমীর সুখ মোর তোমার পায়ের ধূলা
বাপের বাড়ী না যাইবাম আমি ত একেলা।

৯

নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া আষাঢ় মাস খাইল,
গলার সে মতির মালা তাও বেচ্যা খাইল।
শায়ণ মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে,
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে।
শতানি অঙ্গের বাস হাতের কঙ্কণ বাকী
আর নাহি চলে দিন মুঠি চাউলের থাকী।

চাঁদবিনোদ এত কষ্ট দেখিতে না পারিয়া একদিন নিশাকালে বিদেশে রওনা হইল।

১০

এই দুঃখের দিনে কাজী পুনরায় নিতাইকে মলুয়ার নিকট পাঠাইল, সে বলিল :—

ধান ভান, সুতা কাট না সাজে তোমায়,
এমন অঙ্গে ছেঁড়া কাপড় শোভা নাহি পায়।
সোণায় মুড়িয়া দিবে অঙ্গ যে তোমার
কাজীরে করিয়া সাদি ঘরে যাও তার।

কন্যা রক্তজবা আঁখি করিয়া নিতাইকে বলিল :—

বিদেশে গিয়েছে সোয়ামী বড় পাই তাপ
তোর মুখ দেখিলে মাগি মোর বাড়ে পাপ।
আন্ধারে কাটিব আমি দুঃখের দিবা রাতি
কাজীরে কহিও তার মুখে মারি লাথি।
পঞ্চ ভাই আছে মোর যমের সমান
তোর সে কাটিব নাক, কাজীর কাটব কাণ।

মলুয়ার দুঃখ শুনিয়া তাহার পাচ ভাই দেখিতে আসিল।

অঙ্গেতে মৈলান বসন শত জোরা তালি,
ধূলা মাটী লাগ্যা বহিনের অঙ্গ হইছে কালি।
খালি ভুমে পইরা বইন শুইয়া নিদ্রা যায়
শীতল পাটী ঘরে দেখ তুল্যা রাখছে মায়।
ঘুমাইতে না পারে বইন মশার কামড়ে
আবের পাখা ঝালুরের মশইর টাঙ্গাইন তোমার ঘরে।
ভাত ফালাইয়া ভাত খাও বাপের বাড়ী
উপস কইরাছ বইন শুন্যা দুঃখে মরি।
বাপের বাড়ী না যাও কাইল বিয়ানে তুমি
উপস থাকিয়া মায়ে ত্যজিবে পরাণি।

মলুয়া পঞ্চ ভাইএর গলা ধরিয়া কাঁদিল—

ভালা ঘরে দিছলা বিয়া ভালা বরের কাছে
কেমনে খণ্ডাইবা দুঃখ কপালে যা আছে।
শশুর বাড়ীতে থাকবাম আমি করিয়াছি মন
সেই ত আমার গয়া কাশী সেই ত বৃন্দাবন।
পঞ্চ ভাইএর বউ আছে দেখি তাদের মুখ
কিছু ত মায়ের তবু ঠাণ্ডা হবে বুক।
বুড়া শাশুড়ী আমার, পুত্র নাই ঘরে
কি দেখ্যা মায়ের কষ্ট এই দুঃখু পাশরে।

এই কথা শুনিয়া পাচ ভাই ফিরিয়া গেল। এইরূপ কষ্টে বৎসর গেল। একদিন বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া চাঁদবিনোদ গৃহে ফিরিল। নজর দিয়া জমী ছাড়াইল, নূতন করিয়া ঘর বাড়ী করিল।

মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল,
তার থাক্যা অধিক মিঠা শীতল ডাবের জল।
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ,
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক।
তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারাণো ধন
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন।

১১

সুখে দিন যায়, এমন সময় এক দারুণ সমস্যা উপস্থিত হইল। দুরন্ত কাজী সলা করিয়া বিনোদকে ফেরে ফেলাইল। "তোমার ঘরে পরমা সুন্দরী নারী আছে, দেওয়ান সাহেব তাহার সংবাদ পাইয়াছেন, সপ্তাহের মধ্যে যদি তোমার নারী দেওয়ান সাহেবের কাছে না পাঠাও, তোমার গর্দ্দান যাইবে।"

সপ্তাহ পরে হুকুম তামিল না করায় পেয়াদা মির্জ্জা আসিয়া বিনোদকে ধরিয়া 'নিরলইশকার' ময়দানে জীয়ন্তে কবর

দিবার জন্য লইয়া গেল। বিনোদের মাতা হায় হায় করিয়া মাটীতে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল।

যমে যদি নিত পুত না থাকিত আড়ি,
মানুষের হাতে গেল প্রাণ কেমনে পাশরি।

মলুয়া গোপনে এক পত্র লিখিয়া কোড়ার মুখে দিয়া ভাইদের নিকট পাঠাইল। বহুকালের পালা কোড়া ভাইয়ের বিদ্যমানে উড়িয়া গেল, তাহারা লাঠী লোকজন লইয়া বিনোদকে খালাস করিল এবং মলুয়ার নিকট আসিল।

শূন্য ঘর পইর্যা আছে নাহিক সুন্দরী
রাবণে হরিয়া নিছে শ্রীরামের নারী।
খালি পিঁজরা পইর্যা আছে উইর্যা গেছে তুতা
নিভেছে নিশার দীপ কইর্যা আঁধারিতা।

মলুয়াকে দেওয়ান জাহাঙ্গীরের লোক জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে। বিনোদের রোদনে বুকের পাঁজর ভাঙ্গে।

পইরা রইছে চানের কলসী আছে সব ভাই
ঘরের শোভা মলু আমার কেবল ঘরে নাই।
বনের কোড়া মনের কোড়া বাল্য কালের ভাই
তোমার জন্য যদি আমি মলুর উদ্দিশ পাই।
মায়েরে লইয়া বিনোদ কোড়া সঙ্গে লইল,
বাড়ী ঘর ছাইর্যা বিনোদ দেশান্তর হইল।

১২

দেওয়ান জাহাঙ্গীর সাহেবের হাউলীতে মলুয়া সুন্দরী কান্দে, দেওয়ান কত লোভ কত ভয় দেখায়। মলুয়া বাঘের কামড়ে হরিণীর মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে—

বার মাসের ব্রত আমার নয় মাস গেছে
প্রতিষ্ঠা করিতে আর তিন মাস আছে।
শুন শুন দেওয়ান সাব কহি যে তোমারে
প্রতিজ্ঞা করহ তুমি আমার গোচরে।
না খাইব উচ্ছিষ্ট অন্ন না [illegible] পাণি,
এক জালে খাইব অন্ন, [illegible] আলুণি।
পরপুরুষের মুখ কভু না দেখিব।
এ কথা অন্যথা হলে হইবা দুষমন
বিষপাণী খাইয়া আমি ত্যজিবাম জীবন।

তিন মাস পরে দেওয়ান আবার হাজির। কন্যা বলিল দুষ্ট কাজী অবিচারে আমার স্বামীকে [illegible]ইকার চরে জীবন্তে কবর দিয়াছে। সে বাঁচিয়া থাকিতে মনের মিলন হয় না। দেওয়ান তৎক্ষণাৎ শূলে চড়াইবার হুকুম দিল।

মলুয়া খুসী হইয়া বলিল, দেওয়ান সাব, বার মাসের আর বার দিন মাত্র বাকী। ভাউলিয়া সাজাইয়া কোড়া শিকারে চল, আমি স্বামীর নিকটে শিকারের নানা ফন্দী জানি। দেওয়ান রাজি হইল। এদিকে মলুয়া পালা কোড়ার মুখে ভ্রাতাদিগকে খবর দিল।

বিস্তার ধলাই বিল পদ্মফুলে ভরা
কোড়া শিকার করতে দেওয়ান যায় দুপুর বেলা।
সঙ্গেতে মলুয়া কন্যা পরমা সুন্দরী,
পানসী লইয়া পঞ্চ ভাই লইলেক ঘেরি।
লাঠীর বাড়ীতে ছিল যত দাঁড়ী মাঝি
উপুড় হইয়া জলে করে কেঁচামেচি।
পঞ্চ ভাইয়ের পানসীখানা দেখিতে সুন্দর
লম্ফ দিয়া উঠে কন্যা তাহার উপর।
অষ্ট দাঁড়ে মারে টান জ্ঞাতি বন্ধু জনে
পঙ্খী উড়া করে পান্সী ভেঙ্গে পদ্মবনে।
সোয়ামী সহিত মলুয়া যায় বাপের বাড়ী
শ্রীরাম উদ্ধার করে যেন আপনার নারী।

১৩

এদিকে আত্মীয় বন্ধুগণ দুর্ম্মুনি করিল। বিনোদের মামা জাতিতে কুলীন, সে বলিল—

ভাগিনা বউএর হাতে ভাত খাইতে নারি
জাতিতে উঠুক বিনোদ পরাচিত্রি করি।

বিনোদের পিসার সেই মত, কাজেই ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়া বিনোদ জাতিতে উঠিল। মলুয়াকে ত্যাগ করিল। সতী মলুয়া 'বাইর কামুলী' বাহিরের চাকরাণী হইয়া স্বামী গৃহে রহিল, তবু পিতার কাছে গেল না।

বাইর কামুলী হইয়া আমি থাকবাম সোয়ামীর বাড়ী
গোবর ছড়া দিয়াম আমি সকাল সন্ধ্যা বেলা।

অন্নজল দিতে পারিব না। সোয়ামীর ভাল দেখিয়া বিয়া দিবার জন্য পঞ্চ ভাইকে অনুরোধ করিল। বিনোদের বিবাহ হইল। সতীনকে মলুয়া মনের হরষে রাখে। সোয়ামী শাশুড়ীর সেবা করে।

১৪

আবার এক ঘটন ঘটিল। বিনোদ কোড়া শিকারে গিয়াছিল, সেখানে তাহাকে কাল নাগে দংশন করিল। অভাগিনী মা কাঁদিয়া আকুল। ভূমেতে পড়িয়া মলুয়া সুন্দরী কাঁদে।

হায় প্রভু কোথা গেলা অঞ্চলের ধন
তোমারে ছাড়িয়া কেমনে রাখিতাম জীবন।
তোমারে থুইয়া কেন মোরে না খাইল নাগে
বাহির-কামুলীরে নাহি খায় জঙ্গলার বাঘে।
বাইরে থাকি বার-কাম্‌লী বাইরের কাজ করি,
সোয়ামীর মুখ চাহিয়া আমি মান পাশরি।

শেষে পঞ্চ ভাইএর সহিত পানসী করিয়া মলুয়া গাড়রী ওঝার বাড়ী চাঁদ বিনোদের মৃতদেহ লইয়া উপস্থিত হইল। গাড়রীর ঔষধ ও মন্ত্রে চাঁদ বিনোদ বাঁচিয়া উঠিল।

পতি জিয়াইয়া সতী ফিইর‍্যা আইল ঘরে
জয় জয় ধ্বনি হইল জুড়িয়া নগরে।
কেউ বলে বেহুলা জিয়াইল লখীন্দরে
কেউ বলে সতী কন্যা গেছিল দেবপুরে।
পাণ ফুল দিয়া কন্যায় তুইল্যা লও ঘরে
সতী কন্যা হইয়া কেন কামুলির কাম করে।
মরা পতি জিয়াইয়া আনে যেই নারী
তাহারে সমাজে লইতে কেন দ্বমত করি।

১৫

বিনোদের মামা ও পিশা পুনরায় আপত্তি করিল। মলুয়া দেখিল সে বাঁচিয়া থাকিতে সোয়ামীর সুখ নাই, তাই প্রাণত্যাগ করিতে মনস্থ করিল।

ঘাটেতে আছিল বাঁধা মন পবনের নাও
দুপুরিয়া কালে কন্যা নাওয়ে দিল পাও।

ঝলকে ঝলকে ভাঙ্গা নায়ে জল উঠে, বিনোদের ভগ্নী জলের ঘাটে ধাইয়া আসিল।

শুন শুন বধূ ওগো কইয়া বুঝাই তোরে
ভাঙ্গা নাও ছাইর‍্যা তুমি আইস মোদের ঘরে।

মলুয়া ফিরিল না, কঙ্কাবতীর ন্যায় তাহার নাও বাহির দরিয়ায় যাইতে লাগিল। শাশুড়ী দৌড়িয়া আসিল—

শুনগো পরাণ বধূ কইয়া বুঝাই তোরে
ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার ফিইরা আইস ঘরে।
ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরে বাতি
তোমারে না ছাইর‍্যা থাকিবাম এক দিবা রাতি।
"উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও
বিদায় দেও মা জননী ধরি তোমার পাও"

একে একে গর্ভ-সোদর ভাই, ও পতি বন্ধু ছুটিয়া আসিল।

মলুয়া ফিরিল না—

না যাইবাম না যাইবাম ভাই আর সে বাপের বাড়ী
ভাইএর কাছে বিদায় মাগে মলুয়া সুন্দরী।
নৌকা ডুবু ডুবু—চাঁদ বিনোদ ছুটিয়া আসিল।
চাঁদ সুরয ডুবুক আমার, সংসারে কাজ নাই,
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাহি চাই।
ঘরে তুল্যা লইবাম তোমায় সমাজে কাজ নাই
জলে না ডুবিও কন্যা ধর্ম্মের দোহাই।

মলুয়া বলিল :—

আমি নারী থাকিতে তোমার কলঙ্ক না যাবে
জ্ঞাতি বন্ধু জনে তোমায় সদাই ঘাটিবে।
এখান হইতে সোয়ামী মোর চইল্যা যাও ঘরে
কলঙ্ক জীবন মোর ভাসাইব সাগরে।
ঘরে আছে সুন্দরী নারী তার মুখ চাইয়া
সুখে কর গৃহবাস তাহারে লইয়া।
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও
অভাগীরে রাইখ্যা তুমি আপন ঘরে যাও।

তারপর মলুয়া শাশুড়ীকে বলিল—

শুনগো শাশুড়ী আমার শত জন্মের মাও
এইখানে থাক্যা প্রণাম করি তোমার দুটী পাও।

তারপর সতীনকে বলিল—

আজি হইতে না দেখিবা মলুয়ার মুখ
আমার দুঃখ পাশরিবে দেখি স্বামীর মুখ।

তারপর—

পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠে দেওয়া
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেয়া!
ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কতদূর
ডুইব্যা দেখি কতদূর আছে পাতাল পুর।
পূবেতে গর্জ্জিল মেঘ ছুটল বিষম বাও
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মন পবনের নাও॥

বার-বণিতা

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

এ যে দেব-দেউলের ধ্বজ-পতাকাটি
গিয়াছে পড়ি,
কালাপাহাড়ের আঘাত-চিহ্ন
বক্ষে করি!
স্মৃত-পুর-দীপ গিয়াছে নিভিয়া
আঁধার কক্ষ উঠে শিহরিয়া
থেমে গেছে যেন সমারোহ এক
মধ্যপথে,
বাঁশরী একটি গিয়াছে ভাঙিয়া
দলিত পদে।

এ যে শ্রাবণের চির-প্লাবন-ধারায়
পাবক শিখা;
অন্নদা-দ্বারে ক্ষুধিতে বিদায়—
আদেশ লিখা!
ধনীর এ কোষ যেন রে মুক্ত
মিছে ব্যয়ে, ত্যজি যত অভুক্ত
এ এক স্বর্গ ধূলায় লুটায়
চরণ-তলে,
অমৃত-পাত্র ভাসিছে অকূল
স্রোতের জলে।

এ যে মলয় মারুত বিষ-বিস্বাদ
হয়েছে পথে
এ কি এ গলিত কুষ্ঠ আসীন
রূপের রথে?
টানে প্রাণপণে কত না ভক্ত—
এ রথের রসি, মোহানুরক্ত,—
রথপতি শুধু হাসিছেন বসি
চলে না রথ,
সকল শক্তি প্রয়াস বিফল
ব্যর্থ শ্রম।

এ যে করুণা খানিক কাঁদিছে একাকী
পথের পাশে
সলাজ সজল কাজল আঁখিটি
নমিত ত্রাসে!
আদর লালিত দুলাল এ কা'র
খেলে নদীকূলে কেহ নাহি যার,
নিঠুর মধুর চাহনি এ কা'র
ব্যঙ্গ-মাখা,
এ যে পরিহাস অশ্রু-হাসিতে
শোণিতে আঁকা।
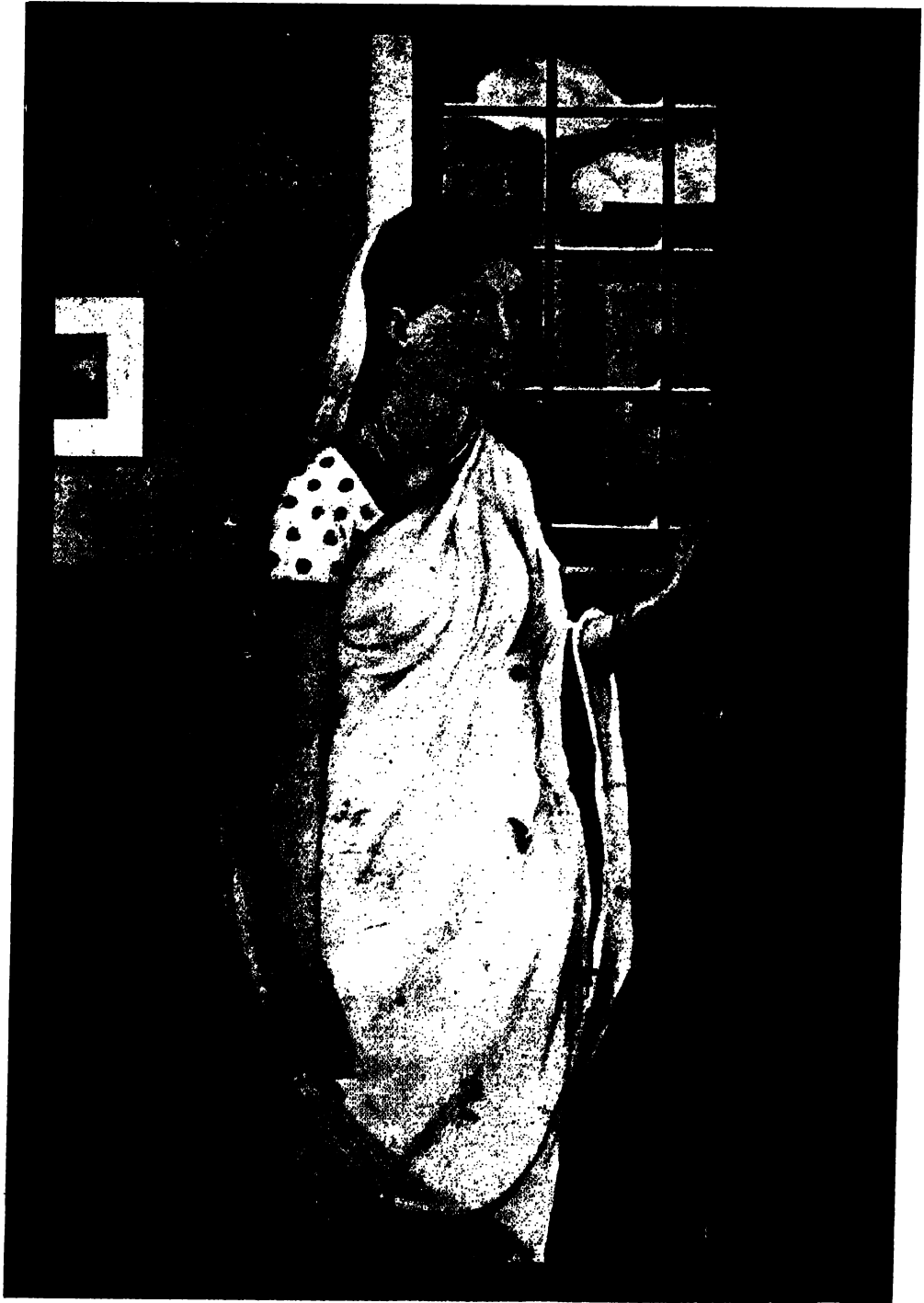
বাতায়ন পথে

শিল্পী —শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র সিংহ।

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১৪ই আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [ত্রয়োত্রিংশ সপ্তাহ

মঘা এড়াবি ক' ঘা ?

(১)

পাজী মান্‌তে গেলে ট্রেণ মেলে না ; টাইম-টেবল মান্‌তে হলে মঘা দেখা চলে না।

কাজটা জরুরী—কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির আশা বিদ্যমান।

অতএব—যাত্রা করিলেন।

(২)

"বারো আর চব্বিশ, বেয়াল্লিশ ; বারো আর চব্বিশ, বেয়াল্লিশ—পাবো! হাঁ—"

(৩)
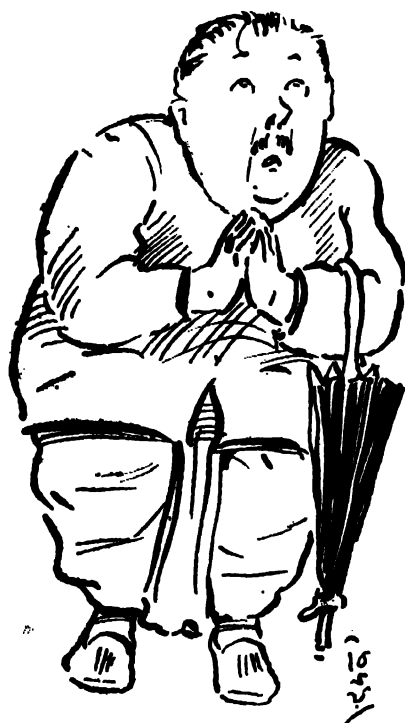
"দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, সাতকোটী দেবতা ভৈ নমঃ।"

(৪)

"একে মঘা, তায় হোঁচট্ !—দুর্গে দুর্গতিহারিণী মাগো—"

(৫)

(মোড়ের মাথায় আসিয়া হতভম্ব)
"এযে গাড়ী মোটরের গাদী লেগে গেছে রে !"

(৬)

"যা থাকে বরাতে—যে দৌড় !"

(৭)

"সাঁড়া অন্ধা !"

(৮)

"ভ্যালা আপদ ! এ আবার ঠেলা গাড়ী ঠেলেছে !"

(৯)

"এইবার একটু ফাঁক হয়েছে—লাগে !" (ছুটিলেন)

(১০)

"ছুঃ শালার ভোঁক!"

(১১)
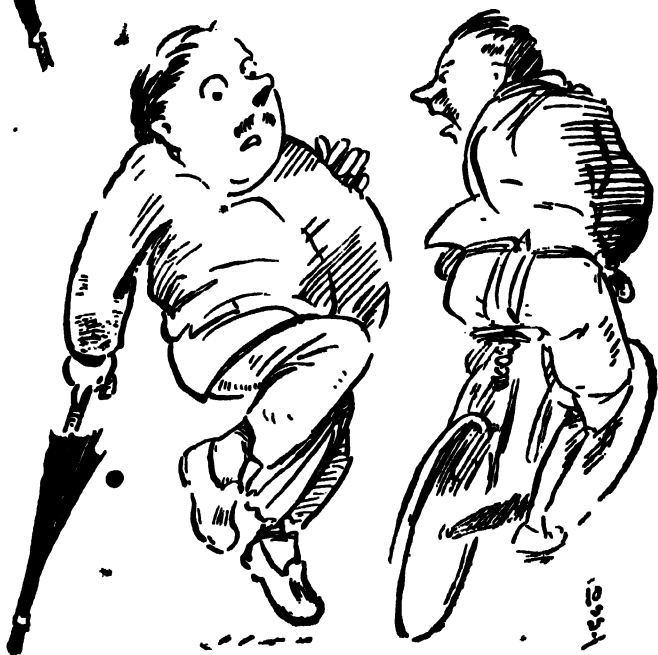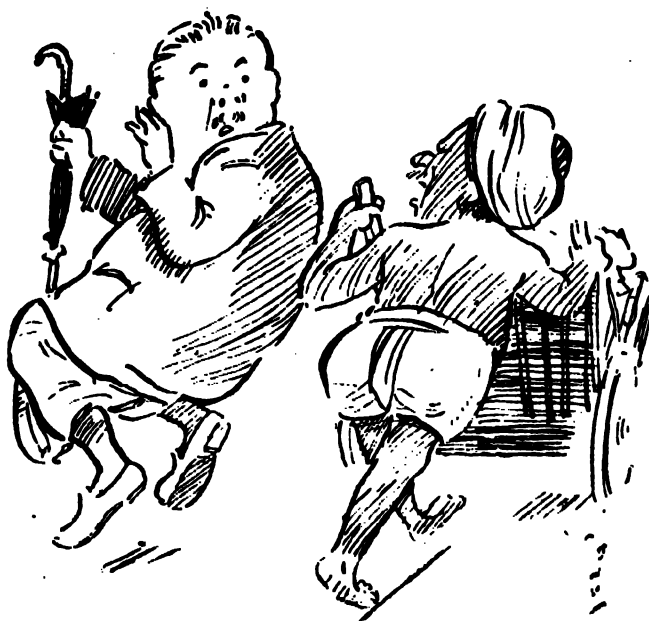
"এবে ত্রিধারা ত্রিবেণীর ঘাটে—বাবা!"

(১২)

"আবার ভোঁক!—গেছিরে বাবা!"

(১৩)
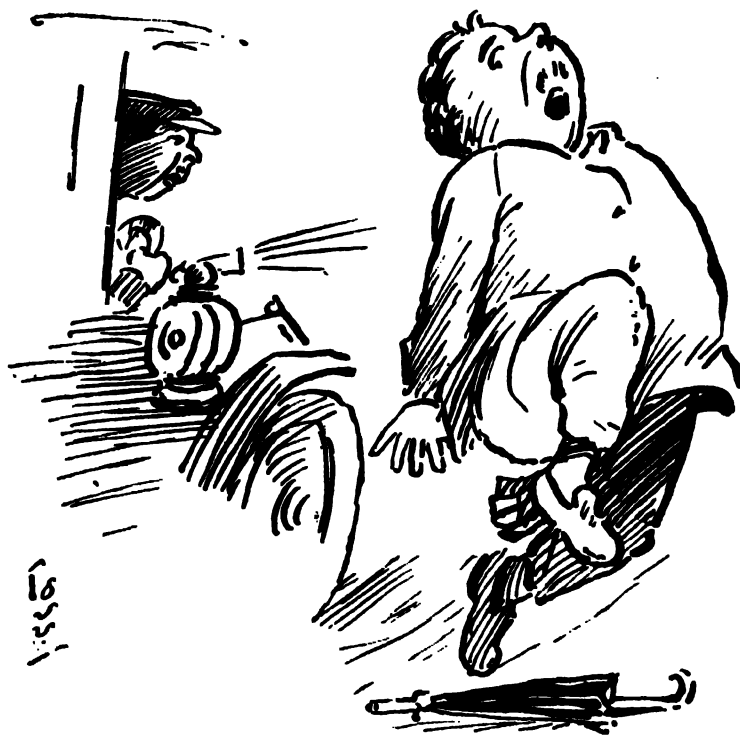
"চলো—থানা!"
"থানা কেন বাবা! চাপা দিয়েও তোমার আশ মিট্‌ল না?"

(১৪

"এযে অশ্বমেধের হয় বাবা!"

(১৫)

"আবার ভোঁক ! উঠে পড়ি বাবা—(উঠিলেন)
ভেঙ্গে পড়বে না ত ?" (কাঁপিলেন)
কাঁপিতে কাঁপিতে ষ্টেশনে ঢুকিলেন।

(১৬)

"রোক—রোক—সবুর—সবুর—গার্ডসাহেব—থোড়া সবুর !"

(১৭)

এ্যাক্সিডেণ্ট !!!

(১৮)
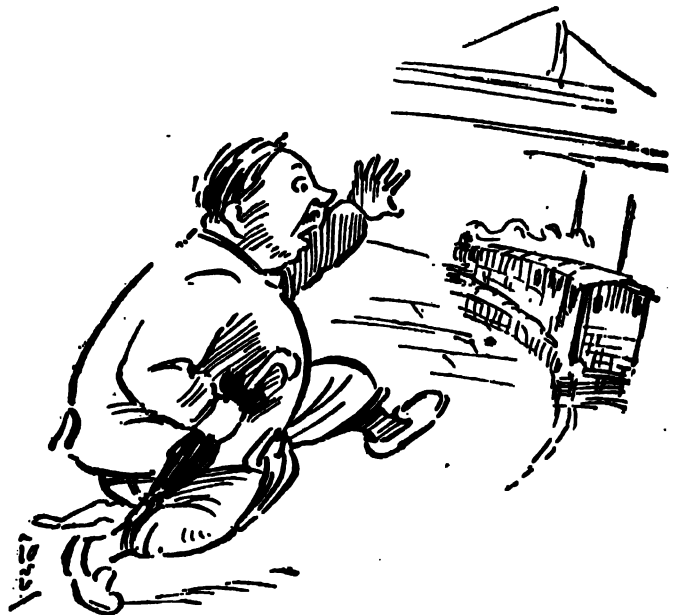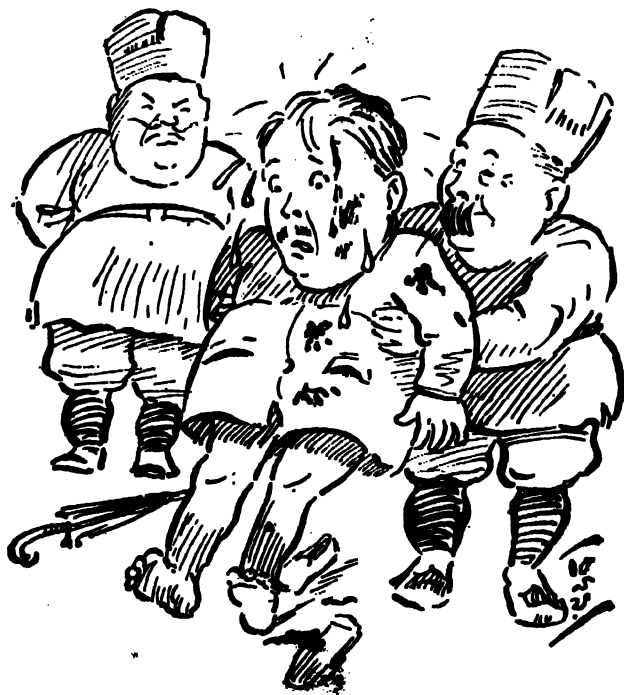
"ধোতি গিয়া কাঁহা তোমারা ?"
"ও মঘা বেটা ছিন্ লিয়া হজুর !"

পঙ্কজিনী

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ওলো ও আংরি, ও মুখপুড়ী, শীগ্‌গীর আয়, শীগ্‌গীর আয়—শুন্‌সে লো, শুনে যা—"

আনন্দে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, কক্ষমধ্য হইতে হঠাৎ ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া, বড়দিদি ছোট ভগিনীকে উপর বারান্দার রেলিং-এ ঝুঁকিয়া ডাকিল। নীচে কলতলায় কনিষ্ঠা সাবান মাখিয়া স্নান করিতেছিল। কলের মুখে একটি বাল্‌তি পাতা, তাহাতে জল পড়িতেছিল।

মুখমণ্ডল সাবানের জমাট ঘন ফেণায় আবৃত; কনিষ্ঠা চক্ষু বুঁজিয়া, উপর দিকে মুখ তুলিয়া কহিল—"আ মর মাগী, ক্ষেপ্‌লি নাকি? দাপিয়ে চেঁচিয়ে একেবারে পাড়া মাৎ কর্‌লি যে।"

সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জ্যেষ্ঠার আদেশ প্রতিপালন করিতে কনিষ্ঠার কোনও উৎসাহ দেখা গেল না, বরং সে ধীরমন্থরে যেমন অঙ্গরাগ করিতেছিল, তেমনই করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা কোনও উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া, বহুপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল—কনিষ্ঠা তাহা জানিতেও পারে নাই।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নাম বেদানাসুন্দরী, কনিষ্ঠার নাম আঙুর বালা। বেদানার বয়স প্রায় বিশ বৎসর, আঙুরের বয়স চতুর্দ্দশ। উভয়েই গৌরবর্ণা, স্বাস্থ্য-সম্পন্না ও সালঙ্কারা। এক কথায় দুই ভগিনীই সুন্দরী-পদবাচ্যা।

প্রেমচাঁদ বড়ালের গলিতে ছোট দ্বিতল একটা বাড়ী। উপরে তিন খানি ঘর, নীচে দুইখানি, কল এবং পায়খানা। নীচের ঘর দুইখানি ভাণ্ডার ও রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয়। উপরের তিনখানি বাসের জন্য। একখানিতে এই দুই ভগিনীর জননী কুসুমকুমারী থাকে। সেখানি পূর্ব্বদিকের টেরে, সিঁড়ি হইতে উঠিতেই। মাঝের খানি বেদানার

বসিবার ও তাহার পরখানি জ্যেঠারই শয়নকক্ষ, ঘরের মধ্যেই দুয়ার আছে, ঘরে ঘরে যাতায়াত চলে। আঙুর মাতার ঘরেই শয়ন করে।

কুসুমের ঘরের মেঝেয় মাদুরে বসিয়া, শহরের বিখ্যাত ঘটক বটুক আচার্য্য কাঁচি মার্কা সিগারেট পান করিতেছে ও তাহার সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়া আছে—উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব হইয়া বেদানা। কুসুম স্থিরভাবে আশঙ্কিত বদনে কন্যার দক্ষিণে পানের বাটা কোলে করিয়া উপবিষ্ট।

কুসুম মুখে খানিক দোক্তা ফেলিয়া দিয়া কহিল—"দেখো আচাব্যি মশায়, যেন শেষটায় বিপদে না প'ড়।"

বেদানা বলিল—"হাঁ, অতি-লোভে তাঁতী যেন ডোবে না, বাবা।"

বটুক আশ্বাস দিয়া, সজোরে মাথা নাড়িয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল—"আরে রাম কহ, তোমাদিকে আমি বিপদে ফেল্‌ব ? তোমরা আমার কি পাকা ধানে মই দিয়েচ ? আর বুঝচো না যে তোমাদের বিপদ হ'তে গেলে, আমার মাথাটাই যে আগে যাবে ?"

কুসুম ও বেদানা উভয়েই সম্মতিসূচক মস্তকান্দোলন করিল।

"আচ্ছা আচাব্যি মশাই, সে বিয়েতে লোক-লস্কর প্রোসেশন বরযাত্রী বামুন পুরুৎ সব আসবে ত—তারা কিছু [illegible]রবে না ? যদি তারা টের পায়, তবে কি হবে ?" [illegible]জ্ঞাসা করিল।

আচার্য্য সহাস্যে উত্তর দিল—"দূর ক্ষেপি ! তা' হলে কি আর শর্ম্মারাম এ কাজে হাত দিত ? সে সব উপসর্গ কিছু নাই বলেই তো, এই মতলব এঁটেচি, যে রাতারাতি কিছু কামিয়ে এই শহর হতে শেষ খেয়া দিই। চিরকালটাই কি খাটব ? হেঁটে হেঁটে দেখ্‌চ—পায়ে কি রকম সব শির উঠেচে ?" বলিয়া বটুকচন্দ্র শ্রীচরণযুগল আগাইয়া দিল—তাহাতে দেখা গেল প্রত্যেক পায়ে প্রায় এক ইঞ্চি মোটা হইয়া চার পাঁচটি করিয়া শিরা বিরাজ করিতেছে।

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে কি রকম হবে ?"

বটুকের মুখবিবরে সিগারেটটি প্রায় অর্দ্ধেকখানা প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া ভিজিয়া যাওয়ায় সিগারেটটি নিভিয়া গিয়াছিল, ফেলিয়া দিয়া কহিল—

"বুঝচো না ? এতো আর কুলীনের বিয়ে নয়, এরা যে বংশজ। এদের টাকা দিয়ে বিয়ে করতে হয়, বুঝলে ? তা ছাড়া, এদের ঘরের মেয়ে পাওয়া এক দুষ্কর ব্যাপার। সে বাবুর আর কোনও ছেলে নাই কেবল একটা মেয়ে আছে মাত্র। তার বিয়ে টিয়ে কবে কোন দিন হয়ে'গেছে ; জামাইটাও নাকি এই কলিকাতাতেই থাকে, কি একটা কায করে। মেয়ের ছেলেপুলে এখনও কিছু হয় নাই। তাই এখন এদের ইচ্ছে, যে বুড়োর যা' কিছু আছে—আসুন আসুন কৌলিনী মহাশয়া আসুন"

বলিয়া বটুক আসল কথা ছাড়িয়া, সদ্যস্নাতা এলায়িত ঘনকৃষ্ণ-কুন্তলা আঙুরবালাকে অভ্যর্থনা করিল।

আঙুর একটু হাসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, বলিল—"মরণ আর কি ? বুড়ো মিন্‌সের ঢং দেখে বাঁচি না।"

কুসুম গৃহের কোণ দেখাইয়া দিয়া কহিল—"ঐখানে খাবার আছে খা।" আঙুর দুইখানি জিলাপী ও একখানি সিঙ্গারা খাইয়া, একটা পান মুখে দিয়া, একটু জর্দ্দা মুখে ফেলিয়া, একটা সিগারেট ধরাইয়া, এলায়িত চুলে জানালার গরাদেতে ঠেশ দিয়া, জানালার তলবেদীতে পা ঝুলাইয়া বসিল।

বটুক কহিতে লাগিল—"হাঁ, মেয়েটার ছেলেপুলে কিছু নেই কি না, তাই তার মতলব যে বাপ আর বিয়ে না করে। কি জানি যদি ছেলে টেলে কিছু হয়, তা হ'লে এত বড় সম্পত্তিটা হাতছাড়া হয়ে যাবে ত ? আর এই জন্যেই সে ছুঁড়ীটা তার স্বামীকে সুদ্ধ নিয়ে এসে, বুড়োর ঘাড়ে জাঁতা দিয়ে, তার বাপের বাড়ীতেই রয়েচে এখন।"

বেদানা বলিল—"আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে বটে তো ? করলেই বা বাপ বিয়ে—তোর কি ? আ মর।"

বটুক বলিল—"বাজে কথা বলো না, দেরী হয়ে যাচ্ছে আমার। আমি কথার খি হারিয়ে ফেল্‌চ। কি বল্লাম ? হাঁ, মেয়েটা এখন এই বুড়োর কাছেই আছে, যাতে সম্বন্ধ সব ভেঙ্গে যায়, বিয়ে না হয়, এই ইচ্ছে। এদিকে বুড়ো বিয়ে করবে বলে একেবারে ক্ষেপে উন্মাদ হয়ে উঠেচে। যেমন

করে' হোক, বিয়ে সে করবেই। অথচ, মেয়েকে ভয়ও বিলক্ষণ আছে। কাযেই, সব চুপিচাপি কায হচ্ছে। এমন কি, আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বাড়ীতে হয় না। কথা হয়, হয় গোলদীঘির পাড়ে, নয় হেদোর ধারে। এই দেখ' না, সে দিন কথা কইতে নিরিবিলি জায়গা আর পাওয়া গেল না, শেষটা ধর্ম্মতলার মোড়ে ট্রামডিপোতে গিয়ে তবে আমরা কথা কই।"

কুসুম—"হুঁ—(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) তা' পর টাকা কড়ির কথা কি হ'ল, বল ? শুনি।"

বেদানা বলিল—"হাঁ আসল কথা বল'।"

বটুক বলিল—"তা বলচি গো—এখন তুমি রাজী তো ? তা' হলেই সব ঠিক।"

কুসুম বলিল—"হাঁ, রাজী আমি আছি, মেয়েটা যদি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে—আর নগদ যদি কিছু অমনি পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি ?"

বেদানা বলিল—"তা' নয় ? আর সে বুড়োই বা কদ্দিন ? সে মরলে আংরিরই তো সব।"

বটুক বলিল—"তা তো ঠিক, তা তো ঠিক। বুড়োর বয়স এখন এই আমাদের মত, কি কিছু বেশীও হতে পারে। আমার এখনও ষাঠ হয় নাই, তার হয় ত হয়েছে। হাঁ, তুমি যখন ঠিক তবে তোমায় সব কথা খোলাশা করেই বলি, শোন'। সে নগদ দশ হাজার টাকা দেবে, আমি বলেচি যে, তারা বড় গরীব কিছু টাকা চায়। তাতে সে দশ হাজার নিজেই বলেচে। আমার কিন্তু পাঁচ হাজার। এতে তুমি রাজী তো ?"

দশ হাজার টাকার কথা শুনিয়া কুসুমের বুকটা প্রথমে যেমন লাফাইয়া উঠিয়াছিল, শেষে বখরার কথা শুনিয়া অনেকটা দমিয়া গেল। বলিল –"একেবারে আধাআধি ? কিছু কম-সম করে নাও। দেখ, প্রথমেত আমায় মহা গণ্ডগোলে পড়্‌তে হবে হুকুমচাঁদ বাবুর কাছে। তা সে আমি একরকম করে মানিয়ে নেব, না হয় তার টাকাটা ফেরৎই দোব, আর কি ?"

বটুক জিজ্ঞাসা করিল—"হুকুমচাঁদ বাবু আবার কে ?"

কুসুম বলিল—"হুকুমচাঁদ একজন মাড়োয়ারী, বেদানার বাবু, বদ্রীরাম বাবুর কেমন খুড়তুতো না জেঠতুতো শালা হয়। সে পাঁচশো টাকা আমায় দিয়ে রেখেছে, আঙুরের জন্যে। আঙুরকে বাড়ীও কিনে দেবে বলেচে। সে প্রায়ই আসে—বদ্রীর সঙ্গে, খোঁজ খবর নিয়ে যায়। ছেলেটি ভারি বেশ বুদ্ধি-সুদ্ধি। ছেলে মানুষ, এই বছর ২০২২ বয়েস তার বাপের গদী ও আছে বড়বাজারে।"

বটুক চিন্তিত হইয়া বলিল—"তবেই তো মুস্কিল বাধালে, দেখ্‌চি। শেষটা কি বিপদে পড়্‌ব নাকি ? সে বাবা মাড়োয়ারী—এক পয়সা তার মা বাপ। পাঁচ-পাঁচশো টাকা—সে কি ছাড়্‌বে ?"

বেদানা স্পর্দ্ধার স্বরে কহিল—"তার বাবা ছাড়বে—সে ভার আমার রইল। আজই আমি ঠিক বন্দোবস্ত করে ফেল্‌চি দেখ।"

বটুক বলিল—"দেখ বাপু, পৈত্রিক প্রাণটা যেন বাঁচে।" বেদানা ও কুসুম উভয়েই বটুককে অভয় দিল।

বটুক জিজ্ঞাসা করিল—"তা' হলে, হাঁ গো, সে আসল কথার কি ?"

বেদানা আপাততঃ পাঁচহাজার ও অনতিদূরভবিষ্যতে বহু টাকার সম্পত্তি, প্রকাণ্ড বাড়ী, মোটরকার ও কোম্পানীর কাগজের আশায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, কতকটা প্রফুল্লচিত্তেই বলিল—"আচ্ছা, তাই সই। লাগেঃ !"

বটুক নিশ্চিন্ত হইয়া, সবিশেষ আরাম অনুভব করিল। স্থির হইল, শীঘ্রই ভাল পল্লীতে এক মাসের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, সেখানে উঠিয়া গিয়া যত শীঘ্র সম্ভব শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

বটুক বাসা ঠিক করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কলিকাতার ব্যবসা বাণিজ্য যেমন এখন মাড়োয়ারী সমাজের একচেটিয়া, তেমনি গণিকাগণও এখন তাহাদেরই প্রায় অধিকৃত। বাঙ্গালী, গুজরাতী, ভাটিয়া প্রভৃতি যখন যে জাতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছিল, তখন ইহারাও একমাত্র তাহাদেরই অঙ্কগত হইয়া থাকিত। বিশেষজ্ঞগণ এ সমস্যা সমাধান করিবেন।

বিখ্যাত ধনী রায় বাহাদুর হনুমান দাস কিল্লিক-ওয়ালার

পৌত্র বদ্রীরাম বেদানাকে বার হাজার টাকা দিয়া এই বাড়ী খানি কিনিয়া দিয়াছে ও তাহাকে মাসিক ৩০০৲ টাকা দিয়া, তাহার মাতা ও ভগিনীকেও প্রতিপালন করিতেছে। সে পিতৃহীন। বৃদ্ধ পিতামহের নয়নমণি। বৃদ্ধের আর কেহই নাই।

বদ্রীরামের বয়স প্রায় ২২।২৩ বৎসর। ঘরে তাহার স্ত্রী, মাতা ও অন্য দু'একজন আত্মীয়া আছে।

রাত্রি নয়টার কম বদ্রী আসিতে পারে না—কারণ, বৃদ্ধ হনুমান দাস তাহাকে সন্ধ্যার পর কাজকর্ম্ম ও হিসাবপত্র লিখিতে শেখায়। জগতে নিছক দুঃখ কোথাও নাই। সুতরাং এ কাজে বদ্রীরও তাহা ছিল না। সন্ধ্যা লাগিতেই,তাহার মন যদিও বেদানার বাড়ীতেই পড়িয়া থাকিত, এবং প্রিয়তমার বিরহ-যাতনায় অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইত, তথাপি তাহার সান্ত্বনা ছিল যে,এই সুযোগে সে কিছু টাকা আত্মসাৎ করিতে পারিত। এই সুবিধাটুকু না থাকিলে বদ্রীরাম কি করিত বলা যায় না।

যথা সময়ে বদ্রীরাম তাহার শ্যালক হুকুমচাঁদের সঙ্গে বেদানার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। কক্ষে ঢুকিয়া দেখে শয্যার এক প্রান্তে অকৃত-সান্ধ্য-সজ্জা বেদানাসুন্দরী ম্লান মুখে নিজ বিড়ালটিকে কোলে করিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া নীরবে আদর করিতেছে। দ্বারদেশে নাগরযুগলকে একবার দেখিয়াই, দৃষ্টি অবনত করিয়া পূর্ব্বারব্ধ কার্য্যেই পুনরায় মনঃসংযোগ করিল—কিছু বলিল না। শুধু মুখের কথা—'এস', তাহাও না।

বদ্রীরাম প্রণয়িনীর এরূপ মান কখনও দেখে নাই—আর সে হয়ত জানেও না—তাই বিস্মিত হইয়া দুয়ারেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না। স্বল্প একটু পরেই বেদানা বিড়াল-শিশুটিকে বক্ষে করিয়া নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

বদ্রীরাম বহুদিন কলিকাতায় বাস করিতেছে। ভিতরে যাহাই থাকুক, উপরটা বাঙ্গালীর মত করিতে সে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করে নাই। এমন কি—হঠাৎ দেখিলে, যাবৎ কিঞ্চিৎ ভাষতে, তাহাকে চেনাই যায় না যে, সে মাড়োয়ারী। বন্ধু-শ্যালককে বসিতে বলিয়া সে বেদানার পিছু পিছু গেল।

বেদানা বলিল—"তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, ছাদে এস।"

বদ্রীরামের বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। মন্ত্র-চালিতের মত সে বেদানার পশ্চাদনুসরণ করিল।

আকাশভরা তারা মাথার উপর মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পথিপার্শ্বস্থ চতুর্দ্দিকের আলোর ছটা পড়িয়া ছাদটি আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল।

বেদানা বিরস বদনে, যেন সর্ব্বনাশ হইয়াছে এমনি ভাঙা গলায়, বলিল—"আমি কার? তোমার, না তোমার ঐ বন্ধুর?"

বদ্রী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সেকি? তুমি বন্ধুর, তার মানে?"

বেদানা বলিল—"তার মানে? তুমি কা'ল যখন একটু বেএক্তার হয়ে পড়েছিলে, তখন তোমার ঐ বন্ধুটি—আমার অঙ্গস্পর্শ করে, জবরদস্তি আমার অপমান করছিল তা' তুমি দেখেছিলে?"

বদ্রী জানাইল—"না"।

তাহার চক্ষু দুইটি স্থির নিষ্পলক। ওষ্ঠ দুইটি ঘন ঘন নড়িতেছিল।

বেদানা বলিল—"তা' দেখ্‌বে কেন? অবিশ্যি ওতে আমার আর কি? তোমারি কি অপমান করা হ'ল না? এই তোমার বন্ধু! তুমি গলায় দড়ি দিয়ে মর'গে। সে দিন অমনি আঙুরকেও কি বলেছিল—সেই জন্যে সে আজ ঘর থেকেই বেরুলো না। অবিশ্যি, আঙুরের কথা না হয় ছেড়ে দাও! আমার যে এতে——"

বেদানা আর বলিতে পারিল না; দুঃখে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। সে ফোঁপাইতে লাগিল।

বদ্রী গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া, কহিল—"জানি না তোমাদের মাড়োয়ারীদের কি ব্যাভার। আমাদের বাঙ্গালী হলে এতক্ষণ ত' খুনখারাপী হয়ে যেত। আমার গায় হাত দেওয়া, আর তোমার স্ত্রীর গায়ে হাত দেওয়া কি কোনও তফাৎ মনে কর' তুমি? যদি আপনার এই ইজ্জৎটুকু না রাখ্‌তে পার,' তবে আমার কাছে তো নয়ই, অন্য কোন

মেয়ে মানুষের বাড়ীই তুমি আর যেয়ো না। ছিঃ তোমরা এমন সব ইতর।"

প্রণয়িণীর নিকট ইহাই যথেষ্ট। বদ্রী আর কোনও কথা না বলিয়া দুপ্ দাপ করিয়া নামিয়া একবারে কক্ষ মধ্যে ঢুকিয়াই হুকুমীচাঁদকে সেই শ্রবণবিদারণ দংষ্ট্রাদমন উপল-বিষম-শ্রুত মাড়োয়ারী ভাষায় কি বলিল। হুকুমী উগ্রভাবে তাহাকে উত্তর দিল। বদ্রী সজোরে তাহার মস্তকে এক ঘুঁসি বসাইয়া দিল—সে বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নীচে গিয়া বীরত্বব্যঞ্জক আস্ফালন জুড়িয়া দিল। বদ্রীও খালি পায়ে দৌড়িয়া নীচে গিয়া তাহার গলদেশ ধরিয়া এমন এক ধাক্কা দিয়া তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল, যে সে একেবারে পথিমধ্যে সজোরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। বদ্রী সদর দুয়ারে খিল দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কুসুম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁ বাবা, হুকুমীকে তাড়িয়ে তো দিলে, তার টাকা গুলো তা'হলে ফেরৎ—"

বদ্রী উত্তেজিত হইয়াছিল। সে উগ্রভাবেই উত্তর দিল "না না টাকা ফেরৎ কিসের? টাকা দিয়েছে সে শালার সাক্ষী কে?" বলিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া বেদানাকে একটি ছুঁড়িয়া দিয়া, নিজে একটি ধরাইল।

কিয়ৎক্ষণ বাড়ীটি নীরব হইয়া রহিল। বেদানা এতক্ষণ মুহ্যমতী হইয়া বসিয়াছিল, তাহার বিরস বদনে অল্পে অল্পে সরস কৌতুকের আভা ফুটিতে লাগিল। উঠিয়া আলমারী খুলিয়া, কত কি সব খট্ খট্ করিয়া নাড়িতে লাগিল।

বদ্রী বলিল—"নাও পাপ বিদেয় হয়েছে ত' এখন? এইবার দাও একটু, মারা গেলুম যে—" বেদানা এই আদেশের অপেক্ষাতেই ছিল। তৎক্ষণাৎ বোতল গেলাস বাহির হইল। তার দশ মিনিট পরেই উচ্চ হাস্যে, অনর্গল প্রেমনিবেদনে ও অকারণ বীরত্বআস্ফালনে কক্ষটি সরগরম হইয়া উঠিল।

বেদানা ডাকিল—"মা, কারী হয়ে থাকে তো দিয়ে যাও।"

বদ্রী বলিল—"আজও ফাউল্ কারী নাকি?"

বেদানা চক্ষু পালটিয়া, ঈষৎ সরস হাসিয়া, বদ্রীর কোলে মাথা দিয়া শয়ন করিয়া কহিল—"না শুয়োরের। এতদিনে কলিকাতায় আছ,' এখনও সভ্য হলে না? আ তোমার ভাল হোক একেবারে গাড্ডি গাড্ডি ছাতুখোর কি না!"

বদ্রী বলিল—"আমি না খেলুম কবে? তবু আমাদের অপবাদ রটাবে?" বলিয়া আদরে তাহার গাল টিপিয়া দিল।

বেদানা তাহার চিবুক ধরিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কহিল—"এই যে আমার বাদ্রিরাম শিখেছে—শিখেছে—শিখেছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বহুবাজারের হিদরাম বাঁড়ুর্য্যের গলিতে ছোট একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, বটুক আচার্য্য আসিয়া কুসুমকে জানাইল যে বাড়ী ঠিক এখন সেখানে উঠিয়া গেলেই হয়।

সামান্য কিছু গৃহস্থালীর তৈজস পত্র লইয়া কুসুম ও আঙুরবালা গিয়া নূতন গৃহে বসবাস আরম্ভ করিল। বেদানা নিজ বাটীতেই থাকিল। কুসুম দুই বেলা ভাত দিয়া আসিতে লাগিল।

বটুক বলিল—"পরশু দিন বিকেলে বাবু আস্‌বেন ক'নে দেখতে। যদি পছন্দ হয়, তবে একবারে দিন পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে যাবে। সঙ্গে আস্‌বে শুধু ভট্‌চায। আজ কালের মধ্যেই একটা বামুন ঠিক করে রেখো যেন। আমি আবার আস্‌ব, বন্দোবস্ত সব ঠিকঠাক হ'ল কিনা দেখে, তবে তাঁদিকে আন্‌তে যাব। আর শোন,—একটা কথা তোমায় বলে দিয়ে যাই, সেটা বেশ করে সেধে রাখ্‌বে।"

কুসুম ও বটুক কক্ষান্তরে গেল। আঙুর একাকিনী বসিয়া রহিল।

তাহার মন একটা অপূর্ব্ব কৌতুক রসে পরিপূর্ণ ছিল; বিবাহের নামে তাহার এতদিন কেবল হাসিই পাইত। এখন এ বাসায় আসিয়া যখন সে জানিল যে তাহার বিবাহ সুনিশ্চিত, তখন হইতে তাহার মনটা যেন কেমন একটু দমিয়া গেল। কি একটা আশঙ্কা যে তাহার বুকখানি ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ অরুণোদয়ে প্রথম আলোকপাতের ন্যায় আজ তাহার প্রথম মনে হইল, যে সে কত অপবিত্র। বেশ্যার কন্যা,

আজন্ম বেশ্যালয়ে লালিত ও পালিত—তাহাকে লইয়া এ কি প্রহসন অভিনয় হইতে চলিয়াছে। তাহার মনটা বিষাদে ভরিয়া উঠিল। সে যদি এমন না হইত? তবে তাহার বিবাহ তো সত্যই হইত। বিবাহের নামে এত ছলনা, এত ষড়যন্ত্র, এত লুকোলুকি তবে ত' করিতে হইত না। কেন সে এমন হইল? আত্মগ্লানিতে তাহার মন তিক্ত হইয়া উঠিল। তাহার তো কোনও দোষ নাই! সে তো এখনও এমন কোনও অন্যায় কাজ করে নাই, যাহাতে সে কুলনারী অপেক্ষা কম পবিত্র? তাহার হৃদয়ে তো কাহারও এখনও স্থান নাই তবে সে অপবিত্র কিসে? শুধু কি এই মাতা ভগিনীর সহবাসেই সে অপবিত্র? এ কি! এদের কাছে না থাকিয়া সে কোথায় থাকিতে পারিত? মানুষ মাতৃগর্ভেই জন্মিয়া থাকে। সে-ও তাই জন্মিয়াছে। তাহার মাতা তাহাকে প্রসব করিয়াছে স্বাভাবিকভাবে। তাহার জন্মদাতা কে, এবং তাঁহার সহিত তাহার জননীর সামাজিক বিধানে বিবাহ হইয়াছিল কি না—সে তাহা জানে না। কোনও সন্তানই তো না জন্মিয়া তাহা জানে না। সেও জন্মিয়া তবে জানিয়াছে। তবে তাহার অপরাধ কি? যদি কোনও অপরাধ থাকে, তবে সে তাহার মায়ের, তাহার নহে। অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করিবে—তাহার জীবন মরণ ও সর্ব্বস্ব দিয়া? একি অদ্ভুত নিয়ম? —কি ঘৃণিত এই জীবন, কি দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা এই জাতির কপালে লেপিত? সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার নিজের মা ও দিদির উপর সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু দিয়া অতর্কিতে বড় বড় ফোঁটায় টশ টশ করিয়া কয়েক বিন্দু তপ্তঅশ্রু পড়িয়া তাঁহার বক্ষবসন অভিষিক্ত করিয়া দিল।

মাঘ মাস। খুব শীত। বেলা ৩টার সময় নীলমণি ঘোষাল মহাশয়কে লইয়া বটুক আচার্য্য কুসুমের বাড়ীতে আগমন করিল। সঙ্গে কেবল একজন পুরোহিত।

নীলমণি বাবুর বয়স প্রায় ৫০।৫২—শরীর দোহারা, ময়লা রং, মাথায় টাক—কিন্তু শরীর এমন স্বাস্থ্যপূর্ণ যে তাঁহাকে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় তাঁহার বয়স ৪৫।৪৬ বৎসর। দাঁত-গুলি সব বাঁধান, চোখে সোনার কাটা-চশমা। দুই হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলে দুইটি দামী আংটি! পোষাক সাদা-সিধা। তাহাতে কোনরূপ বিলাসিতার লক্ষণ ছিল না। দাড়ি গোঁফ কামানো। গায়ে একটা ফ্ল্যানেলের শার্ট, তদুপরি এক দোরোখা শাল!

আজ এক বৎসর হইল, নীলমণি বাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। সে-পক্ষের কেবল একটি কন্যা আছে—সেও বিবাহিত। জামাতা কলিকাতায় পোর্ট কমিশনারের অফিসে চাকরী করে।

সংসারে আর কেউ নাই, কাজেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইতেছে। একটী পুত্রের জন্য তিনি লালায়িত—নহিলে যে বংশলোপ হয়। নিজে একজন ধনী, এখনও তাঁহার উপার্জ্জন যথেষ্ট—তিনি হাইকোর্টের উকীল। গৃহে একটি শিব-মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্পত্তি ও দেবসেবা বংশ ভিন্ন কি করিয়া রক্ষা হয়?

নীলমণি আসিয়া বসিতেই, বটুক "কনের ঘরের পিসি"র মত তাড়াতাড়ি ছড়ি জুতা ও গায়ের কাপড়খানি ছাড়িয়া, "কৈ গো" বলিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। নীলমণি নীরবে আকাশের বর্ণ ও দৃশ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সহযাত্রী ভটচায মশায় ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ করিয়া হাঁচিতে হাঁচিতে নস্যে মনোনিবেশ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই আটপৌরে একখানি নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়া, আনিতম্ব-বিলম্বী-ঘনকৃষ্ণ-কেশকলাপ এলাইয়া, শুধু হাতে রুলী, কানে বেলকুঁড়ি, নাকে নোলক, ও গলায় একগাছি সূতাহার, ব্রীড়াবনত কন্যা আঙুরবালা গৃহে প্রবেশ করিয়া, উভয়কে প্রণাম করিয়া নীরব নতবদনে বসিল। পিছন পিছন বটুক।

পাশের ঘরে কুসুম বেদানা ও দাসীর চাপা অথচ ঘন-ঘন সর্-সর্ খশ্-খশ্ ফিশ্-ফাশ্ ও দুপ্-দাপ শব্দ উঠিতেছিল। সমস্ত বাড়ীখানি একটা আসন্ন শুভ উৎসবের প্রতীক্ষায় যেন নিরুদ্ধশ্বাস, শঙ্কিত, নীরব ও পবিত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে বটুক ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"কেমন ভট্‌চায, মেয়ে কেমন দেখচ? বাবুর যুগ্যি কি না?"

ভট্টাচার্য্য অনুমোদনসূচক শিরশ্চালন করিয়া কহিল—"কন্যা সুন্দরী বয়স্থা, ও স্বাস্থ্যসম্পন্না তাতে আর সন্দেহ কি!

আমরা এইরূপ পাত্রীই তো অনুসন্ধান করছিলাম—এখন বাবুর মতামতের উপরই সব নির্ভর করচে। দেখি মা, তোমার বাঁ হাতখানি !"

আঙুর বাম হাতখানি ধীরে ধীরে বাড়াইয়া দিল। ভট্টাচার্য্য নাকে চশ্‌মা তুলিয়া, কর সামুদ্রিক গণনা করিয়া বলিলেন—

"ধর্ম্মপ্রাণা সতী সাধ্বী পতিসেবা-পরায়ণা
পুত্রোৎপাদিকা কন্যা কল্যাণী চ সুলক্ষণা।
তোমার নাম কি মা ?"

আঙুর বলিল—"শ্রীমতী আমোদিনী—দাঃ—দেবী।"

বটুক আত্মপ্রসন্ন ভাবে মাথা দুলাইতেছিল, তাহার মুখে ও চোখে একটা দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ আঙুরের কথায় চমকিয়া উঠিল। কেহই তাহা লক্ষ্য করিল না। আঙুরের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে ব্যাকুল হইয়া মন্ত্রচালিতের ন্যায় একবার বটুকের দিকে চাহিয়াই আবার পূর্ব্বের মত নতদৃষ্টিতে বসিয়া রহিল।

নীলমণি কন্যার গঠন, বর্ণ, স্বাস্থ্য, রূপ সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিলেন। ভট্টাচার্য্যের গণনাফলে মনে মনে অপরিমিত আনন্দ লাভ করিয়া, বলিলেন—"ঘটক, এইবার এঁকে নিয়ে যাও।"

পুনরায় প্রণাম করিয়া আঙুর আস্তে আস্তে নতবদনে বটুকের পিছন পিছন চলিয়া গেল। নীলমণি তদ্গতচিত্তে একদৃষ্টে ভাবী বধূর গৃহ-নির্গমন দেখিতেছিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক টিপ্‌ নস্য টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এঁদের পরিচয় ?"

একটা দারুণ দুঃখের স্মৃতিতে মানুষের চক্ষু যেমন ছল ছল করে, একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ও তাহার মুখটি যেমন অকস্মাৎ মলিন হইয়া যায়—বটুক তেমনি মুখভাবে কহিতে লাগিল—"মেয়ের বাপের নাম নিতাই সুন্দর রায়। তিনি পশ্চিমে রেলে কাজ করতেন, সেইখানেই দুইটি মেয়ে ও স্ত্রীকে রেখেই মারা যান। সে আজ দশ বৎসর হল। বড় মেয়েটির বিবাহ হয়েছে—কুলীনেই কাজ হয়েছে। কিন্তু বিধবা,—এমনি দুর্ভাগ্য যে জামাইটি আজ চার বৎসর হল নিরুদ্দেশ।"

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন কেন নিরুদ্দেশ কেন ?"

বটুক কহিল—"ছেলেবেলা থেকেই তার সাধু-সন্ন্যাসীতে খুব ভক্তি। সংসারে তার টান কোনও দিনই ছিল না। সেও রেলে কাজ করতো—হঠাৎ একদিন তার স্ত্রীকে তার মায়ের কাছে রেখে—সে যে সেই উধাও হয়েছে—সে আজও হয়েছে, কালও হয়েছে—"

ভট্টাচার্য্য দুঃখিত ভাবে ঘাড় নাড়িলেন। পাশের ঘরে অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শুনা গেল। তাহার বিনানী ভাষাও যে অতিথিদ্বয়ের কাণে না গেল, তাহাও নয়।

বটুক কহিল—"যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে, বিধবা বড় মেয়েটীর কুলীনেই কাজ করেছিলেন,কিন্তু ছোটর বেলায় আর পারলেম না,দেনায় বড্ড জড়িয়ে পড়েচেন। এখন এঁদের দিন চলা ভার। কোনও রকমে মেয়েটাকে সৎপাত্রস্থ করে' জাত-রক্ষা করা' মাত্র। এঁদের বাড়ী হল মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের কাছে আমিরগঞ্জে। সেখানে এই মেয়ের এক কাকা আছে, পাছে কিছু ভাগ দিতে হয়, এই জন্যে সে তো এদিকে বাড়ীই ঢুকতে দেয় না। এমনি পাষণ্ড সে। তার কথা আর কি বলব—ভট্‌চায মশায়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার কথা বলিতে নিষেধ করিলেন। বটুক বাঁচিল। কহিল—এখন এঁরা থাকতেন সেই পশ্চিমেই মুঙ্গের জেলায় জামালপুরে। বাবু টাকা দিলেন তবে এরা এখানে আসতে পেরেছে। এখন এ বিয়েটা যদি হয়। বাবু এই গরীব অনাথা মেয়েটাকে যদি চরণে রাখেন, তবে এ বিধবাও উদ্ধার হয়, আর তার ত অশেষ পুণ্য হয়ই।"

ভট্টাচার্য্য তৎপরে, গাঁই, গোত্র, পুরুষ, সন্তান ও কৌলিক সমস্ত প্রশ্ন করিলেন। বটুক মেয়েদের ঘরে গিয়া কন্যার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া কথা কহিয়া যথাযথ উত্তর দিল। ভট্টাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া মত দিলেন যে এ বিবাহ হইতে পারে।

তখনি পাঁচখানি মোহর দিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা হইল। চারিদিন পরেই বিবাহের দিনস্থির হইল।

মেয়েদের ঘরে একটা সুস্পষ্ট আনন্দগুঞ্জন ধ্বনিয়া উঠিল।

তখন অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিগুলি গৃহাঙ্গনে পড়িয়া, সমস্ত গৃহখানিতে একটা ভাবী উৎসবের সূচনা করিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শুভদিনে শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বহুমূল্য পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া নীলমণিবাবু নববধূকে লইয়া বাড়ী ঢুকিতেই, তাঁহার কন্যা শান্তিলতা, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া, লাফাইয়া, ঘরে খিল দিয়া, তুমুল অশান্তি ঘোষনা করিয়া দিল।

নীলমণি বাবু বিব্রত ও নববধূর কাছে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। নববধূ ভাবিল—"এ্কি? এ কিছু জানতে পেরেচে না কি?"

নীলমণিবাবু কন্যাকে শান্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তাহাতে কন্যার পিতার উপর ক্রোধ ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিল, শেষে শান্তিলতা সারাদিন অনাহারে থাকিয়া সন্ধ্যায় গাড়ী ডাকাইয়া পিতার উপর রাগ করিয়া স্বামীগৃহে চলিয়া গেল। নীলমণি নিস্তার পাইল, আঙুর বাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মস্ত বাড়ী। চাকর চাকরাণী পাচক বেহারা অনেক। বাড়ীর মধ্যেই শিবমন্দির—নিত্য ষোড়শোপচারে শিবের পূজা হয়। সুন্দর সুসজ্জিত অগণ্য বিলাসোপকরণবহুল কক্ষাদি দেখিয়া আঙুরের মন বিপুল আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এ সব যে তাহারই!

আঙুর ভাবিল—এই গৃহ! কুলবতীর এখানে স্থান! জীবনে এমন স্বাচ্ছন্দ্য, এত নির্ভর, এত নির্ভয়, সে ত' আর কখনও অনুভব করে নাই। মুহুর্মুহু সে আনন্দে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এ যে বড় সুখ, বড় আনন্দ!

কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই, নীলমণি একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলেন, সে আমোদিনীকে দিনভোর লেখাপড়া ও শিল্পকার্য্য শিখাইতে লাগিল ও তাহার কাছে থাকিত। আঙুর প্রচণ্ড উৎসাহে বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করিল।

তাহার মনে হইতে লাগিল—এই সুখের আনন্দে তাহার মাথাটা ফাটিয়া কখন চৌচির হইয়া যাইবে। এ কি কল্পনা করা যায়? এ তো স্বপ্নেও জানি নাই?...ঐ কুশ্রী বৃদ্ধ!...না, না. উনি বড় ভাল লোক! আমায় ছাড়া জানেন না, সদাই ওঁর চিন্তা—কিসে আমি সুখী হই! আহা—বড় মায়া হয়। কেউ নাই—ওঁর! বড় ভাল লাগে ওঁকে! ওঁর কথায় চোখে জল আসে—হলেই বা বুড়ো? আর বুড়োই বা কোথায়? একটু বয়স বেশী হয়েছে, এই তো? তা এমন সব দোজ্‌ব'রেদেরই হয়! মুখটি বেশ,—রংটা একটু ময়লা! রং নিয়ে কি ধুয়ে খাব? এ কি বিলাত, যে সবারই রং ফর্সা হবে? আর ময়লাই বা এমন কি? উনি ঠিক উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যাকে বলে। মুখটি বেশ—নাক কাণ চোখ বড় সুন্দর! দেখতে বড় ভাল লাগে।..কৈ কুশ্রী ত' নয়! তবে বোকা, তাই খুব ঠকানো গেছে।...হাঁ বোকা? মস্ত উকীল—বি-এ পাশ—বোকা কোথা? বিয়ে পাগলা—আঙুরের অধরে হঠাৎ একটা প্রসন্ন করুণ ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে তাহা জানিতেও পারিল না।

বেলা দ্বিপ্রহর। আষাঢ় মাস! অত্যন্ত গরম। হঠাৎ কুসুম কন্যার গৃহে আসিয়া উপস্থিত। চাকর বাকরেরা সব নিজ নিজ কক্ষে বা গৃহে তখন বিশ্রাম করিতেছিল। কুসুম বরাবর একবারে দ্বিতলে আসিতেই, দেখিল মধ্যকার সুপ্রশস্ত ও সাহেবী-ফ্যাশানে সুসজ্জিত কক্ষে, একখানি সোফায় বসিয়া শিক্ষয়িত্রী ও তাহার কন্যা গল্প করিতেছে। আঙুর কার্পেটে উল দিয়া জুতা বুনিতেছিল ও শিক্ষয়িত্রী হাতের বই আঙুল মুড়িয়া বন্ধ করিয়া কি বলিতেছিলেন।

কুসুমকে দেখিয়া আঙুরের হাস্য-প্রফুল্ল উজ্জ্বল মুখখানি অকস্মাৎ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠস্বর বসিয়া গেল। কণ্ঠ-তালু শুষ্ক হইয়া উঠিল।

কুসুম কন্যাকে দেখিয়া বলিল—"এই যে মা লক্ষ্মী এখানে। তোমার মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন দেখে আসতে যে তুমি কেমন আছ। তিনি—"

শিক্ষয়িত্রী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বুঝি, তাঁদের বাড়ীর ঝি?"

কুসুম বলিল—"হাঁ—"

শিক্ষয়িত্রী—"তা বেশ, বস এঁর সঙ্গে আলাপ কর'। আমি আসি।" বলিয়া সে মহিলাটি বাহির হইয়া গেল।

আঙুরের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। সে নি[illegible] বাঁচিল। কহিল—"তুই এমন করে' এ বাড়ীতে [illegible]

আসিস্ না। কোন্ দিন সব কথা ফাঁশ হয়ে যাবে। তখন তোর আমার দু'জনেরই গর্দ্দানা যাবে। তা আমি বলে দিচ্ছি।"

মা কহিল—"তা তো বুঝ্‌লুম। তার জন্যেই তো আর আসি না। সেই বিয়ের পরই একদিন এসেছিলুম—আর আজ এসেচি। এই ত প্রায় এক বছর বিয়ে হয়েছে; ক'দিন এইচি বল্?"

আঙুরের বুক ধড়ফড় করিতেছিল—বলিল,—"তা বেশ, কি বল্‌বি বল্ তাড়াতাড়ি। কোনও কথা আছে?"

কুসুম কন্যার ব্যবহারে একটু ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল—"হাঁ, একটু বিপদ হয়েছে।"

আঙুর জিজ্ঞাসা করিল—"বিপদ কি?" মা বলিল বিপদ, অথচ কন্যার সেটা হৃদয় স্পর্শ করিল না কেবল মাত্র শুষ্ক একটা প্রশ্ন করিল—"বিপদ কি?" এ মেয়েটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। নহিলে যে মাতা তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া এত বড়টা করিয়াছে, যে তাহাকে এই সৌভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল—আজ তাহাকেই অবহেলা উপেক্ষা আর তাচ্ছিল্য? এ যে হিতে বিপরীত হইল! কুসুমের বড় কষ্ট হইল। বলিল—

"বেদানার বসন্ত হওয়ার পর থেকে, বদ্রীরাম তো ছেড়েই গিয়েছে, অন্য কেউও আর আসে না। আজ ৪।৫ মাস কাল কেবল ঘরের টাকা ভেঙ্গেই খেতে হচ্ছে। এমন করে আর কদ্দিনই বা যাবে? একটা মোটা আয় ছিল—কি কুক্ষণে মেয়েটাকে মায়ের দয়া হল—সমস্ত শরীরটা একবারে শিল-কোটা করে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে গেল। এদিকে হুকুমী-চাঁদ মধ্যে মধ্যে এসে আবার সেই টাকার জন্যে তম্বি সুরু করে দিয়েচে। নানান্ ভিচিকিচিতে বড্ড জেরবার হয়ে পড়েচি, মা। তাই ভাবছি, এ বাড়ীখানা ভাড়া দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাস কর্‌ব ছোট একখানা ঘর নিয়ে।"

আঙুর উদাস নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু শুনিল। একটা 'আহা' 'উহু' কিছুই বলিল না!

কুসুম কিয়ৎক্ষণ কন্যার মুখের পানে কিছু সহানুভূতির জন্য, একটা উত্তরের জন্য, কোনও সাহায্যের জন্য চাহিয়া রহিল; কিন্তু কন্যার কোনও ভাবান্তরই সে দেখিল না, তাই স্পষ্ট করিয়া বলিল—

"এখন কিছু টাকা কড়ি দে। এই ত এক বছর হল', কিছুই তো দিলি না!"

আঙুর কহিল—"আমার কাছে তো টাকা থাকে না যে আমি দেব।"

মা বলিল—"আদায় করে নে। এটা সেটা বলে আদায় কর্‌বি—তোর নিজের কাছে সিন্দুকের চাবি রাখ্‌বি, তবে তো।"

কন্যা কহিল—"আমি যা চাই, তাই তখুনি পাই। যা' না চাই, তা-ও পাই। চাবি নিয়ে তখন কি করব!"

মা দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিল—"চাবি নিয়ে কি কর্‌ব? আ মর্ আজুলী। বড় সতী হয়েছেন। বিয়ের আগে পই পই করে শিখিয়ে দিলুম যে কি করে টাকা আদায় কর্‌তে হয়, আর কেনই বা তোর বিয়ে দিচ্ছি। তোর যে বিয়ে দিলুম, তোকে গেরস্ত করে দিয়ে, আমি পথে বস্‌বো বলে, নাকি? টাকার জন্যে লো—টাকার জন্যে! এতদিন কিছু ভাবি নাই—বেদানা আমার রাজরাণী ছিল। আজ ভগবান তাকে মেরেচেন বলেই ত যত দুঃখু।" বলিতে বলিতে জননী নেত্রমার্জ্জনা করিল।

আঙুর কহিল—"দেখ মা, আজন্ম তোমাদের এই সব ঢং দেখেই মানুষ হয়েচি—সুতরাং ও সব আমি খুব ভালই জানি। তোমাকে আমি সোজা কথা বলে দিচ্ছি—এ বাড়ী তুমি আর এসো না, আমার কাছে কিছু প্রত্যাশাও করো না। যদি আমার কথা না শোন, তবে শেষে অপমান হবে, কষ্ট পাবে।"

মাতার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে যে এ কথার পর আর কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার কন্যার মুখের পানে রাক্ষসীর মত একদৃষ্টে রোষকষায়িত লোচনে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে যদি ইহার সমস্ত তেজ, এই দুর্বিসহ অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতাম! পদাঘাতে অই দন্তপংক্তি নিপাতিত করিতে পারিতাম! নিষ্ফল ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

আঙুর চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া, দুইখানি একশত টাকার নোট আনিয়া, যেখানে কুসুম বসিয়াছিল, সেইখানে ছুঁড়িয়া

ফেলিয়া দিয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—"এই নাও, এইবার চলে যাও। আর কখ্খনো এ মুখে এসো না। ওঠ ওঠ"—বলিয়াই কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

কুসুম কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া, নোট দুইখানি পেট-কোঁচরে বাঁধিয়া রাগে গস্ গস্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। আঙুর উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষায় মোটামুটি ইংরাজী ও বাঙ্গলা শিখিয়াছে, শেলাইয়ের কায খুব ভালই করিতে পারে; এতদ্ভিন্ন পাকপ্রণালীতে সে একজন ওস্তাদ রাঁধুনী হইয়া উঠিয়াছে। একটি পুত্র ও একটি কন্যা তাহার স্বামীপ্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ নীলমণি বাবুকে উপঢৌকন দিয়াছে। নীলমণি বাবু হাতে স্বর্গ পাইয়াছেন।

সংসারে গুণবতী মনোমত সুন্দরী স্ত্রী, কার্ত্তিকেয় তুল্য রূপবান পুত্র, বিপুল অর্থ, বিশাল অট্টালিকা ও বিলাসোপকরণ মোটর কার, ইলেক্‌ট্রিক পাখা ও আলো, দাস দাসী, নীলমণি বাবুর কিছুরই অভাব ছিল না। নবোদ্যমে দ্বিগুণ বলে নূতন উৎসাহে নীলমণিবাবু আবার সংসার আরম্ভ করিয়াছেন। এই সুখ ভোগ করিবার জন্য ভগবান্ যেন তাঁহাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন—শিবদ্বারে মাথা নত করিয়া নীলমণি বাবু বারম্বার এই প্রার্থনাই করিতেন।

আঙুরের বাল্যজীবন তাহার কাছে এখন শত বৃশ্চিক দংশনের মত যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। এত চেষ্টা করিয়াও সে যে সে-সব কথা ভুলিতে পারিতেছে না! আর সর্ব্বাপেক্ষা তার জীবনকে বিষময় করিয়া রাখিয়াছে—তাহার মিথ্যা পরিচয়! সময় সময় তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। স্বামীর সুগভীর প্রেমসমুদ্রে সে যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া একটি বিন্দুর মত সীমা হারাইয়া—মিলাইয়া যায়, তখন তাহার মনে পড়ে—ওগো এ সুখ যে আমার প্রতারণার ফল। নিজের উপর তখন অসহ্য রাগ ও ঘৃণা হয়। মন তিক্ত হইয়া উঠে, জীবন দুর্ব্বহ হয়, চক্ষু দিয়া অবাধ অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। খুব শক্ত হইয়া মনে করে প্রকাশ করিয়া দিই, যাহা হয়, তাহাই হোক্। এ ছলনার জ্বালা অসহ্য। না হয় আমি পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইব। এই বাড়ীতে দাসী হইয়া থাকিব। তবু এত প্রাণ এত প্রীতির আড়ালে সে প্রকাণ্ড দৈত্যকে আর লুকাইয়া রাখিবে না।...সব ঠিক ঠাক্ করে কিন্তু আসল সময়ে মুখ দিয়া কথা ফোটে না—কে যেন সবলে মুখ চাপিয়া ধরে।

প্রাতে ও সন্ধ্যায় যখন আঙুর স্বামীর পদতলে লুটাইয়া গলবস্ত্র হইয়া নিত্যদিন প্রণাম করে, তখন সে প্রাণের সকল তন্ত্রী দিয়া অতি ব্যাকুল হইয়া নিবেদন করে—"হে আমার ইহপরকালের দেবতা, হে আমার পাপনাশন প্রভু, আমার ছলনার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। আমাকে বল দাও, আমি যেন নিঃশঙ্ক চিত্তে একবার সেই গোপন কথাটি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি।"

শিবমন্দিরে দুই বেলা প্রণাম করিয়াও আঙুর প্রার্থনা করে—"হে শঙ্কর, আমায় সত্য কথা বল্‌তে বল দাও। আর যেন আমার স্বামীকে অন্ধকারে না রাখি। আমার পরিচয় প্রকাশ করিয়া দাও। আমার পরমায়ু দিয়া আমার স্বামীর আয়ু বর্দ্ধিত কর।"

সে যে বেশ্যা-কন্যা এবং চিরদিন বেশ্যালয়ে লালিত ও পালিত হইয়াছে, এবং এতদিন যে সে তাহার দেবতার মত স্বামীকে এ কথা লুকাইয়া রাখিয়াছে—শুধু ইহার জন্যই তাহার সব সুখ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আঙুর ভাবিল, সে এ কথা প্রকাশ না করিলে সে পাগল হইয়া যাইবে।

বেলা প্রায় পাঁচটা। নীলমণি বাবু কাছারী হইতে ফিরিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পোষাক ঘরে আজ আমোদিনী নাই। এমন তো কখনও হয় নাই। কি হইল? তবে নিশ্চয় কোনও অসুখ হইয়াছে। নীলমণি খট্‌-খট্ করিয়া বাহির হইতেই, আমোদিনীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোনও অসুখ টসুখ হয়নি তো!" বলিয়া কপালে হাত দিয়া দেহের উত্তাপ অনুভব করিলেন।

আঙুর বলিল—"নাঃ অসুখ কেন হবে? আমার আজ একটু দেরী হয়ে গেছে। পড়ার ঘরে একখানা বই পড়্‌তে পড়্‌তে টেবিলের উপর ঢুলে পড়েছিলাম।"

"ওঃ এই কথা?" বলিয়া নীলমণিবাবু আশ্বস্ত হইলেন।

জলযোগাদির পর নীলমণি যথানিয়ম বসিবার ঘরে গেলেন। রাত্রি ৮টায় পুনরায় উপরে আসিলেন।

আহারাদির পর পুত্র কন্যাকে যথাস্থানে শয়ন করাইয়া আঙুর তাহার নিত্য অভ্যাস মত স্বামীর পদসেবা করিতে বসিয়া হো হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলমণি ভীত চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া, আঙুরকে বক্ষমধ্যে টানিয়া লইয়া, সাদরে চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে কহিলেন—"ওকি, ওকি, কি হল? কাঁদচ কেন?"

আঙুর ফোঁপাইতে লাগিল, নিরুত্তর! আজ সে বলিবেই, কারণ এ অসহ্য যন্ত্রণা সে আর সহিতে পারে না। যাহাকে ভালবাসা যায়, যে ভালবাসে—তাহার সঙ্গে কখনও কি ছলনা করা চলে? এ যে অসম্ভব, এ যে অস্বাভাবিক। সে যে এখন স্বামীর স্ত্রী, পুত্রের মাতা, গৃহের কর্ত্রী। কিন্তু মুখে কথা আসে কৈ? তাহাকে স্বামী পরিত্যাগ করিবেন, এ তাহার তত কষ্ট নয়—স্বামীর এই সুখ-স্বর্গ যে সে মহা-পাতকী ভাঙিয়া দিবে—ইহাই তাহার বড় ভয়। হয়ত তিনি এতবড় একটা বেদনা সহ্য করিতেই পারিবেন না। তাহা হইলে তাহার এ পাতকের আর যে অন্ত থাকিবে না।... তবু বলিতে হইবেই।

নীলমণি বাবু কাতরভাবে বারম্বার ঐ একই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আঙুর কহিল—"ওগো সেই কথাই যে আজ বল্‌ব, মুখে আসচে কৈ?" বলিয়া আবার উচ্ছ্বসিত বেগে কাঁদিয়া উঠিল।

নীলমণি অধিকতর কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলবে? শীগ্‌গীর বল; আমার বুক যে বড় দুড় দুড় কর্‌চে, আমোদ।" কণ্ঠস্বর আর্ত্ত।

হাতের গোড়ায় বিদ্যুৎ-আলোর সুইচ ছিল, আঙুর টিপিয়া দিয়া কক্ষটি অন্ধকার করিয়া দিল। বলিল—"কি করে' এতদিন পরে তোমায় সে কথা বলব গো? কি করে আমি এ পূজা নষ্ট করি? এ দেব-মন্দির আমি কি করে' ভাঙি গো?"

আঙুরকে বক্ষমধ্যে সজোরে আঁকড়াইয়া নীলমণি কহিলেন—"যাই হোক্, শীগ্‌গীর বলে ফেল! আর দেরী সইতে পার্‌চি না। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।"

আঙুর বলিল—"আমি গৃহস্থের কন্যা নই! আমি বেশ্যাকন্যা। আমার মা ও ভগিনীর এই কলিকাতাতেই ঐ পেশা। আমি সেই তাদেরি একজনের কন্যা ও আর এক-জনের ভগিনী।" আঙুরের মনের প্রাণের বুকের পাষাণ ভার নিমেষে অপসারিত হইল। একটা বিরাট মুক্তি, একটা অসীম আনন্দ, একটা গভীর প্রসন্নতায়—তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। শিথিল হইয়া দেহখানি নীলমণির বুকে এলাইয়া পড়িল।

নীলমণির শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—তাঁহার মাথার মধ্যে কথা কয়টি এমন একটি ঘূর্ণা সৃষ্টি করিয়া তুলিল যে তিনি জীবিত কি মৃত, নিদ্রিত কি স্বপ্ন দেখিতেছেন, প্রফুল্ল কি বিষণ্ণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মাথা হইতে একটা কুণ্ডলীকৃত ধূমস্তম্ভ হঠাৎ বাহির হইয়া যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল। তিনি আরো শক্ত করিয়া আঙুরকে জড়াইয়া ধরিলেন।

নীরব, নির্ব্বাক। গৃহ অন্ধকার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি প্রভাত হইল। নীলমণিবাবুর চক্ষু বসিয়া গিয়াছে ও জবাফুলের মত লাল টক্‌টক্ করিতেছে। আঙুরের চক্ষু দুইটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

একটা গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটিয়াছে, কর্ত্তা গিন্নীর মুখ চোখ দেখিয়া, চাকর বাকরেরা পর্য্যন্ত আঁচ করিয়া ফেলিল।

উভয়েই নীরবে গম্ভীর মুখে নিজ নিজ কার্য্য করিতে লাগিলেন। নীলমণিবাবু সে দিন কেবল কাছাড়ী গেলেন না।

দ্বিপ্রহরে আঙুরকে ঘরে ডাকিয়া নীলমণি জিজ্ঞাসা করিলেন-"আচ্ছা, এতদিন তুমি আমায় এ কথা বল' নাই কেন?"

আঙুর বলিল—"ভয়ে।"

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল—"আজ বল্‌লে কেন?"

আঙুর বলিলেন—"স্বামী কি বস্তু যখন চিনি নাই, তখন তোমার চোখে ধূলো দিয়ে তোমার সর্ব্বস্ব নিয়ে আমার মা

বোনের কাছে ফিরে যাব, এই পরামর্শ করেই এসেছিলাম, কাজেই সেই মৎলবেই ছিলাম। তারপর, গৃহ কি, স্বামী কি, স্বামীর প্রীতি যে আমার মত মহাপাপীকেও স্বামীকে চিনিয়ে দিতে পারে, কুপথ হ'তে সুপথে আনতে পারে, আজন্মের সংস্কার কাটিয়ে অন্ধকার হ'তে আলোয় আনতে পারে, এই সব যখন দেখলাম, প্রাণে প্রাণে বুঝলাম, তখন হ'তে আমার প্রাণে কাঁটার মত কেবলি খচ্ খচ্ করছিল যে কি করে' এই ছলনাটা প্রকাশ করি। এর জন্তে আমি আজ চার বৎসর কাল অত্যন্ত কষ্টে আছি। আর আছি কেন, ছিলাম। কাল থেকে আমার আর কোনও কষ্ট নেই। আমার বুকে এতদিন ধরে' যে পাহাড় চেপে বসেছিল, সে পাহাড় কাল সরিয়ে ফেলেচি। আমি ভালবাসা পেয়েছি—আর ভালবেসেছি। আর কি ছল-চাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনা থাকতে পারে ?"

কঠোর স্বরে নীলমণি বলিলেন—"এর ফল কি হবে জান ?"

স্থির অবিকম্পিত স্বরে আঙুর কহিল -"জানি। আমায় ত্যাগ করবে। আমায় ঝাঁটা মারতে মারতে বিদেয় করে দাও। আমি তোমার দাসী হবারও যোগ্য নই।"

"তাড়িয়ে তো দেবোই ; তারপর তুমি কি করবে ?"

দৃঢ় নিশ্চয়তাব্যঞ্জক কণ্ঠে আঙুর বলিল—"তোমার কাছে যা' পেয়েছি, যা' শিখেছি, তার চেয়ে বড় আর পৃথিবীতে নাই। সুতরাং যেমন তুমি আমায় বের করে দেবে, অমনি তোমার পদধূলি সম্বল নিয়ে গৃহত্যাগ করে এই পথেই একবারে মা গঙ্গার আশ্রয় নেব। এই জীবনেই যে নরক হ'তে স্বর্গে উঠেছে, আর তার তো কিছুরই কামনা নাই। আমার সব সাধ যে মিটেছে, প্রভু।"

"তোমার খুঁটে কি ?"

আঙুর উন্মাদের মত অট্টহাস্ত করিয়া উঠিল। বলিল—"ও মহাপ্রসাদ। তোমার থালা থেকে নিয়ে রেখেচি। শেষ মুহূর্ত্তে মুখে দিব। আমার সংসারের কল্যাণ—আমার জীবন পারের সম্বল"—বলিয়া সেটি মাথায় ঠেকাইল।

নীলমণি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই দাস দাসীর কলরবে ভিতরে আসিয়া শুনিলেন, আঙুরের ফিট্ হইয়াছে।

তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া মুখে হাতে জল দিতে জ্ঞান হইল। দাস দাসীরা সরিয়া গেল।

আঙুর বলিল—"কেন আমার ঘুম ভাঙালে ?"

নীলমণির চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু নিপতিত হইল। কহিল—"আমোদ, তোমায় আমি পরীক্ষা করছিলুম্। তুমি নির্দ্দোষী—অন্তের পাপ তোমায় স্পর্শিবে কোন্ হিসাবে ? তোমার মত পতিব্রতা গৃহস্থ-ঘরেও দুর্লভ। তুমি নিশ্চিন্ত হও—তুমি আমার যা ছিলে, এখন হ'তে আমার কাছে তার চেয়েও প্রিয়তর হলে।"

আবার অট্টহাস্ত ! এবার আর থামে না। অসম্বদ্ধ ভাষায় বলিল—"পতি দেবতার চেয়েও বড়, পায়ের ধুলো দাও, আমি যাই—মা গঙ্গার জল বড় ঠাণ্ডা। আমি যে মহাপাতকী—স্বামীর সঙ্গে ছল চাতুরী ? তোর নরকেও ঠাঁই হবে না—হো হো হো হো—"

নীলমণি ভীত হইয়া উঠিলেন। তখনি চিকিৎসকে কবিরাজে বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কবিরাজেরা বলিল—"উন্মাদের লক্ষণ।" ডাক্তার বলিল—হার্ট ফেল্ করতে পারে।

নীলমণিবাবু শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন।

বাংলার নৃত্যকলা ও নর্ত্তকী

(২)

(শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম এ, ভাগবতরত্ন)

মুসলমান যুগে পরাধীনতার দিনে বাঙ্গলার অন্তঃপুর হইতে নৃত্যকলার তিরোভাব হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুযুগের আনন্দ স্মৃতিগুলি তখনও জাতির মানস পট হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। তাই বাঙ্গলার কাব্যে ও সাহিত্যে হিন্দুযুগের ভদ্র মহিলাদের নৃত্যবিদ্যায় জ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই।

এই সকল কাব্য-সাহিত্য মুসলমান আমলে রচিত। হিন্দুর গৌরবময় যুগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়া এগুলি লিখিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল এইরূপ কাব্যের অন্যতম বিষয় ছিল। বহুলেখকের অমর তুলিকা-পাতে চাঁদ সদাগর ও মনসাদেবীর দ্বন্দ্বচিত্র ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

এই শ্রেণীর কাব্যগুলির মধ্যে আমরা বেহুলার নৃত্য-বিদ্যার পরিচয় পাই। বেহুলা তাহার প্রাণভরা ভালবাসা লইয়া স্বামীর সহিত বাসর ঘরে গিয়াছেন। তরুণ তরুণীর হৃদয় প্রেমের মধুর হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল—মনসাদেবীর প্রেরিত সর্প আসিয়া বেহুলার স্বামী লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করিল। লক্ষ্মীন্দরের প্রাণ বিয়োগ হইল -কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে বেহুলা সাবিত্রীর মতন স্বামীকে পুনরায় বাচাইবেন পণ করিলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া বেহুলা ভেলায় স্বামীর দেহ তুলিয়া নদীতে ভাসিলেন। কত দিনের অক্লান্ত সাধনার পর বেহুলা স্বর্গপুরে উপস্থিত হইলেন।

বেহুলা পূর্ব্বজন্মে ছিলেন উষাদেবী। তাই স্বর্গের অপ্সরাগণের সহিত তাঁহার বড় ভাব। তাহারা তাহাদের সখীকে নর্ত্তকীর উপযুক্ত বেশ পরাইয়া দিল। বেহুলা গভীর-তম দুঃখের মধ্যে ও স্বামীর জীবন লাভ করিবার জন্য নৃত্য করিতে চলিলেন। মহাদেব ধ্যানে মগ্ন ছিলেন,বেহুলার অপরূপ লাস্য-ভঙ্গিমায়—তাঁহার কোমল চরণের নূপুরের রুনু-ঝুনু ধ্বনিতে—তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি নৃত্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ঠাকুরটী এমন আনন্দ একা উপভোগ করিয়া সম্পূর্ণ তৃপ্তি পাইলেন। না তাই পার্ব্বতীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। বেহুলার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে চলিল—কেননা তাঁহার উদ্দেশ্যই ছিল পার্ব্বতীকে প্রসন্ন করিয়া স্বামীর জীবন ভিক্ষা করিয়া লওয়া।

পার্ব্বতী আসিলেন। দেবগণ সকলেই উপস্থিত হইলেন। দেবসভায় বেহুলার নৃত্য আরম্ভ হইল। ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি দ্বিজ বংশীবদন তাঁহার পদ্মপুরাণে এই নৃত্যের বর্ণনা করিয়াছেন—

> নৃত্য করে বিপুলা সুন্দরী।
> যতদেব হরষেতে বসি দেখে চারিভিতে
> কটাক্ষে মোহিল সুরপুরী॥
> খঞ্জন গমনে যায়, তাল কাটে হাতে পায়
> অলক্ষিতে সুতার সঞ্চারে।
> বায়ু ভরে উভা হয়, শূন্যে ভঙ্গরি লয়
> উলটে সঙ্কেত তাল ভরে॥
> অদ্ভুত নাচন দেখি, দেবগণ হল সুখী
> মনে কন্যা করে অনুমান।"

যাঁহারা রুসিয়ার নর্ত্তকীশ্রেষ্ঠা অ্যানা পাভ্লোভার নৃত্য দেখিয়াছেন তাঁহারা

"বায়ু ভরে উভা হয়, শূন্যে ভঙ্গরি লয়"

বুঝিতে পারিবেন। কবি স্বয়ং বাঙ্গলার নর্ত্তকীদের নিকট ঐ প্রকার নৃত্য না দেখিলে—ঐরূপ বর্ণনা করিতে পারিতেন না।

বেহুলা যে দেবসভায় নৃত্য করিয়াছিলেন তাহা সকল কবিই স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গলার নৃত্য কলার উদাহরণ স্বরূপ কবি জানকীনাথের তিনশত বৎসরের হাতে-লেখা

প্রাচীন পুঁথী হইতে বেহুলার নৃত্যের বর্ণনাটী উদ্ধার করিতেছি।

নাচে সুন্দরী বেউলা অলক্ষিতে করে খেলা
নানারূপে করে অঙ্গ ভঙ্গ।
নয়ন কটাক্ষে চায়, প্রাণ হরি নিয়া যায়
অপরূপ মদন তরঙ্গ॥
খঞ্জন গঞ্জন গতি চলিতে সুভাতি অতি
ঘনে ঘনে আঙ্গুলি দেখায়।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে বৈসে অতি সুললিত বেশে
ক্ষণে ক্ষণে মন্দিরা বাজায়॥
মুখে গীত গায় ভাল সংযোগে বাজায় তাল
ময়ুর পেখম জিনি নাচয়ে পাকে।
সুর মুনি আদি যত দ্রব হৈল জলবত
করুণায় ভেদিল অধিকে॥
কোকিলা জিনিয়া রব নৃত্য করে অসম্ভব
ক্ষীণ কটি সদায় হেলায়।
অপরূপ নৃত্য করি মোহিলেক ত্রিপুরারী
পণ্ডিত জানকীনাথে গায়॥

বেহুলার নৃত্য দেখিয়া দেবগণ মোহিত হইলেন। তাঁহারা লখীন্দরকে প্রাণ দান করিলেন।

কিন্তু মনসা দেবীর ইহা সহ্য হইল না। তিনি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন—

"কার ঝী কার বা বধূ আইল কোথা হনে (হইতে)।
নগরীয়া বেশ্যা হেন ভাল নৃত্য জানে॥
দ্বিজবংশী।

এই উক্তিটীর মধ্যে বাঙ্গলার অন্তঃপুর হইতে নৃত্যকলার নির্ব্বাসনের ইতিহাস লুকায়িত আছে বলিয়া আমি মনে করি। বেহুলার গান যখন প্রথমে লোকমুখে গীত হইত—সে সময়ে কোন অন্তঃপুরিকার নৃত্য করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু যখন ঐ গীতগুলি পালা আকারে লিখিত হইল—তখন দেশে মুসলমানের পূর্ণ প্রভাব। সে সময়ে কেবল "নগরীয়া বেশ্যারাই" নৃত্যকলার চর্চ্চা করিত। তাই দ্বিজবংশীর পদ্মা ঠাকুরাণী বেহুলাকে ঐ খোঁটাটী দিতে ছাড়িলেন না। অন্যান্য কবির পদ্মপুরাণে বা মনসার ভাসানে ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই, আমি মনে করি যে কবির সমসাময়িক অবস্থার কথা এখানে ঠাকুরাণীর মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।

বেহুলা সম্বন্ধেও সেই কথা, রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। রাধা বাঙ্গলার নিজস্ব জিনিষ। এক বাঙ্গালী উপনিবেশ ব্রজমণ্ডল ব্যতীত আর বাঙ্গলাদেশ ছাড়া ইঁহ কোথাও নাই। রাধার ভাবমাধুর্য্য বাঙ্গলার প্রাণের সৌন্দর্য্য দিয়া গড়া। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাঙ্গলার বৈষ্ণব-কবিগণ রাস বর্ণনা করিতে যাইয়া তাহার সাহায্য বড় বেশী লয়েন নাই। তাঁহারা খুব সম্ভব বাঙ্গলার প্রচলিত নৃত্যকলার ছায়া লইয়াই রাধাকৃষ্ণের নৃত্য বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আমি মনে করি সেই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার অন্তঃপুরে নৃত্যকলা প্রচলিত ছিল না। কেননা তাহা থাকিলে বৈষ্ণব কবিদের নৃত্যের চিত্র আরও সুস্পষ্ট হইত। তাহাদের বর্ণনা দ্বিজবংশী বা জানকীনাথের মতন চোখে দেখিয়া লেখা বলিয়া বোধ হয় না। তাহার কারণ তাঁহারা ছিলেন সাধক সাধারণ নর্ত্তকীর নাচ দেখিতে তো আর তাঁহারা যাইতেন না।

বৈষ্ণব কবিদের রাসের অসংখ্য পদ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমার কথার প্রমাণ দিতেছি। নৃত্য করিতে গেলে মেয়েদের চুড়ী ও নূপুরের শব্দ হইবেই- একথা বালকেও জানে। বৈষ্ণব কবি মাধব কেবল মাত্র সেই ধ্বনিরই উল্লেখ করিয়াছেন—নৃত্যের আর কোন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার পদ—

রুণু রুণু রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু ঝুনু ঝুনু
কঙ্কন কর রণরণি।
ঝম ঝম ঘাঁঘর ঘাঘটি কটী কিঙ্কিনি
কঙ্কন ঝুমর ধ্বনি॥
ডগ মগ ডগ মগ ডম্ফ ডিমিকি ডুমি
পী পী বেনু নিসানে।
চলত চিত্র গতি নর্ত্তন পদ অতি
মাধব ইহ রস গানে॥

বৈষ্ণব কবিগণের পাণ্ডিত্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু লাস্য সম্বন্ধে তাঁহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা যৎসামান্যই ছিল। তাই কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ দাসের পদেও সংস্কৃত শাস্ত্রের "ছুরিত নৃত্যের" বর্ণনার চেষ্টা দেখিতে পাই মাত্র তাহাতে বস্তুতঃ ঐরূপ নৃত্য যে তিনি কখনও স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না।

নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজ নারী।
জলদ-পুঞ্জে জনু তড়িত লতাবলি
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥
নটন-হিলোল – লোল মণি কুণ্ডল
শ্রমজল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রস ভরে গলিত ললিত কুচ-কঞ্চুক
নীতি খসত অরু কবরিক বন্ধ॥
ছুহুঁ ছুহুঁ সরস পরশ—রস লালসে
আলিঙ্গই রহ তনু লাই।
গোবিন্দদাস পহু মুরতি মনোভব
কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই॥

পূর্ব্ব প্রবন্ধেই আমরা বলিয়াছি যে নৃত্য করা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আনন্দে মনটী যখন নাচিয়া উঠে, তখন দেহটীও তাহার সঙ্গে তাল রাখিতে যাইয়া নৃত্য করে। তাই বাঙ্গলার অন্তঃপুর হইতে নৃত্যকলা নির্ব্বাসিত হইলেও দেশমধ্যে তাহার চর্চ্চা রহিয়াই গেল। ধর্ম্মকর্ম্মে দেবতার সমক্ষে নৃত্য করা গ্রীক্, রোমান্, জার্ম্মাণ প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশের পুরুষেরাও ঐরূপ ধর্ম্ম উৎসব উপলক্ষে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধর্ম্ম ঠাকুরের নাম আপনারা অনেকেই শুনিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধদের দেবতা—পরে হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছেন। ইঁহার উৎসব উপলক্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে নৃত্য প্রচলিত আছে। শূন্য পুরাণে লিখিত আছে—

পুষ্পাঞ্জলি গীত পণ্ডিত রামএ গান,
নট গীত করে গতি এ জরি টৌপর রাতি
তামর অজুরী লইএ কোরে॥"

"নানাম্ বাজানা নিত্ত গীত আনন্দ পুরিত
এমন ধর্ম্মর সেবা ভুবন মোহিত॥

ঘনরামের ধর্ম্ম মঙ্গলেও আছে——

"যে এ হাতে নাচে গায় উভ হাত তুলি॥"

আজও মালদহ জেলায় ধর্ম্মের গাজন উপলক্ষে পুরুষদিগের নানারূপ নৃত্য হইয়া থাকে। "আদ্যের গম্ভীরা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের ভাষায় তাহার বর্ণনা দিতেছি—"ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশে যেখানে জিন দিতে হয়, তথায় ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের মধ্যে অশ্বারোহী কটিদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া অশ্বের উপর পার্শ্বস্থিত রজ্জু স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কার্ত্তিকের নৃত্যও ঐ প্রকার। এতদ্ব্যতীত ভালুক নাচও হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে ভল্লুকের মুখা এবং কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত শণ বা পাটের চুল দিয়া সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া মানব ভল্লুকের মুখা পরিধান করিয়া থাকে এবং অপর একজন সেই ভালুককে নাচায়। কালী মুখার নৃত্যকালে কখন কখন চারিখানি হস্তবিশিষ্ট দেখা যায়, উহার চারিখানি হস্তই কাঠের। নৃত্যকারী আপন হস্ত পশ্চাতে বন্ধন করিয়া নৃত্য করে। চামুণ্ডামুখা নৃত্যকালে হস্তে খর্পর ও পারাবতাদি ধারণ করিয়া নাচিতে থাকে। শিব-পার্ব্বতী শান্তভাবে নৃত্য করিয়া থাকে। পার্ব্বতীর কক্ষে পূর্ণঘট ও আম্রশাখা এবং এক হস্তে প্রস্ফুটিত কমল থাকে। বুড়া-বুড়ীর নৃত্য কৌতুকপ্রদ। শিবের গাজনে সন্ন্যাসীরাও নানারূপ নৃত্য করিয়া থাকে—তবে সে নৃত্যকে কলা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।

মনসার ভাসানে গান করিবার সময়ে তালে তালে নৃত্য করিতে হইত। সে নৃত্য রীতিমত শিক্ষা সাপেক্ষ ছিল। রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ময়মনসিংহ গীতিকায় "কেনারামের পালায়" দ্বিজ-বংশীর দলের ঐরূপ নৃত্যের পরিচয় আছে।

মঙ্গলচণ্ডীর গানেও ঐরূপ নৃত্য প্রচলিত ছিল। মাণিক দত্ত লিখিয়াছেন—

অষ্টদিন অভয়া বারিতে কর স্থিতি।
নাট-গীত যন্ত্র সমেত লাভ বৃহিতি॥

চৈতন্য-মঙ্গল গান আগে এদেশে খুব চলিত ছিল। এখনও দুই একস্থানে ইহা হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ চৈতন্য-মঙ্গল গায়ক চাঁপা ঠাকুরের গান আমি শুনিয়াছি। তাহাতে দলের সকল লোকই নূপুর পরিয়া নৃত্য করে ও গান করে। সে নৃত্যের মধ্যে বেশ লালিতকলা ফুটিয়া উঠে।

আর ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে প্রেমের বন্যা আনিয়াছিলেন, তাহাতে যে আসিয়াছে সেই নাচিয়াছে। এই নৃত্যই হইতেছে মানব মনের স্বভাবসিদ্ধ নৃত্য। ইহার মধ্যে কৃত্রিমতা কলাবিন্যাস কিছুই নাই, কেবল মনের আনন্দে নৃত্য করা।

নাচে শচীসুত, লীলা অদভুত, চলনি ডগমগি ভঙ্গিমা।
সঙ্গে কতশত, ভকত গাওত, হিলন গদাধর অঙ্গিয়া॥
আজানু বাহতুলি, বোলয়ে হরি হরি, আপনি নিজরসে মাতিয়া।
বদন মণ্ডল, চাঁদ ঝলমল, দশন মোতিম পাঁতিয়া॥
কষিত কাঞ্চন, কিরণ ঝলমল, সতত কীর্ত্তন রঙ্গিয়া।
অরুণ-নয়নে, বরুণ আলয়, অঝরে ঝরে দিন রাতিয়া॥
পঙ্গু অন্ধ যত, পতিত দুরগত, দেয়ল সব প্রেম যাচিয়া।
করুণা দেখি মনে, ভরসা বাঢ়ল, দাস নরহরি ছাতিয়া॥

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মুসলমান যুগে বাঙ্গলার সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই নৃত্যকলার প্রচলন ছিল।

ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে বাঙ্গলাদেশে যে সকল ইংরাজ আসিতেন, তাঁহারা আমাদের নর্ত্তকীদের নাচ দেখিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বাঙ্গলার ধনী সম্প্রদায় পূজার সময়ে সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। আর তাঁহাদের আনন্দ বিধান করিবার জন্য নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করিতেন। অতি পুরাতন কলিকাতা গেজেটে এই সকল নৃত্যের ও নর্ত্তকীর অনেক প্রশংসা ছাপা আছে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে দুইজন ইংরাজ মহিলা আমাদের দেশের নাচ দেখিয়া অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন বিশপ হিবরের পত্নী। তিনি পাদরী সাহেবের স্ত্রী হইয়াও, নাচ দেখিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্বামী ছিলেন খাঁটী Puritan—তাই তাঁহাকে দলে টানিতে পারেন নাই। Lady Heber রূপলাল মল্লিকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইয়া এই নাচ দেখেন, তাঁহার স্বামীর Journal এর প্রথম ভাগের পাদটীকায় তাঁহার স্ত্রীর প্রদত্ত নাচের বর্ণনাটী দেওয়া আছে। তিনি আমাদের নর্ত্তকীগণের শ্লীলতার কিরূপ প্রশংসা করিয়াছেন দেখুন—"I never saw public dancing in England so free from everything approaching to indelicacy. Their drerss was modesty i self; nothing but their faces, feet and hand, being exposed to view." অর্থাৎ ইংলণ্ডে আমি অশ্লীলতার গন্ধ বিবর্জ্জিত এরূপ প্রকাশ্য নৃত্য কোথাও দেখি নাই। এই বাংলার নর্ত্তকীদের বেশ যেন লজ্জা মূর্ত্তিমতী; তাহাদের মুখ, পা আর হাত ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। ১৮২৪ সালের রুচি এইরূপ ছিল, আর ১৯২৪ সালের থিয়েটারের নর্ত্তকীদের রুচি কেমন তাহা পাঠকগণই আমার অপেক্ষা ভাল বলিতে পারিবেন।

কিন্তু লোর্ড হিবার এই নৃত্যকলার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ফ্যানী পার্কস্ নাম্নী একজন ইংরাজ মহিলা ঠিক্ এই বৎসরেই রাজা রামমোহন রায়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইয়া কিন্তু বাংলার নৃত্যকলার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসাই করিয়াছেন। ফ্যানী পার্কসের "Wanderings of a pilgrim, in search of the picturesque" নামক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে ঐ বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা রামমোহনের বাড়ী বাইজী নাচ হইয়াছিল। শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইতে পারেন। এই ঘটনা আমাদের বাংলাদেশে বড় বেশী লোকে জানেন না। কিন্তু উক্ত মহিলার বাক্য অবিশ্বাস করার কোন হেতু নাই। আর সে যুগে সকল ভদ্রলোকই বাড়ীতে বাইজী নাচ দিতেন। তাহা কেহই দোষাবহ বলিয়া মনে করিতেন না।

ফ্যানী পার্কস্ বলিয়াছেন যে নর্ত্তকীরা প্রত্যেকে প্রায় একশত গজ করিয়া মস্‌লিন কাপড় পরিয়া নাচিতে নামিয়াছিলেন। ২০০হাত কাপড় পরা! অনুমান করুন একবার ব্যাপারটা। তাহাদের নৃত্যে আনন্দ যেন উছলিয়া উঠিতেছিল তাই ফ্যানী পার্কস্ উহা অত উপভোগ করিয়াছিলেন।

একশত বৎসরের মধ্যে বাংলার নৃত্যকলার ও নর্ত্তকীদের বেশভূষার অনেক, এমন কি আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের কথা বলিবার ও আধুনিক নৃত্যকলার বিশ্লেষণ করিবার অধিকার আমার নাই। কেন না আজ প্রায় পনেরো বৎসর কাল আমি থিয়েটারে যাই নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে আমার অনধিকার চর্চ্চা করা হইবে। আশা করি কোন কলাবিদ্ স্বয়ং এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করিবেন।

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

[শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বহু পণ্ডিত বহুবিধ আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিম সাহিত্য লইয়া এ পর্য্যন্ত যত সমালোচনা হইয়াছে, বাঙ্গালার কোনো লেখকের সাহিত্য লইয়া তত আলোচনা হয় নাই; সুতরাং বঙ্কিম-প্রসঙ্গে এ প্রবন্ধে নূতন কিছু আমরা যে বলিব, আশা করি সে প্রত্যাশা কেহ করিবেন না। প্রায় ত্রিশ বৎসর বাঙ্গালার নাট্যশালার সংস্পর্শে থাকিয়া আমি রঙ্গমঞ্চের উপর বঙ্কিমের যে প্রভাব উপলব্ধি করিয়াছি আজ তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব মাত্র। বাঙ্গালার নাট্যশালার গঠনে প্রথমে দীনবন্ধুর নাটক প্রহসন যে সাহায্য করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলিও তদপেক্ষা কিছু কম সাহায্য করে নাই। গিরীশচন্দ্র নাট্যকার হইবার পূর্ব্বে এবং তাঁহার নাট্যকার হইবার পরেও বঙ্কিমচন্দ্রকে রঙ্গমঞ্চ কখনো পরিত্যাগ করে নাই, করিতে পারে নাই, এবং নাট্যমঞ্চের উপর বঙ্কিমের প্রভাব কতদিনে যে অপসারিত হইবে,—কখনো হইবে কিনা—তাহাও বলা কঠিন।

পঞ্চাশ বৎসরের নাট্যশালার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও যেমন—আজও তেমনি দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী বাঙ্গালী দর্শককে প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া সমান ভাবেই আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি প্রায় সকল উপন্যাসই বাঙ্গলার নাট্যশালাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে এবং আজও পর্য্যন্ত ইহাদের কোনটাই তেমন পুরাতন হয় নাই।

শুধু পুরাতন হয় নাই নহে, নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নাট্যকারের যত নাটক রচিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নাটকেই বঙ্কিম বাবুর প্রভাব, প্রচ্ছন্ন ও অপ্রচ্ছন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাহির হইতে দর্শক হিসাবে সকল সময় বঙ্কিমের এই প্রভাব ধরা যায় না কিন্তু আমরা নানা নাট্যকারের নানা নাটকাবলীর রিহার্শেল দিতে দিতে এই প্রভাব বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারি। সেই কথাই এই প্রবন্ধে বলিবার চেষ্টা করিব।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দীনবন্ধুবাবুর নীলদর্পণ, সধবার একাদশী প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গলার নাট্যশালা তাহার যবনিকা প্রথম উত্তোলন করে। দীনবন্ধুবাবুর এই নাটকগুলি কতকটা সামাজিক। নীলদর্পণ তাৎকালিক বাঙ্গলার নীলকর-পীড়িত কতকগুলি সংসারের চিত্র। তাঁহার সধবার একাদশী, জামাই বারিক প্রভৃতি সামাজিক ব্যঙ্গরঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। তখনও বাঙ্গলা সাহিত্যে ঠিক রোমান্সের যুগ আসে নাই। নাটকে রামনারাণের কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব, তাৎকালিক সমাজচিত্র লইয়া। মাইকেলের মেঘনাদবধ পৌরাণিক। গিরিশবাবুও ইহার পরে যে সমস্ত নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন তাহার অধিকাংশই রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে লিখিত। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী প্রভৃতি বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রথম রোমান্সের যুগ আনিল। তখনকার পাঠকসম্প্রদায় বাঙ্গালায় এই নবরসের আস্বাদনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গলার নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ পাঠকের এই আনন্দ দেখিয়া বঙ্কিমের এই সকল উপন্যাস নাটকাকারে দর্শকগণের সম্মুখে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। বাঙ্গলার নাট্যশালায়ও রোমান্সের যুগ আসিল। বাঙ্গলার সাহিত্যেও যেমন, বাঙ্গলার নাট্যশালায়ও তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রই এই রোমান্টিক যুগের প্রবর্ত্তক।

বঙ্কিমবাবুর ঐ উপন্যাসগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) রোমান্টিক— যথা দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী।

(২) পারিবারিক, যথা :— ইন্দিরা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল।

(৩) ঐতিহাসিক, যথা : রাজসিংহ, আনন্দমঠ।

এইগুলির প্রত্যেকটী রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছে, এবং এখনো বেশ আগ্রহের সহিতই অভিনীত হয়। বঙ্কিমের এই ত্রিবিধ নাটকের প্রভাব, কিরূপ প্রবলভাবে অন্য নাটকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে আমরা তাহার কথাই প্রথমে বলিব। প্রণয়ঘটিত ব্যাপার লইয়া রোমান্টিক নাটক। একজন একজনকে ভালবাসে, যেই সেই প্রণয়ে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইল, একটা কথা চলিত হইয়া গিয়াছে—আমরাও অমনি বলি— অমুকের ওসমান ঐ। কত নাটকে যে "এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর" দেখিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দুর্গেশনন্দিনীর এই কারাগারের দৃশ্য বাঙ্গলার বহু নাটকে স্থানলাভ করিয়াছে; এমন কি, অনেক ঐতিহাসিক নাটকেও এই দৃশ্যের অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রহরীকে ফাঁকি দিয়া কোন কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে, অমনি বিমলা ও রহিম আসিয়া দেখা দিল। সেই সেখ জীর লম্বা দাড়ী, আর বিমলার কোমল করস্পর্শ, সেই পলায়ন! নায়কের উদ্দেশে নায়িকার গৃহত্যাগ মৃণালিনীতে যেমন আছে, দর্শক রঙ্গমঞ্চে অনেক নাটকেই তাহা দেখিতে পাইবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাগুলিকে প্রধানতঃ আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। এক, অতি কোমলা, ভীরু স্বভাবা, প্রকৃত সরলা; যথাঃ—কপালকুণ্ডলা, কুন্দ, রমা, দলনী, তিলোত্তমা ইত্যাদি, আর এক, মুখরা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী, তেজসম্পন্না, কোপ—প্রেম—গর্ব্বস্ফুরিতাধরা রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি, যথাঃ মতিবিবি, বিমলা, সূর্য্যমুখী, শান্তি, রোহিণী ইত্যাদি। এক Feminine beauty আর এক Masculine beauty. বাঙ্গলার অনেক ঐতিহাসিক, রোমান্টিক কিম্বা পারিবারিক নাটকেই এই দুই বিভিন্নজাতীয়া নারী চরিত্র মিলাইয়া লইবেন। দীনবন্ধুর নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণি ও রোগসাহেবের দৃশ্যের অনুকরণ যেমন প্রায় বাঙ্গলার অনেক নাটকের জমাট দৃশ্য (!) অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সাহেবের গালে চড় মারিয়া বন্দুক কাড়িয়া লইল—ইহার অক্ষম অনুকরণ অনেক জমাট নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আজিকালিকার ঐতিহাসিক নাটকে। রাজা আছেন, মন্ত্রী আছেন, সেনাপতি আছেন, বড় বড় বীর জল্পনা কল্পনা করিতেছেন—শত্রু দেশ আক্রমণ করিতে আসিতেছে; উপায় কি? রাজা বলিলেন—এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নই, লোকাভাব, যুদ্ধে কাজ নাই, সন্ধি কর। অমনি অপ্রত্যাশিতভাবে একজন রমণী কে জানে সে ভিখারিণী কি সন্ন্যাসিনী, রাজমহিষী কিম্বা রাজকুমারী,— ধূমকেতুর মত আবির্ভূতা হইয়া তারস্বরে বলিয়া উঠিল "সন্ধি? কখন না; তোমরা কেউ না যুদ্ধ কর, আমি করবো।" রাজা থতমত খাইয়া বলিলেন, যুদ্ধ? তা, তা, লোক কোথায়? রমণী উত্তর করিল, লোক আমি সৃষ্টি করিব।

সেনাপতি বলিলেন তা যেন হোল কিন্তু তাহাদের শিখাইবে কে? রমণী বলিল, আমি। এই যে করতালিধ্বনি সৃষ্টিকারিনী রমণী, ইহা বাঙ্গলার কোন্ ঐতিহাসিক নাটকে যে নাই তাহা ত বলিতে পারি না। সেই বঙ্কিমের শান্তির বিকল্প, অনুকল্প, দ্বিকল্প!

রোহিণী কুন্দের অনুকরণে জলেডোবা, বিষ খাওয়া, গলায় দড়ী দেওয়া, বুকে ছুরী মারা, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের উপর এই যে আত্মহত্যার প্লাবন কোন পিনালকোডই আজও পর্য্যন্ত ইহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। জয়ন্তী যুদ্ধক্ষেত্রে গঙ্গারামের বুকে সেই যে ত্রিশূল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—আহা! বেচারী যদি জানিত যে উত্তরকালে তাহার এই ত্রিশূল ধারণ বাঙ্গালী দর্শকের হৃদয়ে মুহুর্মুহু শেলাঘাত করিবে তাহা হইলে বোধ হয় সে কখনই এ গর্হিত কার্য্য করিত না। প্রতাপের আত্মত্যাগ এবং মৃত্যুকালে সেই আর্ত্তনাদ "কি জানিবে তুমি সন্ন্যাসী"—এ যে এতাবৎ কত বিকৃত ভাষায়, কত বিকৃত ভাবে, কত নায়কের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে এবং রামানন্দের সেই সান্ত্বনা বাক্য ও শুভাশীর্ব্বাদ—"যাও প্রতাপ সেই অনন্তধামে" শেষে সনাতন হইয়া কত অভিনেতাকে যে গেরুয়া পরাইয়া ছাড়িয়াছে তাহার মোটামুটি হিসাব দর্শকগণ একটু চোখ মেলিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন।

আনন্দমঠে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মাতৃ-মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন;—মা আমার যা ছিলেন, যা হইয়াছেন, যা হইবেন। কোন ঐতিহাসিক নাটক এই কালবুট বা ছকের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে? রঙ্গমঞ্চে পুনঃপুনঃ এই জননী জন্মভূমির আবির্ভাবের অত্যাচারে গভর্ণমেণ্টকে একটা ডিপার্টমেণ্টই খুলিতে হইল, যেখানকার কটকে সেলাম না করিয়া কোনও ঐতিহাসিক নাটকেই "জন্মভূমি" টু শব্দটী পর্য্যন্ত করিতে পারেন না।

রাজসিংহের জেবউন্নিসা মোবারককে সাপের মুখে ফেলিয়া দিয়াছিল। প্রণয়ের প্রতিহিংসা লইতে গিয়া ইহার পর যে কত জেবউন্নিসাই কত নায়কের মুণ্ডপাত করিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কিভাবে বাঙ্গলার বহু নাটকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে মোটামুটী তাহারই কথা বলিলাম। অপ্রিয় হইবে বলিয়া উদাহরণ স্বরূপ কোন নাটকের নাম করিলাম না।

গত বৎসর নৈহাটীতে সাহিত্য-সম্মিলনে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমবাবু সাহিত্যে শুধু রথ তৈয়ারী করেন নাই, পথও তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং এখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সাহিত্যরথ সেই পথেই চলিতেছে—পথান্তর গ্রহণ করে নাই। রঙ্গমঞ্চের দিক্ হইতেও কি এই কথা বলা যায় না?

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। *

আহুতি

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

(১২)

মাতার সঙ্গে সঙ্গে মালতীর সেবা করিবার উৎসাহ, কাজ করিবার উদ্যম এবং চিন্তা করিবার সমুদয় শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া গেল। তাহার আহার নাই নিদ্রা নাই। সে কাঁদাকাটী করিয়া, চীৎকার করিয়া, কাহাকেও অস্থির করিয়া তুলিল না, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক শান্ত ভাব এবং চোখের শূন্যদৃষ্টি দেখিয়া সকলে ভয় পাইয়া গেল। জমিদার বাবু তাহার অবস্থা শুনিয়া ভীত হইয়া তাহাকে কাছে ডাকিলেন, সে কথা সে শুনিল না, কিম্বা বুঝিতে পারিল না, ঠিক বোঝা গেল না। অবশেষে যখন তাহাকে টানিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে লইয়া যাওয়া হইল, তিনি তাহার দিকে চাহিয়া 'হাউ-হাউ' করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, কিন্তু মালতী তেমনি ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, এবং ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া নীরবে উঠিয়া বারাণ্ডার একটা অন্ধকার কোণে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কৃষ্ণপক্ষের ঘোরতর অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ীতে একটা ভয়ের ছায়া কালোরূপ ধরিয়া ধীরে ধীরে ছাইয়া পড়িল। বাড়ীর কাজকর্ম্ম অত্যন্ত সাবধানতার সহিত চলিয়াছে, কোথাও এতটুকু শব্দ হইলে সকলে আতঙ্কে আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে,—সর্ব্বত্র একটা ভয়ঙ্কর নীরব গাম্ভীর্য্য!—মালতী তখনও বারাণ্ডার কোণে তেমনই ভাবেই বসিয়া রহিল, ঝিদের মধ্যে কেহ কেহ কর্ত্তব্যের খাতিরে দুই একবার তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল বটে,—কিন্তু মালতী তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া আসিতে লাগিল। মামা ঘুমাইয়া পড়িলে, নরেন ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং অন্ধকার বারাণ্ডায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া মালতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—মালতী রেলিংএ মাথা রাখিয়া নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তেলের অভাবে একরাশ রুক্ষ চুল পিঠ ছাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া মাটিতে গিয়া পড়িয়াছে,—দেহখানি শীর্ণ, মুখখানি মলিন বিবর্ণ। নরেন সস্নেহে অত্যন্ত কোমলস্বরে ডাকিল 'মালতী।' মালতী মুখ তুলিয়া চাহিল, নরেন একখানি টুল টানিয়া কাছে সরিয়া বসিল এবং মালতীর পিঠে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে চুল-গুলি সযত্নে বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করিল। মালতী কি যেন কি ভাবিয়া সহসা নরেনের কোলে মুখ ঢাকিয়া মাতার মৃত্যুর পর আজ ঠিক দশ দিনের দিন আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নরেন বাধা দিল না, সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা মাত্র করিল না, কেবল তাহার চক্ষু হইতে অনর্গল ধারায় জল ঝরিয়া ঝরিয়া মালতীর চুল ভিজিতে লাগিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক একভাবেই কাটিয়া গেল এবং তাহার পর হঠাৎ মালতী আপনি উঠিয়া পাশের ঘরে তাহার নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মাঘ মাসের কুয়াসাঘন প্রচণ্ড শীত এবং দারুণ অন্ধকারে বাহিরের নিশীথ প্রকৃতি তখন স্তব্ধ মৌন হইয়া পড়িয়া আছে। নরেন্দ্রনাথ বহুক্ষণ সেই দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং তাহার পর ধীরে ধীরে মাতুলের শয়ন কক্ষের দিকে চলিয়া গেল।

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, এবং মালতীও ক্রমে আপনার সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিল ও একটু একটু করিয়া আবার রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিতে লাগিল। রোগীর অবস্থা কয়দিন হইতে একই ভাবে চলিয়াছে, খুব

শীঘ্র কোন বিপদের আশঙ্কা নাই বটে, তথাপি তিনি অতি অল্পেই এত বেশী অস্থির হইয়া উঠিতেন যে নরেন্দ্র কিংবা মালতীকে অনুক্ষণ তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকিতে হইত।

একদিন নির্জ্জন ঘরে জমিদার বাবু মালতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মালতী, তোমার সম্বন্ধে যে আমি আর কোন কিছুই ভেবে পাইনে মা। সংসারে যে একটী কেউ তোমার আপনার রইলো না, আমি মরে গেলে তোমার কি হবে?"

মালতী নতমুখে বলিল, "সে ত মেসোমশাই, আগেই একদিন আপনি ঠিক করে দিয়েছিলেন, আমি সে কথা ত ভুলিনি।"

"পারবে ত মা, সারা জীবন কেবল লেখা-পড়া নিয়েই থাকৃতে? জান মা, মানুষের শিক্ষা এক জীবনে কখনও শেষ হয় না, যত শিখবে ততই কেবল আরও শিখতে ইচ্ছে হবে। এ শেখার যে কত আনন্দ মা, যদি শেখ বুঝবে তখন। ভাল কথা,—আচ্ছা মা, তোমার সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করতে চাও বল ত শুনি?"

"আমার যা কিছু আছে, আমার রাধাবল্লভের সেবায় তা বন্দোবস্ত করে দিন মেসোমশায়। মাসে মাসে কতই বা আমার নিজের আর লাগবে?"

"তাই ভাল, মা। আর একটা কথা, মালতী,—আমার সম্পত্তির আয় কত জানিস্ ত মা? একটা ছেলে ছিল,—ভেবেছিলুম, মরবার আগে ছেলেটাকে ধনে সম্পত্তিতে সুখে স্বচ্ছন্দে বড় করে রেখে যাব, সে আশায় প্রাণপণ করে শুধু এই এক জীবনেরই চারধার দিয়ে কত আয় বাড়িয়েছি, কিন্তু অদৃষ্টটা একবার দেখ্‌ মা, আজ আমার এ সম্পত্তি ভোগ করবার কেউ নেই।"

জমিদার বাবুর গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, "মালতী অনেকে বলেছিল আমায় পোষ্যপুত্র নিতে, সে আমার ইচ্ছে হ'ল না মা। কে আসবে, কি করে ভোগ করবে কে জানে। তার চেয়ে মা, ভাবচি এসব তোর নামেই লিখে দিয়ে যাব। তোর নিজের কোন দরকার নেই সে ত আমি জানি মা, তবু আমি তোকে দিতে চাই শুধু এ অর্থের সদ্ব্যয় হবে ব'লে। সারাটা জীবন শুধু সঞ্চয় করে করে আর তার ভার বয়ে বয়েই কেটে গেল, ভোগ করবার তৃপ্তি ত একদিনও পেলুম না। এসব নিয়ে তুই তোর ইচ্ছেমত সৎকাজে লাগিয়ে দিস্, তোরও হাতে কাজ থাকবে, আর আমিও মরে গিয়েও তৃপ্তি পাব।"

"আমি কি করে পারব মেসোমশায়,- আমিত কিছু জানিই না।"

"এত কিছু শক্ত নয় মা,—এই মনে কর, গাঁয়ে একটা স্কুল খুললে মেয়েদের জন্যে, তারপর অনাথাশ্রম করলে, একটা হাসপাতাল হ'ল, এই এমনিতর সব। করবার ইচ্ছে থাকলে, করা ত কিছু শক্ত নয় মা; আর তা ছাড়া, দেওয়ানজি রইলেন, পুরণো ভাল কর্ম্মচারীরা সবাই ত রইলো, তুই শুধু হুকুম দিবি, কাজ ত করাবে ওরাই। আর মালতী, ভাবচি নরেনকেও কিছু দিয়ে যাব। কিন্তু এ বাড়ীটা রেখে যাব তোরই নামে। চিরকাল কি বোর্ডিং আর ইস্কুল, পড়া আর পড়ানো ভাল লাগবে মা? তখন এসে এখানে থাকিস্, তোর রাধাবল্লভ রইলেন,—আস্‌বি দেখ্‌বি, সেবা করবি। মালতী, তোমার ওপর আমার খুব বিশ্বাস আছে মা। আমি জানি, তোমার শক্তিতে নির্ভর করে, ভালমন্দ বিবেচনা করে সৎপথে তুমি থাকতে পারবে; সংসার সমাজ সব তুচ্ছ ক'রে, সে আশাতেই ত তোমার মা তোমায় পড়তে পাঠিয়েছিলেন। মালতী, তাঁর সে আত্মত্যাগ যেন বৃথাই না হয় মা,— আর কি বল্‌বো!"

বৃদ্ধের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, মালতী নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর দেহের উত্তাপ বাড়িয়া চলিল, মালতী ভীতমনে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আজ মাথাটাও যেন গরম হইয়া উঠিতেছে। বহুক্ষণ আবার নিস্তব্ধভাবে কাটিয়া গেল। সহসা জমিদার বাবু চক্ষু খুলিয়া চঞ্চলভাবে বলিয়া উঠিলেন,—'আচ্ছা, বলত দেখি, মালতী, ওদের কথা কি সত্যি? নলিন আমার সত্যি বেঁচে নেই? আমার ত সেকথা মনে হয় না, আমার মনে হয়—ও বেঁচে আছে, শুধু বুড়ো বাপের উপর অভিমান করে আসচে না। মালতী, একবার তাকে আনাতে পারিস্ মা?"

বৃদ্ধ বালকের ন্যায় আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, "মা, বুড়ো বয়সে এত রোগে শোকে ভুগে মর্‌চি, একটীবার নিজের ছেলেটা কাছে এল না! এত বড় জমিদার, সাত গাঁয়ের লোক আজও যার নাম শুনলে কাঁপে, সে নাকি আবার এমন দরিদ্র, এমন কাঙ্গাল, মালতী! ওরে একটীবার তাকে খবর দে,—সে আসুক।"

রাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের মনস্তাপ এবং রোগের যন্ত্রণা বাড়িয়া চলিল, মালতী ও নরেন বিনিদ্র-চক্ষে কাছে বসিয়া রহিল, কিন্তু এ রোগের শান্তিই বা কোথায়, এ মনস্তাপের সান্ত্বনাই বা কিসে?

গভীর রাত্রে বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন, "মালতী, আমি যে মরতেও পার্‌চিনা রে। এত যন্ত্রনায়ও প্রাণটা যে বেরুচ্ছে না। সে বোধ হয় তাকে দেখবার জন্যেই, সেত তা হ'লে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে!—একটা কাজ করতে পারিস্, মা? খবরের কাগজগুলোতে একটা বিজ্ঞাপন দিতে পারিস্? তাহ'লে সে নিশ্চয়ই আসবে। বুড়ো বাপ মরছে শুনলে সে আসবে-ই। দে দিকিন্ মা, কালই তবে দে,—কেমন?"

মালতী চোখের জলে ভাসিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দেবো মেসোমশায়,—"

"দিবি? হ্যা দিস্—দেখিস্ সে আসবেই—"

বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে এবং মালতীর প্রতি অসীম নির্ভরতায় তাহার কোলেই মাথা রাখিয়া শান্তভাবে ঘুমাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কতদিন কাটিয়া গেল, বৃদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের দিকেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। জীবন মরণের এই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া তিনি আজ একটী অতি ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছেন, কোন কিছুর একটু এদিক ওদিক হইলে, শিশুটীর ন্যায়ই কাঁদিতে থাকেন, এবং পীড়িত শিশু যেমন মাতার কোলছাড়া কোথাও থাকিতে চায় না; তেমনই মালতী একটু এদিক ওদিক গেলে তাঁহারও অস্থিরতার আর সীমা থাকে না। নরেন মাঝে মাঝে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু মালতীর আর শ্রান্তি ক্লান্তি, বিশ্রাম অবসর কিছুই নাই। সে তাহার ব্যর্থ নারী-জীবনের সেবা করিবার আকাঙ্খা এই মরণোন্মুখ বৃদ্ধের সেবাতেই মিটাইয়া লইতেছিল। জীবনের আশা ত আর ইঁহার নাই-ই, কবে কি হয়, এখন সেই ভয়েই সকলে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা হইতে আগত ডাক্তারে ডাক্তারে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে, সেবা করিবার, যত্ন করিবার লোকেরও অভাব নাই, সময়ও ফুরাইয়া আসিয়াছে,—কিন্তু তথাপি শেষ মুহূর্ত্তটায় যতখানি আরাম দিতে পারা যায়, তাহারই শুধু ব্যর্থ প্রয়াস!—অবস্থা খারাপের সঙ্গে সঙ্গে, মনের গতিও তাঁহার এমনি দ্রুততালে খারাপ হইয়া চলিয়াছিল, যে সান্ত্বনা দিবার অন্য কোন পন্থাই মালতী আর খুঁজিয়া পাইল না।

বহুদিনের রুদ্ধ মনের দ্বার একবার যদি খুলিয়া গেল, আর তাহাকে আড়ালে রাখা কিছুতে চলিল না। যে গোপন, অতি গোপন কথাটি এই দীর্ঘ ক'বছরেও কখনও কাহারও সমক্ষে প্রকাশিত হয় নাই, বুকটা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি কখন কেহ কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই, আজ সেই কথাটি বলিয়া, সে গুপ্তকথাটিই বার বার প্রকাশ করিয়া, বৃদ্ধ জমিদার শিশুর ন্যায় আকুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রন্দনরত শিশুকে রঙ্গীন খেলনা দিয়া ভুলানো চলে, কিন্তু ইঁহাকে মালতী সান্ত্বনা দিবে কি বলিয়া? তাহার সেবারত কোমল স্নেহস্পর্শে যদিবা কখন ঘুমের ঘোরে ক্লান্ত চোখদুটী তাঁহার মুদিয়া আসিত, দুঃস্বপ্নের আক্রমণে সে ঘুমটী তখনি ভাঙ্গিয়া যাইত, বুকফাটা আর্ত্তনাদে বৃদ্ধ গৃহখানি কম্পিত করিয়া তুলিতেন,—ফিরে আয়, ফিরে আয় বাপ আমার, ফিরে আয়! সদ্য মাতৃহারা মালতী এক প্রবল সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়া, প্রবীণা গৃহিণীর ন্যায় নীরবে আপনাকে সম্বরণ করিয়া বসিয়া থাকিত. তাহার অন্তর গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিত—হায় মাতৃহারা, হায় গৃহহীন!

(ক্রমশঃ)

বিরহ-বিধুরা

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়
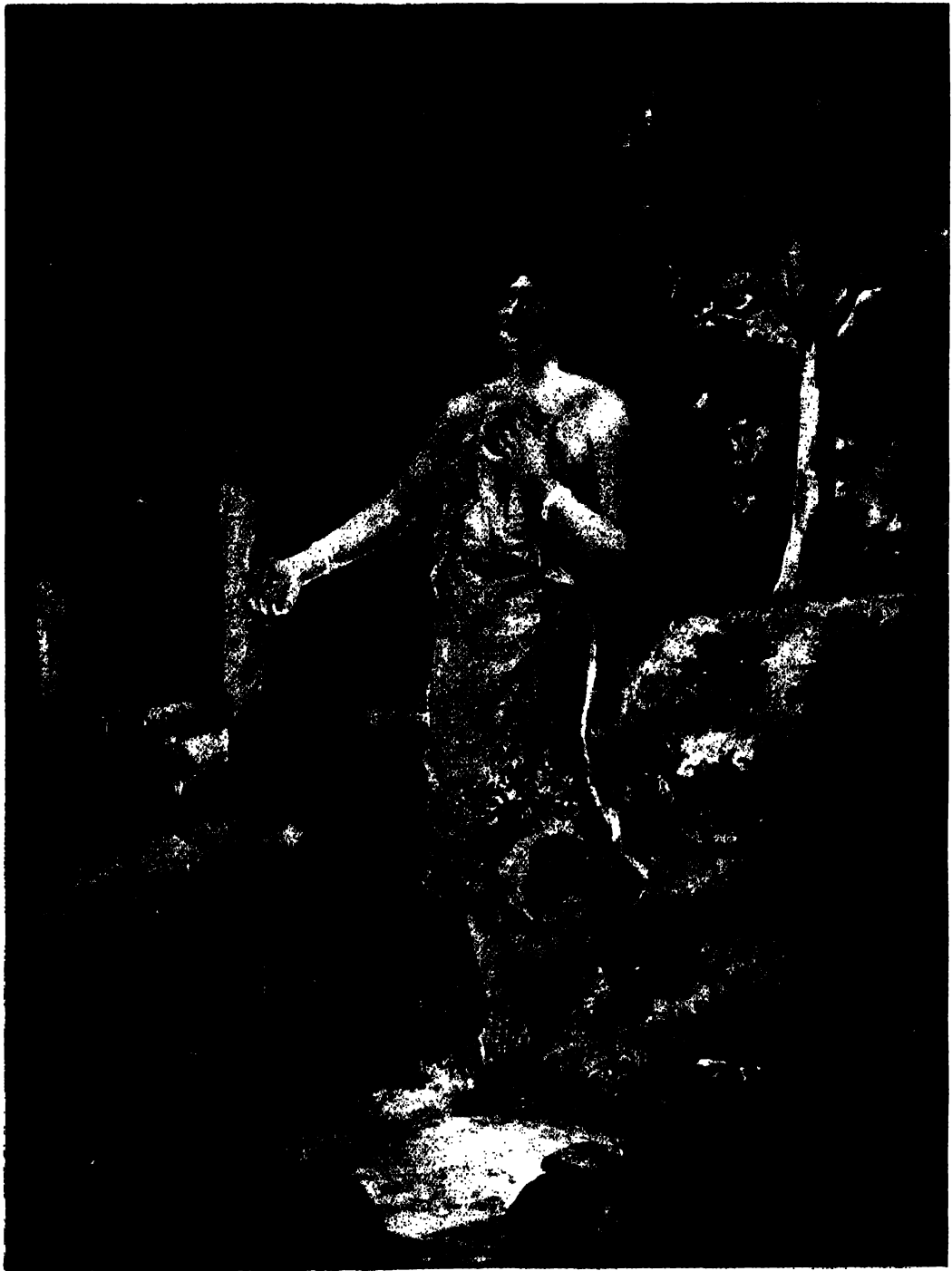
প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২১শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [চতুঃত্রিংশ সপ্তাহ

খেয়ে নাও দু'দিন বৈ ত নয়!

একটু জ্বর, তার সঙ্গে একটু
গায়ে বেদনা—একটু এ্যাকোনাইট্
আর একটু বেলেডোনা—
দু'টো একসঙ্গে—দু'টোই যাবে।
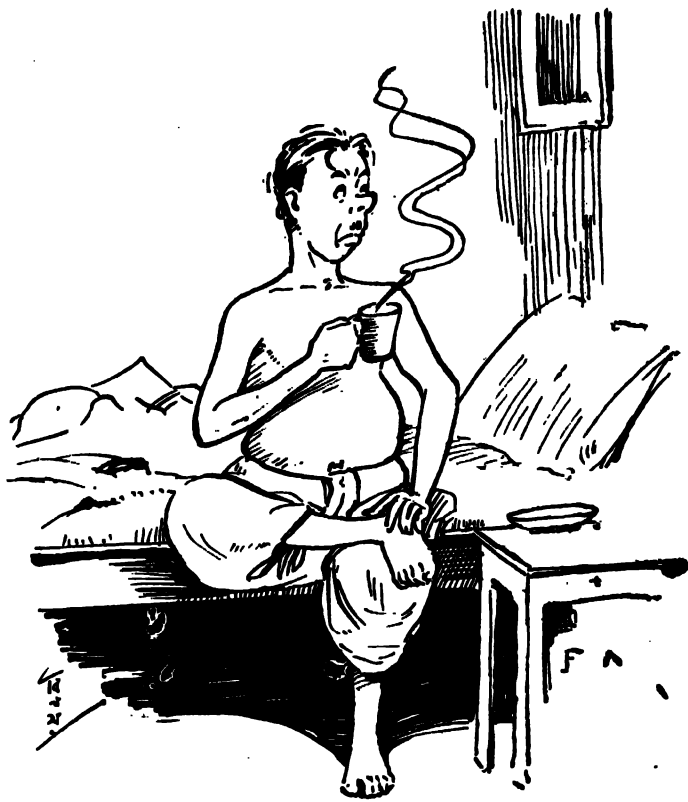
'বিভব সম্পদ ধন মান কিছু নাহি চাই
শুধু বিধি প্রাতে যেন পাই এক পেয়ালা চা।'

টেনে একছিলিম তামাক খাবারও যো নেই—

এরই ভেতর স' আট্-টা হয়ে গেল !

আজ বুঝি আর পিণ্ডি গিলতে হবে না ?

তামাকেই পেট ভরবে—এ—এ—এ !

'ছ' পয়সায় মাছ খাওয়া হয় না, এই মাছের রস খাওয়া হয়।'——

গো-গ্রাস কি কাহাকে বলে ?

তা'তেও পেট ভরে নি, খাইলেন, একখানি কোমল-মধুর সুন্দর সুরুচি সঙ্গত আছাড় !

তার উপর ধাক্কাও একটি ভক্ষণ করিলেন !

(স্বগতঃ) শালা অচল চালাচ্ছে না ত!

(চুপে-চুপে) এরই জোরে টেঁকে আছি দাদা!

[ঘুষ খাইলেন]

তারপর—টিফিন খাইলেন।

'লুপিয়া দে-ও-ও শালা !'

প্রিয় সম্ভাষণ খাইয়াও বাঁচিয়া রহিলেন।

[মেন্থতে (Menu) আইটেম্ (item) বাকী ছিল।]

(ক্রমশঃ)

সংশোধন

[শ্রীবিশ্বেশ্বরী দেবী]

(১)

ছোট সংসার, কিন্তু ঐশ্বর্য্য প্রচুর হইলে লোকে সংসারে যে সুখের প্রত্যাশা করে, শুভেন্দু এবং ইন্দুপ্রভার সংসারে তাহা ছিল না।

কুসঙ্গে পড়িয়া শুভেন্দু মদ ধরিয়াছিল, তাই স্ত্রী ইন্দুপ্রভার মনে সুখ ছিল না। অপর পক্ষে ইন্দুপ্রভার খিট্‌খিটনিতে শুভেন্দুর মনেও সুখ ছিল না। অথচ উভয়েরই ইচ্ছা যে, তাহারা আর পাঁচজনের মতই সুখী হয়।

একদিন শুভেন্দু সন্ধ্যার পর সাজিয়া গুজিয়া বাহিরে যাইতেছে। এমন সময় ইন্দু তাহার হাত ধরিয়া বলিল "যেতে দেবোনা, কেন তুমি রোজ রোজ আমাকে একলা ফেলে বাইরে যাবে?"

মিলনাকাঙ্ক্ষী শুভেন্দু বলিল "যে জন্যে বাইরে যাই, ঘরে যদি তাই পাই, তবে বাইরে যাবার দরকার কি? ইন্দু, আমি তো তোমাকে অযত্ন করি না, প্রাণের চেয়েও তোমাকে ভালবাসি।"

ইন্দু হুঙ্কার দিয়া বলিল "হুঁ, কত! তা নইলে আর বাইরে যাও?"

শুভেন্দু আদর করিয়া ইন্দুর হাত ধরিয়া বলিল "তোমার বিশ্বাস হ'লনা—ইন্দু? এটা জেনো, বাইরে গেলেই স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কমে যায় না। বাইরে যাই আমরা স্ফূর্ত্তির জন্যে। ঘরে তুমি যদি সেই স্ফূর্ত্তি দিতে পারতে তবে বাইরে যাবার কথা মনেই উঠত না।"

ম্লানভাবে ইন্দু কহিল "ছোটবেলাতেই আমি তোমার ঘরে এসেছি। যদি নিজে হতেই তোমার উপযুক্ত না হতে পেরেছি তবে তুমি কোন্ তোমার শিক্ষায় আমাকে তোমার উপযুক্ত করে নিয়েছ? আমি তো কখনও তোমার কোন কথায় না বলি নাই?"

শুভেন্দু আহ্লাদের সহিত বলিল "বটে, বটে, একথা আমার মনে না হওয়া খুব দোষের হয়েছে বটে। তা দেখ, যা হয়ে গিয়েছে তা হয়ে গিয়েছে, এখন থেকে যদি এক কাজ কর, তবে আর বাইরে যাব না।"

ইন্দু আশান্বিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি কাজ?" শুভেন্দু যাহা বলিতে চাহিয়াছিল তাহা বলিতে যেন তাহার মুখে বাধিতে লাগিল; দুই তিনটা ঢোঁক গিলিয়া শেষে বলিল, "ধর, সন্ধ্যেবেলা ঘরেই ছাদে বসে দুই এক আউন্স মদ খেলাম, ধর,—ধর,—"

থতমত ভাব দেখিয়া ইন্দু হাসিয়া বলিল, "কি ধরব?"

শুভেন্দু পূর্ব্বসূত্র অবলম্বনে বলিল "ধর, তুমিও একটু খেলে।"

প্রস্তাব শুনিয়া ইন্দুর মুখ শুকাইয়া গেল; সে কি! কুলবধূ আমি, মদ খাইব, একি কথা! ভাবিল, স্বামী বোধ হয় তাহাকে এমনি অসম্ভব প্রস্তাব দ্বারা জ্বালাইয়া দিয়া দোষ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে। সে জানে নিশ্চয় আমি তাহা পারিব না, তখন বলিবে তোমাকে তো বলিয়াছিলাম, তুমি পারিলে না যখন, তখন বাহিরে না গেলে স্ফূর্ত্তি হয় কি করিয়া? হায়, এমন স্ফূর্ত্তি কি না হইলেই নয়?

ইন্দুকে নিরুত্তর দেখিয়া শুভেন্দুর মনে হইল, ইন্দু সম্মত হইয়াছে। আশ্বাস দিয়া বলিল, "আমি বেশী খাব না। বোতল তোমার কাছেই থাকবে, তুমি যেটুকু দেবে আমি সেইটুকুই খাব—দুজনে ছাদে নিরিবিলিতে বসে গল্প করব। এইভাবে ঘরে আমোদ পেলে আমরা বাইরে যাব কেন? তখন দেখবে—সন্ধ্যে হবে আর ঘরে এসে ঢুকব।"

ইন্দু কহিল "শুনেছি যারা ওসব খায়, তারা কেউই ওর মাত্রা রাখতে পারে না; খেতে খেতে নাকি বেড়েই যায়।"

শুভেন্দু বলিল "আরে, তোমার কাছে থাকবে, আমি বাড়াব কি করে?"

এই বলিয়া ইন্দুর হাতখানা নাড়িয়া দিয়া শুভেন্দু বাহির হইয়া গেল।

ইন্দু বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে স্থির করিল, তাই হোক, কিছুতেই তোমাকে ফেরাতে পারছি না, দেখি এই পথে যদি তুমি ফেরো। কিছু দিন বাইরের টান কমলে, ক্রমে এটাও ছাড়াবার চেষ্টা করব। কিন্তু আমাকেও খেতে বলে—একি মুস্কিল!

(২)

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শুভেন্দুর বাহিরের টান কমিয়াছে বটে কিন্তু একেবারে গিয়াছে বলিয়া ইন্দুর বিশ্বাস হয় না। মদ খাওয়া কিছু বাড়িয়াছে; আগে কেবল রাত্রিতে খাইত, এখন দিনেও শরীর খারাপের অছিলায় কোন কোন দিন খায়। অবশ্য ইন্দুর কাছে চাহিয়াই খায়, তবে ইন্দু না দিলে কাকুতি মিনতি, শেষে জুলুম আরম্ভ করে। এই বাড়াবাড়িতে ইন্দুর মনে ভয় হয়,—তাহা লইয়া স্বামীর সঙ্গে খিটিমিটি বাধে। এইবার শুভেন্দু ইন্দুর সহিত প্রতারণা করিল; চার আউন্স মাত্র খাইবার নিয়ম ছিল কিন্তু অত কমে শুভেন্দুর আর পোষায় না; তাই সে বাহিরে ইচ্ছানুরূপ মদ খাইয়া আসিয়া, ঘরে ইন্দুকে বলে "দাও ইন্দু। আর তোমার যদি দেরী থাকে তবে আমাকে চাবী দাও, আমি বার করে নিই; তোমার তো মাপ আছে।"

ইদানীং ইন্দু স্বামীর সংশোধন সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হইয়া পূজা আহ্নিকেই মনোনিবেশ করিয়াছিল এবং সকাল সন্ধ্যায় ৫।৬ ঘণ্টা পূজা আহ্নিকেই কাটাইয়া দিত। শুভেন্দু তাক্ বুঝিয়া ঠিক পূজার মাঝেই আসিত এবং এমন ব্যস্ততা দেখাইত যে তখনই মদ না পাইলে যেন তাহার ধাত ছাড়িয়া যাইবে। পূজা ছাড়িয়া ইন্দু উঠিতে পারিত না; স্বামীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বিরক্ত হইয়া শেষে চাবী ফেলিয়া দিত।

শুভেন্দু ইন্দুর সম্মুখে বসিয়া মেজার গ্লাসে করিয়া মদ মাপিত—যেন বেশী খাইবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই। তারপর মদ গিলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিত; কারণ গন্ধটা দুই আউন্সের কি দশ আউন্সের, ইন্দু তো তাহা ধরিতে পারিবে না।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, প্রতারণা বেশী দিন চলে না। একদিন ইন্দুর নিকট অমনি চাবী লইবার সময়, ইন্দু শুভেন্দুর মুখে গন্ধ পাইল। ইন্দুর মাথা ঘুরিয়া গেল; ক্রোধে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া ইন্দু চীৎকার করিয়া বলিল "এ কি! প্রতারণা আরম্ভ করেছ?"

ধমক খাইয়া শুভেন্দুরও ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল "তুমি প্রতারণা কর না? আমি কিছু বুঝতে পারি না, বটে! তুমি যে মদ খাবার নাম ক'রে মদ পিছনে-রাখা পিকদানীতে ফেলে দাও! বুঝতে আমি সবই পারি, তবে তোমার নিতান্ত অনিচ্ছা বুঝে, দেখেও দেখি না।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ইন্দু উত্তর করিল "সেটা, সেটা বড় অন্যায় করি,—না? তোমার আগেকার সে জ্ঞানবুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়েছে? ভদ্রঘরের মেয়ে—ভদ্র ঘরের বৌ আমি—মদ খাই না, তোমাকে খুসী করবার জন্যে ভাণ করি—সেটা কি বড় অন্যায় করি? মদ খাওয়া যদি আমার অভ্যাস হয়ে যেত তবে তার পরিণাম কি হ'ত—ভেবে দেখত?"

নিমেষের মধ্যে শুভেন্দুর মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল—যেন বিধবাবেশিনী ইন্দু মাতাল হইয়া আলুথালুভাবে এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতেছে। আরও সব কত কি ছবি। শুভেন্দু ভয়ে চক্ষু মুদিল। ও কথার আর আলোচনা না করিয়া কাতরভাবে বলিল "আজকের মত যা হয়েছে তা' হয়েছে, আর কখনও হবে না - এবারকার মত আমায় মাপ কর।"

ইন্দু আর কোন কথার উত্তর না দিয়া, সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শুভেন্দু হতভম্বের মত সেইখানেই বসিয়া রহিল।

(৩)

ইন্দু স্বভাবতঃ অভিমানিনী। শুভেন্দুর এই প্রতারণায় তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; সংসার অতি তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল। শেষে পূজা আহ্নিককে জীবনের একমাত্র সম্বল করিয়া তুলিল। শুভেন্দু তো দূরের কথা—পাড়া প্রতিবেশিনী, বান্ধবীদের সঙ্গেও আর হাসিয়া কথা কহে না;

বেশীর ভাগ সময়ই কেমন একরকম গুম হইয়া থাকে। বাড়ী আসিয়া শুভেন্দু তাহার কাছে কাছে ঘুর ঘুর করিয়া বেড়ায়— দুই একটা সাংসারিক কথা কহিয়া তাহারই মধ্যবর্ত্তিতায় শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করে কিন্তু ইন্দু যেটার উত্তর না দিলে নয়, মাত্র সেইটার উত্তর দিয়া, আবার গুম হইয়া যায়। এ অবস্থায় শুভেন্দু আর কথা চালাইবার উৎসাহ পায় না; অগত্যা খানিক এদিক ওদিক করিয়া সরিয়া পড়ে।

কিছুদিন এইভাবে ইন্দুর মান ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিয়া শুভেন্দু যখন প্রতিবারেই ব্যর্থ মনোরথ হইল তখন বিরক্ত হইয়া সে বাড়ী আসাই কমাইয়া দিল। ভাবিল, ওঃ এত কি! এত খোসামোদ করলাম, তবুও মান ভাঙ্গল না! এমনিই কি অপরাধ করেছি যে এতটা বাড়াবাড়ি? যাক্, আমার যা' কর্ত্তব্য তা'তো ক'রেছি; তাতেও যদি তার মন প্রসন্ন না হয় তবে আমি আর কি করতে পারি?

শুভেন্দু ঘরে হাল ছাড়িয়া দিয়া বাহিরে গা ভাসাইল। ঈশ্বর কৃপায় পয়সার অভাব ছিল না, পয়সার কৃপায় বন্ধুরও অভাব ছিল না; বন্ধুদের কৃপায় স্থান-কাল-পাত্রেরও অভাব ছিল না। ইচ্ছা মুখে ব্যক্ত হইবার আগেই পূর্ণ হইতে লাগিল। ঐদিকে দুর্ণামেও দেশ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহা ইন্দুর কাণেও পৌছিতে লাগিল। অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার ইন্দুর কোন কিছুরই অভাব নাই কিন্তু স্বামীর আদরে বঞ্চিতা হইয়া ইন্দু নিজেকে অপমানিতা বোধ করিল। এমন কি পাড়া প্রতিবেশিনীগণের সহানুভূতি এড়াইবার জন্য তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতও সে বন্ধ করিল। বেশ-বিন্যাস ত্যাগ করিল, আহারে রুচি গেল, বুকে কেমন একটা বেদনা অনুভব করে, বোধ হয় রোজ রাত্রে একটু জ্বরও হয়। তবে ঠিক বোঝা যায় না। ইন্দুর মনে হইল, এই তো স্বামী, এই তো সংসার! এমন অশান্তি লইয়া কি এখানে বাস করা যায়? স্বামী সম্বন্ধে এক একটা কেলেঙ্কারীর কথা, এক একটা শেলের মত বুকে আসিয়া বাজিতেছে। লোকে যেন আমাকে কৃপার পাত্রী ভাবিতেছে। এমন অবস্থায় এখানে থাকা আর কোনমতেই সম্ভব নয়।

বাপের বাড়ীর সম্বন্ধে এক মাসী ব্যতীত ইন্দুর আর কেহ ছিল না। তাঁহার স্বামী পুরীতে কয়েকটা বাড়ী ও কিছু কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। বাড়ীর ভাড়া এবং কোম্পানীর কাগজের সুদ হইতে তাঁহার বেশ স্বচ্ছন্দেই চলিত। পুরীতেই তিনি থাকিতেন। ইন্দু পুরীতে থাকা স্থির করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিল এবং স্বামীকে ডাকাইয়া বলিল, "দেখ, আমার শরীর ভাল নাই, আমি পুরীতে মাসীমার কাছে যেতে চাই।" মনে মনে ভাবিল,— সেখানে যদি শান্তি পাই, যদিই জগবন্ধু চরণে স্থান দেন!

শুভেন্দুও ভাবিল, দিনরাত খিট্-খিট্ আর মুখভার কত আর সহিব? আজকাল সাক্ষাতের অভাবে খিটখিটিনি কম হইলেও, বাড়ীতে একজন আমার জন্য মুখভার করিয়া বসিয়া আছে—মনে প'ড়িলে, বাহিরেও স্ফূর্ত্তিতে সুখ পাওয়া যায় না। আপনা হইতেই যাইতে চাহিতেছে—যাক্ না। মুখে বলিল "তা যাও; শরীর ভাল নাই যখন বলিতেছ, তখন আমার বারণ করা উচিৎ নয়।"

শুভেন্দুর পিসতুতো ভাই গিয়া ইন্দুকে পুরীতে রাখিয়া আসিল।

(৪)

শুভেন্দু ক্রমেই অধঃপতনের পথে আগাইয়া চলিল। পূর্ব্বে ইন্দুর অভিমানকে কিছু সঙ্কোচ ছিল, এখন তাহাও গিয়াছে, কোন আপদ নাই। তবু মাঝে মাঝে মনে অনুতাপ আপনিই আসে—একটা কর্ত্তব্য-চ্যুতির কাঁটা মনের মাঝে কোথায় খচ্ খচ্ করিয়া বাজে। এক একবার নিজেকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টায় ভাবে, এত লোকে মদ খায়, কত বাড়ী যায়, কৈ কাহারও স্ত্রীতো এমন করে না; ইন্দুর সবই কেমন বাড়াবাড়ি। আবার আপনিই মনে হয়, সে আর বেশী কি আমার নিকট চাহিয়াছিল! সৎ ভাবে থাকা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য, সেও আমাকে আমার সেই কর্ত্তব্য করিতেই বলিয়াছিল; নিজের জন্য তো কিছুই চাহে নাই। শুভেন্দু ভাবিয়াছিল ইন্দু চলিয়া গেলে সে শান্তি পাইবে কিন্তু কৈ, শান্তিতো পায় না; বরং তাহারই অত্যাচারে ইন্দু আজ দূর-প্রক্ষিপ্তা, মনে হইয়া প্রাণটা যে হাহাকার করিয়া উঠে। পনেরো বৎসরের পাতা সুখের ঘর-সংসার—এমনি করিয়া সামান্য একটা খেয়ালের বশে ভাঙ্গিয়া গেলে, এমন কে

কঠিন-হৃদয় আছে যে শান্তিতে দিন কাটাইতে পারে? শুভেন্দুও পারিল না।

যদিও অসুখের অছিলায় ইন্দু চলিয়া গিয়াছিল এবং শুভেন্দুও তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, তবু উভয়েই মনে মনে জানিত অসুখ মিথ্যা—অভিমানই মূল। শুভেন্দুর যখনই মনে হইত ইন্দুকে ফিরিয়া আসিবার জন্য চিঠি লিখি, তখনই ঐ অভিমান আসিয়া বাধা দিত; লেখা আর হইত না।

ইন্দুও ভাবিত, চিঠি লিখিয়া সংবাদ নিই—কেমন আছে, কিন্তু আবার ভাবিত, হয় তো চিঠি পড়িয়াও দেখিবে না, অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দিবে। সে অপমান অপেক্ষা না লেখাই ভাল।

এমনি করিয়া বিচ্ছেদ ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতে লাগিল।

(৫)

ইন্দুর এক বাল্যসখী—নাম সুনীতি—চেঞ্জে আসিয়া পুরীতে যে বাড়ীতে ছিল, সে বাড়ীটী ইন্দুর মাসীর বাড়ীর ঠিক পাশেই। বহুকাল পরে দুই বাল্যসখীতে দেখা। বহুকাল পরে ইন্দুর মুখে হাসি ফুটিল কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ হইয়া সে হাসি তখনই মিলাইয়া গেল। চতুরা সুনীতি তাহা লক্ষ্য করিল এবং কারণ জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বাল্যসখীর নিকট মনোভাব অধিকক্ষণ গোপন রাখা চলিল না—ক্রমে ইন্দু সমস্তই বলিয়া ফেলিল। যে অশ্রু এতদিন রুদ্ধ ছিল, মনোভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগে আজ তাহা ছুটিয়া বাহির হইল। সুনীতিও তাহা নিবারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল না। বহুক্ষণ পরে আপনা-আপনিই ইন্দু যখন অনেকটা শান্ত হইল তখন সুনীতি খুঁটাইয়া প্রশ্ন করিয়া, আদ্যোপান্ত সমস্ত জানিয়া লইল এবং ইন্দুকে আশ্বাস দিয়া বলিল "কোনও পাপের পাপী নস্ তুই, তোর কি এমন দুর্ভাগ্য স্বামী হ'তে পারে? তুই নিশ্চিন্ত থাক্—ভগবান্ কখন এমন সাজা তোকে দিতে পারেন না।"

সুনীতির আশ্বাসে ইন্দু মনে বল পাইল। তাহার মনে হইল, সত্যই তো সে কোন পাপ করে নাই, তবে তাহাকে ভগবান এমন সাজা কেন দিবেন?

(৬)

শুভেন্দু আজকাল মদের 'চব্বিশপ্রহর' করিতেছে। আমোদই যেন পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র কাম্যবস্তু, আর কোন কাম্য নাই। দিনগুলো এমনিভাবেই তাহার কাটিতেছিল; কিন্তু সংসারের কর্ত্তব্যগুলাকে অবহেলা করায় তাহাদের একটা খোঁচা প্রায় সর্ব্বদাই তাহার মনের মধ্যে ফুটিয়া থাকিয়া তাহার মন অশান্তিপূর্ণ করিয়া রাখিত। প্রায়ই ভাবিত, কি সুখ ইহাতে? কেন এমন করিতেছি? আগে সুনাম ছিল, এখন দুর্ণামে যে দেশ ভরিয়া গিয়াছে—তাওতো শুনিতে ভাল লাগে না। আর মদ খাইব না—এইবার নিশ্চয় ছাড়িব। কিন্তু অভ্যাসের এমনি দোষ, যে যথাসময়ে কে যেন চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে বোতলের নিকট লইয়া যায়। একাকী থাকিলে অনেক সময় সে নিজের অধঃপতনের কথা চিন্তা করিয়া কাঁদিত এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত, তিনি যেন এই প্রলোভন হইতে মুক্ত হইবার বল তাহাকে দেন। কিন্তু অভ্যাসদোষে ফল হইতেছিল না।

এমন সময় একদিন একটা নামহীন উড়ো-চিঠি তাহার হস্তগত হইল। লেখাটা স্ত্রীলোকের হাতের। নির্জ্জনে যখন সে পাঠ সমাপ্ত করিল তখন তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে এবং হাত, পা, সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

তাহাতে লেখা ছিল :—

মহাশয়, স্ত্রীলোকে মদ খায়, আপনার বাড়ীর এ কেমন শিক্ষা? মদ পেটে পড়িলেই লোকে যে স্ফূর্ত্তি খোঁজে তাহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সুতরাং নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করিবেন না, যে আপনার স্ত্রীও স্ফূর্ত্তি করিবার জন্য লোক ঠিক করিয়া লইয়াছে। মাসী চোখে কম দেখেন, তার ওপর বেশীর ভাগ সময় মন্দিরেই কাটান সুতরাং ফাঁকা ঘরে যে কীর্ত্তি হইতেছে তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। এমন কি পাশের বাড়ীতে আমাদের বাস করা মুস্কিল হইয়াছে। আপনি আমার অপরিচিত নন, এমন কি দেখিলে চিনিতে পারিবেন। যদি আসেন তবে সাক্ষাতে সমস্ত বিবরণ জানাইব এবং চাক্ষুষ সমস্ত দেখাইব। পরিচিত বলিয়াই পুলিশে খবর দিয়া কেলেঙ্কারী বন্ধ করিবার আগে আপনাকেই

জানাইলাম। যদি ইহাতেও না আসেন তবে পুলিশে জানাইয়া কেলেঙ্কারী বন্ধ করিতে বাধ্য হইব, কারণ আমরা ছেলেপুলে লইয়া ঘর করি; তাহাদের চোখের সামনে এমন দৃষ্টান্ত রাখিতে পারি না। আপনি অমন ধার্ম্মিক লোক, মদ দূরে থাক, তামাক পর্য্যন্ত কখনও আপনাকে খাইতে দেখি নাই, আর আপনার স্ত্রী এমন! এ শিক্ষা কোথা হইতে পাইল? পুরী আসিলে কেমন করিয়া আমার সাক্ষাৎ পাইবেন তাহা বলিয়া দিতেছি। সমুদ্রের ধারে—কুঞ্জকুটীরের সামনে বৈকাল ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত আপনি পায়চারি করিবেন। তাহা হইলেই আমি আপনাকে খুঁজিয়া লইব। ইতি শুভার্থিনী।"...

শুভেন্দু পত্রটী বারবার পড়িল—একবার, দুইবার পড়িয়াও যেন উহার ঠিক অর্থ বোধ করিতে পারিল না। যখন অর্থবোধ হইল তখন মাথা ঘুরিয়া গেল। তারপর উঠিয়া বোতল গ্লাস সমস্ত আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, সেই দিনই রাত্রের ট্রেণে পুরী রওনা হইল।

(৭)

বেলা ৩॥০ টা। ইহারই মধ্যে স্বাস্থ্যান্বেষী বহু লোক সমুদ্রের ধারে পায়চারী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুভেন্দু ৪টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, আগে ভাগেই কুঞ্জকুটীর খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তাহার সম্মুখে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে এবং উৎসুকনেত্রে কুঞ্জকুটীর এবং পার্শ্ববর্ত্তী যাবতীয় ঘরগুলির দিকে ঘন ঘন চাহিতেছে। কাহারও দেখা নাই। ক্রমে সকল গৃহ হইতেই বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রভৃতি বেড়াইতে বাহির হইল। একটী যুবতীকে শুভেন্দুর খুব চেনা চেনা মনে হইল, কিন্তু সঙ্গে বোধ হয় তাহার স্বামী। আগাইয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। স্বামী যদি রাগ করে, কিম্বা স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করিয়াই বসে! ক্ষণেক পরে দেখিল স্ত্রীলোকটী একা ফিরিয়া আসিতেছে। উদ্বেগে শুভেন্দু তাহার দিকে খানিকটা আগাইয়া গেল। কিন্তু নিকটবর্ত্তী হইয়াও, কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে ভাবিয়া পাইল না। অথচ, কথা কই কি না কই—করিয়া বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিল।

স্ত্রীলোকটী কিন্তু বেশ ধীরে সুস্থে শুভেন্দুর পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভাল আছেন?"

"হঁ্যা। আপনি—তুমি—সু—সু—সুনীতি-ঠাকুরঝি! তুমি বেশ ভাল তো? ছেলেপিলে সব ভালো? কর্ত্তা"—

শুভেন্দু কথা শেষ না করিতেই সুনীতি বলিল "আর কর্ত্তার কথা বলো না ভাই; তিনি আমাকে এই বনবাসে রেখে দিয়ে নিজে কলকাতায় বসে রামরাজত্ব করছেন। বল্লে কি বলে জান?"

কি বলে তাহা জানিবার মত ধৈর্য্য তখন শুভেন্দুর ছিল না। নিজের ভাবনাতেই তখন সে অস্থির। কাজের কথায় আসিবার জন্য সে তাই প্রশ্ন করিল, "তুমি বুঝি ঐ কুঞ্জকুটীরে থাক?"

সুনীতি হাসিয়া বলিল, "হঁ্যা ভাই, কিন্তু কুটীর শূন্য, কুঞ্জে আমার শ্যাম নাই। আর তোমার ইন্দুর মত একটা নতুন শ্যাম কেড়ে যে কুঞ্জকুটীরের শূন্যতা পূর্ণ করব—এমন প্রবৃত্তিও আমার নয়। আচ্ছা, শ্রীরাধিকা তো মদ খেতেন বলে শোনা যায় না, তোমার এ ইন্দু-রাধিকা মদ খেতে শিখলে কোথা?"

এ কথায় শুভেন্দু নিশ্চিত বুঝিল—পত্র সুনীতিরই লেখা। হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিল"বোধ হয় আমারই কাছ থেকে, সুনীতি ঠাকুর ঝি—আমারই কাছ থেকে। কিন্তু আমাকে লুকিয়ে মদ তো সে পিক-দানীতে ফেলে দিত—খেতো না তো!"

সুনীতি কহিল "আহা, মুখে যখন বাধ্য হ'য়ে ঠেকাতে হ'ত, তখন এক আধ ঢোঁকও কি পেটে যেত না? তেমনি এক আধ ঢোঁক যেতে যেতেই অভ্যাস হয়ে গেছে। ও কি কম বিষ?"

শুভেন্দু মাথার চুলগুলা দুই মুঠিতে চাপিয়া ধরিয়া সেই বালির উপরেই থপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। একটু দূরে সুনীতিও বসিল।

তারপর প্রায় রুদ্ধশ্বাসেই শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করিল "লোকটা কে?"

সুনীতি হাসি টিপিয়া বলিল "সে এক ছোঁড়া—আমারই নামে নাম—তবে বালা নয়, কুমার তার নাম, সুনীতিকুমার।

কিন্তু সুনীতি তার মধ্যে কোথাও নাই—সবটাই তার দুর্নীতি। চব্বিশ ঘণ্টা মদের বোতল বগলে আছে। ইন্দু আগে একটু আধটু খেত; তারপর এই ছোঁড়া জুটে অবধি ভীষণ মাতাল হয়ে উঠেছে। তা তুমিও যা বল্লে, তা'তে তুমিও তো কম নও। তখন মেলে নি, এখন দুজনে মিলবে ভাল। ঘরেই এন্তার স্ফূর্তি পাবে, আর বাইরে যাবার দরকার হবে না। সন্ধ্যে তো হয়ে এল। তোমার মৌতাতের সময় হয় নি? হয়ে থাকে তো যাও না, গেলেই পাবে। আজকাল ঘরেই মজুত।"

শুভেন্দু ঠিক বুঝিতে পারিল না, কথাগুলা সত্য না শ্লেষ! দুঃখিত স্বরে কহিল "তোমার চিঠি পাওয়ার পরই নেশা ছুটে গেছে। আবার?"

আগ্রহপূর্ণ স্বরে সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যি?"

শুভেন্দু বলিল "এমন দুঃসংবাদ পাওয়ার পরও কারো ও বদ অভ্যাস থাকতে পারে বলে তোমার বিশ্বাস হয়?"

সুনীতি বলিল "না; কিন্তু তোমারই কি বিশ্বাস হয় যে ইন্দুর মত মেয়ে, স্বামী ত্যাগ করলেই কি এমন করে বয়ে যেতে পারে?" বলিয়াই সুনীতি হাসিয়া উঠিল।

শুভেন্দু ধোঁকা খাইয়া গেল। সুনীতির কোন্ কথাটা সত্য? তাহার মনে হইল—আশার আলোক দেখা দিয়াছে, কুয়াসা কাটিয়া যেন সূর্য্য কিরণ উঁকি মারিতেছে।

অতিশয় আগ্রহে স্থানকালপাত্র ভুলিয়া শুভেন্দু সুনীতির একটা হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দোহাই তোমার সুনীতি ঠাকুর ঝি, সত্যি করে বল ইন্দু মদ খায় কি না? সুনীতি কুমারের ব্যাপার সত্য কি না? আমায় আর সংশয়ে রেখো না।"

হাসিয়া, হাত ছাড়াইয়া লইয়া সুনীতি বলিল, "তোমার কি মনে হয় আগে বল না?"

শুভেন্দু বলিল "আমি কিছু ঠিক করতে পারছি না। কিছুই যদি না হবে, তবে তুমি অমন চিঠি লিখ্‌বে কেন? আবার মনে হয় ইন্দুর পক্ষে এমন অধঃপাতে যাওয়া অসম্ভব—একবারেই অসম্ভব। আবার মনে হয়, সে ঠিকই থাকত যদি না আমিই তার কাণে এ কথাটা ঢুকিয়ে দিতুম—যে কুলবধূরও গোপনে মদ খাওয়া চলতে পারে, স্ফূর্তিটা জীবনের একটা প্রয়োজনীয় বস্তু।"

সুনীতি বলিল, "ছিঃ, কখনও কি তলিয়ে কোন কিছু বোঝবার চেষ্টা কর নি? এতদিন তার সঙ্গে ঘর করলে, আর তাকে আজও চিনতে পারলে না? কি তরল প্রকৃতির লোক তুমি! মদখেয়ে তুমি হয়তো কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়েছিলে, সেতো আর তা হয় নি।"

শুভেন্দু বলিল, "তা না-হয় নাই হলো, কিন্তু প্রতিশোধ দেবার জন্যেও যদি—"

রাগতভাবে এবার সুনীতি বলিল "মূর্খ তুমি, তাই এমন কথা তোমার মনে ওঠে। প্রতিশোধ দেবার ইচ্ছা যদি আমাদের মনে থাকতো তবে আজ "কুলবধূ" বলে কোনকথা সংসারে থাকতো না। শতকরা পঁচানব্বুইজন পুরুষ যেখানে অসৎ, সেখানে তাদের স্ত্রীরা, রক্তপাতের প্রতিশোধ রক্তপাত জ্ঞান করলে কি আর রক্ষে ছিল! বিশেষ করে তোমার ইন্দু। তুমি উচ্ছন্নে যাওয়ায় অভিমান করে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে, সে উচ্ছন্নে না গিয়ে পুণ্যের পথই খুঁজে নিয়েছে। এই সন্ধ্যেবেলা যখন সকলেই স্বাস্থ্যলাভের আশায় সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছে, ঘরে গিয়ে দেখ, সে তখন একমনে তোমার উদ্ধারের কামনায় ভগবানকে ডাকছে।"

শুভেন্দু ঈষৎ দ্বিধাযুক্তস্বরে বলিল, "তবে তুমি অমনভাবে চিঠি লিখেছিলে কেন?"

সে কথার উত্তর না দিয়া সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি মদ ছেড়েছ—একথা ঠিক?"

শুভেন্দু বলিল "ঠিক।"

সুনীতি বলিল "আর কখনও খাবার ইচ্ছা আছে?"

শুভেন্দু নিজে হইতেই নাক কাণ মলিয়া বলিল "আবার!"

তখন সুনীতি হাসিয়া বলিল "সংশোধনের অমন উপায় অবলম্বন না করলে নিজে থেকে কখনও ছাড়তে পারতে?"

একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুভেন্দু বলিল "আজ তুমি আমায় বড় বাঁচিয়েছ।"

সুনীতি সহাস্যে কহিল—এখনও পুরো বাঁচনি ভাই; ঘরে এস, প্রাণ পাবে!—তাহারা গৃহের দিকে চলিল।

বর্ষায়—পল্লীছবি

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

পল্লী মায়ের বুকে
অনাবিল শান্তি,
নাই হেথা সংগ্রাম,
অবসাদ, ক্লান্তি।

হেথা বসে নিরিবিলি
দেখি ভোর সন্ধ্যায়—
দোয়েল শালিক শ্যামা
নাচে খেলে গান গায়।

আকাশেতে ঘন মেঘ,
বিজলী সে চমকায়,
মন্থর পায়ে চলে
পান্থ, সে থমকায়।

বর্ষার ঘোলা জল
ঘাটে মাঠে থই থই,
ছেলেদের মাছধরা—
ছুটোপুটি, রই রই।

পায়ে-চলা পথগুলো
কোথা গেল তলিয়ে?
ধান ক্ষেতে ঘোলা জল
উঠে ছলছলিয়ে।

পাট-পঁচা-জলে ঢেউ
খেলে ডোবা নালাতে,
পিল্ পিল্ খাল বিল
কচুরী ও পানাতে।

চারিদিকে খোলা মাঠ—
পথ গেছে হারিয়ে,
তারি মাঝে একখানা
ছোট ঘর দাঁড়িয়ে।

ও ঘরে কে থাকে জান?
ওঁর বাড়ী কোন্ গাঁয়?
ইষ্টিশনের বাবু—
বাড়ী ওঁর ভিন্‌গাঁয়।

অল্প বেতন হায়—
সাথে আছে পরিবার,
ছোট বাসা, নাই ঠাঁই
নড়িবার চড়িবার।

নাই থাক, তবু আছে
একখানা ছোট মুখ,
পাণ খেয়ে ঠোঁট দুটি
করে সদা টুক্ টুক্।

নয়ন পটোল-চেরা,
কপোলেতে তিলা কি?
ভুরু দুটী ঠিক যেন
ধনুকের ছিলাটি!

দৃষ্টি সরল তার,
হাসিখানা মিষ্টি,
শত অসুবিধা মাঝে
করে সুধাবৃষ্টি।

তাই ত রে বাঙালীর
জান্‌লায় পর্দ্দা,
মুখে হাসি, খেলে তাস,
পানে খায় জর্দ্দা।

* * *

ঐ ধোঁয়া দেখা যায়—
রেল গাড়ী এল রে!
কাল কোট, টুপী কোথা?
কাজ বুঝি গেল রে!

গাড়ীখানা থামতেই
একখানা দরজায়
বিশ জনে ঠেলাঠেলি—
ভিড় করে, গালি খায়!

উজান চলেছে যেন
জোয়ারের কৈ মাছ,
গায়েতে বেজায় জোর—
লম্বায় তালগাছ!

যত জোর তত যদি
বুদ্ধিটি থাক্‌তো,
দেশের শ্রী ফিরে যেতে
দেরী কি গো লাগ্‌তো?

* * *

চল্‌ চল্‌ ছুটে চল্‌—
ঐ দিল ঘণ্টা,
গাড়ী বুঝি দিল ছাড়ি—
এ কি উৎকণ্ঠা!

ষ্টেশনেতে হৈ চৈ—
এঞ্জিন গর্জ্জায়,
ওখানে কে বসে ঐ
জান্‌লার পর্দ্দায়?

চম্পক অঙ্গুলি,
চোখ দুটী খঞ্জন,
ও চোখেই হানে শর,
করে মান ভঞ্জন।

মাষ্টার-ভোমরার
মৌচাক-মৌটি!
থাক্‌-থাক্‌—চেয়োনাক,
ঘোমটার বৌটি!

* * *

পল্লীর সেই সুখ
কোথা আজ বঙ্গে?
ম্যালেরিয়া ঘরে ঘরে
এল রেল-সঙ্গে।

রেলগাড়ী নিল কাড়ি
মুখে-তোলা অন্ন,
লুঠে নিল যত ধন
বিদেশেরই জন্য।

প্রতিদানে দিয়ে গেল
বিজাতীয় গর্ব্ব,
দিনে দিনে সরলতা
হয়ে এল খর্ব্ব।

শত অভাবের ভূত
ঘাড়ে বসি হাসিছে,
ব্যাধি-রাক্ষসী আজ
শতমুখে গ্রাসিছে।

সেই দেশ—সেই মাটি
সেই রবি উঠ্‌ছে,
সেই ত রে কল কল্‌
নদীজল ছুটছে।

তবু হায় বাংলায়
মরে লোক অভাবে,
মরে শুধু চোখ বুঁজে
নিজেদেরই স্বভাবে।

ব্রাহ্মণ গুলো যেন
জীবন্ত যমদূত,
খুঁজিয়া বেড়ায় শুধু
কার কোথা আছে খুঁৎ।

শাস্ত্রের নামে শুধু
বড় বড় কথা কয়,
স্বার্থপিশাচ গুলো
নৃশংস নীচাশয়।

গ্রামের মোড়ল যারা
তাদের তো কাজ নাই,
করে শুধু দলাদলি,
করে শুধু কুৎসাই।

বুদ্ধি খরচ করে
করিয়া বরাদ্দ,
আড্ডায় বসে করে
তামাকের শ্রাদ্ধ।

যখন ছিল না গাড়ী
তখন তো বিশ ক্রোশ
অক্লেশে হেঁটে যেতে
ছিল না তো আপ্‌শোষ।

এখন হয়েছে হায়
কি সখীন মনটা,
দুই ক্রোশ যেতে লোক
বসে ছয় ঘণ্টা।

পয়সা লাগুক—তবু
গাড়ী চড়ে যাওয়া চাই,
সবাই চাদরে বাঁধে
বিড়ি আর দেশ্‌লাই।

ওই যে চাষার দল
সরল ও জ্যান্ত,
ওরা বিড়ি বরফের
নামটা কি জান্‌তো ?

এই ত দেশের গতি,
পল্লীর ছবি এই,
নেই নেই, অতীতের
সেই ছবি আর নেই।

দুঃখের কথা গুলি
কি লাভ বা বলিলে,
মনে মনে কাঁদি আর
ভাসি আঁখি সলিলে।

যত ভাবি তত হায়
জল আসে চক্ষে,
ভালবাসি, তাই আসি
ছুটে এরই বক্ষে।

মধুসূদনের স্বাদেশিকতা

[শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, ভাগবতরত্ন]

সমুদ্রমন্থন করিয়া যে অমৃতের আবির্ভাব হইল, তাহা আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিবার জন্য দেবের অভাব হইল না। কিন্তু মন্থনোত্থিত কূট গরল গলাধঃকরণ করিবার জন্য একজনমাত্র অগ্রসর হইলেন—তিনি মহাদেব। মহাদেব নীলকণ্ঠ হইয়াও শান্ত, প্রসন্ন—আনন্দের জীবন্ত প্রস্রবণ স্বরূপ।

একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী যখন পাশ্চাত্য-সভ্যতা-সমুদ্র মন্থন করিল, তখন লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূতা হইলেন—কিন্তু অমৃতভাণ্ড হস্তে করিয়া নহে, ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চাকুরীর ক্ষুদ্র টুকরি হাতে করিয়া। সে যুগের সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা তাহাই পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন অসাধারণ মহাপুরুষ; তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অগাধ সমুদ্রই পান করিয়া তাঁহার প্রাণের অনন্ত পিপাসা মিটাইতে চাহিলেন। সমুদ্রের মধ্যে যে তীব্র হলাহল ছিল, তাহাও তিনি অম্লান বদনে পান করিয়া বসিলেন। বিষের জ্বালায় তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত হইল, কিন্তু মনটী মহাদেবেরই ন্যায় আনন্দে পরিপূর্ণ রহিল।

আনন্দেই সৃষ্টি হয়; মধুসূদনের অন্তরের আনন্দের বিভাতিতে বাঙ্গলার কাব্যজগত উদ্ভাসিত হইল। তাঁহার সেই বহুমুখী সৃষ্টির মধ্যে আজও পণ্ডিতগণ কোথায় কোথায় পাশ্চাত্যের প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা ধরিতে ব্যস্ত। আবার অন্য একদল পণ্ডিত দেখাইতে যাইতেছেন—কিরূপে তিনি ঐ প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মহাকবি মধুসূদন

পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, পাশ্চাত্য রীতিতে কাব্য-নাটকাদি রচনা করিয়াও, তিনি যেমন তাহার মধ্যে দেশীয়

স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছেন, তেমনি তাঁহার অন্তরের গোপন বাসনা ছিল যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে থাকিয়াও দেশ আবার স্বাধীন হইয়া উঠুক। কিন্তু সে যুগে তখনও শৃঙ্খলের মহিমা দেশ ভাল করিয়া বুঝে নাই—তাই তাঁহার অন্তরের কামনা অন্তরেই মিলাইয়া গেল।

ভারতের সেই মহিমময় স্বচ্ছন্দ স্বাতন্ত্র্যের প্রতি মধুসূদনের লোলুপ দৃষ্টি যৌবনের প্রথম উন্মেষের দিনেই পড়িয়াছিল। যখন তিনি উনবিংশ বর্ষীয় যুবক, তখনই স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে পুরুষসিংহ বিশ্ববিজয়ী সেকেন্দার শাহেরও সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই, সেই পুরুর অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী লইয়া Literary Gleaner পত্রে একটী ইংরাজী কবিতা প্রকাশ করেন। পুরুর সহিত সেকেন্দারের ভীষণ যুদ্ধ ও উভয়ের মিলন কাহিনী বর্ণনা করিবার পর নবীন কবির মনে হইল—হায়! ভারতের সেই সকল সুসন্তান কোথায় চলিয়া গেল, যাহারা হৃদয়ের রক্ত দিয়া দেশ-মাতৃকার সম্মান-রক্ষা করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না—যাহারা পরাধীনতার নাম শুনিলে আতঙ্কে চমকিয়া উঠিত?

But where, oh! Where is Porus now?
And where the noble hearts that bled
For freedom—with the heroic glow
In patriot—bosoms nourish'd—
Hearts, eagle-like that recked not Death
But shrank before foul Tharldom's breath?
And where are thou—fair Freedom! thou
Once goddess of Ind's sunny clime!

পরাধীনতার গ্লানি ও অবমাননা মধুসূদন অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই অপমানের গুরুভার যাহাতে কিয়ৎপরিমাণেও লাঘব হয়, তাহার জন্য তিনি লেখনী পরিচালনা করিতে ক্রটী করেন নাই। তিনি যখন মাদ্রাজে অধ্যাপকতা করিতেন, সেই সময়ে আমাদের ভারতবর্ষীয়গণকে Native men বলা হইত, আর ইউরোপীয় ব্যক্তিদিগের কথা উল্লেখ করিতে হইলেই European gentlemen বলিয়া অভিহিত করা হইত। তেজস্বী মধুসূদনের নিকট ঘৃণাসূচক ঐ Native man আখ্যা তীব্র কশাঘাতের ন্যায় বোধ হইল। তাই তিনি মাদ্রাজের সমস্ত প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে উক্ত আখ্যার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টার ফলে আমাদের Native অপবাদ কিয়দংশে দূরীকৃত হইয়াছে।

মধুসূদন ছাত্রজীবনে সকল রকমে বিলাতী উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কার করিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতমাতাকে স্বাধীন করিবার স্বপ্ন দেখাও সেকালের নবীন সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতার এক অঙ্গ ছিল। দেশকে স্বাধীন করিবে তো সমাজের বন্ধন হইতে নিজেকে প্রথমে মুক্ত কর—মদ খাও, স্ফূর্ত্তি কর,—এরূপ সৌখীন দেশোদ্ধার কার্য্য করিতে তরুণেরা তখন বড় পটু ছিলেন—এখনও যে সে কৃতিত্ব আমাদের একেবারে গিয়াছে তাহা নহে।

মধুসূদন একটু বয়স হইলেই বুঝিতে পারিলেন যে এরূপ ন্যাকামী স্বাদেশিকতার অপেক্ষা কদর্য্যতা আর কিছুই নাই। তাই তিনি তীব্র "একেই কি বলে সভ্যতা" প্রহসনে ইহার উপর তীব্র শ্লেষ করিলেন। নবকুমার "জ্ঞানতরঙ্গিনী" সভায় বক্তৃতা দিতেছেন শুনুন—"জেন্টেলম্যান, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর, তাদের স্বাধীনতা দাও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দাও—তা হলে এবং কেবল তাহলেই—আমাদের প্রিয় ভারতভুমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য-দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়। কিন্তু জেন্টেল-ম্যান, এখন ও দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবারটি অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যা খুসি, সে তাই কর। Gentleman! in the name of freedom let us enjoy ourselves."

মধুসূদন বিদেশী সভ্যতার হলাহল পান করিয়াও কেমন-ভাবে দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসাকে জীয়াইয়া রাখিয়া-ছিলেন, তাহা তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু সে যুগের ধরন ধারন দেখিয়া কবি আমাদের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ আশাশীল হইতে পারেন নাই। জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে দেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার বাণী তিনি প্রচার করিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে ভারত কখনও আবার সত্যই জাগিবে কি-না। তাই তিনি আক্ষেপের স্বরে মাতৃভূমিকে সম্বোধন করিয়া হতাশভাবে বলিতেছেন—

"Thou art fallen alas!
No more to rise."

এই যে দেশের রাষ্ট্রীয় নব জাগরণ সম্বন্ধে হতাশার ভাব তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠে," রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" ও- ডাঃ নরেশচন্দ্রের "শাস্তি"তেও প্রকাশ পাইয়াছে। জানি না কবে আমাদের প্রাণে এমন দেশাত্মবোধ আসিবে, যেদিন কবি ও সাহিত্যিক সকলে মিলিয়া দেশমাতার পূজামন্ত্রে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিবেন!*

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মৃতিসভায় পঠিত।

আহুতি

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

(১৩)

ফাল্গুনের সে এক সুন্দর পূর্ণিমা তিথি,—সারাটাদিন রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিয়া সকলের অনুরোধে মালতী একবার উঠিয়া আসিয়াছে,—গাটা যেন জ্বলিতেছে, মাথাটা যেন গরম হইয়া উঠিয়াছে। মালতী স্নান করিয়া খোলা চুলে বাহিরে হাওয়ায় আসিয়া বসিল,—দেহের ক্লান্তি নাই, কিন্তু মনটা যেন আর পারে না,—শূন্য,—চারিধারে কেবল শূন্য! হায়রে, এ শূন্যতা ত এজীবনে আর ভরিবে না,—এই কাজ এবং সেবার আনন্দই বা আর কতদিন? তাহার পর যে চির বিশ্রাম, চির অবসর,—বিশ্রামের ক্লান্তি যে সকলের চেয়ে বেশী অসহ্য! মেসোমশায় বলিয়াছেন কাজের কি অভাব? পড়াশুনা করো, আর দীন দুঃখীর সেবা করো,—কিন্তু দূর হোক্ গে ছাই পড়াশুনা, যে মা সহস্র দুঃখ কষ্ট বেদনায়ও বিক্ষোভিত না হইয়া, তাহাকে পড়িতে পাঠাইয়াছিলেন, আজ হৃদয় ভাণ্ডারে তাহার অনন্ত জ্ঞানরাশির সঞ্চয় হইলেও তিনি ত তাহা দেখিতে আসিবেন না! কি হবে তবে আর পড়িয়া? মালতীর মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল এবং চক্ষু হইতে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তবে দীন দুঃখীর সেবা? মেসোমশায় সেদিন বলিয়াছিলেন, মা, মানুষের মধ্যেই নারায়ণ আছেন, তুমি নারায়ণেরই সেবা করিয়া ধন্য হও, এই একমাত্র আমার আশীর্ব্বাদ। তবে তাহাই হোক, সংসারে ব্যর্থতা বলিয়া কিছু আছে নাকি? কিছু না, আমি তবে এমনিভাবে সেবার মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া সার্থক হইয়া উঠিব।

এমনিভাবে কতক্ষণ কাটিল কে জানে,—বহুক্ষণ পরে মালতীর চমক ভাঙ্গিল নরেনের স্পর্শে। মালতী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, চকিতে মালতীর আর একদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল, সে-ই মাতার মৃত্যুর পর একদিন! সে কথা মনে হইলে মালতী আজিও লজ্জায় বেদনায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরে,—মালতী শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন খানিকক্ষণ এধারে ওধারে পায়চারি করিতে লাগিল, এবং হঠাৎ কোন্ এক মুহূর্ত্তে মালতীর অতি নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, "মালতী, কে জানে, তোমার মন আজও কি ঠিক বুঝিনি? যদি আমার ধারণাই সত্য হয়, একটীবার বল, মামার কাছে বলে তাঁর শেষ অনুমতি এবং আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে নিই। এসব কথা তোলা এখন উচিত নয় তা আমি জানি, কিন্তু আমাদেরও সময় সঙ্কীর্ণ।"

মালতী স্তব্ধভাবে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সহসা পেছনে সরিয়া গেল এবং কঠিনস্বরে বলিল, "ছিঃ নরেনদা, এখন তাঁর শেষ সময়ে আমাদের এসব কি ভাবা উচিত? আর তা ছাড়া আমি ত আপনাকে কোন কিছু ভুল বুঝবার সুযোগ কখনো দিই নি, কেন আপনি সারাজীবন একটা তুচ্ছ কথার সৃষ্টি করে জ্বলে মরবেন? যদি আপনি কিছু ভেবে থাকেন,—সব ভুল।"

মালতী ধীরে ধীরে ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সে রাত্রি জমিদার বাবুর অত্যন্ত খারাপভাবে কাটিল। সেবা এবং শুশ্রূষার বিরাম নাই সত্য, কিন্তু কোনওমতেই রোগীকে কেহ আর আরাম দিতে পারিতেছে না। নরেন সারারাত্রি ঘরে ছিল না, ভোরবেলা কোথা হইতে আসিয়া মাতুলের যন্ত্রণার বৃদ্ধি দেখিয়া সারারাত্রি আপনার অনুপস্থিতির জন্য সঙ্কোচে এবং বেদনায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। মালতী একবার তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল বড় গম্ভীর কিন্তু বড় করুণ। আজকাল অতি সহজেই

মালতীর বুকে বেদনা জাগে,—থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনটা বড় কেমন কেমন করিতে লাগিল।

বড় কষ্টে সেদিনকার সে কালরাত্রির অবসান হইল, সকালবেলা জমিদারবাবু চোখ খুলিয়া চাহিলেন, এবং শিয়রেই মালতীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া করুণ কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "এখনও বসে আছিস্ মা? যতক্ষণ না একেবারে মরে যাব, কাছে বসে থাকিস্। মা, নলিন কি এলোনা মা? সে তা'হলে খবর পায়নি বোধ হয়?"

মালতী নতমুখে বসিয়া রহিল। বৃদ্ধের এ অন্তিম বাসনা কিছুতেই পূর্ণ হইবে না সে কথা ত মালতী জানে কিন্তু তথাপি সে কঠিন সত্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার এ আশা এবং এই প্রতিমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষার আনন্দকে কি নৈরাশ্যের আঘাতে চূর্ণ করিয়া দিতে পারে?

দিনটা একরকম কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর গ্রামের এবং আশে পাশের গ্রাম হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক রোগীর অবস্থা খারাপ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, মালতী রোগীর শয্যাপ্রান্ত ছাড়িয়া গৃহ হইতে উঠিয়া আসিল। এই কয়দিনের অবিশ্রান্ত রাত্রি জাগরণ এবং স্নানাহারের অনিয়মে ও নৈরাশ্যের বেদনায় মালতীর দেহ মন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, সে শ্রান্ত-দেহ-মনে পাশের ঘরে ঢুকিয়াই একটা বিছানো মাদুরে শুইয়া পড়িল। কয়দিনের অনিদ্রা—ক্ষণকালের মধ্যেই মালতী ঘুমাইয়া পড়িল।

সহসা বাহিরে একটা অপরিচিত গলার শব্দে মালতীর ঘুম ভাঙিয়া গেল, সে চমকিয়া দরজার দিকে ফিরিয়া চাহিল,—ঘরের একপাশে একটা আলো মৃদুভাবে জ্বলিতেছে, সেই আধ আলো আধ অন্ধকারে কে একজন ঘরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল,—নিতান্ত অপরিচিত, ভীষণ দুর্ব্বল এই অদ্ভুত আগন্তুক। মালতীর ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নাই, সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। আগন্তুক হাসিয়া বলিল, "দেখ্ ছি চিন্‌তে পারোনি, আমার কিন্তু মনে আছে, মালতী, আমি নলিন!"

এ-ই নলিন! বহুকালের হারান নিধি, মুমূর্ষু পিতার একমাত্র কাম্যধন—এবং থাক্—কিন্তু, এই কি সেই নলিন! ডান পা'খানি কাষ্ঠ নির্ম্মিত, একখানি হাতেরও আঙুলগুলি কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, দেহখানি শীর্ণ, পরিধানের বস্ত্রখানি ছিন্ন এবং মলিন, ভাঙা ছাতাখানি কতকালের যে পুরাতন, কে জানে! এই মূর্ত্তি নলিনের নাকি? ইউরোপের সমাধিভূমি হইতে নলিনের প্রেতমূর্ত্তি এই বেশে আসিয়া কি গৃহে প্রবেশ করিল?

মালতী দুইহাতে চক্ষু ঢাকিয়া অস্ফুটস্বরে কি একটা ভয়ব্যঞ্জক ব্যাকুল শব্দ করিয়া উঠিল। নলিন আবার হাসিয়া বলিল, "উঃ, অনেকটা পথ্ হেঁটে এসেছি, এক গেলাস জল খাওয়াতে পারো? আঃ একটা পাখাও কি ছাই ঘরে নেই?"

আগন্তুকের সহজ কথাবার্ত্তা শুনিয়া মালতীর ভয়টাও কতকটা আয়ত্বের অধীনে ফিরিয়া আসিতেছিল, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আলোটা একটু চড়াইয়া আগন্তুকের মুখে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা আবার বসিয়া পড়িল, এবং ক্রন্দনোচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নলিনদা, তুমি! তুমি এমন কেমন করে হ'লে নলিনদা?"

"সে অনেক কথা মালতী, আগে একটু জল, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।"

মালতী কান্না চাপিতে চাপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং নলিনকে জল ও পাখা দিয়া আবার নিকটে আসিয়া বসিয়া পড়িল। মালতীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল,—যে নলিনদার চিন্তা মনে আসিলে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিত, বুকের স্পন্দন আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইত এবং দেহ শীতল হইয়া উঠিত, যাহার চিন্তা তাহার অত্যন্ত গোপন মনের একান্ত প্রিয়তম সামগ্রী ছিল, এবং যাহাকে হয়ত কোনকালে ফিরিয়া পাইতেও পারে আশায় সে সমস্ত দুঃখ বেদনা দুইহাতে ঠেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল,—এই সে একি মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দিল! ইহার চেয়ে ইহাকে না দেখিলেও যে ভাল ছিল।

"আজ সাত বচ্ছর, নয় মালতী? আর ফিরে আসব সে আশা বোধ হয় তোমাদের ছিল না, না? ঈশ্, এর মধ্যে কত পরিবর্ত্তন কিন্তু হয়ে গেল।"

মালতী প্রাণপণে আপনাকে সম্বরণ করিয়া যথাসাধ্য শান্ত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "সেত হয়েই-ছে, তুমি কোত্থেকে এলে—সেকথা আগে বল শুনি।"

নলিন মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া সে কথাটি সাবধানে

এড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ, বাবা—বাবা কোন্ ঘরে? এখনো আছেন ত বেঁচে?"

"তোমায় দেখ্‌বার জন্যেই তাঁর প্রাণটা শুধু কোনমতে রয়েছে, কিন্তু—"

মালতীর গলা আবার কাঁপিয়া উঠিল, সে রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "—কিন্তু নলিনদা, এ তাঁকে কি দেখা তুমি দেখাবে?"

নলিন সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "তাহ'লে এবার চল যাই,—আমার আবার সময় হয়ে এল, এই গাড়ীতেই ফিরতে হবে।—হ্যাঁ, একটা কথা, আমিই শুধু তাঁকে দেখব, তাঁকে আমার কথা কিছু বলো না। এ অবস্থায় কি তাঁর কাছে দাঁড়ান যাবে?"

"কোথায় আবার তোমায় ফিরতে হবে? কি এত কাজ?"

"কি কাজ? - ভয়ানক জরুরী কাজ মালতী, একজনকে আমার ৫০্‌টী টাকা আজ রাত্তিরের ভিতরই দিতে হবে, নইলে সর্ব্বনাশ,—কালকেই মেয়াদের শেষ তারিখ!"

"কিসের মেয়াদ? কোথায়, কার সঙ্গে বল,—টাকা পাঠিয়ে দাও, কিন্তু তোমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না।—বল তুমি কোথায় ছিলে?"

"সে অনেক কথা, মালতী,—যুদ্ধ থেকে কি দশা নিয়ে ফিরে এসেছি, সে এই হাত আর পা দেখেই ত বুঝ্‌তে পারছ? কিন্তু ফিরেছি,—সে অনেক কাল, দু'বছর হয়ে গেল, তারপর কলকাতায় আছি, পেটটা চালাতে হবে বলে সওদাগরী আফিসে কাজ নিয়ে আছি। তারপর গেল বছর বসন্ত হয়ে মরতে বসেছিলুম, কিন্তু মরা আর হ'লনা।"

নলিন রহস্যভরে হাসিতে লাগিল। মালতী কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

"দু' বছর তুমি কল্‌কাতায় আছ!"

"আছি, কিন্তু সে কোথায়, তা আর জিজ্ঞেস করো না। মালতী, দেখ্‌চ ত শরীরটা? কোন রকমে টেনে নিয়ে চল্‌ছি। এ কাপড় দেখে, ছাতা দেখে হাসছ? কিন্তু এও আর জোটে না।" নলিন আবার হাসিয়া উঠিল।

"কেন জোটে না?"

"কেন? হা, হা, হা,—মালতী, আমি কি মানুষ রয়েছি? জাত, ধর্ম্ম, মান, শিক্ষা, দীক্ষা সব গেছে,—তিরিশটী করে টাকা রোজগার করি, ১৫ দিন না যেতে সে টাকা সব শেষ হয়ে যায়। আর কি নিজের মুখে বলবো? কিন্তু,—এ-ই অবস্থা!"

মালতী শিহরিয়া বলিয়া উঠিল,—"আর তোমায় যেতে হবে না চাকরী কর্ত্তে,—"

"কি লাভ? বাবা যদি আজ রাত্তিরটাও থেকে যান, কাল আর নিশ্চয়ই তাঁকে রাখা যাবে না,—তারপর আমি কিসের জন্য থাকব বল? সম্পত্তিতে আর আমার প্রবৃত্তি নাই, এবং অধিকারও আর নাই, সে সব আর আমি চাই নে। থাক্‌গে সে সব,—সে সব আলোচনা করে আর কি হবে,—কে জানে, বেশী কথা বলতে গিয়ে কি কথা আবার বলে ফেলি! মালতী, ছোটলোকের সঙ্গে থেকে থেকে ছোট-লোক হয়ে গেছি যে!—" নলিন সব কথাতেই একটু অস্বাভাবিক ভাবে হাসিতে লাগিল এবং তাহার মাথা নাড়া ও অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চক্ষু দুটীর ভীষণ দৃষ্টি দেখিয়া মালতীর বুক কাঁপিতে লাগিল।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণারজনীর ম্লান আকাশে অসংখ্য তারা মিটিমিটি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আঁধার ঘোচে নাই এবং সর্ব্বত্র একটা ভীষণ নীরবতা যেন মৃত্যুর ছায়া ধরিয়া পৃথিবীটাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। রোগীর ঘর হইতে ডাক্তারদের মৃদু চলাফেরার শব্দ এবং মাঝে মাঝে রোগীর একটা বেদনা-ব্যঞ্জক কাতর ধ্বনি ধীরে ধীরে শোনা যাইতেছিল। মালতী মনে প্রাণে কেমন একটা অস্বোয়াস্তি অনুভব করিতে লাগিল,—একি নৈরাশ্যের বেদনা তাহার চারিদিকে ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে!—ইহার ভিতর হইতে সে মাথা তুলিয়া আর কখনও দাঁড়াইতে পারিবে কি? কিন্তু কেন,—কি দাবী দাওয়া তাহার কাছে ইহাদের করিবার আছে? তাহার পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই—ইহাদের জন্য খাটিয়া, চিন্তা করিয়া সে মরিবে কেন?

মালতীর ক'দিনের অনিয়ম অত্যাচারে ক্লান্ত মন সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া দরজার দিকে হাত দিয়া বলিল, "যাও, ঐ যে মেসোমশায়ের ঘর—"

কয়েকমিনিট পরে নলিন আবার ফিরিয়া আসিল, এবং হাসিয়া বলিল, "জান মালতী, দেখে দেখে আবার যেন মায়া ফিরে আসে। বাবার প্রাণের আশা যদি থাকত, বোধকরি থেকেই যেতুম—কিন্তু এখন কোন লাভ ত নেই।—চল্লুম—কিন্তু—মালতী, ক'টা টাকা দিতে পারো? যে কাণ্ড করে এসেছি, হয়ত এবারে জেলে যেতে হবে!"

মালতী জানালায় মুখ রাখিয়া পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—জানালার নীচেই ফুটন্ত রজনী-গন্ধার গাছ,—তাহারই গন্ধে এবং বাহিরের মৃদু মৃদু শীতল হাওয়ায় মালতীর মাথা শীতল হইয়া আসিতেছিল, এবং তাহার এই একবিংশবর্ষ ব্যাপী ব্যর্থ জীবনখানির শুধু কল্পনায় রচিত শত সহস্র সুখের স্বপ্ন চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল। জীবনটা ব্যর্থ হইয়াই ছিল, কিন্তু তাহার স্বপ্ন দেখার ত বিরাম ছিল না। সুখ দুঃখও সে জীবনে অল্প পায় নাই, কিন্তু সে সমস্তকেই আড়াল করিয়া কেবলমাত্র যাহার স্মরণে তাহার একটা সুখ এবং একটা দুঃখও বটে সর্ব্বদা চিরসত্য হইয়া তাহার বক্ষে জাগিয়া ছিল,—আজ সে স্বপ্ন বাস্তব হইয়া তাহার সম্মুখে দেখা দিল কি? কিন্তু একি ভয়ঙ্কর রূপে! তথাপি—হোক্ ভয়ঙ্কর, হোক্ তুচ্ছ, ঘৃণ্য, মালতী যে নারী! আজ তাহার সুপ্ত নারীত্ব সমস্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। মালতীর হৃদয় উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—আমি ত ভোগের সামগ্রী নই, আমি যে সেবিকা,—! কিন্তু—সমাজ? মালতীর নারী হৃদয় সমাজের কঠোর শাসনের বিরুদ্ধে আবার গর্জ্জিয়া উঠিল, যে বিচার করিয়া বিধি দিতে জানে না, যে রক্ষকের রূপ ধরিয়া নিষ্ঠুর উৎপীড়নে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তাহাকে আবার মানিয়া চলা? বিশেষতঃ ন্যায়ের দিক দিয়া আপনার প্রবৃত্তি এবং সমাজকে তুল্যভাবে বিচার করিতে মা-ই যে তাহাকে শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সে আজ কিছুতেই অন্যায় স্বীকার করিবে না এবং সমাজকে আঘাত করিতে হইলেও সে ন্যায়কেই বরণ করিবে। এই যে হতভাগ্য অপরিণামদর্শী যুবক মাতার অভাবে, ভগিনীর অভাবে, নারীর কল্যাণময়ী স্নেহের অভাবে অধঃপতনের পথে তিলে তিলে মরিতেছে, ইহাকে আজ হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবার অধিকার একমাত্র তাহারই আছে। কিন্তু চিন্তা করিবার কিংবা তর্ক করিবার সময় ত আর নাই, জীবনকে যদি ন্যায়তঃ তাহার প্রাপ্য দিতেই হয়, তবে এখনই তাহা ঐ মুমূর্ষু বৃদ্ধের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহারই আশীর্ব্বাদ দিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে।

(১৪)

মালতী ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং নলিনের সেই বিকলাঙ্গ এবং নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় এই কেমন একটা ভাব তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার সেবাপরায়ণ নারীহৃদয় নলিনের প্রতি উন্মুখ হইয়া উঠিল।

নলিন একটু অগ্রসর হইয়া পুনরায় কয়েকটা টাকা ভিক্ষা চাহিল মালতী যথাসাধ্য আপনাকে সম্বরণ করিয়া শান্তভাবে বলিল, "কয়েকটা টাকা কেন নলিন দা, তোমার এত বড় সম্পত্তিই ত রয়েছে, ফিরে এসে কেন সে সবই নাও না।"

"না:—এখানে আর থাকতে পারব না মালতী,—যেখানে আছি, যা হোক করে তবু দিন চলে যাচ্ছে, রোগে পড়ছি, উঠ্ছি, খাচ্ছি, আফিসে যাচ্ছি, আর নেশার ঘোরে রাত কাটিয়ে দিচ্ছি,—এ-ই বেশ মালতী, এ সয়ে গেছে, আবার নতুন করে এ ঐশ্বর্য্য ত সইবে না! শুধু টাকায় এখানে আমি আরাম পাব না,—না মালতী, সে-ই আমার ভাল।"

দৃপ্ত পাদক্ষেপে মালতী ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া দরজা ধরিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল এবং হাতের একটা আঙুল তুলিয়া সম্মুখের চেয়ারটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কঠিন স্বরে বলিল, "ঐ ওখানটায় বসো, খবরদার, যদি বেরুতে চাও; আমিই লোক ডেকে চোর বলে ধরিয়ে দেবো। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা নলিন দা, এই মরণাপন্ন বাপের এই দশা দেখেও সে বিশ্রী জায়গাটার জন্যেই তুমি ছটফট করে মরুচ? ছেলে হয়ে তুমি কার ওপর তাঁর শেষ ভার দিয়ে যেতে চাও, কে তাঁর শেষ কাজ করবে?—ঐ ভোলা চাঁড়াল না, ঐ রামধন বাগ্দী?"

বিপন্ন নলিন উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "মালতী, কেন বিপদ বাড়াতে চাও? আমি এখানে এসেছি সে কথা ওখানে সবাই জানে, আজ যদি আমি সে লোকটাকে এ টাকা কটা

না দিতে পারি, কাল পুলিশ এখানে এসেই হাতকড়ি দিয়ে কাণে ধরে আমায় নিয়ে যাবে। না, মালতী, আজ যেতে দাও,—বিশ্বাস কর ফের আমি আস্‌ব।"

কিন্তু মালতী তেমনই আদেশের ভঙ্গীতে বলিল, "বেশ, আমি লোক ডেকে দিচ্ছি, ঠিকানা দিয়ে দাও টাকা পাঠিয়ে, কিন্তু তোমার যাওয়া কিছুতে হবে না।"

ঘরের আলোটা চড়াইয়া রাখিয়া মালতী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে ভয়ানক রজনীরও কিন্তু অবসান হইল, জমিদার বাবুর রুগ্নশয্যায় তাঁহারই পদতলে শুইয়া সাঃারাত্রি মালতী ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিয়াছে, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে কামনা করিয়াছে,—আজিকার রাত্রিটা যদি আরও দীর্ঘ হইত! প্রভাতে উঠিয়া কেমন করিয়া সে সেই ভীষণ-দর্শন অথচ তাহার সেই চিরকাম্য শবপ্রায় দেহটার পানে তাকাইয়া দেখিবে! তাহার আগে তাহার এই চক্ষু ছুটী কি কোন প্রকারে অন্ধ করিয়া ফেলা যায় না? মন তাহার সেই চির নবীন, চির স্থির ভাবেই ত রহিয়াছে, কিন্তু হায়, এ চক্ষু ছুটীই যে কেবল বিদ্রোহ জাগাইয়া তোলে!

কিন্তু প্রভাতও হইল, এবং মালতীর সেই চক্ষু ছুটীও তাহাদের পূর্ণদৃষ্টি লইয়া প্রকৃতির পানে চাহিয়া দেখিল। বিরুদ্ধচিত্তে মালতী উঠিয়া বসিল,—এবং রোগীকে শান্তভাবে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া স্নান করিবার জন্য ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

স্নানঘরে যাইবার পথে সম্মুখের দরজাটায় দাঁড়াইয়া একটীবার ভিতরে তাকাইয়া দেখিবার জন্য মালতীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, অদম্য কৌতূহল এবং ভয়ঙ্কর উৎকণ্ঠার সহিত মালতী আপনাকে কোন কিছু চিন্তা করিবার অবসর মাত্র না দিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল,—কিন্তু এ কি ভয়ানক দৃশ্য!—মালতী চক্ষু মুদিত করিয়া সভয়ে পেছনে হটিয়া আসিল। বিছানার একপাশে সরিয়া গিয়া নলিন উপুড় হইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে, বুকের নীচে বালিস ছুটী মাথাটাকে নীচের দিকে খানিকটা ঝুলাইয়া রাখিয়াছে, এবং বিছানার চারিধারে কয়েক হাত পর্য্যন্ত থুথুর সঙ্গে রক্তের ছিটা সারাঘরখানিকে ঘৃণ্য কুৎসিত করিয়া রাখিয়াছে। মালতী জানিত, যক্ষ্মারোগীর কাসিতেই রক্ত থাকে,—তবে কি নলিনদার ইহারও আর বাকী নাই? চঞ্চলচিত্তে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে মালতী ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল।

সকালের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, লোকজনের যাতায়াত ঝি চাকরের চলা ফেরার মধ্যে মালতীর মনে পূর্ব্বের স্বাভাবিক ভাব কতকটা ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়া সে দিন প্রফুল্লভাবেই বলিয়া গেলেন,—"অমাবস্যাটা কাল কেটে গেছে, আজ একটু ভাল বোধ হচ্ছে, আরও ছয় সাতদিনের আগে বোধ করি ভয়ের কোন কারণ নেই।" মালতী কতকটা আশ্বস্ত হইয়া আবার তাহার নিজের কাজে লাগিয়া গেল। মরণ যদিও সুনিশ্চিত তথাপি মানুষের মন চাহে, আজ সেটা না আসিয়া কালই যেন আসে,—তেমনই সন্ত সন্ত একটা ভয়ানক ঘটনা না ঘটিয়া যতদিন মাঝে কাটিয়া যায়—মালতীর সারা মন-প্রাণ উন্মুখ হইয়া তাহাই কামনা করিতে লাগিল! কিন্তু রোগীর সেবা, রোগীর পথ্য প্রস্তুত ইত্যাদি সকল কর্ম্মের মধ্যেই নলিনের চিন্তাটা বারে বারে জাগিয়া উঠিয়া তাহার মনে ঘা দিতে লাগিল, এবং এ বাড়ীতে যে সে ছাড়া আর কেহই নলিনকে সহজভাবে সহিয়া নিতে পারিবে না, তাহাই ভাবিয়া মালতী মনে মনে আশঙ্কা অনুভব করিল। নলিনের অপরূপ মূর্ত্তি বাড়ীর মাহিয়ানা করা এই লোকগুলির মনে যে কিরূপ হাস্যোদ্রেক অথবা ভীতিসৃজন করিবে, তাহাই মনে করিয়া মালতী কাতর হইয়া উঠিল।

বেলা বাড়িয়া চলিল, অতি সযত্নে মালতী মেসো মহাশয়ের মুখখানি ধোয়াইয়া তাঁহাকে ঔষধ পথ্যাদি পান করাইয়া এবং তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে তাঁহাকে শয্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া দিল, এবং নরেনকে নিকটে বসিতে বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

নলিন তখনও শয্যায়। মালতী দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, "নলিনদা, বেলা হ'ল,—ওঠ—"

(ক্রমশঃ)

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

[শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ]

গতবারে আমরা রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলিয়াছি; আজ বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস-গুলির অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলিব।

এ পর্য্যন্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যত উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে, এক স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা" ভিন্ন কোন উপন্যাসকেই দর্শকগণ তেমন ভাবে গ্রহণ করেন নাই—যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইলে তাহার ঔপন্যাসিক আকর্ষণ তেমন থাকে না এবং প্রকৃত নাটকের মর্য্যাদাও অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। উপন্যাসে অনেক জিনিষ বর্ণনায় চলে, অনেক জিনিষ পড়িতে পড়িতে পাঠক ভাবিয়া লইতে পারেন; সময় ও স্থানের কড়া নিয়ম উপন্যাসে না মানিলেও কোন ক্ষতি হয় না; বিক্ষিপ্ত ঘটনার সাহায্যে উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা নাই—অবশ্য বিষয় যদি সুচিন্তিত ও সুলিখিত হয়।

উপন্যাসে দৃশ্য বিভাগের কোন বালাই নাই; পাত্রপাত্রী পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে ক্রমাগত পাঠককে তাহাদের কাহিনী শুনাইয়া যাইতে পারেন; কোন বিষয়ের বা চরিত্রের রহস্যোদ্ভেদ প্রথমে না করিয়া গ্রন্থকার পাঠকের কৌতুহল উদ্দীপ্ত রাখিবার জন্য নিজের ইচ্ছা বা সুবিধামত স্থানে তাহা উদ্ঘাটন করিলেও কোন ক্ষতি হয় না; পুস্তকের শেষ অংশে কোন নূতন চরিত্রের অবতারণা করিলেও, উপন্যাসের কিছু যায় আসে না। দুই বা ততোধিক গল্প পরস্পরের সহিত জড়িত না করিয়াও স্বতন্ত্রভাবে দেখান যাইতে পারে, তাহাতে চরিত্র চিত্রণের বা রস বিকাশের কোন ব্যাঘাত ঘটে না কিন্তু নাটকে এরূপ করিবার উপায় নাই। নাটক জন্মায়, তাহাকে তৈয়ারী করিতে হয় না। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে গাছ এবং গাছ হইতে ফল প্রসূত হয়, তেমনই নাটকও কোন বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ ভাব বা রসকে অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠে, তাহার ক্রমবিকাশ হয়; এবং তাহা বীজানুযায়ী বৃক্ষের মতই স্বাভাবিক ভাবে চরম পরিণতি লাভ করে।

ভাল নাটকের কোন চরিত্র—একটা সামান্য চরিত্রও বাদ দিলে নাটকখানি ভাজিয়া চুরমার হইয়া যায়। এই কারণেই অনেক সু-উপন্যাস রস-সাহিত্য হিসাবে অপূর্ব্ব হইলেও, রঙ্গমঞ্চে তাহারা শুধু যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে না তাহা নহে, অনেক সময় তাহারা দর্শকের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া উঠে। পড়িতে পড়িতে যাহা বিসদৃশ মনে হয় না, চক্ষের সম্মুখে অভিনয় কালে তাহা অত্যন্ত অরুচিকর হয়। ঘরের মধ্যে উপন্যাস বর্ণিত এমন অনেক জিনিষই আমরা বেশ সহজভাবেই পড়িতে পারি যাহা চক্ষে দেখা সহ্য করিতে পারি না, কিম্বা যাহা সহ্য করা ভদ্রোচিতও হয় না। অথচ সে সকল দৃশ্য নাটক হইতে বাদ দিলে, শুধু যে উপন্যাসের মর্য্যাদা হানি হয়, তাহা নহে, উপন্যাস লেখকের উপরও যথেষ্ট অবিচার করা হয়। প্রণয় বা নায়কের প্রতি কামজ আসক্তি প্রকাশ, উপন্যাসে নানাভাবে রঙ ফলাইয়া দেখানো যাইতে পারে কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর সামান্য মাত্রাধিক্য হইলে, শিল্প এবং শিল্পী—উভয়েরই সর্ব্বনাশ। উপন্যাসের এ লিপি-চাতুর্য্য অভিনয় চাতুর্য্যে রূপান্তরিত করিলে কোন ভদ্র-দর্শকই তাহা সহ্য করেন না। বিধবা নায়িকা খুব সংযত ও মার্জ্জিত ভাষায়, ঘটনাচক্রে পড়িয়া নায়ককে কোন নিভৃত স্থানে আদর আপ্যায়ন করিতেছে—তাহার অন্তর্নিহিত প্রেমের অভিব্যক্তি কথায় নহে, কেবল তাহার লজ্জারক্তিম মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে—উপন্যাসের এ দৃশ্য পড়িতে পড়িতে কোন ব্যতিক্রমই চক্ষে ঠেকে না, বরং গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব তুলিকায় তাহা মনোরাজ্যে মনোরম হইয়াই ফুটিয়া উঠে কিন্তু রঙ্গমঞ্চে যে-ই দেখি যে একটা

নিরাভরণা যুবতী-বিধবার পরিধানে থান, হাতে পাখা, স্থান নিরালা, সম্মুখে তাহার তাহারই-মনে-মনে-বরিত নায়ক, তখনই তাহার সেই থান কাপড়—এমন একটা বিসদৃশ ভাব মনে জাগাইয়া দেয় যাহা আদৌ সুষ্ঠু ও রুচিকর নহে, অধিকন্তু যে করুণ রসের আভাস উপন্যাসে দেখা গিয়াছিল, তাহা বিকৃত রসে রূপান্তরিত হইয়া সহানুভূতির পরিবর্ত্তে ঘৃণার উদ্রেক করে। অভিনয় কালেও কোন অভিনেত্রীর পক্ষে কোন কথা না বলিয়া কেবল ভাবের দিক হইতে রং মাখা মুখে লজ্জার লালিমা ফুটাইয়া তোলাও নিতান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সকল কারণেই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাদ দিয়া অন্য যাঁহাদেরই উপন্যাস অভিনয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে সে চেষ্টা ব্যর্থই হইয়াছে—কখনও তেমন সাফল্য লাভ করে নাই। নাটকাকারে উপন্যাসের সাফল্য প্রমাণিত হয়—কেবল সমালোচনায় বা শিল্পচাতুর্য্যে নহে, টিকিট ঘরে টাকার ওজনে সে তাহার দর নিজেই যাচাই করিয়া লয়। অবশ্য ইহাতে এমন কেহ না বুঝেন যে, যে নাটকের ওজনে রূপার বাটখারা যত ভারী, নাটক তত উৎকৃষ্ট। কেন না এমনও দেখা গিয়াছে যে অনেক ভাল নাটকও তেমন রজত-কাঞ্চন প্রসব করিতে পারে নাই—যেমন অনেক নিকৃষ্ট চটকদার নাটক করিয়াছে। উপস্থিত প্রসঙ্গে আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই—যে সকল উপন্যাস বহুল পরিমাণে দর্শকের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে, সেই সকল উপন্যাসকেই রঙ্গমঞ্চে স্থান দিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। এই প্রতিযোগিতায় আজও পর্য্যন্ত বঙ্কিম-চন্দ্রকে কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নহেন।

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে এত আদর, তাহার আর একটা কারণ এই, যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রায়ই ড্রামাটিক এবং এই ড্রামাটিক বলিয়াই অভিনেতা ও অভি-নেত্রীর পক্ষে রসবিকাশের অনুকূল। ইহাতে কেবলই বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ঘোরালো বিশ্লেষণ নাই—ইহার মনস্তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে ধারাবাহিক ঘটনা-প্রসবী ঘটনার মধ্য দিয়া,—যে ঘটনাবলী পাত্রপাত্রীর চরিত্রানুযায়ী,—যে ঘটনাবলী অভীপ্সিত রসবিকাশের উৎসস্বরূপ, যে ঘটনাবলী অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাত-সঞ্জাত এবং হৃদয় যন্ত্রের তরঙ্গভঙ্গের স্বাভাবিক গতিতে সদা লীলাচঞ্চল।

উপন্যাসের সূক্ষ্ম তুলির দাগ অতি মনোরম, কিন্তু নাটকে সব সময় সূক্ষ্ম তুলির ব্যবহার চলে না। পুস্তকে পড়িয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া, কল্পনার সাহায্যে যে রস ধরিতে পারি, নাটকে সে সময়ের অভাব; কাজেই সূক্ষ্ম তুলির টানের সঙ্গে সঙ্গে নাটকে অনেক সময়েই মোটা তুলির টানও দিতে হয়। মোটা তুলির টানে আঁকা দৃশ্যপট যেমন দূর হইতে অতি সুন্দর ও শোভন দেখায়, নাটককেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে অনেক সময় সেইরূপ বাইরের মোটা ঘটনার আশ্রয় লইয়া চরিত্র অঙ্কনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে এই দুই তুলির টান সমানভাবেই ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপন্যাস—উপন্যাস ও নাটক একাধারে দুই'ই; এবং এই জন্যই রঙ্গমঞ্চে তাঁহার উপন্যাসের এত আদর। দুর্গেশনন্দিনীর কারাগারের দৃশ্য, চন্দ্রশেখরের অগাধ জলে সাঁতার, কৃষ্ণকান্তের বারুণী পুকুরে, দেবী চৌধুরাণীর বজরায় রাণীগিরি, আনন্দমঠের মাতৃমন্দির, রাজসিংহের পার্ব্বত্যপথে চঞ্চলকুমারী, কপালকুণ্ডলার শ্মশানভূমে মিলন ও বিয়োগ প্রভৃতি অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলীর সংযোজন রঙ্গমঞ্চে দর্শকের চিত্তে যে বিস্ময়-ব্যাকুল-ভাবের উদ্দীপন করে তাহা তো এ পর্য্যন্ত কোন উপন্যাসে দেখিলাম না। আবার সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের স্বতঃস্ফুরণ—"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ", "কেন তুমি তোমার অই অতুলনীয় দেবমূর্ত্তি নিয়ে আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে", "তোমার জন্য আগরার সিংহাসন ত্যাগ করে এসেছি, তুমি আমায় ত্যাগ করো না," "বাদসাজাদীর চোখে জল, বাদসাজাদীও কাঁদে?" "তুমি কি রোহিণী যে তোমার জন্যে ভ্রমর"—এমন কত বলিব, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে, প্রতি দৃশ্যে, প্রতি চরিত্রমুখে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা কোথায়? এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হইলেও কর্ণের ন্যায় অর্দ্ধ রথী নহেন, তিনি মহারথী, অর্জ্জুনের ন্যায় সব্যসাচী, আজও পর্য্যন্ত বাঙ্গলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্য সম্রাট।

(ক্রমশঃ)

জগাপিসি

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

তাঁর আসল নাম যোগেন্দ্রনাথ, কিন্তু পাড়ার লোকে বলিত জগাপিসি। যখন তিনি কোন কাজের ভার লইতেন, তখন সমস্ত বাড়ীতে ভীষণ গোলমাল শুনিয়া মনে হইত না জানি কি একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডই চলিতেছে! সামান্য একখানা ছবি টাঙানো এই কাজটাকেই তিনি এমন সমারোহ ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারিতেন যে কি বলিব! সেই কথাটাই আজ হোক্।

একখানি ফ্রেমে বাঁধানো ছবি—কৈকেয়ী ও মন্থরা—আজ কদিন হইল দোকান হইতে আসিয়া খাটের তলায় পড়িয়া আছে। গৃহিণী হরিপ্রিয়া বলিলেন—"ওগো ওখানার গতি কি হবে?" জগাপিসী বলিলেন—"কিছু ভাবতে হবে না, আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমি নিঃশব্দে সব ব্যবস্থা করে দোব।"

আপিস যাইবার আগে ছেলেদের মেয়েদের সকলকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন—"ওবেলা সব তৈরী থেকো; ছবি টাঙানো হবে।"

তারপর সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়াই কোট খুলিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন, পৃথিবীতে এইরকম লোকেরাই সচরাচর উন্নতি করিয়া থাকে।

প্রথমে নেড়াকে পাঠাইলেন, পেরেক কিনিতে, তার পিছনে আবার পাচুকে পাঠাইলেন, কোন্ সাইজের পেরেক আনিতে হইবে সেই কথাটি বলিয়া দিতে; তারপর হুকুম চলিল—"রেণি আমার হাতুড়ী খুঁজে আনো।...শান্তি, পালাসনি, আলো ধরে দাঁড়াতে হবে!...নিতাই মই নিয়ে এসো। বোঁচন, বোঁচন কোথায় গেল, ছবিটা সে হাতে তুলে দেবে।...

অতঃপর স্বয়ং তিনি খাটের তলা হইতে ছবিখানি অতি সাবধানে বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে গিয়া ঝনঝনাৎ! কেমন করিয়া কাঁচখানা সাতটুকরা হইয়া গেল জানা গেল না, কিন্তু জগাপিসির একটা আঙুল ঈষৎ কাটিয়া যাওয়াতে তিনি সারা ঘরময় বিষম লাফালাফি সুরু করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার—"শিগ্‌গির আমার রুমালখানা বার করো।" কিন্তু রুমালখানা সহজে পাওয়া গেল না যেহেতু সেখানা যে কোটের পকেটে ছিল সেটা এইমাত্র তিনি কোথায় খুলিয়া রাখিয়াছেন তা কেহই জানে না, তিনি নিজেও না। সকলকেই ধমকাইয়া তিনি বলিলেন, "ঘরে এতগুল লোক রয়েছে আমার অতবড় কোটটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না।" সবাই সভয়ে চুপ করিয়া রহিল, তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়াই দেখিতে পাইলেন কোটটার উপরেই এতক্ষণ তিনি বসিয়াছিলেন।

তারপর পাকা আধঘণ্টা লাগিল তাঁহার হাতের ব্যাণ্ডেজ করিতে। ওদিকে আর একখানা কাঁচও কেনা হইয়াছে এবং যন্ত্রপাতি মই ইত্যাদি সবই আসিয়াছে। তিনি মালকোঁচা বাঁধিয়া অগ্রসর হইলেন। ছেলেরা মেয়েরা গোল হইয়া দাঁড়াইল—তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য।

দুজনে দুইপাশে মই ধরিয়া দাঁড়াইল, একজন তাঁহাকে ধরিয়া মইয়ে তুলিয়া দিয়া ঠ্যাংটা ধরিয়া রহিল। একজন পেরেকগুলি হাতের কাছে পৌছাইয়া দিল। আর একজন হাতুড়ীটা হাতে দিল।

জগাপিসী বাঁহাতে পেরেক ধরিয়া ডানহাতের হাতুড়ী দিয়া সজোরে ঘা মারিতে গিয়া—ঠুন্! পেরেক পড়িয়া গেল! খোঁজ্ খোঁজ্,—সকলে মিলিয়া পেরেকটাকে যদি বা খুঁজিয়া বাহির করিল, হাতুড়ী তখন অন্তর্দ্ধান লাভ করিয়াছে! জগাপিসি রাগিয়া কহিলেন—"আমার হাত থেকে হাতুড়ী কোথায় গেল, তোমরা এতলোকে দেখ্‌তে পেলে না?"

অনেক সন্ধানে দেখা গেল, তিনি সার্শির মাথায় হাতুড়ী রাখিয়াছেন!

হঠাৎ জগাপিসি বলিয়া উঠিলেন—"ছবিটা ঠিক সামঞ্জস্য ক'রে টাঙানো হচ্ছে না। কোণ থেকে ৩১$\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চির অর্দ্ধেক কত? সেইখানে ছবিখানা খাটালে মানানসই হয়।" হিসাবটা মনে মনে কেহই কসিতে পারিল না, উপরন্তু তাঁহার তাগাদায় আসল নম্বরটাই ভুলিয়া গেল। তিনি নিজে করিতে গিয়া তাঁহার মাথাটা গরম হইয়া উঠিল।

তিনি মই সরাইয়া লইয়া, একটা টোন সুতা দিয়া মাপিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যতদূর তাঁর হাত যাওয়া সম্ভব তার তিন ইঞ্চি ওধারে যাইবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে অকস্মাৎ তিনি টেবিল হারমোনিয়মটার উপর সোজা আসিয়া পড়িলেন, একসঙ্গে সব সুর-গুলা বাজিয়া উঠিল। ছেলেরা কাঁদিবার আয়োজন করিয়া হাসিয়া ফেলিল, কর্ত্তা দাঁড়াইয়া সকলকে চাঁটি দিলেন।

জগাপিসি এবারে জায়গাটা বেশ স্থির করিয়া হাতুড়ী লইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিধি বিড়ম্বনা, পেরেকে ঘা মারিতে গিয়া বুড়া আঙুলে হাতুড়ী আসিয়া পড়িল, সেটাকে ছাড়িয়া দিতেই নেড়ার পায়ের কড়ে' আঙুলটাকে ভোঁতা করিয়া দিল।

হরিপ্রিয়া এবারে ধীরে ধীরে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"এবার যখন ছবিটাঙাবার কথা হবে, তখন আমি বাপের বাড়ী চলে যাব। যে রকম হাঙ্গাম দেখচি তাতে সাত-আট দিন আমি খুব থেকে আসতে পারি।"

জগাপিসি বলিলেন—"কি আর হয়েছে? কত সহজে কাজ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা তিলকে কেমন তাল করে তোল। তোমাদের ঐ কেমন স্বভাব!"

এবারে আর একটা পেরেক লইয়া এমনি প্রচণ্ড এক ঘা বসাইলেন যে সম্পূর্ণ পেরেকটা এবং হাতুড়ির আধখানা দেয়ালের মধ্যে চলিয়া গেল, তাঁহার নাকটাও সেই সঙ্গে বেশ জোরে ঠুকিয়া গেল।

তারপর আবার মাপ লইয়া জায়গা ঠিক করিয়া ছবি টাঙাইতে রাত বারোটা বাজিয়া গেল। তবুও ছবিখানার এক দিকটা বাঁকা হইয়া বিশ্রীভাবে ঝুলিতে লাগিল, এবং সে ধারের দেয়ালটার দশা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—একটা ভূমিকম্প হইয়া গেছে। জগাপিসি গিন্নীর পা মাড়াইয়া দিয়া চেয়ারটাকে হড়্ হড় করিয়া পিছাইয়া আনিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া নিজের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিখানা দেখিতে লাগিলেন আর বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন—এই সব ছোট ছোট কাজ নিঃশব্দে করতে আমি বরাবরই ভালবাসি।"

সাময়িকী

'সচিত্র শিশির' পুরস্কার প্রতিযোগিতা প্রথমে ছয় মাসের জন্য ঘোষিত হইয়াছিল। ১৩৩০ সালের মাঘ মাসে আরম্ভ হয়, আষাঢ়ে শেষ হইল। পুরস্কার প্রতিযোগিতায় আমরা মহিলাদের মধ্যে বেশ উৎসাহ লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রতি মাসেই কুড়ি পঁচিশটি রচনা আমাদের হস্তগত হইত, কোন মাসে চল্লিশটি রচনাও পাইয়াছি। সাহিত্যে তাঁহাদের উৎসাহ জাগ্রত করাই আমাদের উদ্দেশ্য; উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইয়াছে; তজ্জন্য আমরা পুরস্কারদাতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মণিমোহন দের নিকট কৃতজ্ঞ।

পুরস্কার কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য—বারম্বার ইহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও অনেক পুরুষ লেখক প্রতিযোগিতায় নামিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে তীব্র মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহা সত্ত্বেও কতকগুলি পুরুষ রচনা পাঠাইতেছেন, এ মাসেও তিনটি পুরুষ-রচিত গল্প 'প্রতিযোগিতার জন্য' বিশেষভাবে লিখিত হইয়া আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই, তবে তাঁহাদের মানসিক অবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত রচনা যাঁহারা বিচার করিয়া দিয়াছেন আমরা তাঁহাদের নিকট-ও কৃতজ্ঞ আছি। রায় বাহাদুর শ্রীযুত জলধর সেন; শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এ্যাট ল; শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি-এ; শ্রীযুত চারুচন্দ্র মিত্র এম্-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণ বিচারকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এর নাম প্রতিযোগিতা-পুরস্কার-বিচারকগণের মধ্যেই দেওয়া হইয়াছিল। রাখালদাস বাবু কলিকাতায় নাই এবং বিচারকের কার্য্য করিতে সম্মতি প্রত্যাহারও করিয়াছিলেন, এইজন্যই তাঁহার নাম বিচারক-তালিকা হইতে আমরা উঠাইয়া দিয়াছিলাম।

সুহৃদবর শ্রীযুক্ত মণিমোহন দে মহাশয় এই প্রতিযোগিতাটি আরও ছয় মাসের জন্য চালাইতে চাহেন। এতদুদ্দেশ্যে ছয় মাসের পুরস্কারের টাকাও তিনি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। মণিবাবু সাহিত্য-রসিক যুবক; স্ত্রী-শিক্ষা-কার্য্যে তাঁহার অসীম উৎসাহ। তাঁহার অন্তঃকরণ উদার, উদ্দেশ্য মহৎ! ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করুন।

শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত—ছয় মাস প্রতিযোগিতা চলিবে। ভরসা করি লেখিকাগণকে পূর্ব্বের মতই সোৎসাহে বঙ্গবাণীর পূজার মন্দির-পথে চলিতে দেখিতে পাইব।

পুস্তক সংবাদ

ধর্ম্মযোগ—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ, ন্যায়বাগীশ বি-এ, বি, সি, এস, (অবসর প্রাপ্ত) মহাশয় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোং—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য দেড় টাকা।

লেখক মহাশয় এই গ্রন্থখানিতে ধর্ম্মমতকে তর্কশাস্ত্রের বিচার দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি নানারূপ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে সকল ধর্ম্মের সাধনই এক—সকলকেই বৈরাগ্য এবং সর্ব্বজীবে সমদর্শন সাধন করিতে হইবে—নিষ্কাম নিরহঙ্কার হইয়া শান্ত সমাহিত হইতে হইবে। লেখক মহাশয় বলেন যে ধর্ম্মের নামেই জাতিভেদ বর্ণভেদ প্রভৃতি আসিয়া পৃথিবীতে নানারূপ বিপ্লব ও সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়াছে। লোকে ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইলে আর এরূপ হইত না। গ্রন্থকার তুলনামূলক সমালোচনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের যথার্থ তথ্য বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

লেখক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে "তর্কবিজ্ঞান" নামক ইউরোপীয় লজিকের গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া যে যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন, এই গ্রন্থ তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাঁহার সরল মধুর ভাষার গুণে জটিল সমস্যাগুলি অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানির যথার্থ সমাদর দেখিতে চাই।

শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত একখানি নূতন উপন্যাস 'সাথী' প্রকাশিত হইয়াছে। উপন্যাসখানি ইতিপূর্ব্বে কোনও পত্রিকায় বাহির হয় নাই। মূল্য ২৲।

"না বাঁধে চিকুর না পরে চীর,
না খায় আহার না পিয়ে নীর ॥

* * *

না চিনে মানুষ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রহিছে চাই ॥"
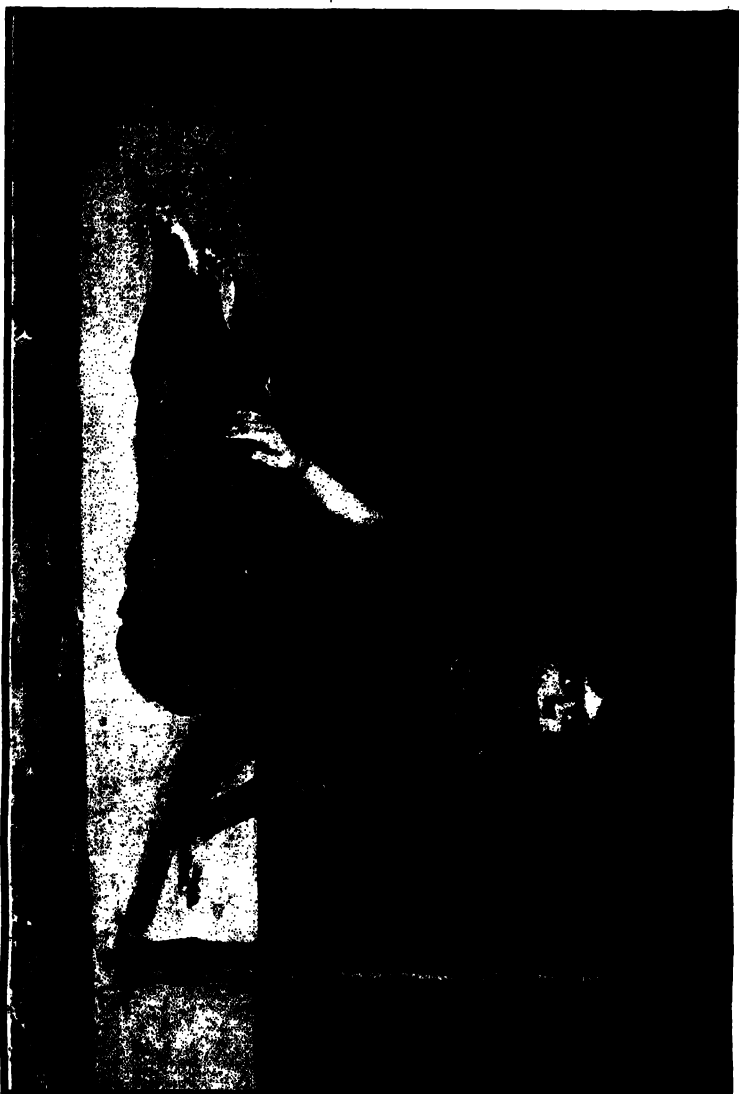
প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২৮শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [পঞ্চত্রিংশ সপ্তাহ

খেয়ে নাও দু'দিন বৈ ত নয়!
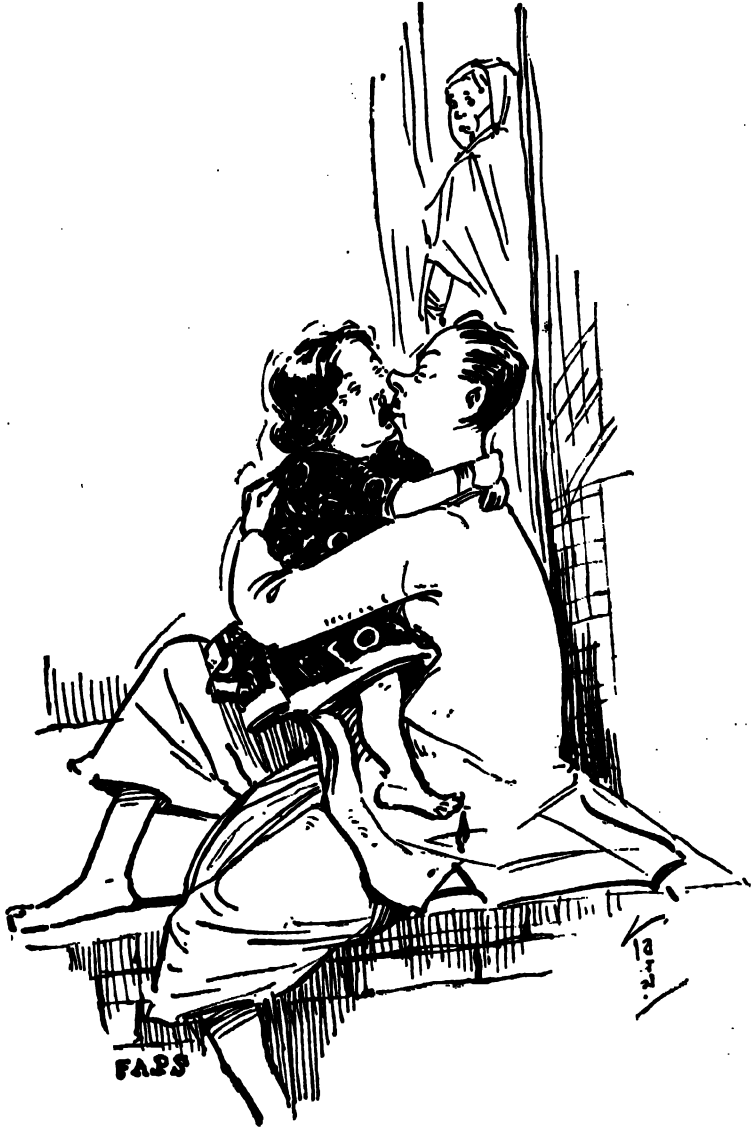
বিষম

—"ষাট্, ষাট্,

ষেটের বাছা ষষ্ঠির দাস"—

হামি।

"যেতে নাহি দিব।"

ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক

অপরাহ্ন বেলায় মোদক খাইলেন।

মাথা

"খাও খাও, আমার মাথা খাও।"

গুম্

"সহেনা যাতনা, লাঞ্ছনা, অপমান।"

হোঁচট্

পপাত ধরণীতলে।

পেট যে মোটে একটা

নিমন্ত্রণ

৺দ্বিজেন্দ্রলালের "কর্ণমর্দ্দন-কাহিনী" দ্রষ্টব্য।

জহ্নু মুনির জল গণ্ডুষ
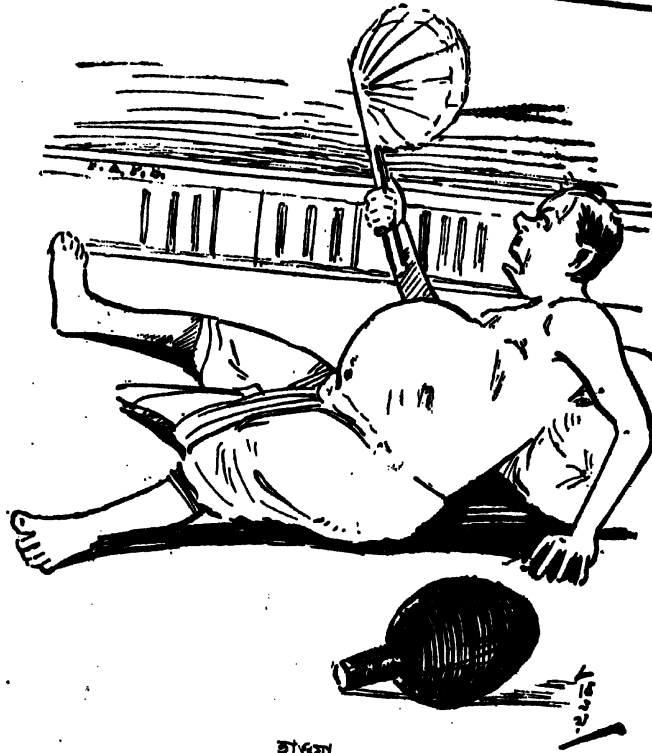
হাওয়া
এত জল, এত হাওয়া, তবু কিছু হয় না কেন বাবা!

খাবি
রাস্তায় কাটবে না-ত ?

ঝাঁটা
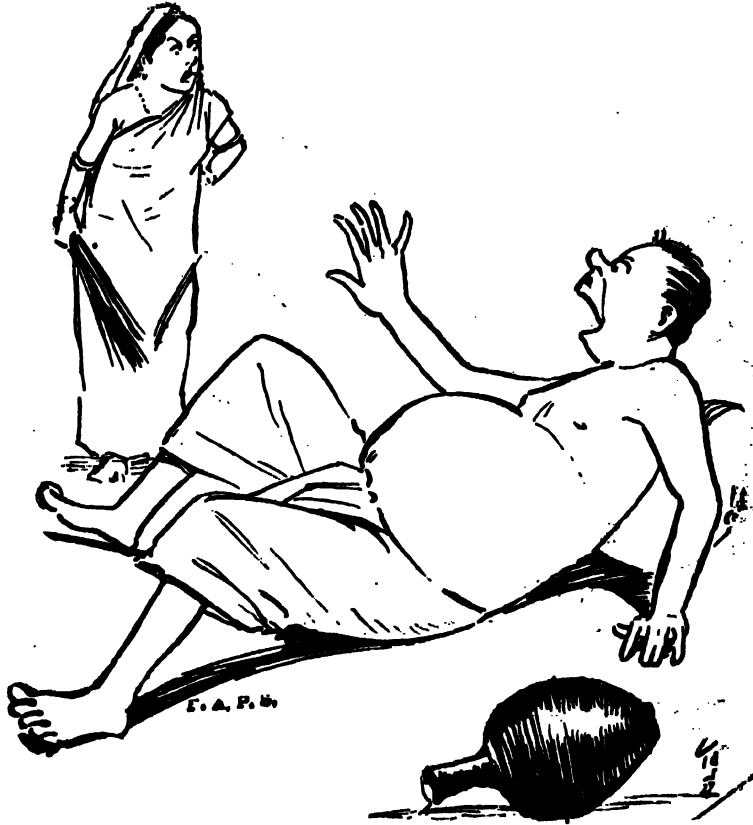
জিনিষটাই না-হয় পরের, পেট-টা ত নিজের ! বুঝে সুঝে গিলতে পার নি !
ফের যদি চ্যাচাবে ষাঁড়ের মতন—দেখেছ ?

ঔষধ

"না-ও গেলো খানিক।"

ঔষধ খাইলেন ও অতঃপর বাঁচিয়া রহিলেন।

বাঙ্গালী চিরদিন এইরূপে বাঁচিয়া আছে।

মৃত্যু-বরণ

[শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যভারতী]

(১)

মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিয়াছি। গৌরবের মৃত্যু নহে; অতিরিক্ত পান দোষের অবশ্যম্ভাবী ফল যে মৃত্যু, সেই মৃত্যু একরূপ ইচ্ছা করিয়াই বরণ করিয়া লইয়াছি। সহানুভূতির অযোগ্য আমি; সহানুভূতি চাই-ও না। মানুষের সহানুভূতি আর আমার কোন কাজেও লাগিবে না। তবে ইহা লিখি কেন? তাহার কারণ—ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে ইহার বিরুদ্ধে সতর্কী-করণ। তাহাও অধিকারের আকারে করিতেছি না—করিতেছি অনুরোধের আকারে। এদিকে তাহাদের সতর্ক-দৃষ্টি মেলিয়া রাখিলে এমন শোচনীয় মৃত্যুকে বরণ করিবার অবকাশ তাহাদের নাও ঘটিতে পারে।

আজ আমি মাতাল; সকলের অবজ্ঞার পাত্র কিন্তু চিরদিন আমি এমন ছিলাম না। আমার ভবিষ্যত উজ্জল ছিল; লোকে আমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত, কারণ লোকের কাজে আসা আমার জীবনের একটা ব্রত-স্বরূপ ছিল।

যাক্, কি হইতে পারিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া আজ আর কোন লাভ নাই। কি হইয়াছি, তাহা বলিয়াছি; কেন হইয়াছি, তাহাই বলিতে বাকী আছে। সেইটুকু বলা শেষ হইলেই আমার ছুটী।

কিশোর কাল হইতেই আমার সাহিত্য-চর্চ্চার বাতিক ছিল এবং তাহারই ফলে কাব্যময় প্রেমোপভোগের একটা সুতীব্র বাসনা আমার হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। কিন্তু হায়! উপন্যাসে যে প্রেম এত সুলভ, বাস্তব-জীবনে তাহাই এত দুর্লভ, যে বহুদিন পর্য্যন্ত সেই শুভ (?) মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় থাকিলেও সে মুহূর্ত্তটী আসিল না। যখন আসিল তখন বুঝিতেও পারিলাম না যে প্রেমে পড়িয়াছি বা ইহাকেই বলে প্রেম। অদৃষ্টের কি ভীষণ পরিহাস!

(২)

এক আত্মীয় এবং বন্ধু-কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া দুমকা গিয়াছিলাম। রামপুরহাট হইতে দুমকা পর্য্যন্ত মোটর সার্ভিস থাকিলেও আমি নিজের মোটরে গিয়াছিলাম। যেখানে সম্ভব সেখানে নিজের মোটর লইয়া যাওয়াই আমার অভ্যাসের মধ্যে ছিল। ইহাতে স্বাধীনতার সুখ এবং আমার পদমর্য্যাদা—উভয়ই অক্ষুণ্ণ থাকিত।

নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে ধন এবং মর্য্যাদা হিসাবে আমিই ছিলাম সর্ব্ব প্রধান। কর্ম্মকর্ত্তা সেই জন্য অত হাঙ্গামের ভিতরেও আমাকে পৃথকভাবে অভ্যর্থনা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমি পৌঁছিবামাত্র আমাকে সভায় লইয়া গিয়া অভিনন্দিত করা হইল; আমিও বিনীতভাবে তাহার উত্তর দিলাম। আমি জানি এ অভিনন্দন আমার ঐশ্বর্য্যের কিন্তু তাহারা 'ঐশ্বর্য্য' কথাটার স্থানে 'সাহিত্যিক' কথাটা ব্যবহার করিয়া নিজেদের হীনতাটা গোপন করিয়াছিলেন। আমার অপেক্ষা বহু বড় সাহিত্যিকগণকে যখন এইরূপে অভিনন্দন দেওয়া হয় না, তখন সত্য বলিতে হইলে আর কি বলা যাইতে পারে?

সভাতে নীত হইবার পরেই একটী সুন্দরী এবং যুবতী মহিলা আমাকে অভ্যর্থনার জন্য বিশেষভাবে রচিত একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিলেন। কি সুমিষ্ট স্বর! তোষামোদপূর্ণ উদ্বোধন-গীতিটীর রচয়িতা অন্য ব্যক্তি, যুবতী কেবলমাত্র তাহা গাহিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু এমনি মতিভ্রম যে আমার মনে হইতেছিল—যুবতীই বুঝি আমার গুণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজেরই কথায় এবং সুরে আমার আরতি করিতেছেন।

সভাভঙ্গের পর সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত নিমন্ত্রণ কর্ত্তা আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন; আমিও বিনয়ের অবতার সাজিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলাম। আমি জানিতাম—ধনীরা সামান্য মাত্র বিনয় প্রদর্শনে অত্যুচ্চ প্রশংসা পাইতে পারেন সুতরাং প্রশংসা লাভের জন্য আমি কখনও বিনয় প্রদর্শনে কার্পণ্য করিতাম না।

যখন সেই গায়িকা-যুবতীর সহিত নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা আমার

পরিচয় করাইয়া দিলেন তখন জানিলাম যে গায়িকা-যুবতীটী নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা প্রিয়তোষবাবুর একজন আলোক-প্রাপ্তা বান্ধবী। পূর্ব্বে প্রিয়তোষবাবুর বাবুর কন্যাকে—যাহার বিবাহ হইতেছে—গান শিখাইতেন, এখন কলিকাতার অপর কোন এক ধনী-কন্যাকে ইনি গান শিখাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। সংসারে তাঁহার মাতা ব্যতীত অপর কেহ নাই। তিনি কলিকাতাতেই বাড়ী আগলাইয়া আছেন--কন্যার সঙ্গে আসেন নাই।

কি জানি কেন,—কোন মতেই মনে আসা নিবারণ করিতে পারিলাম না যে যুবতী যখন গরীব এবং আমি ধনী তখন আমার প্রেম নিবেদন প্রত্যাখ্যাত না-ও হইতে পারে!

গান বাজনায় আমারও কিঞ্চিৎ দখল ছিল। বিশেষতঃ য়ুরোপ ভ্রমণের সময় তদ্দেশীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের সহিত অনেকটা পরিচিত হইয়া, ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় সঙ্গীতের একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা, মাঝে মাঝে মাসিক-পত্রিকার মারফতে আমি করিতাম। প্রথম পরিচয়ের সময় গায়িকা-যুবতী মীনা রায় বলিলেন যে তিনি আমার সেই সমস্ত পাণ্ডিত্য পূর্ণ সরস (?) প্রবন্ধগুলি একনিশ্বাসে পাঠ করিয়া নাকি বহু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। বন্ধুবান্ধবরা কিন্তু বলিতেন যে আমার ঐ প্রবন্ধগুলি নাকি, নিদ্রা না আসিলে, নিদ্রাকর্ষক ঔষধ হিসাবে তাঁহারা সেবন করিয়া থাকেন। আজ মনে হইল, ঐ প্রবন্ধ লেখার শ্রম পণ্ড হয় নাই বরং তাহা অসাধারণ সাফল্য মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

পরিচিতেরা আমার সঙ্গীত শাস্ত্রে দখলের কথা অবগত ছিলেন। তাঁহারা এবং তাঁহাদের ও মীনার মুখে সে কথা অবগত হইয়া নবপরিচিতেরাও গান গাহিবার জন্য আমাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জন্য যতটা না হউক কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞা মীনাকে আমার সঙ্গীতজ্ঞতার পরিচয় দিবার এবং সঙ্গীতেরই মারফতে আমার প্রেম নিবেদন করিবার এমন সুযোগ আমি ত্যাগ করিলাম না; বলিলাম যেমন জানি তেমনি গাইছি কিন্তু ওঁর পর আমার গান কি আপনাদের কানে লাগবে?

লাগিবে কি না-লাগিবে, ভদ্রমহোদয়গণ মীনার সাক্ষাতে সে সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন;—কাহাকে ছোট করিয়া কাহাকে বড় করেন! মীনা তাঁহাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিল; বলিল, সেকি কথা? কা'র সঙ্গে কা'র তুলনা! আমি যে আপনার পদনখেরও যোগ্য নই।

কথাটা এমন সুকৌশলে উচ্চারিত হইল যে, গান সম্বন্ধে কি জ্ঞান সম্বন্ধে সে আমার পদনখের যোগ্য নহে বলিতেছে, তাহা ঠিক বোঝা না গেলেও, কেমন একটা প্রেম-গন্ধী ধোঁকা ধরাইয়া দিল। স্বরটা একটু ভারি, চক্ষুদ্বয় ঈষৎ নত দেখিয়া আমার অন্ততঃ মনে হইল যে ঐ কথাটার সাদা অর্থ ছাড়া একটা বাঁকা অর্থও বোধ হয় আছে।

সত্য মনোভাব কি জানিবার জন্য মনটা আগ্রহপূর্ণ হইয়া উঠিল। সবিনয়ে আমিও উত্তর করিলাম, সে কি কথা? সে কি কথা? আপনার সঙ্গে আমার তুলনা!

এ তুলনাও যে কি সম্বন্ধে তাহা আমিই ভালরূপে বুঝিলাম না, তা' অন্যে বুঝিবে কি?

তারপর গান আরম্ভ হইল। ওস্তাদির পরিচয় দিবার জন্য প্রথমে দুই একটা ওস্তাদির গান, তারপরই স্বরকে করুণ এবং দৃষ্টিকে ভিক্ষাপূর্ণ করিয়া, খুব দরদ মিশাইয়া গাহিলাম "আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।" তারপর মীনাকে গাহিতে অনুরোধ করিলাম।

মীনা গাহিল "দেখ সখা ভুল ক'রে ভালবেসো না, আমি ভালবাসি বলে" ইত্যাদি। স্বর তেমনি করুণ, দৃষ্টি তেমনি ভিক্ষাপূর্ণ, গানে তেমনি দরদ। এ যেন আমারই ভঙ্গীর পাল্টা জবাব। কোন মতেই আমি মনে আসা নিবারণ করিতে পারিলাম না যে গানের আবরণে আমি তাঁহাকে যে প্রেম নিবেদন করিলাম, মীনার সূক্ষ্মদৃষ্টি সে আবরণ ভেদ করিয়া যথাস্থানে গিয়া পৌছিয়াছে, নহিলে এমন যথাযথ উত্তর দিতে সে সক্ষম হইবে কেমন করিয়া? তথাচ একেবারে সংশয় হীন হইবার জন্য পুনরায় ঐ ভাবেই ঐ জাতীয় আর একটা গান গাহিলাম সে-ও পূর্ব্বোক্ত ভাবেই তাহার উত্তর দিল।

যখন নিঃসংশয়ে বুঝিলাম যে আমার প্রেম নিবেদন গানে গানেই মঞ্জুর হইয়াছে তখন মনে হইল, আমি যেন আর ধরণী-বাসী নহি, যেন কোন্ স্বপ্নের স্বর্গপুরে আমার ঘর; আলোকে,

সঙ্গীতে, উৎসবে সেস্থান মুখরিত, আর আমার বামপার্শ্বে বধূ-বেশে দাঁড়াইয়া—কমল-কোমলাঙ্গী, উদ্ভিন্ন-যৌবনা মীনা!

(৩)

বৈকালের দিকে মীনা এবং কয়েকজন পরিচিত ভদ্র-লোকের সহিত পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলাম। ময়ূরাক্ষীর তীর ধরিয়া যে নির্জ্জন পথ দেওঘরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। সমপদস্থ নহে বলিয়াই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্ম ভদ্রলোকগুলি আমার পাশে না চলিয়া, আমার অনুসরণ করিতেছিলেন; মীনা কেবল আমার পাশাপাশি চলিতেছিল। নানারকম গল্প বলিতেছিল; তাহারই মাঝে আমি সতর্কতার সহিত খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তাহার সংসারের এবং মনের পরিচয় লইবার চেষ্টা করিতেছিলাম এবং তাহার অতি সামান্ত গুণ বা কোন বিশেষ অভ্যাসের কথায় আমার আশ্চর্য্য হইবার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া, আমিও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিলাম।

ইহার মাঝে ভদ্রতার অনুরোধেও পিছনের লোক কয়টীর সহিত আলাপ করিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিলাম না—সময়ের সে নিদারুণ অপব্যয় করিবার ইচ্ছাও হইতেছিল না। জানিনা তাহারা আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবিতেছিলেন। এক সময় লক্ষ্য করিলাম, দল অনেক পাতলা হইয়া গিয়াছে; আর কিছুক্ষণ পরে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, সেখানে আর কেহই নাই;—দুইজনে নির্জ্জনে ধীরপদবিক্ষেপে ময়ূরাক্ষীর তীর ধরিয়া চলিয়াছি। বাঁচা গেল। কাজের কথায় এখনও অগ্রসর হইতে পারি নাই; পিছনের ফেউএর দল পাছু না ছাড়িলে কি মন খোলা যায়! এইবার আরম্ভ করা গেল।

আমি বলিলাম—আজকের রক্তসন্ধ্যাটা কি সুন্দর, দেখছেন?

বাস্তবিকই চমৎকার!

রক্ত -সন্ধ্যার একটা বিশেষ গুণ হচ্ছে যে, যার যেমন রঙ, তাকে তার চেয়ে সুন্দর দেখায়। এই দেখুন না, আমার মত কালা আদমীকেও অনেকটা আপনার মত দেখাচ্ছে!

'আপনি বুঝি নিজেকে কালো মনে করেন? কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, আপনার আর আমার রঙে তো বড় বিশেষ তফাৎ নেই। রক্তসন্ধ্যা তো পক্ষপাতী নয়, যে আপনার রঙকে উজ্জ্বল করবে আর আমার করবে না। আমার রঙটাও নিশ্চয়ই আমার আসল রঙের চেয়ে ফর্শা দেখাচ্ছে। আর তফাৎ-ই বা এমন কি? আপনাকে অনেক সময় বাইরে রোদে হাওয়ায় ঘুরতে হয়, আমাকে তা' হয় না—এই যা সামান্ত একটু তফাৎ।

আপনি বাক্-কুশলী, আপনার সঙ্গে কথায় তো পারবার জো নেই।

মনে হইল, যদি ভদ্রতার অনুরোধে একথা না বলিয়া থাকে,—যদি সত্যই আমার রূপ সম্বন্ধে তাহার ঐ ধারণা হয় তবে—আর, তবে নয়?

মীনা সলজ্জ-হাসির সহিত বলিল, আপনার মত ধনী ও গুণী যে এমন বিনয়ী হয়, তা আমার আগে জানা ছিল না। অভিনন্দনের উত্তরে যিনি অমন সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারেন, বাক্-কৌশলে যে তিনি আমার মত নগণ্যার চেয়ে কোনও অংশে কম—একথা কে বিশ্বাস করবে? শুনেছি যাঁরা মহৎ তাঁরা নিজেকে সকল বিষয়ে সকলের চেয়ে ছোট মনে করেন, তাই বোধ হয় বাক্-কৌশলে আমার সঙ্গে পেরে উঠবেন না—ভাবছেন?

বক্তৃতাটা যে ঘর হইতে মুখস্থ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিয়া খাটো হইতে প্রাণ চাহিল না। আহ্লাদে প্রাণটা যেন লাফাইয়া উঠিল; মনে হইল, গোবৎস যেমন পায়ের সুড়সুড়ি মারিবার জন্ম এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে, আমার মনের সুড়সুড়ি মারিবার জন্ম আমারও খানিকটা তেমনি করা প্রয়োজন হইয়াছে। নিতান্ত অশোভন হইবে এবং মীনা পাগল ভাবিবে বলিয়া সে ইচ্ছা দমন করিলাম।

বর্ণ কাহার কতটা পরিষ্কার—এই দার্শনিক প্রসঙ্গ চাপা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কলিকাতায় তাহার মাতা ছাড়া আর কেউ বাড়ীতে থাকেন কি না।

হাসিয়া মীনা বলিল, "আর কেউ" শুধু কলকাতার বাড়ীতে কেন, কোথাও নেই। যাঁরা ছিলেন, বাবা প্রকাশ্যে

বাবুর্চ্চি রাখার পর তাঁরা কেউ সম্পর্ক স্বীকার পর্য্যন্ত করেন না। আমাদেরই মত আলোক-প্রাপ্ত বা ব্রাহ্ম খৃষ্টান বন্ধু-বান্ধব যা' দু'চারজন আছেন, তাঁরাই মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নেন।

স্বজন পরিত্যক্ত শুনিয়া মনটা করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল; বলিলাম, এখন থেকে আমাকেও আপনার একজন গুণমুগ্ধ - ও-ও—বন্ধুর মধ্যে গণ্য করবেন কি ?

গুণমুগ্ধর পর রূপমুগ্ধ কথাটা আপনিই ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, তাই খানিকটা গেঙ্গাইয়া সে কথাটাকে ফেরৎ পাঠাইতে হইল।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, এ আমার পরম সৌভাগ্য" বলিয়া মীনা অকস্মাৎ আমার দক্ষিণ হস্তটা গ্রহণ করিয়া সেক্‌হ্যাণ্ডের আকারে নাড়িয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটু চাপও দিল।

তাহার সেই প্রথম স্পর্শে আমার সর্ব্ব শরীরে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল; আত্মহারার মত আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতটায় তেমনি ঈষৎ চাপ দিতেই, সে একটা চোখ কেমন এক রকম মচকাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে কাছে টানিয়া ধরিলাম। মীনাও যেন কেমন একটা আবেশে সঙ্গে সঙ্গে আমার অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল। যদিই বা এক আধটুকু জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল, ইহাতে তাহাও উড়িয়া গেল। কখন কখন যে ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলাইয়া দিয়াছিলাম, সে জ্ঞান আমার ছিল না। জ্ঞান ফিরিল, যখন মীনা বারে বারে আমার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইবার ইঙ্গিত জানাইল।

ইঙ্গিত স্পষ্টই বুঝিলাম কিন্তু তবু ছাড়িতে মন চাহিল না। কে না চায় যে অমন একটা মুহূর্ত্ত চিরস্থায়ী, অন্ততঃ দীর্ঘস্থায়ী হয়!

আবার মুক্ত হইবার ইঙ্গিত জানাইয়া, এই অভিসারের উত্তেজনা-কম্পিত-স্বরে বলিল, না, না, ছিঃ, ছাড়; লোকে দেখলে বলবে কি! আমরা ত বিবাহিত নই।

তবে বিবাহে মীনার মত আছে! তবু দীনতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে যে তুমি আমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করবে!

এবার মীনা নিজেই দক্ষিণ হস্তে আমার কটীদেশ বেষ্টন করিয়া, বাম হস্ত আমার পায়ের দিকে এবং আবেশপূর্ণ অর্দ্ধদৃষ্টি আমার মুখের দিকে স্থাপিত করিয়া বেশ একটু নাটকীয় ভাবে বলিল, তুমি যদি পায়ে রাখ।

গুরুঠাকুর শিষ্যের পা ছুঁইতে গেলে শিষ্যের যেমন শশব্যস্ত হওয়া সম্ভব, তেমনি শশব্যস্তে পাদস্পর্শ-প্রয়াসী তাহার বাম হস্তটা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া আবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম; বলিলাম, মীনা, মাথার মাণিক কি পায়ে সাজে ?

(৪)

এমন সহজ ভঙ্গীর সহিত উভয়ে বিবাহ বাড়ীতে ফিরিলাম যেন, যেমন সাধারণ পরিচয় লইয়া উভয়ে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, এখনও উভয়ের মধ্যে ঠিক তেমনি সাধারণ পরিচয়ই আছে। মীনা অন্দরে চলিয়া গেল, আমি বাহিরেই রহিলাম। কিন্তু আর বিবাহ বাড়ীতে মন টেঁকে না। কেবলই মনে হয় কি করিয়া, কোন্ ছলে আবার দেখা হইবে ? কথা কওয়ার সুযোগ যদি নিতান্তই না ঘটে, চোখের দেখা দেখিলেও যে প্রাণটা কতকটা ঠাণ্ডা হয়।

বিবাহ দেখিবার জন্ত যখন ডাক পড়িল তখন সকলের আগে ছান্‌লা তলায় গিয়া হাজির হইলাম। দিব্য করিয়া বলিতে পারি আজ পর্য্যন্ত, কেমন যে বরের আর কেমন যে ক'নের মুখ, তাহা দেখি নাই। ছান্‌লা তলায় গিয়া অবধি খুঁজিতেছিলাম ভিড়ের মধ্যে কোথায় সে আছে, কখন একবার চোখে চোখে মিলিবে ? কখন একবার গোপন মৃদু হাসির আদান প্রদান হইবে ?

খুঁজিতে খুঁজিতে চোখে চোখ মিলিল কিন্তু বিবাহ বাড়ী এরা এমন অন্ধকার করিয়া রাখে কেন ? লোকজনের মুখই স্পষ্ট দেখা যায় না বলিয়াই বোধ হয় স্বামীস্ত্রীর মধ্যে আজ কাল এত অবনিবনাও হয়!

আচ্ছা কোন ছলে রাত্রে আবার তেমনি করিয়া দু'জনে বেড়াইতে বাহির হওয়া চলে না ? উহুঁ, আমাদের দেশটা বড়ই খারাপ—বড় পরচর্চ্চা করে। এরাই আবার স্বরাজ চায়, ছ্যা!

রক্ত সন্ধ্যায় সেই নির্জ্জন ভ্রমণ, সেই সমস্ত কথাবার্ত্তা

স্মরণ হইয়া মনকে এমন চঞ্চল করিয়া তুলিল যে রাত্রে ভাল করিয়া ঘুম হইল না। শেষ রাত্রে ক্লান্তি বশে যদি একবার চোখের পাতা লাগিল কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। শুধুই সেই চোখমট্‌কানো, সেই বুকে বুকে, মুখে মুখের অবস্থাটা স্বপ্নে মনে জাগিতে লাগিল।

রাত্রিটা তো এমনিভাবে কাটিল, সকাল বেলায় আবার একটা নূতন মুস্কিল বাধিল। যে দেখে সেই জিজ্ঞাসা করে আপনার কি কোন অসুখ করেছে? কেউ জিজ্ঞাসা করে, রাত্রে কি ভাল ঘুম হয় নাই? কেউ বলে বাড়ী থেকে কি কোন মন্দ সংবাদ এসেছে? মুখ আপনার অমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?—মর্ ব্যাটারা, আমার মুখ বিমর্ষ দেখাচ্ছে তা, তোদের কি? আর আমার মুখটাকেই বা কি বলিব? ধরাইয়া দিবার জন্য যথাসময়ে বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছে!

ভালই হইল; শরীর খারাপেরই অছিলায় বাড়ী যাইবার ছুটী পাইলাম। ভাবিলাম বাড়ী গিয়া কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া মাসকতক ক্রমান্বয়ে কলিকাতায় থাকিব নতুবা মীনার নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ কেমন করিয়া পাই? কিন্তু মীনা কবে কলিকাতায় ফিরিবে তাহা তো জানিয়া যাওয়া হইল না। তাহা না হয় আগে গিয়া পড়িলে দিনকতক অপেক্ষাই করিব; ঠিকানাটা জানিয়াছি, প্রত্যহ একবার কি দুইবার করিয়া সংবাদ লইলেই চলিবে। কিন্তু এই দুমকা হইতে রামপুরহাট পর্য্যন্ত দীর্ঘপথটা যদি মীনাও সঙ্গে যাইত তবে পথের কষ্টটা আদৌ জানা যাইত না। তাহা কি সম্ভব হয় না?

ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সম্ভব হইল। একজন আয়া-জাতীয়া জীব আসিয়া বলিল, মিনিবাবা আপনাকে সেলাম দিয়াছেন।

মিনিবাবা সেলাম দিয়াছেন! আমি থতমত খাইয়া, আয়াটাকেই প্রতি-সেলাম দিয়া ফেলিলাম। ভাগ্যে সেখানে অপর কেহ ছিল না! আয়াটা কিন্তু আমার সেলামে শশব্যস্ত হইয়া এমন ভাবে চাহিতে চাহিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেল যে অন্যে দেখিলে হয়ত একটু কুৎসিত চিন্তাও মনে ঠাঁই দিয়া ফেলিত।

আয়াকে অনুসরণ করিয়া মিনিবাবার নিকট উপস্থিত হইলাম। মীনা কহিল, আপনি নাকি রামপুরহাট যাচ্ছেন? আমাকে সঙ্গে নেবার সুবিধা হবে কি? প্রিয়তোষবাবুর (মীনার বন্ধু ও কন্যাকর্ত্তা) কাছে ছুটী নিয়েছি কিন্তু আসবার সময় ট্যাক্সির ড্রাইভারটার মাতলামী দেখে বড়ই ভয় পেয়ে ছিলাম; গাড়ী চালাচ্ছে তাও যেন বেহুঁস হয়ে। আর ছোট্ট গাড়ীতে অত গাদাগাদি করে কি যাওয়া যায়? বাপ্! এখন আমার জিনিষপত্র নিয়ে আয়া যদি বাড়ীতে যায়, আপনার গাড়ীতে একা আমার স্থান হবে কি?

মনে হইল বলি, তোমার জন্য তো পৃথক স্থান দরকার নেই, তোমাকে যে আমি বুকে করে নিয়ে যাব মীনা। কিন্তু কতকগুলি মহিলা সেই সময় পাশ দিয়া আনাগোনা করিতেছিল বলিয়া সহজভাবেই বলিলাম, যথেষ্ট স্থান হইবে। গাড়ীর ভেতর তো একা আমি—চাকর চাপরাসী তো ড্রাইভারের পাশে বসে যাবে। তা নয়তো তাদেরও অন্য গাড়ীতে যাবার বন্দোবস্ত করে দিই, আপনি শুদ্ধ গেলে বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে, এই দূর পথটা একেবারেই জানা যাবে না।

ঠারে ঠোরে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হইয়া গেল। মীনাও জানাইল যে তাহার আয়া জিনিষপত্র লইয়া পৃথক গাড়ীতে যাইবে—সুতরাং একা, আমিও জানাইলাম যে আমারও চাকর চাপরাশীর ঐ রকম যাহা হোক একটা ব্যবস্থা হইবে সুতরাং আমিও একা।

তারপর প্রিয়তোষবাবু যখন মীনাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া দিলেন তখন যেমন এতটা পথ একসঙ্গে মাত্র দুজনে যাইবার কল্পনায় মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তেমনি প্রিয়তোষবাবুর স্পর্শ দেখিয়া তাঁহার উপর মনটা জ্বলিয়া উঠিল।

যে সুখে অমন দীর্ঘ পথটা অতিবাহিত করিলাম তাহার বিশদ বর্ণনা দিয়া আপনাদের হিংসা উৎপাদন করিব না।

মীনা রামপুর হাটে মোটর ছাড়িল, ট্রেণে উঠিল। বাধ্য হইয়া চোখও ছাড়িল কিন্তু মন ছাড়িল না। সেই সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাটার মধ্যবর্ত্তিনী সুন্দরীর পিছনে পিছনে, ট্রেণের সমান গতিতে অলক্ষ্যে ছুটিয়া গেল। দেহটা লইয়া আমি বাড়ী আসিলাম।

(৫)

অনেক পশ্চিমদেশীয় চাপরাশী কি সহিসের গঞ্জিকা সেবনের কৈফিয়ৎ শোনা যায় যে এ দেশের জলটা সহেনা বলিয়াই নাকি তাহারা ঐ জল সহাইবার ঔষধ সেবনে বাধ্য হয়। আমিও যখন বিলাতে ছিলাম তখন তথাকার শীতটা সহাইবার জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দুই একটা পেগ টানিয়া লইতাম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ফিরিয়াও কেন যে আজ পর্য্যন্ত পেগ লই তাহার কোন কৈফিয়ৎ না থাকিলেও একটীমাত্র কৈফিয়ৎ এই যে অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

প্রথম প্রথম যখন লোকে মদ খাইবার ইচ্ছা করে তখন ইচ্ছাটাকে প্রয়োজনের আকারই দিয়া থাকে। অনেকে আবার কুইনাইন দিয়া মদকে ঔষধের কোঠায় ফেলিয়া দোষ শোধন করিয়া লয়। আজ বড় বাদ্‌লা, একপেগ না খাইলে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে, অতএব মদ খাও—আজ বড় সর্দ্দি লাগিয়াছে, অতএব মদ খাও; আজ পরিশ্রমে সকল অঙ্গ বেদনা করিতেছে, অতএব মদ খাও। এমনই ছল করিয়া লোকে প্রথমে মদ খাইতে আরম্ভ করে। শেষে যখন অভ্যাসে দাঁড়ায় তখন বলে নিরুপায়। যখনকার কথা বলিতেছি তখন আমার ঐ ছলের অবস্থা; তখনও নিরুপায় হই নাই। বিরহকাতর মনটাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য বাড়ী পৌছিয়া সেই দ্বিপ্রহরেই উপর্য্যুপরি কয়েকটি পেগ খাইলাম। সন্ধ্যার পর প্রত্যহই খাইতাম কিন্তু দিনে কখনই খাইতাম না। আজ প্রথম। নদীর বাঁধে একটী ছিদ্র হইলে একদিন যেমন সমস্ত বাঁধটা ভাঙ্গিয়া যায়, তেমনই মদস্পর্শ করিবার সম্বন্ধে দিবা সংযমের যে বাঁধ ছিল আজ প্রথম তাহাতে ছিদ্র হইল!

ম্যানেজার এবং তাহার পিতা বৃদ্ধ দেওয়ানজীকে যাবতীয় বৈষয়িক এবং সাংসারিক কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া ২।১দিন মধ্যেই কলিকাতা যাত্রা করিলাম। কৈফিয়ৎ দিলাম যে কলিকাতার থিয়েটারে আমার একটী নাটক চলিবার সম্ভাবনা হইয়াছে তাহারই ব্যবস্থার জন্য একাদিক্রমে কয়েকমাস কলিকাতায় থাকা আবশ্যক। কলিকাতায় আমার এজেন্টকে তার করিয়া বাড়ী ঠিক করিলাম। পুরানো মোটরখানা বাড়ীতে রাখিয়া সেখানে গিয়া একখানা নূতন মোটর কিনিলাম।

(৬)

মোটরের যে ড্রাইভারটি জুটিয়া গেল তাহার চেহারা দেখিয়া তাহাকে বেশ সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত বলিয়া মনে হয়। যেমন রং তেমনই দেহের গঠন, তেমনি তেড়ির বাহার, থাকিতও তেমনি ফিটফাট হইয়া। যেন সে চাকরী করিতে আসে নাই, জামাইবাবু নিমন্ত্রণে আসিয়াছে! বাজার চলন গলাবন্ধ ইউনিফর্ম্‌ দেখাইতেই সে বলিল—একি মশায় পরা যায়, কলার নেকটাইএ আর আপনার কতই পড়্‌বে। ইউনি-ফরম পরাতে হয়ত গ্রাগন্থর ব্রীচেস ওপন ড্রেস কোট আর কলার নেকটাই দিন, আর ঐ কার্ণিসওয়ালা টুপি, কাঁসি কি ভদ্রলোকে মাথায় দেয় মশায়? সাহেব ড্রাইভারদের মত একটী হেল্‌মেট কিনে দিন আর জুতোটা গ্লেজ্‌ড্‌ কীডের দেখে দেবেন; পায়ে আবার একটা কড়া আছে কিনা। মোজা, ও শিল্কেরই ভাল, টেঁকে বেশীদিন।

মনে হইল ড্রাইভার হইয়া তুমি যদি হেলমেট, সিল্কের মোজা ও গ্লেজ্‌ড্‌ কীডের জুতা পরিবে তবে তো গিয়াছি বাপু! পারিব কি? কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল নিজের পোষাক অপেক্ষা চাকর বাকরদের পোষাক দামী হইলেই আজকাল ষ্টাইল অধিক রক্ষিত হয়। সেইজন্য গরীবের বাবুগিরির ইচ্ছা দেখিয়া গা জ্বলিয়া উঠিলেও তাহারই ইচ্ছামত পোষাক কিনিয়া দিলাম।

মীনার বাড়ীর নম্বর এবং রাস্তার নাম বলিতেই ড্রাইভার মণিমোহন নিতান্ত পরিচিতের মত একেবারে তাহার দরজায় গিয়া গাড়ী লাগাইল। বুদ্ধিমান ড্রাইভার পাওয়া গিয়াছে ভাবিয়া সন্তুষ্টই হইলাম।

মীনার মাতা কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিজের ঘরের ছেলের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমার নূতন পরিচয়ের সঙ্কোচ কাটিয়া গেল।

চা খাওয়ার পর মাতাপুত্রীকে মোটরে বেড়াইতে যাইবার নিমন্ত্রণ করিলাম; কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। গাড়ীর নিকট আসিয়া যখন মাতা ও পুত্রীর দৃষ্টি মণিমোহন ড্রাইভারের উপর পড়িল, লক্ষ্য করিলাম তখন মাতা ও পুত্রী অসম্ভব রকম চমকাইয়া উঠিলেন এবং

উভয়েরই মুখ যেন কেমন পাংশু বর্ণ হইয়া গেল। মণি-মোহন কিন্তু তাঁহাদের মুখের পানে একবার মাত্র কটাক্ষ করিয়া চক্ষু নত করিল কিন্তু মুখে তাহার হাসির আভাস জাগিয়া রহিল।

তখন কৌতূহলটা চাপিয়াই গেলাম কিন্তু পথে এক সময় জিজ্ঞাসা করিলাম—মণিমোহন কি আপনাদের পরিচিত?

মাতা ও পুত্রী উভয়ে যেন ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন, কেন?

আমি বলিলাম—এমন কিছু না, তবে গাড়ীতে উঠিবার সময় আপনাদের মুখ দেখিয়া মনে হইয়া-ছিল, ও যেন আপনাদের পরিচিত!" মীনা বাহিরের দিকে এমনভাবে চাহিয়া রহিল যেন ইহার উত্তর তাহার মাতারই দেয়, তাহার নহে।

মাতা বারকতক ঢোঁক গিলিয়া, ২।১বার কাঁপিয়া যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে আমার ড্রাইভারটির চেহারা অনেকটা নাকি তাঁহার এক বোনপোর সঙ্গে মেলে। তাই তাঁহারা মণিমোহনকে দেখিয়া প্রথমে একটু থতমত খাইয়া-ছিলেন।—এই সামান্য কথাটা আর মনে স্থান না দিয়া অন্য গল্পে মনোনিবেশ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

এক মিনিট

[শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু]

(১)

এক সাহেব অশ্লেষা-মঘার দিন 'টুর'এ বাহির হইয়া বেজায় নাকাল হইয়াছিল। সেই থেকে তার এমনি ভয় হইয়া গিয়াছিল, যে কোথাও যাত্রা করিবার আগে হিন্দু-আর্দ্দালীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "চাপরাশী, দেখো ত' তুমারা মঘাশালা কিধার হ্যায়!"

(২)

এক মস্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলিতেন—তুমি আমি এবং পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু, সবই মায়া। একদিন তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, রাস্তায় একটা চোরের পিছনে অনেকগুলি লোক ছুটিতেছে। এই তাড়া করার ঘটনাটা তিনি স্ত্রীর কাছে আসিয়া এইভাবে বলিলেন, প্রিয় মায়া, মায়াতে দেখিলাম একটা মায়াকে অনেকগুলি মায়া, মায়া করিতেছে।

আর একদিন দৈবক্রমে একটা মহিষ ক্ষেপিয়া গিয়া পণ্ডিতজীকে গুঁতাইতে আসিয়াছে! তিনি আর কোথায় আছেন, প্রাণভয়ে ছুট্! এ অবস্থায় কতকগুলি ছোকরা তাঁহাকে ধরিয়াছে, ছি ছি, ঠাকুর, মায়ার ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছেন!

ঠাকুর সপ্রতিভভাবে জবাব দিলেন, জন্তুটা মায়া বটে, কিন্তু আমার এ পলায়নকেও সত্য মনে করিও না, ইহাও মায়ামাত্র!

(৩)

খোকা শুনিযাছিল তাহাদের বাড়ীতে যে রাধারমণের বিগ্রহ আছেন তিনি এমনি জাগ্রত যে সমস্ত প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন। তাই সেদিন ইস্কুল হইতে আসিয়াই সে ঠাকুর ঘরে গিয়া হাত যোড় করিয়া বলিতে লাগিল, হে ঠাকুর, সিংহল যেন সিংহভূমের রাজধানী হয়।

তার মা শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খোকা, ঠাকুরের কাছে ওকি কথা হচ্ছে?

খোকা কাঁদ কাঁদ মুখে উত্তর করিল, আমি যে আজ পরীক্ষার খাতায় ঐ কথাই লিখে এসেছি মা!

আহুতি

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

নলিন জাগিয়াই ছিল, এবং ঘরের অবস্থা দেখিয়া নিজের উপরই তাহার রাগ হইতেছিল,—এত কি বিষম ঘুম কাল তাহার আসিয়াছিল যে স্থান অস্থানের জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহার ছিল না!—নলিন উঠিয়া বসিল এবং নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় মুখ তুলিয়া বলিল, "মালতী, রোগে দারিদ্র্যে আর মানুষ হয়ে থাকতে দিলে না। এই তোমার ঘরটারই কি অবস্থাই করে দিলুম! রাত্তির বেলা জ্বরটাও খুব হয়, মাথাটাও তুলতে আর পারিনে, বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকি কিনা,—তা কিছু মনে করো না। যদি ঝাঁটাটা আর, একঘটী জল এনে দাও, কিংবা কারুকে দিতে বল—

মালতী একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি উঠে ওধারের ঐ স্নানের ঘরে যাও দেখি,- এসব তোমায় আর ভাবতে হবে না,—যাও,ওঠ, দেরী করো না।"

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া নলিন বলিল, "কিন্তু, এসব তাহ'লে করবে কে? এযে বড্ড ছোঁয়াচে!"

"হোক, যাও তুমি,- স্নান করে এই কাপড় চোপড় গুলো একধারে সরিয়ে রেখো, আমি পরিষ্কার ধুতি পাঠিয়ে দেব'খন—যাও।"

(১৫)

বেদনায় এবং অবসাদে অবনত হইয়া ঘরের শয্যাটীর পানে বারেক দৃষ্টিপাত করিয়া মালতী পার্শ্বস্থ জানালাটির গরাদে হাত রাখিয়া দাঁড়াইল, এইমাত্র একজন বৃদ্ধ ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া যে গানটা গাহিয়া গেল, তাহার শেষ পদ-দুটির ভিতরে কি এমন একটা করুণ ভাব ছিল, যাহার পুনরাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে, নিতান্ত অজানিতেই মালতীর চক্ষু দুইটা হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।—যেন কি একটা হারানো জিনিষের সন্ধান বড় সহসা মিলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এত আর তেমনটি নয়, যেমনটি তাহার হাতছাড়া হইয়াছিল, এত আর সেটি নয়, যা ছিল তাত আর মিলিল না, এ সন্ধানে, এ পাওয়ায় তবে লাভ হইল কি? হারানো সহিয়া যায়, আশায় আশায় জীবন কাটানোও যায়, কিন্তু চির বাঞ্ছিতকে কলঙ্কে লিপ্ত ত চোখে দেখা যায় না, মনের এ কথা-গুলি, যা মনটাও ভাল করিয়া ফুটাইতে পারিতেছিল না, ভিখারীর গানে একি জ্বলন্ত ভাষায় কবি এ কথাগুলি ফুটাইয়া দিলেন!

ও পাশের বড় ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া উঠিতেই মালতী চমক ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বেলা ত ক্রমে বাড়ি-য়াই উঠিতেছে, দাঁড়াইয়া শুধু ভাবিলে কাজ ত তাহার ফুরাইবে না, এই যে ঘরময়, বিছানাময় রক্ত এবং থুথু, এসব পরিষ্কার করার কাজ ত তাহারই। মালতীর মন সহসা কেমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, —তাহারই? সে কি কথা! কে তাহার উপর কবে এ ভার দিয়া গেল? আপনি স্বেচ্ছায় সে এ দাসীত্বের বোঝা কেন মাথায় তুলিয়া লইবে?

হ্যাগা দিদিমণি,—

বাহির হইতে ডাকিতে ডাকিতে ঘরে ঢুকিয়াই সহসা বিন্দি ঝি দুই পা পেছনে হটিয়া গেল, সভয়ে চমকে সে চেঁচাইয়া উঠিল, মাগো, একি! এ কিগো দিদিমণি! কার এ বিছানা? দাদাবাবুর? এযে বাপু যমে ধরেছে!" আপনাকে সম্বরণ করিয়া মালতী বলিল, যা ত বিন্দি, একঘটি জল আর ঝাঁটাটা নিয়ে চট করে এ ঘরটা আগে পরিষ্কার করে দিয়ে যা দিকিন—

বিন্দি চলিতে চলিতে বলিয়া গেল, আমার বাপু বাটনা

বাটা রয়েছে. বামুন ঠাকুর চোঁচয়ে 'ল, তার চেয়ে বাপু. রাঁধুকে পাঠিয়ে দিই গে—

মালতী পরম আরামে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, যেন সহসা একটা বিষম সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে,—এইত দাসীত্ব,—দাসী ত ইহারা, যাহারা নিক্তিতে মাপিয়া কাজ করে। যেখানে প্রাণের আকর্ষণ, সেখানে দাসীত্ব কোথায়? সেখানে বরঞ্চ রাণীত্বের দাবী করা চলে, কিন্তু দাসী বলিয়া মন ছোট করিবার প্রয়োজন কি? মনে মনে মালতীর কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল, শুধু মনের টানে নয়, জন্ম নক্ষত্র যেখানে তাহার বন্ধন সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছে, সেখান হইতে টানিয়া আনিতে পারে, কার এমন কি শক্তি আছে?

দ্রুতহস্তে স্বহস্তে কাজ সারিয়া লইয়া মালতী আবার আসিয়া জানালায় দাঁড়াইল, আকাঙ্খিত জনের সেবার আনন্দে একটা পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, মালতী সাগ্রহে নলিনের প্রতিক্ষা করিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, রাত্রির আলো ছায়ার বিভীষিকায় যাহাকে ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হইয়াছিল, দিনের আলোতে হয়ত তাহাকে তেমন নাও দেখা যাইতে পারে।

সম্মুখের বাগানে প্রাচীরের গাত্র সংলগ্ন দুইটী বৃহৎ আমগাছ পরস্পর মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদেরই মধ্যবর্ত্তী আকাশ দিয়া দরোয়ানের গৃহের কিয়দংশ মাত্র দেখা যায়, স্নানসিক্ত দেহে বিশাল দেহ রঘুসিং মাথায় প্রকাণ্ড টিকি ঝুলাইয়া, একঘটি চায়ের জল ফুটাইয়া নিল, সম্মুখের একটা পিতলের থালাতে তাহার স্বহস্তে গড়া খান-কয়েক রুটি,—একপার্শ্বে একটা ছোট কেরাসিন কাঠের বাক্সের উপর গোটা দুই বাটি, একটা কড়া, আর একটা ছোট হাঁড়ি,—বিদেশী দরিদ্রের এই গৃহকর্ম্ম এবং গৃহসজ্জাটুকু মালতীর চোখে বড় মধুর লাগিল।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে নলিন আসিয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল,—মালতী!

এই যে, এসেছ!—

নলিন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবাকে একবারটি দেখে এইবারে তবে বিদায় হই,—কি বল,—

রুগ্ন শীর্ণ মুখখানির উপর চক্ষুদুটির কেমন একরকম অস্বাভাবিক দৃষ্টি, মালতী সহসা সহিতে পারিল না, চক্ষু নত করিয়া বলিল, তুমি এ চেয়ারটায় বস ত, আমি তোমার চা করে আন্‌ছি, তারপরে সে কথা হবে।—আঃ ও কি নলিন দা! তোমার বুকে ও কিসের দাগ? ওমা, এখনো শুকোয় নি যে ও কি? কেটে যাওয়ার দাগ না কি?

বিকট দর্শন মুখখানিতে ততোধিক বিকট হাসি ফুটাইয়া নলিন বলিল, সে তুমি শুন্‌লে ভয় পাবে,—থাক্ সে কথা,—

"না, না, বল, বল, উঃ আমার শরীর কেমন কর্চ্ছে, বল ও কি?"

নলিন তেমনই হাসিতে হাসিতে মালতীর কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল "ও ছোরার দাগ,—কেটে দিয়েছিল,"—

"কে?"

নলিন একটু ভাবিয়া বলিল—সে একজন,—তা আমিও তাকে আস্ত রাখিনি, কেটে দুখানা করে তবে পালিয়েছি,—হুঁ বাবা, গয়নাচুরির দোষ দিয়েছিল, সোজা কথা নাকি?

"খুন করেছ! পুলিশে ধর্‌লে না?"

"হুঁ, পুলিশ! এ কি বাবা তেমন ছেলে!"

মালতী ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ঘর ছাড়িয়া পলাইল।

(১৭)

সে দিন বিকালের দিকটায় জমিদার বাবু চোখ খুলিয়া চাহিলেন এবং মৃদুস্বরে মালতীকে বলিলেন, "মা, আমি যেন কেমন একটা স্বপ্ন দেখলুম, যেন সে এসেছে, কিন্তু মা তার বড্ড কষ্ট।"

মালতী বুঝিল এ স্বপ্ন নয়, নলিন একবার আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া রোগের ঘোরে এবং দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সবটা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে স্বপ্ন বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছে। নলিনের আসার কথাটা একটীবার জানাইবার জন্য কাল রাত্রি হইতে মালতীর মন ব্যগ্র হইয়াছে, কিন্তু ডাক্তারের নিষেধে এ পর্য্যন্ত সে কিছুই জানাইতে পারে নাই। কিন্তু, এখন আর তাহা গোপন রাখা উচিত নয় মনে করিয়া, সে তাঁহার মুখের কাছে অত্যন্ত নত হইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "স্বপ্ন ত নয় মেসোমশায়, তিনি সত্যি এসেছেন যে,—কিন্তু তাঁর কোন কষ্ট ত আর নেই, তিনি ভালই আছেন। আপনি তাঁর জন্যে ভাববেন

না মেসোমশায়, দেখতে তিনি একটু খারাপ হয়ে গেছেন বটে, কিন্তু তিনি ভালই আছেন।"

আসন্ন মরণোন্মুখ স্নেহ-চঞ্চল পিতার দেহে আর একটুও শক্তি ছিল না, তথাপি তিনি কেমন এক রকম ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এসেছে! তবে মা, তবে একবার দেখা, একবারটী দেখে নিই—...না, না, আমি ভাব্‌ব না রে, আমি কিছু ভাব্‌ব না, তুই একটীবার ডাক না তাকে, ডেকে দে,—"

* * • *

এই ভয়ঙ্কর মিলনের অবস্থাটার কথা ভাবিয়াই ডাক্তারেরা মনে মনে ভয় পাইতেছিলেন, পুত্রের এই অমানুষিক ভীষণদর্শন দেহটা দুর্ব্বল পিতার প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিবে, এবং ইহাতেই হয়ত বিপদ ঘটিয়া যাইবে, কিন্তু ভগবানের দয়ায় তাহা হইল না। রুগ্ন বৃদ্ধ অতি আশ্চর্য্য ভাবে আপনাকে সামলাইয়া লইলেন।

পরদিন সকালবেলা নলিন আসিয়া পিতাকে দেখিয়া গেলে জমিদার বাবু মালতীকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা, যদ্দিন ও আসেনি তদ্দিন ত এ চিন্তা ছিল না, এখন যে আমি কিছুতেই আর শান্তিতে মরতে পাচ্ছি না!—মা, ওকে কা'র হাতে দিয়ে যাই বল্,—ওকে যে আবার কি রোগে ধরেছে তা আমি দুদিনেই বুঝে নিয়েছি, হতভাগা আর দুবছরও হয়ত বাঁচবে না, কিন্তু কি যন্ত্রণাটা পেয়েই ও যাবে! আহা, মা,—এত টাকাকড়ির বদলেও কি একটা লোক ওর জন্যে পাওয়া যেতে পারে না! কে ওকে দেখবে তবে,—বল্,—আমার যে আর এ যন্ত্রণা সইছে না, মা।

মালতী রুদ্ধস্বরে বলিল, "মেসোমশায়, কেন ভাবছেন,—পয়সা দিলে কি লোকের অভাব হয়?"

"সেও আমি বুঝে নিয়েছি মা, আমি ত নিজে জমিদার, টাকার লোভেও কে আমায় দেখেছে মালতী? তোর মত মা যদি না পেতুম,—বিনা সেবায় বুঝি প্রাণটা হারাতে হ'ত, টাকা কড়িতে কি আপনার লোক মেলে মা! আর, ওর কাছেও ত কেউ আসতে চাইবে না!"

মালতী নীরবে সজল নয়নে বসিয়া রহিল। জমিদার বাবুর সেই পূর্ব্বের যন্ত্রণা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে,—তিনি মাঝে মাঝে অস্থির ভাবে ঘাড় নাড়িয়া অসহ্য যন্ত্রণাটা প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন, মালতী চাহিয়া রহিল, কিন্তু কি করিবে! এ যন্ত্রণার কারণ সে বুঝিল কিন্তু ইহার নিবৃত্তির উপায় সে কি করিতে পারে?

সন্ধ্যার পর ডাক্তার বলিলেন, "অবস্থাটা ভাল বোধ হচ্চে না, মনের উপর হঠাৎ বড্ড চোট লেগেছে, এ সময়টায় আর নলিন বাবুর না আসাই ভাল ছিল,—অবিশ্যি এবারে যাবেন যে সেত জানা কথাই ছিল, তবে কি না, নতুন করে এ ব্যথাটা বেশি লেগেছে।"

নলিন পিতাকে দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে ঘরে আসে বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ তাহাকে সে ঘরে থাকিতে দেওয়া হয় না,—সে যেন অবস্থাটা ঠিক বুঝিতে পারে না, মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি তাহার কোন লোপ পাইয়া গিয়াছিল, কারণে অকারণে সে নানা কথা বলিয়া, নানাভাবে অঙ্গভঙ্গী করিয়া বিকট স্বরে হাসিতে থাকে,—পিতার রোগের গুরুত্ব তাহাকে বারে বারেই বুঝাইয়া দিতে হয়, এবং সে যে গৃহে আসিয়াছে, গৃহস্থের সংসারে আসিয়াছে, বাহিরের বাজে লোকের মত ইহারা নয়, সে কথাও তাহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে হয়। নলিনের অবস্থা দেখিয়া পাড়ার লোকে করুণা অনুভব করে,—বাড়ীর ঝি চাকরেরা হঠাৎ কখনও তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলে প্রাণপণে ছুটিয়া পলায়ন করে। কিন্তু মানুষের অন্তর্য্যামীই শুধু জানেন একমাত্র কাহার অন্তরেই এই দীন হীন দুশ্চরিত্রটার জন্য বেদনার ঝড় প্রবলভাবে বহিতেছে, এবং কাহার একখানি প্রেম-করুণ তরুণ হৃদয় ভেদ করিয়া রক্তগঙ্গার স্রোত নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে!

দেবতা যতক্ষণ দূরে দৃষ্টির অগোচরে থাকেন, পূজারী ততক্ষণই তাঁহাকে কল্পনার মূর্ত্তিতে গড়িয়া আপন ইচ্ছামত পূজা করিয়া যায়, কিন্তু যখন তাঁহার কঠিন পাষাণমূর্ত্তি কাছে আসিয়া ধূলায় গড়াগড়ি যায়, মানুষের ভক্তি তখন ঘৃণায় পরিণত হয়, কিন্তু যদি আবার তাঁহাকে তুলিবার ভার তাহারই উপর পড়ে তবে সে উন্মাদ হইয়া যায়। মালতীর অবস্থাও ঠিক সেইরূপই হইল, তাহার স্বপ্নের জিনিষ দিনের আলোতে যে কুৎসিত হইয়া দেখা দিয়াছে, চক্ষু মুদিয়া আর ত তাহাকে

দেখা যায় না, কিন্তু চক্ষু খুলিলে সম্মুখে এ তাহার কি প্রতিরূপ! আবার এদিকে স্নেহ-দুর্ব্বল আসন্ন মরণোন্মুখ পিতার সঙ্কোচে কুণ্ঠিত নীরব মিনতিটী মালতীর বুকে যাইয়া পৌঁছিয়াছিল,—মালতী দিশাহারা হইয়া গেল। এই বিপদের দিনে কে জানে তাহার কি কর্ত্তব্য! সংসার যখন ছিল না, তখন সংসারের রূপ একখানি অতিসুন্দর ছবির ন্যায়ই তাহার কল্পনার চোখে ফুটিয়া উঠিয়া তাহারই মোহে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিত, কিন্তু আজ তাহারই একি ভয়াবহ রূপ মুখব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে আসিতেছে!—আজ সে কি করিবে?

পলকে পলকে, প্রহরে প্রহরে রাত্রি কাটিতে লাগিল। শেষ রাত্রিতে তন্দ্রার মধ্যে কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া বৃদ্ধ জমিদার বাবু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, মালতী চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে লাগিল এবং ঘরের অন্যান্য শুশ্রূষাকারীরা সভয়ে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ জমিদার বহুকষ্টে আপনাকে সামলাইয়া যেন এদিক ওদিক চাহিয়া নলিনকে খুঁজিতে লাগিলেন, নরেন উঠিয়া পাশের ঘর হইতে তাহাকে জাগাইয়া আনিল। নলিন আসিয়া কাছে বসিলে পিতা অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তাহার হাতদুটী বুকে চাপিয়া ধরিলেন, এবং তাঁহার চক্ষু বাহিয়া অনর্গল ধারায় জলস্রোত গড়াইয়া চলিল। কয়েক মিনিট কাটিয়া গেলে, কি একটা কথা অস্পষ্টভাবে বলিয়া তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, দুই তিনবার বলার পর বোঝা গেল,—বৃদ্ধ পুত্রের নিরাশ্রয় অবস্থা চিন্তা করিয়াই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন ঘরে প্রায় দশ পনর জন লোক,—মালতী সবারই মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, একবার মাথা তুলিয়া নলিনের মুখও দেখিয়া লইল, এবং তাহার পর উপুড় হইয়া মেসোমহাশয়ের মুখের কাছে মুখ নিয়া জোরে জোরে বলিল, "কেন এত কষ্ট পাচ্ছেন মেসোমশায়, নলিনদার সেবার ভার আমি নিলুম মেসোমশায়; সে আদেশ একবার নিজের মুখে দিয়ে যান—"

জমিদার বাবু সহসা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিয়া মালতীর দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে—যেন কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্যই— চাহিয়া রহিলেন, এবং তাহার পর নিজের কম্পিত বাঁ হাতখানি তুলিয়া মালতীর হাত ধরিয়া তাঁহারই বুকে নলিনের শুষ্ক কঠিন হাতের উপর রাখিলেন। মালতীর সারা দেহেমনে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের শিহরণ বহিয়া গেল, সে প্রাণপণে চক্ষু মুদিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

জমিদার বাবু তেমনিভাবে নলিন ও মালতীর হাত বুকে রাখিয়া এবং আপনার এই শেষ ইচ্ছা সম্পাদনের ভার তার ভাগিনেয় নরেনের উপর দিয়া যেন অত্যন্ত আরাম অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে ঘুমাইতে লাগিলেন। সেইদিন সূর্য্যাস্তের সময় গৃহে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস পড়িয়া তাঁহাকে চির-মুক্ত করিয়া দিল।

(১৮)

পিতার মৃত্যুর পর নলিন সহসা যেন কেমন হইয়া পড়িল। দুই দিন দুই রাত্রি সে পিতার ঘরে মাটিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, কেহ তাহার সম্মুখে আসিল না এবং আসিতে সাহসও করিল না। তৃতীয় দিবসে মালতী উঠিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। বহু দিন পরে আজ—দীর্ঘ সাত বৎসর পরে আজ—নলিন উঠিয়া বসিয়া পিতার খাটে মাথা রাখিয়া পিতামাতার জন্য বড় কান্নাটাই কাঁদিল।

সে দিন সন্ধ্যার সময় নলিন আবার তাহার কলিকাতার বাসস্থানে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, মালতী অত্যন্ত কোমলভাবে বহু অনুনয় করিয়া বলিল,— "আর সেখানে কেন নলিনদা,—এই ত তোমার নিজের বাড়ী,—এত টাকা মেসোমশায় রেখে গেছেন সে কার জন্যে তবে?"

নলিন উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "সে আমার নয় মালতী, সে তোমার,—এ বাড়ীতে আমি কোথাও শান্তি পাবনা, আমায় যেতেই হবে।"

মালতী রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "সে টাকা তোমারই জন্য মেশোমশায় আমার কাছে রেখে গেছেন যে। নলিনদা, কক্ষণো তোমায় আমি যেতে দেব না, আমি কাছে থেকে আবার তোমায় মানুষ করে তুলবো। নলিনদা একবার ত তুমি আমায় চেয়ে ছিলে, আজ নিজেই যদি এলুম, কেন তবে তুমি ফিরিয়ে দিতে চাও?"

নলিন কতকটা বুঝিয়া কতকটা বোধহয় না বুঝিয়া বিস্মিত

হইয়া চাহিয়া রহিল, এবং ক্ষণকাল পরে সহসা চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, "মালতী, তুমি? কিন্তু একদিন যখন আমার সারা মন প্রাণ তোমরই আশায় পাগল হয়ে উঠেছিল, সেদিন কেন তবে আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলে?—তা না হলে বোধ হয়, মালতী, আজ এ অবস্থা আমার হ'ত না;—আমার সে আশা অসম্ভবও ছিল না, তার ক'দিন পরেই আমাদের পাশের গাঁয়ের হরিদাস মিত্তিরের বিধবা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। মালতী, এ অবস্থা বোধ হয় আজ তা'হলে হ'ত না, আমি মানুষ হ'তে পারতুম, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এমন করে পথের ধারে পড়ে থাকতে হ'ত না আমার।"

নলিন নিতান্ত সহজ গলায় কথাগুলি বলিয়া এক গেলাস জল নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল, এবং বিস্ময়ে দুঃখে অবাক হইয়া মালতীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষুর সে দৃষ্টি মালতী সহসা সহিতে পারিল না, সে চক্ষু নত করিয়া বলিল, "নলিনদা, সেদিন ত তুমি আমায় চাওনি, তোমার উচ্ছৃঙ্খল কলুষিত বাসনাটাই আমায় চেয়েছিল। তাতে আর কোন আপত্তি যদি বা মিটে যেত, আমরা নিজেরা কখনো সুখী হতে পারতুম না, নলিনদা! কিন্তু আজই তোমায় আমার দরকার। নলিনদা, তোমায় কক্ষণো আজ আমি যেতে দেবোনা। নলিনদা, মেসোমশাই শেষ অনুরোধ, শেষ আদেশ করে গেছেন আমায়, তোমার ভার আমাকেই নিতে হবে। তাঁরই আদেশে তোমায় আমি এ ঘরে আমার কাছেই ফিরিয়ে আনবো। তোমার কোন কথা আমি শুনবো না আজ। নলিনদা——"

নলিন বাধা দিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "সে কিছুতে সম্ভব হ'বার নয়। মালতী, আজ আমার কি আছে? আমার স্বাস্থ্য নাই, পা নাই, আমার হাত নাই,—আমি আজ জাতি ভ্রষ্ট। সব চেয়ে বড় কথা, আমি চরিত্রটাও হারিয়ে ফেলেছি, তোমায় নিয়ে আমি কি দেবো, মালতী?"

মালতী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল এবং তৎক্ষণাৎই মুখ তুলিয়া বলিল, "তাই ভাল নলিনদা আজ তোমার ঐ খোলা খুলি সত্য কথাটিই শুনতে চাই, তুমি আমায় কিছুই দিতে না পার যদি, কৃত্রিমতা ত দেবেনা, নলিনদা, তোমার আজ কিছুই নেই, তুমি আজ পঙ্গু, দরিদ্র কাঙ্গাল, —তাই তোমায় আবার আজ দরকার। আর কিছু নাই দিতে পার যদি, সেবার অধিকারটাই শুধু দিও, তাতেই আমি তিল তিল করে তোমায় পাব। সবাই যা পায়, তা যদি আমায় না দিতে পার, চাই না কিছু, কিন্তু তোমায় পাবার স্থায্য অধিকারটা আজ আমায় দিতেই হবে।"

মালতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, সে আপনার অজ্ঞাতসারেই সরিয়া আসিয়া নলিনের পা দু'খানির উপর মাথা পাতিয়া দিল।……

মোহাচ্ছন্ন নলিনের প্রকৃতিতে যে স্নেহ পরায়ণ উদার যুবকটী এতদিন ঘুমাইয়া ছিল, বহুকাল পরে আজ সে সহসা জাগিয়া উঠিয়া অশ্রুর প্রবল বন্যায় মালতীর দেহ ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

সমাপ্ত

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

[শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিবার জন্য অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে যে প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছি, অন্য কোন লেখকের উপন্যাস অভিনয় কালে সে আগ্রহ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস এক সময়ে থিয়েটারে বেশ চলিয়াছিল;
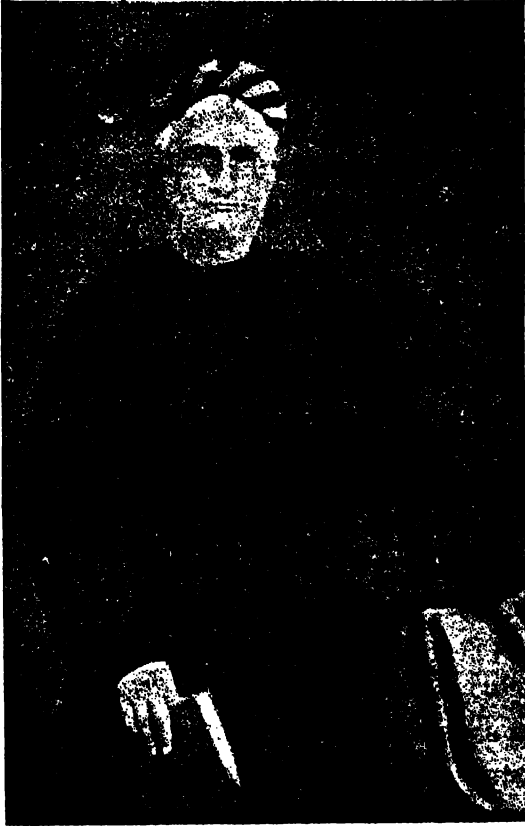
বঙ্কিমচন্দ্র

কিন্তু সে চলা বঙ্কিমের কাছাকাছি যায় নাই। পুনরভিনয়কালে দেখা গিয়াছে, বঙ্কিমের উপন্যাস যেমন, যখনই খোলা যায় তখনই নূতন, রমেশচন্দ্রের কিম্বা অন্য কাহারও উপন্যাস তেমন আগ্রহোদ্দীপক হয় নাই। আর এক কথা, বাঙ্গালার সকল থিয়েটারই বঙ্কিমের উপন্যাসকে যেন নিজেদের একটা গর্ব্বের সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। অর্থাগম হিসাবেও বঙ্কিমের অনেক উপন্যাসই বাঙ্গলার বহু নাটক উপন্যাসকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ষ্টারের "চন্দ্রশেখরে" "বাদুড় ঝুলিত"—ইহা প্রবাদের মতই চলিয়া আসিয়াছে। ক্লাসিকে "ভ্রমরের" বিক্রয় এখনও অনেকের স্মরণ আছে। এমারেল্ড থিয়েটার খুব দুর্দ্দশার দিনে "কপালকুণ্ডলা" খুলিয়া তখনকার আসর জমাইয়া দিয়াছিল। বঙ্কিমের এমন অনেক উপন্যাসেরই নাম করা যাইতে পারে যাহা থিয়েটারের অনেক মেঘ কাটাইয়া দিয়াছে। এ সৌভাগ্য আজ পর্য্যন্ত কোন উপন্যাসকারের দেখি নাই।

অভিনেতা অভিনেত্রীরাই বা কেন এত বঙ্কিমের উপন্যাসের পক্ষপাতী, এইবার সেই কথাই বলিব। রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে, প্রায় সব থিয়েটারেই পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ই বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক কিম্বা অন্য ধরণের নাটকও অভিনীত হইত, যেমন:—প্রবীন নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অশ্রুমতী" বা "সরোজিনী," কিম্বা স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ দাসের "শরৎ সরোজিনী" বা "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" ইত্যাদি। রামায়ণ মহাভারত বা কৃষ্ণ-লীলাকে ছাড়াইয়া কিন্তু কোন সুরই তখনকার নাট্যশালায় স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এই পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে যখনই দর্শক ও অভিনেতারা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তখনই বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসের প্রতি রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টি পড়িয়াছে। রাম, লক্ষণ, ভীম, অর্জ্জুন, সীতা, দময়ন্তী, কলি, শনি, বিভীষণ, রাবণ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র,হিন্দু দর্শকগণ সত্য বলিয়া গ্রহণ

করিলেও, অভিনেতা অভিনেত্রীরা কখনও ইহাদের সত্য রূপ ধারণা করিতে পারেন নাই। এ যুগে এই সব মানবের চরিত্র কল্পনা-রাজ্যে যতটা স্থান অধিকার করে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলাইতে গেলে, এই ধূলার ধরণীতে তাঁহাদের স্বর্গীয় আদর্শ ততটা স্থান প্রাপ্ত হয় না—কখনও পাইবে বলিয়া আশাও নাই। কাজেই মানুষের পক্ষে তাঁহাদের সত্য রূপ ঠিক ঠিক ফুটাইয়া তোলা যে নিতান্তই অস্বাভাবিক তাহাতে সন্দেহের অবসর নাই! অভিনেতার পক্ষেও যেমন বিপদ, তেমনি পৌরাণিক অবদান লইয়া নাটক বা কাব্য লিখিতে গেলে কবিরও তেমন কম বিপদ হয় না। এই ইংরাজী যুগের আদি কবি—মাইকেল মধুসূদন পুরাণকে আদর্শ করিয়া কাব্য লিখিতে গিয়া হিন্দুর দৃষ্টিতে তাহা যথোপযুক্ত মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার এই অপূর্ব্ব কাব্যে, চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায়, এক শ্রেণীর পাঠকের চক্ষে এই দাগ বড়ই সুস্পষ্ট দেখায়। একা গিরিশচন্দ্রকেই আমরা পৌরাণিক নাটকে বা দৃশ্যকাব্যে ধরণীর ধূলা মিশাইতে দেখি নাই। ইংরাজী অনুকরণে নাটক লিখিতে গিয়া, বস্তুতন্ত্রের প্রেরণায়, অধুনা অনেক কবিকেই কিন্তু আমরা পুরাণে কোরাণে মিশাইতে দেখিয়াছি। তাই নবীনচন্দ্রের পৌরাণিক কাব্যগুলি বেদব্যাসের মহাভারত না হইয়া, উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত হইয়াছে। আর এই জন্যই বোধ হয় অনেক পৌরাণিক আদর্শ চরিত্র ইংরাজী নাটকের নায়কের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সীতা সাবিত্রী দেবীত্ব হারাইয়া ইংরাজী বিবির নকলে, মাত্র গাউন ছাড়িয়া শাঁখাসাড়ী পরিয়া দেখা দিয়াছেন। রাম লক্ষণকেও রামায়ণের উচ্চ আদর্শ হইতে টানিয়া আনিয়া আমাদেরই মত মানুষের স্তরে নামানো হইয়াছে। নট-নটীর পক্ষে খাঁটি পৌরাণিক চরিত্রের স্বাভাবিকতা রক্ষা ও রূপ-কল্পনা যেরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে, এ্যাংলো-পৌরাণিক চরিত্রও তেমনি তাহাদের মনোমত হয় না। দর্শকগণও বরং যথাযথ পৌরাণিক চরিত্রের অভিনয়ই ভক্তিনত-হৃদয়ে উপভোগ করিয়া থাকেন কিন্তু হ্যামলেটের মত ভীষ্ম বা রোমিওর মত নল কিম্বা জোয়ান অফ্ আর্কের মত দ্রৌপদী দেখিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগে, অবশ্যই পুরাণ বাদ দিয়া থিয়েটার করা একরূপ অসম্ভবই ছিল; কারণ যাত্রাপ্লাবিত দেশে "যাত্রা শোনায়" অভ্যস্ত দর্শক-বৃন্দকে, ক্রমশঃ পুরাণের মধ্য দিয়াই "নাটক দেখিবার" জন্য প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাঙ্গলা সাহিত্যে "রথ

গিরিশচন্দ্র

ও পথ" দুই-ই প্রস্তুত করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রকেও তেমনি এই বাঙ্গলাদেশে নট,নাটক ও দর্শক, এই তিনকেই প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। এই ধারাবাহিক পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মুখ বদলাইযাছে—বঙ্কিমের উপন্যাস অভিনয় করিয়া। আর এই জন্যই বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চ বঙ্কিম-চন্দ্রের এত পক্ষপাতী।

বেঙ্গল থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ৺ শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং অধ্যক্ষ ৺বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" ও "মৃণালিনী" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় করেন। পরে গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমের দুই একখানি

পুস্তক ভিন্ন প্রায় সকল উপন্যাসই নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া, অভিনয় করিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্র বা বিহারীলাল কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত "দুর্গেশ-নন্দিনী" "মৃণালিনী" এখন আর চলে না। গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত "দুর্গেশ-নন্দিনী" "মৃণালিনী" "সীতারাম" প্রভৃতি এবং নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের "চন্দ্রশেখর" "রাজসিংহ" "বিষবৃক্ষ" বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এখনও শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে। স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চের জন্য যে তিনখানি উপন্যাস—"কপালকুণ্ডলা," "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "বিষবৃক্ষ" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন, তাহার মধ্যে এক "কপালকুণ্ডলা" ভিন্ন আর দুইখানির অস্তিত্ব এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতুলবাবুর "কপালকুণ্ডলা"র মধ্যেও আবার অনেক স্থলেই গিরিশচন্দ্রের লেখা মিশিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা থিয়েটারে শত শত নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজো পর্য্যন্ত বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীদিগের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যত বড় প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রীই হৌন না কেন, যত বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় যত দক্ষতার সহিতই করুন না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কোনও উপন্যাসের উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা দক্ষতার সহিত যাঁহারা অভিনয় না করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পূর্ণরথী বলিয়া স্বীকার করা উচিত নয়। অবশ্য ইহা প্রাচীন দলের অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথা। তাঁহাদের মধ্যে যেমন শুনিয়াছি তেমনই লিখিতেছি। একথা তাঁহাদের প্রমাণ-সহ কিনা জানিনা, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যে অসাধারণ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রেরও যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল, তাহার পরিচয়ও আমরা নানাভাবে পাইয়াছি। মাইকেল, দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র এবং নিজের রচিত নাটকাবলী ভিন্ন, গিরিশচন্দ্র কেবল এক বঙ্কিমের উপন্যাসেই বহু ভূমিকা বহুবার সাগ্রহে অভিনয় করিয়াছেন।

অবান্তর হইলেও এখানে গিরিশচন্দ্রের "সাজা" সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিতেছি। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ একবার "অশ্রুমতীতে" "রাণা প্রতাপ" সাজিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন, গিরিশচন্দ্রও সম্মত হন। অভিনয়কালে কিন্তু তৃতীয় অঙ্কের পরে তাঁহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। রঙ্গমঞ্চে সাড়া পড়িয়া গেল, খোঁজ, খোঁজ, কোথায় "রাণা প্রতাপ"! "রাণা প্রতাপ" তখন হল্‌দি ঘাটের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া, বাগবাজারে আসিয়া একেবারে নিজের বাড়ীর বৈঠকখানায় আশ্রয় লইয়াছেন। পরদিন প্রাতে পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করায় গিরিশচন্দ্র বলিলেন—"দেখ, রিহার্সালে তখন অতটা বুঝতে পারি নাই, প্লে করতে করতে

মহেন্দ্রলাল বসু

দেখলাম, "রাণা প্রতাপের" মেয়ে "অশ্রুমতী" সেলিমের জন্যে পাগল, সে রঙ্গমঞ্চে শক্তসিংহকে উচ্চকণ্ঠে বলছে, "কাকা, সেলিম" "কাকা,—সেলিম"! তখনই মনে হ'ল এ মেয়ের বাপ সাজা একটা বিষম সাজা; সে সাজা সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে এসেচি; ব'লে এলে ছেড়ে দিতনা।" আর একবার তাঁহাকে ৺ অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "রকম ফেরে" বাধ্য হইয়া মাত্র এক রাত্রির জন্য একটী ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই

কয়জন নাট্যকার ভিন্ন অন্য কোনো নাট্যকারের পুস্তকে তাঁহাকে আর কোন ভূমিকা গ্রহণ করিতে শুনি নাই। "দুর্গেশনন্দিনীতে" জগৎ সিংহ, "কপালকুণ্ডলায়" নবকুমার, "সীতারামে" সীতারাম, "বিষবৃক্ষে" নগেন্দ্র দত্ত, "চন্দ্রশেখরে" "চন্দ্রশেখর", বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বহুবার তাঁহার প্রতিভাস্ফুরণের আশ্রয় হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যে এই সকল বিভিন্ন জটিল চরিত্রের অভিব্যক্তি রসশিল্পের মধ্য দিয়া যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। বাঙ্গলার অধিকাংশ নট নটী তাঁহারই প্রদর্শিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আজিও শিক্ষালাভ এবং যশ অর্জ্জন করিতেছেন। গিরিশ চন্দ্রের শিক্ষাদানকালেও লক্ষ্য করিয়াছি, যে উৎসাহ লইয়া তিনি বঙ্কিমের উপন্যাসের রিহার্সেল দিতেন, অন্যের নাটকের শিক্ষাদান কালে তাঁহার সে উৎসাহ লক্ষিত হইত না। কারণ, সে সব নাটকের চরিত্র চিত্রন তাঁহার কেমন ভাল লাগিত না। গিরিশচন্দ্রের বঙ্কিমপ্রীতি কতটা ছিল, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের একখানি হ্যাণ্ডবিল হইতে, যতদূর স্মরণ হয়, দুই এক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। মিনার্ভায় সীতারাম অভিনয়ের প্রথম রজনীর হ্যাণ্ডবিলে তিনি লিখিয়াছিলেন "Quarter of a century ago, I tried my prentice hand to dramatise the works of this immortal author."

গিরিশচন্দ্রের গঠিত সম্প্রদায়ে অভিনেতা অভিনেত্রীরা বঙ্কিমের উপন্যাস বর্ণিত চরিত্রের অভিনয়ে, বাঙ্গলার দর্শকবৃন্দকে যে রস পরিবেশন করিয়াছেন, ভুক্তভোগী কখনও তাহা ভুলিবেন না। গিরিশচন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দিন, মহেন্দ্রলালের "নবকুমার", "গোবিন্দলাল", "নগেন্দ্রনাথ" প্রভৃতি দেখিলে মনে হইত যেন বঙ্কিমের ঐ সমস্ত নায়ক চরিত্র তাঁহার জন্যই অঙ্কিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রের মুখে শুনিয়াছি, শোভাবাজার রাজবাটীতে মহেন্দ্রলাল বসুর "নবকুমারের" অভিনয় দেখিয়াই তাঁহার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবার বাসনা জাগরিত হয়। এই অভিনয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন গিরিশচন্দ্র। এই অভিনয়ের সহিত গিরিশচন্দ্রের এক অসাধারণ শক্তির পরিচয় আমরা লাভ করি। অভিনয়ের জন্য সকলেই প্রস্তুত, এমন সময় দেখা গেল, "কপালকুণ্ডলার" খাতাখানি নাই। বুঝা গেল এই সম্প্রদায়কে অপদস্থ করিবার জন্য, বিপক্ষদলের কেহ উহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় খাতাও নাই; দর্শকে বাড়ী ভরিয়া গিয়াছে, অথচ বই নাই; অভিনেতারা সকলেই বিপন্ন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র দমিলেন না। তিনি তখনই একখানি "কপালকুণ্ডলা" পুস্তক আনাইয়া বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, আমি মুখে ড্রামাটাইজ করিয়া প্রম্‌ট্‌ করিতেছি, তোমরা উৎসাহের সহিত প্লে কর"। হইলও তাহাই; গিরিশচন্দ্র পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, মুখে মুখে ড্রামাটাইজ করিয়া প্রম্‌ট্‌ করিলেন; আর তাঁহার সুদক্ষ শিষ্যগণও এমনি নিপুণতার সহিত অভিনয় করিলেন যে দর্শকগণ বিন্দুমাত্র ব্যাতিক্রম বুঝিতে পারিলেন না। সুকুমারী দত্তের "বিমলা", "গিরিজায়ার" অভিনয় দেখিয়া, প্রবাদ আছে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছিলেন, "আজ বিমলা, গিরিজায়াকে জীবন্ত দেখিলাম।" সুকণ্ঠ অমৃতলালের "চন্দ্রশেখরে," সেই হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপ "সনাতন, আবার সংসার" যেন এখনও কর্ণে ঝঙ্কার তুলিতেছে। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীর "মনোরমা" যাঁহারা দেখিয়াছেন—"আমি পুকুরে হাঁস দেখিগে গো"—তাঁহারা কখনও তাহা ভুলিবেন না। অমরেন্দ্রনাথের "গোবিন্দলালও" কম উল্লেখ যোগ্য নহে। "সীতারামে" তিনকড়ির "শ্রী"---বৃক্ষশাখায় দাঁড়াইয়া মনোমোহিনী মূর্ত্তি---"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"—সেই উত্তেজনা ব্যঞ্জক ধ্বনিও ভুলিবার নহে। জীবিত অভিনেত্রীর মধ্যে একমাত্র বিনোদিনী ব্যতীত আর কাহারও নাম উল্লেখ করিলাম না। রঙ্গমঞ্চে এই যে বিভিন্ন রসের অভিব্যক্তি দেখিবার সুযোগ আমরা পাইয়াছি, ইহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র; আর এই রস বিকাশের শিক্ষক ও গুরু গিরিশচন্দ্র।

রঙ্গমঞ্চের উপর বঙ্কিমের প্রভাব যে ভাবে কার্য্য করিয়াছে, দর্শক, অভিনেতা ও নাট্যমঞ্চের দিক হইতে যাহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি তাহাই বলিলাম। উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে কিছু কিছু যোগ বিয়োগের প্রয়োজন হইয়াই থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে গিয়া গিরিশচন্দ্রকেও সেইরূপ যোগ বিয়োগ কিছু কিছু করিতে হইয়াছিল। চরিত্র ও রসের ব্যাঘাত না করিয়া কিরূপ দক্ষতার সহিত তিনি সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, প্রবন্ধান্তরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ফুট্ কড়াই

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু]

জবর উত্তর

কোন পল্লীগ্রামস্থ ভদ্রলোক রাস্তা সরল করিবার উদ্দেশে তাঁহার কোন প্রতিবাসীর শাকের ক্ষেতের মধ্য দিয়া প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। ক্ষেত্রস্বামী তাঁহার বাটির জানালা খুলিয়া প্রায়ই এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেন। একদিন নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় তিনি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাঁহার গ্রামবাসী ভদ্রলোকটিকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওহে, আমি যখনই জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াই, তখনই তোমায় ক্ষেত মাড়াইয়া চলিতে দেখি। এ কি রকম ভদ্রতা?"

ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "ওহে, আমি যখনই ক্ষেত মাড়াইয়া চলিয়া যাই, তখনই তোমায় জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইতে দেখি। এটাই বা কি রকম ভদ্রতা?" ক্ষেত্রাধিকারী নিরুত্তর।

খেয়ে দেখে নাও

ঢাকার কোন খ্যাতনামা উকীল বাহিরে মক্কেলদের মধ্যে যথেষ্ট আধিপত্য করিলেও, গৃহের ভিতরে স্ত্রীর নিকট ভৃত্য অপেক্ষা বাধ্য ছিলেন। একদিন বাজার হইতে অধিক মূল্যে কয়েকটি অম্লাস্বাদ আম্র কিনিয়া আনায় স্ত্রী ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "এই বুদ্ধি নিয়ে ওকালতি কর? আ কপাল আমার! সব আমগুলো টোকো বিষ। আমরা বাড়ীতে ফেরীওয়ালাদের কাছে যে জিনিষ কিনি, সব আগে চেকে চেকে পরখ করে' তবে নিই; তাই একটা সামগ্রীও খারাপ হয় না। শাম্‌লা চাপকান্ প'রে জজের সাম্‌নে বক্তিমে ঝাড়', আর এইটুকু বোঝ না যে কোন জিনিষ কেন্‌বার সময় খেয়ে দেখে নিতে হয়?"

ইহার কয়েক দিবস পরে একদিন এক বুড়ী উকীলবাবুর বাসায় কয়েক আঁটি ঝাঁটা বিক্রয় করিতে আসিল; উকীল মহাশয় তাহাকে বাটীর ভিতর সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া গিন্নী সমীপে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "আমি ত সেদিন না খেয়ে এনে তাহা ঠকেছিলাম, এবার তুমি খেয়ে দেখে পরখ ক'রে নাও!"

কোন্ লিঙ্গ

পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে পড়াইতে পড়াইতে প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন "অণ্ড অর্থ কি?"

একজন ছাত্র উত্তর করিল "আজ্ঞে—ডিম্ব।"

পুনরায় প্রশ্ন হইল, "কোন্ পদ?"

অন্য এক বালক উত্তর করিল, "আজ্ঞে বিশেষ্য পদ।"

পণ্ডিত মহাশয় এবার মুরারী নামক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে মুরো, অণ্ড কোন্ লিঙ্গ বল্ দেখি?"

মুরো ওরফে মুরারীমোহন গম্ভীরভাবে বলিল, "আজ্ঞে পণ্ডিত মশাই, বলতে পাল্লুম না, মাপ করুবেন!"

পণ্ডিত মহাশয় রাগিয়া বলিলেন, "কেন রে গাধা? শীঘ্র বল্—অণ্ড কোন্ লিঙ্গ? নইলে –"

মুরারী মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আধ-কান্না আধহাসির সুরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, ডিম্ না ফুট্‌লে কি ক'রে বল্‌বো তা স্ত্রীলিঙ্গ কি পুংলিঙ্গ?"

কৈকেয়ীর বর

কথক ঠাকুর।—তারপর কি না কৈকেয়ী ঠাকুরুণ মন্থরার সঙ্গে পরামর্শ করে রাজা দশরথের কাছে দুটি বর চাইলেন...

ত্রৈলোক্য পিসী।—ওমা, কথা শুনে ঘেন্নায় মরি—আহ্নিক করি। (জনৈকা সঙ্গিনীর প্রতি) ওলো পচি শুন্‌চিস্? নিঘিন্নে কেকঈ মাগীর বুকের পাটাখানা একবার দ্যাখ্। অমন বরের মত বর—রাজা দশরথ, তাঁর কাছে

আবার চাইতে গেলেন কি না আরও দু-দুটো বর! একটাতে বুঝি আর সানায় নি? তা চাইবি ত চাইবি, নিজের বরের কাছেই বর চাইলি? তাই শুনেই ত বুড়ো দশরথ রেগে-মেগে কেঁদে কেটে পটল তুল্লে।

পচি। চুপ কর্, তারপর কি বল্‌ছে শোন্ না পিসী! ...ওগো এ আমাদের 'ভাতার বর' নয়। এক বর চেয়েছিল—রামকে বনে পাঠাতে, আর এক বর চেয়েছিল—ভরতকে রাজা ক'রে দিতে!

ত্রৈলোক্য পিসী।—বুঝিচি লো বুঝিচি! ভাতার বর হলেন ত দশরথ; তারা ত লুকোনো বাইরের বর, ওন্নাম কি—উপ-বর। তাদেরও একবার বুকের পাটা দ্যাখ্। প্রথম বর ব্যাটা চায় আবার শ্রীরাম চন্দরকে বনে পাঠাতে! আহাহাঃ, তা না হ'লে মজা হবে কেন? দেখ্‌তে পাই ত অমন বরের মুখে সাতশ' মুড়ো খ্যাংরা মারি!

মনোহর মারাত্মক বিজ্ঞাপন

বৎসর তিন চার পূর্ব্বে একবার মাদ্রাজ প্রদেশ পরিভ্রমণ করবার্ সুযোগ উপস্থিত হয়। সেখানে অনেকগুলি অদৃষ্টপূর্ব্ব অসাধারণ মজার জিনিষ আমার নজরে পড়ে; তন্মধ্যে একটি হইতেছে—প্রত্যেক ছোট বড় দোকানের অপরূপ সাইন্‌বোর্ড ও সোবোর্ড। সেখানকার পান ওয়ালার দোকানেও একটা ছোটোখাটো ইংরাজী সাইনবোর্ড লটকান থাকা চাই, নচেৎ তার দোকানের অঙ্গহানি হয়! মাদ্রাজীরা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গোঁড়া ইংরাজী ভাষার ভক্ত; কিন্তু এই সকল সাইনবোর্ড ও বিজ্ঞাপনে যে মনোহর মারাত্মক ইংরাজী ভাষার পরিচয় দেওয়া হয়, তাহাতে বোধ করি নেস্‌ফিল্ড্ ও গদাধরকে গ্রামার কম্পোজিসন্ নূতন করিয়া শিখিবার দরকার হইয়া পড়ে। দুই একটা নমুনা দিতেছি। দেখুন—

1 **RAMEYOHHARAM NAIDU**

Happy Betel Marchent

Very monstruous betels, honey-sweat mineral watters, s da, Lemnad, Tonic given for small pice here. Every customers gladdens at use and never beaten by cheattings.

টিকা অনাবশ্যক!

2. **Kavirajasri Musalimuny Mudaliar**

F.R.G.H., C.D.L. (U.S A.), M P.R (Cal.) etc.

Formideble Aurvedik Physician

My **Sarvamritam** is a imperial disease-destroying factory used by big gentles of India. Try me. I am sure and gigantic dose. I work wonder when within your belly. I am to be taken once internally at night along with a little gingelly oil to easily gulp me down.

বুঝ সাধু যে জান সন্ধান!

3. **Mukbul Mohammed Khan**

Hair-mower and beautiful shaver!

Gentlemen's checks and throats are cut with very sharp razorr by careful coolnes. No irritating sensation feeled afterward. Plenty of powder and hair lotion like a morning motion. Trial solicitated.

বিজ্ঞাপন অনুযায়ী যদি কাজ হয়, তা হ'লেই চক্ষুস্থির আর কি!

একটী কথা

[শ্রীজগৎ ঘটক]

স্ত্রী জাতি নাকি অবলা ? ৩০শ সংখ্যার সচিত্র শিশিরে শ্রীমতী সফিয়া খাতুন বি, এ যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমি ষোল আনা মত দিতে পারি। তবে কিনা তিনি 'চরিত্র হীনে'র সরোজিনীকে লইয়া শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর যে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহাতেই আমাকে দু'একটী কথা বলিতে হইল।

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নাকি স্ত্রীলোকদিগকে পথের বাহির হইতে বারণ করিয়াছেন। পথের বাহির হইলে যে কি দুর্দ্দশা হয় (অথবা হওয়া উচিত) তাহাই সতীশের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন।

কিন্তু সত্য বলিতে হইলে শরৎবাবু সেরূপ কোন উদ্দেশ্য লইয়াই এরূপ কথা বলেন নাই। বরং তাঁহার অন্যান্য বই পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে তিনি স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার খুব বিপক্ষে নহেন। তাঁহার চিত্রিত সরোজিনীর অবস্থা দেখিয়া বরং এরূপ বলা যাইতে পারে যে তিনি স্ত্রীলোকদিগকে প্রকৃত শক্তিশালিনী হওয়ার পুর্ব্বে বাহির হইতে বারণ করিয়াছেন। এবং এই চিত্রটী তিনি স্ত্রীলোকদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতি কল্পে একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য নয় যে তিনি তাঁহারি দেশের মা বোনদিগের অপমান দেখিয়া মজা করিবার জন্য এরূপ চিত্র আঁকিয়াছেন। অন্যত্র, শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্বে দেখিতে পাই, যেখানে বর্ম্মদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পথিপার্শ্বস্থিত ইক্ষুদণ্ড গ্রহণান্তর গাড়োয়ানের পৃষ্ঠদেশে দারুণ প্রহার করিতেছে—শরৎবাবু—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের সহিত বর্ম্ম-দেশীয়া স্ত্রীলোকদিগের তুলনা করিয়া, এতদ্দেশীয়া স্ত্রীজাতির দুর্ব্বলতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমতী সফিয়া খাতুন কি বলিতে চান যে শরৎবাবু সে স্থলে একটা ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছেন ?

সরোজিনীর অবস্থা দেখিয়া সফিয়া খাতুন মহাশয়া না হাসিয়া থাকিতে পারেন নাই। বই পড়িয়া দৃশ্যটী সম্যক অনুভব করিবার পুর্ব্বে মাননীয়া লেখিকা দু'চার ঘা জুতা পটাপট্ মারিতে পারেন কিন্তু (ভগবান না করুন) বাস্তবিক যদি কখনও ওরূপ অবস্থা তাঁহার আসে তখন তিনিই আপনার কথা বিচার করিবেন।

জনৈকা সম্মানীয়া ভদ্রমহিলা কলিকাতার রাস্তা দিয়া গত বৎসর দোলযাত্রার সময় গাড়ীতে যাইতেছিলেন। এমন সময় কয়েকটী ভদ্র সন্তান রং দিবার জন্য তাঁহার গাড়ীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি সবলে গাড়ীর দরজাটী বন্ধ করিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলে দুর্ব্বৃত্ত ভদ্রসন্তানগণ জানালার খড়খড়ির ভিতর দিয়া তাঁহার গায়ে রং দিবার উদ্যোগ করিল। তখন তিনি বাহিরে লাফাইয়া পড়িলেন ও কোচম্যানের হস্তস্থিত চাবুক লইয়া বীরবালা-বেশে যখন সেইসকল লোকদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন তাহারা নিরীহ ভালমানুষের মত স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এরূপ স্থলে সফিয়া খাতুন মহাশয়ার বীর-দর্প খাটিতে পারে। কিন্তু সেই জনহীন অন্ধ তমসাচ্ছন্ন রজনী অপেক্ষাও ভীষণ স্থানে, নিরস্ত্র, সঙ্গীবিহীন অবস্থায় যদি কোন ভদ্রমহিলা চার পাঁচজন বলশালী 'ছাতুখোর' পশ্চিমবাসীর হস্তে পড়েন, তাঁহার অবস্থা যে তখন কিরূপ হয় তাহা কেবল তিনিই সম্যক বুঝিতে পারেন যিনি ওরূপ রাস্তা দিয়া কখনও গিয়াছেন। তাঁহার চীৎকার করিয়া লোকজন ডাকিবার অবসর নাই, তাহার উপর চীৎকার করিলেও কোন শব্দই সে ভীষণ বন্যা ভেদ করিয়া বাহিরে যাইতে পারিবে না। সরোজিনী কম কষ্টে পড়িয়া হতাশ হন নাই। সফিয়া খাতুন মহাশয়া বলিতে পারেন "আমি তাহাদের আক্রমণ করিতাম।" কিন্তু এই আক্রমণ করা কথাটা মুখে উচ্চারণ করিতে যত কষ্ট না হউক, কার্য্যক্ষেত্রে অনেক মহারথীদেরও পশ্চাৎমুখ হইতে দেখা গিয়াছে। সেখানে কলিকাতার গ্যাসের আলো নাই, মুক্তপথে গমনশীল ব্যক্তিবর্গের কথাবার্ত্তার শব্দ নাই—আছে শুধু নিস্তব্ধ জনমানব-শূন্য বিশাল অরণ্য, তাহার মাঝে উন্মত্ত ঝড়-বৃষ্টির লীলা, আর কয়েকজন গুণ্ডাশ্রেণীর পশ্চিমদেশীয় মাতালের উৎকট আনন্দ। সফিয়া খাতুন মহাশয়ার বোধ হয় এসব দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর ছিল না, কেবল সরোজিনীর কষ্ট দেখিয়াই তাঁহার প্রাণে sympathetic ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সরোজিনীর কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার বর্ণিত উপরের উদাহরণে বেশ বোঝা যায় যে ওই সকল ভদ্রসন্তান যদি উপযুক্তভাবে শিক্ষিত হইতেন তবে কখনই পথিমধ্যে ভদ্র-মহিলার সহিত ওরূপভাবে অভদ্রতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। পিতা অপেক্ষা মাতার হস্তে সন্তানাদির শিক্ষার ভার বেশী পড়িয়া থাকে। সন্তানাদি পালন ও শিক্ষার নিমিত্ত মাতাকে যে পরিমাণে শিক্ষিত হওয়া উচিত এ দেশীয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে বেশীর ভাগই তাহা নহে। অধিকন্তু বাল্যকাল হইতে স্ত্রী-পুরুষ যেরূপ কুসংস্কারে আবদ্ধ তাহাতে অনিষ্টের ভাগই শুধু বাড়িয়া চলিয়াছে। স্ত্রীলোক রাস্তার বাহির হইয়া একগলা ঘোমটার ভিতর হইতে পথিমধ্যস্থিত যুবকের প্রতি একটী কটাক্ষপাত করিলেন। ফলে যুবকটীর মনে যদিও কোনরূপ কু-ভাব না থাকে, একটী মাত্র কটাক্ষবহ্নি-প্রবাহে তাহার সমস্ত অন্তর খানি ঝলসাইয়া গেল।

ফলে সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে যে কীট প্রবেশ করিল তাহা তাহাকে চিরদিনের মত ধ্বংস পথে অগ্রসর করাইয়া দিল।

এই-যে ঘোমটার আড়ালে কটাক্ষপাত, ইহা মহিলাটির নিকট যত অস্বাভাবিক না হউক, বাহিরের লোকের নিকট ততোধিক অস্বাভাবিক। স্ত্রীলোকের জন্মগত কুসংস্কারগুলিকে দূর না করিলে তাঁহাদের এইসব সংস্কারও দূর হইবে না। যদি রাস্তায়ই বাহির হইব, তবে লম্বা ঘোমটার প্রয়োজন কি? অপরে মুখ দেখিবে? তাহাতে কাহারো বিশেষ ক্ষতি হইবে না; কিন্তু ওই যে ঘোমটার ফাঁক দিয়া একটুখানি দেখিয়া লওয়া, ইহা অপেক্ষা ক্ষতিকর বোধ হয় আর কিছু নাই। ইউরোপের সমস্ত সভ্যদেশে স্বাধীন স্ত্রীলোকেরা যে ভাবে ইতস্তত: ভ্রমণ করেন, আমাদের দেশ হইলে তাহা একটা মস্ত অপরাধের বিষয় হইত সন্দেহ নাই। সেখানে যুবকবৃন্দ সুন্দরী যুবতীগণের একটা মৃদু হাসি লাভের আশায় অসাধ্যসাধন করিতেও পরাঙ্মুখ নয় স্বীকার করি, কিন্তু এদেশের যুবকদের মত চৌর্য্যবৃত্তিশালী ও নীচ প্রকৃতির নয়।

কাহারও সহিত ক্রমাগত মিলন মিশ্রনে মানুষের মন তাহার বিষয়ে কিছু নূতন ধারণা করিতে পারে না। স্ত্রীজাতি যদি চিরদিন ধরিয়া পুরুষের সহিত মিশিতে পারিতেন তবে আজ কোন স্ত্রীলোক পথে যাইতে অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া ঘোমটা দিয়া সরিয়া যাইতেন না; অথবা ঘোমটার আড়াল হইতে একটীবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিছু অনাসৃষ্টি ঘটাইতে পারিতেন না। যদি স্ত্রী-পুরুষ প্রথম হইতেই সৎ শিক্ষালাভ করিয়া সহজভাবে চলিতে পারিতেন তবে আজ এত সমালোচনার প্রয়োজন হইত না। বৃদ্ধা কন্যাকে মা বলিলেন "ওরে, এখন আর ওঘরে যাস্‌নে কয়েকটী ভদ্রলোক আসবেন।" কন্যা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"কেন মা?" মা তাড়া দিয়া বলিলেন "কেন আবার কি? বারণ করলুম যা তাই শোন্।"

কন্যা আর প্রশ্ন করিতে সাহস পাইল না। তারপর ভদ্রলোকেরা যখন উপস্থিত হইলেন, কন্যা মার কথা স্মরণ করিয়া একবার ইতস্তত: চাহিল—কাহাকেও না দেখিয়া নিজের কৌতূহল দমন করিবার জন্য দরজার ফাঁক দিয়া একবার দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিতে পাইল সুন্দর সুশ্রী একটী পুরুষ। একবার মার কথা স্মরণ ও আর একবার ভদ্রলোকটীর মুখখানি স্মরণ করিতে করিতে কখন যে চিন্তা-স্রোত মেয়েটীর প্রাণের-কূলে একটা দাগ বসাইয়া দিল, সে জানিতেও পারিল না। মানুষের মন বড় সন্দেহ-প্রবণ। কোন কিছু জোর করিয়া বারণ করিলেই মন সেইদিকেই শিকল কাটিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। পিতামাতা শিশুকাল হইতেই সন্তানের প্রাণে এইভাবে কয়েকটী সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন জাগিয়ে দেন মাত্র—কিছুই বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন না—এই প্রকার শিক্ষার ফল যে কিরূপ তাহা পাঠক পাঠিকার বিচারের উপর নির্ভর করিলাম।

যাহাই হউক, শ্রীমতী সফিয়া খাতুন মহাশয়া স্ত্রী-পুরুষের চলন পদ্ধতির যে আলোচনা করিলেন তাহা খুবই সত্য। সুশিক্ষা দ্বারা বাল্যকাল হইতেই পুত্র-কন্যার সংস্কারের পরিবর্তন না হইলে ভবিষ্যতে যে বিষ-বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয় তাহা উৎপাটন করা বড় দুষ্কর হইয়া উঠে। যে শিক্ষা মানুষের কুসংস্কার দূর করিতে পারে না, মানুষকে অর্ব্বাচিন করিয়া তুলে, শরৎবাবু তাহাকেই দূর করিতে বলেন। যে শিক্ষা শুধু উপরটাকেই দেখায়, ভিতরটাকে ভুলিয়ে দেয়—সে শিক্ষা অপেক্ষা অশিক্ষা শ্রেয়:। সরোজিনী শুধু মেম সাহেবের চাল চলনই শিখিয়াছিলেন;—যে শিক্ষা স্বাধীনভাবে টম্‌টম্ হাঁকিয়ে বেড়াইতে শেখায় তাহাই শিখিয়াছিলেন। বিপদের সময় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে শেখেন নাই, অথবা বিপদে পড়িবার পূর্ব্বে নিজের অবস্থাটা ভাবিতেও শেখেন নাই। শরৎবাবু সেই চিত্রটীকেই সকলের সামনে ধরিয়াছেন, তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

বুদ্ধদেব—শুভজন্ম

"আনন্দে মূর্চ্ছিতা দেবী পড়িতে, ধরিলা করে
এক শাল-শাখা সুশোভন,

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৩রা শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [ষট্‌ত্রিংশ সপ্তাহ

যে সময়ের যা

ছেলেয় ছেলেয় কথা—
প্রতি কথায় দ্বন্দ্ব।

প্রতিভার পরিচয়—
প্রতি কথায় হয়।

যুবায় যুবায় কথা—
প্রতি কথায় হাসি।

বুড়োয় বুড়োয় কথা—
প্রতি কথায় কাশি।

প্রাচীন য়ুরোপীয় নৃত্যপ্রথা

(১৮৫৩ খৃঃ প্রকাশিত, Read's Characteristic Dances of all Nations গ্রন্থ হইতে)
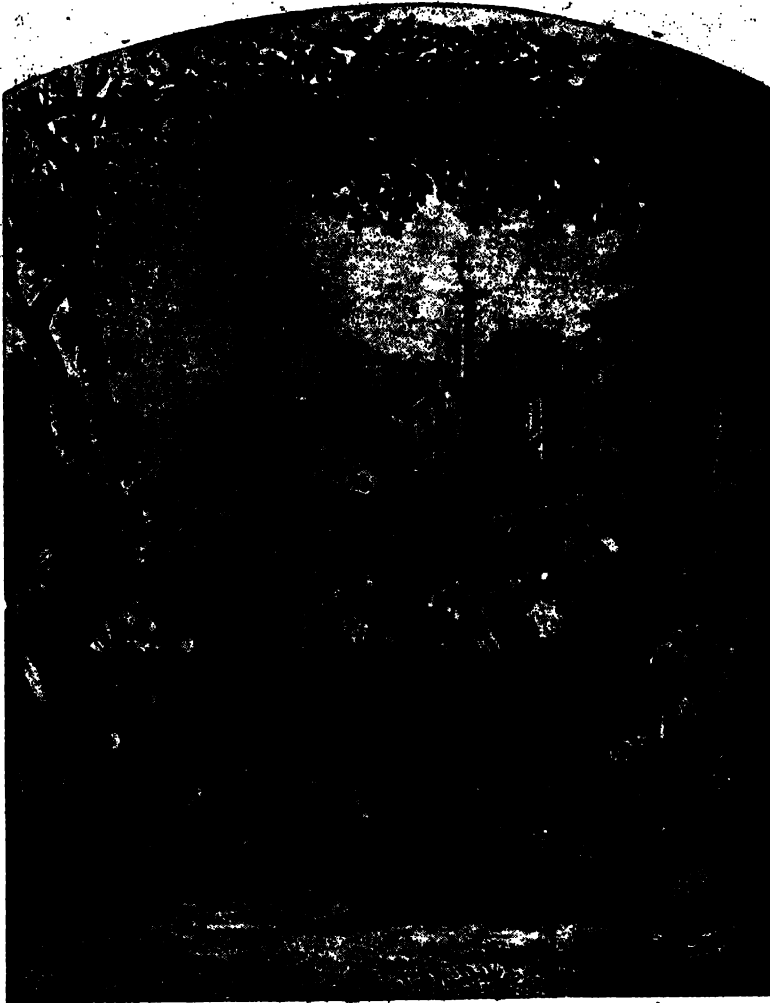
সুইটজারল্যাণ্ড মনফ্রেমা নৃত্য
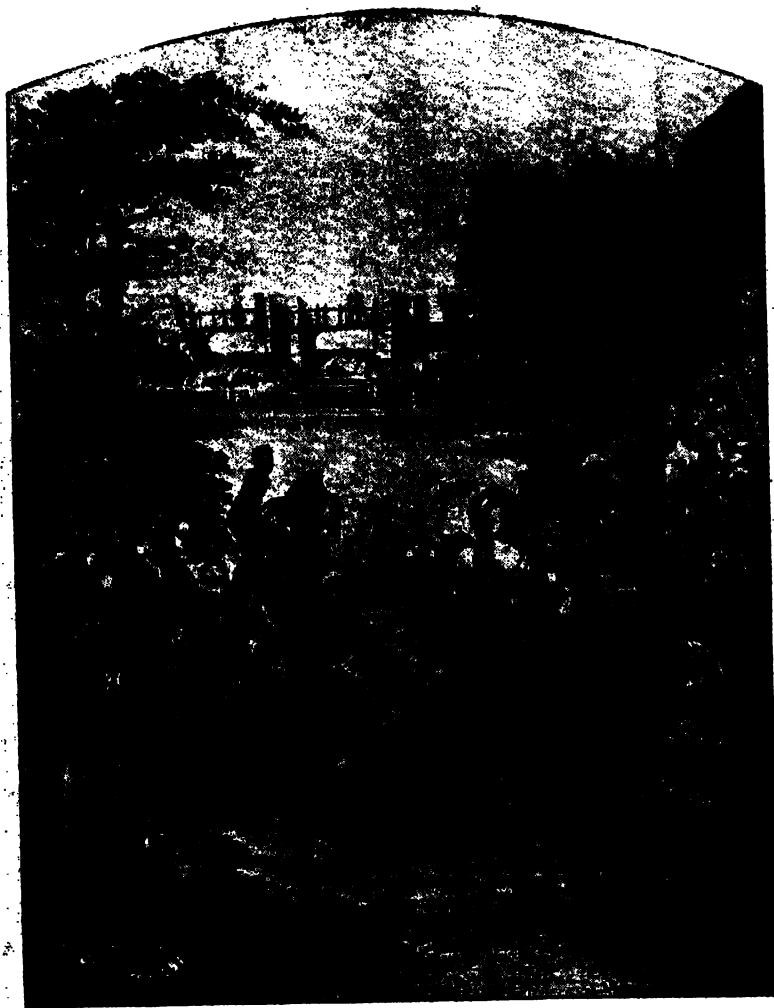
কটনাও। হাইনাও নৃত্য

প্রাচীন ইংলণ্ডের মে-পোল নৃত্য

স্পেন। ফান্ডাগো নৃত্য

গ্রীস। জাতীয় ওয়াণ্টজ নৃত্য

আয়রল্যাণ্ড। জিগ নৃত্য
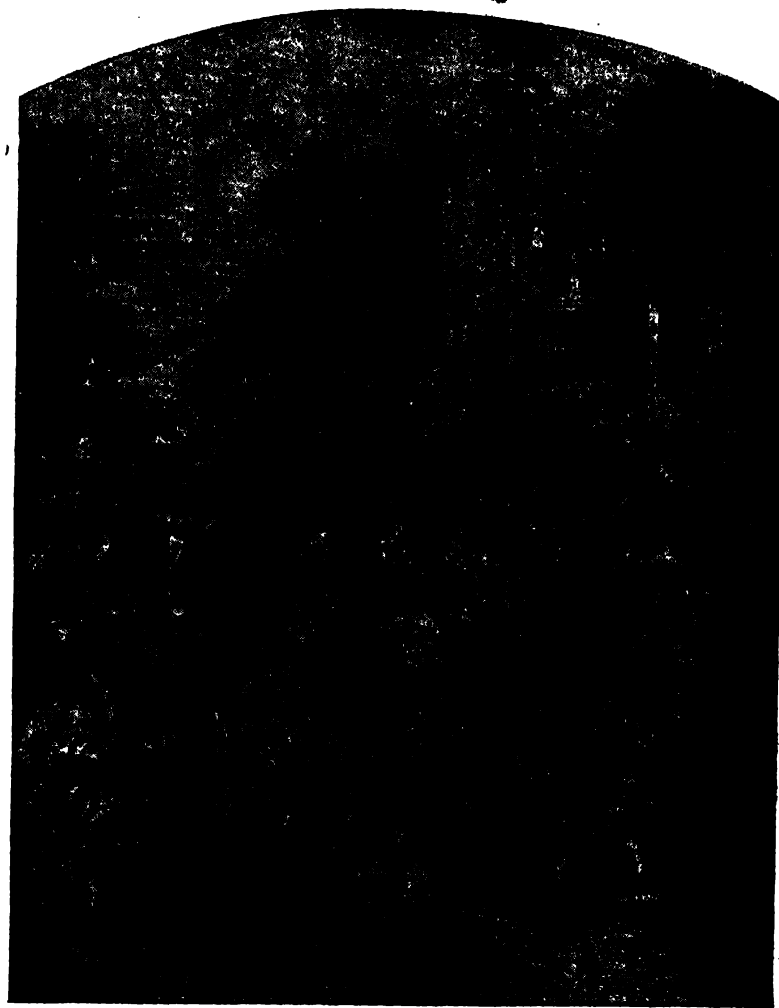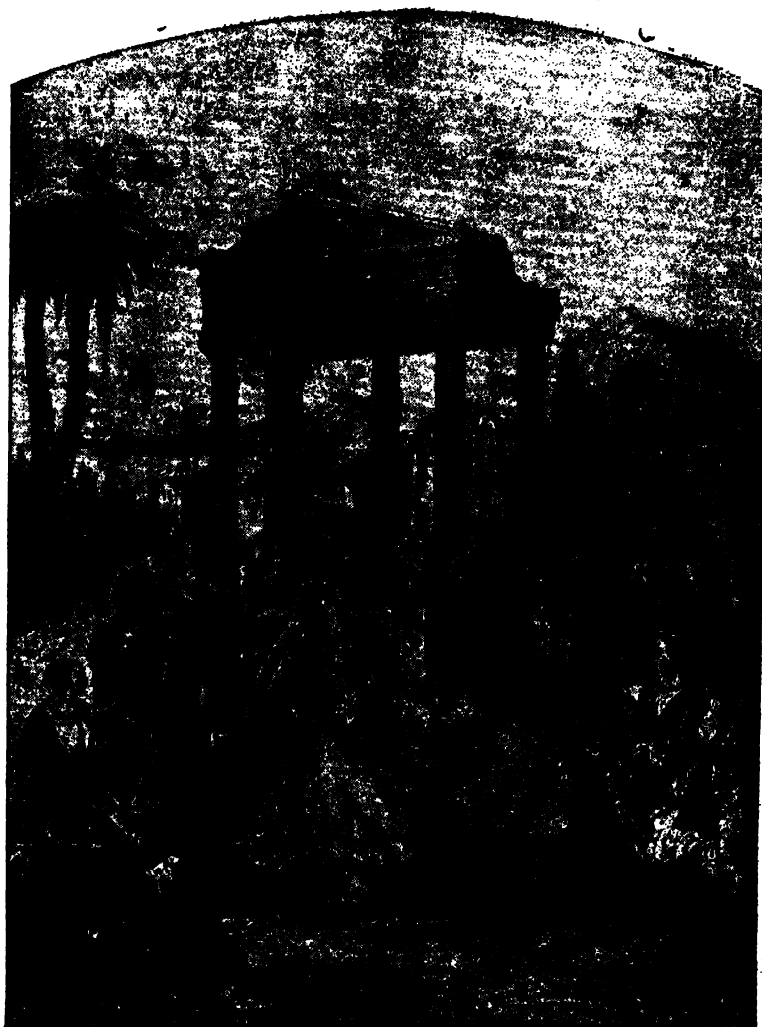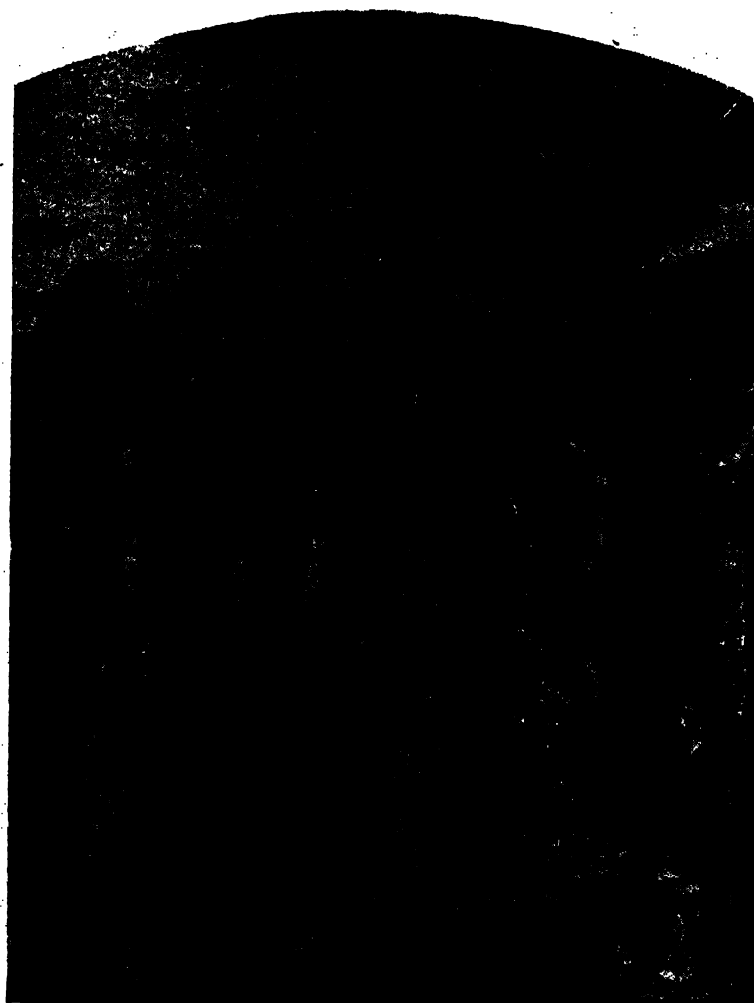
নিমকহারাম

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

(সচিত্র শিশির গল্প-প্রতিযোগিতায় আষাঢ়ের পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)

আমাদের হিন্দুস্থানী চাকরটির নাম ছিল, ভেলুয়া; মা সেটিকে বদলে রেখেছিলেন, ভুলু। বাঙ্গলা দেশে এসে সে বাঙ্গালীর মত কাপড় পরত; বাঙ্গলা কথা কইত; বাঙ্গালীর মত চুল কাট্‌তো; মোটের ওপর বাঙ্গালী হবার তার ভারি সখ। মার কাছে এই বাঙ্গালী নাম উপহার পেয়ে সে খুসীই হয়েছিল।

ভুলু বলত, তার ভারি ভুলো মন। পয়সা কড়ির হিসেব বড্ড ভুল হত বোলে সে আমাকে তার হিসেব-রক্ষক রেখেছিল। মাইনের টাকা, তত্ত্ব বিদায়ের টাকা, মাসকাবারী বাজারের দস্তরী, পুজোর বখ্‌শিস্, দোলের বখ্‌শিস্ যা কিছু সে পেত, সব আমার কাছে এসে জমা রাখত। একদিন দু'দিন অন্তর হিসেব করে মোটে কত টাকা তার হয়েছে, আমাকে তা বলে দিতে হোত। ইচ্ছে করে, মজা দেখবার জন্যে আমি মাঝে মাঝে হিসেবে ভুল করতুম। ভুলু যদিও বলত তার বড় ভুলো মন, হিসেব রাখতে সে আদপে পারে না, একটা পয়সার ভুল কিন্তু তার কাছে এড়ায়ে যেতে পারত না। খানিক ঘুরে ফিরে এসে বলত, দেখ দিদিমণি, তুমি আর একবার হিসেবটা মিলিয়ে দেখ, বোধ হয়, ভুল হয়েছে। আমি যত বলি, ভুল হয় নি, সে ততই মাথা নাড়ে আর বলে, উঁহু, ভুল হয়েছে ঠিক, তুমি দেখ। আমি রেগে-মেগে বলি, নে বাপু, তোর হিসেব আমি আর রাখতে পারব না, তুই নিজে রাখ।—তখন সে ছুটে গিয়ে মার ঘর থেকে আমার ছোট বোনের জন্যে রাখা লজেঞ্জেস্ চোকোলেট এনে আমাকে দিত আর বলত, দিদিমণি রাগ করো না। আমার পাঁচশো টাকার দরকার কি না, তাই আমি হিসেব করিয়ে রাখছি, পাঁচশো হতে আর দেরী কত! কম শুনলে আমার বড্ড কষ্ট হয়।

পাঁচশো টাকা তার কি দরকার, আমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করি; তার উত্তরে সে হাসে, জবাব দেয় না। কেবল বলে, বড্ড দরকার। না হলে সে বাঁচবে না।

সে বাঁচবে না—শুনে আমার কষ্ট হোত। আমি তখন তার ঠিক হিসেব তাকে জানিয়ে দিতুম। সে জিজ্ঞাসা করত, পাঁচশো হতে আর কত দেরী, দিদিমণি?

হিসেব করে বলতুম, অত দেরী!

তার মুখখানা শুকিয়ে যেত; আবার উজ্জল হয়ে উঠ্‌ত। খানিকক্ষণ বসে বসে ভাবত, তারপর কখন চলে যেত। মা বলতেন, ও কারু কাছে পাঁচশো টাকা ধার করেছে বোধ হয়, শোধ দেবে, তাই হিসেব করে। বাবা উকিল মানুষ, তিনি বলেন, পাঁচশো ধার করে নি, করেছে হয়ত শ খানেক কি শ দুই, দিতে হবে পাঁচশো। ঐ রকম ধার করেই ত খোট্টা বেটারা মরে কি-না।

মা যা বলেন, বাবা যা বলেন, সব আমি ভুলুকে বলি। ভুলু শোনে আর ঘাড় নাড়ে। এমন ভাব দেখায় যেন, বাবা যা বলছেন, তাও ঠিক; আবার মা'র সন্দেহও মিথ্যে নয়।

আমার মনটা বড্ড খারাপ হয়, আহা, এত কষ্টের, এত মেহনতের পয়সা তার, একশো টাকা ধার করে পাঁচশো টাকা দিতে হবে গা!

আমাদের বাড়ীতে আগে একটা বাঙ্গালী চাকর ছিল, সে

কাবলীওলার ঠেঙে টাকা কর্জ্জ করে যে কষ্ট পেয়েছিল, ভাবতে গেলেও আমার গায়ে যেন জ্বর আসে। আমাদের বাড়ীর সামনেই একদিন দুটো কাবিলওয়ালা তাকে এমন মার মারলে যে তখনি তাকে গাড়ীতে তুলে হাঁসপাতালে দিয়ে আসতে হয়েছিল। এক মাস হাঁসপাতালে পড়ে থেকে সে সেরে উঠ্‌ল বটে কিন্তু বাম-অঙ্গটা তার পড়ে গেল। সে আর কাজ কর্ম্ম করতে পারলে না, বাবার ঠেঙে কিছু টাকা নিয়ে দেশে চলে গেল। তার জন্যে আমার খুব দুঃখু হয় নি, সে লোকটাকে আমার কেমন ভাল লাগত না। সে নাকি অনেক নেশা করত; দিন রাত তার চোখ দু'টো ঢুল্ ঢুল্ করছে, মাথায় মস্ত তেড়ী, নেয়ে উঠে আধ ঘণ্টা ধরে সে তেড়ীই কাট্‌ত; রাত্রে আমাদের বাড়ীর সদর দরজায় চাবী দিয়ে কোথায় চলে যেত; ভোরবেলা ফিরে আস্‌ত; বাবা কতদিন এ-জন্যে বকৃতেন, তাড়িয়ে দিতে চাইতেন, এক মাথা তেড়ী আর এক মুখ গোঁপ নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকে মুচকে হাস্‌ত। আমাকে বিকেলে বাগানে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে কাদের বাড়ীর সব ঝি-চাকরের সঙ্গে গল্প করত, বিড়ি খেত, অন্য ছেলেপেলেরা আমাকে মারলে, দেখেও দেখত না, আমি বাড়ী এসে মাকে বলে দিলে, উল্টে সে আমার নামে দোষ দিয়ে বলত, আমি বড় দুষ্টু। তাই আমি তাকে দু'চক্ষু পেড়ে দেখতে পারতুম না।

ভুলু ছিল, ঠিক তার উল্টো। আমার বয়স যখন দশ-এগারো বছর, তখনও সে আমাকে কাঁধ থেকে নামাত না। আমি যে পাড়ার সব মেয়ের সেরা সুন্দরী আর লক্ষ্মী তাই নিয়ে সে-যে কত লোকের সঙ্গে ঝগড়া করত, তার ঠিক নেই। একদিন আমার অসুখ করত যদি, সে-ই খেত না, শুত না, যেন—তারই অসুখ করেছে। আমি রাগ করলে বাড়ীর আর কেউই আমার মুখে একটি জলবিন্দু দিতে পারত না, পারত কেবল ভুলু। এই সবের জন্যে তাকে আমার খুব ভাল লাগত। আর সে ধার করে পাছে কখন কোনদিন কোন বিপদে পড়ে, আমার তাই ভাবনার অন্ত ছিল না। তাই বাবা যখন টাকা ধারের কথা বল্লেন, ভুলুও তাই মেনে নিলে, তখন আমিই তাকে বল্লুম, ভুলু তোর চারশো টাকা ত জমেছে, তাই তুই দিয়ে আয়। নইলে আবার তারা যদি তোকে শঙ্করার মত মারে!

ভুলু আমাকে কোলে জড়িয়ে ধরে বল্লে—না খুকুমণি, আমায় কেউ মারবে না। বলে সে হাসতে লাগ্‌ল।

শঙ্করাও এই রকম হাস্‌ত; তাকে মা যখন কাবিল্ মুখ-পোড়াদের টাকা শোধ দিতে বলতেন, তখন সে হাস্‌ত আর বলত - ও কিছু না!

ভুলুর কথা শুনে তাই আমার ভয় করতে লাগল; তাকে বোঝালুম যে দেনা রাখতে নেই, শোধ করে দেওয়াই ভাল।

সে হেসে বল্লে—কিছু ভয় নেই খুকুমণি, আমি শোধ দেবে, দেবে। পুরো পাঁচশ হলেই হয়।

তখন থেকে আমি আমার চামড়ার প্যাটরা খুলে রোজ হিসেব করতুম, পাঁচশ পুরতে আর দেরী কত! চারশ এক থেকে চারশ পঞ্চাশ হতে অনেক সময় লাগল; তারপরেই একদফায় সে পঞ্চাশ টাকা পেয়ে গেল। কি করে পেল—বলি।

আমার মাসতুতো বোন্ পঙ্কজিনী তার স্বামীর সঙ্গে বিলেত গেছল; তার স্বামী খুব বড় বেরিষ্টার। অনেক টাকা কড়ি তাঁর। বিলেত থেকে ফিরে এসে কিছুদিন তাঁরা দু'জনেই আমাদের বাড়ীতে রইলেন। পঙ্কজ-দিদির গয়নার বাক্স থেকে একদিন তাঁর বিলেতে-কেনা পাঁচ হাজার টাকা দামের হারগাছাটি হারিয়ে যেতে বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। পুলিসে, জমাদারে, সার্জ্জেনে বাড়ী ভরে গেল। আমার ছোট বোন পদ্মা ছেলে মানুষ,—সে ত আর পাঁচহাজার দশহাজার বোঝে না, মাসীমার গয়নার বাক্স খোলা পেয়ে হারগাছি নিয়ে তার পুতুলের বাক্স-জাত করে বসে আছে। ভুলু ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল, তার পা লেগে পদ্মার খেলনার বাক্সটা উল্টে পড়্‌তেই, দেখ্‌লে, হার! ছুটে পঙ্কজদিদিক দিলে। পঙ্কজদিদি খুশী হয়ে তাকে পঞ্চাশটাকা দিলে। আমার খুব আনন্দ হল।

আমি ভাল করে হিসেব করে ভুলুকে বললুম যে পুরো পাঁচশ' হয়েছে।

ভুলু বল্লে—আমার সামনে গোণ দেখি খুকু!

আমি গুণে দেখিয়ে দিলুম যে ঠিক পাঁচশো হয়েছে।

সে হাস্‌তে হাস্‌তে মা'র কাছে গিয়ে সে মাসের মাইনে চেয়ে নিলে। মা বিকেলে দোব বলেছিলেন, সে তাতে রাজী হল না; বল্লে, তখনি চাই। মা দিলেন। নিয়েই সে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে ফিরে এসে বল্লে—সে দেশে যাচ্ছে।

আমরা সবাই অবাক্।

মা বল্লেন—টাকা শোধ দিতে যাচ্ছিস্ ভুলু?

ভুলু চুপ করে রইল।

মা বল্লেন—সে-ত ভাল কথাই রে! তবে অত তাড়াতাড়ি কেন, একটা লোক টোক ঠিক করে দিয়ে—দু'দিন পরে তখন যাস্। এতদিনই যখন গেছে...

ভুলু বল্লে—আজ যেতেই হবে মা'ঠারুণ!

বাবা বল্লেন—খোট্টা বেটাদের রোগই ঐ। যাব বল্লে আর নেই। যাক্ গে!

এতক্ষণ আমি কিছু বলি-নি; বাবার কড়া কথা শুনে একটু দুঃখু হলো; ভুলুকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বল্লুম—ভুলু সবাই বল্‌ছে···

আমার কথা না শুনেই সে বল্লে—আমি যে তাদের বলে এসেছি খুকুমণি, যেদিন পাঁচশো টাকা হবে—চলে আসব।

কাকে বলে এসেছিস্ ভুলু!

সে আছে মোদের গাঁয়ে।

এলিই বা বলে, একদিন দেরী সয় না?

না খুকু। আমি কথা দিইছে।

আমি রেগে বল্লুম, ওঃ ভারী ত কথা। কে সে, কোথাকার কে, তার ঠিক নেই—কথা দিয়েছেন ত একেবারে মাথা কিনেছেন! আমাদের বাড়ী থেকে টাকা পেলি, আমাদের কথা বুঝি কথা নয় রে?

সে ঘাড় নেড়ে বল্লে, উঁহু, কোথাকার কে নয়। আমার যে বউ হবে—সে তার বাপ্।

ও হরি! বউ হবে? হয় নি ত?

সে হওয়াই খুকুমণি! পাঁচশো টাকা পেলেই তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, তার বাপ বলে রেখেছে! দিদিমণি, তুমিই বল, যাকে বিয়ে করব, তার কাছে কি কথার বেঠিক কর্‌তে পারি গা? এই ত তোমারই আজ বাদে কাল সাদী হবে, আজ হাম করবি না, কাল করবি—করতে পারবে?

আমি বল্লুম—তারা ত আর জান্তে পারছে না যে আজই তোর পাঁচশো টাকা হয়েছে। দু'দিন দেরীতে গেলে কি ক্ষতি হবে?

তারা না-ই জান্‌ল খুকুমণি! হামি ত জান্‌ছে! সে-যে আমায় ভালবাসে দিদিমণি।

কে ভালবাসে?

আমার বহু। সে ছোট্ট বটে, তার খুব বুদ্ধি, হামি যখন আসে বলেছিল, টাকা হলেই আস্‌তে!

সে কত ছোট রে?

তোমার মাফিক কি কিছু ছোট হবে!

ওমা! আরও ছোট কি রে? তাকে তুই ভালবাসিস্, বুড়ো মিন্‌সে!

বাসে রে বাসে! বয়স ছোট হল ত কি হলো, ভালবাসে!—

সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

সেই রাত্রেই ভুলু চলে গেল।

আমার বিয়ে হোল, তার তেরদিন পরে, তাকে তার করা হোল, সে এল না।

বাবা বল্লেন, কি নেমকহারাম!

আমার স্বামী এ গল্প শুনে বলেছিলেন, নিমকহারাম নয়, সেই সুখী!

নারী অবলা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

শ্রীযুক্তা সফিয়া খাতুন বি, এ, মহাশয়া ৩০ সংখ্যার সচিত্র শিশিরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত্রহীন নামক বিখ্যাত উপন্যাসের সরোজিনীর স্বাধীনতা ও এ দেশের সকল নারীর অধীনতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন।

আমরা কি অবলা—এ সম্বন্ধে তিনি যে যে কথা বলেছেন সবই জলন্ত সত্য কথা, এর মধ্যে মিথ্যে এতটুকু নেই। আমাদের এই দেশটায় যে রকম নারী-নির্য্যাতন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, তাতে সে সম্বন্ধে যিনি যে উপদেশটুকু দেবেন আমরা তা শুনব, সেটা ভেবে দেখব।

এই ভারতবর্ষে চিরদিনই নারীর সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল, নারী সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই মায়ের সম্মান পেত। যখন পৃথিবীর অন্য সব দেশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল তখন এই ভারতবর্ষই জ্ঞানের দীপ জেলেছিল। তখনকার দিনে এই ভারতবর্ষে এই সব মেয়েরাই প্রকাশ্যভাবে বার হয়েছেন, ঘোমটা টানবার আবশ্যকতা তখন ছিল না। তাঁরা পুরুষদের প্রত্যেক কাজে,এমন কি হোম-যাগ প্রভৃতিতেও যোগ দিয়েছেন, এর প্রমাণ এখনও যথেষ্ট আমরা পাই। তখন যে ছিল সার্ব্বজনীন স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, অবাধ স্বাধীনতা। দেশের ছেলেরা অসীম শক্তি গায়ে রাখত, বুকে অনন্ত সাহস তাদের ছিল, আর নিজেদের সেই সাহস ও শক্তির' পরে নির্ভর করেই তারা নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। একদিন এই দেশে অমন যে শক্তিবান সত্যবান পুরুষ জন্মেছিল সে শুধু যথার্থ মায়ের জন্যে। শ্রীযুক্তা সফিয়া খাতুন যথার্থ ই বলেছেন—'আমরা নিজে এখনও যথার্থ মা হতে পারিনি, তাই প্রকৃত ছেলেও তৈরী হয় নি।'

এই তো সেই ভারতবর্ষ, এই তো সেই মাতৃ সাধনার পীঠস্থান। ভারতের সাধনার বস্তু—মা, তাই এখানে শক্তির পূজা হয়। এ দেশের প্রধান দেবতা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি, আর কেবলমাত্র এঁদের স্বামী বলেই হরি, শিব প্রভৃতি দেবতাকে পূজা করা হয়। সেই পূর্ব্বযুগের নারীশক্তির কথাটা এখনও চলেছে, কিন্তু সেটা অনেক রূপান্তরিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ সেটা ব্যবহার হয় সমাজ সংস্কারের—যদি দরকার বোধ হয়, কিম্বা লম্বা বক্তৃতা দেবার সময়ে, অন্য সময়ে নয়।

ঘোমটা টেনে দৌড়ানোর কথা তিনি যা বলেছেন সেটা ঠিক কথা; কিন্তু এটা হচ্ছে সংস্কারের জন্যে, মনের যে স্বাভাবিক কৌতুহল সেটা কোথায় যাবে, কাজেই ঘোমটার ফাঁক দিয়ে একবার দেখে নিতে হয়। এতে লোকের মনে কৌতুহল তো বাড়বেই, কেননা গোপনে যা থাকে তারই দিকে লোকের আগ্রহ থাকে, কিন্তু প্রকাশ হয়ে গেলে তখন আর দেখার জন্যে অতটা লালায়িত হতে হয় না। দেখার ইচ্ছাটা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো আছে!

একদিন এই ঘোমটা দেওয়ার বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে বেশ তর্কও চলেছিল। একটী ভদ্রলোক বলেছিলেন "ঘোমটার সৃষ্টি হয়েছে সেই দিন হ'তে যেদিন নারী মা হয়েছিল।" কিন্তু আমি বলেছিলুম—"তা নয়। পুরুষেরা যতদিন হ'তে শক্তি হারিয়ে ক্রমেই জড় হয়ে আসছেন, দেহের অনুভূতি, এমন কি মনের অনুভূতিও হারিয়ে ফেলছেন, মনুষ্যত্ব যেদিন হতে তাঁদের মধ্য হতে বিলীন হয়ে গেছে, সেই দিন হতে নারীর মুখে ঘোমটা টেনে দিয়ে অন্তঃপুর নামক স্বতন্ত্র একটা স্থান গঠন করে সেখানে ভালবাসা, স্নেহ প্রীতির শিকল পরিয়ে তাকে রাখা হয়েছে। অত বড় দুর্দান্ত জন্তু যে হাতী, এ রকম করে শিকলে বেঁধে তাকে খাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়, সে মোটে নিজেকে ধারণাই করতে পারে না। তখন মানুষ তাকে পীড়ন করে, মারে, তবুও সে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিবেচনা করে' মাথা নুইয়ে পড়ে থাকে; তার মধ্যে যে কি শক্তি লুকিয়ে আছে তা

যদি সে একবার অনুভব করত তা হলে সব যে লণ্ডভণ্ড করে দিত। প্রথমে মোটা শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছে, এখন আস্তে আস্তে পা হতে শিকল খুলে নিলেও সে আর পা বাড়াতে পারে না, তার নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না যে সে বাঁধন ছাড়া। সে বাঁধা থেকে থেকে এমন হয়ে গেছে যে আর নড়তেও চায় না।

একটা গল্প পড়েছিলুম অনেকদিন আগে,—একটী লোক বছর তের চোদ্দ বয়সে অন্ধকার কারাগারে যায়, তারপর যখন তার বয়স ষাট বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে বাইরে আনা হল, কিন্তু বাইরের আলোতে তার চোখ ঝলসে গেল, সে চোখ বুঁজে হাহাকার করে কাঁদতে লাগল—তাকে ফের কারাগারেই পাঠিয়ে দেওয়া হোক, তার জীবনের বাকি কয়টা দিন সে সেখানেই কাটিয়ে দেবে। সত্যি সে তাই-ই করেছিল, আলো সে সইতে পারে নি।

এ দেশেরও হয়েছে তাই। কিন্তু এদের মোটেই আলো দেখবার সময় দেওয়া হয়নি! অন্ধকারে থেকে এদের বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে, আলোয় গেলে প্রথমটা দমবন্ধ হয়ে আসবেই তো!

থাক এ কথা—পুরুষ নিজে শক্তিহীন হয়েছে বলেই কি আপনাপন স্ত্রী কন্যাকে ঘরে বন্ধ করে ফেলে নি? তার যদি সেই আগের মত সাহস থাকত, তেমনি শক্তি থাকত, সে তার স্ত্রী কন্যাকে নিশ্চয়ই অবাধে বেড়াতে দিত। কিন্তু কোথায় তার সে শক্তি, কোথায় তার সেই সাহস? সেই বুকের অকুতোসাহস, দেহের বিপুলশক্তি এখন আশ্রয় করেছে বাঙ্গালীর পিঠে, বাঙ্গালীর মুখে, তাই বাঙ্গালীর কলম খুব ছোটে, বাঙ্গালীর মুখ খুব ফোটে। বাঙ্গালী আসল যা জিনিষ, তা হারিয়েছে; তার সামনে হতে দুর্ব্বৃত্তরা তার স্ত্রী কন্যাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সামনে দাঁড়িয়ে অত্যাচার করছে, সব সে নির্ব্বিরোধে সহ্য করে যাচ্ছে! রক্ত তার জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, এত অত্যাচারেও সে তাই চুপ করে আছে, তার বুকের রক্ত তবু গরম হয়ে উঠছে না। সে চুপ করে দেখছে, আর মনে মনে ভাবছে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম! এই তো বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব, এই ত দেশবাসীর বীরত্ব!

অত্যাচার নাই কি?—সব দেশেই আছে, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত কোন দেশের মেয়ে এত শক্তিহীনা নয়, কোনও দেশের পুরুষ এ দেশের পুরুষদের মত বাক্যবীর নয়। এ দেশের পুরুষেরা যখন পুরুষত্ব হারিয়েছে, যখন নারীকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার নেই, তখন উচিত তাদের নারীকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত স্বাধীনতা দেওয়া! তাকে পায়ে শিকল বেঁধে ঘরে বন্দিনী করে রাখা কিছুতেই তার উচিত কাজ নয়। নারীই নারীর বেদনা চট করে বুঝে নেয়, তাই নারীর 'পরেই নারীর ভার ছেড়ে দেওয়া খুব উচিত।

ছেলেদের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা উঠছে, এ ও যথার্থ সত্য কথা। ছেলেদের মায়েরা হচ্ছে বদ্ধ কারার অন্ধ জীব, বাইরে তারা যেমন ব্যবহার পায়, মনে করে এই রকমই ব্যবহার তারা বরাবর পেয়েছে, বরাবর পাবেও, তাই এর সম্বন্ধে আলাদা কোনও একটা অনুভূতি তারা মনে জাগিয়ে তোলে না। ছেলেরাও এ সম্পর্কে মায়ের কাছ হতে তাই কোনও উপদেশ পেতে পারে না, তাই এদেশে যথার্থ ছেলের মত ছেলে আজও তৈরি হয় নি। পরের মা বোনকে নিজের মা বোন বলে জীবন পণ করে রক্ষা করতে এগিয়ে যাবে, তেমন ছেলে আমাদের দেশে আজ কই? ছিল না যে, এমন তো নয়। এক'শ বছর আগেকার কথা আমরা শুনেছি, তার সঙ্গে আজ-কালকার ছেলেদের তুলনা করলে জ্ঞান থাকে না।

ছেলেদের শক্তি ও সাহসের 'পরেই আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাধীনতা রক্ষিত হতো; মেয়েরা সেই জন্যে ঘরে বাইরে যোগ দিতে পারতেন, একেবারে আলাদা হয়ে একটী নির্দ্দিষ্ট জায়গায় নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতেন না।

চরিত্রহীনের মধ্যে সরোজিনীকে লক্ষ্য করে সতীশ বলেছিল "আপনি কি ইংরাজের মেয়ে যে যেখানে ইচ্ছা একলা গেলেও কোনও ভয় নেই—" ইত্যাদি।

এই কথা শুনে সরোজিনী গাড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। শ্রীযুক্তা সফিয়া খাতুন বলেছেন যদি সরোজিনী যথার্থই স্বাধীনা মহিলা হতো তবে কখনই এ রকম অপমান সইতে পারত না। সে যদি সরোজিনী না হয়ে সফিয়া খাতুন নিজে হতেন তা হলে পা হতে জুতো খুলে

পটাপট সেই হিন্দুস্থানীদের লাগিয়ে দিতেন। মরবেনই তো, তবু দুটো একটা মেড়ুয়াবাদীর জীবন না নিয়ে মরবেন না—এই হচ্ছে তাঁর কথা!

কথাটা খুবই বীরের মত তা স্বীকার করছি, কিন্তু কাজটা অত সহজ কি? মেনে নিচ্ছি হয়ত তাঁর গায়ে খুব জোর আছে, কিন্তু তা হলেও তিনি মেয়ে তো! যদি যথার্থই তিনি সে রকম স্থলে পড়েন, দশ বারো জন অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী, যাদের সম্ভ্রম বোধ নেই, নারীত্বের সম্মানের ধার যারা ধারে না, যাদের চোখ দিয়ে লালসার আগুন ঠিকরে পড়ছে—এরা যদি তাঁকে ঘিরে ফেলে, তাঁর এই কথাগুলি সেখানে টেঁকবে কি? একজনকে তিনি আক্রমণ করবেন, সেই সময় বাকিগুলি তাঁকে যদি চেপে ধরে, তিনি কেমন করে তাদের দুই একজনকে মেরে, মরবেন? লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা মরবার আগেই হতে হোত, সেটা ত জানা কথা।

তাঁকে তো এটা স্বীকার করতেই হবে পুরুষের শক্তি ও নারী শক্তিতে অনেক পার্থক্য আছে, ভগবান পুরুষকে পৃথক শক্তি দিয়েছেন। আমরা—অর্থাৎ নারীরা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, চরিত্রে, সংযমে, সব তাইতেই পুরুষকে ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠতে পারি, কিন্তু দৈহিক শক্তির বেলাতেই আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। আমি ছোট বেলা হতে ওদেরই মত দৌড়াদৌড়ি করেছি, গায়ে শক্তি ত আমার যথেষ্ট রয়েছে, কিন্তু তবু যে একটা শক্তিশালী পুরুষের মত হতে পেরেছি তা তো আমার মনে হয় না। আজকালকার নব্যশ্রেণীর বাঙ্গালী যুবক, যাঁরা দেহ ক্ষয় করে রাশি রাশি বই গিলে খেয়েছেন, যাঁরা চলতে গিয়ে ঢলে পড়েন, পেট ভরে ভাত খান না, পাছে পেট-মোটা হয়ে যান—তাই খান চাঁদের আলো, চেঁচিয়ে কথা বললে বিশ্রী শোনায় তাই কথা বলেন কোমল মিহি সুরে,—হটানো যেতে পারে এদের। একখানা জুতো কি লাঠি হাতে নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে একটা মেয়ে বীরদর্পে যদি এঁদের সামনে দাঁড়ান, এই যুবক দল যে অবিলম্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু যারা ছাতু রুটী-খোর, কাব্য কাকে বলে তা যারা জানে না, এদের দশ বার জন থাক, একজনের গায়ে একটা আঘাতও করা যাবে না। বাঙ্গালাদেশের সৌভাগ্য, বাংলার ছেলেরা—যারা পথে ঘাটে একা নারীকে চলতে দেখে দুটো চারটে বিদ্রূপ বচন ছুড়ে ফেলতে কুণ্ঠিত হয় না, তারা নেহাৎই শক্তিহীন, হাঁড়ির ভাত তারা আধপেটা করে খায়, চাঁদের আলো মলয় বাতাস খেয়ে কোনও রকমে দেহখানা তাদের বেঁচে রয়েছে! এ রকম ছেলে দশ বারটা কেন, কুড়ি বাইশ জন এলেও একটা বীরনারী তাদের অনায়াসে হটিয়ে দিতে পারে।

সরোজিনী কি রকম অবস্থায় পড়েছিল একটু দেখা যাক। সে যেখানে, যে সময়ে, যে রকম অবস্থায় পড়েছিল, সে মেয়ে না হয়ে যদি দেশের নব্যতন্ত্রের কোনও যুবক হতো—অবশ্য সতীশ ছাড়া,—তা হলে তার যে সরোজিনীর চেয়েও আরও কাহিল অবস্থা হতো তাতে আমার তো একটু মাত্র সন্দেহ নেই।

কলকাতার মত জায়গা হলেও চলতে পারে, কেননা আজব সহর এই কলকাতা, সামান্য একটা ঘটনা যেখানে ঘটছে সেখানেও সারি দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে যায়; অথবা কলকাতা না হয়ে যদি কোন সহরও হতো তা হলেও কোন ভাবনা ছিল না; কারণ সহর মাত্রতেই একটু কিছু কাণ্ড হলে লোক জমে যায় খুব। সহরের উপকণ্ঠে একা রমণী সে, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এ রকম স্থলে যদিও জুতো মারার কথাটা তার মনে হয়ে থাকে, তবুও সে সাহস করতে পারে না, কারণ জুতো ছাড়া আর তার কাছে এমন কোনও অস্ত্র তখন ছিল না যা দিয়ে সে আততায়ী দুই একজনকে মেরে শেষকালে নিজেও মরবে। একটা জুতোকে সম্বল করে দশবারজন ছাতুখোরের বিপক্ষে দাঁড়াতে একজন সবল পুরুষই সাহস করতে পারেন কি? সতীশ সাহস করতে পেরেছিল, তার মত ডাকাবুকো আর দু চার জন ছাড়া আর সবাই এরকম স্থলে পিট্টান দিত এ ঠিক বলছি। একটাকে মারতে গেলে অপর গুলি যে নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বা ভয়ে পালাত তা কখনই নয়, ফলে এই হতো—সতীশ যতক্ষণে সেখানে গিয়ে পৌছেছিল ততক্ষণে সরোজিনীর অস্তিত্বও সেখানে থাকত না; সতীশ জানতেও পারত না যে এখানে সরোজিনী ছিল। সে যে অমনি ভাবে লড়েছিল, দুর্দান্তদের কথার একটা উত্তরও দেয় নি, আমার মনে হয়—কেবল সেই জন্যেই

তাদের মনের মধ্যে একটু সঙ্কোচ জেগে উঠেছিল, তাই তারা অতক্ষণ ধরে মুখেই যা তা বলছিল, সাহস করে তখনও অঙ্গস্পর্শ করতে পারে নি।

রিক্তহস্তে থাকলে একমাত্র মুখের জোর ভিন্ন আর কিছু চলে না, আর মুখের জোর করতে গেলে একখানা কাণ্ড ঘটে বসে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এ দেশের লাঞ্ছিতা অপমানিতা মেয়েদের লক্ষ্য করে যে কথাগুলো বলেছেন তা সত্য, আবার শ্রীযুক্তা সফিয়া খাতুন মহাশয়া যা বলেছেন তাও খাঁটি সত্য কথা। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এ দেশের মেয়েদের ঘরে বাইরে লাঞ্ছনা অপমান। ঘরে—পাণের থেকে চুণ খসলে নিস্তার নেই, বাইরে এক পা বেরুতে গেলে তাতেও নিস্তার নেই! মেয়েদের উপর এমন অত্যাচার আর কোনও দেশে হয় নি, হবেও না। এ দেশের পুরুষ যে নারীর সম্মান রক্ষা করতে চির-উদাসীন তা আর কতবার করে বলব?

দেশের নারী শাসন বড় চমৎকার—বাইরের চেয়েও বেশী, কিন্তু সে কথা আজ থাক, পরে যদি পারি—বলব।

তারপর নারীর হাতে অস্ত্র দেবার কথা, অর্থাৎ তাদের হাতে একখানা করে ছোট আকারের অস্ত্র রাখা অবশ্যই উচিত। কথাটা ঠিক, আর এও ঠিক যে এই শ্রেণীর অত্যাচারী নরপশুর দল—যারা নারীকে অপহরণ করতে যায়, নারীর সর্ব্বনাশ করে, তারা যথার্থই কাপুরুষ হয়, এরা অস্ত্র দেখলে ভয় পাবে, কয়েক জায়গায় পেয়েছে-ও।

কিন্তু কথা হচ্ছে, দেশের ছেলেরাই অস্ত্র হাতে রাখতে সাহস করে না, নইলে তাদের চোখের সামনে ঘর হ'তে নারী কখনও অপহৃতা হয়? দেশে পুরুষদের যদি সাহস থাকত, অস্ত্র নিয়ে তারাই তো ছুটত। মেয়েদের হাতে অস্ত্র—এতো তারা হেসেই উড়িয়ে দেবে।

আচ্ছা—তাও না হয় হোল, মেয়েরা অস্ত্র রাখলে। দেশের মেয়েরা শুধু অস্ত্র হাতে রাখলেই কি চলে—কারণ সব সময়েই তাঁরা হাতে অস্ত্র রাখতে পারেন না, সংসারের কাজ আছে, ছেলেমেয়ে মানুষ করা আছে। আগেকার দিনে মেয়েরা সর্ব্বক্ষণ অস্ত্র কি বিষ সঞ্চয় করে রাখতেন কিন্তু কাছে সর্ব্বদাই রাখতেন কি? পুরুষ বিশ্বাস করত মেয়েকে, মেয়েরা বিশ্বাস করত পুরুষকে; দুই শক্তি দুই শক্তির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াত। পুরুষ যদি ঠেকাতে না পারতেন মেয়েরা এগুতেন। ছুটো মারতেন, নিজে মরতেন। পথে ঘাটে বার হলেও অত্যাচারের ভয় ছিল না, দেশ সুশাসনে ছিল, দেশের নারীর মর্য্যাদাও রক্ষা হতো। যদিই বিপদ ঘটে তেবে তাঁরা প্রস্তুত হয়েই বেরুতেন—তাতে নিজেদের সম্মান রক্ষা হতো। অতর্কিত আক্রমণের জন্যে মেয়েরা এখনও প্রস্তুত হতে পারে নি। তারা একেবারেই শক্তিহীনা, নির্ভর করছে এখনও পুরুষের 'পরে। তবে বলতে পারিনে, এ রকম নারী-হরণ আর কিছুদিন চললে সব মেয়েই সাবধানতা অবলম্বন করবেন কি-না।

নারীকে সব রকমে পেষিত দলিত করে, তার দুটি চোখ বেঁধে ফেলে তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে অন্ধকার অন্তঃপুরের মধ্যে, তার স্বাস্থ্য নেই, তার শক্তি নেই, তার সাহস নেই, তার কিছু নেই—তাই সে অবলা, তাই সে হীনা, তাই সে দুর্ব্বলা। তাকে উৎসাহ দাও, তাকে গঠন করে তোল, তার মনেও বল আসবে, সে নিজেকে যোগ্য করবার চেষ্টা করবে, নিজেকে সে বিপদের আঘাত সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত করে রাখবে। কিন্তু তোমরা—পুরুষত্বহীন অথচ বাক্যবীর পুরুষ, তোমরা মুখে যা বল কাজে তোমরা তা কর কই? তোমরা যে প্রথম হতেই জানাচ্ছ 'তোমরা কিছু করতে পার না, আমরা সব পারি, অতএব আমাদের পরে সব নির্ভর কর।'

নির্ভর করে থাকবার যে ফল তা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে! এখনও কি পুরুষ বলবেন—নির্ভর কর, আর সেই ছেঁদো কথায় বিশ্বাস করে—নারীও নির্ভর করে থাকবে?

যার রক্ষা করার ক্ষমতা নেই সে নারীকে ছেড়ে দিক। নারী ক্রমে বলসঞ্চয় করবে, যথার্থ সাহস সে পাবেই। অস্ত্র সে কাছে রাখবে, বিষ সে সঞ্চয় করবে। অমন দুর্দ্দান্ত দশ বারটা হিন্দুস্থানী আসুক না কেন, আত্মরক্ষার জন্যে সে দু'একজনকে হত্যা করবে, তারপর তখনও যদি না পারে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে। নিজের শক্তি জাগিয়ে তোলবার সুযোগ দেওয়া হোক তাকে—সে সর্ব্বদা বিপদের ঘা সহ্য করবার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। তাকে রক্ষা করবার জন্যে সে পুরুষের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে তার দুয়ারে যাবে না কারণ আজ তার এ দুর্দ্দিনে তাকে রক্ষা করতে কেউ নেই, নিজেই সে নিজের রক্ষাকর্ত্রী। নারীর এ আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলতে—তাকে ছেড়ে দাও পুরুষত্বহীন পুরুষ, তুমি যা পারলে না, দেখ, সে তা পারে কি না।

মৃত্যু-বরণ

[শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যবিদ্যাভারতী]

(৭)

ক্রমেই মীনা আপনার লোকের মত আমার উপর অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া ঐ মটরকারটার

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবহারতায়। কোথায় প্রায় নাকি তাহাদের নিমন্ত্রণ হইত; এবং সেই নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য প্রায়ই আমার মটর চাইয়া পাঠাইত এমন কি তাহার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বিবাহে কি কোন কার্য্যে মোটর দরকার হইলে মীনা আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই মোটর দিবার প্রতিশ্রুতি দিত এবং এমনভাবে মটরটী চাহিয়া পাঠাইত যে, আমার "হাঁ," "না" বলিবার কোন অপেক্ষাই রাখিত না। মীনা ক্রমেই আমাকে আপনার ভাবিতেছে বুঝিয়া আমি মনে মনে আনন্দিতই হইতাম।

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোথায় নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য মীনা মটরটী চাহিয়া পাঠাইল। আমিও ড্রাইভার মণিমোহনকে ডাকিয়া মোটর লইয়া যাইবার আদেশ দিলাম। ড্রাইভারটী আমার বেশ হাসিমুখো লোক। যখনই আমি ডাকিয়া তাহাকে গাড়ীর আদেশ দিতাম—সে বেশ হাসিমুখেই সে আদেশ গ্রহণ করিত। অবশ্য নিজের প্রয়োজনের সময় তাহাকে ডাকিয়া বুঝাইবার কিছু ছিল না—চাকর দ্বারা গাড়ী ঠিক করিতে বলিয়া পাঠানই রীতি ছিল। কিন্তু মীনার বরাতের সময় নিজমুখে ভালভাবে সমস্ত বুঝাইয়া দিতাম—অন্যকে বিশ্বাস হইত না, পাছে যথাসময়ে তাহার নিকট গাড়ী না পৌছায় বা অপর কোনরূপ গোলযোগ হয়। আজও নিজে মণিমোহনকে, কয়টার সময় মীনার দরজায় গাড়ী লাগাইতে হইবে, যতক্ষণ মীনা ছুটী না দিবে ততক্ষণ যেন হাজির থাকে ইত্যাদি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলাম; এবং সে ঠিক বুঝিল কিনা জানিবার জন্য, আমার উক্তি তাহার মুখে পুনরুক্ত করাইয়া, শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। সে তেমনি মৃদুমৃদু হাসির সহিত আমার আদেশ শুনিল।

মণিমোহন চলিয়া গেলে আমি ভাবিতে বসিলাম—এখন আমি করি কি? আজ সন্ধ্যায় তো মীনার সঙ্গ পাওয়া যাইবে না—সন্ধ্যা এবং রাত্রিটা কাটে কি করিয়া? তখন স্থির করিলাম আজ ষ্টার থিয়েটারে "অযোধ্যার বেগম" দেখিয়া আসা যাক্। যদিও মীনাকে সঙ্গে লইয়া ইতিপূর্ব্বে একদিন দেখিয়া আসিয়াছি কিন্তু সে নামে দেখা মাত্র। মন তাহারই দিকে ছিল—নাটকের দিকে তো ছিল না। সে দেখা কি আর দেখা! ভাবিলাম আজ আদ্যোপান্ত বেশ মন দিয়া দেখার সুবিধা হইবে। যখন নাট্যকার হইতে চলিয়াছি তখন ভাল নাটক দেখায় নাটক লেখার কিছু সাহায্যও পাইতে পারি। টেলিফোন করিয়া নীচের সামনের একটী সিট রিজার্ভ করিলাম; এবং যথাসময়ে দুইটা পেগ্ টানিয়া লইয়া একটী ট্যাক্সি করিয়া বাহির হইলাম।

নিজের গাড়ী থাকিতে ট্যাক্সির ভাড়া দিতে সকলেরই বোধ হয় গায়ে বাজে। আমারও বাজিল এবং সেই বিরক্তির মুহূর্ত্তে মনে হইল—মীনার কি অন্যায়। প্রায় প্রত্যহই সে আমার গাড়ী লইয়া কোথায় পরের বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইবে আর আমি—ট্যাক্সির ভাড়া গণিয়া মরিব! সে জানিয়াছে আমি তাহার পাণিপ্রার্থী; কোথায় এখন তাহার উচিৎ অধিকক্ষণ আমাকে সঙ্গ দান করা, না অধিকক্ষণ—অন্ততঃ ক্ষণের সেরা ক্ষণ—বৈকাল-সন্ধ্যা প্রায়ই সে নিমন্ত্রণ সারিয়া বেড়ায়। আর এত বন্ধুই বা সে পায় কোথায়? সে বন্ধুগুলিই বা কে এবং কেমন? বেশীর ভাগই পুরুষ বন্ধু নাকি? সম্ভব তাই, নইলে এত টান যে কখনও ওজর দিয়াও নিমন্ত্রণ কাটায় না। তা আমার সহিত পরিচয়ও তো করাইয়া দিতে হয়; তা না করিয়া বন্ধুদের যে নেপথ্যেই রাখিয়া দিল। আবার পরিচয়ের সময় বলা হইয়াছিল—"বাবা প্রকাশ্যে বাবুর্চ্চি রাখার পর আগেকার বন্ধু বান্ধব সব ছেড়ে গেছে, দুচারজন আমাদেরই মত আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান বন্ধুবান্ধব যা আছেন।" ও বাবাঃ এরই নাম দুচার জন! দু'চার ডজন দূরে থাক এবে শট্ কেতেও কুলায় না।

সেই বিরক্তির এবং মদের মুখে উল্টাদিকটা ভাবিতে আরম্ভ করায় অনেক ভাবনাই আপনি আসিয়া পড়িল। দুমকায় কত গরজ করিয়া মিশিয়াছিল, কত সহজে, প্রায় আপনা হইতেই গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিল—যেন আমাকে দেখিয়া তাহার মন আকৃষ্ট হইয়াছে। আর ইহারই মধ্যে কি এমনই পুরানো হইয়া গেলাম যে নিজে হইতে গায়ে পড়া দূরে থাক, আমি গায়ে পড়িতে গেলে সে সরিয়া বসিবার চেষ্টা করে! সেদিন মোটরে করিয়া ষ্ট্রাণ্ডে বেড়াইবার সময়, গোলাপী নেশার আবেশে মনটা যখন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আলিঙ্গন করিবার জন্য একটু ঘেঁসিয়া বসিবামাত্র এমন সন্ত্রস্তভাবে ধারের দিকে সরিয়া গেল, যেন মণিমোহন ড্রাইভারটা আমাদের কোন গুরুজন, তাহার পিছনে দুইটা চোখ না থাকিলেও তাহার উপস্থিতিতে তাহার পশ্চাৎ দিকেও অমন আলিঙ্গন চলিতে পারে না। না না তোমরা হাসিও না, এটা আমার গোলাপী নেশার কল্পনা নয়। সরিয়া বসিয়াই এমন ভীতিবিহ্বলনেত্রে সে মণিমোহনের দিকে চাহিয়াছিল যে ঐ গুরুজনটী এই ব্যাপারটা দেখিয়া থাকিলে যেন মহা লজ্জার কথা হইবে, বা বাড়ী গিয়া এই বেয়াদপির জন্য কোন গুরুদণ্ড পাইতে হইবে। হুঁঃ কলিকাতা সহরের ড্রাইভাররা নাকি আবার মানুষ! বাবুরা বা বিবিরা নাকি আবার মানুষ বলিয়া তাহাদিগকে গণ্য করে? না তাহাদের উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করে? যত মানুষ হইল কি আমার এই মণিমোহন ড্রাইভারটি!

(৮)

আসিয়াছিলাম অভিনয় দেখিতে, কিন্তু ভাবী প্রিয়া সম্বন্ধে এমনি সব বিরুদ্ধ দুশ্চিন্তা মনে জাগিলে কি অভিনয় দেখা হয়! একটা দৃশ্য শেষ হইল। প্রেক্ষাগৃহে আলো জলিল—, ঐক্যতান বাজিতে লাগিল। কিন্তু ঐক্যতান কে শোনে? অনর্থক বেচারীরা বাঁশী ফুঁকিয়া বুক খারাপ করে। অমন ধন্যবাদ-হীন কাজ থিয়েটারের মধ্যে প্রমটার ব্যতীত আর কাহারও আছে কি না জানিনা। আমি কনসার্টের উল্টা দিকে মুখ ফিরাইয়া নীচে উপরে কেমন লোক হইয়াছে, পরিচিত কেহ আজ আসিয়াছে কিনা—দেখিতে লাগিলাম।

নীচের দেখা শেষ করিয়া, একধার হইতে যখন উপরের বক্সগুলা দেখিয়া চলিয়াছি তখন একটা বক্সে কি যেন দেখিলাম—চক্ষুকে কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। একি সম্ভব? একি হইতে পারে? চক্ষু দুইটা বেশ করিয়া মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় দেখিলাম—সেই একই দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে

জাগিয়া রহিয়াছে। আবার চক্ষু-মার্জ্জনা করিয়া চাহিলাম—সেই একই দৃশ্য! ভুল? বারবার কি কাহারও চোখ এত ভুল দেখিতে পারে? বারবার তিনবার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় সেইদিকে চাহিলাম--দেখিলাম—মণিমোহন বাইভার মীনার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া এমন কাছাকাছি মুখ রাখিয়া কথা কহিতেছে যে ওঃ আজও তাহা লিখিতে গিয়া হাত কাঁপিয়া উঠিতেছে! হাতে একটী কাচের গ্লাস আর পিছনের চেয়ার হইতে একটী মদের বোতল ও কয়েকটী সোডার বোতল গলা বাড়াইয়া যেন উঁকি মারিতেছে। এমন সময় গ্লাসটী মণিমোহন মীনার মুখে ধরিল, আমি সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া, চেয়ারের হাতে বাহুদ্বয় সংবদ্ধ করিয়া তাহাতেই মুখ লুকাইলাম। যখন মুখ তুলিয়া চাহিলাম, তখন সেই অতিসূক্ষ্ম নেটের পরদা ভেদ করিয়াও চোখে পড়িল—মীনা মণিমোহনকে চুম্বন করিতেছে!

চক্ষের সম্মুখে দেখিলাম কিন্তু ব্যাপারটা এমনই অবিশ্বাস্য যে তবু মনে হইল বুঝিবা দূর হইতে ভুলই দেখিলাম। একবার নিকট হইতে দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করা উচিত।

বক্সের গার্ডকে একজন লোকের সহিত দেখা করিব বলিয়া উপরে গেলাম কিন্তু বক্সের দরজা বন্ধ। যেটুকু ফাঁক রহিয়াছে তাহাতে পিছনের খানিকটা দেখা গেল—মুখ দেখা গেল না।

তখন আর একটা উপায় মাথায় ঠেকিল। রাস্তায় আসিয়া যেখানে সারিবন্দী গাড়ী মোটর প্রভৃতি দাঁড়াইয়া আছে -একধার. হইতে দেখিয়া চলিলাম—তাহার মধ্যে আমার মোটর আছে কি না? আছে। একটা কে ছোট ছোঁড়া তাহার মধ্যে ঘুমাইতেছে। তাহাকে জাগাইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কাহার মোটর? সে উত্তর দিল, মণিমোহন বাবুর! হুঁ মোহনই বটে, তবে মণিমোহন নয়—মীনা-মোহন!

জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবুর সঙ্গে আর কে আসিয়াছে? উত্তর দিল, বাবুর বিবি। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "ঘরের না বাইরের?" বালক বিরক্ত হইয়া বলিল "অত কথায় আপনার দরকার কি মশা! আমি জানি না!"

আমি ধৈর্য্য হারাইয়া বালকের কাণ ধরিয়া বেশ করিয়া নাড়া দিয়া বলিলাম, বল্ নইলে মার খাবি। বালক কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বাইরেরই হবে। আমাদের ঘরে তো থাকে না। বালকটীর বাবু সম্বোধনেই বুঝিলাম যে সে মণিমোহনের ভৃত্য হইবে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, রোজই কি তোর বাবু বিবিকে নিয়ে থিয়েটারে আসে? বালক কহিল, রোজই থিয়েটারে আসবে কেন। তবে যেদিন থিয়েটারে আসে সেদিন গাড়ী আগলাবার জন্তে আমাকে নিয়ে আসে। অন্যদিন কোথায় যায়,—যায় কি না যায়—তা আমি জানি না।

বুঝিলাম বালক সত্যই বলিয়াছে—ইহার অধিক সে আর জানে না সুতরাং তাহাকে আর প্রশ্ন করা বৃথা।

একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, তোর বাবু করে কি? উত্তরে বালক বলিল, কোন এক রাজার গাড়ী চালায়।

মণিমোহনের নিকট আমি মোটর চালাইতে শিখিয়াছিলাম—লাইসেন্সও পাইয়াছিলাম। বালককে বলিলাম, গাড়ী আমি নিয়া যাইব, তুই নাম।

আশ্চর্য্য হইয়া বালক বলিল, সে কি মসা? আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ষ্টিয়ারিংএ গিয়া বসিলাম এবং সেলফ্ ষ্টার্টার দ্বারা ষ্টার্ট করিলাম। বালক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সেই চীৎকারে যাবতীয় ড্রাইভার নিজ নিজ গাড়ী হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল। বলিলাম, আমার ড্রাইভার লুকিয়ে আমারই গাড়ীতে করে তার রক্ষিতাকে নিয়ে এসেছে। গাড়ী আমি নিয়ে যাব।

ড্রাইভারগণ আমার কথার সঙ্গে সঙ্গেই সরিয়া গেল; বালকটী ছুটিয়া থিয়েটারে ঢুকিল এবং ক্ষণেক পরেই দেখি, মণিমোহন ও মীনা একটু দূরে থিয়েটারের সিঁড়ি হইতে ভীতিবিহ্বল নেত্রে আমাকে দেখিতেছে,—আর অগ্রসর হইয়া কাছে আসা দূরে থাক, সেই গাড়ীর ভিড়ের মধ্যে কোনদিকে যে অদৃশ্য হইয়া গেল, আর ঠাহর করিতে পারিলাম না।

বালকটী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। কিন্তু আর কোনরূপ বাধা দিবার চেষ্টা করিল না। আমি বাড়ীর দিকে না গিয়া মীনার বাড়ীর দিকে গাড়ী চালাইয়া দিলাম।

(৯)

মীনার মার খুব জাগন্ত ঘুম। এক ডাকেই সাড়া মিলিল। দ্বার খুলিবামাত্র আমাকে দেখিয়া তাঁহার মুখের যেরূপ ভাব হইয়াছিল তাহা ফটো তুলিলে বোঝানো যাইতে পারে—লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য অন্ততঃ আমার তো নাই। থতমত খাইয়া গ্যাজাইয়া গ্যাজাইয়া তিনি বলিলেন "এত রাত্রে যে বাবা? মীনা যে ঘুমুচ্ছে।"

বেচারীর অবস্থা দেখিয়া সেই দুঃখেও আমার হাসি আসিল, বলিলাম "না, মীনা মণিমোহনের সঙ্গে থিয়েটারে বসে মদ খাচ্ছে—বাড়ীতে ঘুমিয়ে নাই।"

মীনার মা দাঁড়াইয়াছিলেন, থপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। থিয়েটারে যাহা দেখিয়া আসিলাম আদ্যোপান্ত তাহা মীনার মাকে বলিলাম। প্রথম দোষ স্খালনের চেষ্টাতেই মুখ থাবড়া খাইয়া মীনার মা ঘাড় হেঁট করিয়া সমস্ত শুনিয়া গেলেন—একবারও হাঁ, না, কিছুই বলিলেন না। শেষে আমি যখন বলিলাম, যে এই শেষ, আর আপনাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ রহিল না, তখন তিনিও বলিলেন—আমারও না। কতবার নিষেধ করিয়াছি—কাঁদিয়াছি—হাতে ধরিয়াছি. কিছুতেই মণিমোহনকে ছাড়িল না। আত্মহত্যা করিবার পর্য্যন্ত ভয় দেখাইয়াছি, তবুও না। আমি ভদ্রমহিলা, আমার স্বামী ভদ্রলোকই ছিলেন, মেয়ের এমন কুমতি কেন হইল বুঝি না। মণিমোহনকেও ছাড়িবে না, আবার সকল ভদ্রলোককেই আশাও দিবে। তাই মণিমোহনকেই বিবাহ কর—করিয়া আমার যা কিছু আছে তাই লইয়া আর চাকরী বাকরি করিয়া একরকম করিয়া থাক, তাও না। এদিকে মেয়ের আমার উঁচু নজর। গহনা কাপড়, গাড়ী মোটর যোগাইবার জন্য একজন বড়লোক স্বামী চাই, আবার মণিমোহনকেও চাই। মণিমোহনকে বিবাহ করিলে তো সে সব হইবে না—তাই বিবাহ তাহাকে করিবে না। তোমার মত এমন স্বামী, অগাধ ঐশ্বর্য্য সে পায়ে ঠেলিল—এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি আছে? আমিও আজ হইতে তাহাকে ত্যাগ করিলাম। শেষে লোকে আমাকেও বলিবে—আমিও বোধহয় ইহার মধ্যে আছি। মেয়ে যদি আমার মরিয়াও যাইত—আমি বাঁচিতাম—আমার হাড় জুড়াইত। মীনার মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সান্ত্বনা কে কাহাকে দিবে? আমি কোন কথা না বলিয়া নীরবে সরিয়া পড়িলাম।

(১০)

তারপর প্রায় তিন বৎসর অতীত হইয়াছে। আজও আমি বিবাহ করি নাই—কখন করিবার আশাও নাই। বিবাহ ও করিতে হইবে তো স্ত্রীলোককে? সে যে মীনার মত না হইবে তাহার প্রমাণ কি? আর সমস্ত ঠিকই আছে। —বেশীর মধ্যে ভালর দিকে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা মিলিয়াছে। থিয়েটারে আমার নাটকের খুব নাম—থিয়েটারে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। মন্দের দিকে জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, সুতরাং মদের মাত্রা অসম্ভব রকম বাড়িয়াছে!

যখন প্রথম থিয়েটারের ভিতর যাইতে আরম্ভ করি তখন অনেক অভিনেত্রীই আমার ঐশ্বর্য্যের গন্ধ পাইয়া আমাকে হস্তগত করিবার হাস্যকর চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আমি থিয়েটারে সম্মানহানির আশঙ্কায় সে পথেও যাই নাই। অভিনেত্রীদের স্বরূপ আমি দেখিয়াছিলাম—সে রূপ দেখিলে অসচ্চরিত্রও সচ্চরিত্র হয় সুতরাং সেখানে আমি ঠিক ছিলাম। তা বলিয়া বেশ্যালয় আমার অপরিচিত স্থান নহে। এমনি ভাবেই দিন কাটিতেছিল।

আমার নাটক অভিনয়ের পর যখন ছাপা হইল, তখন থিয়েটারের সকল অভিনেতা অভিনেত্রীকেই একখানি করিয়া বই উপহার দিয়াছিলাম। বইয়ের প্রথমেই আমার ফটো দিয়াছিলাম—তখন জানিতাম না যে পাঠকে যখন খ্যাতিসম্পন্ন গ্রন্থকারের চেহারা দেখিতে চায়, তখন গ্রন্থকারের ফটো প্রকাশকেরাই দেয়। নিজের ফটো নিজে দেওয়ার মধ্যে যে অহঙ্কার লুকানো আছে—তাহা স্পষ্ট তখন চোখে পড়ে নাই। যাহা হউক এই ফটো দেওয়ায় আমার যেটুকু কায হইয়াছিল তাহা বলিতেছি।

ননী বলিয়া যে একট্রেসটী আমার নাটকে নায়িকা সাজিত, সে একদিন বলিল, মহাশয়, আমার বাড়ীর নীচের তলায় একজন ভাড়াটে, আমাকে আপনার যে বই দিয়েছিলেন তাতে আপনার ফটো দেখে এবং আপনার সঙ্গে আমার আলাপ

আছে জেনে, আপনাকে একবার আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে বলেছে। আপনি যাবেন কি? আমার বাবুর সঙ্গে তো আপনার সদ্ভাব আছে—তিনিও থাকবেন।

বুঝিলাম ননীর নিজের কোন কুমতলব নাই। সে কেবল তাহার বান্ধবীর হইয়া ওকালতী করিতেছে মাত্র।

কে তাহার সেই বান্ধবী জানিতে চাহিলাম কিন্তু কোন-মতেই নাম বলিল না, কেবল বলিল, আগে চলুন না, তারপর স্বচক্ষেই দেখবেন?

আমি ভাবিলাম, ক্ষতি কি? কে পুরাতন আলাপী গরজ করিয়া আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছে, দেখিয়াই আসি-না-কেন। বলিলাম, কাল যেতে পারি কিন্তু তোমার বাড়ী তো আমি চিনি না।

ননী বলিল, আমার বাবু আপনাকে নিয়ে যাবেন, আপনি বেলা ১১।১২টার সময় থিয়েটারে আসবেন।

তাহাই হইল। ননীর বাবুর সঙ্গে ননীর বাড়ী গেলাম। দিনের বেলায় বেশ্যালয়ে ঢুকিতে গা কেমন ছমছম করিতে লাগিল তবু চোখ বুজিয়া চট্ করিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম।

এক সুসজ্জিত ঘরে আমি নীত হইলাম, সেখানে ননী এবং থিয়েটারেরই আরও দুইটী ছোট মেয়ে শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল। আমরা প্রবেশ করিতেই তাহারা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ছোট মেয়ে দুইটী অসম্ভাবিত আগন্তুককে দেখিয়া যেন সাফল্যের উল্লাসেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইবার পরই ননী বাহির হইয়া গেল এবং ক্ষণেক পরে অপর একজন স্ত্রীলোককে হাত ধরিয়া হড়হড় করিয়া টানিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

এ কি! এ যে—এ যে—সেই মীনা নয়? সেই তো বটে! কিন্তু কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! সে লাবণ্য নাই, সে বিলাস নাই, সে স্বাস্থ্য নাই, এ যেন দীনা, শীর্ণা কোন কাঙ্গালিনীর মূর্ত্তি! লজ্জাহীনের মত অপলক দৃষ্টিতে উভয়ে উভয়ের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম—কেহ কাহাকেও কোন কথা বলিল না—বলিবার সামর্থ্যও বোধ হয় কাহারও ছিল না।

অভিভূতের ভাবটা কতকটা কাটিলে, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি—তুমি—এ বেশ্যা বাড়ীতে? মীনা কোন উত্তর করিল না—কেবল একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু নত করিল।

ননী বলিল, ও হরি, আপনি তাও জানেন না। ও যে আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হল বেরিয়ে এসে, খাতায় নাম লিখিয়েছে; তবে আমাদের পাড়ায় এই মাস দুই হ'ল এসেছে; তখন থেকেই আমার সঙ্গে খুব ভাব। আমরা কেউ কারো কাছে কোন কথা গোপন করি না। তাই তো আপনার বইয়ে আপনার নাম ও ফটো দেখে, আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে এবং আপনাকে আমার বাড়ীতে একবার নিয়ে আসতে অনুরোধ জানায়। যেদিন আপনি ওকে থিয়েটারে আপনার ড্রাইভারের সঙ্গে দেখে, ওর মাকে সব ব্যাপার জানিয়ে আসেন, সেই দিনই ওর মা, থিয়েটার থেকে ফিরে বাড়ী ঢুকতেই ওকে তাড়িয়ে দেয়। মণিমোহন ড্রাইভার তখনও চলে যায় নি, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। ও—ও রাগের মাথায় তখনি বেরিয়ে আসে কিন্তু মণিমোহন ওকে গহনা কাপড় সব নিয়ে আসবার জন্যে ফিরে পাঠায়। মাকে চাবী চাইবামাত্র, মাও রাগের মাথায় চাবী ফেলে দেয়। ও—ও গহনা আর কাপড়ের বাক্স মণিমোহনের সাহায্যে ধরাধরি করে নিয়ে এসে গাড়ীতে তোলে। তারপর মণিমোহন ওকে সোণা-গাছির একটা বাড়ীতে এনে তোলে এবং মাসখানেক পরেই ওর গহনাগাঁটি বাগিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়। তারপর নানা রকমের সব বাবু জোটে—তার মধ্যে ভালমন্দ দুই-ই ছিল। তা ও হতভাগী লক্ষ্মীছাড়ী—ওকি কিছু রাখতে পেরেছে? চপ কাটলেট মদ খেয়ে—বাবুদিগে খাইয়ে আর বাবুগিরি করেই সব উড়িয়ে দিয়েছে। যখন দিন চলে না—এমন অবস্থা হল, তখন সে পাড়ায় আর তিষ্ঠুতে না পেরে আমা-দের পাড়ায় উঠে এল। মাসখানেক তো আমিই ওকে খাওয়ালুম। কিন্তু একটা ভাল রকম বাবু কিছুতেই জুটিয়ে দিতে পারছি না। ওর নিমকহারাম বদনাম বেরিয়ে গেছে—কোন ভাললোক ঘেঁসতে চায় না।

আমি চিত্রার্পিতের মত স্থির হইয়া আদ্যোপান্ত শুনিলাম। অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আপনিই বাহির হইয়া গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা পৈশাচিক উল্লাসে হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া

উঠিল। মনে হইল—বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! নিমক হারামীর—কামুকতার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তই হইয়াছে। স্নেহপূর্ণস্বরে মীনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তা' আমাকে কি জন্য ডাকা হয়েছে?

মীনা তেমনি নিরুত্তর। ননীকে বলিলাম, তোমার হৃদয় আছে জেনে বড় সুখী হলুম, তোমার সদিচ্ছার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ কিন্তু আমাকে বাদ দাও। মীনার বাবু হবার মত যোগ্যতা আমার নাই। এই বলিয়া হাতের গ্লাসটার মদটুকু শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মীনা মূর্চ্ছিতা হইয়া তাহার সখীর কোলে ঢলিয়া পড়িল। আমি দেখিয়াও না দেখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

(১১)

মদতো বরাবরই খাইতাম। মাঝে মাঝে দিনেও চলিত। ক্রমেই লাগাড় ভাবে চলিতে লাগিল। নিদ্রার সময়টুকু মাত্র যা বিরাম, তারপর বাকী সমস্তক্ষণই মদ আর মদ! আজকাল লিভার কনকন করে, কোন কিছু খাইতে গেলে বমি আসে, লিখিতে গেলে হাত কাঁপে, হাঁটিতে কষ্ট হয়, সর্ব্বদাই—বিশেষ করিয়া নেশা একটু ছাড়িয়া আসিলে কেমন ভয় ভয় আর বুক গুর-গুর করে। বিষয় কর্ম্ম দেখা ছাড়িয়া দিয়াছি—দেখিবার শক্তি নাই, ভদ্রলোক কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, পারত পক্ষে এড়াইতে কসুর করি না। নিজের পূর্ব্ব জীবন এবং বর্ত্তমান জীবন তুলনা করিয়া কত সময় গোপনে কাঁদি; মনে হয়,—মীনা আমার কে? সে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া আমি কেন আমার জীবনটাকে নষ্ট করিতেছি! কিন্তু বদভ্যাসের এমনি দোষ যে, সমস্ত বুঝিয়াও ছাড়িতে পারি না। সময় হইলে কে যেন কেশাকর্ষণ করিয়া বোতলের নিকট লইয়া যায়।

কাটুক—যে কয়টা দিন পৃথিবীতে আছি, এমনি করিয়াই কাটুক। আশা নাই, উৎসাহ নাই, জীবনে কোন লক্ষ্য নাই, কেবল মদ আর মদ! তবু ভাই সব, তোমাদিগকে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এ বিষ যেন কেউ ঔষধের হিসাবেও ছুঁইয়ো না। তাহলে তোমাদেরও যে আমার মত দশা, আমার মত সর্ব্বনাশ হইবে না, তাকে বলিতে পারে? তবু মদই আমার একমাত্র বন্ধু! অশান্তিতে মন যখন পূর্ণ হইয়া উঠে তখন মদই নিদ্রা আনিয়া আমাকে শান্তি দেয়। হে ভগ্ন-হৃদয়ের বন্ধু আমার! তোমাকে আমি নমস্কার করি, আর সকলে যেন দূর হইতেই তোমাকে নমস্কার করে। এখন প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছি, কবে সেইদিন আসিবে যেদিন তোমারই কৃপায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া প্রেমের জ্বালার হাত এড়াইব!

তরু

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

আমি ভাবি,—দেখ্‌ব সে কি আর?
তরুর শোভা যেমনতর মরি,
কবিতাও তেম্নি চমৎকার!

তরুটি ঐ কেমন মৃদু দোলে
আঁকড়িয়া পরাণপণে মাটি,
শিশুর মতো আপন মায়ের কোলে!

তরুটি ঐ সারাটি দিন ধরি
চেয়ে আছে স্বর্গলোকের পানে,
শাখার বাহু ঊর্দ্ধমুখী করি!

তরুটিতে নিদাঘ দিবস এলে,
বাঁধ্‌বে পাখী কুলায় কেমন চারু,
গানের সুধা কণ্ঠ থেকে ঢেলে!

তরুটিতে বৃষ্টিধারা ঝরি,
পরিয়ে দেবে মোতির মালাখানি
সজল-শোভায় নিখিল পরাণ ভরি'!

কবিতা সে আহাম্মকের দান,
আমি যেমন তাদেরি একজন,
তরু, সে যে রচেন ভগবান!

ট্রামের খোরাক্

[শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু]

মেয়ে মানুষ কি পারে না ?

আগে দেখা যাক্, মেয়ে মানুষ কি পারে ?

মেয়ে মানুষ কোন কাজ 'কর্‌ব না' বলে' চিরকাল সেই কাজটা না করে' যেতে পারে; উপরন্তু স্থল বিশেষে সে এমন মোলায়েম্ মিষ্টি প্রাণ-গলানো নীচু স্বরে 'না' কথাটি বল্‌তে পারে, যাতে করে' স্বচ্ছন্দে তার মানে 'হাঁ' বলে' ধরে' নেওয়া যেতে পারে।

তাকে যদি উপযুক্ত পরিমাণে আনাজ আর একখানা ধারালো বঁটি দিয়ে কুট্‌নো কুট্‌তে দেওয়া যায়, তা'হলে সে আঙুল না কেটে সারাদিন নির্ব্বিকার চিত্তে কুট্‌নো কুটেই যেতে পারে।

সে—দুরন্ত কাঁদুনে ছেলে কোলে নিয়ে আদ্ধেক রাত পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে দোলাতে নাচাতে পারে,—একবারও ছেলেকে রেগে আছ্‌ড়ে মেরে ফেল্‌তে চায় না, যদিচ বাপ-মশায় নাসিকা-ধ্বনির একতারা থামিয়ে বজ্র-গম্ভীর স্বরে মাঝে মাঝে ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সে—বিয়ের ষাট বছর পরেও তার স্বামীর শুক্‌নো ঠোঁটের প্রেমের চিহ্ন ঠিক তেম্‌নি আগ্রহে গ্রহণ ও তেম্‌নি পরিপূর্ণ-ভাবে উপভোগ কর্‌তে পারে—যেমনটি সে পনের বছরের সময় করেছিল।

সে—বছরের পর বছর ধরে অশ্রদ্ধা, অনাদর ও উপেক্ষা মুখ বুঁজে সহ্য করতে পারে এবং একদিনের সামান্য একটা মিঠে কথায় সেই ঝঞ্ঝা-বাদলের বিষণ্ণ স্মৃতি মন থেকে নিমেষে মুছে ফেল্‌তে পারে।

সে—নিজের ও পাড়া-পড়সির কাছে ধার-করা কাপড়—অলঙ্কার পরে' হাসিমুখে নেমন্তন্ন খেতে যেতে পারে এবং বাড়ী এসে নিদ্রাতুর স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করে' তাঁর কাণের পাতা খাড়া করে' তুলে—কার বউ বা মেয়ে কি রঙের কত দরের কাপড় জামা পরে এসেছিল এবং কি প্যাটার্ণের কত ভরির গহনা গায়ে চড়িয়ে বেড়িয়েছিল, তা মহাভারতের সঞ্জয়ের মত অকপটভাবে যথাযথ বর্ণনা করে যেতে পারে।

স্বামী যখন বাড়ীতে রাত করে' ফেরার কৈফিয়ৎ স্বরূপ একটা মস্ত গাঁজাখুরী গল্প সুরু করে' দেন্, তখন সে এমন বিশ্বাস-বিহ্বল চোখে কথাগুলো হজম করে' যেতে পারে যে স্বামী স্বপ্নেও ভাব্‌তে পারেন না যে স্ত্রী-রত্নটি মনে মনে তাঁকে একটা মস্ত মিথ্যাকথার বিরাট মনুমেণ্ট্ বলে' জানে।

সে—আরও কত কি কর্‌তে পারে ? সে মটরগাড়ী চড়্‌তে ও চালাতে পারে, সে বর্শী দিয়ে মাছ ধর্‌তে পারে, সে 'ভার্সিটির ডিগ্রী লাভ কর্‌তে পারে, সে হেড্‌মিষ্ট্রেস্ লেডী প্রফেসর বা লেডী-ডাক্তার হতে পারে, উকীল ও ব্যারিষ্টার বণ্‌তে পারে, রোজগার করে স্বামীপুত্রকে খাওয়াতে পারে; পুরুষ লোক যে কাজটা সাধ্‌তে একঘণ্টা লাগায়, সেটা সে দুই মিনিটে বাগাতে পারে; দেবতা থেকে আরম্ভ করে' ছোট বড় পৃথিবী পতিদের সে নিজের তর্জ্জনী সঞ্চালিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ বশে রাখ্‌তে পারে। জলে স্থলে মরুদ্ব্যোমে ইচ্ছা ও ইচ্ছানুযায়ী সকল কাজই কর্‌তে পারে। হ্যাঁ স্বীকার করি, পারে! কিন্তু একটি কাজ ছাড়া...

হায়! মেয়েমানুষ নারিকেল গাছে চড়্‌তে পারে না!!

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

[শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ]

উপন্যাসে অনেকটা গল্পের বাহার থাকে। বিশেষতঃ প্রাচীন উপন্যাসে গল্পের বাহুল্য কিছু প্রবল। যে দেশের উপন্যাস হইতে আমাদের দেশের উপন্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে দেশের প্রাচীন উপন্যাস অধিকাংশ স্থলে এইরূপ রহস্যময় গল্পাংশ লইয়া রচিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমকার উপন্যাসে এই গল্পের বা plotএর উপর কিছু বেশী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পরবর্ত্তী উপন্যাসে, জটিল গল্পাংশ ক্রমশঃ সরল হইয়া আসিলেও উহা একেবারে প্লট বর্জ্জিত নহে। মাত্র তাঁহার দুইখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে আমরা এই গল্প বা প্লটের বাহুল্য দেখি না—বিষবৃক্ষ, ও কৃষ্ণকান্তের উইল। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, সীতারাম প্রভৃতি অধিকাংশ উপন্যাসই জটিল গল্প বা প্লট লইয়া রচিত হইয়াছে, এবং এই গল্পাংশই ক্রমাগত পাঠকের আগ্রহকে জাগাইয়া রাখে। এই গল্পাংশের সহিত তাঁহার উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রের সামঞ্জস্য বরাবর রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বর্ণিত গল্প প্রায় অস্বাভাবিক হয় নাই।

সুকুমারী দত্ত

দুই এক স্থানে যে ব্যতিক্রম হইয়াছে তাহা নাটকে অভিনয় কালে যতটা ধরা পড়ে, পড়িবার সময় ততটা চোখে ঠেকে না। দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীতে দেখা গিয়াছে, দুই চারিটা ঘটনা কল্পনায় বেশ খাপ খায় কিন্তু অভিনয় কালে—বাস্তব-ব্যবহারে তাহা ততটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কতলুখাঁকে খুন করিয়া বিমলার নির্ব্বিঘ্নে নারীর নিশ্চিন্তমনে বসিয়া থাকা বা ততোধিক নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইয়া পড়া, অনেকটা গল্প বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ অভিনয় কালে, নেপথ্যে যবন সেনা চীৎকার করিতেছে আর রঙ্গমঞ্চের উপর দর্শকের সম্মুখে মৃণালিনী ও গিরিজায়া ঘুমাইতেছে—ইহা বিসদৃশই ঠেকে। কিন্তু যে কথা হইতেছিল। রহস্যময় গল্পের সৃষ্টি করিতে গিয়াই এইরূপ ঘটনার

বিনোদিনী

পর্য্যায় কোন বস্তু-তান্ত্রিকই একান্ত সম্ভবপর বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। মৃণালিনীতেও যখন গৌড়নগরী মুসলমান সৈন্য বিধ্বস্ত করিতেছে, চারিদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা, সে সময়ে ঐ নগরীরই উপকণ্ঠস্থ কোনও উদ্যানে—যেথান হইতে নগর-ধ্বংসকারী মুসলমান সৈনিকগণের উচ্চ কোলাহল সুস্পষ্ট শোনা যাইতেছে, সেইখানে মৃণালিনীর মত ভীরু-স্বভাবা জাল ছড়াইয়া পড়ে এবং সে জালের দুই একটা বাঁধন আলগাও হয়, পলকাও হয়। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিবার সময় এ সকল ঘটনা বাদ দিলে নাটকেরও অঙ্গহানি হইয়া পড়ে এবং বাদ না দিলে এইরূপ স্থলে নাটকও কম-জোরি হয়।

আর এক কথা,—গল্পের সূত্র এবং পারম্পর্য্য বরাবর

অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া নাটকও ভারী হইয়া পড়ে। দিন বদলাইতেছে। (আগেকার মত ছয় কি সাত ঘণ্টা ধরিয়া নাটক দেখিবার সময় ও সখ এখনকার দর্শকের নাই। যাত্রার আসরে থিয়েটার বসিয়াছিল বলিয়া তখনকার নাটকে বক্তৃতাও যেমন খুব লম্বা লম্বা হইত, ঘটনার পর ঘটনাও তেমনি বিস্তৃতভাবে যোজিত থাকিত। অভিনয়ে অত্যোদয়

যিনি থিয়েটারের জন্য নাটক লেখেন তাঁহাকে অনেক সময় দল দেখিয়া নাটক লিখিতে হয়। সম্প্রদায়ে অভিনেতা অভিনেত্রীর সংযোগ যেমন থাকে, সেইভাবেই নাটকের পাত্র পাত্রীকে সাজাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কারণ, অভিনয়ই নাটকের জীবন। সু-অভিনয় না হইলে অনেক সু-নাটকও মাঠে মারা যায়। রসশিল্পের অণুমাত্র ব্যতিক্রম

তিনকড়ি

অতীত হইলেও দর্শক বিরক্ত হইতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী প্রভৃতির অনেক অংশই এখন বাদ দিয়া অভিনয় করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়িয়া পাঠকও এমন অভ্যস্ত হইয়াছেন, যে অভিনয় কালে এইরূপ বাদ সত্ত্বেও উপন্যাস বর্ণিত মূলরসের কোন ব্যাঘাত হয় না।

না করিয়া বরং নাট্যশিল্পের চরমোৎকর্ষের সহিত, যিনি সম্প্রদায় বিশেষের শক্তি ও সামর্থ্য উপযোগী নাটক লিখিতে পারেন, তাঁহারই নাটক শুধু যে তাৎকালিক রঙ্গমঞ্চের স্থায়িত্ব বিধান করে এমন নহে, নাট্য সাহিত্যেও তাহা চিরদিনই আদর্শ রূপে আপনার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ

মাঝে। বঙ্কিমচন্দ্র থিয়েটারের জন্য বই লেখেন নাই; গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। যে সম্প্রদায়ের জন্য যখন প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের অভিনেতা অভিনেত্রীর সমাবেশ অনুসারে তাঁহাকেও এই উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণের তারতম্য করিতে হইয়াছে। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত খাতারও এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ন্যাসানাল থিয়েটারের আমলে, জগৎসিংহের ভূমিকা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করিতেন; ঐ ভূমিকায়ও সেইভাবে জোর দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং ওসমান অপেক্ষা তখন জগৎসিংহই অভিনয়ে স্ফুটিত অধিক। ওসমান উপন্যাসেও যেমন, নাটকেও তেমনি উপনায়ক (sub-hero) হইয়াই থাকিতেন।

আয়েষার ভূমিকায় তারাসুন্দরী

পুরুষ চরিত্রেও যেমন, স্ত্রী চরিত্রেও তেমনি দেখা গিয়াছে, অভিনেত্রীর শক্তি ও স্বভাব বুঝিয়া গিরিশচন্দ্রকে উপন্যাস বর্ণিত স্ত্রী চরিত্রের উপর নানাভাবে রং ফলাইতে হইয়াছে। এইজন্যই কখনো তিলোত্তমা নায়িকারূপে দেখা দিয়াছে,

কখনো বা আয়েষা উপনায়িকা (sub-heroine) হইলেও তিলোত্তমাকে চাপা দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যখন স্বর্গীয়া সুকুমারী দত্ত বিমলা সাজিতেন, তখন আবার লিপি চাতুর্য্যে ও অভিনয় নৈপুণ্যে বিমলাই দর্শকের চিত্তকে সমধিক আকৃষ্ট করিত। বঙ্গের অভিনেত্রীকুল-রাজ্ঞী বিনোদিনীকে প্রয়োজনানুসারে কখনো আয়েষা, কখনো বা তিলোত্তমা সাজিতে হইয়াছে। তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভাগুণে এবং গিরিশচন্দ্রের লিপিকৌশলে তিনি যখন যে ভূমিকা গ্রহণ করিতেন সেই ভূমিকাই উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইত। কিন্তু এ সকল আমার শোনা কথা, ইঁহাদের এই সকল ভূমিকার অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বে মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় আমি দেখিয়াছিলাম। সম্প্রদায়ের সামর্থ্য অনুসারে এই সময় গিরিশচন্দ্র নূতন করিয়া দুর্গেশনন্দিনী ড্রামাটাইজ করেন। এবারে আয়েষা শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরী, ওসমান শ্রীযুক্ত দানীবাবু এবং বিমলা স্বর্গীয়া সুশীলা, (পরে স্বর্গীয়া তিনকড়ি)। সুশীলা সুগায়িকা বলিয়া বিমলার ভূমিকায় অনেকগুলি গান দেওয়া হইয়াছিল। এবারের অভিনয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল, ওসমান ও আয়েষা। গিরিশচন্দ্র দুই একরাত্রির জন্য বীরেন্দ্রসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয় অতুলনীয় হইলেও, আয়েষা ও ওসমান রঙ্গমঞ্চে দর্শকের চিত্তকে অধিক বিভ্রান্ত করেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

নাটকের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল আয়েষাকে ক্রমশঃ বর্ষার মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় আমরা বিষাদ-আচ্ছন্ন দেখি। উপন্যাসে এই বিষাদ গাঢ় হয় আয়েষার জগতসিংহকে পত্রলেখার পরিচ্ছেদে। এই বিষাদ উপন্যাসে গাঢ়তর হইয়াছে, যেখানে সে তিলোত্তমাকে

অলঙ্কার পরাইয়া বিদায় লইতেছে। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে যখন তিলোত্তমা গরলাধার অঙ্গুরীয় দুর্গের পরিখা-জলে নিক্ষেপ করিল, তখন এই অপূর্ব্ব নারী-চরিত্র ভারে ভারে বিষাদরাশি লইয়া পাঠকের সম্মুখে এক অপরূপ বিষাদময়ী মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। রঙ্গমঞ্চে তিলোত্তমার নিকট বিদায়ের দৃশ্যে নাট্যকারকে বঙ্কিম-বর্ণিত আয়েষাকে ফুটাইবার জন্য নূতন করিয়া কিছু লিখিতে হয় না। কিন্তু পত্রলেখার দৃশ্যে যেখানে সুদীর্ঘ স্বগত উক্তি ভিন্ন মনোভাব প্রকাশের অন্য কোন উপায় নাই, যে দৃশ্যের সাফল্য নির্ভর করে কেবলমাত্র অভিনেত্রীর অসীম গুণপণা ও অভিনয়-নৈপুণ্যের উপর, এবং যেখানে অভিনেত্রীকে সাহায্য করে নাট্যকারের লেখনী;—গিরিশচন্দ্রের নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত দুর্গেশনন্দিনীর সেই দৃশ্যের অভিনয় যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহারই মনে পড়িবে,—একজন পরিচারিকা আর আসমানিকে অলক্ষ্যে রাখিয়া তাহাদের কথোপকথনে নাট্যকার কি কৌশলে এই দীর্ঘ পত্রের বৈচিত্র্যহীন একমুখী তরঙ্গকে ভঙ্গ করিয়াছেন, এবং অভিনেত্রীও সেই সুযোগ পাইয়া কি অতুলনীয় অভিনয় ভঙ্গিমায় আপনার চক্ষের জলে দর্শকের চক্ষে অশ্রুর প্রবাহ বহাইয়াছেন। তাহার পর উপন্যাস-বর্ণিত শেষ দৃশ্যের কথা। উপন্যাসে এই শেষ দৃশ্যের পর আর কিছু জানিবার বা দেখিবার প্রয়োজন হয় না। কবির বর্ণনায় আমরা আয়েষার অঙ্গুরীয় নিক্ষেপে দেখি, যে এ সেই আয়েষাই বটে—যে একদিন মুক্তকণ্ঠে নিশীথে কারাগারে ওসমান ও জগত সিংহের সম্মুখে বলিয়াছিল—"এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর!" যে দৃঢ়তা লজ্জাবনতমুখী কুসুমকোমলা আয়েষাকে একদিন মুখরা করিয়াছিল, সেই দৃঢ়তাই আত্মহত্যার প্রলোভন হইতে রক্ষা করিয়া আজ তাহাকে সত্যসত্যই রমণীললামভূতা করিয়াছে। উপন্যাসে এ দৃশ্য যেমন সমুজ্জল, রঙ্গমঞ্চের উপর কেবলমাত্র স্বগত-উক্তিকারিণী আয়েষার সে ঔজ্জ্বল্য কোথায়? ওসমানকেও আমরা উপন্যাসে হারাইয়া আসি জগৎসিংহের সঙ্গে তাঁহার দ্বৈতযুদ্ধে। উপন্যাসের পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাহাকে না পাইয়াও তাঁহার জন্য আর কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর জীবন্ত অভিনয় দেখিয়া দর্শকের চিত্ত আপনা হইতেই প্রশ্ন করে, ভগ্নহৃদয় প্রত্যাখ্যাত ওসমানের কি হইল? নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এই দুই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন দুর্গেশনন্দিনীর শেষ দৃশ্যে। এখানে বিষাদময়ী আয়েষা বিষাদ-আচ্ছন্ন ওসমানের সঙ্গে কথোপকথনে আপনি ফুটিয়াছে, ওসমানকে ফুটাইয়াছে। স্থান বিষাদময়—নীলবর্ণ গগনমণ্ডলে লক্ষ লক্ষ তারা যেন অগ্নি বর্ষণ করিতেছে, পেচক ঘূৎকারে আয়েষার কর্ণে অবিরাম ধ্বনি তুলিতেছে—বিষাদ,—বিষাদ! গরলাধার অঙ্গুরীয় বলিতেছে আর কেন, এ জীবন তো বিষাদময়, এস আমার সাহায্যে এ যন্ত্রণার শেষ কর।

আয়েষা পরিখা-জলে অঙ্গুরীয় ফেলিয়া দিল। এমন সময় ওসমান বলিল,—ওসমানের বাক্যে সেই জ্বালা, সেই তীব্র ব্যঙ্গ—"নবাবপুত্রী, একবার দেখ্‌তে এলেম। তুমি কেমন আছ দেখ্‌তে এলেম, দেখা দিতে এলেম, কেমন আছি বলতে এলেম। দেখ্‌ছি বড় বিষণ্ণ, কিন্তু কেন? এত ভালবাসার প্রতিদান পাওনি?" আয়েষা বলিতেছে—"ওসমান, আমি প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষিণী নই। যদি তোমার তিরস্কার করবার ইচ্ছা হয়, তিরস্কার কর। ওসমান, তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ, আমি জানি। আমিও বড় কষ্ট পেয়েছি, কি করবো ওসমান, আমি নিরুপায়।"

দুই সমব্যথী—দুই বাল্য-সহচর সহচরী; প্রত্যাখ্যানের জ্বালায়, হতাশ প্রণয়ে দুজনেরই চিত্তে অশান্তি! সে শ্রী নাই, সে রস নাই, হৃদয় যেন তপ্ত অঙ্গারের মেলা। আয়েষা বলিতেছে—"ওসমান, আমি নারী হয়ে সহ্য করচি, তুমি কেন পারচ না?" উত্তরে ওসমান বলিতেছে—"* * * * একবার তোমায় দেখে যাই কেমন আছ, দেখে যাই তুমি কি সহ্য করেচ? তুমি ক'দিন জগৎসিংহকে রুগ্নশয্যায় শুশ্রূষা করেচ? আমি রণে বনে দুর্গমে শয়নে স্বপনে দিবারাত্রি তোমায় দেখেচি। কি সহ্য করেচ? আমার মত সহ্য করনি, আমার মত সহ্য করনি।"

মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের সহিত আয়েষার অস্ফুট কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল—"হা জগদীশ্বর!" যবনিকা পড়িল, দর্শক পরিপূর্ণ বিষাদের দুইটী চিত্র তাঁহার চিত্তে অঙ্কিত করিয়া গৃহে ফিরিলেন। উপন্যাসে বর্ণিত দৃশ্য এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে

—উপন্যাসের মূল চরিত্রকে অটুট রাখিয়া নাটকীয় সম্পদে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

সীতারামেও গিরিশচন্দ্র এইরূপ একটা গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন,—সীতারামের শেষ দৃশ্যের অবতারণায়। উপন্যাসে আছে, শ্রী গঙ্গারামের শবদাহ করিয়া অন্ধকারে কোথায় মিলাইয়া গেল। আর রামচাঁদ শ্যামচাঁদ তামাক খাইতে খাইতে জানাইয়া দিল, মুর্শিদাবাদে সীতারামকে নাকি শূলে দিয়াছে; কিম্বা "সেই দেবতা" আসিয়া সীতারামকে কোথাও লইয়া গিয়াছে। উপন্যাসে রামচাঁদ শ্যামচাঁদ এই বলিয়া তামাক ঢালিয়া সাজিলে কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু রঙ্গমঞ্চের উপর এ সকল দৃশ্যের কোন সার্থকতাই নাই। এত বড় একটা বিয়োগান্ত কাব্য, রঙ্গমঞ্চে তাহার পরিণতি ও তদুপযোগী বিয়োগান্ত দৃশ্যে হইলেই সঙ্গত ও শোভন হয়। উপন্যাসে পড়িয়া এই বিয়োগান্ত রসের কোনো ব্যতিক্রম আমরা উপলব্ধি করি না, কিন্তু অভিনয়কালে শেষ দৃশ্যে তামাক ঢালিয়া সাজিলে দর্শককেও ঢুলিতে হয়। গিরিশচন্দ্র সীতারাম চরিত্রের বিয়োগব্যথিত সুরকে অব্যাহত রাখিয়া নাটকের শেষ দৃশ্যে শ্রীর সহিত কথোপকথনের মধ্য দিয়া উভয় চরিত্রকেই এমনি ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা সত্যই অতুলনীয়। সর্ব্বহারা পরাজিত সীতারাম রণক্ষেত্র হইতে পলাইতেছেন; উদ্‌ভ্রান্ত সীতারাম বুঝিতে পারিতেছেন না, যে তিনি কোন্ সীতারাম! যবনবিধ্বংসী হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সীতারাম, না শ্রীর প্রেমে উন্মত্ত সীতারাম? এমন সময় সন্ন্যাসিনী শ্রী পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা হইয়া বলিতেছে, "আমায় গ্রহণ কর।" সম্মুখে শ্মশান, পশ্চাতে শ্মশান, ঊর্দ্ধে শ্মশান ধূম, পদতলে হিন্দু-মুসলমানের রক্তরঞ্জিত কর্দ্দম, আর তাহারই মাঝখানে সেই সীতারাম, সেই শ্রী! যেন সমস্ত উপন্যাসের স্তরে স্তরে বিন্যস্ত নরনারীর জীবন-আখ্যায়িকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দর্শকের সম্মুখে তাহার পরিপূর্ণ স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। শ্রী বলিতেছে, "মহারাজ, আমায় গ্রহণ কর"। সীতারাম বলিতেছেন,* * * * "করবো, তোমায় গ্রহণ করবো, কিন্তু কোথায় গ্রহণ করবো? অট্টালিকায় তোমায় গ্রহণ করা হবে না, সেখানে রমা মরেছে, নগরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না, সোণার মহম্মদপুরী ভস্মীভূত হয়েছে, কুটীরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না, কুটীর শূন্য করে কুটীরবাসী পালিয়েছে। করবো, তোমায় গ্রহণ করবো, আমার এখনো মমতা যায় নি, চল, স্থান খুঁজিগে চল, স্থান খুঁজিগে চল।" উন্মত্ত সীতারাম কোথায় অনন্তের ক্রোড়ে স্থান খুঁজিতে চলিলেন, শ্রী তাঁহার অনুসরণ করিল। নাটকাকারে সীতারামের পরিশিষ্ট এইখানে। নাটকের শেষ হইল,—দর্শকের চিত্ত-নিবদ্ধ বিষাদ-বাষ্প যেন সীমা ছাড়াইয়া সীতারামের সঙ্গেই কোনো অনির্দ্দিষ্ট কল্পনার রাজ্যে গিয়া গভীর তপ্তশ্বাসে শূন্যে মিশাইল। সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা অভিনেত্রীও এই দৃশ্যে তাহাদের অভিনয়-কলার চরম বিকাশের সুযোগ পাইল। এই দৃশ্যের অভিনয়ে—সীতারামরূপী গিরিশচন্দ্র এবং শ্রীর ভূমিকায় স্বর্গীয়া তিনকড়ি বা শ্রীযুক্তা তারাসুন্দরীকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে, যে এরূপ অভিনয় জগতের যে কোনো রঙ্গমঞ্চকে গৌরবান্বিত করিতে পারিত।

ছিটেফোঁটা

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

আনাতোল ফ্রাঁ—

বিগত এপ্রিল মাসে ফরাসী সাহিত্য-সম্রাট আনাতোল ফ্রাঁর অশীতি-বর্ষ-বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে ইংলণ্ড হইতে এইচ, জি, ওয়েল্‌স্ আনাতোল ফ্রাঁর নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

সমগ্র বিশ্বের জন্য আপনার সাহিত্য সাধনা, তাই আজ সমগ্র বিশ্ববাসী আপনার এই অশীতিবর্ষ-বার্ষিক উৎসবে আপনাকে সসম্মানে অভিনন্দন করিতেছে। বৎসরের তুলনায় আপনার বার্দ্ধক্য আসে নাই—কালের প্রভাব আপনার অন্তরের উপর কোন ছাপ রাখিয়া যাইতে পারে নাই—আপনি আপনার চেষ্টায় পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা যৌবনের গান গাহিয়া চিরস্মরণীয় যশমণ্ডিত হইয়া আছেন আপনি তাঁহাদের ভিতর আপনার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু সব চেয়ে সুখের কথা এই—যে সকল দেশের যুবক সম্প্রদায়, কুলীমজুর এবং দোকানদারগণ পর্য্যন্ত, যাহারা ফরাসী ভাষার ক অক্ষরটুকুও ভাল করিয়া জানে না, তাহারাও যখন আপনার নাম কাহারও মুখে উচ্চারিত হইতে শুনে তখন তাহাদের অন্তরের ভিতর একটা অব্যক্ত আনন্দের পুলোকোচ্ছ্বাস যেন নৃত্য করিয়া উঠে।

পুরুষ ও নারী প্রকৃতি—

কোন এক সদ্যবিবাহিতা নারী তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে সেদিন আমাকে বলিয়াছিলেন—'উঃ, কি আশ্চর্য্য এই পুরুষ জাতটা! বাড়ীতে এঁরা এক রকম, কিন্তু বাহিরে ঠিক তার বিপরিত—দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে এই একই ব্যক্তির এ হেন দ্বিবিধ চরিত্র হইতে পারে!'

বাস্তবিক, মেয়েদের চেয়ে পুরুষ-চরিত্রের পরিবর্ত্তন বেশী স্পষ্ট ভাবেই আমাদের চোখে ধরা পড়িয়া থাকে। পুরুষ যতদিন সংসারে প্রবেশ না করে ততদিন তাহার পরিবর্ত্তন তেমন ভাবে কাহারো নজরে পড়ে না, কিন্তু ঠিক যেদিন হইতে বিষয় কর্ম্মের চাপ আসিয়া তাহার ঘাড়ে পড়ে কিম্বা বন্ধন-জীবন যাপনের মেয়াদ ফুরাইয়া যায়, ঠিক সেই দিন হইতেই তাহার চরিত্রেও একটা আমূল পরিবর্ত্তনের বিপুল বন্যা বহিয়া যায়—সেই সদা-কৌতুক-গল্প-প্রিয় ভদ্রলোকটী তিনদিনে অস্বাভাবিক গম্ভীর ও ভারিক্কী হইয়া উঠে, সব কিছুতেই তাহার মুখে একটা বিজ্ঞতার ভাব পরিলক্ষিত হয়।

পুরুষ-চরিত্রেই পরিবর্ত্তন ঘটে বেশী, নারী চরিত্রে তেমন বড় একটা ঘটিতে দেখা যায় না। পুরুষ ঘরে একরকম থাকে, বাইরে গেলেই সে অন্য রকম হইয়া যায়। অন্দর মহলে—স্ত্রীর নিকট যে বেজায় হাসিখুসী ও স্ফূর্ত্তীবাজ, সে-ই আবার যখন অফিসে যায় তখন তাহার মেজাজ রুক্ষ কঠিন কর্কশ হইয়া উঠে; কিন্তু নারীচরিত্রে এ বিশেষত্বটুকু প্রায়ই থাকিতে দেখা যায় না। রমণী ঘরে যেমন, বাইরেও ঠিক তেমনি থাকে; বিবাহের পূর্ব্বেও সে যেমন ভাবে লোকের সঙ্গে হাসিখুসীভাবে মিশিতে পারে, বিবাহের পরও ঠিক তেমনি ভাবেই তাহাকে সকলের সাথে মিশিতে দেখা যায়। বরঞ্চ ঠিক বিপরীত—অনেক কুমারী মুখ-চোরা মেয়েকে বিবাহের পর হাস্য-মুখরা ও রঙ্গ-কৌতুকময়ী হইয়া উঠিতে দেখা গিয়া থাকে।

পুরুষ ও নারী চরিত্রে এমন পার্থক্য কেন দৃষ্ট হয় কেহ বলিতে পারেন কি?

হাজার চক্ষু বিশিষ্ট পতঙ্গ—

কীট পতঙ্গ মাত্রেরই চক্ষু আছে। মানুষের যেমন দুটী করিয়া চক্ষু আছে তেমনই কীট পতঙ্গেরও দুটী করিয়া চক্ষু আছে কিন্তু উহাদের ভিতর আবার দুইটী শ্রেণী বিভাগ করা চলে। কোন কোন পতঙ্গের দুইটী চক্ষুর ভিতরে আবার হাজার হাজার ছোট ছোট সূক্ষ্ম চোখ আছে এবং সেই চক্ষু-সমষ্টি দ্বারা উহারা প্রতিমুহূর্ত্ত কেবল চারিদিকে নয়—দশদিকেও নয়—এক মুহূর্ত্তে সকল দিকেই সকল কিছু দেখিয়া লইতে পারে। ইহার প্রমাণ—আমাদের ঘরের মাছিগুলি। একটা মাছিকে ধরিতে চেষ্টা করিলেই সে যে কতদূর চালাক তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মাছির এই অতি-চালাকীর একমাত্র কারণ—তাহার দুটী চোখে মোট ৪০০০ হাজার ক্ষুদ্র চক্ষু আছে। বড় বড় রাক্ষুসে মাছির দুইটা চোখে মোট ১২০০০ হাজার ছোট চোখের সমষ্টি আছে।

যে সকল কীট পতঙ্গের চোখের ভিতর চোখ নাই, তাহাদের প্রায়ই দুইটা হইতে কুড়িটা বিভিন্ন চোখ থাকিতে দেখা যায় কিন্তু যাহাদের বহু চক্ষুসমষ্টি থাকে তাহাদের দুইটার বেশী বড়-চোখ থাকে না।

মাকড়সা ও কাঁকড়াবিছের ছোট বড় দুই রকম চক্ষুই আছে বটে কিন্তু উহারা সেগুলি দ্বারা তেমন বিশেষ কোন উপকার পায় না।

"শ্যাম সুখময় দেহ গৌরী পরশে সেহ
মিলাইল যেন কাঁচা ননী।
রাই তনু ধরিতে নারে আলাইল আনন্দ ভরে
কুসুম কমলিনী॥"

শিল্পী—শ্রীএম্, দত্ত।

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　১০ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩১ সাল।　　[সপ্তত্রিংশ সপ্তাহ

আধুনিক মোক্ষ

কৃপানন্দ স্বামী গহন-বনের অধিবাসী। স্বামিজী বনে থাকেন, হোম-যাগ-যজ্ঞ করেন, ফল-মূল ভক্ষণ করেন, ঈশ্বরের নাম গান করেন আর থাকেন। কাম-ক্রোধাদি-রিপুচয় পরাজয় মানিয়াছে; স্বামিজী পার্থিব ব্যাপারের সম্পূর্ণ অতীত হইয়া গিয়াছেন। এখন একমাত্র মোক্ষই তাঁহার লক্ষ্য। খাস্ স্বর্গেও স্বামিজীর নিষ্ঠার, তপঃপ্রভাবের সংবাদ পৌছিয়াছে; শীঘ্রই তাঁহাকে সশরীরে গোলক-ধামে আনয়ন করিবার জন্য রথ প্রস্তুত হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মা মহাশয় সে রথের নির্ম্মাতা।

সে একটা শ্রাবণ মাস। শ্রাবণের ধারা নামিতেছে, মুষলধারে বৃষ্টি, স্বামিজী ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। সাধারণতঃ পাপীগণের মুখাবলোকন করিবার ভয়ে স্বামিজী লোকালয়ে বড় গমনাদি কার্য্য করেন না। কিন্তু নিদারুণ বরষা, গাছের ফল-মাকড় সব জলে গলিয়া অথবা ভাসিয়া গিয়াছে; বাদুড়াদি পক্ষী সমূহ অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহাও ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। ভিক্ষায় বাহির হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না; স্বামিজী নরলোকের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। বৃষ্টি আর কোথায়আছে, হুড় হুড় ঝুড় ঝুড় করিয়া নামিল কিন্তু রিপুজয়ী মহাত্মার তাহাতে দৃকপাতও নাই, চলিলেন।

স্বামিজী বুঝিলেন, মোক্ষপ্রাপ্তির এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে; এখনো স্বর্গপুরবাসীগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। স্বামিজী তাহা বুঝিয়াই আপন মনে কহিলেন—আরো, আরো, প্রভু, আরো আমায় পরখ্ করো।

যে ছেলে লেখাপড়ায় খুব দড়, পরীক্ষায় ভীত নহে তাহার অন্তর। স্বামিজীও পরীক্ষায় ভীত নহেন।

"আরো আরো, প্রভু, আরো আমায় পরখ্ করো।"

স্বামিজী চলিয়াছেন, পায়ের নীচে দিয়া নদী ব'হিতেছে, মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িতেছে, ঝড়, বজ্র,- স্বামিজী চলিয়াছেন।

এখন, পথিপার্শ্বে বনান্তরালে বসিয়া একটি ভিজা-বিড়াল শীত-বিকম্পিত হিয়ায় ম্যাঁও ম্যাঁও ধ্বনিতে বনস্থল কাঁপাইতে ছিল। স্বামিজীর কাণে মার্জ্জারের মর্ম্মভেদী

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল, আকুল করিল···প্রাণ।"

সে স্বর পৌছিল। দয়ার শরীর তাঁর, সর্ব্বজীবে সম-দয়া, স্বামিজী মার্জ্জারের নিকটবর্ত্তী হইলেন। একে ভিজা-বিড়াল, তায় মনুষ্য দর্শন, বাছাটি বড়ই করুণ-স্বরে ম্যাঁও—অর্থাৎ ওহে বাপু আমাকে লও—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কাণের ভিতর দিয়া সে স্বর মরমে পশিল, আকুল করিল···প্রাণ।

"অর্থাৎ কি-না, তুমিই মানুষ !"

কৃপানন্দের কৃপার তুলনা নাই। সর্ব্বজীবে সম দয়া !—স্নেহে, আদরে স্বামিজী জীবটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। স্বামিজী কমণ্ডলু ফেলিলেন, চিমটা রাখিলেন, বাঘছাল নিক্ষেপ করিলেন; শ্মশ্রু-কম্বল দ্বারা বিড়াল-নন্দিনীর গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। বাঘের মাসী এতখানি আদর আশা করে নাই; লাঙ্গুল ফুলাইয়া পুলক-গম্ভীর-কণ্ঠে কহিল—ম্যাঁ-অ্যাঁও ! অর্থাৎ কি-না, বিশ্বে একা তুমিই মানুষ !

এখন ত তণ্ডুল-মুষ্টি-ভিক্ষা করিলেই চলিবে না; একটুখানি গব্য-রসের যে বিশেষ প্রয়োজন। বিধাতা যখন জীবটিকে তাঁহার হস্তেই সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাকে রক্ষা করা, পালন করা ত অবশ্যকর্ত্তব্য, নতুবা যে প্রাণী হত্যার পাতক লাগিবে। মায়া-মুক্ত, মোক্ষ-পথের যাত্রী, বিশ্বকর্ম্মা-রচিত-রথের ভাবী-আরোহী কৃপানন্দজী কিঞ্চিৎ দুগ্ধ-ভিক্ষায় বাহির হইলেন। পথিমধ্যে স্বামিজী একটি নারিকেল মালা সংগ্রহ করিলেন, গৃহস্থ বাড়ীতে গিয়া মালা পাতিলেন—কিঞ্চিৎ দুগ্ধং দেহি! গৃহস্থের ঘরে সন্ন্যাসী অতিথি।

—দুগ্ধ-দুগ্ধই সৈ!

দুগ্ধ দুগ্ধই সৈ!

"তুমি আমাদের ঠাকুরদাদা—"

যথাকালে স্বামিজীর পালিতা মার্জ্জারী বহু সন্তানের জননী হইলেন। ঠাকুর জপ-তপ করেন, মার্জ্জারী-শাবকগণ তাঁহার গায়ে-পিঠে লাফাইয়া উঠে, আর মাতার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ডাকে—ম্যাঁও! তাহার অর্থ এই যে, তুমি আমাদের ঠাকুরদাদা হও—জান!

এতগুলি নাতি-নাতিনী হইয়াছে যখন, তখন তাহাদের পালন-চিন্তাও ত বড় অল্প নয়, স্বামিজী গালে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'ন। স্বামিজী ঈশ্বর-জানিত ব্যক্তি, সংসার-ত্যাগী, ঘোরতর সন্ন্যাসী, মায়া-মুক্ত, মোক্ষ-প্রয়াসী,—অধিককাল চিন্তাজ্বর তাঁহাকে পীড়া দিতে পারিল না; স্বামিজী স্থির করিলেন, একটি গাভী হইলেই নাতি-নাতিনীগুলির আহারের জন্ম আর ভাবিতে হয় না। অকূলে কূল মিলিল।

এক গ্রামে এক দেব-দ্বিজে ভক্ত গৃহস্থ ছিল। তাহার অনেকগুলি গাভী। স্বামিজী একদিন, তেরা ভালা হোগা বেটা—বলিয়া তাহার কাছে হাজির হইলেন। গাভী ভিক্ষা করিলেন। স্বামীর মাথায় তাল-পাকান জটা, আবক্ষ-লম্বিত দাড়ীর রং কটা, গৃহস্থ আর কি করে। পুড়িয়া মরিবার ভয়ও ত বড় কম নয়। গাভীটীর মায়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। স্বামিজী বহু-বহু আশীর্ব্বচন উদ্গীরণ করিয়া গাভী সহ গৃহে (হ্যাঁ, ততদিনে নাতি-নাতিনীর জন্ম একখানি চালাও বনমধ্যে বাঁধিয়াছিলেন) গমন করিলেন।
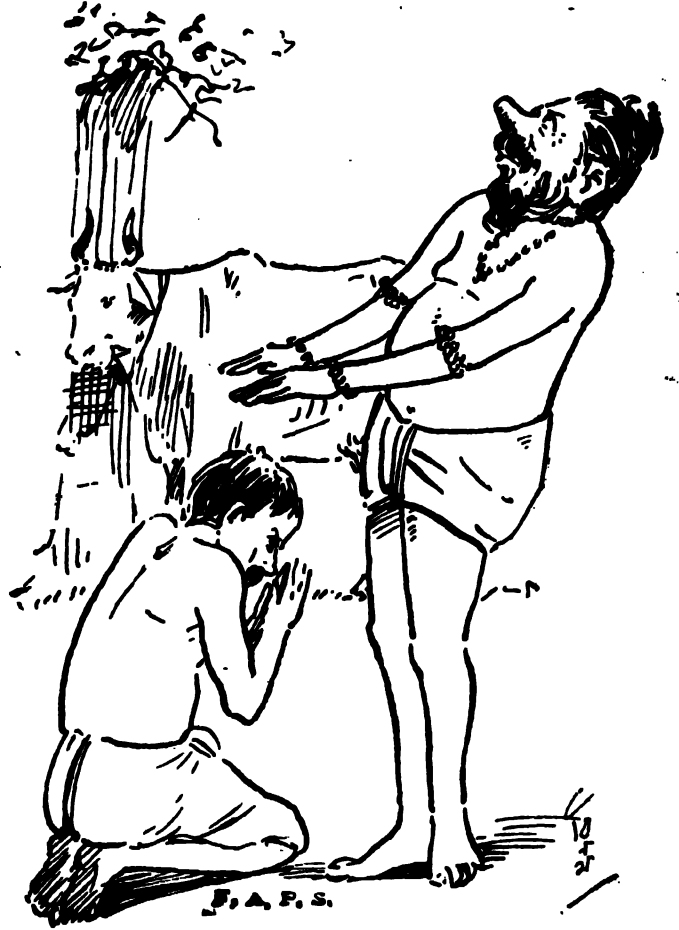
"তেরা ভালা হোগা বেটা।"

—শীর্ণা হইয়া পড়িতেছে।

নাতি-নাতিনীর দুঃখের অবসান তো হইল। তাহারা দুধ, সর, ননী, মাখন ভক্ষণ করিয়া হৃষ্ট-পুষ্ট হইতে লাগিল। এখনও তাহারা ম্যাঁও ম্যাঁও করে বটে কিন্তু সে করুণ সুর আর নাই, এখন কণ্ঠ খাদে বাঁধা—ম্যাঁ-ও-ও; অর্থাৎ মন্দ নয়, আছি বেশ। কিন্তু স্বামিজীর চিন্তার আর অন্ত নাই। গাভীর পরিচর্য্যা করে কে? পরিচর্য্যার অভাবে গাভীটি যে দিনে দিনে শীর্ণা হইয়া পড়িতেছে।

বড় কষ্ট !"

নিজে আর কত পারেন ? গোয়াল সাফ করা, ঘাস আনা, জল তোলা, গোয়াল-বন্ধ করা—সন্ন্যাসী মানুষ, অত পারিবেন কেন ? বড় কষ্ট হয় !

বিশ্বকর্ম্মা-রচিত রথ চক্ষে না দেখিয়াও স্বর্গসুখ উপভোগ করেন।

আরো বিপদ তাহার বাছুরটিকে লইয়া! সেটি বড়ই দুষ্ট! কোথায় যে পালায়, খুঁজিয়া খুঁজিয়া স্বামিজী হায়রাণ হইয়া যান। তাহার জননীর করুণ-কাতর-মর্ম্মস্পর্শী হাম্বা-রব শুনিয়া স্থিরও থাকিতে পারেন না, খুঁজিতেই হয়। খুঁজিয়া খুঁজিয়া, কোলে করিয়া ফিরাইয়া আনিয়া মায়ের কাছে ছাড়িয়া দেন। মা সস্নেহে শাবকের গাত্র লেহন করে, স্বামিজী বিশ্বকর্ম্মার রচিত রথ চক্ষে না দেখিয়াও স্বর্গ-সুখ উপভোগ করেন।

"বুড়ীও সশরীরে স্বর্গ বাসের আশায়—"

কিন্তু—বড় কষ্ট!

এক বুড়ী বরাবর ভিক্ষা দিত, ভক্তি করিত, বাবা ঠাকুরের জন্ম তাহার প্রাণ কাঁদিত। মোক্ষকামী মহাপুরুষ মানস-চক্ষে তাহা দেখিতেন, মনে মনে তাহা জানিতেন। বড়ই কষ্টে পড়িয়া একদিন বুড়ীকে স্মরণ করিলেন। সন্ন্যাসীর কষ্ট দেখিয়া বুড়ীর দয়া হইল কিন্তু সে বড়ই বুড়ী হইয়াছে, নিজে কাজকর্ম্ম বড় করিতে পারে না; তাহার একটি মেয়ে আছে, বড় সড়, বয়স হইয়াছে, কাজে-কর্ম্মেও বেশ,—সেই বাবাঠাকুরের গরুর সেবা করিয়া দিয়া যাইবে, বলিল। যে ক'দিন না বিবাহ হয়, বাবাঠাকুরের গরুর সেবা করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবে, বুড়ীর ইহাই আন্তরিক অভিপ্রায়! বাবা-ঠাকুর বুড়ীর জন্য স্বর্গে একটি আসন অবধারিত থাকিবে, আশীর্ব্বাদ করিলেন। আগামী কল্য প্রভাতেই মেয়েটিকে পাঠাইয়া দিবে, বলিয়া বুড়ী বাড়ী ফিরিল।

—আসিল, আসিল, আসিল।

বুড়ী সশরীরে স্বর্গে যাইবার আশায় হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

পরদিন বুড়ীর কন্যা আসিল। শুধু আসিল না,—আসিল, আসিল, আসিল!

স্বামিজী দেখিলেন, সে আসিল; ব্রীড়ানম্র-মস্তকে আসিয়া সে দাঁড়াইল।

(ক্রমশঃ)

সাধক রামপ্রসাদ

[রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট্.]

বেদের রুদ্রদেব বিনাশের দেবতা, তাঁহার জটাজুট অগ্নি-শলকার ন্যায়, তাঁহার নৃত্যের নাম তাণ্ডব, তাহাতে বিশ্ব-বিকম্পিত হয় ও গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হইয়া ব্যোমপথে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছুটিতে থাকে। রুদ্রের নিশ্বাসের জ্বালা—জগতের শ্মশান, তাঁহার শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া দিগ্‌হস্তীরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। তাঁহার নেত্রশাসনে চিত্ত-শ্মশানে কামদেব পুড়িয়া ছাই হয়—তাঁহার মুখোচ্চারিত প্রণব—প্রলয়ের গান—বিনাশের ঝঞ্ঝা,—তাহা জগতকে পুঞ্জীভূত ধূলায় পরিণত করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, তাঁহার বিষাণবাদনের তালে তালে চতুর্দ্দশ মৃত্যু নৃত্য করিতে থাকে।

বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে রুদ্র তাঁহার তেজ সম্বরণ করিলেন। সংহারের দেবতা অপূর্ব্ব সৌম্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, যেন চিতা জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, কতকগুলি ছাই রহিয়া গেল। তাঁহার প্রলয় বিষাণ থামিয়া গেল,—তিনি যোগীর আদর্শ যোগীশ্বর, ক্ষমার আদর্শ ভোলানাথ, ত্যাগীর আদর্শ সর্ব্বত্যাগী হইলেন,—এক কথায় তাঁহার ভয়ঙ্করত্ব চলিয়া গেল, তাহার তাণ্ডব নৃত্য প্রেম নৃত্যে পরিণত হইল।

কিন্তু বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতিকে যেরূপ ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, তাহাতো এখনও আছে। এখনও জরা-মৃত্যু তাহাদের রক্তলোলুপ লেলিহান জিহ্বা ব্যাদান করিয়া আছে, এখনও ভীষণ মহামারীতে প্রলয় কাণ্ড হইয়া থাকে, এখনও প্রকৃতির ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে ফুলের বাগান শুকাইয়া যায় এবং শ্মশানের চিতাগ্নি মাতৃহৃদয়ের হাহাকার উপেক্ষা করিয়া পদ্মের কুঁড়ির মত শত শত শিশুকে ধ্বংস করিয়া জলিয়া উঠে, এখনও কৃষকের বহুযত্নে উৎপন্ন সোনার ফসল নির্দ্দয় বন্যায় স্রোতে ভাসিয়া যায় এবং আকাশের প্রলয় মেঘের কোল হইতে ভীষণ সর্পের ন্যায় খরবিদ্যুৎ ছুটিয়া আসিয়া বিশাল রাজ-প্রাসাদ ও মন্দিরের স্বর্ণ চূড়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, এখনও অনন্ত নাগের শিরোকম্পনে জগৎব্যাপী ভূমিকম্পে শত শত দেশ বিধ্বস্ত হয় এবং আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে ভীষণ জ্বালা ও দ্রব অগ্নিপ্রবাহ নিঃসৃত হইয়া সুরম্য হর্ম্ম্যময় নগরীকে ধ্বংসের স্তূপে পরিণত করে। এক কথায় প্রকৃতির যে তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া বৈদিক ঋষি রুদ্র-তাণ্ডব কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই ভয়ঙ্করী লীলা তো জগত হইতে এখনও চলিয়া যায় নাই।

রুদ্রদেব শিবসুন্দরে পরিণত হইলেন। হিন্দুর কল্পনায় বুদ্ধদেবের ত্যাগের আদর্শের যে মনোজ্ঞ প্রতিবিম্ব পড়িল—সেই ত্যাগ, জীবের জন্য সেই অপার করুণা, সেই বিশ্বের কল্যাণ-চিন্তা তাঁহারা রুদ্রদেবকে নূতন ছাঁচে গড়িলেন, বিশ্ববাসীর কষ্ট দূর করিবার জন্য বুদ্ধ রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন, রুদ্রদেবের হস্তেও আমরা ভিক্ষাপাত্র ও কমণ্ডলু দিয়া তাহাকে দেব-ভিখারী সাজাইলাম।

কিন্তু জগতের যে ভীষণতা আছে, তাহা তো আমাদের জীবনযাত্রার পথে পথে। রোগ, শোক, মারীভয়, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু প্রভৃতি শতরূপে আমরা যে ভীষণতার—নির্ম্মমতার দর্শন পাই—তাহাতো সাধক একেবারে বাদ দিতে পারেন না, এই নির্ম্মম সত্যের কঙ্কাল হাসি যে আমাদিগকে নিত্যই দেখিতে হইবে, ফুল্লারবিন্দপ্রতিম শিশুর মৃদুহাসি মণ্ডিত মুখখানি যেরূপ সত্য, ভীষণ রোগশয্যার প্রেতপ্রতিম কঙ্কালও যে তেমনই সত্য। এই ভয়ঙ্করের দেবতাকে উপেক্ষা করা যায় না।

যে স্থান এককালে রুদ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্থান কে গ্রহণ করিবে? যোগীশ্বর ক্ষমার আদর্শ, সর্ব্বত্যাগী ভোলানাথ যুগব্যাপক চেষ্টার ফলে যে মনোজ্ঞমূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে তো তার ভীষণভাবে কল্পনা করা যায় না। গঙ্গাকে আর ফিরিয়া হরিদ্বারে লইয়া যাওয়া অসম্ভব, ভগীরথ স্বয়ং আসিলেও তাহা হইবার নহে।

এই ভীষণতার স্থান পূরণ করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে নব নব দেবতা আসিয়া বঙ্গদেশে শক্তি-ব্যূহ রচনা করিলেন,—বঙ্গের ঘরে ঘরে পূজিতা শ্বেরাস্তা, হংসারূঢ়া অরুণিতবসনা মনসাদেবী এই ব্যূহের অন্যতমা।

কিন্তু এই শক্তিকেন্দ্রের প্রধান দেবতা হইলেন কালী। ইনি বৈদিক দেবতা নহেন। কিন্তু যেস্থান হইতেই ইঁহাকে আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি না কেন, আর্য্য কল্পনা, হিন্দুর সাধনা ইঁহাকে এমনই ধ্যানের মূর্ত্তি দিয়াছে যে ইনি একাধারে ভয় ও বরাভয়ের অধিষ্ঠাতৃরূপে এদেশের সর্ব্বপ্রধান মাতৃদেবতা হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

আমরা বলিতে পারি না কেন এই দেশ বিশেষভাবে কালীমাতার অধিকার ভুক্ত। আর কোন্ দেশে এরূপ ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র ধরিত্রী কম্পিত করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ নির্ম্মমভাবে কাহাদের তরঙ্গ রাজনগরের মত কীর্ত্তি গ্রাস করিয়া লেলিহান ধ্বংসলোলুপ জিহ্বা প্রসারণ করে? আর কোন্ ভূমি এরূপ ভীষণ সিংহ ব্যাঘ্রের জননী? Royal tiger আর কোথায় এরূপ হস্তীর মস্তক চূর্ণ করিয়া রঞ্জিত নখর লেহন করে,—বঙ্গদেশের জঙ্গলের মত কোথায় এরূপ ভীষণ চন্দ্রবোড়া ও কেউটা জন্মিয়া থাকে? কৃষ্ণ-মেঘের মত বিশাল কায় হস্তী আর কোনদেশের তমালতালী-বনরাজীনীলা সমুদ্রবেলা ও গিরিগুহায় বিচরণ করে? দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রক্তশোষণকারী দারিদ্র্য, নানা রোগ আর কোনদেশের লোককে এরূপ ঘন ঘন পীড়ন করে? একবৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ, অপর বৎসর ধরিত্রী সুজলা-সুফলা; এক ঋতুতে মেঘের গর্জ্জনে, বিদ্যুৎ স্ফুরণে কুটিরবাসী মুহুর্মুহু জৈমণির নাম স্মরণ করিয়া শতছিন্ন কন্থার মধ্যে ভয়ে কাঁপিতেছে, অপর ঋতুতে ফুলের বাগানে আনন্দ ধরে না; সরসীর সুনীল জলে রক্তপদ্মের উপর সৌরকর কি হাসিই না মাখাইয়া দিতেছে! এক ঋতুতে পদ্মা মহাজনের কাকুতি মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পদ উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বুদ্বুদের ন্যায় ডুবাইয়া দিতেছেন, অপর ঋতুতে পদ্মার পুত্র প্রতিম জেলেরা মাঝ-দরিয়াকে সিংহাসন মনে করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ডিঙ্গা চালাইয়া দিতেছে, এবং করুণাময়ী মাতার নিকট হইতে ঝুড়ি ভরিয়া মৎস্য উপহার লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। এক ঋতুর গভীর তমিস্রার ন্যায় মেঘকুন্তলা দিক্-বধূগণ তাঁহাদের গাঢ় অন্ধকারের লহরীর ন্যায় বেণী দোলাইয়া দিয়া বিদ্যুৎ কটাক্ষের পৈশাচিক দীপ্তি দ্বারা পথিককে ভয় দেখাইতেছেন, অপর ঋতুতে শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী প্রেমাবেশ ঢুলু ঢুলু চোখে চাহিয়া দম্পতী-হৃদয়ে আনন্দ ঢালিয়া দিতেছেন, একদিকে যেমন বঙ্গপ্রকৃতি খাঁড়া ও নরমুণ্ড দেখাইয়া আতঙ্কিত করিতেছেন, আর একদিকে তেমনই বিচিত্র আনন্দ ও শোভাসম্পদ লইয়া যেন আমাদিগকে বর দিতেছেন, এক হস্তে উত্তোলিত খড়্গ, বিদ্যুতের ঝলক খেলিতেছে, অপর দিকে প্রসারিত করপদ্ম দ্বারা "মাভৈ" এই ইঙ্গিত করিতেছেন।

সুতরাং আমাদের দেশ যে বিশেষভাবে এই করাল-বদনা, মহিয়সী, মধুর-হাসিনী মাতৃ দেবতার অধিকারে, তাহা আর বেশী বুঝাইতে হইবে না। দাশরথীর সঙ্গীত-স্তোত্র ইহাকে একবার বলিতেছে "নিরমল নিশাকর করকপালিনী" আরবার সেই সুর ঘুরাইয়া বলিতেছে "নাগিনী জড়িত জটাবুভূষিণী"। এক পংক্তিতে "নিরমল নিশানাথ নিভাননী" এবং অপর পংক্তিতে "লোলরসনা করালবদনী" "নিতম্বে নিচোল শার্দ্দূল ছাল, বাম করে শোভে খর করবাল" এই ভীষণরূপের সহিত সুন্দরের সমাবেশ শাক্ত কবি ছাড়া আর কে করিতে পারিয়াছেন? এক ছত্রে বলিতেছেন "নীল-নলিনা—যিনি ত্রিনয়নী"—অপর ছত্রেই বলিতেছেন "লোল-রসনা করালবদনী।"

এই উত্তাল, নির্ম্মম উদ্দাম প্রকৃতির মেরুদণ্ডে পুরুষ। তাঁহার কত বড় স্থৈর্য্য! প্রকৃতির ভীষণ লীলায় সরোবরের শত শত পদ্ম শুকাইয়া যাইতেছে, আবার পরদিন কোন চিরস্থায়ী ভাণ্ডার হইতে নূতন শত শত পদ্ম-কুঁড়ি ফুটিতেছে, প্রতিদিন শত শত শিশু শ্মশানের আগুনে জ্বলিয়া ছাই হইতেছে, আবার পরদিন আঁতুড় হইতে শত শত শিশুর অধরে অমিয়া হাস্য ফুটিয়া উঠিতেছে? এই নিত্য ধ্বংস লীলার মধ্যে কে স্থির অচঞ্চল ও অবিনাশী ভাণ্ডার লইয়া বসিয়া আছেন? কাহার এই অতুলনীয় ধৈর্য্য, যাহা প্রকৃতির অবিরাম ধ্বংস লীলার মধ্যে সৃষ্টির সূত্র হারায় নাই, ভীষণত্ব ও ধ্বংসের মধ্যে নিত্যকে অপরূপ সুন্দর ও অবিচল করিয়া

রাখিয়াছে ? সে ধৈর্য্য কি অসীম, তাহা এক মৃত্যুর সঙ্গেই তুলনীয়। মড়াকে মার, কাট, তাহার পাঁজর ভাঙ্গ, নড়িবে না। যে পুরুষবর এই তাণ্ডব লীলাময়ী প্রকৃতিকে আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি সেই মৃতের ন্যায়ই ধৈর্য্যশীল, তিনি যে কালসর্পকে বুকে করিয়া স্মিতবদনে শুইয়া আছেন, প্রকৃতি-পুরুষের এই অপূর্ব্বলীলা দেখিয়া দেখিয়া পুরুষবরের প্রতি অপার করুণায় ভক্ত হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি পাইয়াছিলেন,—

"নেমে নাচগো ন্যাংটা মাগী
বাজবে মহেশের বুকে"

এই প্রকৃতির লীলা পুরুষই চিনিয়াছেন—তাই এই ধ্বংসকে তিনি আদর করিয়া বুকে লইয়াছেন। এই ধ্বংস দ্বারা তিনি জগতের নিত্য আনন্দ লীলা সৃষ্টি করিয়াছেন, লীলাময়ীকে তিনি নিত্যলীলার সহায় মনে করিয়া অসীম ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার পদ পঙ্কজ বক্ষে রাখিয়া নিজে মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছেন। ভক্তের ভয় বৃথা, তাঁহার পাঁজর ভাঙ্গিবে না, এই বজ্রনির্ম্মিত পাঁজর,—ইহা পোড় খাইয়া অমর হইয়াছে,—অপার্থিব অলৌকিক আনন্দ এই পাঁজরের দৃঢ়ত্ব জন্মাইতেছে। পরম নির্ভয় দেবতা তাঁহার আনন্দ-সাধনায়—এই প্রাকৃতিক লীলাকে অনশ্বর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন—তাঁহার স্পর্শে ক্ষণভঙ্গুর নিত্যচঞ্চল প্রকৃতি অমরতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

রামপ্রসাদের সময় দেশ-ব্যাপক অরাজকতা। তখন মোগল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ, সেই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যে বৈতরণীর পদ্মফুলের মত তাজমহল দাঁড়াইয়া ছিল। গত যুগের প্রেম ও সৌন্দর্য্য লিপ্সার অমর স্মারকচিহ্ন এই তাজমহল। সেই শাসন যাহা একছত্র হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে নিরাপদ রাখিয়াছিল—প্রজাবৃন্দের সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও উদারতা বিকশিত করিয়া শিল্প ও ত্যাগের আদর্শকে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের অবসানের দিনে দেশময় দস্যু ও তস্করের ভীতি উপস্থিত হইল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা দিল্লীশ্বরের শাসন-মুক্ত হইয়া যেন মেষশাবকেরা সিংহ হইয়া প্রজাপীড়ণ করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশেও অরাজকতা ও অত্যাচারের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। প্রাতঃস্মরণীয় রাণী ভবানী স্বীয় দুহিতার পুত্তলী শ্মশানে পোড়াইয়া তাঁহাকে অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচাইলেন, জীবন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও জমিদারগণ "বৈকুণ্ঠ" নামধেয় জীবন্ত নরক ভোগের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজকুমারদিগকে উলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত করিবার আদেশ হইল। কোন কোন রাজার কন্যা মুর্শিদাবাদাধিপ চাহিয়া বসিলেন, না দিলে তাঁহাদের ধন সম্পত্তি অত্যাচারের ফুৎকারে উড়িয়া যাওয়া নিশ্চিত ছিল,—কাজিরা দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়া প্রজাপীড়ণ করিতে লাগিল। যখন রাজ-রাজড়াদের অবস্থাই এইরূপ, তখন সামান্য প্রজাদের দুর্দ্দশা যে কি তাহা পাঠকবর্গ কল্পনা করিতে পারেন।

এই অত্যাচার ও বিপদের দিনে মানুষের চিত্তে দুঃখবাদের প্রাবল্য স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব এই দুঃখবাদ জগৎকে দিয়া গিয়াছিলেন,—যাহা বলে ধনজন মিথ্যা, দেহ মিথ্যা, পৃথিবী দুঃখময়। তপ্ত খোলা হইতে যেরূপ খই লাফাইয়া ভূমে পড়ে, এই দুঃখবাদকে স্বীকার করিয়া বুদ্ধের পরে শত শত লোক সংসারাশ্রমকে দুঃখ পূর্ণ মনে করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিল— সেই দুঃখবাদ হিন্দুকে যুগে যুগে সংসার নিবৃত্ত ও ভোগ-বিমুখ করিয়াছে। দুর্দ্দিনে যখন দুঃখের চিত্র চারিদিক হইতে ফুটিয়া উঠে, তখন দুঃখবাদ মনকে বিশেষরূপে অধিকার করে; বঙ্গের এই দুঃসময়ে বাঙ্গলার ভক্তি, বাঙ্গলার কর্ম্ম, বাঙ্গলার সাধনা এই দুঃখবাদকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ পাইয়াছিল। এই দুঃখবাদের অবস্থায় ভোগসুখী ইন্দ্রিয়গুলিকে মানুষ শত্রু বলিয়া মনে করে। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে ভীতিকর বলিয়া ধারণা হয়, "দারা বন্ধু পরিবার" আমাদিগকে সংসার কূপে নিমজ্জিত করে – এই আশঙ্কায় সংসার-ত্যাগী মন শ্মশানের চিতাকেই পরম সম্পদ মনে করে। রামপ্রসাদের গানে এই দুঃখবাদের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়, রামপ্রসাদ গাইলেন "রমণী বদনে সুধা নয়—সে বিষের বাটী, আগে ইচ্ছাসুখে পান করি, বিষের জ্বালায় ছটফটি।" "ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে পাক দিতেছ অবিরত, ওমা কি দোষে করিলি আমায় ছটা কলুর অনুগত।"

এই যে সংসার অনিত্য—ইহার বন্ধন মায়া-পাশ—তাহা ছেদন করাতেই বীরত্ব—এই দুঃখবাদ তো আজকাল কার

নয়। বহুযুগ যাবৎ ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে পৃথিবীর এই কালো দিকটা হিন্দুর চোখে পড়িয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদ এই দুঃখের সুরটি পুনরায় জাগরিত করিলেন, তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া অসংখ্য ফকির, বাউল আবার এই দুঃখবাদের সুরে বঙ্গসমাজকে সংসার-বিমুখতায় দীক্ষিত করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর রামপ্রসাদের সুর অনুকরণ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফিকির চাঁদ গাহিলেন—

"বাঁশের দোলাতে চড়ে কেহে বটে শ্মশান ঘাটে
যাচ্ছ চ'লে।
ঘুরে যে ঢাকার সহর, দীল্লি লাহোর, টাকা
মোহর নিয়ে এলে,
খেলেনা পয়সা সিকি, কণা দেখি, তার কি
কিছু সঙ্গে নিলে।"

এই দুঃখময় জীবনের আঁধার দিকটার উপর জোর দিয়া বৈরাগ্যের যে সুরটা উঠিয়াছিল—এযুগে তাহার প্রথম প্রেরণা দিয়াছিলেন রামপ্রসাদ। তিনি তাঁহার মায়ের উপর স্নেহের দাবী ফাঁদিয়া এই দুঃখের জন্য তাঁহাকে স্নেহ-মিষ্ট গঞ্জনা করিতে কসুর করেন নাই। মা আদরের ছেলের মুখে চুম খাইয়া তাহাকে আবার শ্মশানে ডালি দিতেছেন কেন? ছেলেকে গৃহবাসী করিয়া কেন আবার সন্ন্যাসী করিলেন, এই সকল অনুযোগ দিয়া তিনি তাহাকে "সর্ব্বনাশী" বলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সংসারের ত্রিতাপ ভোগ করিয়া মাকে সমস্ত বিধানের কর্ত্রী জানিয়াও তিনি মায়ের স্নেহের রাজ্যের বহির্ভূত হন নাই। তাহার সমস্ত অনুযোগ আবদার মাত্র, তাহাতে কান্না আছে, "কেন মারছ?" বলিয়া আর্ত্তনাদ আছে, কিন্তু শিশু যেমন মায়ের মার খাইয়া তাঁহার আঁচল ছাড়ে না, রামপ্রসাদের বাহ্যিক বিদ্রোহ সূচক শত শত অভিযোগময় গানের ভিতরও স্নেহের অমৃত-পোরা। সেই অভিযোগে সর্ব্বত্র বৈষ্ণব কবিদের মানের সুরটি পাওয়া যায়। ইহা শুধুই দুঃখবাদ নহে। বাউলের গানের দুঃখবাদের সঙ্গে রামপ্রসাদের গানের এই স্থলে প্রভেদ। বাউলের গানে নিছক বৌদ্ধ-ভাব। বাউল শুধুই মড়ার কান্না গাহিয়া বিরাগ শিখায়। রামপ্রসাদের কান্নায় দুঃখ সৃষ্টির জন্য মায়ের প্রতি ভর্ৎসনা আছে কিন্তু তাহা বিরাগ নয়, অনুরাগের ছদ্মবেশ। শত গালাগালি দিয়াও তিনি মায়ের আঁচলটিতে বাঁধা আছেন। "নিতান্ত যাবে এদিন ঘোষনা রবে গো। তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক রবে গো।" এই সুরে মায়ের স্নেহে পাছে ঔদাসিন্যের কলঙ্কের ছাপ পড়ে, আবদেরে ছেলে তাহারই জন্য কাঁদিতেছেন। এই দুঃখবাদ বিষকুম্ভ নহে, এই দুঃখবাদের মধ্যে প্রেম ও নির্ভর যথেষ্ট পরিমাণে আছে,—এইজন্য ইহা বৈষ্ণব কবির বিষ-মিশ্র অমৃত। ইহা মায়ের অসীম নিষ্ঠুরতা জানিয়াও মায়ের অসীম দয়ার প্রতি আস্থাবান। একেকবার ইহা নৃমুণ্ড-মালিনী মায়ের অসী স্বীকার করিয়াছে সত্য—কিন্তু তাঁহার বরাভয় দায়ী করদ্বয়ও দেখিয়াছে! জগৎকে ভয়ানক জানিয়াও ইহার মূলশক্তির অভয় প্রদত্বও মঙ্গলত্ব স্বীকার করিয়াছে। শাক্তধর্ম্মের এইখানেই জোর। ইহা লোকচিত্তকে এই কারণে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ভগবানকে শুধু দয়াময়, প্রেমময় বলিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার স্বীকার করিয়া লইয়াছে, অপরাপর ধর্ম্ম ভগবানের শ্রীমুখ দেখিয়া ভুলিয়াছে। তাঁহার স্নেহ ও প্রেমের বাঁশীর সুর শুনাইতে জগৎকে আহ্বান করিয়াছে। একমাত্র শাক্তধর্ম্ম বিশ্বের উলঙ্গ সত্যকে যথাযথ ভাবে দেখাইবার সাহস করিয়াছে—ইহা লোল শোণিত-লোলুপ জিহ্বা ও কঙ্কালাকৃতিকে প্রণাম করিয়া বরাভয় দায়ী করদ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে। কালীমূর্ত্তি—ঝঞ্ঝা, উল্কাপাত, মহামেঘ ও চিতাভস্মের দেবতা—ইনি বৈদিক রুদ্রদেবের পরবর্ত্তী বিভূতি! এদিকে তাঁহার কৃষ্ণকান্তি অপূর্ব্ব উন্মাদনাময়—"ধনি না বাঁধে কবরী না পরে বাস— ও বিধু বদনে মধুর হাস" এই ভীষণ ও সুন্দর উলঙ্গ সত্যকে সাহসিক সাধক ভিন্ন কে হৃদয়ের শোণিত দিয়া পূজা করিবে?

বাউলের সুরের দুঃখবাদ ও রামপ্রসাদের দুঃখবাদে এই প্রভেদ। বাউল মানুষকে দুঃখের জীবনের প্রতিপদে শত দুঃখ দেখাইয়া শ্মশানের নির্ব্বাণটাকে শেষাশ্রয় স্বরূপ মনে করিয়াছে, রামপ্রসাদের দুঃখবাদে সংসারের শত দুঃখের প্রতি ইঙ্গিত থাকিলেও তাহা যে মাতৃ-পাদপদ্মের শরণ লইলে দূর

হয় তাহা জোরের সহিত বলা হইয়াছে। এই নিছক সত্য, এই নির্ভর আত্মোৎসর্গময় সঙ্গীত এককালে সমস্ত বাঙ্গলা দেশকে জয় করিয়াছিল। সংসার কাঁটার বন, ইহা সাফ করিয়া যদি ভক্তির চর্চ্চা করা যায় তবে মানব জীবন দুঃখময় না হইয়া স্বর্ণপ্রসূ হইতে পারে, রামপ্রসাদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। "এমন মানব জন্ম রৈল পড়ে আবাদ কৈলে ফলত সোনা।" হাটে মাঠে বাটে এই সকল গানের সুধা হরির লুটের মত তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।

আমি তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের কথা বিশেষ করিয়া বলিব না, পাঠক রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মিলাইয়া পাঠ করিবেন, দেখিবেন রামপ্রসাদই ভারতচন্দ্রের আদর্শ, এমনি একটি মৌলিক ভাব নাই, এমন কোন কবিত্বের কথা নাই, গোড়া যাহার রামপ্রসাদ গাঁথিয়া না দিয়াছেন, ভারতচন্দ্র সেই ভিত্তির উপর রং ফিরাইয়াছেন মাত্র। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের বিষয় রাজসভার খুব প্রিয় হইলেও এবং কৃষ্ণচন্দ্রের পিশা শ্যামসুন্দরের পুত্র রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় রামপ্রসাদের মুরুব্বি হইয়া পুস্তক রচনার আদেশ করিলেও যে এই কাব্যের ভাব রামপ্রসাদের মত ভক্ত ব্যক্তির মনের ভাবের সহিত সঙ্গতি পায় নাই, তাহা স্পষ্ট। এই কাব্যে কবি তাঁহার মুরুব্বিকে খুসি করিবার জন্য খুবই চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহার সমস্ত পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের ভাণ্ডার উলট-পালট করিয়া এই কাব্যের গড়নে লাগাইতে যত্নপর হইয়াছেন, অনেক স্থানের অনুপ্রাস, বর্ণনা, পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব উচ্চদরের হইয়াছে—তথাপি মনে হয় উহা কতকটা কৃত্রিম, উহাতে স্বভাবজ সৌন্দর্য্য নাই—আয়াসজাত যত্ন আছে, বাহ্যিক সমৃদ্ধি আছে—কিন্তু ভিতরটা ফাঁকা। বোধ হয় এই পরিশ্রমের পর কবি গান রচনা করিতে যাইয়া স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া পাইয়া লিখিয়াছিলেন "গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত" সেই গ্রন্থ তাঁহার বৃথা পাণ্ডিত্যের অসার কীর্ত্তি—ঐ গানগুলিই যে তাহার ও সমস্ত বঙ্গদেশের প্রাণের বস্তু, তাহার মূল্য তিনি নিজে অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন।

আমরা দেখাইয়াছি রামপ্রসাদ পরবর্ত্তী গীতি-সাহিত্যের দুঃখবাদে কি অপূর্ব্ব প্রেরণা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার দুঃখবাদ কি অপূর্ব্ব ভক্তি ও প্রেমের রসধারায় স্নাত। রামপ্রসাদের ন্যায় 'মা' 'মা' বলিয়া এরূপ করুণ কান্না, মায়ের সঙ্গে এরূপ দুষ্টুমি ও আবদার, মায়ের উপর অফুরন্ত নির্ভর, "ভয় করি না মা চোখ রাঙ্গালে" এই স্নেহের বীরত্ব এবং মায়ের আঁচল ধরিয়া নৃত্য,—এক কথায় এরূপ মাতৃগতপ্রাণ শিশু-জগতের সাধনা-রাজ্য আর কোথায় মিলিবে ?

তারপরে রামপ্রসাদই আগমনী গানের প্রথম কবি, তৎপূর্ব্বে উমা ও মেনকা লইয়া বাৎসল্য রসের ধারা কোন কবি বঙ্গসাহিত্যে বহাইয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। "গিরি, আমি প্রবোধ দিতে নারি উমারে, উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে। অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদিত শশী, বলে উমা ধরে দে উহারে। আমি বলিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়—ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।"

বাঙ্গলার কুটিরের বালিকাদুহিতাদের স্বামী গৃহে যাওয়ার পর মাতৃহৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণ-রসের অফুরন্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে, সেই আগমনী গানের আদিগঙ্গা—হরিদ্বার এই প্রসাদ-সঙ্গীতে। আশ্বিন মাসের ঝরা শিউলীফুলের মত এই যে মাতৃমিলনের প্রত্যাশায় বালিকা বধূদের চক্ষুজল দিন রাত্রি ঝরিত, এই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রু-রচিত হার, উহা তাৎকালিক বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদরসে পুষ্ট।

তৃতীয়তঃ যেমন কৃষ্ণরূপ, শিবের রূপ নানা স্তোত্র ও কবিতায় ধ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রামপ্রসাদের রচিত শত শত সঙ্গীতে কালী মূর্ত্তি সেই রূপ উচ্চাঙ্গের সাধনার সহায়ক হইয়াছেন। জগতের যাহা কিছু সুন্দর শুধু তাহাই নহে যাহা কিছু ভৈরব—তাহাই দিয়া এই মূর্ত্তি তিনি রচনা করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর বা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি রচক,—রামপ্রসাদ বর্ণিত রূপকে আদর্শ করিতে পারেন নাই। চিত্রে ও মৃণ্ময় বিগ্রহে কালীমূর্ত্তি স্থিরা, তাঁহার লীলা নাই ; তাঁহার রূপ সংযত কিন্তু কবি যেন তৎবর্ণিত রূপে জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য ভীষণত্ব ও চাঞ্চল্য ঢালিয়া দিয়াছেন ; তাঁহার ভাষায় যে জীবন্ত মূর্ত্তি পাই, এখনও মন্দিরে

আমরা তাহা পাই নাই, কালীমূর্ত্তির চিত্রকর ও ভাস্কর এখনও জন্মায় নাই। রামপ্রসাদ ভাষায় যেরূপ আঁকিয়াছেন—তাহা শুধু রূপ নহে, তাহাতে তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—

"ঢলিয়া ঢলিয়া কে আসে,
গলিত চিকুর আসব আবেশে
বামা রণে দ্রুতগতিতে চলে, দানবদলে
ধরি করতলে গজগরাসে
কে রে কালীর শরীরে রুধির শোভিছে
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে
কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত
নখর নিকর তিমির নাশে
কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়
ঘনঘোর রবে উঠে আকাশে
দিতি সুতচয়, সবার হৃদয়
থর থর থর কাঁপে তরাসে
মাগো কোপ কর দূর, চল নিজপুর,
নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে"

পুনশ্চ—"এলোচিকুর ভার, এ রমণী কার
মার মার রব বলে"

এই সকল গান সুগায়কের কণ্ঠে শুনিতে শুনিতে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনায় হৃদয় ভরিয়া যায়; করি গ্রাস অবধি যাহা কিছু অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর তাহা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিশিয়া যেন লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। গানগুলি কল্পনাকে অলৌকিকভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া এমন এক রাজ্যে লইয়া যায় যাহা বীভৎস ও ভীষণকে সুন্দর করিয়া দেখায় এবং সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব কবিত্ব মণ্ডিত হইয়া ভৈরব, মহান ও সুন্দরকে একসূত্রে গাঁথিয়া ফেলে।

সেই মহিয়সী মূর্ত্তি যাহা কালিন্দীর তরঙ্গে কিংশুকের ন্যায় শোভমান,—যাহার রূপ-জ্যোতি বিদ্যুতের মত সাধকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করে—যিনি আসব পান করিয়া বিগলিত কেশা, দৈত্যসহ রণক্লান্ত হইয়া আসব আবেশে ঢলিয়া ঢলিয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তিনি তাঁহার পাত্র শূন্য করিয়া তাঁহার ভক্তির আসব রামপ্রসাদকে দিয়াছিলেন, তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন, —"আমার মন মাতালে মাতাল কৈল, মদ মাতালে মাতাল বলে।" কোথায় সেই আসব? তাহা শুঁড়ির দোকানের নহে, তাহার জন্মস্থান সাধকের চিত্তে।

একবার এই কুমারহট্টের মৃত্তিকার ধূলি লইয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহা জগতের সার বস্তু মনে করিয়া তাঁহার কোঁচার খুটিতে বাঁধিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—"কুমার হট্ট ঈশ্বর পুরীর জন্মস্থান। এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ।"

সেই কুমার হট্টের ধূলি লইয়া আবার আসুন আমরা মস্তকে ছোঁয়াইয়া উত্তরীয়াগ্রে বাঁধিয়া রাখি। রামপ্রসাদের লীলাস্থান এই কুমারহট্টকে শত নমস্কার। এই স্থান হইতে ভক্তির যে মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল—বঙ্গদেশের দিগ্‌দিগন্তর হইতে কোটী কোটী লোক হাত পাতিয়া প্রসাদ-কবির সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখান হইতে যে মা মা রব উত্থিত হইয়াছিল তাহা দুই শত বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার পথে ঘাটে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, পার্ব্বত্য ত্রিপুরাও আসামে, ও স্বচ্ছসলিলা ধলেশ্বরী বাহিত ঢাকা ও ফরিদপুর, ময়মনসিংহে, প্রকৃতির রম্য নিকেতন বাঁকুড়া ও বীরভুমে এবং সরস্বতী ও দামোদর তটে, এক কথায় সমস্ত বঙ্গদেশে রামপ্রসাদের গান লোকেরা গাহিয়া গাহিয়া এই দীর্ঘ সময় যাবৎ ভক্তির উপহার দিয়াছেন, সেই সকল গানের এই আদিগঙ্গা—এই হালিসহর, আমাদের চক্ষে মহাতীর্থ, ইহাকে শত শত নমস্কার। *

* গত ২৮শে বৈশাখ সাধক-কবি ৺রামপ্রসাদের জন্মভূমি কুমার-হট্ট-হালিসহরে রামপ্রসাদ-সাহিত্য-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

কপালকুণ্ডলার ইতিবৃত্ত

[বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর]

(১)

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি ক্ষীণকায় দেবতা-তুল্লভকান্তিযুক্ত ২১ বৎসর বয়স্ক নবীন যুবাপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র—হাকিম (Dy. Magistrate) হইয়া প্রথমে যশোহরে যাত্রা করেন। সেখানকার কার্য্য শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তার, কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া—সরকার বাহাদুর (Government) বিশেষ প্রীত হইয়া এই তরুণ বয়স্ক যুবক হাকিমকে বঙ্গের এক প্রধান মহকুমায়—শান্তিরক্ষার্থ প্রেরণ করেন। যাহাকে হিজলীকাঁথি (Contai) বলে এবং যাহা উপস্থিত সদর (District) বলিয়া খ্যাত—তৎকালে উহা "নাগোয়ান মহকুমা" (Subdivision) বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সেই প্রদেশে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রায় দশমাসাধিক কাল থাকিতে হয়। তারপর তিনি অন্যস্থানে বদলি হয়েন। একস্থানে দশমাসাধিক অবস্থানের ফল—বঙ্গসাহিত্যে চিরনূতন অদ্ভুত উপন্যাস "কপালকুণ্ডলা।" সে রহস্য ক্রমশ: বলিতেছি।

(২)

বঙ্কিমচন্দ্রকে পরে গল্প করিতে শুনিয়াছি—নাগোয়ানে থাকিবার কালে তাঁহার জীবন ভীষণ কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে তাঁহাকে দিবারাত্র অতি কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত। সেবারে তাঁহার সঙ্গে ২।৪ জন ভৃত্য ছাড়া বাটীর কোন পরিবারবর্গ বা আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না। যে সময় বঙ্কিমচন্দ্র তথাকার "হাকিম"—সে সময়ে সেস্থানে "দৌলতপুর ও দরিয়াপুর" নামে দুইটী গণ্ডগ্রাম ছিল মাত্র। তথায় মনুষ্য বসতির কোন চিহ্ন ছিল না, অরণ্যময় স্থানমাত্র। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অহুদ্যোতিনী, সে প্রদেশ সেরূপ নহে। কোর্ট—আদালত, পুলিশ, ট্রেজারি, রাজকর্ম্মচারীদিগের থাকিবার স্থান প্রভৃতি সমুদয় "দরিয়াপুরে" ছিল। দৌলতপুরে এ সকল আপদ বালাই কিছুই ছিল না। "দৌলতপুরের" লোকদিগকে—মামলামকর্দ্দমা করিতে হইলে "দরিয়াপুরের" কাছারিতে আসিতে হইত। "দৌলতপুর" গ্রামখানি নদীর উপকূলেই অবস্থিত, তবে উক্ত নদীটী প্রকৃত নদী নহে—নদীর মোহানামাত্র। কিন্তু সেই স্থানে নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও ছিল না। নদীর এক কূলে দৌলতপুর গ্রাম—অপর কূলের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। আর যে দিকেই দৃষ্টিগোচর হয় সেই দিকেই দেখা যায় যে কেবল অনন্ত জলরাশি চঞ্চল রবিরশ্মিমালা প্রদীপ্ত হইয়া গগনপ্রান্তে গগনের কোলে মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল সচরাচর সকর্দ্দম নদীজলবর্ণ; কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি নীলপ্রভ।

"দরিয়াপুরে"—কাছারি-আদালত ছিল বটে—কিন্তু মনুষ্য বসতি অতি বিরল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেঁয়ো দোকান—তাহাও বহু দূরে দূরে। বহুদূরে নদীর উপকূলে দৌলতপুর গ্রাম—তথায় (যাহা তৎকালে "রসুলপুরের নদী" বলিয়া বিখ্যাত ছিল) মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত কয়েক যোজন পথ ব্যাপিয়া এক বালুকাস্তূপ শ্রেণী বিরাজিত ছিল। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তূপ শ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। লোকে উহাকে "বালিয়াড়ি" বলিত। ঐ সকল "বালিয়াড়ির" ধবলশিখর-মালা মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণে "দরিয়াপুর" হইতে অপূর্ব্ব শোভা-বিশিষ্ট দেখাইত। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে। মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করে। বৃক্ষাদির মধ্যে "ঝাটী" "বনঝাউ" এবং "বনপুষ্পই" অধিক। ইহার পরে দূরে বহু দূরে—মঙ্গল-মধ্যস্থিত প্রান্তরের শেষ সীমায় বহুকালের অতি প্রাচীন জরাজীর্ণ

ভগ্নপ্রায় "কালীমন্দির।" তাহার পর যতদূর চক্ষু যায় কেবল অনন্ত বিস্তৃত বিজন বন। মনুষ্যবিরল বালুকাময় চর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাস্তূপের সারি। আকাশ, প্রান্তর—বিজন অরণ্যানি—সমস্তই জনহীন নীরব—কেবল বহুদূরাগত অবিরল কল্লোলিত সমুদ্র গর্জ্জন আর বন্য পশুর রব।

(৩)

তথায় নয়নোপযোগী বা শ্রবণোপযোগী আর কিছু বিশেষ ছিল না—তবে ছিল—আর ছিল নিবিড়ঘন শ্যামাচ্ছাদিত অরণ্যের মধ্যস্থলে সাহেবী ধরণের একটী "বাঙ্গলা"। জনশ্রুতি প্রবাদ এইরূপ যে উহা বহুপূর্ব্বে নীলকুঠির ম্যানেজার সাহেবের "খাস আরাম-গৃহ" ছিল। পরে নীলের আবাদ চিরদিনের জন্য এ প্রদেশ হইতে উঠিয়া যাইলে—"সরকার বাহাদুর" উক্ত "বাঙ্গলা" মেরামত করিয়া হাকিমদিগের বাসভূমি রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হাকিম—সুতরাং তাঁহাকে ঐ অপ্রফুল্লকর স্থানে ঐ বাঙ্গলায়—রাজকার্য্যের কঠোর কর্ত্তব্যানুরোধে অতি কষ্টে প্রায় দশমাসাধিককাল বাস করিতে হইয়াছিল। উক্ত বাঙ্গলার নিকটস্থ চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়—কেবল অনন্ত বিস্তৃত বন। কিন্তু সে বনকে দীর্ঘ বৃক্ষাবলী শোভিত নিবিড় অরণ্য বলিতে পারা যায় না। কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ডকে ব্যাপিয়া আছে মাত্র। তাহার পরে দীর্ঘ ঘন পল্লববিশিষ্ট দীর্ঘ বৃক্ষাবলী শোভিত নিবিড় অরণ্য দৃষ্টিগোচর হয়। জল স্থল, আকাশ প্রান্তর, সকলি নীরব নীথর মনুষ্যসমাগমশূন্য—যেন মূর্ত্তিমতী নিস্তব্ধতা বিরাজমানা। কেবল স্তব্ধ রজনীর গভীর নিশীথে—নির্জ্জন পল্লীপথে—ঝিল্লির অবিশ্রান্ত রব, দূরে বহু দূরে—গভীর সাগর গর্জ্জন ও বন্য পশুর অবিরাম চীৎকার সেই বাঙ্গলাকে মৌন করিয়া স্বল্পতোয়া ক্ষীণ শরীরা মৃদুমন্দ গতিতে ধীরে ধীরে সাগরাভিমুখে প্রবাহিতা ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর কুলু কুলু ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন "নাগোয়ানে" তিনি দিবারাত্র কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সময় কাটাইতেন—সঙ্গী ছিল মাত্র ভৃত্যবর্গ ও অদম্য উৎসাহপূর্ণ কর্ম্ম জীবন। প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায়, নির্ভীক, অদ্ভুত সাহসী যুবা বঙ্কিমচন্দ্র ভৃত্যবর্গ বা অপর কোন লোকজন সঙ্গে না লইয়া, একাকী সেই মনুষ্য-সমাগম-শূন্য নির্জ্জন পল্লীপথ অতিবাহিত করিয়া অস্পষ্ট আলোকে কখনও সমুদ্র-উপকুল-সন্নিকট-বালুকাময় স্তূপের কাছাকাছি শ্বেত ধবলাকৃতি চরে—কখনও বা কোলাহল শূন্য গম্ভীর নির্জ্জন নদীর ধারে চুপ করিয়া বসিয়া অনন্তদেবের অনন্ত ধ্যানে তন্ময় হইয়া —পৃথিবীর, এমন কি নিজের পর্য্যন্ত অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া—ধ্যান-স্তিমিত লোচনে সমাধিস্থ যোগীর ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। যখন গভীর রাত্রে লণ্ঠন হস্তে ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে ডাকাডাকি করিত তখন তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া যাইত। তাহার পর ভৃত্যবর্গের হস্তস্থিত লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পথ দেখিয়া "বাঙ্গলায়" ফিরিয়া আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া আহারাদি করিয়া সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রম-জনিত শ্রম দূর করিবার মানসে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেন। নিদ্রাদেবীও তাঁহার প্রতি প্রসন্না ছিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার গভীর নাসিকা-ধ্বনি ভৃত্যগণকে জানাইয়া দিত যে তিনি নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া পরমানন্দে নিদ্রিত হইয়াছেন। এইরূপে সুখদুঃখে দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম সহ কর্ত্তব্য পালন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই নির্জ্জন পুরীতে প্রায় দশমাসাধিক কাল সময় যাপন করিলেন।

তারপরের ঘটনা বলি - সে অতি অদ্ভুত অপূর্ব্ব রহস্য। এইরূপে দিন যায়। একদিন আহারাদির পর শয়ন করিয়া যখন বঙ্কিমচন্দ্র গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন—হঠাৎ সেই নিদ্রাঘোরে তাঁহার মনে হইল যেন কোন মনুষ্য শয্যার চারিপার্শ্বে অতি মৃদু পদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অকস্মাৎ মনুষ্য নিঃশ্বাস প্রবাহিত অতি উষ্ণ বায়ু বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে লাগিল। লাগিবামাত্র নিদ্রাঘোর কাটিয়া গেল। চক্ষু চাহিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি নিজের অস্তিত্ব, দেশ, কাল পাত্র সব বিস্মৃত হইলেন। জাগ্রত কি নিদ্রিত, কি নিদ্রাসুখে স্বপ্ন দেখিতেছেন ইহা স্থির করা তাঁহার পক্ষে কঠিন বোধ হইল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অদ্ভুত প্রকৃতির সাহসী পুরুষ ছিলেন। "ভয়" বলিয়া যে কোন জিনিষ পৃথিবীতে

আছে তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল। নিমেষ মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন সম্মুখে এক ভীষণ অদ্ভুত দৃশ্য ;— বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার শয্যার অনতিদূরে তাঁহার নয়নোপরি বিদ্যুদাগ্নির ন্যায়—অতি খরতর তীক্ষ্ণ জ্যোতির্ম্ময় অথচ জ্বালাময়ী রক্তবর্ণ চক্ষু স্থাপন করিয়া – দীর্ঘাকার এক পুরুষ,— কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত, গলদেশে, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা শোভিত, প্রশস্ত ললাটে রক্তচন্দন-চর্চ্চিত ; হস্তে লোহিতবর্ণ দ্রবপদার্থ-পূর্ণ নরকঙ্কাল ; এক ভীষণাকার সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে দণ্ডায়মান। বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভীক হৃদয়ে জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সন্ন্যাসী মূর্ত্তিধারী তুমি কে কি জন্য এই নিশীথ সময়ে আমার ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাইয়া—আমার অন্দরে অনধিকার প্রবেশ করিয়া শয্যার চারিপার্শ্বে চোরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ? জান আমি কে— আমি মনে করিলেই পুলিস ডাকিয়া এই দণ্ডেই তোমাকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিতে পারি ? তুমি কি চাও ?"

মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিল—"হ্যাঁ আমি সব জানি। তুমি হাকিম, এ নাগোয়ান মহকুমার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা এ সকলি আমার জানা আছে। আমি সারাজীবন আশায় আশায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে সমুদ্রতীরে শ্মশানবাসী হইয়া আছি— কাহার জন্য জান ? তবে শোন বঙ্কিমচন্দ্র। যাহার আগমন প্রতিক্ষায় এই সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া শরীর ধ্বংস করিলাম—আজ মা জগদম্বার কৃপায় এতদিনের পর—মায়ের হুকুমে—সেই লোকের সন্ধান পাইয়া এই গভীর নিশীথে তোমার ঘুমের বাধা সত্ত্বেও—তোমার এই অন্দর মহলে তোমারি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কেন আসিয়াছি, কাহার জন্য আসিয়াছি,—জান কি বঙ্কিম ?"

বঙ্কিমচন্দ্র। না।

সন্ন্যাসী। শোন বঙ্কিম—সে লোক অপর কেহ নহে, স্বয়ং তুমি।

বঙ্কিম। (সভয়ে বিস্মিতভাবে) অ্যাঁ—আমি ? আপনার কথার ভাব ও তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিলাম না। সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলুন !

সন্ন্যাসী। দেখ বঙ্কিমচন্দ্র, তর্কবিতর্কে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি ? রাত্রিও প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হয়। আর অনর্থক বিলম্ব করিয়া কোন ফল নাই। তোমার সহিত আমার গোপনে অনেক কথা আছে সে সকলই গুহ্যকাহিনী ;—বলিবার এ উপযুক্ত স্থান নহে। যদি সাহস হয় এই গভীর নিশীথে অরণ্যপথ অতিক্রম করিয়া ঐ সুদূরে সমুদ্র নিকটবর্ত্তী নির্জ্জন বালিয়াড়ীর শিখরদেশে আমার সাধন স্থানে আমার সহিত আইস। সেই বালিয়াড়ীর শিখরদেশে বসিয়া নির্জ্জনে তোমাকে আমি কতকগুলি অতি গোপনীয় অদ্ভুত রহস্য পরিপূর্ণ গুহ্যকাহিনী শোনাইব। তুমি তাহা শুনিয়া উচিৎ বিবেচনা কর তাহার প্রতিকারের উপায় স্থির করিয়া সময়ান্তরে আমাকে সংবাদ দিও। তোমার কোন অনিষ্ট করিতে আমি আসি নাই। আসিবার কোন কারণ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—সন্ন্যাসী ঠাকুর ভয়ের নিমিত্ত আমি কাতর নহি। আজ পর্য্যন্ত "ভয়" জিনিষটা যে কি বস্তু তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। তবে বিশেষ কোন কারণে এই গভীর নিশায় অন্ধকারে আজ আমি আপনার সহিত যাইতে অপারক। আমি ইতিমধ্যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিব। আপনি পুনরায় অন্য একদিন আসিবেন। সেইদিন কর্ত্তব্যমত কার্য্য করিব।

সেইদিন সন্ন্যাসী দ্বিরুক্তি না করিয়া বিদায় হইয়াছিলেন, তাহার পরও সেই সন্ন্যাসী পুনরায় দুইবার সেইরূপ গভীর নিশীথে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু বলিতে পারি না, কি কারণে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসীর আদেশ মত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই।

(৪)

শেষবারে সন্ন্যাসী কতকগুলি তিব্বতী ভাষায় (অনেকটা বহু পুরাতন দেবনাগরী ভাষার তুল্য) লিখিত প্রস্তর ফলক ও পুঁথি লইয়া আসিয়া পূর্ব্বমত গভীর রজনীতে বঙ্কিমচন্দ্রের শয়নগৃহে যাইয়া তাঁহাকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া বলিলেন "বঙ্কিমচন্দ্র, আমি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তিন তিনবার তোমার কাছে আসিলাম কিন্তু তুমি একবারও আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে না। কি করিব, সকলি

মহামায়ার ইচ্ছা। তোমার নিকটে আমার এই শেষ আসা। তোমায় আমায় বোধ হয় এই শেষ সাক্ষাৎ। এতদিন ধরিয়া এত যত্ন করিয়া পুত্রাধিক স্নেহে যে সকল প্রস্তরলিপি ও এই পুঁথিখানি নিজের কাছে অতি গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম—যাহার জন্য এক মুহূর্ত্তও স্থিরচিত্তে নিজের সাধনকার্য্য পর্য্যন্তও করিতে পারি নাই—আজি তৎসমুদায় তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। অবসরমত পড়িয়া দেখিও। মূল্যবান বিবেচনা কর, রাখিয়া দিও—নচেৎ সর্ব্বভুক অগ্নিদেবতাকে উপহার দিও। ঐ সব প্রস্তরফলকে যে সব স্থানের নির্দ্দেশ আছে—এই গভীর জঙ্গলের ভিতর আমি স্বয়ং সে সকল স্থান দেখাইয়া না দিলে তুমি সারা জীবন ধরিয়া খুঁজিলেও তাহা বাহির করিতে পারিবে না—সেইজন্য তোমাকে আমার সহিত যাইবার জন্য এত সাধাসাধি করিয়াছিলাম। যাক, এ সকলি সেই বিশ্বজননীর মর্জ্জি। আজি আমি যথাসর্ব্বস্ব তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া—নিশ্চিন্ত মনে চিরশান্তিতে মায়ের ছেলে মায়ের কাছে ফিরিয়া চলিলাম। আমার শেষ অনুরোধ উহা নিজের নিকট রাখিতে ইচ্ছা না হয় পুঁথিখানি অগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিও প্রস্তরগুলি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিও। অপর কাহারও হস্তে দিও না। তবে যদি স্মৃতি রাখিতে চাও তাহা হইলে নূতন করিয়া নূতন পুঁথি নূতন মাল মসলা দিয়া ভোল ফিরাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়া—জগৎবাসীকে উপহার দিও কিন্তু পুরাতনের নাম-গন্ধ রাখিও না। এক্ষণে চলিলাম, আশীর্ব্বাদ করি এ মর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া—যশসৌভাগ্যের উচ্চশিখরে অধিরোহন কর।" পরমুহূর্ত্তেই চকিতে চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল। পরদিবস বঙ্কিমচন্দ্র আবার তাঁহার বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান নাই। তাহার কিছুকাল পরেই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলাদেশকে ও বাঙ্গালীকে উপহার দিয়াছিলেন—**"কপাল কুণ্ডলা।"**

কিন্তু সেই সব প্রস্তর ফলক ও পুঁথিখানি বঙ্কিমচন্দ্র যে কি করিয়াছিলেন—তাহা বহু চেষ্টা সত্বেও আমরা জানিতে পারি নাই—পূজনীয়া স্বর্গীয়া মাতামহী দেবী—আমার পরমারাধ্যা পরমপূজনীয়া—শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী ও আমরা সকলে বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই সকল প্রস্তরফলক ও পুঁথির কথা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইয়াছি "যে সকল ঘটনা অন্ধকারের যবনিকায় লুক্কায়িত, সে সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ও সকল কথা আমাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিও না।"

ইহাই "কপালকুণ্ডলার" পূর্ব্ব ইতিহাস। তাঁহার স্ব-লিখিত জীবনচরিতে ইহার উল্লেখ আছে দেখিয়াছি ও তাঁহার নিজমুখে ঐ সকল গল্প ঐরূপভাবে শুনিয়াছি। তবে কেমন করিয়া কোথা হইতে কি কি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে কাপালিক প্রতিপালিতা বনচারিণী কপালকুণ্ডলাকে আমরা মানশ্চক্ষে সজীব অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছি তাহা জানিবার ও বুঝিবার বহু চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু অদৃষ্টক্রমে বুঝিতে পারি নাই।

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

[শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাট্যবিনোদ]

অনেকে বলেন, উপন্যাস হইলেও কপালকুণ্ডলা একখানি শ্রেষ্ঠ গদ্যকাব্য। কপালকুণ্ডলার চরিত্র অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ। ব্যবহারিক জগতে ইহার স্থান কতটুকু জানি না, কিন্তু কল্পনার রাজ্যে ইহা তুলনা-রহিত। শকুন্তলা ও মিরাণ্ডার

অমরেন্দ্রনাথ ও কুসুমকুমারী (নল ও দময়ন্তী সাজে)।

সহিত কপালকুণ্ডলার তুলনা-মূলক সমালোচনা অনেক হইয়া গিয়াছে, সুতরাং চরিত্র বা উপন্যাসের সমালোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। রঙ্গমঞ্চের দিক হইতে দর্শক ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কি ভাবে ইহা নাটকাকারে গ্রথিত হইয়াছে, আমরা কেবল সেই কথাই বলিব।

(কপালকুণ্ডলার ন্যায় নিছক কবিত্বপূর্ণ চরিত্রের অভিনয় সচরাচর জমে না; কারণ এরূপ চরিত্রের পরিকল্পনা এবং রঙ্গমঞ্চে তাহার বিকাশ যে-সে অভিনেত্রীর দ্বারা সম্ভবপর হয় না। এই সকল কবিত্বপূর্ণ ভাবপ্রবণ চরিত্রগুলি প্রায়ই নাটকে বেশী কিছু কাজ করে না; ইহাদিগকে অবলম্বন

করিয়া নাটকের অন্যান্য পাত্রপাত্রী কার্য্য করে, কাজেই পারদর্শিনী অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত না হইলে, অভিনয়ে এই সকল চরিত্র বড় প্রাণহীন মনে হয়। এই জন্যই অভিনয়ে দেখা গিয়াছে, মতিবিবি দর্শকের চিত্তে যে প্রভাব বিস্তার করে, কপালকুণ্ডলা তাহা করিতে পারে না। উপন্যাসে

ন্যাশান্যাল থিয়েটারের আমলে শ্রীমতী বিনোদিনী কপালকুণ্ডলার ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। তখন শুনিয়াছি; বিনোদিনীর অভিনয়-নৈপুণ্যে রঙ্গমঞ্চেও কপালকুণ্ডলাই উচ্চস্থান অধিকার করিত। কপালকুণ্ডলার ভূমিকা অভিনয়ের এই যে সাফল্য তাহা কেবল অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত গুণপণা ও কৃতিত্বের জন্য।

চুনীলাল দেব

কপালকুণ্ডলা নায়িকা, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে কপালকুণ্ডলাকে চাপা দিয়া মতিবিবি ফুটিয়া উঠে এবং এই মতিবিবিই দর্শকের চিত্তে অবসাদ আসিবার সুযোগ দেয় না। আর গদ্যকাব্য হইলেও এই কারণেই একটু ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারিলেই রঙ্গমঞ্চে কপালকুণ্ডলা বেশ জমে।

১৮৯০ কি ৯১ খ্রীষ্টাব্দে এমারেল্ড থিয়েটারে আমরা প্রথম কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখি; সে অভিনয়ে কপালকুণ্ডলাকে চাপা দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল—মতিবিবি। তখন মতিবিবি সাজিতেন স্বর্গীয়া সুকুমারী দত্ত। এই অভিনয়ে যাঁহারা প্রধান প্রধান ভূমিকা লইয়াছিলেন, আমার যতদূর স্মরণ

আছে তাহা লিখিতেছি। নবকুমার সাজিয়াছিলেন স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু। মহেন্দ্রলালের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার কণ্ঠস্বরে; দুঃখাত্মক ভূমিকা, হতাশ-প্রেমিকের ভূমিকা তাঁহার কণ্ঠস্বরে যেমন খাপ খাইত, তেমন আর কাহারও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই বিশেষত্ব ছিল বলিয়াই তাঁহার নামের তখন বিশেষণ দেওয়া হইত—"The Tragedian."কাপালিক সাজিয়াছিলেন—স্বর্গীয় মতিলাল সুর। উগ্র নিষ্ঠুর প্রকৃতির চরিত্রাভিনয়ে ইনি বিশেষ পটু ছিলেন। তাঁহার কাপালিক এখনো রঙ্গমঞ্চে অনুকৃত হয়। মতিবিবির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুকুমারী দত্ত একাধারে সু-গায়িকা ও সু-অভিনেত্রী ছিলেন। এমারেল্ড থিয়েটারে এই যে কপালকুণ্ডলা ড্রামাটাইজ করা হয়, তাহাতে মতিবিবির চরিত্রে অনেকগুলি গান এই জন্যই সংযোজিত হইয়াছিল। সে গানগুলি এত মনোরম ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল যে এখনও পর্য্যন্ত সেই গানগুলি লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এই কপালকুণ্ডলার সময় গানগুলির সুর সংযোগ করিয়াছিলেন—সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যিক স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর। কপাল-কুণ্ডলা শ্রীমতী হরিমতি (ব্লাকী), পেশমান—স্বর্গীয়া কুসুম কুমারী (হাড়কাটার কুসুম); এই কুসুম-কুমারীও সুগায়িকা ছিলেন বলিয়া পেশমানের ভূমিকায়ও অনেকগুলি গান দেওয়া হয়। এখনও রঙ্গমঞ্চে এই সকল গান খুব প্রশংসার সহিত গৃহীত হয়। এমারেল্ড থিয়েটারের জন্য কপালকুণ্ডলা ড্রামাটাইজ করেন স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র। অতুলকৃষ্ণ সুকবি ছিলেন। বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ তাঁহার নিকট কম ঋণী নহে। তাঁহার রচিত বহু গীতিনাটিকা বহু রঙ্গমঞ্চে বহুবার আদরের সহিত অভিনীত হইয়াছে এবং সব অভিনয়ে কোনদিনই দর্শকের অভাব হয় নাই। ছোট কথায় মর্ম্মস্পর্শী গান তিনি অতি সহজেই বাঁধিতে পারিতেন। দ্বৈতসঙ্গীত রচনায় তাঁহার জোড়া ছিল না, আর এই জন্যই তাঁহার রচিত সঙ্গীত আজও রঙ্গমঞ্চে জীবিত। অতুলকৃষ্ণ সুকবি ও নাট্যকার হইলেও কপালকুণ্ডলা তিনি যে ভাবে ড্রামা-টাইজ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বথা গিরিশচন্দ্রের অনুমোদিত হয় নাই; আর অনুমোদিত হয় নাই বলিয়াই গিরিশচন্দ্র প্রায় সাতাশ কি আটাশ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং কপালকুণ্ডলা ড্রামাটাইজ করেন। বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করিয়া দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা গিরিশচন্দ্র ও অতুলকৃষ্ণের খাতার তারতম্য কোথায় তাহাই দেখাইতেছি।
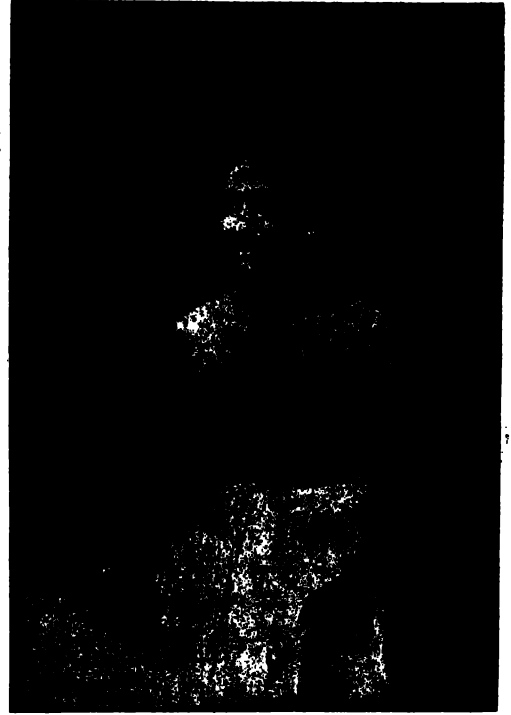
প্রিয়নাথ ঘোষ

অতুলকৃষ্ণ কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দেখাইয়াছেন—স্থান, বালিয়াড়ী, দূরে নদী-গর্ভে নৌকা দেখা যাইতেছে, কপালকুণ্ডলা কাপালিককে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ওটা কি বাবা?"

কাপালিক।...গঙ্গাসাগর যাত্রীর নৌকা।

কপালকুণ্ডলা। ওতে কারা আছে?

কাপালিক। ওতে মানুষ আছে।

কপালকুণ্ডলা। হাঁ বাবা, মানুষ কি বাবা? ইত্যাদি।

ইহা সেই Tempest-এর অনুকরণ অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা চরিত্রের সহিত সামঞ্জস্য নাই; কারণ গ্রন্থের কয়েক পরিচ্ছেদ পরেই কপালকুণ্ডলা অধিকারীকে বলিতেছে,

"যখন তোমার শিষ্য এসেছিল, তখন আমায় তার সঙ্গে যেতে দাওনি কেন?"

অতএব সে মানুষ চিনিত এবং ইহার পূর্ব্বে নৌকা দেখাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই, ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে মনে করিয়া লইতে পারি। কাজেই অতুলকৃষ্ণের কপালকুণ্ডলার এই প্রথম প্রবেশ ও তাহার এই উক্তি একটা প্রকাণ্ড ন্যাকামীতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু গিরিশ-চন্দ্র এখানে বঙ্কিমের উপর কলম চালান নাই। তিনি কপালকুণ্ডলাকে দর্শকের সম্মুখে প্রথম ধরিয়াছেন যেমন আমরা উপন্যাসে দেখি, ঠিক তেমনই। সে পথহারা নব-কুমারকে দেখিয়া বলিতেছে "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ!" নবকুমার যে পথিক, কপালকুণ্ডলা তাহা চিনিয়াছিল; তাহার এই প্রথম উচ্চারিত সম্বোধনই দর্শককে স্পষ্টই বুঝাইয়া দেয় যে "মানুষ কি বাবা?" বলিবার মত অবস্থা তাহার নয়। শুধু একস্থানে নয়, অতুলকৃষ্ণের কপাল-কুণ্ডলার অনেকস্থানেই এমন অনেক কথা আছে, যাহা বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা চরিত্রের বিরোধী। গিরিশচন্দ্র অতি সাবধানতা ও নিপুণতার সহিত কপালকুণ্ডলাকে রঙ্গমঞ্চে কথা কহাইয়াছেন। তিনি অভিনয় জমাইবার খাতিরে কপালকুণ্ডলার মুখে অসঙ্গত বাক্য কিছুই দেন নাই। চটীর দৃশ্যে, যেখানে মতিবিবির সহিত তাহার প্রথম দেখা হইল, সেখানে নবকুমারের সঙ্গে কথোপকথনে দুই চারিটী কথায় গিরিশচন্দ্র বনবিহঙ্গীর ন্যায় স্বভাব-মুগ্ধা সরলা কপালকুণ্ডলাকে দর্শকের সম্মুখে অবিকৃত ভাবেই ধরিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা, নবকুমারকে বলিতেছে—"সমুদ্র এখান থেকে কতদূর? আমি যেন এখানে বসে সেই জল-কল্লোল শুনতে পাচ্ছি"......ইত্যাদি।

কপালকুণ্ডলার এই ভাবের দুই চারিটী কথায় দর্শককে বিনা আড়ম্বরে বুঝাইয়া দিতেছে যে সে হিজলী ত্যাগ করিলেও হিজলী তাহাকে ত্যাগ করে নাই। যে বনে, যে সমুদ্রতীরে সে পালিতা হইয়াছিল, সেই সমুদ্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। সে সেখান হইতে যতদূরেই যাক্ না কেন, এই বন্ধনই বুঝি আমরণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। এই যে ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ, ইহাই নাট্যকারের লিপি-চাতুর্য্য।

ক্লাসিকের জন্য গিরিশচন্দ্র কপালকুণ্ডলার যে ড্রামা-টাইজ করেন, তাহাতে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহাদের নাম দিতেছি।—

নবকুমার—স্বর্গীয় অমরেন্দ্র নাথ দত্ত। অমরেন্দ্র বাবু এই ভূমিকায় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। কাপালিক সাজিয়াছিলেন – স্বর্গীয় অঘোর নাথ পাঠক। অঘোর বাবু সুগায়ক ছিলেন। এমারেল্ডের কাপালিক গাহিতে পারিতেন না; অঘোর বাবুর জন্য গিরিশচন্দ্র কাপালিকের মুখে একটী গান দিয়াছিলেন। নবকুমারকে বধ্যভূমি দেখাইয়া কাপালিক গাহিতেছে—তাহার প্রথম লাইনটী এই,—

"নররুধির-তৃষাতুর নেহার ভূমি দূরে"

গানটী এমন সুরে ও ভঙ্গিমায় গীত হইত যে দর্শক সত্যই শিহরিয়া উঠিতেন। কপালকুণ্ডলা সাজিতেন যশঃস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী; মতিবিবির ভূমিকা লইয়াছিলেন প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী। এই অভিনয়ে তখনকার রঙ্গমঞ্চে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। প্রতিযোগিতায় তখনকার মিনার্ভা থিয়েটার অতুলকৃষ্ণের কপালকুণ্ডলার অভিনয় আয়োজন করিয়াছিল। এখানে মতিবিবির ভূমিকা দেওয়া হইয়াছিল স্বর্গীয়া তিনকড়ি দাসীকে। নবকুমার দেওয়া হইয়াছিল সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষকে এবং কাপালিক দেওয়া হইয়াছিল এখনকার প্রবীণ কিন্তু তখনকার নবীন উদীয়মান অভিনেতা শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেবকে। গিরিশচন্দ্র মতিবিবির চরিত্রচিত্রণ এমন নিপুণতার সহিত নাটকাকারেগ্রথিত পুস্তকে করিয়াছিলেন এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরীও এরূপ সুন্দর ও সঙ্গত অভিনয় করিয়াছিলেন যে, সে অভিনয় দেখিয়া সকলকেই বলিতে হইয়াছিল, মতিবিবির পুরাতন ধারা তারাসুন্দরী বদলাইয়া দিয়াছেন। যে দৃশ্যে মতিবিবি পেশমানকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ দিয়া আগ্রা হইতে চিরবিদায় লইতেছে, সেই দৃশ্যে, গিরিশচন্দ্র কয়েকটী ছত্রে মতিবিবি-চরিত্রের এমন ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন এবং মতিবিবিও অভিনয়ে এমনই মর্ম্মস্পর্শীভাবে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন যে, আজও তাহা দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে।—মতিবিবি পেশমানকে বলিল "আকাশে চন্দ্র সূর্য্য থাকতে, জল অধোগামী কেন?"

পেশমান। কেন?

মতিবিবি। ললাট-লিখন! * * * * পেশমান তুই-ই সুখী। রূপের মোহিনী কখনও তোর নয়নপথে পতিত হয় নি; তোর পূর্ব্বস্মৃতিতে সুন্দর স্বামীর গলে বরমাল্য প্রদান নেই? আবার অনেক দিনের পর সে সুন্দর মূর্ত্তি তুই দেখিস নি, তার কথা শুনিস নি, তার দ্বারা বিপদে উদ্ধার হস নি, তার যত্ন পাস নি, মুমূর্ষু অবস্থায় তার কাঁধে ভর দিয়ে চলিস নি—সে যে আবার অন্যের হয়েছে—এ জ্বালা কখনও সহ্য করিস নি;—পেশমান, আমার প্রাণ বড় অসুখী!"

উপন্যাসে এই পরিচ্ছেদ-শেষে আছে, পাষাণ মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল, পাষাণ দ্রব হইতেছিল। রঙ্গমঞ্চে গিরিশ-চন্দ্র মতিবিবির মুখে দ্রবীভূত পাষাণ, ভাষায় দেখাইয়াছেন; নহিলে দর্শকের চিত্ত দ্রব হয় কি কারয়া? (ক্রমশঃ)

মূর্খ

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

(ক)

পুরুষটি বয়সে অনেক বড়, অতি কুৎসিত; মেয়েটি নবীনা ও সুন্দরী। গৃহ দীন-দরিদ্রের. সন্ধ্যা আসন্ন; ঘরের অবস্থা সুতরাং অনুমেয়। মেয়েটি কেবল এ ঘর-ছাড়া।

পুরুষ বলিল—এত লেখাপড়া শিখলি কি করতে? দু'পয়সা রোজগারই যদি না করতে পারবি! বলিয়া মুখটা এমন গোমড়া করিয়া বসিল যে মেয়েটির চোখে ঘরটা একেবারেই আঁধার হইয়া গেল।

ধিক্কারের উত্তর সে দিল না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিল, এই মূর্খাদপি মূর্খ ভাইটাকে বিদ্যার প্রভাব দেখাইতেই হইবে। তাহারা ভাই-বোন্। হাঁদু ও হেনা। জন্ম-পরিচয় অতি ঘৃণ্য, আলোচনার অযোগ্য।

(খ)

রবিবারের ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইল, একটি বিবাহিতা কিশোরীর জন্ত একটি সুন্দরী শিক্ষিকার আবশ্যক। হেনা বাক্স নম্বর দেখিয়া আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়া গুণধর জ্যেষ্ঠের পিণ্ড প্রস্তুত করিতে বসিল। গাঁজাগুলি খাইয়া আসিয়া সামনে বাড়া-ভাত না পাইলে মা-সরস্বতীর মুখে দিয়াশলাই জ্বালিয়া দিবে।

দুইদিন পরে চিঠি আসিল ও সেইদিনই অপরাহ্নে মোটর আসিয়া গলির মোড়ে দাঁড়াইল। হাঁদু ভগ্নীকে সাদরে বিদায় দিয়া বলিল—বুঝব দিদি লেখাপড়ার কেমন জোর! একশ' টাকা চাই; বেশী হয়, আরও ভাল।

হেনা চাকরী পাইল।

(গ)

মেয়েটি অর্থাৎ ছাত্রিটি, রাজপুত্রবধূ। রাস্তার কলে কলস ভরিতেছিল, রাজার দৃষ্টি পড়ে, মেয়েটি এক লাফে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিল। লোকে জানিল, একটা ভৌতিক কাণ্ড হইয়া গেল। আমাদের ছেলেপুলেরা ভূতের গল্প বলিতে অনুরুদ্ধ হইবামাত্র এই কাহিনী বলিয়া আমাদের ভয় দেখাইয়া থাকে। বৌ-রাণীর যে চেহারা, তাহাতে তাহাকে বৌ-রাণী ছাড়া আর কোন নামেই মানায় না। লেখাপড়ায় একেবারে মা! কুমার বাহাদুর বাড়ীতে পড়াইয়া তাঁহাকে এডুকেটেড ও এন্‌লাইটেণ্ড করিতে চান্। বাড়ীর লোকের ইচ্ছা ছিল, মেম নিযুক্ত হয়; কুমার স্বদেশ-প্রিয় যুবা-পুরুষ, বিদেশিনীকে এতগুলি টাকা বিদেশে-বহনের জন্য দিতে কষ্ট বোধ করিলেন। হেনা কর্ম্মে মন দিল। বৌ-রাণীকে এক দৃষ্টিতেই তাহার ভাল লাগিয়াছিল। সুন্দরীর সহচরীরা অনেকক্ষেত্রেই সুখী। মেয়েটি খুব বাধ্য, বেশ ধীর, শান্ত, কোমল, স্নেহময়ী।

তাহার ভিতরের যন্ত্রটা একেবারে নূতন। লেখাপড়া-র প্রথম কয়টা দিন বড়ই অশান্তিতে কাটাইয়া এখন সে বেশ দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতে আরম্ভ করিল।

বাড়ীতে হেনার সুখ্যাতি রটিল।

(ঘ)

বৌ-রাণীর দেবর,—ছোট কুমার বৌ-দিকে জিজ্ঞাসিল—কেমন লাগছে গো?

আজকাল ভালই লাগছে ভাই।

বেশ। এগজামিন করব?

কর-না ভাই।—তাহার ভারি আগ্রহ, দেবর পাঠ লইয়া তুষ্ট হয়।

আজ নয়; আর দিন কতক যাক্—তারপর। পাস হলে সোণার মেডেল।

বৌ-রাণী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন—মেডেল পরে কি সার্কেসওলা সাজব!

দেবর অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল— আচ্ছা, হার !

সে ভাল।

হেনা শুনিয়া বলিল—হারটি তোমার গলায় যতদিন না দেখছি, আমার সুখ হচ্ছে না।

হেনা সারাদিন বই নাড়ে, পড়ে।

(ঙ)

হেনা পড়াইতেছিল,—কথার শব্দে মুখ ফিরাইল।

নমস্কার ! দেখতে এলুম আপনার ছাত্রীর পড়া কেমন হচ্ছে।

ইনি বড় কুমার। সুপুরুষ, সৌখীন, কিছু বিলাসী-ও। দৃষ্টি বড় চঞ্চল, চক্ষু সুন্দর।

বৌ-রাণী ঝড়ে-ওড়া ফুলটির মত ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—ফার্ষ্টবুক আজ শেষ হয়ে যাবে।

কুমার অন্যদিকে চাহিয়াছিলেন, বলিলেন—খুব ভাল ত !

হেনা লজ্জাটার গলা টিপিয়া ধরিয়া কহিল—বৌ-রাণীর চমৎকার মেধা, আর পরিশ্রম করতেও উনি কুণ্ঠিত নন্।

কুমার একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া, বৌ-রাণীকে ধরিয়া বসাইয়া দিলেন—আচ্ছা দেখি, ফার্ষ্ট বুকখানা।

প্রশ্নের উত্তর মিলিতে এক মুহূর্ত্ত দেরী হয় না, একটি ভুল হয় না,—কুমার খুশী হইয়া বলিলেন—বেশ হয়েছে, চঞ্চলা !

বৌ-রাণীর নাম—চঞ্চলা।

আপনি বসুন-না মিস্ সেন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন !

হেনা না বসিয়া আনত-আননে বলিল—থাক্।

কুমার বলিলেন—তা হ'লে ত আমাদেরও বসা হয় না।

না, না—উঠ্বেন না, আমি বস্‌ছি।

হেনার মুখ প্রফুল্ল, স্বর প্রফুল্ল ; কেবল বাহিরের ভাবটা বড় জড়সড় ; বড় আড়ষ্ট।

(চ)

আজ পরীক্ষা নিতে হবে ঠাকুরপো—বৌ-রাণী দেবরের পাঠ-কক্ষে ঢুকিয়া প্রার্থনা জানাইলেন।

দেবরের নিজের আসন্ন পরীক্ষা, অন্যের পরীক্ষা লইবার মত অবস্থা নয় ; বলিল—আজই ?

হ্যাঁ।

এত তাড়া কেন বলত বৌ-রাণী ? হারের জন্যে নিশ্চয়ই না, কারণ সে ত আগেই অক্লেশে মিলতে পারে, হুকুমের বাস্তা—দেবর আনুগত্যের ভাব প্রকাশ করিল।

দূর, তার জন্যে নয়।

তবে ?

আজ আর এক পরীক্ষায় পাস হয়েছি !

কার গো ?

তুমি বল-দেখি ?

কর্ত্তার।

হ্যাঁ।

কখন্ ?

বিকেলে ; আমি পড়ছিলুম যখন, তখন।

বখ্‌শিস্ কি মিল্‌লো ?

বৌ রাণী হাসিয়া, নতমুখে বলিল—মিল্‌লো !

দেবর-ও হাসিল, বলিল—বুঝেছি !

যাও—বলিয়া বৌ-রাণী আঁচলে মুখ চাপা দিল।

বৌ-রাণী, কাল হবে ভাই।

আচ্ছা।

পরদিন বহি হাতে ছাত্রী হাজির।

সেদিনও অন্যত্র পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে, বলিলেন।

দেবর বলিল—এত ঘন ঘন পরীক্ষা কেন ?

বৌ রাণী রাগ করিয়া বলিলেন—তোমার মতন কাজের লোক ত সংসারে সবাই নয় ; তোমার যেমন রোজ সময়াভাব।

ছোট কুমার টেবিলের খোলা বহিখানাকে সশব্দে বন্ধ করিয়া বলিলেন—আজ আর সময়াভাব নয়, আজ পরীক্ষা।

বৌ-রাণী সোফায় ঝাঁকিয়া বসিয়া বহিখানি টেবিলের উপর রক্ষা করিলেন।

আচ্ছা, প্রশ্ন হবে একটি, বলতে পারলেই পাস্।

বল।

খ্যাঁকশেয়ালীর adjective বিশেষণ কি ?

ধূর্ত্ত—sly.

পাস্।—ছোট কুমার ড্রয়ার খুলিয়া একটি লেদারেটের

বাক্স বাহির করিলেন; সেটি খুলিয়া একগাছি উজ্জ্বল হার বাহির করিয়া উঠিয়া আসিয়া বৌ-রাণীর গলায় পরাইয়া দিলেন। হাসিয়া বলিলেন—এইবার একটা সত্যি কথা বল ত বৌ-রাণী?

কি?

বর্ধাশস্—কোনটা ভাল?

যাও!

(ছ)

দুইদিন পরে বৌ-রাণীর পাঠ-কক্ষে উপস্থিত হইয়া বড় কুমার হেনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আপনাদের কাযের ক্ষতি করলুম না ত?

হেনা সপ্রতিভ-ভাবে বলিল—না, না।

বড় কুমার বসিয়া বলিলেন—আপনি বিরক্ত হবেন ভয় করে' দু'দিন আসিনি।

হেনা অস্ফুটকণ্ঠে কি বলিল।

বৌ-রাণী ভাবিলেন, মিস্ সেনের বিরক্তির কি কারণ থাকিতে পারে? এই একটা কথাই অনেকক্ষণ ভাবিলেন, তন্ময় হইয়া ভাবিলেন; এতই তন্ময় যে আর আধঘণ্টা সেই ঘরে আর দুইটি প্রাণী যে লক্ষ কথা কহিল, তাহা বৌ-রাণী শুনিতেই পাইলেন না।

সন্ধ্যার পর ছোট কুমার অম্লমধুর কণ্ঠে বলিল—বৌ-রাণী তুমি একটি হস্তীমূর্খ!

অত্যন্ত হাসিমুখ ছিল বলিয়াই বৌ-রাণী কাঁদিলেন না, নতুবা তাঁহার বুকের মধ্যে জল যেন ছল ছল করিয়া উঠিল।

(জ)

পড়া আর হয় না, গল্প করিতেই সময় কাটিয়া যায়। হেনা বড় কুমারের সঙ্গে বড় বড় গল্প ফাঁদে; বড় কুমারও এত আত্মহারা যে পড়ার কথা তাঁহারও মনে থাকে না বৌ-রাণী রাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া যান, ইঁহারা লক্ষ্যও করেন না। অথচ মাহিনা পঞ্চাশ টাকা ইহারই মধ্যে বাড়িয়া গেছে।

বৌ-রাণী ফুল বাগানের ক্রোটন ঝোপের মাঝখানে বহি-খাতা ফেলিয়া দিয়া আসিলেন; বাড়ীর লোকমাত্রেই শুনিল, বৌ-রাণীর পড়ার সখ মিটিয়া গিয়াছে।

দেবর জিজ্ঞাসিলেন—সত্যি?

হুঁ।

কেন?

বারম্বার এক 'কেন'র উত্তর দিতে বৌ-রাণী বাধ্য হইলেন—কেবল গল্প। তা পড়ব কখন?

দেবর মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—এইবেলা বিদেয় কর।

স্বামী বলিলেন—লেখাপড়া ছাড়লে? ছিঃ।

ঘর ছিল অন্ধকার, হৃদয় ছিল অভিমানে ভরা; টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, কেহ দেখিল না, নিজেও না। আর কথাবার্ত্তাও কিছু হইল না। কিন্তু হেনার চাকরী গেল না। যেমন ছিল, তেমনিই রহিল; কারণ বিদায় দিবার মালিক যিনি, বিদায় দেওয়ার কথা তাঁহার মনেই জাগিল না! তিনি সন্তুষ্টি খুঁজিতেছিলেন।

(ঝ)

হেনা যথাসময়ে বেশ-বাস সংস্কার করিয়া, ফিটফাট হইয়া পড়াইতে আসে,ছাত্রীকে উপর্য্যুপরি অনুপস্থিত দেখিয়াও তাহার উৎসাহ ভাঙ্গে না, বাসয়া অপেক্ষা করে। বড় কুমার দারুণ গ্রীষ্মে গড়ের মাঠের উষ্ণ হাওয়ার জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ঘরেই কাল কাটাইতে লাগিলেন। হেনা গল্প বলে, বড় কুমার নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া যান; কখনও নিজে বলেন না। হঠাৎ কোন সময়ে ছাত্রী আসিয়া পড়িলে দু'জনেই তাহাকে বসাইয়া গল্প শুনিতে বাধ্য করেন।

বৌ-রাণীর দেবর শুনিয়া বলে – বিদেয় কর বৌ-রাণী।

বৌ-রাণী দুঃখিত হইয়া বলেন—আমি কেমন করে' বিদেয় করব? তুমি কর।

আমার সামনে যে পড়েই না!

যাতে পড়ে তার ব্যবস্থা করছি।

বৌ-রাণী মনে মনে মতলব ঠাওরাইতে ঠাওরাইতে চলিয়া গেলেন।

(ঞ)

বৌ-রাণী ঠিক ৪টার সময় দেবরের কক্ষে ঢুকিয়া বলিলেন, হেনাকে এইখেনে ডেকে এসেছি; সে আসছে, যা বলতে হয়—বলো।

তুমি থাকবে না?

না। পরে সব শুনব'খন। আমি থাকলে দোষ হবে, বুঝছ না?

দেবর ঘাড় নাড়িল। বৌ-রাণী চলিয়া গেলেন।

কিছু পরেই হেনা ঘরে ঢুকিল; দেবর তাহাকে বসিতে বলিলেন।

হেনা একখানা চিঠি বাহির করিয়া বলিল—বৌ-রাণী আমাকে লিখেছেন, একটা বিশেষ কথা আছে…

দেখি—

ঠিক যেমন ছোট কুমার হাত বাড়াইয়া চিঠিখানা লইবে, বড় কুমার দুপ দাপ করিয়া পা ফেলিয়া ছাদ হইতে সরিয়া গেলেন। ছোট কুমার দেখিলেন, হেনা অন্যদিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিল, দেখিল না।

হেনার হাত হইতে পত্র লইয়া ছোট কুমার পড়িলেন—

"মিস্ সেন, আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকারী একটি কথা আছে; আপনি এখনি ছোট কুমারের পড়িবার ঘরে একবার আসিবেন; আমি থাকিব।

বৌ-রাণী।"

হেনা পত্রখানি ফিরাইয়া লইয়া বলিল—বৌ রাণী এখানে নাই, দেখি কোথা গেলেন। নমস্কার।

ছোট কুমারের মুখ হইতে শব্দ নির্গত হইবার পূর্বেই হেনা নিক্রান্ত হইল।

(ট)

বড় কুমার শয়ন-কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, বৌ-রাণী খাটে শুইয়া। জিজ্ঞাসিলেন—হেনা নির্মলের ঘরে কি করছে, বলতে পার?

বৌ-রাণী হাসিলেন মাত্র।

হাস কেন? ব্যাপার কি?

সমাজ-সংস্কার।

কি-রকম?

অসবর্ণ বিবাহ—বোধ হয়।

বড় কুমার সাশ্চর্য্যে কহিলেন—বিবাহ কার?

যাদের এখনো আইবুড় নাম ঘোচে নি!

নির্মলের?

বৌ-রাণী নীরব।

হেনার সঙ্গে?

বৌ-রাণী বলিলেন—বল্লুম ত—সমাজ সংস্কার।

বড় কুমারের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। খানিক পরে বলিলেন ছোঁড়াটা গোল্লায় গেছে দেখছি।

বৌ-রাণী তাহাও স্বীকার করিয়া লইলেন।

বড় কুমার বলিলেন—বিদেয় করে দাও, বিদেয় করে দাও, শেষ কি ছোঁড়াটার মাথা খাবে!

বৌ-রাণী বলিলেন—আমি পারব না, ছোট ঠাকুরপো রাগ করবে।

বড় কুমার রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—ইস্—রাগ করবে! করলে ত বড় বয়েই গেল। জানে—আমি ওর গার্জেন!

বৌ-রাণী হাসিয়া বলিলেন—তুমি গার্জেন হতে পার, আমি নই।

আচ্ছা, আমিই বিদেয় করছি।

(ঠ)

চিঠি লিখিয়া ডাকিয়া পাঠান, তারপর অনুপস্থিত থাকা, হেনার মনে একটা খটকা লাগিয়াছিল। সে বৌ-রাণীর শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া দরবার করিবে, বড় কুমার পর্দা ঠেলিয়া ঘরে আসিয়া বলিলেন—দেখুন, বৌ-রাণী আর পড়বেন না।

খট্‌কাটা পরিষ্কার হইয়া গেল; তবে দুঃখ একটু হইল, তাহা এই, এ কথা বৌ-রাণী নিজে বলিলেই ত পারিতেন। আরও একটা দুঃখ হইল—যাক্ সে কথা।

বড় কুমার তিনমাসের পুরা মাহিনা, পাথেয় ইত্যাদি হিসাব করিয়া চিট্ লিখিয়া দিলেন, খাজনাখানার দেওয়ান চিট পাইবামাত্র টাকাকড়ি গণিয়া দিল।

হেনার ভাই কয় মাস স্বচ্ছন্দে ছিল, বোনকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বলিল—আ-তোর ভালো হোক্! এই তুমি বিদ্বান হয়েছ, তিন মাসের বেশী কাজ করতে পারলে না!

হেনার দর্প ছিল না, বলিল—কি বল্লে দাদা, আমি বিদ্বান? তোমার বোন্—বিদ্বান হয় কখনও, যে মূর্খ—সেই মূর্খ!
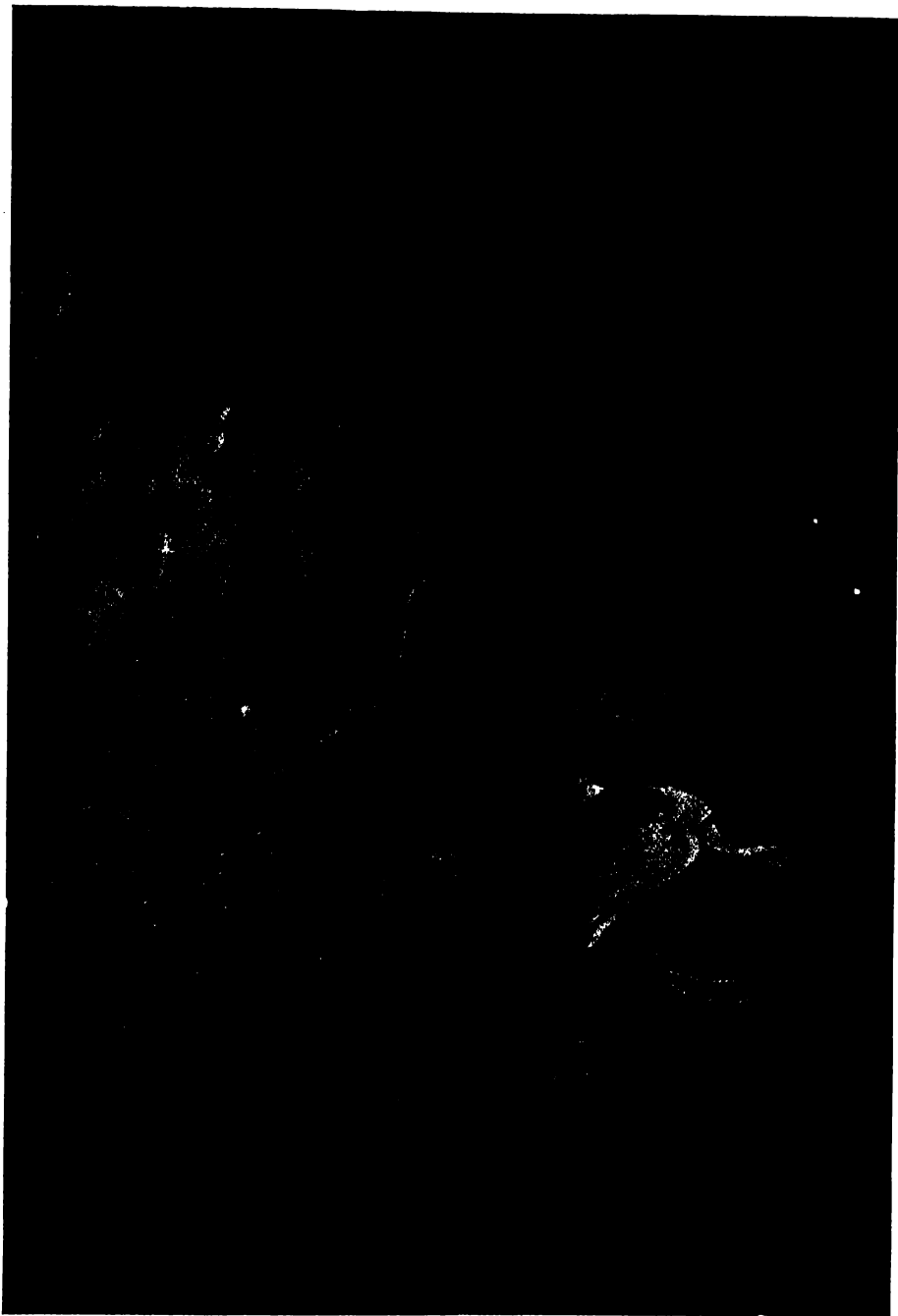
বুদ্ধদেব—কৈশোর

"লও তুমি শাক্য-রাজা,
আমি নাহি চাহি তাহা,
এ হংস আমার, আমি দিব

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১৭ই শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [অষ্টত্রিংশ সপ্তাহ

আধুনিক মোক্ষ (২)

তারপর :—

বুড়ীর মেয়ে যদিও, সে ত আর বুড়ী নয়,—খুব কার্য্যক্ষমা। তখনই কাজে লাগিয়া গেল। ঝাঁটা হাতে সে কাজে ত লাগিল বটে কিন্তু অন্তের যে——

"বাঁধিল পরাণ তটে।"

তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
পাইনু কপাল বলে।

"চম্পক বরণী বয়সে তরুণী
হাসিতে অমিয়া ধারা।
সুচিত্র বেণী দুলিছে জনি
কপিলা চামর পারা॥"

* * *

দেখিয়া—

"হিয়া জর জর খসিল পাঁজর
এমতি করিল বটে।
ছলল কামিনী বঙ্কিম চাহনি
বিঁধিল পরাণ তটে॥"
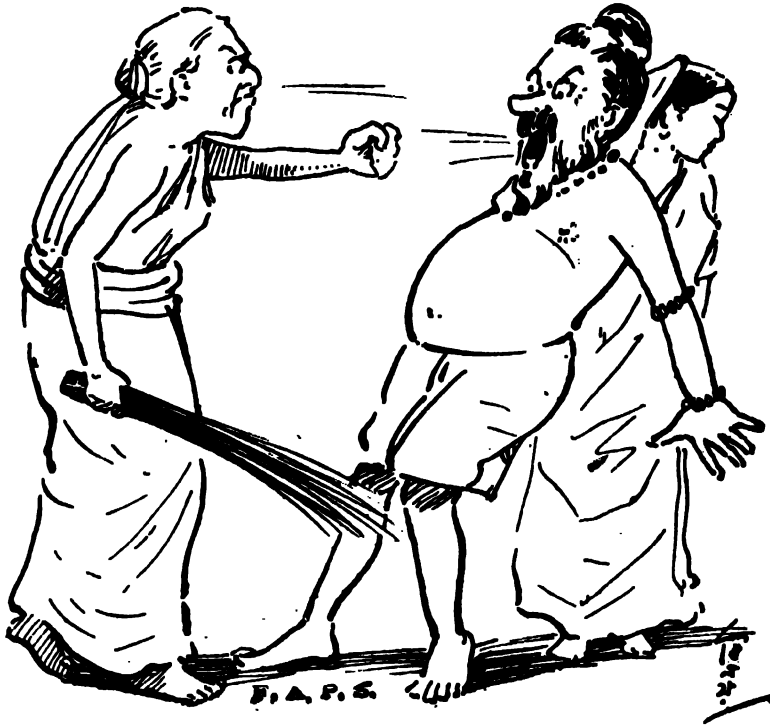
বাঁ হাতে তুলিল ঘুসি, ডান হাতে ধরিল
ডাবের কাঠির গুছি।

স্বামিজীর দয়ার শরীর, দয়া উপজিল। দয়া প্রকাশ করিতেও বাধিল না!

"তুমি সে আঁখির তারা।
আঁখির নিমিখে　　কত শতবার
নিমিখে হইয়ে হারা।"...

সোমত্ত মেয়ে, সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়াছে, ভয় এমন কিছু না থাকিলেও, বুড়ী পাছু-পাছু আসিয়াছিল। আসিয়া দেখিল কতক, শুনিল অনেক ; কল্পনা করিল, আরও অনেক।

নাপিত ডাকাইলেন এবং···

যথা,—"তোমা হেন ধন অমূল্য রতন, পাইনু কপাল বলে।" বুড়ী বাল্যকালে কুস্তি করিত, বাঁ হাতে তুলিল, ঘুঁসি; ডান হাতে ধরিল, ডাবের কাঠির পরিষ্কার গুছি! "সোমত্ত মেয়ের হাত ধরা! ঝেঁটিয়ে ঝাড়ব বিষের গোড়া!"

"হয় মেয়ের জাত-কুল-মান রাখ, নয় এই ঝাঁটা! এই ঝাঁটা! এই ঝাঁটা!" বুড়ি তিন সত্যি করিয়া ডাবের কাঠির গোছা মাটীতে ঠুকিল।

অতঃপর সন্ন্যাসী ঠাকুর গ্রামে গেলেন, নাপিত ডাকাইলেন এবং ..

মোক্ষ তখন জবাকুসুম তৈলে!

সন্ন্যাসী তখন চিমটা ফেলিয়া ধুতি ধরিলেন; কোটা ছাড়িয়া, জটা কাটিয়া, সভ্য হইলেন; আগেকার সঞ্চিত পুণ্য-অর্থ-ব্যয় করিয়া বাজার হইতে প্রেয়সীর জন্য আসল একশিশি জবাকুসুম তৈল কিনিয়া মন্ত্র পাঠ করিলেন,—জবাকুসুম-সংকাশং—তাঁহার বিশ্বাস মোক্ষ তখন জবাকুসুম তৈলে! (তিনি বিজ্ঞাপন পড়িয়াছিলেন, প্রিয়ার মুখ-ভার হইলে মাথা ধরিলে একমাত্র ঔষধ—জবাকুসুম।)

——আসে যেন প্রবল বন্যা।

তারপরই—

পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত!

"কেরাণীর স্বর্গে——"

তখন—

চাকরী-বাকরী না করিলে ত আর চলে না। হায় মোক্ষ, হায় স্বর্গ, আর হায় স্বর্গের হেনরী ফোর্ড—মিঃ বিশ্বকর্ম্মা, আরও হায়, বিশ্বকর্ম্মা-রচিত রথ—সব রহিল পড়িয়া—আপাততঃ সিগারেট, গৃহিণীর দন্ত-নাড়া ও ট্রাম!—কেরাণীর স্বর্গধাম আফিস! কৃপানন্দ স্বামী সেই স্বর্গ, সেই মোক্ষ—সেই মোক্ষেই চলিলেন।

এখনও যান, আমরা স্বচক্ষে দেখি।

স্বস্তি! স্বস্তি!! স্বস্তি!!!

অধ্যাপকের অভিনব অভিজ্ঞতা

[শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, ভাগবতরত্ন]

আজকাল আলাদীনের প্রদীপ বা হারুণ-অল্-রসিদের খেয়াল জিনিষটার বড়ই অভাব হয়ে পড়েছে। তাই কেউ আর এখন রাতারাতি রাজা উজীর হয়ে উঠতে পারেন না! কিন্তু এক রাত্রির মধ্যে নিজের যে কত বড় পরিবর্ত্তন এ যুগেও হতে পারে, তা আমি এই কয়েকদিন পূর্ব্বেই উপলব্ধি করেছি।

৫ই জুলাই রাত্রি পর্য্যন্ত ছিলাম কলিকাতার সাহিত্যসেবীদের নগণ্য সেবক! সাহিত্যের নানা আসরে যাতায়াত করিতাম—কাব্য ইতিহাসের অম্লমধুর নানারস পান করিতাম। আবার অবসর মত সাহিত্যিক মহলে প্রজাপতি ঠাকুরের specia' ambassadorএর কাজও করিতাম। সুখে দুঃখে দিনগুলি বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। সহসা কোন সাহিত্যিক বন্ধুর মনে হইল যে আমার দ্বারা বোধ হয় রাঢ়ের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের কিছু কাজ হ'তে পারে। তিনি আমার শুভাকাঙ্খীদের সহিত কথাবার্ত্তা একেবারে ঠিক্ করে আমাকে নির্ব্বাসনের আদেশ দিলেন—"যাও রাঢ়ে—তোমাকে সেখানে আপাততঃ ডেরাডেণ্ডা ফেল্‌তে হবে, হেতমপুরে—সেখানকার কলেজের ছেলেদের পড়াবে আর ইতিহাস লিখ্‌বে।" যিনি একথা বললেন, তাঁহার কথা বাল্যকাল হইতে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতে অভ্যস্ত—তাই প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলাম না। কিন্তু মনের মধ্যে এক প্রকার অজানিত আশঙ্কার সঞ্চার

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার

হইল—রাঢ়ের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে বলিয়া নহে—কেননা সে তো আমার জীবনের সাধনা—

ভয় ঐ কলেজের সম্পর্কে। শোনা ছিল কলেজটীতে বি, এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। রাঢ়ের ছেলেরা সাধারণতঃ একটু বেশী বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করে—সুতরাং বি-এ, ক্লাসের ছেলেরা নিশ্চয়ই জোয়ান মর্দ্দ বড় বড় ছেলে হবে। তাদের সঙ্গে কেমন করে ব্যবহার করবো—কেমন করে সহসা গুরু-মশায় সাজিয়া বসিব তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ৫ই জুলাই রাত্রিকালে ট্রেণে চাপিলাম।

একখানি রাত্রির মাত্র ব্যবধান। কিন্তু তার মধ্যেই একেবারে মাষ্টার বণিয়া গেলাম! সকাল বেলা যখন গাড়িতে চড়িয়া হষ্টেলে আসিয়া নামিলাম, তখন গাড়োয়ান ছেলেদের চীৎকার করিয়া বলিল "মাষ্টার মশায় এসেছেন! নিজের নূতন নামকরণে নিজেই চমকিয়া উঠিলাম। এই গাড়োয়ানটী প্রথমে ঠাওরাইয়াছিল যে আমি হেতমপুর স্কুলে পড়িতে যাইতেছি! তাই গাড়ীতে উঠিলেই সে বলিয়াছিল "বাবু ইস্কুল বোর্ডিংএ নিয়ে যাব কি ?" আমি তাহাকে কলেজ বোর্ডিংয়ে যাইতে বলিলাম। সে খানিকক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু বুঝি কলেজে পড়েন?" আমি বলিলাম "না, আমি সেখানে পড়াতে যাচ্চি।" গাড়োয়ান সহসা তাহার শ্রবণশক্তির উপর বিশ্বাস হারাইল—কেবল বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি তাহাকে যথাসাধ্য অল্প কথায় বুঝাইয়া দিলাম যে সত্যই আমি কলেজের মাষ্টার।

আমার যাবার খবর ছেলেরা পূর্ব্বেই পাইয়াছিল। তাই—তাহাদের মধ্যে কয়েকজন গাড়ীর শব্দ পাইয়াই ছুটিয়া আসিল। নিজেরাই আমার জিনিষপত্রগুলি ধরিয়া নামাইল। আমি প্রথম পরিচয়েই বুঝিতে পারিলাম এখানে এখনও সেই তপোবনের গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের কিছু বজায় আছে। এ জায়গাটা একেবারে কলিকাতা হইয়া উঠে নাই। আর সত্যই যে এ হষ্টেলটী দেখিয়া তপোবনের কথাই মনে জাগিয়া উঠে। গ্রামের সমস্ত স্বার্থ-কোলাহলের বাহিরে নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে বোর্ডিংটী স্থাপিত। ইহার চারিদিকে বিশাল মাঠ—কোথাও নূতন ধরণের সবুজ রঙ্গের ঢেউ বহিয়া গিয়াছে, কোথাও বা তৃণাচ্ছাদিত কোমল ভূমি মায়ের মতন আঁচল বিছাইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় মাথা তুলিয়াছে—বাঙ্গালীর পক্ষে এই পাহাড়শিশুগুলির রূপ বড়ই মনোরম। হষ্টেলের অনতিদূরেই একটী ঝরণা—পাষাণের বক্ষ ভেদ করিয়া যেন করুণারাশি উছলিয়া উঠিতেছে। কৃষক বালিকারা সেখান হইতে কলসী ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে। সে দৃশ্যও নয়ন জুড়ান—প্রাণ মাতান। হষ্টেলের সম্মুখে একটী স্বচ্ছতোয়া পুষ্করিণী। হষ্টেলের সম্মুখ দিয়া একটী সুন্দর রাজপথ চলিয়া গিয়াছে—তাহার লালকাঁকর ও দুইধারের গাছ দেখিয়া আমার সহসাই মণীন্দ্রবাবুর "রমলার" হাজারিবাগের বর্ণনার কথা মনে পড়িয়া গেল। বিস্তৃত একটী কম্পাউণ্ডের মধ্যে এই হষ্টেল। গৃহগুলি সুধা-ধবলিত।

ছেলেদের মধ্যে দুই চারিটী করিয়া আসিয়া তাহাদের নূতন মাষ্টার মশায়কে দেখিতে লাগিল। এতগুলি কৌতূহলী চক্ষুর সম্মুখে নিজে যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। তবে তাহাদের সহিত নানারূপ সদালাপ করিতে বিরত হইলাম না। এখানে আসিবার পূর্ব্বে একজন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলিয়া-ছিলেন যে ছেলেদের সহিত খবরদার মিশিও না—তাহাদিগকে যত তফাৎ রাখিতে পার ততই ভাল। তাঁহার এ উপদেশ আমার ভাল লাগে নাই। ছেলেদের সহিত যদি না-ই মিশিব, তবে অধ্যাপকতা করিতে আসিলাম কেন? ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ হইবার চেষ্টা করিলেই তো হইত! তাহা হইলে যথেষ্ট লোকের উপর চোখ রাঙ্গানীর সুযোগ পাওয়া যাইত। ছেলেদের সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিব, তাহাদের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করিব—দেশের যাহাতে প্রকৃত সুসন্তান তৈরী হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব এই সকল আদর্শ লইয়াই আমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে যাইতেছি।

যে ছেলেটী আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিল, সে খানিকক্ষণ বাদে অতি ধীরে ও নম্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল "Sir, আপনার বয়স কত?" আমি বলিলাম "এই বছর চব্বিশ হবে।" সে বলিল "Sir, তা'হলে আপনি আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট।" আমি তখনই মনুসংহিতার একটী শ্লোক আওড়াইয়া বলিলাম যে সে কথা আজ নূতন নহে—ঋষিদের আমলেও এরূপ ব্যাপার

ঘটিত। আবার ইউনিভার্সিটির ছেলেরা কোন কোন নবীন অধ্যাপকের অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট পর্য্যন্ত হয়।

তাহার পর আহারাদি করিয়া কলেজে যাইলাম। দ্বিতল লাল কলেজটী দেখিয়া বেশ মন লাগিল। কলেজে প্রিন্সিপাল ও অধ্যাপকগণের সহিত পরিচয় হইল। সংস্কৃতের অধ্যাপক মহাশয় অত্যন্ত ভক্ত লোক—আমার বাড়ী নবদ্বীপে শুনিয়াই তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আমি একটু ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনাও তাঁহার সহিত করিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে বেশ একটু প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পরে তিনি জানিয়াছেন যে আমার আচার ব্যবহার অনেকটা অবৈষ্ণবোচিত। আমি নিজেও যে একটু পাষণ্ড ধরণের তাহাও বোধহয় তাঁহার জানিতে বাকী নাই। তবে ইহার পরের দিন বৈকালে তিনি যখন ছেলেদের লইয়া সুমধুর কীর্ত্তন করিতেছিলেন তখন সত্যহ আমার মতন পাষাণের চোখেও জল আনিয়াছিল। কলেজে হরি সংকীর্ত্তন দেখিয়া অবশ্যই প্রীত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও সন্তুষ্ট হইলাম ছাত্র ও অধ্যাপকদের এইরূপ প্রীতিপূর্ণ মিলন দেখিয়া।

অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপক মহাশয় সকল বিষয়েই দেখিলাম খবর রাখেন, এমন কি আমার সহিত আচার্য্য শঙ্করের তারিখ সম্বন্ধে রীতিমত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে রাজী আছেন এমন কথাও ঘোষণা করিলেন। প্রিন্সিপাল মহাশয় মাঝে মাঝে আমাদের আলোচনায় যোগ দিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মোটের উপর সহকর্ম্মীদের সহিত মিশিয়া বেশ আনন্দ পাইলাম।

পরদিন রবিবার। হষ্টেলের ছেলেরা সব একে একে আমার কাছে আসিয়া বসিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা তাহাদের সহিত দেশ ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানারূপ আলাপ করিতে লাগিলাম। কথায় কথায় বলিলাম, এখানে এতটা জায়গা বৃথা পড়িয়া আছে—আর তরকারীও এখানে সবরকম সব সময় পাওয়া যায় না—আমরা এ জায়গাটা আবাদ করিলে কেমন হয়? একটী ছেলে বলিল "Sir, আমরা খেটে খুটে চাষ আবাদ করবো, আর নূতন ছেলেরা এসে তার ফল ভোগ করবে! এতে আমাদের লাভ কি?" আমি বলিলাম "লাভ ক্ষতির অঙ্কটা অত সূক্ষ্মভাবে করিবার সময় আমাদের মধ্যে কাহারই জীবনে এখনও আসে নাই—এখন কাজের আনন্দেই কাজ করিবার সময় আমাদের। আমরা ফল আওরাইলাম—আর পরবর্ত্তী ছাত্রের দল তাহা ভোগ করিল—তাহাতে আসে যায় কি? তাহারা আসিয়া আমাদের কত আশীর্ব্বাদ করিবে। আর আমরাই যে ফল ভোগ করিতে পারিব না কে বলিল? শাকের ডাঁটা বোন,—একমাসের মধ্যে খাওয়া চলিবে। তাহার পর লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা প্রভৃতি বুনিয়া দিলে তাহার ফলও পূজার ছুটীর পরে আসিয়া খাওয়া চলিবে। আর নিজের হাতের তৈয়ারী জিনিষ খাইতে যে কি মধুর—তাহা খাওয়ার সময়ই টের পাওয়া যাইবে।"

ছেলেরা এ কথায় মহা উৎসাহিত হইয়া উঠিল। তাহারা পরের দিনই দেখি অনেকটা জমী কোপাইয়া ঠিক্ করিয়া ফেলিয়াছে। আমি লাউ, কুমড়া, পুঁইয়ের জন্য মাচা পাতিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। পাশের গ্রাম ছিলপাইয়ে আমার এক বন্ধু জমীদার বাড়ীর ছেলে—তাহাদের ওখান হইতে শাক সব্জীর ভাল বীজ লইয়া আসিলাম। দুই চারিটী গাছ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। অনেক জমি আবাদ হইয়া গিয়াছে। ছেলেরা নিজে রোজ সে সবে জল দেয় ও পর্য্যবেক্ষণ করে। এই খবর পাইয়া অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজন ইহা দেখিতে আসিলেন। আমি ছেলেদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিলাম—এই গাছে ফল ধরিলে তাঁহারা যেন আসিয়া হষ্টেলে খাইয়া যান।

একদিন ছেলেরা আমার জীবনের বড় একটা রোমান্স মাটি করিয়া দিয়াছে। মাঠ ভাঙ্গিয়া স্কুল বোর্ডিংএ গিয়াছিলাম। সেখানে গল্প করিতে করিতে রাত্রি হইল, প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাত্রি দশটার সময় বৃষ্টি ছাড়িল। বোর্ডিংএর মাষ্টাররা সকলেই রাত্রির মত সেখানেই থাকিয়া যাইতে বলিলেন। আমি ভাবিলাম—নূতন লোক আসিয়াছি—আমাদের বোর্ডিংএর ছেলেরা হয়তো আমার জন্য ভাবিবে। তাই তাঁহাদের প্রস্তাবে রাজী হইতে পারিলাম না। একটী আলো হাতে করিয়া বাহির হইলাম। প্রায় দেড়মাইল পথ নির্জ্জন মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আমাদের বোর্ডিংএর কাছাকাছি যাইয়া সহসা পথটী মাঠের

মধ্যে মিলাইয়া গেল। ওদিকে আবার বৃষ্টি নামিল। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। ঝিল্লীর রব ছাড়া সেখানে আর কোনও শব্দ নাই। যে দিকে যাই সেই দিকেই জলের ডোবায় পড়ি! মনে করিলাম আবার স্কুল বোর্ডিংএ ফিরি। রাজবাড়ীর টাওয়ারের বৈদ্যুতিক আলো লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে আবার পথ হারাইলাম। তখন আলেয়ার কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম রাত্রিকালে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা চুপ করিয়া একটী বাবলা গাছের তলায় বসিয়া রাত্রি কাটান ভাল। অমনি কল্পনার চোখে রবীন্দ্রনাথের "বর্ষা অভিসারের" নানা কবিতা ভাসিয়া উঠিল কিন্তু হায়, পরাণ সখা কই? তাঁহার বাঁশী কি গাছ তলায় বসিয়া সারারাত্রি ভিজিলেই শোনা যাইবে? এইরূপ বিক্ষিপ্ত চিন্তায় নিমগ্ন আছি, এমন সময় দেখি পূর্ব্বদিকে তিনটী লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরা হইল। আমি জানিতাম কলেজ হষ্টেল পূর্ব্ব দিকে। বুঝিলাম ছেলেরাই তাহাদের মাষ্টারের বিপন্ন অবস্থা বুঝিয়া উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। আলো লক্ষ্য করিয়া ছুটিলাম। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই হষ্টেলে পৌছিলাম। ছেলেরা বলিল "একটী আলো মাঠের মধ্যে ঘুরিতেছে দেখিয়াই আমরা বুঝিলাম আপনি পথ হারাইয়াছেন। তাই আমরা আলো ধরিয়া থাকিলাম।" পরে শুনিলাম দর্শনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক সুকবি শ্রীযুক্ত কিরণধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদিন এইরূপ পথ হারাইয়া রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত মাঠে মাঠে কবিত্ব করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন!

কলেজের ক্লাসের কথা আর কি বলিব। সেই মামুলী বক্তৃতা করা আর নোট্ দেওয়া তো আছেই। প্রথম যেদিন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে বক্তৃতা করিতে যাই—সেদিন কলেজে উপস্থিত সকল ছেলেই নূতন মাষ্টারের বক্তৃতা শুনিতে ভিড়িয়াছিল।

এইবার একটা সভা উপলক্ষে ঈদের ছুটীতে কলিকাতায় আসিয়াছি। ফিরিয়া যাইয়া আর বোর্ডিংএ উঠিব না—একটী মনোরম বাসা রাজারা দিয়াছেন। সেইখানেই থাকিব।

হেতমপুরে দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। তাহার মধ্যে প্রাচীন রাসমঞ্চের বাড়ীতে দেওয়ালের উপর যে অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শন আছে, তাহার তুলনা বাঙ্গলা-দেশে আর নাই। ভাস্কর্য্য গুলির মধ্যে কয়েকখানি অত্যন্ত অশ্লীল। রাসমঞ্চের একটী বিবরণ পাঠকগণের গোচরে শীঘ্রই আনিবার ইচ্ছা থাকিল। ইতিমধ্যে যদি কোন সাহিত্যিক অনুগ্রহ করিয়া সেগুলি স্বয়ং দেখিতে যান, তবে বড়ই আনন্দিত হইব। আমার ক্ষুদ্র কুটীরে তাঁহারা পদার্পণ করিলে, আমি বাংলার ভাস্কর্য্য নিদর্শনগুলি দেখাইয়া কৃতার্থ হইব।

মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় হেতমপুরে "রাঢ় অনুসন্ধান সমিতিতে" কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক শীঘ্রই লইয়া যাইবেন শুনিতেছি। আজ এই পর্য্যন্তই থাক্।

চয়নিকা

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

পকেট বস্ত্র-ঝাড়ন—

খুব দামী পোষাক পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইলে পথে যদি হঠাৎ কোন রকমে ধূলা লাগিয়া উহা ময়লা হইয়া যায় তাহা হইলে সৌখীন বাবুদের আর দুশ্চিন্তা করিয়া মন খারাপ করিতে হইবে না। তাঁহাদের জন্য এক নূতন ধরণের বুরুস্ তৈরী হইয়াছে—তাহা পকেটে করিয়া সিগারেট কেস্‌এর

মতন অনায়াসে যেখানে সেখানে লইয়া যাওয়া যায় বুরুস্‌টী এমনিভাবে তৈরী যে বাক্সের একধারে একটা চাবী টিপিলেই বুরুষের লোমগুলি এক-সঙ্গে সব আড়ভাবে শুইয়া পড়ে এবং তাহার পর একটা ঢাক্‌না দিয়া পকেটে ফেলিয়া দিলেই হইল। বুরুসের বাক্সটী আধইঞ্চি মাত্র পুরু—ছবিটী দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

আংটীর ভিতর পেন্‌সিল—

মেয়েরা যে-সকল জামা পরে তাহাতে কোন পকেট থাকে না বলিয়া পেন্‌সিল কলম বহন করা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই অসুবিধা জনক। ফাউন্‌টেন পেনে ক্লীপ্ লাগান থাকে বলিয়া ব্লাউসের বুকে ঝুলাইয়া কেহ কেহ উহা ঐ ভাবেই বহন করিয়া থাকেন। ফাউন্‌টেন পেনের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম —কিন্তু পেন্‌সিল একটা সঙ্গে রাখা অনেকের পক্ষেই নিতান্ত দরকার অথচ এমন অনেক পুরুষ-পুঙ্গবও আছেন যাঁহাদের বিস্তর পকেট থাকা সত্বেও কাজের সময় একটা পেন্‌সিলও কোন পকেট হইতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই জাতীয় পুরুষদের জন্য এবং মহিলাদের জন্য এক-রকম আংটী তৈরী হইয়াছে—উহার ভিতর ছোট একটা পেন্‌সিল অনয়াসে লুকাইয়া রাখা যাইতে পারে। লেখা হইয়া গেলে পেন্‌সিল্‌টীকে ভাঁজ
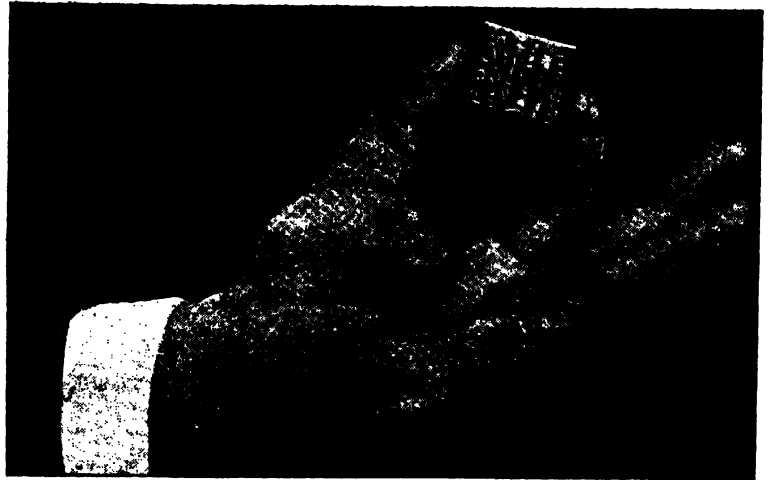
করিয়া ভিতরে ভরিয়া রাখা যায়। একটা স্ক্রু ঘুরাইয়া দিলেই পেন্‌সিলটী ভিতরে চলিয়া যায় এবং একটা পাথর আংটীর মাথায় উঠিয়া আসে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ও ক্ষুদ্রতম পুস্তক—

ফিলাডেল্‌ফিয়া ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীতে দুইটী পুস্তক দৃষ্টার্থে রাখা হইয়াছে—তাহার একটীর বয়স ৫০০০হাজার বৎসরেরও অধিক এবং তাহাতে বেবীলনীয় রাজার আমলের ব্যবসা বাণিজ্যের কথা পাথরের উপর খোদাই করা আছে। এই পুস্তকটী আকারে মাত্র দেড়ইঞ্চি।

উপরে দুই আঙুলের ভিতর এই পুস্তকটী রহিয়াছে। অপর পুস্তকটী কয়েক বছর আগে মাত্র তৈরী হইয়াছে—এবং উহাতে কয়েক শত পৃষ্ঠা আছে। এই পুস্তকটাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট। উপরের ছবিতে দেখুন—হাতের মাঝখানে পেট-মোটা ক্ষুদ্রতম গ্রন্থটী দিব্যি দাঁড়াইয়া আছে।

সবচেয়ে বড় গীর্জ্জার ঘণ্টা—

জার্ম্মাণীর কলোন সহরের গীর্জ্জার ঘণ্টাটী হইতেছে পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় ঘণ্টা। বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় এই ঘণ্টাটী গলাইয়া সেই গলান ধাতু যুদ্ধের যন্ত্রপাতির নিমিত্ত ব্যবহার করা হইয়াছিল। সম্প্রতি আবার একটী নূতন ঘণ্টা প্রস্তুত হইয়াছে।
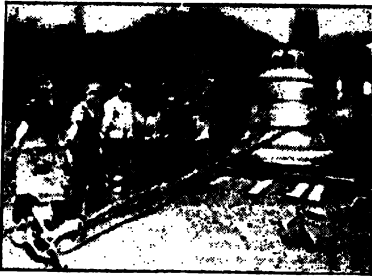
ঘণ্টাটী যে কত বড় এবং কি পরিমাণ ভারি তাহা উপরের ছবিতে কতজন লোক দড়ি ধরিয়া টানিতেছে তাহা দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

বন্দুকের মাথায় ক্যামেরা—

বন্দুক দিয়া এতদিন শুধু শিকার করাই চলিত কিন্তু এখন দেখিতেছি সেই শিকার প্রাণবধ না করিয়াও করা যাইবে। দূরের জিনিষ চট্ করিয়া নিজের করায়ত্ত করিয়া ফেলাই হইতেছে এই বন্দুক-ক্যামেরার কাজ। তবে এই যন্ত্রটী দিয়া ফটো তুলিতে হইলে খুব ওস্তাদ শিকারী হওয়া চাই—লক্ষ্যভেদ করিতে যে খুব পাকা ওস্তাদ তাহার পক্ষে এই ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলা খুবই সহজ। ক্যামেরার একপাশে একটা কল টিপিলেই ফিল্ম্ ঘুরিয়া, সাটার খুলিয়া সব ঠিক হইয়া থাকে এবং বন্দুকের ঘোড়া টিপিবামাত্র এক্সপোজার দেওয়া হইয়া যায়।

উপরের ছবিটী দেখুন, কেমন একটী রমণী বন্দুকের নিশানা ঠিক করিতেছেন—এই বুঝি ঘোড়া টিপিলেন!

এক প্লেটে চৌদ্দবার এক্স্পোজার—

সূর্য্যগ্রহণের সময় কোন এক ফটোগ্রাফার একই প্লেটে পাঁচ মিনিট অন্তর চৌদ্দবার এক্স্পোজার দিয়াছিলেন। প্রত্যেক পাঁচ মিনিটে দুরন্ত

রাহু সূর্য্যকে যে কতটুকু গ্রাস করিতেছিল তাহারই ফটো এখানে দেওয়া হইল।

আমার বৈধব্য

(গল্প)

[শ্রীমায়া দেবী (বসু)]

(১)

সামনে ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলাম,—এমন সময় বড়দার মোটরের শব্দ পেয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখি বড়দার সঙ্গে ন'দাও নামলেন এবং তখনই চাকর-বাকরকে ডাকাডাকি আরম্ভ হল। ব্যাপারখানা কি, না বুঝতে পেরে হেঁট হয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দেখতে লাগলাম। একটু পরেই চাকর-বাকরে ধরাধরি করে একটী তেইশ চ'ব্বিশ বৎসরের যুবককে নামালে। আমি ত দেখেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেম; সংশয় কাটাবার জন্যে এক-ছুটে নীচে হাজির হতেই বড়দা আমার কৌতূহল মিটিয়ে দিলেন। উক্ত যুবকটী ফুটবল খেলতে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছেন, তাই ন'দা বড়দাকে নিয়ে গিছলেন। সবদিকে সুবিধে হবে ভেবে বড়দা তাঁকে বাড়ীতে এনেছেন।

বড়দা একজন নামজাদা ডাক্তার, ন'দা কিছুদিন হল প্রোফেসারী করছিলেন, খেলায় তাঁর বড় অনুরাগ,—ফুটবল ম্যাচের দিনে বজ্রাঘাত হলেও ন'দার যাওয়াই চাই!

এই ছেলেটী বিদেশী, এখানে হোষ্টেলে থাকেন, ন'দা অনেক বলা কওয়া করে, তাঁর কষ্ট হবে বলে এখানে এনেছেন।

এখন প্রথম প্রশ্ন হ'ল—রাখা হবে কোন ঘরে? উপরে মাত্র পাঁচখানি ঘর; বড়দা, মেজদা, সেজদা ও নদা চারখানি ঘর অধিকার করেছিলেন, ছোড়দা এখন বিলেতে, তাই তাঁর ঘরখানা আমার দখলেই ছিল এবং আমার ছোট্ট ঘরখানাতে ইদানীং জিনিসপত্রও রাখা হত। আমি মনে মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করে দীপ্ত স্বরে বল্‌লাম,—বড়দা, আমার ঘর আমি এই মুহূর্ত্তেই ছেড়ে দিচ্ছি।

বড়দা একটু ভেবে বল্লেন, কিন্তু তুই কোথায় থাকবি?

আমি হেসে বল্‌লাম, আমি নিজের ঘরে থাকব। এতো ছোড়দার ঘর, যেদিন তিনি ফিরে আসবেন সেই দিনই ত ছেড়ে দিতে হবে। তা ছাড়া আমার একলার ঘরে একলার ব্যবস্থা আছে, আপনারা যদি ওঁকে সেখানে রাখেন তাহলে ওঁর কিন্তু কোন কষ্ট হবে না।" বড়দা তবুও ভাবতে লাগলেন দেখে জোর দিয়ে বল্লেম, না বড়দা, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না আমি যা বল্‌ছি তাই করুন।

নদা বললেন, কোহিনুর ঠিকই বলেছে বড়দা তাই করো।

তখন আমার কথামত তাঁকে আমার ঘরে এবং আমার বিছানাতেই শোয়ান হ'ল।

বারান্দায় ডেকে বড়দা আমায় বললেন, খুকি, দেবেনের সেবার ভার তোকেই নিতে হবে।

দেবেন বাবু উত্থানশক্তি রহিত তাঁর সেবা—মানে সবই করতে হবে আমার সর্ব্বাঙ্গ বয়ে গোপনে যেন লজ্জার ঝড় বয়ে গেল, সহসা কোন উত্তর দিতে পারলেম না।

বড়দা বললেন, এখানে ওর কেউ নেই,—অবশ্য ওর মা বাপকে জানিয়েছি, তাঁরা হয়ত পরশু নাগাদ এসে পড়বেন, ততদিন ত কারুকে করতে হবে—তাই বলছি।

আমি ধীরে ধীরে বললাম, উনি ত বসতে পর্য্যন্ত পারেন না তাহ'লেত আমাকেই সব করতে হবে—সে আমি পারব না বড়দা।

বড়দা আমায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথার ওপর হাতটী রেখে স্নেহকোমল স্বরে বললেন, সেবায় কোন লজ্জা নেই খুকু! সেবার ভিতর দিয়েই মানুষ ঈশ্বরকে পায়। আতুর পীড়িতের সেবা করতে পাওয়া বড় সৌভাগ্য ভাই—এতে ত লজ্জার কিছু নেই—বরং আনন্দের আছে—গর্ব্বের আছে। তোর বড়বৌদিদি নইলে ত সংসার চলবে না, নইলে তাকেই

বলতাম। বউমাদের ত বলতে পারি না—কি জানি কালু, বিজু, শরৎ যদি বিরক্ত হয়—তাই তোকে বলছি—কারণ জানি তুই আমার নিজস্ব জিনিস—আর তুই আমার মুখের উপর 'না' বলতে পারবি না।

কিন্তু বড়দা—

এর মাঝে ত কিন্তু নেই দিদি! মনে কর যদি বিদেশে আমারই আজ—

তাঁর কথা সমাপ্ত হতে না দিয়ে বল্লাম, করব বড়দা, আর আপনাকে কিছুই বলতে হবে না।

বড়দা আর একবার তাঁর মঙ্গলবর্ষী হাতখানি আমার চুলের উপর রেখে বললেন, আশীর্ব্বাদ করি বোন, চিরদিন যেন এমনি করে পীড়িতের সেবার ভার নিজের উপর তুলে নিতে পার। যাও, দেবেনের কাছে বোস গিয়ে।

বারান্দা পার হয়ে ঘরে ঢুকলাম; বড়দা ডাক্তার মানুষ, তিনি হয় ত সেবার বাড়া কোন ধর্ম্মই বড় মনে করেন না—কিন্তু সেই সেবাটা যখন আমার মনে পড়ে গেল তখন নিজের মনেই নিজে যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম।

ন'দা তখনও কাপড় ছাড়েন নি, আমায় দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, বড়বৌদির কাছ থেকে দুধ নিয়ে আয় কোহিনুর!

বড়বৌদির কাছ থেকে দুধ নিয়ে 'ফিডিং কাপ' নিতে তিনি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বল্লেন, সেটা যে আমি ভেঙ্গে ফেলেছি খুকি, কি হবে?

রাগ করে বললাম,—কি আর হবে! দাও একটা বড় চামচ।

সেজবৌদি বল্লেন, কাল বট্‌ঠাকুরকে বলে দিলেই হবে।

চামচ নিয়ে উপরে এলাম, নদা একটু আগেই চলে গিছলেন. একলাটী প্রথমটা কেমন বাধবাধ ঠেকতে লাগল,—কিন্তু তখনি মন থেকে সে ভাবটা ঝেড়ে দিয়ে বড়দার কথাগুলি স্মরণ করতেই এক মুহূর্ত্তে মনের সব গ্লানি মুছে গেল।

আমি বেশ স্বচ্ছন্দভাবে দেবেন বাবুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে চামচে করে সব দুধটুকু তাঁকে খাইয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছিয়ে দিলাম। এই সময় কতকগুলো শিশি হাতে করে বড়দা আমার কাছে এসে বললেন, এগুলো রেখে দে,—এই ওষুধটা একটু পরে খাইয়ে দিস।" পড়ে দেখলাম সেটা ঘুমের ঔষধ।

(২)

দেবেন বাবুর বাপ শুনলাম দেরাদুনে কি একটা উঁচু কাজ করেন—তাঁকে খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যত শীঘ্র আমরা আশা করেছিলাম তত শীঘ্র তিনি আসতে পারলেন না।

বাড়ীর মধ্যে আমি আর বড়বৌদি ছাড়া দেবেন বাবুর সামনে কেউ বেরুত না, যদিও বড়বৌদির পরেই মেজ বৌদি এবং সে অনুপাতে তাঁর বড়বৌদির চেয়ে দু'চার বছরেরই ছোট হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রথমকার মেজবৌদি মারা যাওয়ায় সেখানে বারো বছরের ফাঁক পড়ে গিছল। এ মেজবৌদি ন'বৌদির সমবয়সী—ছেলে মানুষ বউ বলে তারা কেউই বেরুত না। বড় বৌদির সংসারের কাজ ছিল, তা ছাড়া দিবানিদ্রাটা তাঁর না হলেই চলত না—কাজেই সকাল সন্ধ্যে ছাড়া তিনি সময় করে আসতে পারতেন না। আমায় একলাই তাঁর কাছে থাকতে হত। সন্ধ্যার সময় দাদারা ছুটী দিতেন, আবার রাত্রে পালা করে জাগতে হত—তাঁর জ্বর হতে আরম্ভ হয়েছিল বলে রাত্রেও একজনকে জেগে থাকতে হত। একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি দেবেন বাবুকে ঔষধ খাওয়াতে গেলে তিনি একটু হেসে বল্লেন, আপনি যখন ওষুধ নিয়ে আসেন তখন আমার মনে হয় বুঝি স্বর্গ থেকে কোন্ দেবকন্যা আমায় নিরাময় করবার জন্যে সুধা নিয়ে এসেছেন!

গ্লাসটা মাটীতে উপুড় করে রেখে বল্লাম, তারপর ওষুধের আস্বাদটাও কি সুধার মতই মিষ্টি লাগে?

তিনি হেসে উত্তর দিলেন, আপনি বুঝি সুধাপান করেছেন?—জানেন?

বিস্মিত হয়ে বল্লাম, কেন?

তিনি মধুর হেসে বললেন, নইলে তার আস্বাদ জানলেন কি করে?

বল্লেম, বাঃ সকলেই ত বলে মিষ্টি!

তিনি বললেন, সকলেরই ত কল্পনা, কেউ ত খেয়ে দেখে নি।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, কিন্তু লোকের কথাতেই ত সব বিশ্বাস করা হয়। আচ্ছা, আপনি কি কবি?

তিনি উৎসুক চোখ দুটী আমার মুখের উপর রেখে বললেন, কেন বলুন ত? আমার মধ্যে কবির মত কি পেলেন?

বল্লাম, আপনার উপমাটাই যে কবিত্বপূর্ণ।

তিনি বললেন, কৈ, কোন কবিত্বপূর্ণ উপমা ত দিইনি; যেটা মনে আসে সেটাই বলেছি।

আমি হেসে বল্লাম, কিন্তু এমন উপমা আমাদের মত অকবির মনেও যে আসে না।

দেবেন বাবু বল্লেন, আমি দেখছি আপনি আমায় গাছে তুলছেন, কিন্তু শেষে মই কেড়ে নেবেন না যেন!

তার অর্থ?

শুনেছি এইই নাকি নারী প্রকৃতি;—বলে তিনি মুচকে হাসলেন। একটু ভেবে বললেন, বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছে?

হাঁ; সম্ভবতঃ তাঁরা আজকালের মধ্যেই এসে পড়বেন।

সম্ভবতঃ বাবা একলাই আসবেন—মা কি আর আসতে পারবেন?

কেন?

সেখানে ত বড় কেউ নেই; আমার পর দু'টী ভাই, একটী ষোল বছরের, একটী বার বছরের, তার কোলে একটী বোন, বছর দশেকের,—মা তাদের ছেড়ে কি করে আসবেন?

এই সময় বড়দা এলেন, আমি ছুটী পেয়ে পলায়ন করলাম। পরের দিন দেবেন বাবুর বাপ মা এলেন, বাড়ীশুদ্ধ লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

(৩)

দেবেন বাবুর বাপ-মা কয়েকদিন রইলেন। জীবনের কোন আশঙ্কা নেই জেনে সকলেরই মনের মেঘ কেটে গেল। সেদিন দেবেন বাবুর স্নানের জল আনতে যাচ্ছি—শুনতে পেলাম তাঁর মা বড় বৌদিকে বললেন, বউমা, তোমাদের যদি অমত না হয় তা'হলে কোহিনুরকে আমার ঘরের লক্ষ্মী করে নিয়ে যাই। দেবুও ত আমার এম-এ পড়ছে,—অবশ্য যদি তোমাদের মত হয়।

বড় বৌদি বেশ আনন্দিত হয়ে বললেন, বেশ ত মা, দেবেন বাবুকে নন্দাই করতে আমার কোন আপত্তি নেই,—আপনি আপনার ছেলেদের কাছে কথা ফেলবেন।

তিনি বললেন, একে ত অমন লক্ষ্মী মেয়ে আজকালকার বাজারে মেলাই শক্ত,—তা ছাড়াও কি জান মা দেবুরও বড় পছন্দ হয়েছে,—তা হবেই ত, মা যে রূপেগুণে লক্ষ্মী স্বরস্বতী।

বড় বৌদি আর একদফা দাদাদের মত নিতে বলে বললেন, "দেবেন বাবু চমৎকার ছেলে। রূপে-গুণে খুকির যোগ্যপাত্র—তা দেখুন এঁরা কি বলেন।" আর ত দাঁড়িয়ে শুনলে চলে না—চটির চটাপট শব্দ করে মহারাজের কাছে গেলাম। বৌদি বোধ হয় আমার দিকে চেয়ে মুচকে হেসে থাকবেন, কেই বা সেদিকে লক্ষ্য করলে!

জল নিয়ে উপরে গেলে দেবেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আসতে এত দেরী হল যে?

তখনও ঠিক প্রকৃতিস্থ হতে পারিনি, মুখ নীচু করে বললাম, কৈ না ত!

তিনি চুপ করে রইলেন, কিন্তু তাঁর মুখে যেন একটা কৌতূহল জেগে রইল।

দু'তিন দিন পরে তাঁর মা-বাপ চলে গেলেন। যাবার আগে তাঁর মা আমার হাতের উপর তাঁর রোগা ছেলেটীর হাতখানি রেখে বললেন, মা, দেবুকে তোমায় দিয়ে গেলেম, যদিও তুমিই সব করছ, তবুও ওর সব ভার তোমাকেই দিয়ে গেলেম। দেবু সেরে উঠলে অঘ্রাণে তোমায় নিয়ে যাব—কেমন যাবে ত?

তাঁর গোপন ইঙ্গিত শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।

মা চলে গেলে তিনি হাত ঘুরিয়ে আমার হাতখানা মৃদু আকর্ষণ করে বল্লেন, মা যা বললেন, তার অর্থ বুঝেছ কহিনুর?

আমাদের মাঝ থেকে 'আপনি'র দূরত্বটা কেটে গিছল। তাঁর কথা শুনে আমি লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম।

তিনি ধৃত হাতখানায় একটু চাপ দিয়ে বললেন –যেতে রাজী আছ ?

আমি তবুও চুপ করে আছি দেখে বললেন, মৌনং সম্মতি লক্ষণ-- না মুখের উপর 'না' বলতে লজ্জা কোনটা—বুঝব ? শেষ কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখের সমস্ত দীপ্তি নিবে গেল।

আমি চুপি চুপি বললাম, আমার আবার মতামত কি ? দাদাদের মত হলেই ত হল !

তিনি অত্যন্ত নিরুৎসাহ ভাবে বললেন—দাদাদের মত হলেই হল ! তোমার নিজের তা'হলে একটুও ইচ্ছে নেই— শুধু পরের কথাতেই স্বীকার করেছ ?

কণ্ঠস্বর সংযত করে ধীরে ধীরে বল্‌লাম, মেয়েদের আবার স্বাধীন মত থাকে নাকি ?

তিনি জোর দিয়ে বললেন, সকলের না থাকতে পারে কিন্তু তোমার আছে।

বল্লাম, কেন ?

কেন তা জানি না—কিন্তু তুমি আমার কথার উত্তর দাও।'

মুখ নীচু করে মৃদুস্বরে বললাম, নিজের মন থেকেই আমার উত্তর পাবেন,—আমি সৌভাগ্য বলেই মনে করি !

অন্ধকার ঘরে আলো আনলে যেমন চোখের পলকে তার চেহারা বদলে যায়, তেমনি আমার এই কটী কথাও তাঁর চেহারা বদলে দিলে, আমার হাতখানা স্নেহভরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, সত্যি ! সত্যি বলছ কহিনুর ? আমার কান দুটো গরম হয়ে উঠল, বললাম, নিজেই কি জানেন না !

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটাবার পর হঠাৎ আমি মুখ তুলে বললাম, আচ্ছা আমি যে আপনাকে এতকরে সারালাম, আপনি আমায় কি দেবেন ?

তিনি হেসে উত্তর দিলেন,—দেবার মত কি আছে আমার—প্রাণইত দিয়ে ফেলেছি, দেবার মত আর ত কিছু নেই !

ফস্-করে বলে ফেল্লাম, একপক্ষ থেকে পেলেই সেটা পাওনা, দুপক্ষ থেকে দেওয়া হলে ত সমানই হ'য়ে গেল !

তিনি আমার চিবুকে হাত রেখে সোচ্ছ্বাসে বল্‌লেন, আমার মত ভাগ্যবান কে আছে !

আজ কেবলই ভাবি—ওরে হতভাগী, সেদিন সেই আদর পেতে পেতে, সেই বুকের কাছে মাথা রেখে কি তুই চোখ বুজতে পারতিস না ? হারে পোড়াকপালী, এত আদর, এত যত্ন, এত ভালবাসার খনি হারিয়েও ত তুই বেঁচে রইলি ! কেন, গঙ্গা যমুনার অত জলেও কি তোর ওই ক্ষুদ্র দেহ ডুবতে পারত না !

(৪)

এবার যে অধ্যায় লিখতে বসেছি এতেই আমার জীবন্ত সমাধি আছে। তিনি বেশ ভাল হয়ে উঠেছিলেন, বড়দা বলেছিলেন—দিন আষ্টেকের পর তিনি কলেজে যেতে পারবেন।

সে বছর সর্ব্বনাশী ইনফ্লুয়েঞ্জা কত লোকের জীবন প্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে ছিল তার সংখ্যা নেই, রাক্ষসী এসে আমাদের বাড়ীতেও দেখা দিলে। সকলেরই হ'ল,—তাঁরও হ'ল,— শুধু ভাল রইলেন বড়দা, মেজদা, আমি ও বড়বৌদি। সেদিন নীচে থেকে খেয়ে এসে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্তে তাঁর কাছে গেছি,—হাতের ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে বসলে, ধীরে ধীরে বল্‌লেন, আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও কহিনুর, আমার প্রাণটা কেমন করছে।

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে বল্‌লাম, বড়দাকে ডাকি !

মাথা নেড়ে বল্‌লেন, না,—তুমি আমার কাছে থাক। তারপর সজোরে আমার হাতখানা বুকের উপর চেপে ধরে কেমন কাতর চোখে আমার পানে চেয়ে রইলেন।

আমি শঙ্কিত হয়ে বল্‌লাম, অমন কচ্ছেন কেন ! কি কষ্ট হচ্ছে ?

তাঁর চোখের কোণ থেকে টপ্‌টপ্ করে জল ঝরে পড়ল, অতিকষ্টে বল্‌লেন, বুঝি তোমায় ছেড়ে যেতে হ'ল ! আমি 'বড়দা' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। বড়দা, মেজদা প্রভৃতি সকলেই ছুটে এলেন,—বড়দা কপালে হাত রেখে চীৎকার করে উঠলেন,—একি ! এর যে হার্টফেল্ হচ্ছে !

সেইটুকু সময়ের মধ্যে যতদূর চিকিৎসা সম্ভব বড়দা সবই করলেন,— কিন্তু যেন সবই বিফল বলে মনে হ'ল। আমার হাতখানা বুকের উপর টেনে নিয়ে তিনি তাঁর মৃত্যু-ছায়া মাখা ছুটী চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। পাথরের মত কঠিন চোখছুটী তখনও আমার পানে তেমনই আগ্রহভরা দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল।

ঘরে কে আছে কে নেই সে জ্ঞান তখন আমার ছিল না, 'মাগো' বলে আমি তাঁর তুষার শীতল নীল দেহের উপর লুটিয়ে পড়লাম—তারপর কিছু মনে নেই।

* * * *

কাল রাত্রিটা যে কি করে কাটল কিছুই মনে নেই, শুধু একটা স্বপ্নের মত ক্ষীণ স্মৃতি মনে পড়ে, বড় বৌদি হাহাকার করে কেঁদেছিলেন, আর তার পরই যেন একটা হরিধ্বনির শব্দ পেয়েছিলাম। যখন সব অনুভব করবার শক্তি ফিরে এল তখন আমার হৃদয়-দেবতার নশ্বর-দেহ পঞ্চভূতে মিশে গেছে। প্রথম যেদিন ভাত খেতে গেলাম সেদিন মহারাজ মাছের ঝোল ভাত দিয়ে গেল। ভাত স্পর্শ না করে উঠে পড়লাম,—নবৌদি কাছে ছিল, হাঁ হাঁ করে উঠল। আমি মাছের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, "এ জিনিসের ছোঁয়া আর আমায় দিও না।" আমার সঙ্গে বড়দা বৌদিও মাছ ছাড়লেন। কয়েকদিন পর শাশুড়ীকে একখানা চিঠি লিখলাম ;—মা, সবই শুনেছেন,—আমি অভাগিনী আপনার সর্ব্বস্ব গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে ভস্ম করে ফেলেছি! মা মৃত্যু-সময়েও তিনি এ অভাগিনীর চিন্তাই করেছিলেন, আমার মুখের পানে চেয়ে আমার জন্তে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তিনি আমায় ছেড়ে চলে গেলেন! আপনার গচ্ছিত ধন আমি হারিয়ে ফেললাম! মা, আপনি আমায় অগ্রহায়ণ মাসে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন,—মা আমি কার বামে গিয়ে আপনার উঠানে দাঁড়াব? আপনার দুঃখিনী পুত্রবধূকে ভুলে যাবেন না, মন বড় অস্থির হয়েছে, যদি নিয়ে যান তা'হলে দেখে আসি।

আপনার অভাগিনী পুত্রবধূ—
কোহিনুর।

(৫)

মাসখানেক পর শ্বশুর মহাশয় এলেন। শ্বশুর বধূতে অনেকক্ষণ একই দুঃখে একই লোকের উদ্দেশে কাঁদলেম। তিনি আমায় নিতে এসেছিলেন, বড়দা প্রথমটা ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু শেষে সম্মত হলেন। আসবার সময় বড়বৌদি জোর করে জরীপেড়ে সাড়ী পরিয়ে দিয়েছিলেন, আমি কিন্তু পূর্ব্বেই নিজের সঙ্কল্প স্থির করে বড়দার থানকয়েক থান ও বড়বৌদির সাদা সেমিজ ট্রাঙ্কে তুলে নিয়েছিলাম। ষ্টেশনের বাথ-রুমে গিয়ে কাপড় বদলে, গয়না খুলে আমি বিধবার সাজ পরে বেরিয়ে এলাম। শ্বশুর মহাশয় আমার পানে চেয়ে হাহাকার করে সেই একপাল সাহেব বিবির সামনেই কেঁদে উঠলেন। সান্ত্বনা দিবার কোন ভাষাই ছিল না—নীরবে তাঁর হাত ছুটী কোলে টেনে নিলাম।

সামনের ছোকরা সাহেব ছুটী এবং মেম তিনটী আমার আকস্মিক বেশ পরিবর্ত্তন দেখে আশ্চর্য্য হ'য়েছিল,—শ্বশুর মহাশয়কে তাঁর রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে। শ্বশুর মহাশয় চোখ মুছে বললেন, এটী আমার বিধবা পুত্রবধূ!

হায়! কার বধূ আমি! কার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ! কোথায় আমার ইষ্টদেবতা! কোথায় আছ প্রভু! চোখে সব যেন ধোঁয়া হয়ে আসতে লাগল, আমি শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ পরে জানি না, মুখে ঠাণ্ডা জলের ছাট পেয়ে চোখ চাইলাম,—গাড়ী শুদ্ধ মানুষ আমার মুখের পানে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে। হায়! তবুও যেতে পারলাম না! ওগো জীবনে বড় ভালবেসেছিলে, তাই মরণে কি এতই ভুলে গেছ! চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। মাথায় কাপড় ছিল না, উঠে বসে দিতে যাচ্ছি শ্বশুর মহাশয় আমার মাথাটা জোর করে কোলে চেপে ধরে বললেন, উঠোনা মা, বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ। আমি চোখ বুঁজে শুয়ে পড়লাম, মনে হ'ল এই স্নেহ আমি একদিন জোর করে নিতে পারতাম,—আজ আমার কোনই অধিকার নেই, এ সবই যেন দয়া, যেন বড় লোকের বাড়ী ভিক্ষা নিচ্ছি!

শ্বশুর মহাশয় কতকটা যেন স্বগতভাবে বললেন, আজ প্রায় আট মাস হ'ল সেও একদিন এমনি করেই আমার

কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিল,—আর আজ! আজ যদি এই কোলে সেও মাথা দিয়ে শুত!

অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় আমি ঘুমিয়েছি ভেবে তিনি আমার যথার্থ পরিচয় সঙ্গীদের দিলেন। গাড়ীতে একটা ক্ষোভের ঢেউ বয়ে গেল।

শ্বশুর বাড়ী গিয়ে পৌছলাম। শাশুড়ী তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের জন্ম আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠলেন। আমিও তাঁর পদপ্রান্তে বসে চোখের জলে অন্ধ হয়ে গেলাম। ননদ-দেবরগুলি ঘিরে বসল—শুধু রত্নমন্দিরের কৌস্তভকেই দেখতে পেলেম না!

(৬)

শ্বশুর বাড়ীর সকলেই যেন আমার একটী কথার অপেক্ষায় থাকত। শ্বশুর শাশুড়ী ত সংসারের সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। পাড়ার লোকের কাছে পুত্রবধূ বলেই পরিচয় দিতেন।

একদিন আমার এক ভাস্থর এলেন, প্রণাম করে চলে আসছি—শুনতে পেলেম, তিনি আমার শাশুড়ীকে বলছেন, দেবুর সঙ্গে ত এঁর বিয়ে হয়নি, তবে কেন বউ বল? শাশুড়ী উত্তর দিলেন, লৌকিক আচারে হয়নি বটে, কিন্তু ঈশ্বরের চোখে হয়ে গেছে, নইলে কি স্বেচ্ছায় বৈধব্য বরণ করতে পারত? একে ধর্ম্মপত্নী ছাড়া কি বলব বল!

উদ্দেশে শাশুড়ীকে প্রণাম করলাম। এত আদর যত্নের ভিতরেও আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল, বড়দাকে লিখলাম, মন বড় অস্থির হয়েছে, আমায় নিয়ে যান।

কয়েক দিন পর মেজদা এলেন, তাঁর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরলাম। আসবার সময় জনে-জনে শীঘ্র আসতে হাত ধরে অনুরোধ করে দিলেন।

শাশুড়ী বললেন, মা, তুমি থাকলে তবুও কতক শোক ভুলি, তুমি যে আমার দেবুর ছায়া!

এখানে এসে দেখলাম বিলেত থেকে ছোড়দাকে দিয়ে তাঁর একখানা খুব বড় ছবি করান হয়েছে। ন'দার কাছে নাকি তাঁর কলেজের ছবি ছিল। একদিন কি একটা কাজে বড়দার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছি—শুনতে পেলেম বড়দা বড়বৌদিকে বলছেন, খুকীর হাতে টাকাকড়ির সমস্তর ভার ফেলে দিও।

বড় বৌদি বল্লেন, কেন?

বড়দা বল্লেন, সংসারে জড়িয়ে যদি একটু শান্তি পায়!

চোখে জল এল,—হায় স্নেহময় বড়দা! শান্তিই যদি অদৃষ্টে থাকবে তবে আমার সোনার তরী কূলে এসে ডুবে যাবে কেন ভাই!
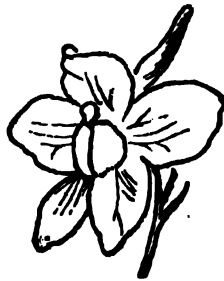
একটার তোপ

(১)

উঠে গেল একটার তোপ
এটা কোন বিধাতার কোপ ?
সমরের অগ্রদূত নয়,
শঙ্কায় কাঁপে না হৃদয়,
এ ত নয় তোপ মানোয়ারী
জানে নাক কোনো দাগাদারী।
আনিবারে রাজা রাজাদের
গর্জ্জন হয় নাক এর ;
বৃটিশের অবিরোধী তোপ,
হায় হায় কে করিল লোপ !

(২)

ফুরায়েছে কল জল হতে,
গাড়ী ঘোড়া থামিয়াছে পথে,
নভেল পড়িছে শুয়ে বধূ
চলিয়াছে প্রেমালাপ মধু।
স্বর করে ডাকে ফেরিয়ালা
বেলোয়ারি চুড়ি আর বালা,
টাকায় কাপড় তিনখানা
মাড়োয়ারী-ডাক যায় শোনা,
হেনকালে একটার তোপ
হায় হায় কে করিল লোপ !

(৩)

ঘড়ি পানে বাবু চেয়ে রয়
হয়ে এলো তোপের সময় ;
টিফিনের দেরী নাই আর
ছেলেদের আনন্দ অপার !
ওই দেখ পরীক্ষার হলে
লেখনী কতই দ্রুত চলে,
বাহিরেতে দোকানের সারি
হেঁকে যায় গোলাপী গাণ্ডারী।
ভীতিহীন গীতিময় তোপ
হায় হায় কে করিল লোপ।

(৪)

বোম্বাট করে নাক পুরী
ভবে এর মেলে নাক জুড়ী,
কালিকার প্রাঙ্গনের মাঝে
বৌদ্ধ শ্রমণ সম রাজে।
ওই ভীম প্রকাণ্ড গড় খাই
উহার গরব জানে ভাই
হাইকোর্ট, রাজার কৈতন
কেবা ওর পরিচিত নন,
একাহারী সে বৈষ্ণব তোপ
হায় হায় কে করিল লোপ !

"স্বভাব কবি গোবিন্দদাস"

কবিগুরু বিহারীলালের মন্ত্রশিষ্যগণের মধ্যে যে কয়জন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নাম আজ পৃথিবী বিখ্যাত। বাকী তিনজনই অভাগিনী বঙ্গ-জননীকে কাঁদাইয়া অনেক দিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বর্গীয় দেবেন্দ্র নাথ সেন ও স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার বড়াল যেমন সুকবি ছিলেন, জীবনকালে তদুপযোগী না হইলেও সমাজে সুযশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাদের কবিতা পড়িয়াছে, তাঁহাদিগকে আদর করিয়াছে, স্নেহ দিয়াছে, ভালবাসিয়াছে—অবশ্য পয়সার কথা চাপিয়া যাওয়াই ভাল. কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ-ভাওয়ালের কবি স্বর্গীয় গোবিন্দ চন্দ্র দাস সুকবি হইয়াও সোহাগ সম্মান তো দূরের কথা—জীবনে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া গিয়াছেন, যে যাতনা সহ্য করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসেও তাহার তুলনার সংখ্যা বোধহয় অঙ্গুলি পর্ব্বে গণনা করা যায়। কবিবর ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানে যেমন লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তেমনি নবদ্বীপে তাঁহার আদর হইয়াছিল; কিন্তু কবি গোবিন্দ দাসের জীবনে শুধু বর্দ্ধমানই জুটিয়াছিল, নবদ্বীপ উদয়ের সৌভাগ্য আর ঘটে নাই। সুসঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে তাঁহার সমাদর হইয়াছিল বটে কিন্তু দেশ, কাল ও অবস্থানুসারে তাহাও পাত্রানুরূপ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যে সাহিত্যিক সংঘের শীর্ষদেশে যাঁহার পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, জীবনে তাহার অতি নিম্নতম স্তরেও তাঁহার স্থান হয় নাই। যে জন্মভূমিকে তিনি জীবনাধিক ভালবাসিতেন,—যাঁহার বন্দনা গান রচনা করিয়া বলিয়া ছিলেন—

"শত স্বর্গ শত কাশী তার চেয়ে ভালবাসি
অই যে পদ্মা পূর্ণ জননী আমার
শত গঙ্গা হতে ভাই পূণ্য তোয়া ও চিলাই,
কত ঘাট ওর তীরে মণিকর্ণিকার।"

সেই স্বর্গাদপি গরীয়সি জননীর স্নেহ ক্রোড় হইতে তিনি নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে—স্থান হইতে স্থানান্তরে উদরান্ন সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টায় ফিরিয়া, গুপ্তঘাতকের ভয়ে আজ এখানে কাল সেখানে লুকাইয়া কাটাইয়া জীবনে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, ঘৃণা ধরিয়াছিল। দারিদ্র্যের জ্বালায়—লাঞ্ছনার তাড়নায় জীবন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সারাজীবন তিনি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন, জীবনে কখনো সুখের মুখ দেখেন নাই, শান্তি পান নাই। তারপর—যাহার কৃপায় সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, সকল যন্ত্রণার অবসান হয় সেই সর্ব্বসন্তাপ-হরা বিরামদায়িনী মৃত্যুই তাঁহাকে সকল অপমান সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছে, কবি বুঝি মরিয়া বাঁচিয়াছেন।

কিন্তু মৃত্যুও কি তাঁহার শান্তিতে হইয়াছিল? কেমন করিয়া সংসারের কঠোর ঘাত প্রতিঘাতে তিনি মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিলেন, কোথায় কেমন অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ভাবিতেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, চক্ষু ফাটিয়া শোণিত নিঃসৃত হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু এমন অনাদরে, উপেক্ষায়, পরগৃহে মৃত্যুকে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন কয়জন? কবির চরিতাখ্যায়ক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার "স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"১৩২৫সনের ১৩ই আশ্বিন প্রভাত হইল। সেদিন কবি গোবিন্দ চন্দ্র মর জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুর দিন সোমবার, কৃষ্ণা একাদশী তিথি ছিল। সারাটা দিন চলিয়া গেল। দিবসে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয় নাই যে তিনি পৃথিবী হইতে অন্তিম বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

সূর্য দেব অস্তমিত হইলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—গভীর অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আবৃত হইল। ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠ নারিন্দিয়ার জনকোলাহল নিস্তব্ধ হইল। পূর্ব্বকথিত বাড়ীর একটী কক্ষে মরণোন্মুখ কবি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহাই কবির শেষ যুদ্ধ। গৃহকোণে একটী প্রদীপ তৈলাভাবে মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। কবির জীবন-প্রদীপও তখন নির্ব্বাণোন্মুখ। আর কবির শিয়রে ও পদপ্রান্তে তাঁহার দুইটী অসহায় পুত্র থাকিয়া থাকিয়া নিদ্রালস নয়নে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। বাহিরে ঘনান্ধকার—প্রকৃতি স্তম্ভিত—যেন কবির অন্তিম মুহূর্ত্তে কালিমময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল। সেই ভীষণ রজনীতে, সেই অসহায় অবস্থায় মুমূর্ষু কবির পুত্র দুইটীকে সান্ত্বনা দান করিতে নিকটে কেহ উপস্থিত ছিল না।"

কবির প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন জন্য শবানুগমন তো দূরের কথা—শব সৎকারের ও লোকাভাব ঘটিয়াছিল! শেষে একটী সেবাশ্রম হইতে জন দুই চারি সেবক আসিয়া সে কার্য্য সমাধা করেন। সুসভ্য ঢাকা নগরী পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবকে এইরূপে চির বিদায় দান করিয়াছে। কিন্তু তারপর? তারপরতো কত ১৩ই আশ্বিন আসিয়াছে, গিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গেই বা কি আর পশ্চিম বঙ্গেই বা কি, আজও কি কেহ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে? এমন কি—এই পাপের কথঞ্চিত প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে কবির প্রিয় সুহৃৎ পূর্ব্ববঙ্গের সহৃদয় সজ্জন শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়

কবির যে জীবনী খানি লিখিয়াছেন, স্বর্গগত দরিদ্র লাঞ্ছিত কবির পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে যে শ্রদ্ধার তর্পণাঞ্জলী নিবেদন করিয়াছেন তাহাও মর্য্যাদানুরূপ সমাদৃত হয় নাই। ততোধিক লজ্জার কথা. ঘৃণার কথা, কলঙ্কের কথা কোনো কোনো হতভাগ্য চেষ্টা করিয়া ষড়যন্ত্র পাকাইয়া সুপারিশ চালাইয়া বইখানির আলোচনা পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিবার ফিকিরে ফিরিতেছে। কবি যে আক্ষেপ করিয়া শুধাইয়াছিলেন—

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে'
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?
আজ যে আমি উপোষ করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি
হাহাকারে দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছটফট ;
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে'
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?

সে প্রশ্নের উত্তর তাঁহার জীবনকালেও যেমন কেহ দেয় নাই, আজও তেমনি মঠ দেওয়া তো দূরের কথা. কবির পরলোক গত আত্মার উদ্দেশে সামান্ত তিল কাঞ্চনের ব্যবস্থাও কেহ করে নাই।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কবির জীবনী লইয়া যে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় আশা করিয়াছিলেন—

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই গ্রন্থ কবি গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ। কবি গোবিন্দচন্দ্রকে বাঙ্গালী জাতি যদি উপযুক্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পর এই গ্রন্থ সম্বন্ধে নানাদিক হইতে নানারূপ আলোচনা হইবে। সেই আলোচনার ফলে আমরা ক্রমশঃ গোবিন্দচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সাধনা যথার্থরূপে আমাদের আপনার করিয়া লইতে পারিব।"

কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট ! সেদিন এখনো বাঙ্গালায় আসে নাই আসিতে বোধহয় বহু বিলম্ব আছে। কোনো লাইব্রেরীতে অথবা কোনো সভায় অথবা কোনো কাগজে কোনো যোগ্যতর ব্যক্তি এই বইখানি লইয়া কোনো আলোচনা করিয়াছেন,—বলিয়া আমরা জানি না। কোনো দৈনিকে কি সাপ্তাহিকে কেহ কেহ নম, নম করিয়া নিয়ম রক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অতি অকিঞ্চিৎকরই হইয়াছে। শুনিতে পাই বাঙ্গালায় নাকি এটা আলোচনার যুগ, কিন্তু কোনো লক্ষণ তো দেখিতে পাই না।

মণীষার মৃণ্ময় ঘট কেমন করিয়া চাড়ালের লগুড়াঘাতে চূর্ণ হইয়াছে,, কবিত্বের স্বর্ণাভ কমল কেমন করিয়া পিশাচের পদ-তাড়নে দলিত হইয়াছে, কবি গোবিন্দ চন্দ্র মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন, কাহার জন্ম তিনি সারা জীবন অপমানে অশান্তিতে দুঃখে কষ্টে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন বাঙ্গালীর তাহা জানিয়া রাখা উচিত। কবি গোবিন্দ চন্দ্রের কবিত্ব কিরূপ শক্তি সম্পন্ন, উদার, প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক ছিল, জাতীয় জীবনে তাহার স্থান কোথায়, বুঝিয়া রাখা উচিত। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থখানিতে এই সব কথাই জানাইবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠক কি "স্বভাবকবি গোবিন্দদাস" বইখানি একবার পড়িবে না ? *

* "স্বভাবকবি গোবিন্দদাস"—মূল্য ২৲ টাকা।

মুষ্টিযোগ

স্বামী কি পছন্দ করেন না ?

তিনি প্রভাতে উঠিয়া দেরীতে চা পাওয়া——পছন্দ করেন না।
" সকালে বেশী কথা শোনা বা বলা " " "
" অফিস যাবারকালে বন্ধু দর্শন করা " " "
" সন্ধ্যায় ভ্রমণে বাহির হইবার কালে বাধা পাওয়া " " "
" রাত্রি করিয়া ফিরিলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় ইহা " " "
" শয়ন-কালে স্বাভাবিক স্বর ভিন্ন অন্য স্বর " " "
" গভীর-রাত্রে শয়ন কক্ষে কাহার জাগিয়া থাকা " " "
" আফিসে নিজের মাহিনা বৃদ্ধি চাহেন, গৃহে ঝি-চাকরের বেতনবৃদ্ধি " " "
" স্ত্রীলোকের বহুবিধ জামা-কাপড়-প্রীতি——পছন্দ করেন না।
" মাড়োয়ারী-রমণীগণ অধিক অলঙ্কার প্রিয় তাহাদের " " "
" শ্বেতাঙ্গিনীদের স্বাধীনতা প্রিয়তার জন্য " " "
" ভারতের স্বাধীনতা চান, যে বা যাহারা বাধা দেয়, " "
" কোন কার্য্যের কৈফিয়ৎ দেওয়াটা একেবারেই " " "
" যে সকল স্ত্রী বুঝিয়া বোঝে না, বুঝিয়া চলে না, তাহাদের একেবারেই " " "

কমলা

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

(১)

হলিয়া গ্রাম বাগিচায় বেড়া এবং সুন্দর সুন্দর ঘরে বেষ্টিত। সেখানে মনিক চাকলাদার বাস করেন, তাঁর সম্পদ অপার, সুখের সীমা নাই। তিনি যেমন দাঁতা তেমনি আতিথেয়। তিনি পরম ভাগ্যবান, দেবতার বরে তাঁহার মদনের মত এক পুত্র, তার নাম সুধন, আর কমলা নামে এক কন্যা, যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। চাকলাদারের নিদান নামে এক কারকুন আছে, সেই মহলের সব দেখাশুনা করে।

২

গ্রামেতে আছয়ে এক চিকণ গোয়ালিনী
যৌবনে আছিল যেমন সবরি-কলা চিনি।

সে এখন বৃদ্ধা।

সংসারেতে আছে যত লুচ্চা লোকন্দরা
গোয়ালিনীর বাড়ী গিয়া করে ঘুরা ফেরা।
তেলপড়া দেয় যদি চিকণ গোয়ালিনী
সোয়ামী ছাড়িয়া যায় কুলের কামিনী।

৩

কমলা পরম রূপসী,

চাঁদের সমান মুখ করে ঝলমল
সিন্দুরে রাঙ্গিয়া ঠোঁট তেলাকুচ ফল।
জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আঁখি
ভ্রমরা উড়িয়া আসে সেই রূপ দেখি!
বেলুনে বেলিয়া তুলছে দুই বাহুলতা
কণ্ঠেতে লুকায়ে তার কোকিল কয় কথা।

৪

কমলাকে নিদান কারকুন একদিন জলের ঘাটে দেখিল।

জলেতে সুন্দরী কন্যা ফুটা পদ্ম ফুল
কন্যারে দেখিয়া কারকুণ হইল আকুল।

চাকলাদারের বাড়ীতে চিকণ গোয়ালিনী ক্ষীর সর দিতে আনাগোণা করে। কারকুণ গোয়ালিনীর স্মরণ লইল। ঔষধ পাতি দিয়া কমলাকে তাহার বশ করিয়া দিতে বলিল।

চিকণ গোয়ালিনী কয় শুন কথার নাল
মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল।
ফাঁদ পাতি চাঁদ ধরি জমীনে থাকিয়া
আমার গুণের কথা জানে যত ভূঞা।'

৫

কারকুণ একদিন গোয়ালিনীকে টাকা কড়ি দিয়া কমলার কাছে এক প্রেমলিপি লিখিয়া পাঠাইল। পত্র লইয়া গোয়ালিনী কমলার নিকট গেল।

নবীন বয়স কন্যা প্রথম যৌবন
রূপেতে রোশনাই করে চন্দ্রমা যেমন
আশ্বিন মাসেতে যেমন পদ্মের কলি
বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি।

কমলা পালঙ্কে বসিয়া ছিল, গোয়ালিনীকে খারাপ দুধ দই দেওয়ার জন্য বলিল—

চোকা দইয়ে পোকা তোর দুধে দোনা পাণি
এমন বয়স তোর না গেল ভণ্ডামী।

গোয়ালিনী বলিল, এটা বয়সের দোষ—

আগের যৌবন যদি থাকিত আমার
এই দই খাইয়া তুমি করিতে বাহার।
এক সের দইয়ে দিছি সাতসের পাণি
তবু লোকে ডাকিয়াছে চিকণ গোয়ালিনী।

তারপর গোয়ালিনী হাসিয়া বলিল—

এমন বয়স কন্যা না হইল বিয়া?

কন্যা হাসিয়া উত্তর দিল—

আমার জোড়া পৃথিবীতে মিলিবে না, স্বর্গে আমরা

ছিলাম, মানুষের সহিত আমার বিবাহ হইবে না। চতুরা গোয়ালিনী হাসিয়া যেন ভেঙ্গে পড়ে। সে বলিল—সত্য, আমি স্বর্গেও দুধ দই বেচি, সেখানে তোমার মদনের সঙ্গে দেখা হইল. সে জানে তুমি মর্ত্তে কমলা হইয়া জন্মিয়াছ এবং আমাকে এই পত্র দিয়াছে, তোমাকে দিবার জন্য। এই বলিয়া কারকুনের পত্রখানি কমলার হস্তে দিল।

কন্যা বলে গোয়ালিনী কিবা দিব আর
মনের মত লও তুমি এই পুরস্কার।
চুলেতে ধরিয়া কন্যা নিকটে আনিল
গোয়ালিনীর গালে তিন ঠোকর মারিল।
চুলেতে ধরিয়া তার দিল তিন পাক
লাথি মারিয়া গোয়ালিনীর ভাঙ্গিলেক নাক।

এবং কারকুনকে বলিল,

পায়ের গোলাম হইয়া শিরে উঠতে যায়।
ইচ্ছা যদি করি তারে দিতে পারি শূলে
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড়ালে।

৬

উদ্‌গ্রীব কারকুন সন্ধ্যাবেলা গোয়ালিনীর বাড়ী গেল।

কারকুনকে দেখ্যা কয় আঁটকুড়ীর বেটা
মোর বাড়ীতে আইলে তোর মুখে মারবাম ঝাঁটা'

কারকুন লজ্জায় ও ক্রোধে সাতদিনে চাকলা ছারখার করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া এক ফন্দী আঁটিল। জমিদারের কাছে চাকলাদারের নামে এক অভিযোগ করিল। সাতঘড়া মোহর পাইয়া চাকলাদার জমিদারকে জানায় নাই, লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আদায় করা হউক বলিয়া আর্জি করিল।

৭

রঘুপুরের 'দয়াল' জমিদার পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ চাকলাদারকে ধরিতে পাইক পাঠাইল। মানিককে পিছমোড়া দিয়া বাঁধিয়া হাজির করিল। এবং খুনশালে বাঁধিয়া রাখিল। এদিকে কারকুন কমলার ভ্রাতা সুধনকে বুঝাইল—

শ্রীমন্ত পাটনে গেল বাপেরে আনিতে
ঘরেতে বসিয়া তুমি থাক কি জন্তেতে,

খানকতক মোহর লইয়া তাহাকে জমিদারের কাছে পাঠাইল, মোহর দেখিয়া দয়াল জমিদার বুঝিল কারকুনের কথা সত্য, সমস্ত মোহর হাজির কর, নতুবা পিতা পুত্রে পাষাণ চাপা থাক। এই নিদারুণ আদেশ হইল। পিতা পুত্রে বন্দী হইয়া দুঃখে দিন যাপন করিতে লাগিল।

৮

নিদেন কারকুন, বাকী খাজনা আদায় করিয়া জমিদারের কাছে পাঠাইয়া চাকলা দাবীর সনদ পাইল। চাকলাদার হইয়া কমলার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিল। কমলা কহিল—

কি আর কহিব তোরে পশুর অধম
মাথায় যে তুল্যা লয় পায়ের খড়ম।
আমার বাপের নুন খাইয়া বাঁচিলা পরাণে
তার গলে দিতে দড়ি না বাজিল প্রাণে।
বাপ ভাই দেশে থাকে কইতে এমন কথা
কোটালে ডাকিয়া তোর কাটিতাম মাথা।

এই কথা বলিয়া কমলা "আন্দি সান্দি" দুই ভৃত্যকে সংবাদ দিল, তাহারা বেহারার কাজ করে। কমলা ও তাহার মাতাকে তাহারা মামার বাড়ী রাখিয়া আসিল।

৯

কমলা মামার বাড়ী গিয়াছে জানিয়া কারকুন তার মামাকে এক পত্র লিখিল—

শুন শুন শুন ওগো তোমার ভাগিনী
পর পুরুষে মজে হইল কলঙ্কিনী

যদি তুমি তাহাকে ঠাঁই দাও তুমি একঘরে হইবে। তোমাকে নাপিত বামুনে ছাড়িবে। আর জমিদার হুকুম দিয়াছেন—

কলঙ্কিনী কমলারে যেবা দিবে স্থান
জান বাচ্চা সহিত তার যাইবে গর্দ্দান।

পত্র পাইয়া মামা তাঁর পত্নীকে লিখিল—তুমি পত্রপাঠ কমলাকে চুলের মুঠি ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিবে। মামী পত্র পাঠ করিয়া ভাবিতে লাগিল—

সাক্ষাৎ ভাগিনী আর অবিয়াত কুমারী
কেমন কৈরা দেই তারে ঘরের বাহির করি।

কিছু না বলিয়া পত্রখানি মেঝের উপর রাখিয়া দিল যেন কমলা দেখিতে পায়।

১০

সন্ধ্যাবেলা ঘরে গিয়া কমলা পত্রখানি পড়িল, জলে তার চক্ষু ভাসিয়া গেল, সংসার অন্ধকার দেখিল। ভাবিল—

জলে ডুবি বিষ খাই গলে দিই কাতি
মামার বাড়ী না থাকিব দণ্ড দিবা রাতি।
একবার না গেল কন্যা মামীর সদনে,
একবার না চাইল কন্যা মায়ের মুখ পানে,
একবার না ভাবিল কন্যা জাতি কুল মান
একবার না ভাবিল কন্যা পথের সন্ধান,
সন্ধ্যাবেলা তারা উঠে সূর্য্য ডুবে ডুবে
একবার না ভাবিল কন্যা আশ্রয় কে দিবে

কন্যা দুর্গার নাম স্মরণ করিয়া পথের বাহির হইল। চক্ষের জলে পথ দেখিতে পায় না, তবু চলিতে লাগিল।

১১

বহুদূর আসিয়া এক হাওরে পড়িল, সেখানে লোকজন নাই। এমন সময় এক বৃদ্ধ মহিষালের সঙ্গে দেখা হইল।

অগতির গতি তুমি ধর্ম্মের বাপ

আজ রাত্রে তোমার গোহালে একটু স্থান দাও। মহিষাল কমলার অসামান্য জ্যোতি দেখিয়া বুঝিল ইনি স্বয়ং লক্ষী, তাহার উপর সদয় হইয়া গৃহে আসিয়াছেন। সে মহা যত্নে ও গভীর ভক্তির সহিত তাহাকে আশ্রয় দিল।

লক্ষী অধিষ্ঠান হইল তাহার গোহালে।

১২

একদিন কোড়া শিকারে এক শিকারী আসিল। তার সোণার অঙ্গে সোণার সাজন দেখিয়া রাজার নন্দন বলিয়া মনে হয়।

সন্ধ্যাবেলা মইষাল বাথান হইতে আসে
কার্ত্তিক দেখিল যেন দাঁড়াইয়া পাশে।

তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কুমার জল চাহিলে—কমলা জল দিল।

সন্ধ্যা কালের তারা কিম্বা নিশা কালের চন্দ
লক্ষীরে জিনিয়া রূপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ।
কিবা কহ মহিষাল কোন দেবের বরে
চাঁদ হেন কন্যা তোমার রাখিলেক ঘরে।
মহিষাল কইছে কথা ধর্ম্ম অবতার
বাপ মার নাম আমি নাহি জানি তার,
সদয় হইয়া লক্ষী দিলা দরশন
তাঁরে পাইয়া মোর হইল সফল জীবন,
বাথানের বন্ধ্যা মইষ হইয়াছে গাভীন
মায়ের কৃপায় মোর হইয়াছে সুদিন।

শিকারী বলিল—এই কন্যা দেও মোরে লয়ে যাই ঘর। মহিষাল কাঁদিয়া বলিল—মায়েরে ছাড়িলে আর মোর বাঁচা নাই। শেষে অনেক কথার পর কন্যাকে লইয়া কুমারের দেশে যাওয়া স্থির হইল। মহিষাল বলিল—

"শুন মোর মাও
অন্তকালে দিও মোরে রাঙ্গা দুটী পাও।"

১৩

কন্যা রাজপ্রাসাদে গিয়া মায়ের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদে। প্রদীপকুমার তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল। কমলা বলিল, যদি কখনো সুদিন আসে বিবাহ করিব, এখন নয়।

অন্তরে মন্তর কলি নাহি ফুটে মুখ
ভৃঙ্গ যেমন উড়ে যায় মনে পাইয়া দুখ।

১৪

হঠাৎ একদিন রাজপুরে বাদ্য বাজিল। রক্ষাকালীর নিকট নরবলি হইবে। পরিচয় পাইয়া কমলা বুঝিল, তাহার পিতা ও ভ্রাতারই প্রাণ যাইবে। প্রদীপকুমার কিছুই না জানিয়া কন্যাকে বলিল—

তুমি আমি দুইজন যাব সেইখানে
দেখিব সে নরবলি আনন্দিত মনে।

কমলা সজল নেত্রে বলিল—

আজি কুমার দিব আমি সত্য পরিচয়
এক ত নালিশ মোর শুনতে উচিত হয়।
হলিয়া গ্রামেতে সেই চাকলাদারের বাড়ী
তাহার কারকুনে তুমি আন শীঘ্র করি।

তারপর 'আন্ধি সান্ধি' দুই ভাই, চিকণ গোয়ালিনী, কন্যার মাতুল ও মামী এবং সেই বুড়া মহিষাল বন্ধুকে হাজির করিতে বলিল—

সকলে হাজির কর ধর্ম্ম সভার ঠাঁই
পরিচয় কথা মোর সভাতে জানাই।

১৫

কমলা ধর্ম্মসভায় চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করিয়া বলিল—

পইলা সাক্ষী পিতামাতা দেবতার সমান
দোঁহার চরণে করি সহস্র প্রণাম।
গর্ভ সোদর ভাই সাক্ষী করি তারে
আর সাক্ষী করি আমি এই কারকুনেরে।
চিকণ গোয়ালিনী সাক্ষী ভাঙ্গা দন্ত যার
মামা মামী সাক্ষী করি সম্বন্ধে আমার ;
সন্ধ্যাকালের তারা সাক্ষী সাক্ষী আঁখির পাণি
আর সাক্ষী হাতে আমার মামার পত্রখানি।
গোলুর গোষ্ঠী সাক্ষী আমার মইষাল বন্ধু ছিল
সন্ধ্যাকালে বাপের মত মোরে আশ্রা দিল।
তারপর সাক্ষী আমার রাজার কুমার
যাহার কারণে আমি পাইলাম নিস্তার।

এই বলিয়া কমলা সজল নয়নে তাহার দুখের করুণ-কাহিনী বর্ণনা করিল, কেমন করিয়া কালসাপ কারকুন চিকণ গোয়ালিনীকে দিয়া পত্র পাঠায়, কেমন করিয়া ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়া সে রাজার নিকট মোহর পাওয়ার কথা লিখিয়া পিতাকে বাঁধিয়া লইয়া যাওয়ায়, কেমন করিয়া হাতে মোহর দিয়া ভ্রাতাকে পিতার উদ্ধারার্থে পাঠাইয়া তাহাকেও বন্দী করায়, কমলা একে একে সমস্ত প্রকাশ করিল এবং তাহার পত্রও ধর্ম্মসভায় দাখিল করিল। কমলা বলিল—

যখন গলায় কাপড় দিয়া পড়িয়া ধূলায়
বাপ ভাইএর বর মাগি ঝিও আর মায়

তখন এই দুই কারকুন রাজার সনন্দ লইয়া অন্দর হইতে আমাদিগকে তাড়ায়। 'আন্দি সান্দি' এরা দুই ভাই আমাদিগকে পালকী করিয়া মামার বাড়ী রাখিয়া আসে। কারকুন মামাকে পত্র লিখিলে তিনি বিদেশ হইতে যে পত্র লিখিলেন তাহাও এই ধর্ম্মসভায় রাখিলাম। বিরাগে মামার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। অন্ধকার জনহীন হাওরে এই বৃদ্ধ মহিষাল বন্ধুর দেখা মিলিল—

জন্মের সুহৃদ মোর বাপের সমান
তিন দিন দিল মোরে গোয়ালেতে স্থান,
মায়া মমতায় সে যে বাপের চাইতে বাড়া
এইখানে পাইলাম আমি সুখের আরা,
একে একে কইলাম আমি সকল সাক্ষীর কথা
এইখানে সাক্ষী আমার প্রাণের দেবতা।

এই বলিয়া কমলা প্রদীপকুমারের কথা বলিল। রাণী (প্রদীপকুমারের মাতা) আমাকে কন্যার মত স্নেহের চক্ষে দেখেন। দুঃখের মধ্যে সুখেই বাস করিতেছি হঠাৎ অদ্য বলির বাদ্য ও বলির কথা শুনিয়া এই সভায় আপনার পরিচয় দিলাম। বন্দীরা আমার বাপ ও ভাই। সভাজন

বিচার করিয়া তবে দেও নরবলি।

১৬

চিকণ গোয়ালিনী সভায় অবশেষে সত্য কথা বলিল, প্রত্যেক সাক্ষীর দ্বারা ও পত্রের দ্বারা কারকুনের গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হইল। রাজা রুখিয়া কারকুনকে বলিলেন

সত্য কথা দুষ্টমতি কও এইবার
দিবাম উচিত দণ্ড মাহিক নিস্তার
কাভা ভাজি ঠাডা পড়ে কারকুনের শিরে
কহিতে না পারে কারকুন ধর্ম্মরাজার ডরে।

কারকুনের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছিল। সতীকে বহু যন্ত্রণাই দিয়াছে, আজ তার প্রকাশের দিন আসিয়াছে।

করিয়া মায়ের পূজা রাত্রি নিশাকালি
কারকুনে দিলেন রাজা পূজার নরবলি।

১৭

মহা আনন্দে এবং মহাসমারোহে প্রদীপকুমারের সহিত কমলার বিবাহ হইল। পুত্রসহ চাকলাদার নিজের চাকলায় ফিরিল—

এইখানে করিলাম শেষ বারমাসী গান
বাটা ভইরা জামাইর মা দেও গুয়া পান।

---

* পালাটী ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুরের মৈমনসিংহ গীতিকা হইতে গৃহীত। দীনেশ বাবু অনেক জিনিষ বঙ্গসাহিত্যে দিয়াছেন কিন্তু এই গীতিকার মত কিছু দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এটী উঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। গভর্ণমেণ্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সকল গাথা সংগ্রহের জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রচুর অর্থ দান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। অর্থাভাবে এই কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, ইহা দেশের ও দশের বিষম দুর্ভাগ্য ও লজ্জার কথা। এরূপ বহু পালা এখনো লোকের মুখে মুখে চলিতেছে, তাহা সংগৃহীত হয় নাই। যাহাতে সংগৃহীত হয়, সে চেষ্টা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

চাণক্য

"চন্দ্রগুপ্ত" স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের একখানি সুপ্রসিদ্ধ নাটক। প্রায় ১৫বৎসর হইতে বাঙ্গলার বৈতনিক,অবৈতনিক থিয়েটারে ইহার অভিনয় হইয়া আসিতেছে।

প্রথম মিনার্ভায় যখন ইহা অভিনীত হয় তখন দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য নাটকের সহিত তুলনায় এই চন্দ্রগুপ্ত হীনপ্রভ বলিয়া মনে হইয়াছিল। প্রথম দুই চারি রাত্রির অভিনয়ে দর্শকও তেমন হয় নাই বলিয়া তখনকার কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার সঙ্গে রায় মহাশয়েরই "পুনর্জ্জন্ম" জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তখন থিয়েটারে না জমিবার কারণ নাটকখানি মাঝে মাঝে বড় খাপছাড়া হইয়াছিল। যেভাবে নাটকের গল্প জমাট বাঁধে

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সেভাবে ইহার গল্পগুলি সুসবদ্ধ হয় নাই। চরিত্রগুলিও প্রায় একাই পুষ্টি লাভ করিয়াছে, নাটকীয় ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে পরস্পরে বিশেষ সাহায্য করে নাই। এমন কি নাটকের গাঁথনি এমন বিক্ষিপ্তভাবে হইয়াছে যে

কতকগুলি ঘটনা বা কতকগুলি চরিত্র নাটক হইতে বাদ দিলেও নাটকের কোন ক্ষতি হয় না বা রসবিকাশের ব্যাঘাত জন্মে না। যদি আন্টিগোনাস, সেলুকাস, সেকেন্দর শা, হেলেন, আন্টিগোনাসের মাতা—এই গ্রীসিয় চরিত্রগুলি পুস্তক হইতে একেবারে তুলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের কিছুমাত্র অঙ্গহানী হয় না। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়েও ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কারণ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী কর্ণওয়ালিসে যখন চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় করেন তখন অনায়াসেই প্রায় সমস্ত গ্রীসিয় চরিত্রগুলি বাদ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহা রাখিয়াছিলেন তাহার সার্থকতা দর্শক প্রোগ্রামেই দেখিয়াছিলেন, অভিনয়ে বড় কিছু দেখেন নাই। আবার কেহ যদি ছায়াকে বাদ দিয়াও অভিনয় করেন তাহা হইলেও চন্দ্রগুপ্ত নাটক ভাঙ্গিয়া পড়ে না। কাজেই হেলেন, ছায়া, আন্টিগোনাস, আন্টিগোনাস-জননী একান্তই নাটকে Redundant. অজাগর-স্তনের ন্যায় শুধু সৌন্দর্য্য নাশক নয় – অনাবশ্যক।

বই পড়িয়া এবং অভিনয় দেখিয়া এখনও একটা মনে খটকা লাগে - নাটকের নাম চন্দ্রগুপ্ত হওয়া উচিৎ, না চাণক্য হওয়া উচিত ছিল।

কেন না চন্দ্রগুপ্ত লইয়া নাটক লিখিত হইলেও চন্দ্রগুপ্ত ইহার কোনস্থানেই তেমন ফোটে নাই, যেমন ফুটিয়াছে এই চাণক্য। আর চন্দ্রগুপ্ত নায়ক বলিয়া কথিত হইলেও সে নিজে নাটকে কোন রসেরই সৃষ্টি বা পুষ্টি বিধান করে না, কিম্বা যেটুকু রসের সৃষ্টি করে তাহাও চাণক্যের প্রভাবে চাপা পড়িয়া যায়। কাজেই এ চরিত্র ফুটি ফুটি ফোটে না। এই সকল কারণেই প্রথম অবস্থায় এই নাটক তেমন জমে নাই। পরে ইহার অনেক অংশ কাটিয়া ছাঁটিয়া, বাদ দিয়া যখন পুনরভিনীত হইল তখন নাট্যকারের কৃতিত্ব নহে, নটের কৃতিত্বই দর্শকের আগ্রহ উদ্দীপিত করিতে লাগিল। ব্যক্তিগত ভাবে অভিনেতার শক্তি ও সামর্থ্যের উপর চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রতিষ্ঠা আমরা বরাবরই দেখিয়া আসিতেছি। ক্ষমতাশালী অভিনেতা যদি চাণক্য সাজেন তবেই রঙ্গালয়ে দর্শক হয়, নচেৎ এ নাটকের বিশেষ কোন আকর্ষণী শক্তি যে আছে তাহা উপলব্ধি করা যায় না। এই পোনের বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালায় বৈতনিক রঙ্গমঞ্চে দানীবাবু চাণক্য সাজিয়া আসিতেছিলেন, মাঝে মাঝে শিশির বাবু, নরেশ বাবু, তিনকড়ি বাবু ইঁহারা সকলেই চাণক্যের ভূমিকা লইয়া আপন আপন কৃতিত্ব দেখাইবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই বিভিন্ন চাণক্যের বিভিন্ন অভিনয় ভঙ্গীর তুলনা মূলক সমালোচনা করিব না। স্বর্গীয় রায় মহাশয় ইদানীং সম্প্রদায়ের শক্তি বুঝিয়া নাটক লিখিতেন। মিনার্ভার জন্য যখন তিনি চন্দ্রগুপ্ত লেখেন, তখন দানীবাবুই যে চাণক্য করিবেন এই লক্ষ্য তাঁর ছিল। রায় মহাশয়ের সামনেই এই নাটকের Rehearsal হয় সুতরাং তখনকার চন্দ্রগুপ্তের Representation তাঁহার অনুমোদিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু নাট্যকারের অনুমোদিতই হোক কিম্বা কোন অভিনেতার ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রভাবে যেভাবেই পরিস্ফুট হোক, যে কোন নাটকীয় চরিত্রের মর্য্যাদা ও সঙ্গতি রাখিয়া যে কোন ক্ষমতাশালী অভিনেতা, ইহার ভিন্ন আকার দিতে পারেন। বিভিন্ন নটের হাতে পড়িয়া চাণক্যও রঙ্গমঞ্চে আকার বদলাইয়াছে, ইহা দর্শক দেখিয়াছেন। কিন্তু এই চাণক্যের প্রথম ছবি আমরা দেখি দানীবাবুর অভিনয়ে; আজিও তিনি চাণক্য সাজিতেছেন। সুতরাং এখানে আমরা শুধু দানীবাবুর চাণক্যের কথাই বলিব। কিন্তু অভিনয়ের কথা বলিবার পূর্ব্বে চাণক্যের চরিত্র গ্রন্থকার কি ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা দেখা আবশ্যক।

ইতিহাসে বা কিম্বদন্তীতে যে চাণক্যের পরিচয় আমরা পাই, এ চাণক্যে আমরা সর্ব্বত্র তাহা পাই না—প্রয়োজনও নাই। ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকের মনোনীত না হইলেও এখানে নাট্যকারের লেখনী চির-স্বাধীন। চন্দ্রগুপ্তের চাণক্যকে আমরা প্রথম দেখি - স্থান, শ্মশান প্রান্তর, কাল প্রত্যুষ, বহু জলার উপর একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, শ্মশান কুশাচ্ছন্ন, চাণক্য নিজের মনের অবস্থার সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাদৃশ্য দেখিতেছেন; দৃশ্য বীভৎস, চাণক্যের অন্তরেও বীভৎস-রসের আন্দোলন, বীভৎসতার যে সৌন্দর্য্য, সে সৌন্দর্য্যে চাণক্য মুগ্ধ, আত্মহারা। এই বীভৎসতাই চাণক্যের প্রেয়সী, চাণক্য তাঁহার প্রেয়সীকে সম্বোধন করিয়া

বলিতেছে হে সুন্দরি, তুমি আমাকে শিখিয়েছ সংসারকে ঘৃণা করতে, ক্ষমতাকে তুচ্ছ করতে, ঈশ্বরের বিপক্ষে সোজা হ'য়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে। হে সুন্দরি! আমায় সংসার হতে আরও দূরে টেনে নিয়ে যাও—যতদূর পার, নরকে হয় তাও ভাল, শুদ্ধ সংসার থেকে যতদূরে হয়।"

অত্যাচারী। সর্ব্ব অত্যাচার-পীড়িত চাণক্য সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, ঈশ্বরের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। সামান্য কুশাঙ্কুর পায়ে বিঁধিতেছে, চাণক্য তাহাও সহ্য করিতে পারে না,—মনে করে, তৃণও আজ তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন মানসিক অবস্থা এই,
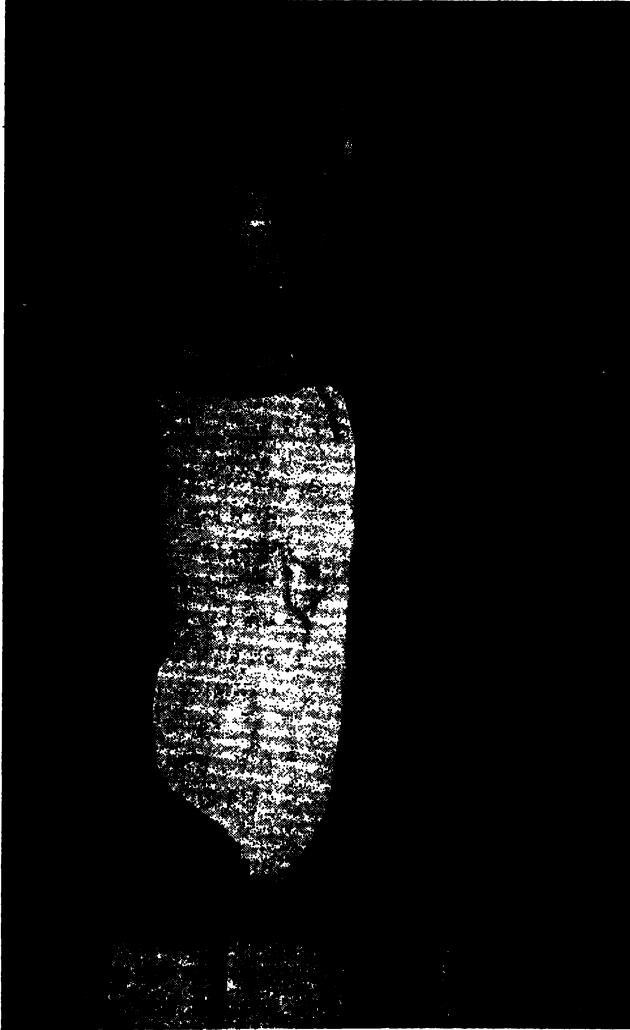
চাণক্যের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ,—দানীবাবু।

এই চাণক্যের পত্নী-বিয়োগ হইয়া গিয়াছে, কন্যা অপহৃত হইয়াছে, রাজা তাহার ক্ষুদ্র কুটীরটীকে বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। রাজা অত্যাচারী, মানুষ অত্যাচারী, ঈশ্বরও

পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই, তখন কাত্যায়ন আসিয়া চাণক্যকে নন্দের পৌরোহিত্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিল। অনুরোধ করিল দুর্ব্বলচিত্ত, অক্ষম, নেহাৎ গো-বেচারা কাত্যায়ন

নন্দ কর্তৃক তার সাত পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। অত্যাচারে ক্ষিপ্ত চাণক্য এ সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। ব্রাহ্মণের লুপ্ততেজ—যাহা বংশগত সংস্কারে চাণক্যের শোণিত-কণায় সুপ্ত ছিল তাহা জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের তেজ অর্থে, নাট্যকার স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন এ কলির ব্রাহ্মণের তেজ। এ ব্রাহ্মণের তেজে চণ্ডালত্ব স্পর্শ করিয়াছে। কাজেই এ দৃশ্যের চাণক্য, বীভৎসতার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট—এক কথায় ভূতগ্রস্ত, নরবিদ্বেষী, ঈশ্বর বিদ্বেষী, চণ্ডালের ন্যায় উগ্র অথচ পাণ্ডিত্যের অভিমানে, দম্ভে পরিপূর্ণ। ইহার পরেই আমরা চাণক্যকে দেখি, নন্দের বিলাস উদ্যানে। কদাকার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া নন্দ তাহার অপমান করিল,বাচাল তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিল, যে চণ্ডত্বের আভাষ, চাণক্যের প্রথম পরিচয়-দৃশ্যে পাইয়াছিলাম তাহা প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। সে নন্দকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া গেল। সে অভিশাপ-বাক্যের প্রতি অক্ষরে চাণক্যের আত্মবিশ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছে, চাণক্য বলিতেছে, "যদি সে নন্দবংশ ধ্বংস না করে, সে চণকের সন্তান নয়"; তার ভবিষ্যদ্বাণী, তারই পদতলে একদিন নন্দ প্রাণভিক্ষা চাহিবে, সে ভিক্ষা সে দিবে না; কলির ব্রাহ্মণের তপস্যার শক্তি, কলির ব্রাহ্মণের প্রতিভার প্রভাব, কলির ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞার বল, সেই দিন নন্দ বুঝিবে। এই অভিশাপ-বাণীকে সফল করিতে যে যে ঘটনার প্রয়োজন, নাট্যকার ইহার পর হইতেই এই নাটকে তাহারই আয়োজন করিয়াছেন।

—————

(ক্রমশঃ)

যথাস্থান *

[শ্রীদেবেন্দ্রমোহন লাহিড়ী এম্-এ]

কোন্ হাটে তুই বিকাতে চাস্ বাঙালী সন্তান,
কোন্‌খানে তোর স্থান?
ভাগ্যলক্ষ্মী থাকেন যেথা যে সব জাতির মাঝে,
জীবনব্যাপি যে সব জাতি লিপ্ত দেশের কাজে;
চল্‌ছে যেথায় আদান প্রদান সকল জাতির সাথে,
বাণিজ্য যার জগৎ জুড়ে সদাই দিবস রাতে;
পয়সা কড়ি আছে মেলাই দরিদ্রতা-নাশন,
তারি মধ্যে একটা প্রান্তে পেতে চাস্ কি আসন?
সন্তান তায় গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে।
কোন্ হাটে তুই বিকাতে চাস্ বাংলা দেশের ছেলে,
কোথায় কি ধন পেলে?
সড়্‌কি হাতে ঘোড়ার পিঠে আরব বেদুইন
মরুর মাঝে বেড়ায় যেমন ভাবনা ভয় হীন;
অথবা কোন্ বীরের ছেলে মায়ের আঁচল ছেড়ে
পৃথিবীটাই ঘুরে আসে উড়ো জাহাজ চ'ড়ে;
কিম্বা কোন সব্‌মেরিণে অতল জলের নীচে
যা' না কেন, মরবি না'ক, থাক্‌বি রে তুই বেঁচে!
বাংলা দেশের ছেলে শুনি মর্ম্মরিয়া কহে
নহে, নহে, নহে।
কোন্ হাটে তুই বিকাতে চাস্ ওরে বাছাধন,
কোথায় যেতে মন?
গ্রামের ছোট কুটীর ত্যজি নগর কোঠা বাড়ী
বিজ্‌লী পাখার হাওয়া খাবি তালের পাখা ছাড়ি,
ঘি দুধের আর দেখ্‌বি না মুখ, সে গুড়েতে বালি,
সহর মাঝে খাবি কেবল ধুলো ধোঁয়া কালি,
দীঘির জলে শীতল দেহ আর না হবে কভু,
এমন সহর মাঝে কিরে চাস্ কি হতে বাবু?
সন্তান সে কথা শুনি রহে দ্বিধা ভরে,
যাব বাঁধ ক'রে।
কোন্ হাটে তুই বিকাতে চাস্ বাঙালী সন্তান,
কোন্‌খানে তোর স্থান?
নবীন ছাত্র আছে পড়ে মেসের একটা ঘরে,
মনটা কিন্তু কোথা থেকে কোন্‌দিকে যে ঘোরে!
শ্বশুর-কন্যা তরে তিনি ভাবেন অনুক্ষণ,
নাটক নভেল উজাড় করি খোঁজেন প্রেম-বচন,
চশ্‌মা আঁটা টেরি কাটা আতর এসেন্স্ ভরা,
এমন বাবুর পাশে কি তুই চাস্ রে যেতে ত্বরা?
যেমনি বলা অমনি শুনি' বাঙালী সন্তান
লোভে কম্পমান!
কোন্ হাটে তুই বিকাতে চাস্ বাঙালী সন্তান
কোন্‌খানে তোর স্থান?
পাষাণ ঘেরা আফিস ঘরে আছেন তাঁরা বেশ,
কেরাণী যে কত হাজার নাইক তাহার শেষ!
শুষ্ক বদন, সবাই নীরব, কেউ তোলে না মাথা,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল লিখ্‌ছে বসে খাতা;
ভৃত্য মত নিত্য সেথায় হাজির হওয়া চাই,
তিরিশ টাকার দক্ষিণাতে ছুট্‌বি রে সেই ঠাঁই?
হঠাৎ কহে উচ্ছ্বসিয়া বাঙালী সন্তান—
সেইখানে মোর স্থান।

—————

* রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে।

আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২৪শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [উনচত্বারিংশ সপ্তাহ

একবিংশ-শতাব্দী-নারী-চরিতম্
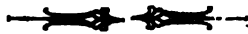
বিগত বিংশ শতাব্দী-পর্য্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ লোকের ধারণা ছিল, আমরা অবলা। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মূঢ়মতি নরগণ নারীদের উপর কি ভীষণ অত্যাচার অবিচার সকল না করিয়াছে ? নির্জ্জীব,নিশ্চল জড় পদার্থের মত তাহাদের ঘরের মধ্যে গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছে ; রান্নাঘরের অন্ধকারে বন্ধ করিয়া চোখ দিয়া অহর্নিশি অশ্রু বহাইয়াছে ; তাহাদের দিয়া বংশের আবাদ করাইয়াছে, ছেলে মানুষ করাইয়াছে,— অত্যাচারী মানব এতদূর করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাদিগকে দস্যুর মত বকিয়াছে, মারিয়াছে, দাঁত খিঁচাইয়াছে। স্ত্রীদিগকে ঘরের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া নিজেরা থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখিয়া বেড়াইয়াছে ; আড্ডা দিয়াছে ; দেশভ্রমণ করিয়াছে।

অবলা ! তাই দুইবেলা দু'টা ভাত ফেলিয়া দিয়াই পুরুষরা নিশ্চিন্ত থাকিত। অবলা—পাঁচবার নাক নাড়া, মুখ ঝামড়া দিয়া দুইটা জামা, দুইখানা গহনা দিয়াই গলদঘর্ম্ম হইয়া যাইত। অবলা, রাস্তায় বাক্স পেঁটরার মত বন্ধ করিয়া গাড়ীর ভিতর চাপাইয়া দিত। অবলা—তাই রেলগাড়ীতে উঠিবার সময় পোষা কুকুরের মত আমাদের পিছাইয়া দিয়া নিজেরা আগে আগে চলিত ; আমরা যদি একটু জোরে চলিয়াছি, একটু চক্ষু চাহিয়া চলিয়াছি, অমনি ফোঁস— কুলনাশিনী। চক্ষু মুদিয়া যদি চলি, হোঁচট খাই—অমনি দন্তকম্পন ;—জানোয়ার !—কাহারো গায়ে ধাক্কা লাগে,— ব্যস্, কলঙ্কিনী, জাতের দফা রফা !

"অবলা ! তোমরা অবলা, আমরা তোমাদের খাওয়াইব,

পরাঙ্মুখ, রক্ষা করিব। তোমরা নিজের হাতে কিছুই করিবে না,! কেবল সামান্য এই কয়টি কার্য্য ছাড়া—ভাত রাঁধা, বাসন জুতায় কালী দেওয়া; ছেলেকে তেল মাখান, স্নান করান, ভাত খাওয়ান, ঘুম পাড়ান; রাত্রে যতক্ষণ না আমাদের

তাই আমরা স্থির করিলাম, মুদ্গর ভাঁজিতেই হইবে,
নতুবা—বল সঞ্চিত হইবে না; অবলা নাম ঘুচিবে না।

মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা করা ও তোলা, রৌদ্রে দেওয়া, কাচা, ঝাড়া; আমাদের পদসেবা করা, মাথার পাকা চুল তোলা, কর্ণের খইল বাহির করা, ভৃত্যের অনুপস্থিতিকালে নিদ্রাকর্ষণ হয়,ততক্ষণ শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ভক্তিগদগদচিত্তে তালপাতার পাখাখানি মৃদুমন্দ ভাবে নাড়া— মাত্র এই সামান্য কাজ কয়টির ভার তোমাদের দিলাম; বাকী সমস্তই আমরা করিব।

যদি প্রশ্ন করা হইত, যে এই সামান্য কাজ কয়টির ভার কি আমাদের না দিলেই চলিত না? তাহার উত্তর এই শুনিতাম যে—চলিত, কিন্তু পাছে অকর্ম্মা বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া তোমাদের দেহে বাতাশ্রয় করে; চলাচলের অভাবে দেহ যন্ত্রাদিতে মরিচা পড়ে, জং ধরিয়া যায়, তাই এই সামান্য অনায়াসসাধ্য কাজ কয়টির ভার তোমাদের উপর ন্যস্ত হইল; যেহেতু তোমরা—অবলা! এবং তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা আমরা!

পরে স্থির করিলাম, গুড়্‌গুড়িতে তামাক খাইতেই হইবে। 'মোটা তাকিয়ায় দিয়ে ঠেশ'—জিনিষটি ত বেশ——
যেন ঘুম পাড়িয়ে দেয়। উঃ স্বার্থপর পুরুষজাতি একটা
মহা সুখ হইতে আমাদের বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল।

অবলা! অবলা!! অবলা!!! শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালাপালা! হাড়কালী মাস কালী হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু

ভো ভো অবলা-রক্ষক নরগণ, শুনিয়া রাখ, বিংশ শতাব্দীর শেষ দিনে অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এক মহা প্রলয় হইয়া গিয়াছে। আর তোমাদের অবলা রক্ষা করিবার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না; ব্রহ্মার বরে আমরা সবলা হইয়াছি; এখন হইতে আমাদের নিজেদের এবং আমাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি রক্ষার ভার (স্মরণ রাখিও তোমরা অস্থাবর সম্পত্তি-পর্য্যায়ভুক্ত) আমরা নিজেরাই গ্রহণ করিয়াছি—এতদ্বারা তোমাদের জানাইয়া দেওয়া হইল। আশা করা যায় যে অতঃপর তোমরা ভবিষ্যতে নারী অবলা এবং পুরুষ তাহার রক্ষাকর্ত্তা,

ওল্ড লিভ্ এ ষ্টোন অনটর্ণড্!—কেরাণী?—কেরাণী কি হাতী ঘোড়া? ফুঃ—
পুঁটি মাছ, পুঁটি মাছ! এতদিন করিনি—তাই!

দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা—এ ভ্রান্ত বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করিয়া মূঢ়তার পরিচয় দিবে না।

আমরা স্বয়ং সমস্ত ভার গ্রহণ করায় তোমাদের কিছু কিছু হইতে জমিদার স্বয়ং যখন জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন; খোট্টা চাকরের নিকট হইতে গৃহস্থ স্বয়ং যখন দৈনিক বাজারের ভার তুলিয়া লয়েন; মেসের বাসার বাবুরা যখন

বিকেলটা যদিও হায়—হাইটা তুলেই কেটে যায়,
সন্ধ্যেয় একটু হাওয়া ভিন্ন প্রাণটা আর বাঁচে কৈ ?

অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে সত্য কিন্তু কি করিব— নাচার! পৃথিবীর নিয়মই এই। দেখনা, নায়েব-গোমস্তার হাত ভাঁড়ারের চাবী নিজেরাই রাখিতে আরম্ভ করেন, তখন কাহার-কাহার অসুবিধা ত কিছু হয়ই; তাই বলিয়া কোন্

মনিব খেয়ালে স্বীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়! যদি কেহ দেয়, তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় কি? কখনই নহে। কোন

না, দিব না!

প্রথমতঃ তোমাদের গড়গড়ার একাধিপত্য লুপ্ত হইয়াছে।

"ইউ ফুল্—জোরে নিঃশ্বেস টান।"

—শুধু মিড-ওয়াইফ্‌রি নয়, মস্তর মত ডাক্তারী।

ডক্টর মিষ্টার কদমমণি চট্টোপাধ্যায় এম্-বি!

সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই নিজ স্বার্থ বিসর্জন দেয় না। আমরাই বা কেন দিব?

ছড়ির একেশ্বরত্ব আর তোমাদের নাই! আমাদের বহুকষ্টের বহু অশ্রু-ভেজা রাঁধা-ভাত খাইয়া আফিসে কেরাণীগিরি করিতে

তোমরা বড়ই বড়াই করিতে, এখন হইতে তোমরা রাঁধিবে, আফিস করিতে হয়, কলম পিসিতে হয়, আমরা পিসিব।

পর্দানশীন—আমরা নই, এখন তোমরা।

সাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া—সে'ও আমরা করিব। তোমরা ক'নে দেখিতে গিয়া আমাদের বড় কষ্ট দিতে, এখন হইতে আমরা বর দেখিতে যাইব। সন্ধ্যা বেলায় ফুটফুটে বাবু সাজিয়া উর্দ্ধনেত্র হইয়া তোমরা বায়ু সেবন করিতে বাহির হইতে, কিন্তু না; আর তাহা হইবে না; এখন হইতে সান্ধ্যভ্রমণ আমরা করিব। তোমরা সেই অবসরে রিয়াসা করিয়া

রাখিবে ; খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া, ঘুম পাড়াইবে। তোমরা পুরুষ-রূপ অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বিজয়-গর্বে আমাদের বিবাহ করিয়া কাপড়ে গাঁটছড়া লাগাইয়া হড় হড় গৃহে ফিরিব। পথে দেখিবে, ডাক্তার আমরা, পুলিশ

বর-দেখা

"আর সব ঠিক হয়েছে। কেবল ও রকম চুল ছাঁটলে তোমার বাবু বিয়ে হওয়া শক্ত।"

করিয়া টানিয়া আনিতে, যেন একটা রাজ্য জয় করিয়া চলিয়াছ, কিম্বা ছাগলী কিনিয়া আসিতেছ ; কিন্তু না হে না, বর্তমানে আর তাহা হইবে না। এখন হইতে আমরাই

আমরা ; ঘাটে দেখিবে, মৎস-হন্তা আমরা ; মাঠে দেখিবে, কুস্তিগীর আমরা ! যদি দেখিতে কষ্ট হয়, সহিতে প্রাণ যায়-যায় হয়, তবে রাস্তায় হাঁটিয়া বাহির হইও না, গাড়ীর দরজা

বন্ধ করিয়া চলিও, আমরা তোমাদের ড্রাইভ করিয়া লইয়া যাইব। গরুর গাড়ী যেমন তেরপল চাপা দিয়া পাটের বস্তা লইয়া যায়—তেমনিভাবে তোমাদের বহন করিয়া লইয়া যাওয়া যাইবে। ইহাই ভবিতব্য, বিধাতার বিধান! ইহারই নাম—একবিংশ শতাব্দীর নারী-সাম্রাজ্যম্! —

ইয়েস, ভাটস্ লাইক এ গুড্ বয়।

—হাঁ, ইহাই ঠিক সুবোধ বালকের মত।

(এখনো অনেক বাকী)

গৌরী

(গল্প)

[শ্রীসুষমা সেন গুপ্তা]

— ১ —

বেলা প্রায় আটটার সময় গৃহিণী ঠাকুরাণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন। উপরের বারান্দা হইতে নীচের তলার একটা ঘরের রুদ্ধ দুয়ারের দিকে চোখ পড়িতেই তাঁহার মেজাজ চড়িয়া গেল। গলাটাকে সপ্তমে চড়াইয়া তিনি হাঁক দিলেন "বলি ওগো গৌরীরাণী, আজ কি আর নিদ্রাভঙ্গ হবে না? পূবের সূর্য্যি যে পশ্চিমে ঢলে পড়বার যো হল গো, বা-ব্বা, আমাদের গেরস্ত ঘরে কি আর এত ঘুম পোষায়, তাও যদি বুঝতুম যে দশটা চাকর চাকরাণী আছে, তবু বোঝা যেত। তা তোর যদি রাজ-ঐশ্বিয্যিই ছিল, রাজার হালেই থাকা অভ্যেস, তবে আমাদের গরীবের ঘরে আসবারই বা কি দরকার ছিল? এত বাবুয়ানা ত আর আমাদের পোষাবে না, তা এখন যাই বল বাছা।"

দরজার দিকে উদ্দেশ করিয়া গৃহিণী এতগুলি কথা বলিয়া গেলেন কিন্তু ভিতর হইতে কোনরূপ সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ইহাতে তাঁহার রাগ যেন আরো বাড়িয়া চলিল। পুনরায় নূতন উদ্যমে বাক্যবাণ-বর্ষণ করিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময় নীচে নেত্য ঝিকে দেখিয়া বাধা পড়িল, তাহাকে কহিলেন "হ্যাঁলা নেত্য, দেখ্ দেখি নবাব-নন্দিনীর আজ হ'ল কি? এখনো যে দোরই খোলা হয় নি।"

নেত্য গিয়া এক ধাক্কা দিতেই দরজা খুলিয়া গেল, ভিতরে একবার চোখ বুলাইয়া সে উপরের দিকে তাকাইয়া বলিল "গৌরী ত ভেতরে নেই মা।"

"ভেতরে নেই, ত কোন চুলোর দোরে গেছে, দেখ্ ত; এই যে তখন থেকে ডেকে ডেকে গলা চিরে যাবার জোগাড় হল, তা না পেলাম একঘটি মুখ ধোবার জল, না একখানা গামছা; এদিকে ছেলেটা যে কেঁদে মল, তারই বা দুধ জাল [illegible] ? তা আমিও ত বাছা একটা মানুষ, একা আর ক'দিক সামাল দি বলত? মানুষের শরীর ত বটে, তা আছিস্ যখন, তখন যদি এক আধটুকু এসব দিকে না আসিস্, বসে বসে কেবল সেই রাজ-ঐশ্বিয্যির স্বপ্নই দেখিস, তবে আমারো ত আর শরীরে কুলোয় না বাপু! কেবল গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে; বা-ব্বাঃ সোমত্ত বয়সের মেয়ে একটু কাজে ভিড়তে চাইবে না, এমন তো কখন দেখি নি গো!"

আপন মনে গৃহিণী বকিয়া যাইতেছেন, ইতিমধ্যে ঝি উপর নীচে এঘর সেঘর, কলতলা চারিদিক ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, "না মা, তাকে ত দেখছু না।"

এতক্ষণে যেন গৃহিণীর রাগের ঝোঁকটা থামিল, তিনি কহিলেন "সে কি লা, ভাল করে দেখেছিস্?"

"হ্যাঁ মা, আর কোত্থাও বাকী নেই।"

এবার গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার বিশাল বপু উত্তোলন করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে, একবার উপরে একবার নীচে এঘরে সেঘরে দেখিয়া একেবারে বাহিরের ঘরে যেখানে কর্ত্তা বসিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন—"হ্যাঁগা, এমনি করেই কি মানুষের সর্ব্বনাশ করতে হয়? এমনি করেই কি শত্রুতা সাধতে হয়? ওমা, আমি কোথায় যাব গো, লোকের কাছে মাথা তুলবার ত আর ঠাঁই রইল না গো—দুধ দিয়ে কি কালসাপ পুষেছিলুম গো, এমনি করেই আমার কুল, মান সব নষ্ট করলে গো!" গৃহিণীর ক্রন্দনের স্বর ক্রমশঃই উচ্চে উঠিতে লাগিল। কর্ত্তা ত ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া উঠিয়া গিয়া বাহিরের দরজাটা বন্ধ করিয়া হতভম্বের মত বসিয়া রহিলেন। শেষে অনেক কষ্টে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথাবার্ত্তা ও কান্নাকাটির ভিতর হইতে আসল কথাটা বাহির করিতে পারিলেন। তিনি ধীরে গৃহিণীর গায়ে হাত রাখিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তা এত অস্থির হয়ো না, চুপ কর, আমি তাকে খুঁজে আনছি,"

এই বলিয়া আলনা হইতে ছাতা ও চাদরটা লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

দশজনে কি বলিবে এই ভয়ে ভীতা ও দশজনের কাছ হইতে কথাটা লুকাইবার জন্ম গৃহিণীর উচ্চ কলরোলে ক্রমে পাড়ার প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধার দল একে একে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই গৃহিণীর দুঃখে ব্যথিত হইলেন, তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, এবং সকলেই একবাক্যে প্রকাশ করিলেন যে অল্প বয়সের অমন রূপের-ডালি-মেয়ে ঘরে রাখাও যা স্বহস্তে আপনার ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়াও তা, এবং এরূপ যে একটা কিছু হইবে তাহা সকলেই আগে হইতেই কতকটা আঁচ করিয়াছিলেন। সেই সভায় ক্রমে গৌরীর আরো অনেক দোষ ধরা পড়িল, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরে সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে দেখা গেল যে গৌরী বরাবরই বড়ই অস্থিরমতি, কাজে তাহার কোনদিনই মন নাই। কাজ করিতে করিতে বার বার সে দৌড়াইয়া বাহিরে যায়, প্রায়ই তাহাকে সকলে ছাদে কিম্বা জানালায় অঙ্গভঙ্গী সহকারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছে ইত্যাদি। পাশের বাড়ীর বিন্দুঠাকুরাণী বলিলেন, "দেখ দিদি, তোমায় বলব বলব করি, ভুল হয়ে যায় রোজ, আগে যদি বলতাম, তবে বোধ হয় আর এমন হত না গো। সেদিন আমি তোমার এখান থেকে যাচ্ছি দুপুর বেলা, হঠাৎ দেখি গৌরী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, তার চোখ বরাবর চেয়ে দেখি রাস্তার ওধারে দাঁড়িয়ে এক ছোঁড়া, মুচ্‌কে হাসছে, আমায় সেদিকে তাকাতে দেখে গৌরী সরে গেল।" ঘোষেদের বড়গিন্নী বলিলেন "আচ্ছা ছোঁড়াটা দেখতে ফর্শা, বেশ পালোয়ান না?" বিন্দুঠাকুরাণী প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিতেই ঘোষেদের বড়গিন্নী বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও ত তাকে ক'দিন এখান দিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।" ক্রমে প্রকাশ পাইল যে অনেকেই সে ছেলেটিকে এখান দিয়া ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছেন।

গৃহিণী ঠাকুরাণী ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া চোখ হইতে একফোঁটা জল মুছিয়া ফেলিয়া ভগ্নস্বরে কহিলেন, "আমার কি ছাই পেটে অতবুদ্ধি, নইলে সেদিন দুপুর রাত্তিরে গরমে, কর্ত্তা এক গেলাস জল খেতে চাইলেন, ওপরে গেলাস ছিল না, মনে করলুম গৌরীকে একটা গেলাস আনতে বলি গে, তা দেখি, পোড়ারমুখী ঘরে নেই! আমার ভাই—সাদা মনে কাদা নেই,—মনে করলুম বুঝি বা বাইরে গেছে, নইলে তখন থেকে সাবধান হলে কি আর এই হত?"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "ওমা, এতদূর? তবে আর না বেরিয়ে গিয়ে উপায় কি গো? ঘরে থাকবার হলে ত ঘরে থাকবে? যাই বল ভদ্দর লোকের বাড়ী ত, বাড়ীতে বসে এসব অনাচ্ছিষ্টি কাণ্ড আর কতদিনই চলতে পারে? তুমি তাই, আবার খোঁজ করতে লোক পাঠিয়েছ, আমরা হলে এমন মেয়েকে আর চৌকাট মাড়াতে দিতুম না।"

গৃহিণী পুনরায় ভগ্নস্বরে কহিলেন—যাই বল ভাই, পেলে ত বড় করেছি, ও আমার পেটের মেয়েরই মত, যদি উপায় থাকে তবে একটা প্রাচিত্তির করিয়ে ঘরে তুলব, তাছাড়া আর উপায় কি বল? তা দেখ, এমনটা কখনো হ'তো না, মাস্তা আবার মেয়ের নামে কিছু শুনবেন না, কিছু বলতে গেলে বলেন—দেখ, স্বর্ণরই ত মেয়ে, ওর নামে আমার নিজে চক্ষে দেখলেও বিশ্বাস হবে না, এখন বল ত? বিশ্বাসটা ত খুব রাখলে আদরের ভাগ্নি: সবই আমার পোড়াকপাল দিদি, আমার পোড়াকপাল নইলে নিজের পেটে পাঁচটা মেয়ে ধরেছি, কই তাদের ত কোন লেঠা নেই, এ এক পরের দায় ঘাড়ে করে আজন্ম ঘুরে বেড়াই আর কি, এত কি আর এ বয়সে সয়?

ক্রমে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় মজলিস্ ভাঙ্গিল। রমণীগণ যে যাহার ঘরে প্রস্থান করিলে গৃহিণী উঠিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সন্ধ্যার সময় কর্ত্তা বাড়ী ফিরিলেন। সারাদিন পথশ্রমে ক্লান্ত, গা দিয়া ঘাম ঝরিতেছে, মুখচোখ কালীবর্ণ, মাথায় হাত দিয়া তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণী একখানা পাখা হাতে করিয়া নিকটে আসিতে তিনি কষ্টে কহিলেন "দেখ স্বর্ণর এত দুঃখের এত আদরের মেয়েটাকে রাখতে পারলাম না, স্বর্গে থেকে সে নিশ্চয় আমায় অভিশাপ দিচ্ছে। আর দেখ গৌরীকেই যদি অসতী বলে ভাবতে হয় তবে সংসারে কাকে যে বিশ্বাস করব তা জানি না।"

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন "না এখনো বিশ্বাস করো না,

অসতী বলে বিশ্বাস কর আমাকে আর কি ? বলি তোমার মুখে চিরদিনের জন্ম চুণকালী ঢেলে, তোমার মানের মাথায় লাথি মেরে যে সচ্ছন্দে চলে যেতে পারল, তার জন্ম আবার এত দুঃখ কিসের ? এস, নেয়ে খেতে এসো।” কালীমুখ আরো অন্ধকার করিয়া কর্ত্তা ধীরে ধীরে উঠিয়া ভিতরে গেলেন।

(২)

এখন পূর্ব্বের কথাটা একটু বলা দরকার।

গৌরীর মাতা স্বর্ণময়ী ছিলেন যদুনাথ বাবুর বৈমাত্রেয় ভগিনী। যদুনাথ বাবুর পিতা চন্দ্রনাথ বাবুর জলপাইগুড়িতে মস্তবড় চা বাগান ছিল। যদুনাথ তাঁহার আগের পক্ষের একমাত্র পুত্র, শেষ পক্ষে বেশী বয়সে যদুনাথের মাতার মৃত্যুর পর তিনি আবার বিবাহ করেন। স্বর্ণময়ীর মাতা অতিশয় চতুরা রমণী ছিলেন এবং অসামান্যা রূপসী ছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে চন্দ্রনাথ তাঁহার হাতে উঠিতেন বসিতেন। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা হইল, দেখিতে ঠিক মায়ের মত সোনার বরণ হওয়াতে মাতা আদর করিয়া নাম রাখিলেন “স্বর্ণময়ী”। স্বর্ণের মা যদুনাথকে বড় আন্তরিক ভালোবাসিতেন না কিন্তু ভাই-বোনে খুব ভালবাসা হইয়া গেল। যদুনাথ স্বর্ণকে একদণ্ড চক্ষের আড়াল হইতে দিতেন না। পুত্র না হইলেও স্বর্ণর মাতা দমিবার পাত্রী ছিলেন না, তিনি স্বামী বাঁচিয়া থাকিতেই স্বর্ণকে দশবৎসর বয়সে বিবাহ দিয়া ঘরজামাই রাখিলেন ও মেয়ের নামে অর্দ্ধেক সম্পত্তি লিখাইয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহার এত হিসাব নিকাশ ভগবানের কাছে টিঁকিল না। স্বর্ণর বিবাহের দুইবৎসর পরই যদুনাথের বিবাহ হইল। তাহার একমাসের মধ্যে স্বর্ণর মাতার কাল হইল। যদুনাথের পত্নী অন্নদাদেবী ঘরে পা দিয়াই স্বর্ণকে বিষনজরে দেখিলেন। খুঁটিনাটি নানা ব্যাপারে স্বর্ণর সঙ্গে তাঁহার গোলমাল লাগিয়াই থাকিত। শেষে ব্যাপার মন্দ বুঝিয়া চন্দ্রনাথ বাবু জামাতাকে জলপাইগুড়িতেই ভিন্ন বাসা করিয়া দিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই চন্দ্রনাথ বাবুর মৃত্যু হইল। স্বর্ণর স্বামীর তখন মাত্র ২০বৎসর বয়স। এই বয়সে এত টাকা পয়সা হাতে পাইয়া সে দুহাতে উড়াইতে লাগিল ও অকালে একমাত্র কন্যা গৌরীকে রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

যদুনাথ ভগিনীর দুঃখে অতি ব্যথিত হইলেন, ভগিনীকে নিকটে আনিয়া রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু স্বর্ণ কিছুতেই রাজি হইলেন না। এদিকে অন্নদাসুন্দরীও সোমত্ত বয়সের বিধবা মাগী ঘরে রাখিতে রাজি নন্, এমন কি তিনি যদুনাথ বাবুকে পর্য্যন্ত এ বিষয়ে ইঙ্গিত করিতে ছাড়িলেন না, যে হ'লো বা ভাইবোন্, এক মায়ের পেটের ত নয়, পুরুষ মানুষের বিশ্বাস নেই। যদুনাথ লোকটি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির, তিনি আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। অতুল ঐশ্বর্য্যে, পরম আদরে লালিতা স্বর্ণ দারুণ দুঃখ কষ্ট সহিয়া গৌরীকে দশবৎসরের করিলেন কিন্তু তাঁহার দেহে আর সহ্য হইল না, নিজে প্রাণ থাকিতে স্বীকার না হইলেও মরণের সময় দাদাকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে কন্যাকে সঁপিয়া দিয়া তিনি চিরদিনের তরে চক্ষু মুদিলেন। সেই অবধি গৌরী যদুনাথের সংসারে।

যদুনাথ তাহাকে কন্যার অধিক স্নেহ করিতেন, সর্ব্বদা নিজের কাছে কাছে রাখিতেন, গৌরীও তাহার ক্ষুদ্র সাধ্যানুসারে মাতুলের যত্ন করিত। মাতুলানীর কিন্তু এত সহ্য হইত না, তিনি সময়ে অসময়ে বাক্যবাণে মামা ভাগিনীকে বিদ্ধ করিতেন। উভয়েই নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইত।

এমন সময় যদুনাথের কনিষ্ঠ পুত্রের ম্যালেরিয়া হইল। জলপাইগুড়িতে যথেষ্ট চিকিৎসা হইল, চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিলেন এস্থান হইতে না গেলে সারিবে না। অগত্যা যদুবাবু কলিকাতায় সহরের কোলাহল হইতে দূরে, নারিকেলডাঙ্গায় একখানা ভাল বাড়ী ভাড়া করিয়া পরিবার সেখানে রাখিয়া দিলেন। ক্রমে পুত্রের অসুখ সারিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের বয়স হইল, কলিকাতায় থাকিয়াই সম্বন্ধাদি করিতে সুবিধা, কাজেই আর কিছুদিন কলিকাতাতেই তাঁহারা রহিয়া গেলেন। যদুনাথ জলপাইগুড়িতেই রহিলেন, মাঝে মাঝে কলিকাতা আসিয়া দুই চারিদিন থাকিয়া যাইতেন।

কলিকাতা আসিয়া মামার অসাক্ষাতে এবার গৌরীর শিক্ষা আরম্ভ হইল। মাতুলানী তাঁহাকে কথায় কথায় বুঝাইয়া দিতেন যে দশ বৎসর বয়সটা কম নহে এবং এ বয়সে তাঁহারা কত কাজ কর্ম্ম করিতেন, এখন যখন গৌরীর পিতা মাতা অবর্ত্তমান, তখন তাঁহাকেই তাহার বিবাহের চিন্তা করিতে হইবে। মেয়েমানুষের চিরজীবন পরের ভাতে,

সুতরাং বসিয়া কাটাইলে তাহার চলিবে কেন? কাজেই তাহারই পরকাল চিন্তা করিয়া তিনি দশ বৎসরের বালিকাকে নির্ম্মমভাবে দিনরাত খাটাইতেন, আপনার শিশু পুত্রটিকে সর্ব্বদা তাহার কোলে দিয়া রাখিতেন, নিজে নড়িয়াও বসিতে চাহিতেন না, আর যত ফরমাইস্ ঐ বালিকার উপর দিয়াই চলিত। নীরবে বালিকা সকল নির্য্যাতন সহ্য করিত, আর মাঝে মাঝে মায়ের কথা মনে করিয়া চক্ষের জল ফেলিত। মামাবাবু যে ক'দিন আসিয়া থাকিতেন সে কয়দিন পীড়নটা একটু কম হইত।

* * * *

এইরূপে চারি বছর কাটিয়া গেল। অবশেষে গৌরী যখন চতুর্দ্দশবর্ষীয়া, তখন হঠাৎ গৌরীর একটা খুব ভাল সম্বন্ধ জুটিয়া গেল। পাত্রটি পশ্চিমে এক সহরে ডাক্তারি করে, দেখিতে শুনিতে ভাল, গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র রমেশের সঙ্গে সে মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে আসিয়াছে এবং রমেশের মুখে গৌরীর শতমুখী প্রশংসা শুনিয়া নিজে যদুনাথ বাবুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছে। সেই পত্র যদুনাথ গৃহিণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক আনন্দ প্রকাশও করিলেন। অন্নদাঠাকুরাণী কিন্তু বড় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহার দ্বিতীয় কন্যা গৌরীর একবয়সী, তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেই ত হইত! তিনি ভাবিলেন এ সকলই যদুনাথের কারসাজি। রমেশের উপরও তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন। আপন ভগিনীকে ফেলিয়া পরের উপর কেন এত দরদ বাবা?

কিন্তু সকলপ্রকার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ হইয়া গেল। দেবতুল্য স্বামী পাইয়া গৌরী ধন্য হইল। সে প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিত, স্বামীও যখনই সময় পাইত গৌরীর এটা ওটা কাজকর্ম্ম করিয়া দিত, তাহাকে নানা দেশের মেয়েদের গল্প করিত, একটু আধটু লেখাপড়া শিখাইত, নানাপ্রকারের আদর যত্ন করিত।

এইরূপে দুইবৎসর কাটিয়া গেল। এ দুই বৎসরে গৌরীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। মামীমা খাটাইয়া খাটাইয়া তাহার শরীরটাকে কষ্ট সহিষ্ণু ও সকল রকম কাজের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন কিন্তু অন্তর তাহার নিদ্রিত ছিল। স্বামীর নিকট মুক্তির আস্বাদ পাইয়া, জ্ঞানের আলোকের সন্ধান পাইয়া তাহার প্রাণে নূতন আশা, উৎসাহ ও কর্ম্মের অনুপ্রেরণা আসিল। ইতিমধ্যে সে একবার স্বামীর সহিত গিয়া দিন দশেক কলিকাতা থাকিয়া আসিয়াছিল, এবার কিন্তু মামীমার ব্যবহার অন্যরূপ হইয়াছিল।

কিন্তু ভগবান যাহার অদৃষ্টে দুঃখ লিখিয়াছেন তাহার সুখ আসিবে কোথা হইতে? হঠাৎ একদিন রোগী দেখিয়া আসিয়া গৌরীর স্বামীর অসুখ করিল। অসুখ ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। বিদেশে বিভুঁয়ে ভয় পাইয়া গৌরী মামাবাবুকে টেলিগ্রাফ করিল। যদুনাথ আসিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, যদুনাথের হাতে গৌরীকে তুলিয়া দিয়া গৌরীর স্বামী চিরদিনের মত চক্ষু বুঁজিলেন। মরণের পূর্ব্বে গৌরীর হাত ধরিয়া বলিয়া গেলেন, "দেখ, তোমাকে এ দুবছর যা শিক্ষা দিয়েছি তাতেই বোধহয় তুমি নিজের মান রেখে চলতে পারবে। মনে বড় দুঃখ রয়ে গেল, যে তোমায় একেবারেই অসহায় করে রেখে গেলাম। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রো যেন পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে না হয়—এই আমার শেষ ইচ্ছা।"

দ্বিতীয়বার যদুনাথ গৌরীকে লইয়া আসিলেন, এবার একেবারেই লইয়া আসিলেন। শ্বশুরকুলে গৌরীর কেহই ছিল না এবং স্বামীও নূতন ডাক্তারীতে বসিয়াছিলেন, যাহা পাইতেন সংসার খরচেই ব্যয় হইয়া যাইত, উদ্বৃত্ত কিছুই থাকিত না, কাজেই গৌরী এবার যখন ফিরিল তখন সে একেবারেই নিঃসম্বল নিঃসহায়া—তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে আশা করিবারও কিছু রহিল না। মামীমার অত্যাচার এবার দ্বিগুণতর বেগে আরম্ভ হইল, তিনি উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে তাহাকে অশেষরূপে নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আগের গৌরীর সঙ্গে এখনকার গৌরীর তফাৎ হইয়া গিয়াছিল। গৌরী এখনও সেইরূপ ধৈর্য্যশীলা সহিষ্ণু ছিল, অত্যাচার গঞ্জনা সে তেমনি নীরবে সহ্য করিয়া যাইত কিন্তু প্রভেদ ঘটিয়াছিল অন্তরে। বালিকা গৌরী সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত, যখন অসহ্য হইত শুধু দুঃখে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিত, কিন্তু তখন সে জানিত যে ইহা

হইতে পালাইবার একমাত্র পথ বিবাহ ভিন্ন আর কিছু নাই, কিন্তু এখন ? তাহার ভিতরটা রুদ্ধ আক্রোশে শুধু গর্জ্জিয়া উঠিত, প্রাণপণ বলে সে তাহা দমন করিত। মুক্তির আস্বাদ সে একবার পাইয়াছিল, তাই আর বাঁধন তাহার কিছুতেই সহ্য হইতেছিল না। তাহার মনে হইত তাহার স্বামীর শেষ কথাগুলি, সে ভাবিত হয় ত বা সে গলগ্রহ বলিয়াই মামীমার এ বিরক্তি। সে যদি মামীকে কতকটা আর্থিক সাহায্য করিতে পারে তবে—তবে হয়ত তিনি খুসী হইবেন। এ সম্বন্ধে সে স্বামীর নিকট হইতে কতকগুলি নির্দ্দেশ পাইয়াছিল, কিরূপে নারীরা গৃহে বসিয়া কিছু কিছু রোজগার করিতে পারে। তাই সে একদিন অবসর সময়ে মামীর নিকট গিয়া বলিল,—মামী-মা, আমি ত রোজই কতকটা সময় অবসর পাই— সে সময়টা যদি পাড়ার মেয়েদের জামা সেমিজ কিছু কিছু তৈরী করে দি, তবে কিছু পয়সাও রোজগার করা যায়।"

মামী একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, "কেন বাছা, পয়সা রোজগার করবার জন্যই বা অত ব্যস্ত কেন ? এখানে কি আর তোমার একবেলা দুটি ভাত জুটবে না নাকি—সেজন্যই পয়সা দিতে হবে ? তা ছাড়া বয়সের মেয়ে, তোমার হাতে পয়সা দিয়ে কি কাজ বাপু, আর তুমি যদি লোকের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে সেলাই কর তবে তোমার মামার মানটাই বা থাকে কোথায় ? ওসব লোক-দেখানো সেকামো আমি ভালবাসি না। অতই যদি টাকা পয়সা নাড়বার চাড়বার সখ হয়ে থাকে, তবে অনেক পথই আছে, সেই খুঁজে নাও, লোকের কাছে আমাদের অপদস্থ করো না। বাবা গো বাবা, জন্মাবধি এত লোকের জন্য শুধু করেই এলুম, কিন্তু কারো কাছে একটু উপকারের প্রত্যাশা নেই, কেবল কিসে দশজনের কাছে আমাদের জব্দ করবে সেই ফন্দি,—যার যেমন কপাল আর কি !"

কি বলিতে কি, গৌরী ত অবাক হইয়া গেল। সেই অবধি সে আর মামীর নিকট এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিত না, কিন্তু যখনই সে অবসর পাইত তখনই বসিয়া কেবল তাহার স্বামীর মৃত্যুকালীন কথা, তাঁহার জীবিত কালের উপদেশ, শিক্ষা প্রভৃতির কথা ভাবিত। সে ভাবিত আপনার জীবনের কথা, এমনি করিয়াই কি তার জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে ? স্বামীর মুখে সে যে সব মহীয়সী নারীর কথা শুনিয়াছিল তাহাদের কথাই তার মনে পড়িত। সেই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা, কৃষক কন্যা জোয়ান অব্ আর্কের কথা, আর ভাবিত কেন সে তাহার জীবনটা এমনি ভাবেই ব্যর্থ হইতে দিবে ! এমন কি পাপ সে করিয়াছে যে জন্য তাহাকে আজীবন এই ভূতের বেগার খাটিয়া মরিতে হইবে ? মুখ বুঁজিয়া সে সকল রকম খাটুনি খাটিয়া যাইত, কিন্তু অন্তরের ভিতর তাহার দিবারাত্র কেবল এই সকল চিন্তাই তোলপাড় করিয়া উঠিত। এক একদিন রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাবিত, এই ত পথ সামনে রহিয়াছে, এই বিশাল জনস্রোতে গা ঢালিয়া কি ভাসিয়া পড়া যায় না ? মেমসাহেবরা ত কত একা একা যায় ইতর লোকেদের রমণীরা, হিন্দুস্থানী রমণীরা ত স্বচ্ছন্দে পথ বাহিয়া চলিয়া যায়, তবে সে কেন যাইতে পারে না ? তাহার রূপ আছে বটে কিন্তু মেম সাহেবরাও কি রূপসী নয় ? কিন্তু তাহার সে সাহস কই ? এই যে নিদারুণ পথের ভয়, যে পথ দিয়া অবিশ্রাম জনস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, সে পথে পা দিবার এই দারুণ আতঙ্ক, শত নির্য্যাতনের ভিতরও—এই যে সুনাম লাভের একটুকু শান্তি, এইজন্যই না তাহার আজ এই অসহায় অবস্থা ? সে বুঝিত যে এ গৃহের গণ্ডী পার না হইলে তাহার কোন আশা নাই, তা সে যেমন করিয়াই হউক।

মামাবাবুর কথা মনে হইলে তাহার একটু দুঃখ হইত, তিনি যে তাহাকে ভালবাসিতেন। গৃহিণীকে তিনি রীতিমত ভয় করিয়া চলিতেন, যদি বা গৌরীর অবিশ্রাম খাটুনি দেখিয়া তিনি মাঝে মাঝে কিছু বলিতেন, অমনি গৃহিণী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন, দেখ তোমরা পুরুষমানুষ, এ সবের কি বোঝ বলত ? এই বয়সের মেয়েকে, কখনো চুপ করে বসিয়ে রাখতে হয় ? তা'হলে যে মাথার মধ্যে শয়তানে বাসা বাঁধবে গো ! না হলে আমার কি আর সাধ যে ঐ কচি মেয়েকে দিনরাত অত খাটাই ? ওকি আর আমার মেয়ের চাইতে ভিন্ন ? কর্ত্তাও ভাবিতেন—বুঝি বা তাই !

একদিন গৌরী মামার ঘরে একটা বাংলা দৈনিক উল্টাইতে দেখিল বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় রহিয়াছে—

"উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএর জন্য একজন মেট্রন চাই। লেখাপড়া সাধারণ, উত্তম রন্ধন ও গৃহকর্ম জানা থাকা আবশ্যক। সাধারণ হিসাবপত্র রাখিতে পারা চাই।... দরখাস্ত করুন।"

বিজ্ঞাপনটি দেখিয়া গৌরীর প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাহার এরূপ বিদ্যা নাই যে সে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে। হাঁসপাতালে নার্স হইয়া রোগীসেবা করিতে তাহার খুবই ইচ্ছা করিত কিন্তু সে শুনিয়াছিল যে, এরূপভাবে রোগী শুশ্রূষা করা শুশ্রূষাকারিণীর পক্ষে বড় নিরাপদ নহে। কিন্তু এখানে ত সে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে। রন্ধন ও গৃহস্থালীর কাজকর্ম তাহার উত্তমরূপেই জানা আছে এবং স্কুল বোর্ডিংএর মত জায়গায় থাকিতে পাইলে তাহার ভিতরকার জ্ঞান-পিপাসাও কতক পরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিবে। সেখানে আপনার চরিত্র বজায় রাখিতেও কোন কষ্ট নাই, আর চিরজীবন কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের সংসর্গে থাকিলে প্রাণটাও তাজা থাকিবে। গৌরী যতই ভাবিতে লাগিল ততই তাহার কাছে এই কাজের সম্ভাবনা আনন্দ দিতে লাগিল ; কিন্তু এ পথে প্রধান অন্তরায় উপস্থিত হইল এই যে কি করিয়া সে আবেদন করিবে ? তাহার মত অজ্ঞাত-কুলশীলা নারীর পক্ষে কি শুধু আবেদনপত্রেই কাজ হইবে ? অধীর হৃদয়ে সে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শীঘ্রই সুযোগও ঘটিয়া গেল। দুইদিন পরে মামীমা একদিন ভোরে উঠিয়া পুত্রকন্যা লইয়া কালীঘাট গেলেন। গৌরীর মিষ্ট ব্যবহারে দাসদাসীগণ সকলেই তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিল, কাজেই সে মামীমা বাহির হইয়া গেলে পর বাড়ীর হিন্দুস্থানী চাকরটার হাতে একটা টাকা দিয়া কহিল—বাবা, আমায় একখানা গাড়ী ডেকে দিবি ; তোকে জল খেতে একটা টাকা দিলুম। চাকরটা প্রথম একটু ইতঃস্তত করিল, শেষে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিয়া দিল এবং নিজে সঙ্গে করিয়া গৌরীকে উক্ত মেয়ে-স্কুলে পৌঁছাইয়া দিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া গৌরী প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে দেখা করিল। তাহার এত অল্পবয়স দেখিয়া প্রধানা শিক্ষয়িত্রী প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, গৌরী তাহা বুঝিতে পারিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মা, একমাত্র আপনিই আমাকে পশু থেকে মানুষের স্তরে উঠিয়ে নিতে পারেন, অনেক আশা করে এসেছি আমায় নিরাশ করবেন না।" তাহার সজল কাতর চক্ষু দুটির দিকে চাহিয়া প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর মন গলিল। তিনি গৌরীকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে থেকে তুমি আসতে পারবে ?" এইবার গৌরী একটু মুস্কিলে পড়িল। তাহার মামীমাকে জানাইয়া আসা অসম্ভব, তবে তাঁহার অগোচরে যদি আসা যায়। সে শুনিয়াছিল যে আগামী শনিবার থিয়েটারে একটা খুব ভাল নূতন অভিনয়--প্লে হইবে। তাহার মামীমা প্রত্যেক নূতন অভিনয়েই যাইতেন। কাজেই সে কপাল ঠুকিয়া বলিয়া দিল "আগামী শনিবার সন্ধ্যার পর।" বাসায় ফিরিয়া গৌরী তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় ছাড়িয়া কাজে প্রবৃত্ত হইল। আজ যেন তাহার কর্ম্মে দ্বিগুণ উৎসাহ আসিল, এক ঘণ্টার কাজ আধ-ঘণ্টায় সারা হইয়া গেল। বেলা প্রায় ১টার সময় মামীমাতা ঠাকুরাণী কালীঘাট হইতে ফিরিলেন।

দেখিতে দেখিতে কয়টা দিন কাটিয়া গেল। এ-কয়দিন গৌরী সকলের সঙ্গেই খুব ভাল ব্যবহার করিল, সে সকলকেই মনে মনে ক্ষমা করিল, এমন কি মামীর জন্য পর্য্যন্ত তাহার দুঃখ হইতে লাগিল। শুক্রবার দিন সন্ধ্যার পর যদুনাথ তাঁহার বসিবার ঘরে টেবিলে বসিয়া ছিলেন, গৌরী ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া মামাবাবুর টেবিলের পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার চুলের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করিয়া দিতে লাগিল। যদুনাথ এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিচলিত হইলেন, ধীরে গৌরীকে কোলের কাছে টানিয়া বলিলেন, "কে, গৌরী, এখন কি আর কোন কাজ নেই মা ? দিনরাত কাজকর্ম্ম করে আমার সোণার প্রতিমা কালী হয়ে গেল। তোর মামাবাবু তোকে একটা দিনও সুখী করতে পারল না, এই বড় দুঃখ রইল," যদুনাথের গলাটা ধরিয়া আসিল, গৌরীরও চোখ দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, এমন সময় উপর হইতে ডাক আসিল "গৌরী, হতভাগা মেয়েটা গেল কই ? শীগ্‌গীর উপরে আয়।" গৌরী ছুটিয়া উপরে পলাইল। গৌরী ঠিকই ভাবিয়াছিল, শনিবারদিন অন্নদা-ঠাকুরাণী সন্ধ্যা হইতেই খাইয়া দাইয়া পুত্রকন্যা লইয়া থিয়েটার

দেখিতে গেলেন, গৌরী বাসায় পাহাড়া রহিল। সকলে যখন চলিয়া গেল তখন গৌরী সেই চাকরটিকে দিয়া একখানা গাড়ী ডাকাইল ও আপনার কাপড়ের ক্ষুদ্র বাক্সটি ও মামী প্রদত্ত গোটা কয়েক টাকা লইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে উঠিয়া বাড়ীটার দিকে চাহিতে তাহার চোখ দিয়া দুইফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিরও একটা আনন্দ সে মনে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিল।

গাড়ী আসিয়া ইস্কুলের গেটের ভিতর ঢুকিলে পর গৌরী নামিয়া গাড়ীভাড়া চুকাইয়া দিল। চাকরটার হাতে একখানা পাঁচটাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিল ভজু বাবা, লক্ষ্মী আমার, বাড়ীতে খবর্দার বলিস্ না যেন আমি কোথায় আছি, আমার মাথা খাস্।" বলাবাহুল্য নিরক্ষর নির্ব্বোধ ভজু তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল।

ইহার পরদিন যে ঘটনা ঘটিল তাহা আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছি।

* * * *

ইহার পর দশবৎসর কাটিয়া গিয়াছে। গৌরী এখন আর স্কুল বোর্ডিংএর মেট্রন নহে। আপনার অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে সে ক্রমে বি,এ পাশ করিয়াছে। এখন সে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। স্কুলে সে আপন গৌরী নাম প্রকাশ করে নাই, তাহার ভাল নাম অপর্ণা নামেই সে পরিচিতা। অপর্ণাদি বলিতে মেয়েরা অস্থির, শিক্ষয়িত্রীগণও অপর্ণার স্বভাবে, ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। গৌরী আগে যে বাড়ীতে ছিল, তাহারই পার্শ্বে একটি খুব বড়লোকের বাড়ী ছিল, তখন সে বাড়ীতে একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল নাম তার কণা। সে এখন বড় হইয়া ইস্কুলে পড়ে ও অপর্ণা দির একজন মস্ত বড় ভক্ত। একদিন রবিবার সে গৌরীকে তাহাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করিল, কোন নিষেধ মানিল না, কহিল "অপর্ণা দি তুমি কোথাও যাও না, আমাদের বাড়ী কিন্তু যেতেই হবে।"

অগত্যা গৌরীর যাইতেই হইল। আগে সে জানিত না তাহাদের বাসা কোথায়, শেষে গন্তব্যস্থানে পৌছিতেই সে চমকিয়া উঠিল। সেই পুরাতন বাড়ী! যেখানে সে কতই না নিগ্রহ ভোগ করিয়াছে। সেদিকে চাহিতে তাহার চোখে জল আসিল, এখন আর তাহার কাহারো উপর রাগ ছিল না।

খাওয়া দাওয়ার পর কণার মাতার সহিত গৌরী আলাপ করিতেছিল। হঠাৎ যেন কৌতুহলের ছলে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা ঐ বাড়ীতে একটী ভদ্রলোকের পরিবার ছিলেন না, বাবুটী চা-বাগানের কাজ করতেন?" কণার মাতা বলিলেন, হ্যাঁ ভাই ছিলেনই ত, যদুনাথ বাবুর কথা বলছ ত? আমরা তখন অল্প বয়সের বৌ, এই কণারা তখন বছর চার পাঁচেকের, তাও বাড়ীতে একটী মেয়ে ছিল গৌরী বলে। এই আমাদেরই বয়স বল্লে বিশ্বাস যাবে না ভাই, দেখতে যেন লক্ষ্মী প্রতিমা, আচার ব্যাভারেও তাই, তার নাকি পেটে পেটে এত শয়তানি! রা-ধা, চোখে না দেখলে আমরা কখনো বিশ্বাস করতুম না। তা সে মেয়েটী, মামী অবিশ্যি তেমন দেখতে পারত না, তাই বলেই কি বাপু, একদিন এই পাড়ারই একটা বকাটে ছোঁড়ার সঙ্গে রাত দুপুরে বেরিয়ে গেল। আগে নাকি ঢের চিঠিপত্র চলেছে, শেষে নাকি পোয়াতি হল, তাতেই শেষে বেরিয়ে গেল। সত্যি ভাই, মেয়েটার কথা ভাবলে আমার এখনো দুঃখ হয়। তা মামাটা বড্ড ভালবাসত মেয়েটাকে, ক'দিন পর্য্যন্ত কত খুঁজলে, কত কাঁদলে শেষে পরিবার নিয়ে জলপাইগুড়িতে চলে গেল।

মামার কথা মনে হইতে অতর্কিতে গৌরীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

কাহিনী শেষ করিয়া বধূটি জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি তাদের চিন্‌তেন?

গৌরী উত্তর করিল—হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে একটু চেনা-পরিচয় ছিল আমার। আজ অন্যের মুখে নিজের জীবনের এই কাহিনী শুনিয়া গৌরীর ওষ্ঠে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

হংসেশ্বরী মন্দিরে

[শ্রীগোপালদাস গঙ্গোপাধ্যায়]

ক'মাস ধরে ক্রমাগত কলিকাতায় থেকে প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠেছিল, মেস্ আর আফিস—আফিস আর মেস্, এই নিয়ে একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগছিল না। রবিবার ছাড়া এক আধদিনের বেশী ছুটি আমাদের ভাগ্যে কচিৎ মেলে—বেশী ছুটীর মধ্যে সেই পূজা আর বড়দিন। দেশে যেতে হ'লে ওছুটী ছুটী ছাড়া অন্য সময় যাওয়া সম্ভবপর হয় না। নিদারুণ গ্রীষ্ম. রাস্তায় ধূলা—গরম বাতাস—বড় বড় বাড়ী, নানারকম গাড়ী, রকম-বেরকমের দোকান দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে যাচ্ছিল। শ্যামল ক্ষেত্র, গাছপালা, পল্লীশোভা দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইতেছিল—কিন্তু সুযোগ ও সুবিধা না হ'লে ইচ্ছা করলেও সব সময় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। এইসব কথা নিয়ে মনে তোলাপাড়া কচ্ছিলাম, এমন সময় বন্ধুবর সুশীলবাবু এসে বললেন—একা বসে কি ভাবছো? আমি তখনকার মনের ভাব খুলে বললাম। তিনি বললেন, কাল রবিবার আমি ত্রিবেণীতে একটু কাজ সেরে বর্দ্ধমান যাব, তুমিও আমার সঙ্গে অন্ততঃ ত্রিবেণী পর্য্যন্ত চলো—বর্দ্ধমান না যাও, সেখান হ'তে ফিরে এসো, একটা নূতন জায়গা দেখা হ'বে, অধিকন্তু সেখানকার গঙ্গায় স্নান ক'রে পুণ্য সঞ্চয় কর্ব্বে। আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলাম, পরদিন প্রত্যুষে তিনি মেসে এসে আমাকে ডেকে নিলেন। আমরা দুজনে হাওড়া ষ্টেসনে গেলাম—হাওড়া হতে ত্রিবেণী ত্রিশ মাইল পথ। পৌণে আটটায় ট্রেণ ছাড়ল—দুই ঘণ্টার মধ্যে ত্রিবেণীতে পৌছলাম। ট্রেণেতে আরো কয়েকজন সহযাত্রী মিলিল, তাঁহারাও ত্রিবেণীতে নামিলেন। ষ্টেশন হতে ত্রিবেণী ঘাট প্রায় একপোয়া রাস্তা হবে—আমাদের দল পুরু হওয়ায় বেশ গল্প গুজব করতে করতে যাওয়া গেল—যেতে যেতে পথে আমাদের কলিকাতার নিমতলার ঘাটের ন্যায় পর পর অনেকগুলি শবদেহ দাহ জন্য নিয়ে গেল দেখলাম। এই ক্ষুদ্র পল্লীতে এতগুলি শব দেখে আমার মনে ভয় হ'ল—বুঝিবা এখানে মড়ক হয়েছে। অনুসন্ধানে আমার ভয় দূর হল। জানিলাম অনেক দূরদেশ হতে ত্রিবেণীর পবিত্র শ্মশানে সৎকার জন্য মৃতদেহ আনীত হয়। শবগুলি অধিকাংশ অন্ত্যজানের। আমরা সকলে ত্রিবেণী ঘাটে স্নান করে একটা দোকানে জলযোগ করে নিলাম। বন্ধুবর সুশীলবাবু এখান হতেই আমার নিকট বিদায় নিলেন। তিনি ত্রিবেণীর কাজ সেরে মগরা দিয়া বর্দ্ধমান যাবেন। আমার নূতন বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী মন্দির দেখিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

আমিও ভাবিলাম ত্রিবেণী তো দেখা হ'ল—ট্রেণেরও অনেক দেরী, এখানে বসিয়া থাকিয়া লাভ নাই—তার চেয়ে আর একটা নূতন যায়গা দেখা যাক্। বাঁশবেড়ে এখান হ'তে প্রায় এক ক্রোশ পথ। দোকানির মুখে শুনিলাম এখানে গাড়ী পাওয়া যায় না—চেষ্টা করিলে নৌকা মিলিতে পারে। নৌকার চেষ্টা করা গেল, পাওয়া গেল না। তখন পদব্রজে যাওয়াই স্থির করা গেল। খানিকদূর গিয়া সরস্বতী নদীর উপর পুল পার হইতে হইল। শুনিলাম সরস্বতী আগে খুব বড় ছিল, এখন শুকাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে, বিস্তৃত তটভূমি দেখিলে স্পষ্টই তাহা বুঝা যায়। এই পুলের কিছু দূরে বহুপুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত সেতুর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া গেল। রাস্তার দুধারেই জঙ্গল। শুনিলাম এখানে মধ্যে মধ্যে বাঘের ভয় হয়। কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটা পাথরের ভাঙ্গা বাড়ী দেখিলাম, শুনিলাম এটা মুসলমানদিগের পীরের আস্তানা ছিল। আরও দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গিয়া দেখিলাম গঙ্গার ধারে কতকগুলি বড় বড় বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে ও তাহার পশ্চিমে যতদূর নজর চলে ততদূর ফাঁকা জমী ও তাহার মধ্যস্থল দিয়া রেল পাতা হইয়াছে। শুনিলাম সেখানে কলিকাতার ম্যাকলীন কোম্পানী (Maclean Company) পাটের কল করিবেন। তার পর প্রায় এক মাইল অতিক্রম করিলাম, কোথাও লোকজন দেখিতে পাইলাম না—লোকের বাস আছে বলিয়া মনে হইল না। পরে জানিলাম এই সব জমী বাঁশবেড়ের রাজাদের। তাঁহারা প্রজা তুলিয়া দিয়া পাটের কল করিবার জন্য সাহেবদের ইজারা দিয়াছেন।

দেখে শুনে মনে বড় কষ্ট হ'ল। পল্লীগুলি নষ্ট করে কল-খানা কর্ত্তে দেওয়া দেশের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলজনক বলিয়াই আমার মনে হয়। তাঁহারা হয় তো কিছু সেলামী বা খাজনা বেশী পেতে পারেন কিন্তু তাঁদের ভেবে দেখা উচিৎ ছিল যে এতে দেশের কতটা অনিষ্ট তাঁরা করিবেন। সুখের পল্লীজীবন-মূলে কুঠারাঘাত করিবেন। শুনিলাম তাঁহারা কেহ দেশে থাকেন না—কলিকাতা মহানগরীর মোহে মুগ্ধ হইয়া আর সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। বাপপিতামহের কীর্ত্তিকলাপ বজায়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, তাই সংস্কার অভাবে অনেকস্থলে সেগুলি ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, আর যেগুলি শুষ্ক হয় নাই—সেগুলি শৈবাল ও লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। তাহা মানুষ কেন, গবাদিরও অপেয় সুতরাং বঙ্গদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে পানীয় জলের জন্য হাহাকার পড়িয়া যাইবে সর্ব্বত্র রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি
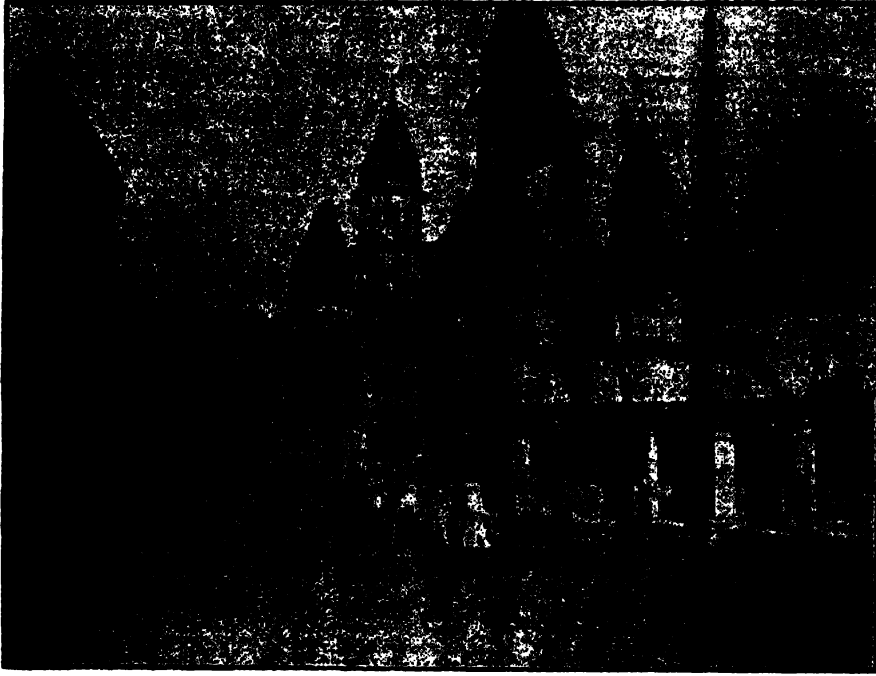
হংসেশ্বরী মন্দিরের পশ্চিমাংশ ও বিষ্ণু বা বাসুদেব মন্দিরের দক্ষিণাংশ।

সেখানেই বসবাস করিতেছেন—কাজেই পল্লীবাসীর সুখ দুঃখ ভাবিবার অবসর কোথায়? বঙ্গদেশের মফঃস্বলের রাজা, মহারাজা, জমীদারেরা এবং অবস্থাপন্ন লোকমাত্রেই পল্লীবাস ছাড়িয়া সহরবাসী হইয়াছেন; তাই পল্লীগুলি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কত পল্লীর হিতকর কার্য্য করিতেন। দেবালয় ও অতিথিশালা স্থাপন, জলাশয় ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জমিদারমাত্রেরই অতি অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। তাঁহারা যে সকল জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন—তাঁহাদের বংশধরেরা পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্যই একদিন সৌখিন শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল, এক্ষণে উৎসাহের অভাবে সে সবই নষ্ট হইয়া যাইতেছে—লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে—এই সবকথা আলোচনা করিতে করিতে আমরা গন্তব্যস্থানের নিকট পৌছিলাম। স্থানটী নীরব নিস্তব্ধ—পথে আসিতে আসিতে জনশূন্যতা আমরা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। রাজবাড়ী যাইবার পথে, দুইধারে বহুকালের রোপিত প্রাচীন বকুল বৃক্ষ শ্রেণী দেখিলাম, মনে হইল যেন কোন কুঞ্জবনের ভিতর দিয়া

যাইতেছি। বৃক্ষশাখা হইতে রংবেরঙের নানাবিধ পক্ষীর কূজন শুনিতে শুনিতে চলিলাম। সম্মুখে প্রাচীন সুবৃহৎ তোরণদ্বার, দ্বারের গঠন প্রণালী আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বলিয়া বোধ হইল। ইতিপূর্ব্বে এরূপ কুত্রাপি দেখি নাই। শুনিলাম এখানে পূর্ব্বে দুর্গ ছিল, ইহা সেই দুর্গদ্বার। দ্বারের দুই পার্শ্বে আধুনিক কালের দুইটী লৌহ ফটক ও তোরণদ্বারে আসিবার রাস্তার দুই দিকে প্রশস্ত ও গভীর 'ঝিল'। শুনিলাম এই ঝিল প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া আছে। পূর্ব্বে ইহাই দুর্গের প্রাকার ছিল। প্রাকার বেষ্টিত বলিয়া রাজবাড়ীকে সাধারণতঃ লোকে "গড়বাড়ী" বলিয়া থাকে। উত্তরদিকের ফটকে প্রবেশ করিয়া আমরা হংসেশ্বরী মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। এরূপ সুগঠিত বৃহৎ মন্দির বঙ্গদেশে কেন, ভারতের কোথাও আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। মন্দিরটী প্রস্তর ও ইষ্টকে নির্ম্মিত। মন্দিরের দ্বিতলের উপর ৮টী চূড়া; চতুর্থতলে ৪টী চূড়া ও ষষ্ঠতলে ১টী চূড়া; সর্ব্বসমেত চূড়া সংখ্যা ত্রয়োদশটী—সর্ব্বোচ্চ চূড়ার উপর হইতে চতুর্দ্দিকে ৫।৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান সকল দেখিতে পাওয়া যায়—সে অপূর্ব্ব দৃশ্য কবির উপভোগ্য। প্রত্যেক চূড়ার নিম্নে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

বকুল কুঞ্জ ও দুর্গদ্বার।

দ্বিতলের শিবলিঙ্গটী শ্বেতমর্ম্মরের ও অপর দ্বাদশটী কৃষ্ণ মর্ম্মরের। দেবী হংসেশ্বরী একটী গোলাকার কারুকার্য্যখচিত চিত্রবিচিত্র অঙ্কিত প্রশস্ত প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত পদ্মবেদীর উপর ত্রিকোণ যন্ত্র খোদিত আছে, তদুপরি মহাকাল শয়ন অবস্থায় যোগ-নিদ্রায় মগ্ন। তাঁহার নাভিস্থল হইতে প্রস্ফুটিত পদ্ম বিকশিত হইয়াছে, তদুপরি দেবী উপবিষ্টা আছেন। দেবী চতুর্হস্তে নরমুণ্ড, অসিধারণ ও বরাভয় প্রদান করিতেছেন, মুখমণ্ডল কালীমূর্ত্তির ন্যায় নহে—সহাস্য বদনা! দেবীর পশ্চাদ্ভাগে কল্পতরুবৃক্ষ উঠিয়াছে, কল্পতরু বৃক্ষে স্বর্ণপল্লব মস্তকোপরি দোদুল্যমান। এরূপ মূর্ত্তি আর কুত্রাপি দেখি নাই। শুনিলাম প্রতিষ্ঠাতা রাজর্ষি নৃসিংহদেব রায় একজন পরম সাধক ছিলেন, সাধনায় সিদ্ধি লাভকালে দেবী ঐ মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। নৃসিংহদেব স্বয়ং শিল্পকলাপটু ছিলেন, ধ্যানে প্রাপ্ত মূর্ত্তিটী তিনি চিত্রাঙ্কিত করিয়া রাখেন, সেই চিত্র দেখিয়া নিম্বকাষ্ঠে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয়। মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী শঙ্করী মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করেন। ১৭৩৬ শকাব্দে মানযাত্রার দিন দেবী প্রতিষ্ঠিতা হন। প্রতিষ্ঠার দিন ভারতবর্ষের পণ্ডিত-

মণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে সমবেত হইয়াছিলেন। রাণী প্রত্যেককে এক এক সরা রৌপ্য মুদ্রা দিয়া পদধূলি গ্রহণ করেন। শুনা যায় মন্দির নির্ম্মাণে ৫।৬ লক্ষ টাকা ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মন্দিরের

কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেব রায়

[illegible]মন্দিরের প্রকোষ্ঠে ৺শ্রীকৃষ্ণ, ৺রাধিকাদেবী ও ৺গোপাল জীউ প্রতিষ্ঠিত। হংসেশ্বরী মন্দিরের পশ্চিমে আর একটী খুব প্রাচীনকালের মন্দির আছে। সেটী ১৭০১ শকাব্দে

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে নির্ম্মিত। মন্দির প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়—ইনিই বাঁশবেড়িয়াতে রাজধানী স্থাপন করেন ও জঙ্গল কাটাইয়া বহু লোক আনাইয়া বাস করান। গ্রামে তিনি অনেক ব্রাহ্মণ বাস করাইয়াছিলেন ও শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য অনেকগুলি টোল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনিই দুর্গ নির্ম্মাণ ও রাজধানীর চতুর্দ্দিকে গড়খাই খনন করাইয়াছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব বংশানুক্রমিক "রাজা

মহাশয়" খেতাব দিয়াছিলেন। বিষ্ণু মন্দিরের কারুকার্য্য ভারি চমৎকার। ইষ্টকের উপর নানাবিধ নক্সা অঙ্কিত—সেগুলি এত সুন্দর যে তাহা না দেখিলে বুঝান যায় না। মন্দিরগুলি দেখিতে দেখিতে আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। আমার নূতন বন্ধুগণ ট্রেণ ধরিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু আমার মন তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিতেছিল না। আমি থাকিয়া গেলাম, তাঁহারা আমায় একা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম—বার বার দেখিলাম—যত দেখি তত হায়—"নয়ন না তিরপিত ভেল।"

মন্দিরগুলির সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। শুনিলাম দুই বৎসর পূর্ব্বে মন্দিরগুলি মেরামতের জন্য রাণীগঞ্জের প্রসিদ্ধ ব্যবসাদার ও কণ্ট্রাক্টার প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে ত্রিশ হাজার টাকা রাজারা আগাম দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি নাকি কোন দায়ে পড়িয়া টাকাগুলি নিজের কাজে খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন - যা'হোক শীঘ্রই সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আরও শুনিলাম যে কলের জন্য রাজারা প্রজাদের যে উঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তাঁহারা দক্ষিণদিকের পরিখার বাহিরে বাস করাইয়াছেন। অনেকেই সামান্য কুটীর স্থলে বাসের জন্য ইষ্টক নির্ম্মিত নূতন পাকাবাড়ী পাইয়াছে। আরও সুখের কথা এই যে অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় জোর-জুলুম তো দূরের কথা, এমন কি এখানে ঠাকুর দেখিতে পয়সা পর্য্যন্ত দিতে হয় না। সেখানে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের নিকট হইতেই এইসব তথ্য সংগ্রহ করিলাম। কথায় কথায় শুনিলাম রাজাদের একজন কয়েকদিন এখানে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম তাঁহার নাম কুমার মুণীন্দ্র দেব। তিনি চুঁচুড়ার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, পূর্ব্বে "পূর্ণিমা" মাসিকপত্র সম্পাদন করিতেন ও "হুগলী-কাহিনী" "সারনাথ" প্রভৃতি বই লিখিয়াছেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল। সংবাদ দিবামাত্র তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তখনি মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আহার করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। আহারান্তে তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা হইল—যেন কত দিনের পরিচিতের ন্যায় তিনি আলাপ করিতে লাগিলেন। এরূপ নিরহঙ্কারী, সদালাপী, অমায়িক ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার মোটর গাড়ীতে আমাকে সঙ্গে লইয়া পুরাতন সাতগাঁ, ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা, হুগলীর ইমাম বাড়ী, চুঁচুড়ার গোরাবারিক প্রভৃতি দেখাইয়া মুখে মুখে তাহাদের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। ফরাসডাঙ্গা পর্য্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল, পথে বিলম্ব হওয়ায় ও সে দিন বাঁশবেড়িয়া সাহিত্য-সভার অধিবেশনে তিনি সভাপতি থাকায় অত দূর যাওয়া ঘটিল না। আমি চুঁচুড়া হইতে গঙ্গা পার হইয়া নৈহাটীতে ট্রেণে উঠিলাম ও সন্ধ্যার মধ্যেই মেসে আসিয়া পৌছিলাম। আমি পাজী পুঁথি দেখিয়া মাহেন্দ্র ক্ষণে যাত্রা করি নাই—বামে শৃগাল করিয়াও যাই নাই—তবে ত্রিবেণীতে বামপার্শ্ব দিয়া শবশিবা উভয়ই গিয়াছিল বটে! যখন মেসে বসিয়া সেদিনকার কয়েক ঘণ্টার ভ্রমণ-কাহিনী বিবৃত করিতেছিলাম তখন সকলেই আমার সঙ্গ না লওয়ার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু পূর্ব্বদিন যখন আমি তাঁহাদিগকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম তখন সে কথায় কেহ কর্ণপাতও করেন নাই।
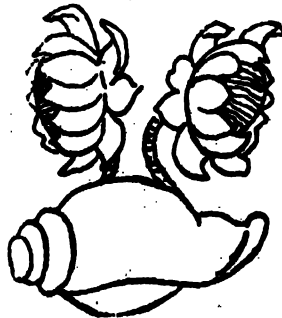
চয়নিকা

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

পিস্তল-ঘড়ি—

এক ফরাসী একটী আশ্চর্য্য জনক ওয়াচ তৈরী করিয়াছেন—দেখিতে ছোট্ট সুন্দর ঘড়িটী কিন্তু ইচ্ছা করিলে সে মানুষ খুন করিতে পারে—তাহার পেটের ভিতর ছোট একটী পিস্তল ভরা রহিয়াছে! ঘড়ির মাথার দিকটা পিস্তলের নলের কাজ করে—এবং তাহার ভিতর একসঙ্গে চারিটা

গুলি ভরা থাকে। ঘড়ির পাশের দিকে পিস্তলের ঘোড়া আছে—উহা টিপিলেই পিস্তল-ঘড়ি গুড়ুম্ করিয়া আওয়াজ করিয়া উঠে। ছবিতে পিস্তল ছুড়িবার নিয়মটা দেখান হইতেছে।

সুন্দরী-পেন্সিল্—

আমেরিকার সুন্দরীদের সৌন্দর্য্য বজায় রাখিবার জন্য এক চমৎকার

পেন্সিল্ তৈরী হইয়াছে। উহার এক অংশে পেন্সিল ও অন্য অংশে পাউডার সজ্জিত থাকে। যাহারা দোকানে কাজ করে তাহারা কাজের সময় পেন্সিল দিয়া লিখিবে এবং অবসর মত ঐ পেন্সিলের অন্যদিক হইতে পাউডার খুলিয়া নষ্ট সৌন্দর্য্য ঠিক করিয়া লইবে। ঐ পেন্সিলের ভিতর আরো একটী কুঠরী আছে—তাহাতে পেনসিলের শিস্ সজ্জিত থাকে।

অদ্ভুত মোটর-কার—

একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার একটী অত্যন্ত মজবুত ধরণের মোটরকার তৈরী করিয়াছেন - ইহার স্প্রিংগুলি এমনি মজবুত যে খুব উঁচু হইতে পড়িয়া গেলেও উহার কোন অনিষ্ট হয় না। ইহা নাকি আবার ফায়ার-

প্রুফ্! উপর হইতে পড়িবার প্রচণ্ড চোটে এঞ্জিনে আগুন ধরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু ইহা নাকি আগুনেও পোড়াইতে পারিবে না।
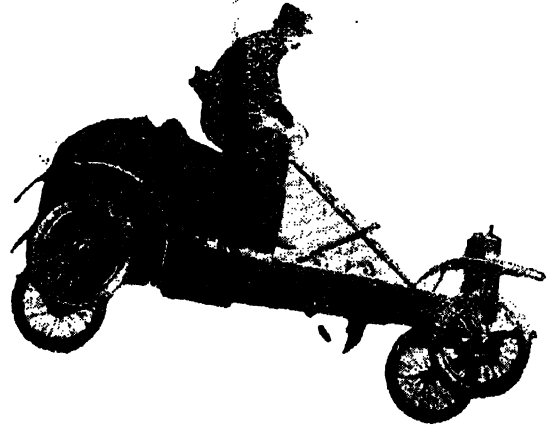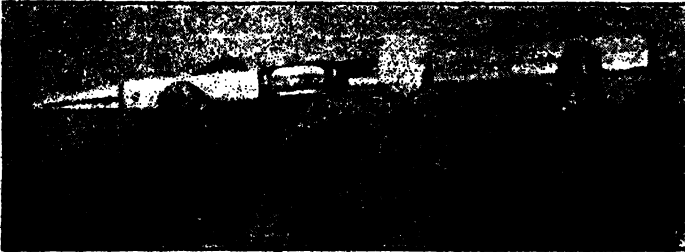
উপরের ছবিতে উক্ত ইঞ্জিনিয়ার স্বয়ং তাঁহার এই মোটরকার লইয়া ছয়ফুট উচ্চ হইতে লাফাইয়া পড়িতেছেন।

হাতীর স্নান—

আমাদের সিংহলের কাণ্ডী সহরে একজন মাহুত একটী হাতীকে কেমন আরাম-দায়ক স্নান করাইতেছে দেখুন। এই হাতী অত্যন্ত পরিশ্রমের পর শীতল জলে স্নান করিতে খুব ভালবাসে। অনেকের ধারণা হাতী অ'ত নোংরা জীব এবং কাদা মাখিয়া ভূত সাজিয়া থাকিতেই ভালবাসে কিন্তু সেটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। হাতী সাধারণতঃ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেই চায় এবং জলে পড়িয়া খেলা করিতে খুবই ভালবাসে।

ছবিটীতে পরিশ্রান্ত হাতী বে'ক আরামে জলে পড়িয়া ক্লান্তি দূর করিতেছে তাহা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

---

৮৫ ফুট লম্বা আগুণ-নিবানো মই—

লণ্ডনে দমকল বিভাগে একটী মই আছে তাহা তিন ভাঁজ করিয়া রাখা যায় এবং সমস্তটা খুলিলে ৮৫ ফুট লম্বা হয়। কোন বাড়ীতে আগুণ লাগলে এই মই বাহিয়া পাঁচতলা দালানের উপর উঠিয়া আগুণ নিবানো এবং বিপন্ন জীবনের উদ্ধার সাধন করা যায়। এই প্রকাণ্ড মইটীকে ৬৫ অশ্ব-শক্তি-যুক্ত একটী মোটরকার টানিয়া লইয়া যায়। মইটীকে ইচ্ছামত উঠান, ঘোরান এবং প্রসারিত করা চলে। তিনভাঁজে ভাঁজকরা মইটাকে সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করিতে সম্পূর্ণ একমিনিট সময়ও লাগে না।
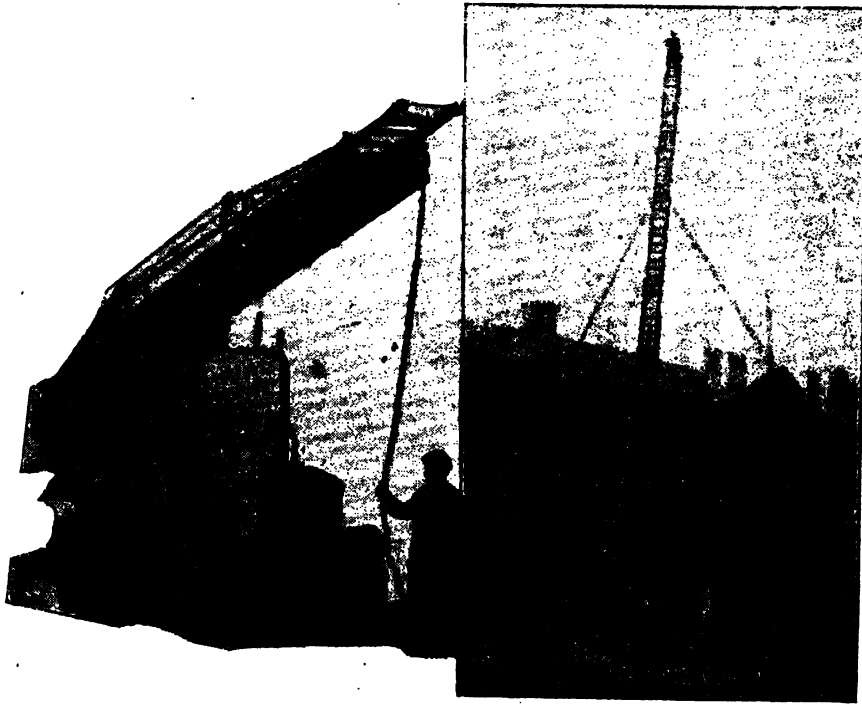
বামদিকের ছবিতে ভাঁজকরা এবং দক্ষিণদিকের ছবিতে সম্পূর্ণভাবে খোলা মইটী দেখা যাইতেছে। খোলা মইএর মাথায় একটী লোক উঠিয়া কেমন নির্ভীকভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—নীচের মানুষগুলির দিকে চাহিয়া ক্রমে উপরের মানুষটীকে দেখিলে উচ্চতার একটা ধারণা করা যায়।

অগ্নি-ত্রাণ পকেট ফিতা—

নিউইয়র্ক সহরে এক সাহেব একটি ৭৫ ফিট্ লম্বা ইস্পাতের ফিতা তৈরী করিয়াছেন! এই ফিতার সাহায্যে যে-কেহ কোন বাড়ীতে আগুন লাগিলে আটতলা দালানের উপর হইতেও নির্বিঘ্নে নীচে নামিয়া আসিতে পারিবে।

ফিতাটী গোল করিয়া পকেটে রাখা যায়। ফিতাটী অত্যন্ত পাতলা ও সরু বলিয়া ইহা ধরিয়া উপর হইতে ঝুলিয়া পড়িতে অনেকে হয়তো ভয় পাইবেন—মনে করিবেন দেহের ভার সহিতে না পারিয়া ফিতাটি নিশ্চয় ছিঁড়িয়া যাইবে কিন্তু তা নয়—৭৫০ পাউণ্ড ওজন পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা ইহার আছে। ফিতার একটা মাথা দালানের কোন এক জানালায় আট্‌কাইয়া অপর মাথা কোমরে জড়াইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতে হয়। নামিবার সময় পতন-বেগ ইচ্ছামত বাড়ান কমান (রেগুলেট করা) যায়।

নির্ম্মাতা স্বয়ং একটী হোটেলের আটতলা হইতে এই ফিতার সাহায্যে নামিয়া পুলিশের লোক ও রাস্তার জনসাধারণকে তাঁহার এই অদ্ভূত অগ্নিত্রাণ ফিতার শক্তি পরীক্ষা দেখাইতেছেন।
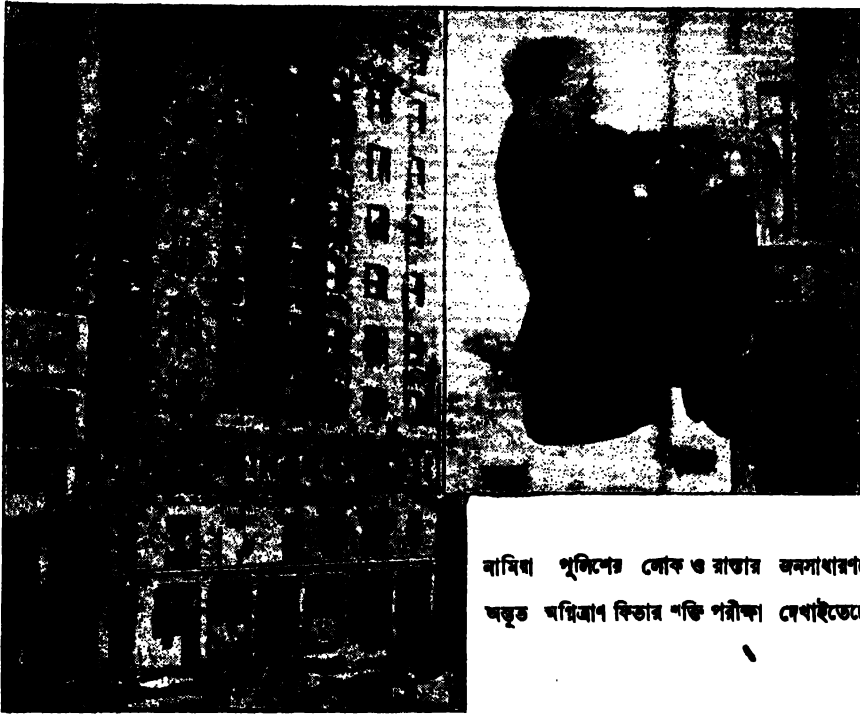
কবি-তীর্থে

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

কাল সন্ধ্যা; স্থান, আজমীর, পুষ্কর-হ্রদতীর। অনেক দিনের কথা সে, আমার বয়স তখন চৌদ্দ কি পনেরো, ঠিক মনে নাই,—একদিন পুষ্কর-হ্রদতীরে বসিয়া আছি, কোথা হইতে কে সুধাঝরা কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

বঁধু কি আর কহিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥

তীরে জনমানব দেখিতে পাইলাম না। খুব দূরে যেন কতকগুলি লোক চেঁচামেচি করিতেছে, তাহারই ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বর শুনা যাইতেছিল, এখন এই মধুর কণ্ঠের কীর্ত্তন গানে তাহাও চাপা পড়িয়া গেল। হ্রদের উপর সন্ধ্যার ছায়া আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সান্ধ্য-সমীর স্পর্শে হ্রদের জলে ছোট ছোট লহরী লীলায়িত হইয়া চলিয়াছে, আর 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেছে'—

ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াইব কাহার কাছে॥

আমি সঙ্গীতজ্ঞ নই, সুর-লয়-তান আমার কিছুমাত্র ছিল না; গায়কের দোষ গুণ বিচার করিবার ক্ষমতাও ছিল না, থাকিলেও বোধহয় সে নির্জন-সন্ধ্যায় সেই সুধা-সঙ্গীত গায়কের দোষ ধরিতে পারিতামও না। গান শেষ হইল, আমিও উঠিলাম। কোথায় এ গায়ক? কোথার কোন্ নিভৃত স্থানে থাকিয়া এ-হেন অমৃত-ময় গীত-সুধা ছড়াইতেছেন! অনেক অনুসন্ধান করিলাম, দেখিতে-দেখিতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল, গায়কের দর্শন মিলিল না, কাণে তাঁহার স্বরগ্রাম অবিরাম ঝঙ্কার দিতে লাগিল। 'সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া' সেই অ-দৃষ্ট গায়কের কথা ভাবিতে ভাবতে বাসায় ফিরিলাম। আমাদের বাসার পার্শ্বেই দেবেন্দ্র বাবু বলিয়া এক সৌখীন ভদ্রলোক থাকিতেন; তিনি চক্ষে চশমা পরিতেন; লম্বা চুল রাখিতেন; অধর নিম্নে জীব-বিশেষের অনুকরণে একটু দাড়ী তাঁহার ছিল, অহোরাত্র তিনি তাহাতে হাত বুলাইতেন এবং নানাবিধ প্রেমের গান গাহিতেন। তাঁহার প্রিয় কয়েকখানি গান, "আমি নিশিদিন তোমায়," "বনে কত ফুল ফুটেছে;" "আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে?" "নিতি নিতি কত রচিব শয়ন, আকুল নয়ন রে"—আমি মাত্র তিনদিনে কম করিয়া তিনশত বার শুনিয়াছি। বাসায় আসিয়া আমি প্রথমেই দেবেন্দ্র বাবুর শরণ লইলাম। আশা, তিনি যদি গানটি জানেন, আর একবার গাহিবেন। "বঁধু কি আর বলিব আমি" শুনিয়াই দেবেন্দ্র বাবু তাঁহার 'নূরে' হাত দিলেন; বার কতক সূক্ষ্ম কেশগুচ্ছ ধরিয়া টানাটানিও করিলেন, বোধহয় সে গুলিকে রাতারাতি বড় করিবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল; একটু ভাবিলেন ও তৎপরে অবজ্ঞাভরে কহিলেন—ও চণ্ডী-দাসের পদ। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি জানেন? দেবেন্দ্র বাবু জানেন-কি-না তাহা মনে করিতে লাগিলেন, আবার অধর-নিম্নের কেশগুচ্ছে হস্ত পড়িল; কহিলেন না; ওসব কি আর গান যে, জানব? গান শুনতে হয় ত বোস।—বলিয়াই তিনি গান ধরিবার উপক্রম করিলেন। আমি উঠিয়া পড়িলাম; কারণ দেবেন বাবুর গানগুলি শুনিয়া শুনিয়া অত্যন্ত এক-ঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছিল। দেবেন্দ্রবাবু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন; বোধ হয় তিনি অভিসম্পাতও দিয়াছিলেন! কি অভিসম্পাত দিয়াছিলেন জানি-না, তবে সঙ্গীতে আমার অপারদর্শিতা, মনে হয় যেন তাঁহার অভিশাপেই হইয়াছে।

আজমীর হইতে জয়পুর, বিকানীর, মেবার—অর্দ্ধ রাজপুতানা পরিভ্রমণ করিয়া আমরা দিল্লী আসিলাম। দিল্লী খুব বড় শহর; সেখানে অনেক বইয়ের দোকান ছিল, গোটাকতক

দোকানে চণ্ডীদাসের গানের বহি খুঁজিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু বহি পাওয়া ত দূরের কথা, চণ্ডীদাস বলিয়া যে কোন লোক কস্মিন্‌কালে কোথাও ছিল, তাহাও কেহ জানে না দেখিলাম। এলাহাবাদেও ঐ দশা। মাসখানেক পরে কলিকাতায় ফিরিলাম; কলিকাতায় আসিয়াই কতকগুলি পুস্তক বিক্রেতার দোকান ঘুরিয়া আসিলাম; বহি মিলিল না; তবে কতকটা আশা হইল যে চণ্ডীদাসের নামটা এখানে অনেকেই জানে, এখানে-না-হয় ওখানে মিলিবে সে সন্ধানও তাহারা দিল।

তারপর চণ্ডীদাস পাইয়াছিলাম। আজিও বেশ মনে আছে, আমার গৃহ-শিক্ষক-মহাশয় (আহা, মহাশয় এখন স্বর্গে!) আমাকে লইয়া এই সময় একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। কারণ ছাত্রের লেখাপড়ার দফা প্রায় কতকটা রফা; সে 'বসিয়া বিরলে থাকই একলে না শুনে কাহার কথা।' বাড়ীর লোকেও যে অল্প-বিস্তর চিন্তিত হ'ন নাই, তাহা কেমন করিয়া বলিব! কারণ একদিন পষ্ট শুনিলাম, মন্ত্রণা চলিতেছে—'রোঝা ওঝা আন গিয়া পেয়েছে কি ভূতা!' আমাকে ভূতে পাইয়াছে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস! ভূত ঝাড়াইবার জন্ম ওঝার প্রয়োজন!—হারে! যাক্, ততদূর আর দৌড়িতে হয় নাই; আমার গৃহশিক্ষক মহাশয়ই খুব ভাল ওঝা। দশ মিনিটের মধ্যেই 'ভূত প্রেত ঘুচিলেক' কেবল 'বাড়িল অঙ্গের জ্বালা।' কিছুকালের মত চণ্ডীদাস আমার কাপড়ের আলমারীতে রিম্যাণ্ডেড রহিলেন। কিন্তু আমি তাহাকে ভুলিতে পারিলাম না, চণ্ডীদাসের পদাবলী আমার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছিল। পিঠের দাগও শুকাইয়াছিল, ইচ্ছা করিলেই আলমারী হইতে বাহির করিয়া দেখিয়া লইতে পারিতাম কিন্তু সযত্নে এড়াইয়া চলিতে লাগিলাম। বাড়ীতে আমার কাব্য-প্রিয়তার জন্ম বহু শত্রু-অর্কাবির উদ্ভব হইয়াছিল। তাহারা গৃহ-শিক্ষক মহাশয়ের নিকট গোয়েন্দাকার্য্যের ভার পাইয়াছিল। আমি তাহা জানিয়াই সতর্ক থাকিতাম। তবে রোজ একবার করিয়া আলমারীটা খুলিতাম; তাহাতেও কথঞ্চিত শান্তি মিলিত। কিন্তু শত্রুর দল তাহাতেও শত্রুতা সাধিতে আসে—'কবিতে হচ্ছে!' কবিতা না হইয়া যে তাহাদের মস্তক হইতেছে, ইচ্ছা হইত তাহাদের দেখাইয়া দিই, কিন্তু বাস্তবিক শেষাশেষি আলমারির দিকও মাড়াইতাম না। কিন্তু অন্তরের কথা বলিব? 'পাশরিতে চাহি মনে পাশরা না যায় গো'—আমার তাই হইয়াছিল।

আমার সহপাঠী, পাড়ার সমবয়সী বন্ধুরা, আমার চণ্ডীদাস প্রীতিতে হাসি টিটকারী করিতে অবহেলা করিত না; আমি যে তাহাদের মত ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভালবাসি না, বায়রণ মুখস্থ করি না, রবীন্দ্রনাথকে হজম করিয়া ফেলি নাই, তাহাদের নিকট সে সময়ে সেটা ক্ষুদ্র অপরাধ ছিল না। তাহারা বিধি-মত উপায়ে আমার কাব্য-প্রিয়তা-অপরাধের সাজা দিবার চেষ্টা করিত, দিতও। তাহারা স্থানে-অস্থানে সকৌতুকে আমাকেই চণ্ডীদাস বলিয়া পরিচিত করাইয়া দিত, ইহাতেও আমাকে বড় অল্প লাঞ্ছনা সহিতে হয় নাই। ক্রমে এই পরিচয় পাড়া ছাড়াইয়া, সহর ছাড়াইয়া, বাঙলা ছাড়াইয়া বিহারেও আসিয়া ছড়াইয়া পড়িল। একবার বিহারে আমার এক ধনী আত্মীয়ের গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়াছি, সেখানকার প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও রমণী আমাকে দেখিয়াই সমস্বরে 'চণ্ডীদাস এয়েছে, চণ্ডীদাস এয়েছে রে' রব তুলিয়া অভ্যর্থনা করিল। রেলওয়ে ষ্টেশনের উপর এই দুর্ঘটনা, পাঠক, মানসিক অবস্থাটা অনুগ্রহ করিয়া ভাবিয়া লইবেন। ইচ্ছা হইয়াছিল—'লোহার মুষলে ভাজিয়া তোদেরে করিমু শতেক ভাগি!'

কিন্তু এই আত্মীয় গৃহে আমি যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, অদ্যাপি আর আমার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। কলিকাতা হইতে এক প্রসিদ্ধা কীর্ত্তনওয়ালী কীর্ত্তন গাহিতে আসিয়াছিল। চণ্ডীদাসের পদাবলী কীর্ত্তনে গীত হইয়া থাকে, ইহা আমি জানিতাম। একদিন মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনওয়ালী আহারাদি শেষ করিয়া তাহার জন্ম নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রাম করিতেছে, চোরের মত (জানাইয়া যাইবার উপায় নাই, কারণ তাহা হইলেই গৃহের বালক বৃদ্ধ 'চণ্ডীদাস'কে লইয়া ফাড়া ছেঁড়া করিবে) তাহার কক্ষে উপস্থিত হইলাম। কীর্ত্তনওয়ালী বোধহয় আমাকে বাড়ীতে নানারূপ কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখিয়াছিল ও আমি যে এই ধনী-গৃহস্থের পরিবার-ভুক্ত—কেহ তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছিল; তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া সম্ভ্রম দেখাইয়া, আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিল। সে

চণ্ডীদাসের পদ গাহিতে জানে-কি-না জিজ্ঞাসা করায় নির্বিকার ভাবে কহিল—অনেক পদ সে জানে কিন্তু পদ-কর্ত্তার নাম জানে না। চণ্ডীদাস আমার সঙ্গেই থাকিত। আমি আমার পেঁটরা খুলিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলীখণ্ড বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া আনিয়াছিলাম; বহিখানি বাহির করিতেই সে হাত বাড়াইয়া লইয়া সূচীপত্র দেখিতে দেখিতে বলিল—চণ্ডীদাসের অনেক পদ সে জানে। আমি জানিতে চাহিলাম, কোন্‌টা কোন্‌টা সে জানে? কীর্ত্তনওয়ালী আমাকে একখানা কেদারায় বসিতে বলিয়া পদাবলীর প্রথম কয়েকটি পদ আবৃত্ত করিয়া চলিল। আমার সেই পুষ্কর-হ্রদে শোনা, অপরিচিত গায়কের মধু-কণ্ঠের সেই 'বঁধুয়া, কি আর কহিব আমি', সেও জানে বলিল। আমি তাহাকে আজিকার রাত্রে সমস্তই চণ্ডীদাসের পদ কীর্ত্তনে গাহিতে অনুরোধ করিলাম; সে বিনীতভাবে অনুরোধ রক্ষা করিবে বলিল। "বঁধু, কি আর কহিব আমি" সর্বাগ্রে গাহিতে বলায়, বলিল—আগে ঐটি গীত হইতে পারে না, কারণ উহার স্থান পরে, পূর্বে নয়, বিরহ পরের অবস্থা, আগের নয়। এ সকল কথার তাৎপর্য্য তখন বুঝি নাই।

রাত্রে সভা বসিল। আমি সর্বাগ্রে সভায় আসিয়া একটা মনোমত স্থান সংগ্রহ করিলাম। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গায়িকা ছিল সুন্দরী, তরুণী, কণ্ঠ ছিল তার অতি সুমিষ্ট, রঙে ভরা, তাহার সঙ্গে যাহারা বাজাইল, তাহাদেরও নিপুণ হস্ত, আর বিষয় ছিল মধুর মধুর হইতে মধুর চণ্ডীদাসের পদ! সভা যেন সঙ্গীতে ডুবিয়া গেল। গায়িকার দৃষ্টি বরাবর আমার উপরে খুব তীক্ষ্ণ ভাবেই পড়িতেছিল; ইহাতে মনে যে আমি গর্ব অনুভব না করিতেছিলাম, এমন নয়। সে-যে কেবলমাত্র আমারই মৌখিক অনুরোধ রক্ষা করিতেছে, তরুণ বয়স্ক যুবকের নিকট ইহা গর্বেরই বস্তু হইয়া উঠিল। আমার মনে হইতেছিল, তৃপ্তি-গিরির সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়া অতি করুণ ও অলস দৃষ্টিতে নিম্নের নর-নারীকে নিরীক্ষণ করিতেছি। তখন জানিতাম না যে অতো উপরে উঠিয়াছি, পড়িয়া যাইতে পারি; হাত পা ভাঙিবারও সম্ভাবনা আছে। গায়িকা আমার মাত্র একহাত দূরে দাঁড়াইয়া দুই হাতে বক্ষ নির্দেশ করিয়া গাহিতেছে—'চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া।' ভণিতা শেষ হইবা-মাত্র একদল কিশোর-কিশোরী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; পরমুহূর্ত্তেই "ওহে চণ্ডীদাস, ওহে চণ্ডীদাস, তোমার গান হচ্ছে হে!" শব্দে সভাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল। আমার সমবয়স্ক দুটো ছোঁড়া অনুচ্চ মৃদুকণ্ঠে একটা অতি কদর্য্য ইঙ্গিতও করিল। যদি সম্ভব হইত আমি—'ঝাঁপ যে দিয়া জলেতে পশিয়া যমুনায় থাকিব মরি।' আত্মীয়গণের গম্ভীর হাস্য, যুবক-যুবতীদের কলহাস্য, কিশোর-কিশোরীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, বালক-বালিকাদের অট্টরোল, তাহার মাঝে কি চক্ষু উঠে! তবু চাহিলাম, দেখিলাম, গায়িকার অধরও মৃদুহাস্য কম্পিত। ভাবিলাম, তখনি প্রতিজ্ঞা করি, -'সবার আগে বিদায় হইয়া যাইব গহন-বনে।' অদৃষ্টের পরিহাস, প্রতিজ্ঞা করা হইল না, করিলে ভাল হইত; অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যাইত। অন্ততঃ সদ্য সদ্য জ্বর হইতে অব্যাহতি ত পাইতাম। সেই রাত্রে-ই খুব জ্বর। অনেকদিন জ্বরের ঘোরেও শুনি, সেই মধুরতম সুরের ঝঙ্কার, ভাষার ঝঙ্কার, ভাবের ঝঙ্কার! পরে পথ্য পাইয়া শুনিলাম, কীর্ত্তনওয়ালী বিদায় কালে 'চণ্ডীদাসের' খোঁজ করিয়াছিল এবং তাহার নাম ঠিকানা ছাপা একখানি কার্ড দিয়া গিয়াছে। কার্ডখানি অদ্যাবধি আমার কাছে আছে; তবে যে কার্ড দিয়াছিল, সে আছে কি না তাহা আমার জানা নাই। তারপর জীবনে চণ্ডীদাসের কীর্ত্তন গান বহুবার শুনিয়াছি।

সাহিত্যের বাজারে ফরিয়াগিরি করিতে আসিয়া মনস্থ করিয়াছিলাম, চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি সচিত্র সুন্দর সংস্করণ বাহির করিব। বহুদিন যাবত তাহার চেষ্টাও করিয়াছি; প্রকাশকও পাইয়াছিলাম, কিন্তু ইচ্ছা-অনুযায়ী কার্য্য করিয়া উঠিতে পারি নাই। বহি বাহির হইয়াছে, ইচ্ছা ছিল শিব গড়িবার; কি গড়িয়াছি কে জানে! (আমি 'রাধাকৃষ্ণ চিত্রে ও কাব্যে'র কথা বলিতেছি) কিন্তু এখনো আশা ছাড়ি নাই। ইচ্ছা আছে, যদি পারি একটি সচিত্র সংস্করণ বাহির করিব কিন্তু সুচিত্রের অভাব আমাদের দেশের এখনো ঘুচে নাই। কাব্যকে মূর্ত্ত করিয়া সাধারণ বোধ্য চিত্রে রূপ দিতে পারেন, তেমন শিল্পী বাঙ্গালায় এক-দুই জনের বেশী

নাই। সুহৃদ্বর হেমেন্দ্রনাথ অধুনা বঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন কিন্তু তাঁহার সাহায্য পাওয়া মাত্র দুষ্প্রাপ্য নয়, একেবারে অপ্রাপ্য!

গত বৎসর পূজার সময় দার্জিলিঙ্ শৈলে একদিন মধ্যাহ্নে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজের "বন আবাসে" বসিয়া অগ্রজোপম সাহিত্যিক পূজনীয় রায় বাহাদুর জলধর সেনের সহিত চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছিল। জলধর দা বলিলেন—চণ্ডীদাসের লীলাভূমি নান্নুর দেখিয়া আসা উচিৎ। তিনি ইতিপূর্বে একবার দেখিয়া আসিয়াছেন। "আমি যদি যাই তিনি মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর সময় আমাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারেন।" "যদি যাই?" আমি বলিলাম, "যদি নয় দাদা, নিশ্চয় যাইব। চণ্ডীদাসের লীলাভূমি, সে ত মহাতীর্থ,—সে স্থানের ধূলি-কণাটি পবিত্র; তাঁর সম্বন্ধে প্রত্যেকটি কথা আমার কাছে মধুর!" জলধর দা বলিলেন—নান্নুরের সন্নিকটে লাভপুরে খ্যাতনামা নাট্যকার নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন। তাঁহার বাড়ীতে গিয়া ওঠা যাইবে। কথাবার্ত্তা এইরূপই স্থির রহিল। মধ্যে অগ্রহায়ণ ও পৌষ, দুইমাস এমন বেশী সময় নয়, কাটাইয়া দিতে পারা যাইবে। জলধরদা'কে শ্রীপঞ্চমীর দিনটা বিশেষ-রূপে স্মরণে রাখিতে অনুরোধ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। "অনেক তপের ফলে বিধি আনি দিল মোরে।"

অগ্রহায়ণ, পৌষ গেল, মাঘ আসিল, উল্লসিত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু 'বিধি হৈল বাদী!' জলধর দাদা অসুখে পড়িলেন। অসুখটা দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলেই ভয় পাইয়া গেলেন। অজাতশত্রু দাদার শয্যাপার্শ্বে বঙ্গের খ্যাতনামা অখ্যাত নামা সকল সাহিত্যিককেই উদ্বিগ্ন মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিতাম। বোধ হয় তাঁহাদের মিলিত শুভেচ্ছার বলেই দাদার ফাঁড়া কাটিয়া গেল; কিন্তু চিকিৎসক গিরীন্দ্রশেখর (সাহিত্য-রসিক গিরীন্দ্রশেখর বসু এম্-ডি) দাদাকে চারিপাশে বনবাসে সীতার মত একটা গণ্ডী টানিয়া দিয়া তাহারই মধ্যে থাকিতে বলিয়া গেলেন। সীতা-দেবী গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কি বিপদে যে পড়িয়াছিলেন তাহা ত কাহারও জানিতে বাকী নাই; দাদাকে সেই কারণেই কি না জানি না গণ্ডীর বাহিরে আনা গেল না। অতএব দাদা হরিঘোষের স্ট্রীটস্থ একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহের দশহাত লম্বা ও আটহাত চওড়া ঘরের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর আমার,—'মনের বাসনা রৈল মনে, চোখে বয়ে গেল দরিয়া!'

কিছুদিন পরে— চাকা ঘুরিল। পর্বত মহম্মদের কাছে গেল না বটে, মহম্মদ পর্বতের কাছে আসিয়া উপস্থিত। নাট্য বিদ্যাভারতী নির্ম্মলশিববাবু একদিন শিশির আফিসে আসিয়া চণ্ডীদাস তীর্থ দেখিবার নিমন্ত্রণ দিলেন। বন্ধুবর সাহিত্যিক হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন সঙ্গে ছিলেন। তিনি কবিত্বপূর্ণ ভাষায় অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কায়দায় চণ্ডীদাসের ভিটা ও সমাধি সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া আমার বাসনা জাগ্রত করিবার চেষ্টায় ছিলেন বোধহয়, নির্ম্মলশিব বাবুর কথা শেষ হইতেই তাঁহাকে হাঁ করিতেও দেখিয়াছিলাম, আমি তৎপূর্বেই কহিলাম, যাইব এবং আজি হইলে কাল নয়। হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন, তাঁহার বক্তৃতার আশায় ছাই পড়ায় যে পরিমাণ হতাশ হইলেন, নির্ম্মলশিব বাবু ততোহধিক পরিমাণে সুখী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হইল। সেদিন ছিল বুধবার। আমাদের কাগজ বাহির হয়, একখানা বৃহস্পতিবার-শেষ, অপর খানা শুক্রের প্রথমে। কাগজ বাহির না করিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না বলায়, নির্ম্মলশিববাবু ব্যবস্থা করিলেন, এইরূপ— আমরা শুক্রবার বেলা দশটার গাড়ীতে রওনা হইয়া অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় লাভপুরে পৌছিব; নির্ম্মলশিববাবু অদ্য রাত্রেই যাইতেছেন—লাভপুর ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইবেন। তথাস্তু।

কথা ছিল,একপয়সার, দুই আনার ও একটাকার শিশিরের শিশিরও আমাদের সঙ্গী হইবেন। কিন্তু যথাকালে তিনি রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। শিশিরকুমার অত্যন্ত ক্ষীণ-জীবি, কষ্ট-অসহিষ্ণু। জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরের গাড়ী চড়িয়া আমাদের নান্নুর অভিযান আরম্ভ শুনিয়াই তাঁহার স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং উৎকট শিরঃরোগ উপস্থিত হইল; পুনঃ পুনঃ উইলকার্নিস ও ষ্টার্নস 'স্তাক' গলাধঃকরণ করিলেন, তাঁহারই মোটরে আমি ও হরেকৃষ্ণ হাওড়াভিমুখে যাত্রা করিলাম।

শাস্ত্রকার বিধি নির্দেশ করিয়াছেন, পথি নারী বিবর্জিতা। পথি ব্রাহ্মণ বিবর্জিত বলিয়াছেন কি-না আমি জানি-না, কিন্তু বলিলে ভাল করিতেন; আমার মতন অনেক হতভাগা সতর্ক হইতে পারিত। হরেকৃষ্ণ ট্রেণ ছাড়িবার পূর্বে বরফ সরবৎ, শুধু সরবৎ, ট্রেণ ছাড়িলে বরফ জল, সাদা জল ত খাইলেনই, আবার তরমুজওয়ালার জন্য কাতর-করুণকণ্ঠে বাহানা ধরিলেন। পরে তিনি জিলাপী-কচুরীর বাহানাও ধরিয়া ছিলেন, ধমক দিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিলাম। বয়সে বড় হইলে কি হয়, হরেকৃষ্ণ মনে-প্রাণে একটি শিশু, সরল, শান্ত।

জ্যৈষ্ঠের দৃপ্ত মধ্যাহ্ন ভেদ করিয়া ট্রেণ ছুটিতেছে, গাড়ীতে আমি ও আমার সাহিত্যিক বন্ধু সাহিত্য-রত্ন। হরেকৃষ্ণ ফলাহারের চেষ্টায় ষ্টেশন খুঁজিতেছেন। আমি অন্য দিকে আসিয়া বসিয়া আছি; মনের ভাব ঠিক মনে নাই, তবে বোধ হয় সেইখানে ছুটিয়াছিল—নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে বাশুলী আছয়ে যথা! একটা ছোট ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। ছোট ষ্টেশন, ফ্ল্যাগ বলিলেই হয়। কিন্তু থামিল ত থামিলই। ট্রেণ চলিলে হাওয়া মিলে, থামিলে গরমে প্রাণ যায়, বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিতেছি, হঠাৎ স্তব্ধ মধ্যাহ্ন কাহাদের আর্ত্তনাদে হাহাকার করিয়া উঠিল; হরেকৃষ্ণ বলিলেন—ওহে সর্বনাশ!

ফিরিয়া দেখিলাম, এক গৃহস্থের ঘরে আগুন লাগিয়াছে। তাহার বাড়ীতে চারখানি ঘর, সকল চালই নূতন, একখানিতে তখনও ঘরামীরা কাজ করিতেছে, ছাইতেছে। এই-সময় এই ব্যাপার! গরীব গৃহস্থের বাড়ীর মেয়েরা বিস্রস্ত বসনে, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারা হইয়া ছেলে পিলেদের টানিয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে; পুরুষরা চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া সে দৃশ্য দেখিতেছে। শুনিলাম অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে জলাশয় নাই! জল দিয়া যে আগুন নিভাইতে হয়, সে কথা ইহারা মনে করিয়াই ভুলিয়া গেল। ট্রেণসুদ্ধ লোক, গার্ড, ড্রাইভার সকলেই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, বিনামেঘে এ যে বজ্রাঘাত! মেয়েদের কাতর আর্ত্তনাদ আজও আমি কাণে শুনিতে পাইতেছি!

চণ্ডীদাসেরই একটি পদ হৃদয়মধ্যে গুঞ্জরিয়া উঠিতেছিল,

> সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
>
> বজর পড়িয়া গেল!

—বজর না পড়ুক, আগুন ধরিল। একই যে কথা!

সব ক'খানি ঘর ভোজন করিয়া অগ্নিদেব শ্রান্তভাসে কৃষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। গার্ডের হাতের ঝাণ্ডী উঠিল, বাঁশী বাজিল; কম্পিতহস্তে ড্রাইভার গাড়ী চালাইয়া দিলেন; সারা গাড়ীতে কম্পনটুকু অনুভূত হইল; আমরা দাঁড়াইয়া ছিলাম, টলিয়া পড়িয়া গেলাম!

(ক্রমশঃ)

"হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট"

[সফিয়া খাতুন বি-এ]

প্রায় মাস দেড়েকের কথা। কোন এক "সোস্যাল্ গেদারীং" এ মিঃ পাল বলেছিলেন, তখনকার দিনে আমরা প্যাক্ট ন্যাষ্টএর ধার ধারতুম না। ঘুষ দিয়ে মুসলমানদের দলে এনে দলটা বড় করবার চেষ্টা করি না।" সেদিন মনে মনে পাল মহাশয়ের উপর বড় চটে গেছলাম। মনে হয়েছিল—ওটা বুঝি স্বরাজ্য দলের উপর তাঁহার ঝাল মেটানো। কিন্তু এখন দেখছি আমারই ভুল ছিল। মিঃ পাল হয়ত সত্যি কথাই বলেছিলেন।

খবরের কাগজে যখন দেখতে পেলাম যে ৮০জন মুসলমান ও তিনজন হিন্দুকে Calcutta Corporation এ চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তখন বড় হাসি পেয়েছিল, দুঃখ ও হয়েছিল। হাসি পেয়েছিল, এইজন্য যে সেই অতীতের স্বদেশীর যুগে ইংরাজ রাজ-সরকার মুসলমানকে ঠিক এমনি করে চাকুরীর লিপ্সা দিয়ে শুধু যে সেই আন্দোলনের বিদ্রোহী করেছিলেন তা নয়, মুসলমানের প্রাণে হিন্দু-বিদ্বেষ ভাবও জাগিয়ে দিয়েছিল।

আর দুঃখ হয়েছিল বাংলার মুসলমান সমাজের আশ্রয়হীন অবস্থা, তার আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার অক্ষমতা দেখে। এই প্যাক্ট বাংলার অপরাপর সমাজকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে মুসলমানের মত এত দুর্ব্বল, এত নীচমন জাত বুঝি দুনিয়ায় আর দুটী নাই। মুসলমানকে টাকা, ঘুষ বা চাকুরী দিলে তাদের দিয়ে না করান যায় এমন কাজ বুঝি দুনিয়ায় আর দুটী সৃষ্ট হয় নাই। এই প্যাক্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বাংলার মুসলমান এখনও সভ্য হয় নাই, তাই হিন্দুরা তাদের সভ্য করবার জন্য, তাদের প্রাণে দেশ-প্রাণতা জাগাবার জন্য চাকুরী দিয়ে দলে নিচ্ছে। এই প্যাক্ট যারা মনে হয় যেন মুসলমান হিন্দুর কাছে যেয়ে বলছে "আমি হে তোমারী কৃপার ভিখারী থাকিতে চাই হরি চিরদিন।" এই প্যাক্ট যেন বলছে, "বড় বড় কাজ দেবো, দেশের কাজ কর, দেশের জন্য আত্মত্যাগ কর। তোমাদের মধ্যে এখনও সে রকম শিক্ষিত লোক না হলেও কোন দোষ নাই, কাজ তোমরাই পাবে।"

মুসলমান পাঠক একবার ভেবে দেখ এতে তোমার লজ্জা হয় কি না। সারাটা বাংলার কত মায়ে-তাড়ান বাপে-তাড়ান হিন্দু অসহযোগী ছেলে কলকাতার রাস্তায় অনাহারে দিন কাটাচ্ছে; খিদিরপুর ডক জেল বোধহয় এক ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ঢাকা ও বরিশাল জেলার বাঙ্গাল ছেলেদের দিয়েই ভরে ছিল, তাতে মুসলমান যে না ছিল তা নয়, অর্দ্ধেকের চাইতে বেশী বোধহয় খিলাফত স্বেচ্ছাসেবক ছিল কিন্তু তারা বাংলার শিক্ষিত মুসলমান ছিল না, সে সব ছিল হিন্দুস্থানী মুসলমান যারা বাংলাতে কথা পর্য্যন্ত বলতে জানে না।

কিন্তু সেসবদের একটীও Corporation এ চাকুরী পায় নাই। কারণ তারা বাংলা ভাষা জানে না। কিন্তু যেসব হিন্দু ছেলে দু'তিনবার করে জেল খেটেছে তাদেরে চাকুরী না দিয়ে তোমাদের ছেলের যারা আন্দোলনে যোগও দেয় নাই তাদের কাজ দেওয়া হয়েছে দেখেও কি তোমাদের লজ্জা হয় না যে হিন্দু তোমাদের চাইতে কত উঁচে, তারা দেশের জন্য না ত্যাগ করতে পারে এমন কিছু নাই!

এই প্যাক্ট হতে মনে হয় যেন মুসলমানদের সত্যিকার মত দেশের কাজ করবার ইচ্ছা মোটেই নাই। শুধু হিন্দুদের অনুরোধে বা চাকুরীর প্রলোভনে পড়ে দেশের কাজ করা। দেশের জন্য যত মাথা ব্যথা যেন হিন্দুরই। তাই তারা নিজের ছেলেদের অনাহারে রেখে শুধু তোমাদের হাতে রাখবার জন্য যাতে তোমরা আবার ইংরেজের পদলেহন বা তোয়াজ করতে না যাও। একবার ভেবে দেখ হিন্দুসমাজ আজ কি ত্যাগের মহিমা দেখিয়ে দিয়ে গেল। চেয়ে দেখ তার স্থান কত উচ্চে। তোমাকে সবগুলি চাকুরী দিয়েও সে নীরব। তাই ভাব দেশ মাতৃকার সেবায় আজ হিন্দু সমাজ কত ব্যাকুল। তাঁরা যেন "নিহিলিষ্ট" ও বেকুইনিন্ পন্থী মেয়েদের মত বলছে—"We can sacrifice our body and beauty to a scoundral if required, for the sake of our country's freedom"

তার মানে এইযে দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদের দেহ ও যৌবন যদি একটা অসচ্চরিত্র লোকের নিকট বিক্রি করতেও হয়—তাতেও রাজী আছি।

আজ Corporation এর চাকুরিতে যে ৮০টী মুসলমান যুবক স্থান পেয়েছেন তাদের আটটীও বোধহয় জেলে যান নাই। কারণ আন্দোলনের প্রথম হতে খুব কড়া নজর দিয়েই দেখে আসছি কয়টা মুসলমান ছেলে কলেজ ছেড়ে ছিলেন বা জেলে গিয়েছিলেন। যারা গিয়েছিলেন তাদের নামও করতে পারি। এই আন্দোলনে শ্রীহট্ট জেলার হিন্দুর চাইতে মুসলমান ছেলে স্কুল কলেজ ছেড়েছে বেশী। বাংলার আর কোন জেলায় এত ভদ্রবংশের এবং শিক্ষিত মুসলমান ছেলেরা জেলে যায় নাই। অন্যান্য জেলার মুসলমান নেতাদের আত্মীয় স্বজনরা স্কুলকলেজ ছেড়ে ছিল, তাছাড়া বড় একটা নাম শুনি নাই। কিন্তু সেসব ছেলেদের একটাও যে Corporation এর চাকুরী করতে যায় নাই তার কোন ভুল নাই। গিয়েছে কারা—যারা কলকাতার রাস্তায় কিন্ কিনে ফরাসডাঙ্গার ধুতি পরে নাকে চসমা এঁটে, মাথায় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের মত টেড়ী কেটে, মুখে বার্ড্ সিগারেট টেনে বেড়াত।

যাক্ এসব বলে আর কি হবে। এখন প্যাক্টএর কর্ত্তাদের কথা বলি। প্যাক্ট এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলমানের একতা। কিন্তু এটা কি রকম একতা? প্যাক্ট সৃষ্টি হবার পর দেখছি দিন দিন হিন্দুনারী মুসলমান গুণ্ডা কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হবার পালা বেড়ে যাচ্ছে। কৈ, সে বিষয়েত প্যাক্ট নেতাদের সাড়াশব্দ শুনিনা। জিজ্ঞেস করতে চাই—হে বাংলার হিন্দুমুসলমান প্যাক্ট! সে সব নির্য্যাতিত হতভাগিনীদের প্রতি কি তোমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই? জিজ্ঞেস করতে চাই আজ সে সব হতভাগিনীরা তোমাদের বাংলার কাউন্সিলে স্বরাজ্য দলের পক্ষে যেয়ে ভোট দিতে পারবে না বলে কি তাদের প্রতি তোমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই?

কিন্তু হিন্দু প্যাক্টওয়ালাদের উপর রাগ করা বোধহয় আমার ভুল। কারণ তাঁরা হয়ত ভাবছেন পাছে তাঁদের এত তালি-সেলাই দেওয়া হিন্দু মুসলমানের একতা ছিঁড়ে যায় তাই হয়ত সে সব কাজে হাত দিচ্ছেন না। কিন্তু তাঁদের কথা আলাদা। আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই—? যেসব জায়গায় এমনি নিষ্ঠুর ভাবে হিন্দু মেয়েরা নির্য্যাতিত হচ্ছেন সে সব জায়গায় দেশভক্ত লোক পাঠিয়ে সেসব মুসলমানদের শিক্ষিত করা কি আমাদের উচিৎ নয়? হিন্দুর কাছে যে আমাদের মুখ দেখাবারও জোটি নাই। তারা যেন গৌরাঙ্গের মত মার খেয়েও জগাই মাধাইকে বলছে—"মেরেছিস্ বেশ করেছিস্, তবু মুখে বলরে হরি।"

তুমি সে আমার প্রাণের অধিক
বোঝে সে তোমারে কহি।

* * * *
* * *

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]   ৩১শে শ্রাবণ, শনিবার, ১৩৩১ সাল।   [চত্বারিংশ সপ্তাহ

একবিংশ-শতাব্দী-নারী-চরিতম্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাঙ্গালী-জাতি ভীরু কাপুরুষ—একথা যদিচ সকলে বলে, আমরা বলি না। বাঙ্গালীর সাহসের পরিচয় আমরা জানি বলিয়াই তাহাদিগকে ভীরু-কাপুরুষ বলিতে আমরা পারি না। আমরা যত নিকট পরিচয় তাহাদের পাইয়াছি, এমন কয়জনে পাইয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি! আমরা দেখিয়াছি সে শৌর্য্য—যাহাতে ম্যালেরিয়ায় ভোগা, ইনকম্ ট্যাক্সের জ্বালায় জর জর, কলম পিষিয়া পিষিয়া কুব্জদেহ বাঙ্গালীর সাহসিকতার পরিচয় নিঃসন্দেহে ফুটিয়া থাকিত! মনে করুন, সেই দিনের কথা, যেদিন আফিস হইতে ফিরিয়া জল খাবার পাইতে দেরী হইলে পুত্র প্রহৃত, দাসী উৎপীড়িত, পাচক পলায়িত, গৃহিণীর নেত্র অশ্রুপূরিত হইত? আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি সে বীর্য্য সেইদিন, যেদিন সাহেব-বুট-রজঃ-মণ্ডিত দেহে, কাবুলিওয়ালার লাঠৌষধি-সঞ্জীবিত প্রাণে বাবু গৃহে আসিয়া সাহেবকে শমন-সদন ও কাবলীওয়ালাকে কারা-গারে পাঠইতেছেন! দেখিয়াছি সে ঔদার্য্য সেইদিন, যেদিন বাবু মুদীর রক্তচক্ষু, কাপড় ওয়ালার সমন, গোয়ালার গালা-গালিতেও নিশ্চল, নিস্পন্দ, নির্ব্বিকার! আমরা দেখিয়াছি সে সহিষ্ণুতা, বৈবাহিক (কন্যার শ্বশুর) ব্যাকরণ বহির্ভূত, শাস্ত্র-অসম্মত বাক্যবাণেও জর্জ্জরিত করিতে না পারিয়া

Keep to the Left

কন্যাকে ফাটকে বন্ধ করিবেন বলিয়া যাইতেন! ধরিত্রী টলমল করিত, কিন্তু কি সে অসম্ভব সহিষ্ণু বাঙ্গালী-বাবুর হৃদয়, তাহাতেও কম্পিত নহে! আমরা দেখিয়াছি সে স্বদেশ-প্রাণতা, পথে পুলিস, চারিদিকে আইনের বেড়াজাল, "স্বদেশ" উচ্চারণ করাও যখন বিধি-নিষিদ্ধ, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দেশোদ্ধারের জন্য সে কি অনলবর্ষী বক্তৃতা! সে কি প্রাণপণ-করা চেষ্টা যত্ন? যখন পথে বাহির হইলে পুলিস পাকড়াও করিতেছে, আদালতে বিচারকগণ দণ্ড দিতে দিতে দরদরধারে ঘামিতেছে, জেল-খানা-রূপ মধুচক্র স্বদেশ-প্রাণ মৌমাছির ভিড়ে ভরিয়া উঠিয়াছে, ভন্ ভন করিতেছে, তখন বাঙ্গালী-বীর কি অমানুষিক শক্তির বিকাশই না দেখাইয়াছে? বন্ধ-দ্বারের ভিতর বসিয়া তাহারা অবিচারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চালাইয়াছে; ন্যায় বিচারের নামে যে অন্যায়-অবিচার হইতেছে, তাহার ভীষণ তীব্র

বলং বলং লাঠি বলম্
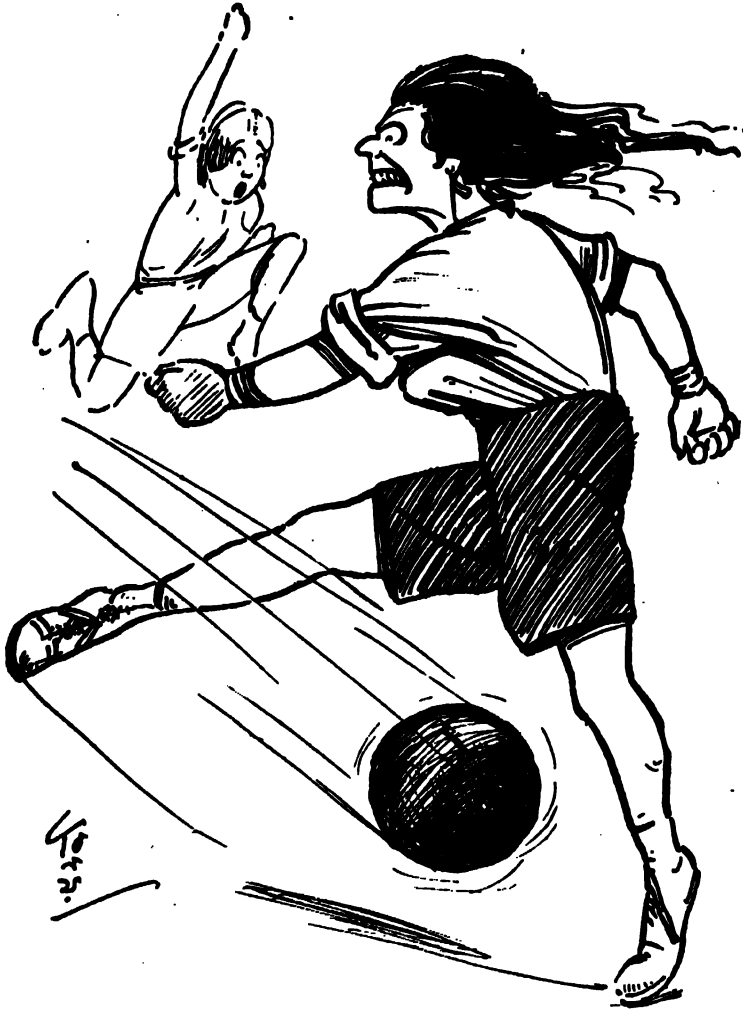
—গোলের বাবা—না, না বাবা নয়, ওটা পুংলিঙ্গ গোলের-মা করে তবে ছাড়বো।

প্রতিবাদ করিয়াছে; জেলখানার সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া তাহারা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছে; হিমালয় ধ্বংসকারী হস্তপদ সঞ্চালিত করিয়াছে। আমরা সে সকল দৃশ্য দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, তাহারা লাট-সাহেবের মাহিনা রদ করিবার অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছে; বড় লাটের ছুটি না-মঞ্জুর করিবার জন্ম বিলাতে টেলিগ্রাফ করিবার চাঁদা উঠাইয়াছে; জঙ্গী-লাটের ক্ষমতা হ্রাস করিতে বড় বড় কাব্যই লিখিয়াছে! বাঙ্গালী না করিয়াছে কি? অকুতোভয়ে সকল বীরোচিত কার্য্যই তাহারা করিয়াছে; ভয়-ডর নাই, নির্ভীক, তেজোদৃপ্ত!

বাঙ্গালী কাহাকেও ভয় করে না। এমন যে স্ত্রীজাতি, পৃথিবীর সকলেই যাহাকে ভয় করে, সমীহ করে, বাঙ্গালী তাহাদেরও থোড়াই কেয়ার করিয়া দিয়াছে! শুনিয়াছি ও কেতাবে পড়িয়াছি, সাহেবরা—যাহারা অর্দ্ধ-পৃথিবীর ঈশ্বর বলিয়া খ্যাত, তাহারা স্ত্রীর ভয়ে এতই জড়-সড় যে একটি দিনও তাহাদের ফেলিয়া রাখিয়া হাওয়া খাইতে যায় নাই, নাচে যোগ দেয় নাই; থিয়েটার দেখে নাই; ভোজ খায়

নাই। যদি কোন দুর্ব্বুদ্ধিগ্রস্থ সাহেব কদাচ কোনদিন তেমন অপকর্ম্ম করিয়াছে, স্ত্রী তাহাকে আদালতের কাঠগড়ায় টানিয়া তুলিয়াছে; ফারকত মঞ্জুর করাইয়াছে, খোরপোষ আদায় করাইয়া লইয়াছে। সাহেব তটস্থ! কিন্তু বীর-বাঙ্গালী কোনদিনই দুর্ব্বলা নারীর ভয়ে কাঁপে নাই! বরং বাঙ্গালী রমণীই বীরবরদের ভয়ে কাঁপিয়াছে, কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাদের পতন ও মূর্চ্ছা হইয়াছে।

যদি বল সেটা দোষের কথা, কিন্তু সে দোষ কার? আমাদের! তাহারা না খাইলে আমরা খাইতাম না; কম খাইলে মাথা বাড়াইয়া দিয়া মাথাটি খাইতে অনুরোধ জানাইতাম। পাণ হইতে চুণ খসুক আর নাই খসুক, তিরস্কার খাইতাম, অশ্রু-তোড়ে নদী বহাইতাম। এতখানি প্রশ্রয় দিলে—নাই দিলে মাথায় না উঠে কোন্ জীব? পুরুষ ত ছার! এক কথায় পুরুষ স্ত্রীকে ভয় করিত না।

তবে কি বাঙ্গালী পুরুষ কাহাকেও ভয় করে না? করে—পুলিশকে তাহারা যথেষ্ট ভয় করে। মাথার সিঁদুরকে ভয় করে না; কিন্তু লাল-পাগড়ী দেখিলেই তাহাদের প্লীহা-কম্পন উপস্থিত হয়। সুতরাং

এবার তিন রান্ নিশ্চয় ....

আমাদের সিঁদূর ত্যাগ করিতে হইয়াছে, লাল-পাগড়ী ধারণ করিতে হইয়াছে!

বাঙ্গালী আর ভয় করে উত্তমর্ণকে। উত্তমর্ণের চেহারা দূরে থাক্‌, তাহার গামছা দেখিলে লিভার ফাটে! যদিও বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ব্যবসা, তথাপি আমাদের সেরূপও পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে—যুগে-যুগে-শতাব্দীতে শতাব্দীতে বাঙ্গালী পুরুষ নারী নির্য্যাতনই করিয়াছে, নারী-নির্ব্বাসনই দিয়াছে, আজ বাঙ্গালী-পুরুষগণকে বুঝাইতে হইবে যে নারী তাহা সহিয়াছিল কেবল মাত্র ভদ্রতা হিসাবেই! জানি নারীর ইহা কার্য্য নয়, কিন্তু কি করা যাইবে! আজ তাহার প্রয়োজন হইয়াছে। অপাঙ্গের বল আর বল নাই। এখন লাঠির বলই পরম বল!

একদম টু দি আয়ারল্যাণ্ড।

না-জাগিলে সব ভারত-ললনা
ভারত আর জাগে না জাগে না!—

কবি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতেই ইহার সার্থকতা আমরা বুঝিয়াছিলাম। তখন হইতেই জাগিবার চেষ্টা আমরা করিতেছিলাম। জাগিতে হইলে যেমন মুগুর ভাঁজার প্রয়োজন, স্পোর্টস্‌—খেলাধূলার

তেমনি প্রয়োজন। বিংশ-শতাব্দীতে খেলা-ধূলা বলিতে আমরা তাস-পাশা বুঝিতাম, এখন খেলা-ধূলা বলিতে বুঝি, ফুটবল, ব্যাটবল, হকি! যদি জাগিতেই হয় তবে ভালরূপেই জাগিতে হইবে! মোহন বাগান একবার বিংশ শতাব্দীতে শিল্ড পাইয়া ভারী জয়ঢাক পিটিয়াছিল। আমাদের শিল্ড সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বথা প্রাপ্তব্য!

মোটর ড্রাইভিং নূতন নয়, শক্তও নয় কিন্তু তাহাও করিতে হইতেছে। আজ সাফুর নাই, স্বামীর শরীর সুস্থ নাই, তিনিও ড্রাইভ করিতে পারিবেন না, অতএব নারী তুমি, অচল-গিরির মত ঘরে বসিয়া থাক, ইহা আর চলিবে না। ভঁপ্পর ভোঁ, ভঁপ্পর ভোঁ—আমরাই ষ্টার্ট দিব, নবনীত কোমল হস্তে ষ্টিয়ারিং ঘুরাইব, গড়ের মাঠে গাড়ী চালাইব, সাহেবদের সঙ্গে রেস্ দিব।

কিন্তু প্রকৃত বীরাঙ্গনা হইতে হইলে অশ্বারোহণ করিতেই হইবে! বিনা অশ্ব কোন আশা নাই। যখন আমরা বীর-বেশে অশ্বারোহণে
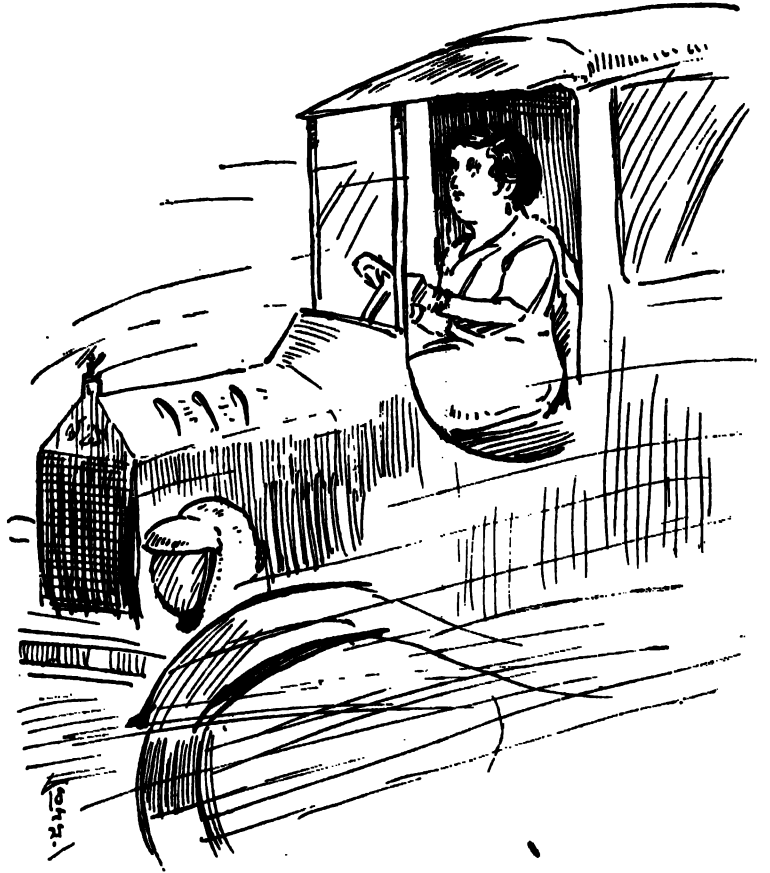
একটু হাওয়া, একটু রেশ্
সেই ত চাই, সেই ত বেশ।

বাহির হইব, পুরুষগণ নয়ন বিস্ফারিত করিয়া তাহা দেখিবে,দেখিতে দেখিতে হয় ত অন্ধ হইয়া যাইবে, ভাবিবে যে এই তেজোদৃপ্ত জাতিকে আমরা এতদিন শাসন করিয়া রাখিয়াছিলাম। অতীতের গর্ব্বে তাহার বক্ষ ভরিয়া উঠিবে, কিন্তু অন্ধকারময় বর্ত্তমানের কথা মনে করিয়া কাঁদিবে; বড় কাঁদিবে! কাঁদিয়া বাঙ্গালা দেশের নদ-নদীর সংখ্যা বাড়াইবে, পুকুর-ডোবা ভরাইবে, বাঙ্গালা দেশের জলাভাব ঘুচিবে, বাঙ্গালা দেশ সত্যিকারের সুজলা হইয়া উঠিবে এবং সুজলা হইলে দেশ সুফলা,সুফলা হইলে অবশ্যই মলয়জ শীতলাং ও হইবে এবং শ্যামলাং হইতেও দেরী হইবে না। দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইবে; বঙ্কিমবাবুর, রবিবাবুর, দ্বিজুবাবুর গান লেখা সার্থক হইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রায়শ্চিত্ত

[শ্রীসরোজ বাসিনী গুপ্তা]

—১—

আলাদিনের 'আশ্চর্য্য প্রদীপ' প্রাপ্তির মত অমর তাহার মাতুলের বহু টাকার কোম্পানীর কাগজ এবং জমিদারীটা আশ্চর্য্য রকমেই পাইয়া গেল।

অমরের মাতুল হরেন্দ্রনারায়ণ রায় পিতৃ পিতামহের আমলের নিতান্ত সেকেলে ধরণের গৃহে নিতান্ত সেকেলে ধরণেই জীবন যাপন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি প্রায় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করিয়া সহসা একদিন বুঝিলেন যে, সম্পত্তির রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দিয়া যাইবার মত লোক তাঁহার কেহ নাই। পিতার আমলের দাস-দাসী এবং আশ্রিত দরিদ্র জ্ঞাতি কুটুম্ব যাহা ছিল, সে সব তিনি বিদায় দিয়া একটি ভৃত্য ও একজন দাসী লইয়া বন্ধ্যা-পত্নী সহ অতবড় গৃহে বাস করিতেছিলেন। ইহাদের কাহাকেও তো বুকের রক্তের মত সম্পত্তিটা দিয়া যাইতে পারা যায় না। হরেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী তখন প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার হইয়া যাইতেছিলেন, পুত্রলাভের কোন আশাই ছিল না। স্বর্ণের প্রতি হরেন্দ্রনারায়ণের যেরূপ অনুরাগ ছিল, কোন স্বর্ণবর্ণার প্রতি তেমন অনুরাগ তাঁহার কোনদিনই ছিল না। সুতরাং তিনি বাঙ্গালা দেশের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী নূতন স্ত্রী সংগ্রহে মনোনিবেশ না করিয়া পুরাতন স্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, আমাদের ছেলে পুলে তো কিছু হ'লোনা; এসব কার কাছে রেখে যাব?" স্বামীর ধনাকাঙ্খার কাছে স্ত্রী তাঁহার আসন একটি দিনের জন্যও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। যৌবনেও রূপসী স্ত্রীর কাছে বসিয়া প্রেম চর্চ্চা করা অপেক্ষা বাহিরে বসিয়া ধনবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন চর্চ্চা করা হরেন্দ্রনারায়ণ মধুরতর বলিয়া জানিতেন। তাই আজ স্ত্রী একান্ত উদাসীনভাবে জবাব দিলেন, "আমি তার কি জানি।" স্বামী বলিলেন, "পুষ্যি পুত্র নেব?" "সে তোমার ইচ্ছা" বলিয়া স্ত্রী চলিয়া গেলেন। হরেন্দ্রনারায়ণ তখন হইতে কিছুদিন বসিয়া একটি দত্তক রাখিয়া নিজের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া রাখিয়া যাইবার কল্পনা করিতে করিতে সহসা একদিন কল্পনার দ্বার চিররুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন: সন্ন্যাস রোগ অতি অল্পক্ষণে তাঁহার সব শেষ করিয়া দিয়া গেল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীও আর বেশীদিন টিঁকিলেন না। যে অমর মাতুলের জীবনে তাঁহার স্নেহাস্বাদ পায় নাই, মরণে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় ধনসম্পদ পাইয়া গেল। ইহাই অমরের বড়লোক হওয়ার ইতিহাস।

অমর জমিদার হইয়াই পুরাতন বাসগৃহের সংস্কার সাধন করিয়া মূল্যবান সজ্জা সমূহে গৃহ মণ্ডিত করিয়া তুলিল। ইহাতেও তাহার মন উঠিল না; তাই সে মনের মত করিয়া একখানা বাগান বাড়ী তৈয়ারী করিল। বাগানে নাচ, গান, পান ভোজন সপ্তাহে সপ্তাহে চলিতে লাগিল। তাহার খরচের বহর দেখিয়া বন্ধুবর্গ বলিত, "অমর গরিবের ছেলে হ'লেও তার মন খুব উঁচু, খরচ করতে জানে বটে!" বৈষয়িক কার্য্যে তাহার অনভিজ্ঞতা ও অনাসক্তি দেখিয়া কর্ম্মচারীরা বলিত, "একেই বলে বাবু! বুড়ো কর্ত্তার মত আমাদের সব কাজে ইনি চোখ কাণ পেতে থাকেন না। এঁর নজর তাঁর মত ছোট নয়।"

আজ অমর বাগান বাড়ীতে নাচ গানের কোন বন্দোবস্ত করিতে না পারিলেও প্রচুর পান ভোজের আয়োজন করিয়াছে। কলিকাতা হইতে তাহার বন্ধু বিলাস এখানে শিকার করিতে অসিয়াছে। বিলাসের সম্বর্দ্ধনার জন্যই এই আয়োজন।

বৃহৎ হল ঘরে সুন্দর শুভ্র ফরাসের উপর মজলিস বসিয়াছে। রেশমী ঝালর যুক্ত তাকিয়ায় ঈষৎ হেলিয়া অমর ও বিলাস বসিয়াছিল। তরল অগ্নির করুণায় সকলের চক্ষুই ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। রক্তজবার মত রক্তিম উল্লাসে সকলের হৃদয়ও উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল। অদূরে বসিয়া একজন বাদক এস্রাজ বাজাইতেছিল। এস্রাজে

তাহার হাত নিপুণ হইলেও অনেকেরই তাহা তৃপ্তিজনক হইতেছিল না। বিলাস অমরের কাণের কাছে মুখ লইয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "এই এস্রাজের সঙ্গে কোন মিষ্টি গলার যোগ থাকলে বাজনাটা কেমন মিষ্টি লাগত ভাই?"

অমর দুঃখিত ভাবে জবাব দিল, "অনেক চেষ্টা করেছি ভাই, কিন্তু যোগাড় করতে পারিনি। তোমরা সহরে লোক; তোমাদের কাছে তো যা-তা আনা যায় না।"

অমর ও বিলাসের কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়াছিল প্রমোদ। সে বলিল, "অমর, তুমি দুঃখিত হচ্ছ কেন? বিলাস বাবুতো হপ্তা খানেক এখানে আছেন। এর মধ্যে আমি তোমাকে এমন একটা বাগান পার্টির যোগাড় ক'রে দেব, যাতে তোমার মনে কোন ক্ষোভ না থাকে।"

প্রমোদের কথা শুনিয়া বিলাস নীরবে ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি হাসিল। প্রমোদ তাহাতে বিরক্ত হইয়া ক্রোধের উত্তেজনার সহিত বলিল, "বিলাস বাবু, হাসলেন যে বড়? আমরা গেঁয়ো হ'লেও আমাদের রুচিটা ঠিক গেঁয়ো নয়, সে আপনি দেখে নেবেন।"

বিলাস বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলিল, "প্রমোদ বাবু, যা দেখাবেন, সেটা আগে শুনতে পেলে বাধিত হব।"

অমর জানিত, এরূপ বিদ্রূপ বরদাস্ত করিবার মত মেজাজ প্রমোদের নয়। হয় তো প্রমোদ এখনই একটা কলহ বাধাইয়া বসিবে। সে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু; বিলাস ও বন্ধু, বিশেষতঃ অতিথি। তাই সে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিল, "বিলাস, সহরে আজকাল কোন্ বাইজীর বেশী প্রতিপত্তি?"

বিলাস বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "কেন, তুমি চামেলীর নাম শোননি?"

"না ভাই, এটা আমার দুর্ভাগ্য বলতে হবে।"

"ঠিক তা নয়। তুমি তো বছর খানেকের মধ্যে কলকাতা যাও নি। মোটে এক বছর হলো চামেলী দিল্লী থেকে এসেছে।"

"দিল্লী থেকে এসেছে! সে বাঙ্গালী নয়?"

"বাঙ্গালীই বটে, কিন্তু তার শিক্ষা-দীক্ষা দিল্লীতে। রাজধানীর প্রমোদ উদ্যানের ফুটন্ত পদ্ম সে। এমন মিষ্টি গলা,—এত রূপ. আমি আর কখন দেখি নি।"

এতক্ষণ সভাস্থ সকলে প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অমর ও বিলাসের কথা শুনিতেছিল। এখন হরলাল হাঁপ ছাড়িয়া অমরের পানে চাহিয়া বলিল, "বাবু ইচ্ছা করলে এখানে বসে সেই চামেলী বাইজীর গানও আমাদের শোনাতে পারেন।"

বিলাস বলিল, "তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। সহরে খুব বড় বড় ধনীর মজলিসে তাকে দু'তিনবার ছাড়া দেখা যায় নি। কলকাতার অনেকেই তাকে মুজরায় রাজি করতে পারেনি, তা মফঃস্বল!"

গোপালের নেশাটা বেশ জমিয়া উঠিতেছিল। সে পান পাত্র পূর্ণ করিয়া সকলের হাতে দিয়া বলিল, "চামেলীকে এখন রেখে দিন; যা চলছে, তাই চলুক।"

গোপালের পরামর্শ সমীচীন বলিয়া আপাততঃ সকলেই তাহা গ্রহণ করিল। এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের এমন অবস্থা হইল যে, উপাদেয় খাদ্যগুলি কিছু বা অর্দ্ধভুক্ত, কিছু বা পড়িয়া রহিল। রাত্রি প্রায় দুইটার সময়ে তাহারা টলিতে টলিতে কোনরূপে শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিল।

—২—

পরদিন প্রমোদ অমরকে নিভৃতে পাইয়া বলিল, "অমর, আমি আজ কলকাতা যেতে চাই।"

অমর হাসিয়া বলিল, "চামেলীকে নিমন্ত্রণ করতে?"

প্রমোদ অমরের হাসিতে যোগ না দিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, "হাঁ। আমি তোমার সহুরে বন্ধুর গুমর ভাঙ্গতে চাই।"

অমর বলিল, "কিন্তু তার গুমর ভাঙ্গতে যেয়ে নিজের গুমরই ভেঙ্গে আসবে; চামেলী আসবে না।"

প্রমোদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে জানলে তুমি?"

"বিলাস যে বলেছে।"

"ওটা কাজের কথা নয়; সহুরে লোকের অহঙ্কার। তুমি যদি টাকা খরচ করতে পার, তা হলে চামেলীর গোষ্ঠী-সুদ্ধ আসবে। আর তুমি যদি বেশী টাকার কথা শুনে ভয় পাও—"

"কি যে বল তুমি! আমি কি মামার মত কৃপণ?"

"তা হলে কি আমাদের বাঁচবার উপায় ছিল? তোমার মত বন্ধু প্রাণ—"

"আঃ! ও-সব বাজে বুক্‌নি রেখে দাও। কলকাতা যেতে হলে যাওয়ার উদ্যোগ কর এখন।"

"তাই করছি" বলিয়া প্রমোদ অত্যন্ত খুসী মনে প্রস্থান করিল।

বৈকাল বেলা প্রমোদ কলিকাতা চলিয়া গেল। তাহার যাওয়ার কথাটা বিলাসের নিকট গোপন রাখিতে অমরকে বলিয়া গেল।

দু'তিন দিনেও প্রমোদ ফিরিয়া আসিল না। অমর বুঝিল, সে চামেলীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সাধনায় লাগিয়া গিয়াছে। তাহার ধূলি-মলিন 'মান' রক্ষার জন্য প্রমোদের এই বিপুল প্রয়াস দেখিয়া সে মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

বিলাস চার পাঁচ দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ও দু'চারটা পাখী ছাড়া আর কোন শিকার মিলাইতে পারিল না। অবশেষে সে বিরক্ত হইয়া অমরকে বলিল, "আর ভাল লাগছে না, আজ চলে যাই।"

অমর বলিল, "শিকারের সাধ মিটল?"

বিলাস বিরক্তিপূর্ণ-স্বরে বলিল, "হাঁ।"

"আর দু'দিন থেকে যাও। আমাদের গ্রামটা তো তোমার দেখা হয় নি।"

"তোমাদের গ্রামে আবার দেখবার কি আছে?"

"যা আছে, তা সহরে নেই। গ্রাম পরিদর্শন করলে সহরের লোকের ঢের অভিজ্ঞতা জন্মে।"

"তবে চল, পরিদর্শনটা এখনি করে আসি।"

"এখন কি বেড়াবার সময়? রোদ উঠে গেছে যে। ও-বেলা বেড়াবে।"

"না, ও-বেলার ট্রেণে আমি যাবই। এখনি চল।" বলিয়া বিলাস উঠিয়া দাঁড়াইল। অগত্যা অমরকেও উঠিতে হইল।

অমর বিলাসকে লইয়া নানা রাস্তা ঘুরিয়া গল্প করিতে করিতে নদীতটে আসিয়া দাঁড়াইল। অদূরে মেয়েদের স্নানের ঘাট। ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতেছিল। বিলাসের লোলুপ দৃষ্টি সেই ঘাটপানে স্থির হইতে দেখিয়া অমর তাহাকে এক ঠেলা দিয়া নিজে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিল। বিলাস চমকিয়া দ্রুতপদে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠেলা দিলে কেন?

অমর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি একটা জানোয়ার, তাই।"

বিস্মিত বিলাস বলিল, "আমি কি করলাম?"

"মেয়েরা চান করছে, তাদের পানে অমন করে চেয়েছিলে কেন?"

"ওঃ, এই কথা! আমি যে একজন পরমহংসের সঙ্গে রয়েছি, তা জানতাম না বলেই চেয়েছিলাম।"

"পরমহংস নই বলেই মেয়েদের পানে অমন ক'রে চেয়ে থাকতে সাহস হয় না।"

"এত যদি বোঝ, তা হ'লে বিয়ে করে লক্ষ্মীমন্ত হয়ে ঘর-মুখো হওনা কেন।"

"তা হবার আমার উপায় নেই।"

"কেন, বল দেখি।"

অমর সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, "বেলা হয়েছে, চল, বাড়ী যাই।"

সেইদিনই বৈকালের ট্রেণে বিলাস কলিকাতা চলিয়া গেল। পরদিন সকালে প্রমোদ ফিরিয়া আসিল।

অমর তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল, "প্রমোদ, তুমি ফিরে এলে! আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি ভেড়া হয়ে চামেলীর পশুশালায় আটক পড়ে গেছ।"

প্রমোদ জুতা খুলিয়া সোফায় শুইয়া পড়িয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তা হ'লেও তাতে আশ্চর্য্য কিছু নেই। বাইরের সবাই জানে, তুমি ভয়ানক ইন্দ্রিয়াসক্ত। তুমি মদে এবং বাইজীদের নাচ-গানে অনেক সময়ে মাতাল হয়ে থাকলেও, ভিতরে বাইরে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তোমার এতটুকু যোগও নেই, সে কথা আমি তো জানি। কিন্তু সেই তুমিও চামেলীকে দেখলে উদাসীন থাকতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।"

অমর হাসিল, বলিল, "তাকে যখন দেখতেই পাব না, তখন তোমার এই অনুমানে কোন লাভ নেই। বিলাসকে

জব্দ করবার কোন উপায়ই যখন বের করতে পারলে না, তখন পাঁচদিন—"

প্রমোদ বিজয় গর্ব্বে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "কে বলেছে উপায় বের করতে পারি নি? আমি কৃতকার্য্য হয়েই এসেছি।"

"তাই নাকি? তবে এত দেরী হলো কেন?"

"চামেলীর দেখা পাওয়া কি সোজা কথা ভাই? চারদিন চেষ্টার পরে তার দেখা পেয়েছি। তোমার নাম বলতে সে খানিক স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোমার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। সব কথা শোনা হলে বলল, আমি আজ কিছু বলতে পারছি নে, কাল আসবেন। পরদিন দেখা করতে গেলে সে নিজেই উপযাচিকা হয়ে বলল, 'আমি পাঁচ সাতদিনের মধ্যে বাবুর সঙ্গে দেখা করব; আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না।' আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে আমি তাকে ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেলাম। রাণীর মত রূপ, অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, কত রাজা মহারাজা তার প্রসাদ-ভিক্ষু; নাচ-গানে অসামান্য নৈপুন্য, তবু কি নম্র স্বভাব তার।"

তুমি তার রূপমুগ্ধ, কি গুণমুগ্ধ, তাতো বুঝতে পারলাম না হে।"

"সেটা আমিও বুঝিনি। সে যে এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছে, সে কথা ভেবে কিন্তু আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হচ্ছি।"

"আমিও। যাও, এখন খেয়ে দেয়ে সুস্থ হওগে।"

অমর প্রমোদকে বিদায় দিয়া সকৌতুক-বিস্ময়ের সহিত চামেলীর কথা ভাবিতে ভাবিতে বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিল।

—৩—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, কিন্তু অন্ধকার স্বচ্ছ। অসংখ্য নক্ষত্রের মুগ্ধ আলোকে অমরের বাগানের ঘনপল্লবযুক্ত বৃক্ষ বীথিকা অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। বহুগুল্ম জাতীয় গাছে নানা রঙের ফুল ফুটিয়াছিল। কতগুলা ফুল বহুদিন বিস্মৃত স্বপ্নস্মৃতির মত সেই অন্ধকার ঠেলিয়া শুভ্রস্নিগ্ধ রূপ প্রকাশিত করিতেছিল। অমর বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বাগানের একপ্রান্তে মালীর ঘর। মালী সেখানে সস্ত্রীক বাস করিত। মালী জানিত না যে, তাহার প্রভু বাগানে বেড়াইতেছেন। তাই সে খোলা প্রাণে স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিতেছিল। এই দম্পতি নিরক্ষর। ইহারা কাব্য উপন্যাসের ধার ধারে না; কিন্তু ইহাদের ছোট ছোট এলো মেলো কথাগুলি কবিতার মিষ্ট ছন্দের মতই অমরের কাণে বাজিতেছিল। অমর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া মালীর ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশব্দে বাগানের অন্যদিকে চলিয়া গেল।

আজ অকস্মাৎ অমরের মনে বহুদিনের একটা রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই ঐশ্বর্য্যের বিলাস, এই উদ্দাম ভোগ, অমরের কল্পনার সীমার বাহিরে ছিল। ছেলে বেলায় তাহার পিতা মাতা মারা যান। তাঁহাদের সঞ্চয় কিছু ছিল না। অমর অতিকষ্টে গ্রাম্য স্কুলে পড়িয়া বেশ ভাল ভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিলেও টাকার অভাবে তাহার কলেজে পড়িবার সামর্থ্য রহিল না। সে বছর দুই চাকরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইল, তারপর জমিদার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য স্কুলেই সে মাষ্টারী পাইল। সে বিবাহ করিয়া যাহাকে ঘরে আনিয়াছিল, তাহার দেহের রূপ ছিল অতি সাধারণ, কিন্তু তাহার হৃদয় সম্পদ ছিল অতুলনীয়। অমরের কুটীরে অমলা ছিল একটি ফুটন্ত পদ্ম। তাহাকে হৃদয় উজার করিয়া ঢালিয়া দিয়াও অমর তৃপ্ত হইতে পারিতে ছিল না। একটা আবেশ-মদির-স্বপ্নের-জাল বলিয়া দু'টি বছর শেষ হইয়া গেল। স্কুল ছুটির পর সে জমিদারের সাত বছরের মেয়ে-টিকে পড়াইয়া সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিত সারাদিনের শ্রান্তি তাপের পর শান্ত শীতল মৌন সন্ধ্যা দু'টি তরুণ তরুণীকে মিলিত মুগ্ধ করিয়া দিত। হয় তো সুদর্শন দেখিয়াই জমিদার সামান্য স্কুল মাষ্টার অমরকে তাঁহার বন্ধুত্বের গৌরব দান করিলেন। জমিদারের বন্ধুত্ব-খর্পরে পড়িয়া অমর যে কেমন করিয়া রীতিমত মত্তপ হইয়া উঠিল, আজ সে তাহা মনে করিয়া উঠিতে পারে না।

ক্রমে ক্রমে অমরের এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, সপ্তদশ বর্ষীয়া অমলাকে খালি বাড়ীতে ফেলিয়া রাখিয়া সে এক এক দিন জমিদারের প্রমোদ কুঞ্জে রাত্রি যাপন করিত। তাহার অধঃপতনে অমলার অশ্রুপাতের বিরাম ছিল না।

সেই অশ্রু যে অমরকে কতখানি আঘাত করিয়াছে, তাহা অন্তর্যামী জানেন; কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আপনাকে শোধাইতে পারে নাই। একদিন শেষ রাত্রে সে স্খলিত পদে টলিতে টলিতে গৃহে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহা আজও মনে পড়িলে তাহার মস্তিষ্কে প্রলয়ের অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। তবু বুঝি আজও—আজও—অমলার সেবা অমলার স্নেহের স্পর্শ একান্ত সঙ্কোচে অমরের দেহ মনের কোন্‌খানটায় যেন লাগিয়া রহিয়াছে। নৃত্য, গীত ও সুরার অদম্য মত্ততা একদিন তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, আজও তাই করুক্।

পশ্চাতে কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ শুনিয়া অমর চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, তাহার অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইয়া এক নারীমূর্ত্তি। সেই ঈষদ্দীর্ঘ ঋজু দেহটি যে সুঠাম ও সুন্দর, তাহা অন্ধকারেও অমরের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি?

"আমি চামেলী।"

"তুমি চামেলী! তুমি এখানে!"

"আপনিই ত আমাকে ডেকেছিলেন।"

খ্যাতির অনুরূপ চামেলীর কণ্ঠস্বর সুমধুর। কিন্তু তাহা অমরের বুকে যেন হাতুড়ীর আঘাত করিতে লাগিল। সে নিকটস্থ একটা লৌহ আসনের উপর বসিয়া পড়িল, কথা কহিতে পারিল না!

চামেলী তাহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠ মধুরতর করিয়া বলিল, "আমি ভেবেছিলাম, এখানে অনাদৃত হব না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আমার আসাটা আপনার মোটেই প্রীতিকর হয় নি। আমাকে কেন ডেকেছিলেন?"

অমর চেষ্টা করিয়া বলিল, "সবাই তোমাকে ডাকে কেন?"

চামেলী সহাস্যে জবাব দিল, "সবাই তো একই কারণে আমাকে ডাকে না।"

"আমার বন্ধুরা তোমার গান শুনতে চেয়েছেন।"

"সে আমার সৌভাগ্য। আমি অবিশ্যি আপনার বন্ধুদের ইচ্ছা পূর্ণ করব। কিন্তু তার আগে আপনাকে আমার কিছু বলবার আছে।"

অমর বুঝিল, টাকার কথা। বলিল, "চল, ঘরে যেয়ে তোমার কথা শুনি।"

চামেলী অমরের পায়ের কাছে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল, বলিল, "না, এইখানে, এই অন্ধকারে বসেই আমার কথা আপনাকে শোনাব।"

চামেলী কি কথা বলিবে? এই নারী কি মূর্ত্তিমতী প্রহেলিকা? অমর চামেলীর পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? না সত্যই রাজধানীর বিখ্যাত বাইজী শত শত বিলাসী ধনীর কাম্যবস্তু তাহার পায়ের কাছে ভূমিতলে বসিয়া আছে? যাহার অলক্তক রাগ-রঞ্জিত রক্ত কমল চরণ দু'টি ধারণ করিবার জন্য কত স্বর্ণসূত্র খচিত মখমল বিস্তৃত হইয়া থাকে, সে কি এই? যাহার রূপাগ্নিতে পুড়িয়া মরিবার জন্য কত জন উগ্রনেশায় মত্ত হইয়া উঠে, সেকি এই প্রশান্ত আঁধারে আপনাকে ঢাকিয়া নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়া আছে?

চামেলী অমরকে নীরব দেখিয়া বলিল, "আপনি কি আমার কথা শুনবেন না?"

অমর চমকিয়া উঠিল, বলিল, "বল।"

চামেলী বলিতে লাগিল, "একটু বেশী বয়সেই আমার বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ছিলেন গরিব, কিন্তু তাঁর স্নেহের বিনিময়ে পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্নও আমি কামনা করতে পারি নি। বিয়ের বছর দুই পরে স্বামী বিরূপ হয়ে উঠলেন। রাত্রে তিনি প্রায় বাড়ী থাকতেন না। স্বামীর স্নেহ হারিয়ে কেঁদে দিন কাটাতাম, দারুণ দুঃখে শূন্য বুক সর্ব্বদা খাঁ খাঁ করত। কিন্তু এততেও আমার পাপের সাজা হলো না। এক রাত্তিরে তিন চারজন লোকে আমার মুখ বেঁধে আমাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল; চিৎকার করতে পারলাম না বটে, কিন্তু অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান হয়ে দেখলাম আমি বন্দী; মুক্তির কোন আশা নেই। কিছুদিন পরে অদৃষ্ট আমাকে তাড়িয়ে দিল্লী নিয়ে গেল, ঘরে ফিরবার আর পথ রহিল না। প্রচুর ঐশ্বর্য্য, অপরিমিত খ্যাতি, আদর, প্রতিপত্তি সবি পেয়েছি। কিন্তু ঘরে একদিন যা হারিয়েছিলাম, তার শোক ভুলতে না পেরে আবার বাঙ্গলা দেশে ফিরে এসেছি।"

অমরের কম্পিতকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "কে তুমি? কে?"

চামেলি স্থির স্বরে জবাব দিল, "আমি বাইজী—চামেলী।"

অমর উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল। জড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তুমি চামেলী নও! কার যেন প্রেতাত্মা তুমি। তুমি—তুমি—" বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে অমর সেই ঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িল।

অমর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল, সে উদ্যান গৃহের শয্যাকক্ষে শুইয়া আছে, মালী তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। অদূরে চামেলী দাঁড়াইয়া। তবে ইহা অলীক নয়, ভয়ানক দুঃস্বপ্নও নয়? অমর ইঙ্গিতে মালীকে বাহিরে যাইতে বলিল। মালী চলিয়া গেলে সে চামেলীকে বলিল, "তবে তুমি সত্যি সত্যিই অমলা!"

চামেলী নত নেত্রে বলিল, "অমলা ম'রে গেছে।"

"তেমন সৌভাগ্য আমার হতে পারে না। তুমি আমার পাপের চরম দণ্ড। এই ঠিক! এই আমার যোগ্য! তুমি আমার কাছে ফিরে এসে ঠিকই করেছ। তোমাকে না দেখলে আমার সাজা ঠিক হ'তো না।"

"আমি কি তোমাকে সাজা দিতে এসেছি?"

"তবে কি জন্যে এসেছ?"

"আজ আমি তোমার পায়ের কাছে মরতে এসেছি। এতদিন মরতে ভয় পেয়েছি ব'লেই বুঝি পঙ্কে ডুবে গেছি। তোমারি বাগান বাড়ীতে নাচ গানের নিমন্ত্রণ পেয়ে মরণ ভয় আর আমার নেই। এই দশ বছর যে আমি অন্তরে একান্ত নিঃসঙ্গ হয়ে যাপন করেছি, নিজের আগুনে তিলে তিলে পুড়ে মরেছি, সে কথা তো এ কালামুখে বলবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু এই কলঙ্কিত দেহভার আর আমি বইতে পারি নে। এ বোঝা ত্যাগ করতেই হবে।"

"কিন্তু আত্মহত্যাও তো মহাপাপ।"

চামেলী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "অত পাপের তুলনায় একি আবার পাপ? তোমার ঘাটে আমার বোট বাঁধা আছে। আমি চল্লাম।" বলিয়া সে অমরের উদ্দেশে মেঝেয় মাথা ঠেকাইয়া উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। তারপর দুই চোখে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি সংগ্রহ করিয়া কিছুক্ষণ অমরকে দেখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

অমর বলিল, "দাঁড়াও, একটা কথা আছে।"

চামেলী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বহুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া থাকিয়া অমর ডাকিল, "অমলা!"

চামেলী সহসা মেঝেই বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "আমি আর অমলা নই, চামেলী।"

অমর চক্ষু নিমীলিত করিয়া গাঢ় মৃদুস্বরে বলিল, "না, অন্তরে অন্তরে তুমি আমার অমলাই আছ। হৃদয়ের চেয়ে বড় সাক্ষী আর নেই। অপরাধের বোঝা আমারও তো কম ভারি নয়। এস, আমরা দু'জনেই এক সঙ্গে চলে যাই।"

"না, না, আমার জন্যে তোমার কিছুতেই মরা হবে না।"

"তবে এস, আমরা দূরে একদিকে চলে যাই। অতীতকে নিশ্চিহ্ন নিঃশেষ করে আবার নতুন জীবন আরম্ভ করি।"

"আমি পতিতা। তোমাকে সেবা করবার অধিকার আর আমার নেই। তুমি জোর ক'রে যদি সে অধিকার আমাকে দানও কর, তবে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তোমার সেবার চেয়ে আমার কোন্ সুখ বড় বল?"

"তোমার দুঃখ দুষ্কৃতির জন্যে আমিই দায়ী। তুমি যদি আমাকে মরতে না দাও, তবে আমিও তোমাকে মরতে দেব না। আমাদের দুষ্কৃতির দুঃখ অপরিমেয় বটে, কিন্তু তা আমরা বিফল হতে দেব না। আমাদের এই দুঃখে—তপস্যায় মঙ্গলের উদ্ভব হোক্। আত্মহত্যা প্রায়শ্চিত্ত নয়, দুঃখ লব্ধ তপস্যাই প্রায়শ্চিত্ত। এস অমলা, আমরা শারীর ও মানস তপশ্চর্য্যা দ্বারা পরজন্মে পরস্পরকে পাওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করি। সেই পাওয়াই সত্য এবং চিরন্তন পাওয়া হবে। অনায়াসে দু'জন দু'জনকে পেয়েছিলাম বলেই বুঝি কেউ কারু মূল্য বুঝতে না পেরে দু'জনেই রিক্ত হয়ে গেছি।"

অমলা দুই কাণ ভরিয়া তাহার প্রিয়তমের কথাগুলি শুনিল। তাহার মনে হইল পৃথিবীতে কোথাও যেন আর দুঃখ, দুষ্কৃতি, বেদনা নাই। তাহার ঝটিকাবিক্ষুব্ধ মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার জীবন-পথেও কোথা হইতে যেন শান্তির মৃদু আলোক রেখা আসিয়া পড়িতেছে। তবু সে বলিল, "তোমার এত বড় সম্পত্তি, এই দিয়ে তুমি অনেক কায করতে পার। সেটা তপস্যার চেয়ে ছোট হবে না।"

অমর জবাব দিল, "আমি গরিবের ছেলে, জমিদারীতে আমার অরুচি ধরেছে। আমার অবর্ত্তমানে এই সম্পত্তি দ্বারা যাতে গরিব দুঃখী এবং সাধারণের উপকার হয়, আমি তার বন্দোবস্ত করে রেখেছি।"

"আমরা কোথায় থাকব?"

"দূরে—কোন তীর্থে যেখানে তোমার ইচ্ছা। এই মুহূর্ত্ত আমাদের নতুন জীবনে প্রবেশের মাহেন্দ্রক্ষণ হোক্। দেরী ক'রে এ শুভযোগ ব্যর্থ করব না। এস অমলা!"

এই বলিয়া অমর অগ্রসর হইয়া চলিল। অমলা তাহার অনুগামিনী হইল। সেই রাত্রির অন্ধকারে কোথায় তাহারা মিলাইয়া গেল, কেহ আর তাহাদের সন্ধান পাইল না।

তিলক জয়ন্তী *

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

তিলক শুধু নামেই তিলক নয়
জাতির তিলক, দেশের তিলক সত্যকার,
ব্রাহ্মণ সে, ব্রহ্মতেজে নির্ভয়—
আমরা ছাড়া কে জানে গো তত্ত্ব তার!

ইচ্ছা তাহার মন্দাকিনীর ধারা
ঐরাবতে ফেল্‌তো ছুঁড়ে উর্ম্মিঘায়
বাণী তাহার কর্‌তো আত্মহারা
উদ্বেলিত সিন্ধু সম পূর্ণিমায়।

সত্য ছিল নিত্য তাহার লক্ষ্য
দেশ-প্রীতি প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে
গরীব পতিত সাথেই তাহার সখ্য
কর্ম্ম তাহার নয় স্বার্থের প্রত্যাশে!

ছিল ব্রত নিষ্ঠা তাহার হেন
শৈল সমান অটল বৃহৎ উচ্চশির
লোহার শিকল, কঠোর শাসন যেন
অঙ্গশোভা গঙ্গাধর এ ধূর্জ্জটীর।

কোমলতায় কুসুম পেলব থাকি
রুদ্র ছিলে বজ্র হ'তে দৃপ্ত হে
ভারতের লোক তাই তোমারে ডাকি
"লোকমান্য" বলে এমন তৃপ্ত যে!

কর্ম্মোৎসাহে "বাল" আখ্যা তব
"স্বরাজ"—গঙ্গা শিরে ধরি "গঙ্গাধর"
দেশের ছিলে মূর্ত্ত "তিলক' নব—
"কেশরী" টি বাহন ছিল আজ্ঞাধর।

ভারতের ঐ পুণ্য প্রভাসনীরে
আছেন শুয়ে অনন্তদেব কর্ম্মী আর—
দ্বারকা সে পশ্চিমেরি তীরে,
ও ভূমি যে মাতৃভূমি মহিমার।

যদুকুল পতির প্রিয় পুরী
বলদেবের দেহ যথা লয় পায়,
তিলক চিতা-ভস্ম সেথা উড়ি,
নর-নারায়ণ মিলন ভূমির জয় গায়।

মৃত্যু তোমার ব্যর্থ নহে! জ্বলে
নবীন বহ্নি লোকের প্রাণে হবিত্রী,
দীক্ষা তোমার লক্ষ শিখানলে
আনছে ডেকে নূতন উষার সবিতৃ।

* তিলক-স্মৃতিসভায় পঠিত।

কবি-তীর্থে

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

বর্দ্ধমান ষ্টেশন ছাড়াইতে সাহিত্য-রত্ন অন্য সর্ব্ববিধ যত্ন ত্যাগ করিয়া সাহিত্যালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসের খর-রৌদ্র-দৃপ্ত দ্বিপ্রহরে, চলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসিয়া সাহিত্যালোচনায় যোগ দিবার মত দৈহিক ও মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। সাহিত্য-রত্ন নিজে-নিজেই দেশে নাট্যকারের অভাব, কবির অভাব, ঔপন্যাসিকের অভাব, সংবাদ পত্র-সেবীর অভাব—এককথায় বহুল অভাব অভিযোগের লম্বা ফর্দ দাখিল করিয়া এবং শ্রোতাকে একান্ত অন্যমনা দেখিয়া অবশেষে বেঞ্চের উপর চৌদ্দোপোয়া হইলেন। ঘুমটিও বেশ পোষা, এক মিনিটের মধ্যেই নাসিকা গর্জ্জিয়া উঠিল।
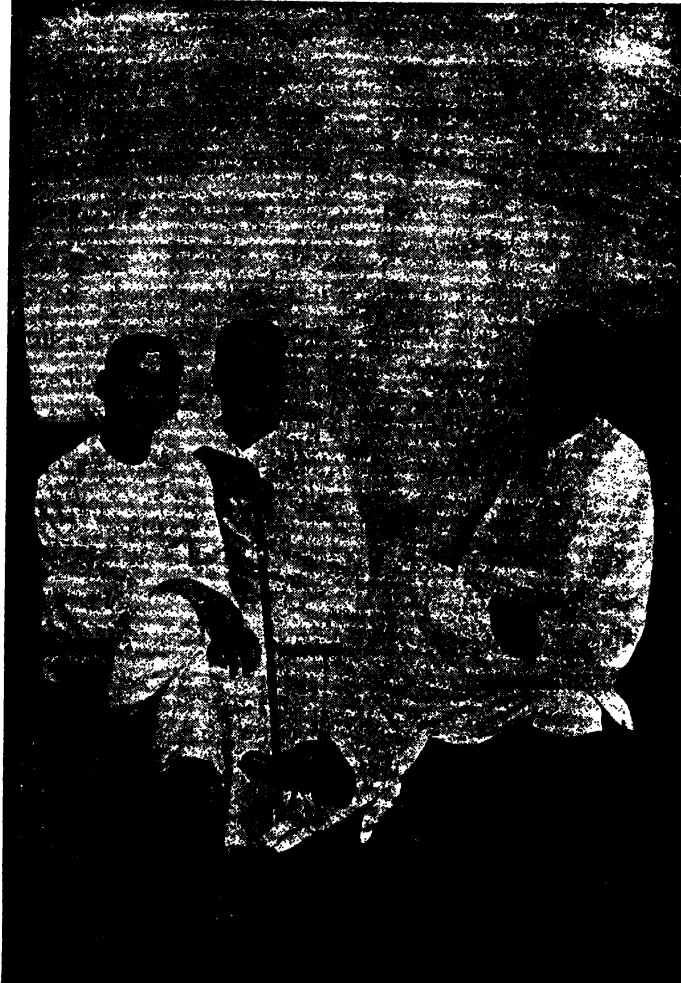
শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন　　প্রবন্ধ লেখক　　শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদপুরে বড় গাড়ী ছাড়িতে হইল, ছোট গাড়ীতে উঠিবার জন্য। এক ময়রাণীর দোকানে গরম জিলিপি (বোধহয়) হরেকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, গরম জিলিপির বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। পথে ও দোকানের খাবার খাওয়া আমার অভ্যাস নাই বলিলাম এবং তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতাও দেওয়া গেল, কিন্তু আর তাঁহার উৎসাহ দেখা গেলনা। ছোট লাইনের গাড়ীগুলি বেশ, কামরাগুলি বেশ সচল পায়রার-খোপের মতন, ঝাঁকানিটা একটু বেশী লাগে এই যা, নইলে মন্দ নয়। আর একঘণ্টার বেশীও সে ভোগ সহিতে হয় না, সুতরাং ক্ষমার্হ। চণ্ডীদাস তীর্থ ক্রমশঃই নিকট হইয়া আসিতেছে, আশায় আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু "লাভ"পুর (ষ্টেশনের কালো কাষ্ঠ-ফলকে রসিক ছেলেরা ইংরাজীতে লিখিয়া দিয়াছে Lovepur) ষ্টেশনে পৌঁছিতেই আনন্দ একেবারেই নিরানন্দে পরিণত হইল, নির্ম্মল শিব দাদার সন্ধান নাই। হরেকৃষ্ণ আকাশ হইতে পড়িলেন, একে ক্ষুধায় কাতর, তায় হোতার অদর্শন,—আমি বেশ বুঝিতে-

ছিলাম, সাহিত্য-রত্ন বৈকালীর (তখন তিনি বৈকালীর সম্পাদক ছিলেন) সম্পাদকীয় স্তম্ভের কাঠামটি মনে-মনে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি দমি নাই। দমিব কেন? বাঙ্গালা দেশেই আছি ত, বাঙ্গালীর ছেলে ত, কিসের ভয়? না হয় লাভপুরে "লভ" (l.০v৩) অথবা লাভ কিছু না-হইল, কিন্তু নায়ুর দেখিবার পক্ষে বাধা ত হইবে না! আমি হাসি-মুখেই ষ্টেশনের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বলা ভাল, হরেকৃষ্ণ ভায়া নির্মল-শিব দাদার বহুকালের বন্ধু একদেশবাসী, উভয়েই বীরভূম-সন্তান অতএব বীর। সে হিসাবে আমি বিদেশী। একজন স্বদেশবাসী, শিক্ষিত বন্ধুর এ-হেন বিসদৃশ আচরণে, বিদেশীকে নিমন্ত্রণ দিয়া আসিয়া অনুপস্থিত থাকা—হরেকৃষ্ণকে মর্মে পীড়া দিয়াছিল নিশ্চয়ই কারণ তিনি একরকম প্যাগলের মতই ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, দেখিলাম। আমাকে আসিয়া ধরিলেন—ভায়া! কি বুঝছ! আমি হাসিয়া বলিলাম—বোঝাবুঝি আর কি দাদা! এই বাঙ্গালা দেশেই একটা কথা চলিত আছে,জান ত? সেই বাড়ীতেও খেও না, না ডাকলেও এসো না!

রোষ-রহস্য তখন সাহিত্য-রত্নের নিকট একাকার হইয়া গিয়াছিল। তবে আমার কথাটাকে তিনি যে ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার মুখ-চক্ষুর ভাবেই পষ্ট বুঝিলাম। হরেকৃষ্ণ গভীর চিন্তামগ্ন, আমি তাঁহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া বলিলাম—ঐ দেখ!—ভায়া ফিরিতেই দেখিলেন, নির্মলশিব-দা লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া রেলওয়ে লাইন অতিক্রম করিতেছেন। হরেকৃষ্ণ গুমরাইতেছিলেন, একখানা ইঞ্জিনও অল্পদূরে তাঁহার মতই রাগে ফোঁস ফোঁস করিতেছিল। বোধ হয় শীঘ্রই উভয়েই '॥st করিতেন (ফাটিতেন) সে দুর্দশা হইবার পূর্বেই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার জুড়ীই কি আমাদের ট্রেণের সঙ্গে রেশ্ দিতেছিল? নির্মলশিব বলিলেন—হ্যাঁ, বাড়ীর বাহির হইয়াই দেখি, ট্রেণ আসিতেছে, কোচম্যানের দোষেই বাহির হইতে দেরী হইয়াছিল। তাহাকে তিরস্কার করায় সে ট্রেণের সঙ্গে রেশ্ জুড়িয়া দিল কিন্তু কলের কাছে কজিতে সকলেরই পরাজয়, ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গেল, আমরা অল্পদূরে পড়িয়া রহিলাম।"

হরেকৃষ্ণ এতক্ষণ নির্মলশিবের উপর রোষে গোঁ গোঁ করিতেছিলেন, এখন তাহার রোষানল ধাইয়া আসিল—আমার পানে। আমি যদি ল্যাণ্ডো ও ট্রেণের রেশ্ দেখিয়াছি, তবে এতক্ষণ সে কথা তাঁহাকে বলিয়া তাঁহার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রশমন করিবার চেষ্টা না করিয়া নীরব রহিয়াছি, ইহাতে তিনি অত্যন্তই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম—জুড়ী দেখিয়াছিলাম বটে কিন্তু আমি হাত গণিতে জানিনা, কাহার জুড়ী তাই জানিতে পারি নাই! জুড়ী হইলেই যে তাহা নির্মলশিব বাবুর হইবে তাহা জানিতাম না, কাজেই কোন-কথা বলারও দরকার বুঝি নাই।

ব্রাহ্মণের রোষ খড়ের আগুন, যেমন জ্বলা,তেমনি নেবা! হরেকৃষ্ণ থামিলেন; তাঁহার শস্ত্র-শীঘ্র পৌঁছাইয়া যাওয়ার বিশেষ দরকার হইয়াছিল; কারণ সকলেই অবগত আছেন আমার বিশ্বাস, অতএব বলা বাহুল্য।

ল্যাণ্ডো গ্রামের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে চলিল। লাভপুর ঠিক গ্রামও নয়, সহরও নয়, মাঝামাঝি একটা কিছু। রাস্তায় ল্যাণ্ডো মোটরও চলে, আবার মেঠো ঘরই বেশী। গ্রামের ভিতর নির্মলশিব বাবুদের ইংরেজী হাই স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল, মেয়ে স্কুল আছে। প্রমোদ-ভবন, অতিথি-আবাস, পাঠাগার, নাট্যমঞ্চ এ-সকলও রহিয়াছে। এতগুলি সদনুষ্ঠান স্থাপিত করিয়া তাঁহারা তদঞ্চলবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

পথিমধ্যে স্থানীয় রেজিষ্ট্রারবাবু আমাদের সঙ্গী হইলেন। হৃষ্টপুষ্ট যুবকটি, বেশ মিশুকে খোলা-প্রাণের লোক। দু'দণ্ডেই আলাপ জমিয়া গেল। বেলা থাকিতে-থাকিতেই আমরা পল্লীপ্রান্তের একখানা সুন্দর গৃহে উপনীত হইলাম। গৃহের উপরে লেখা আছে—বিরামমন্দির। একদিকে তার দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর, অন্য তিনদিকে নির্মলবাবুদেরই ফলের বাগান। সামনেটায় সারি সারি মহুয়া গাছ। মহুয়া শ্রেণীর মাঝখান দিয়া সিন্দূরলিপ্ত সীমন্তের মত লাল কঙ্করময় পথটি বিরামমন্দিরের গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া মিশিয়াছে।

—বাড়ীটার নাম রাখা সার্থক হইয়াছে। বিরাম লইবার উপযুক্ত স্থান বটে!

সেদিন বিরাম মন্দিরে কি একটা ব্রত উপলক্ষ্যে ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। সন্ধ্যা হইতেই লাভপুরের ভদ্রেতর বিরাম মন্দিরে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমরা মহুয়া-শ্রেণীর ধারে শোওয়া-কেদারা খাটাইয়া আড্ডা জমাইলাম। যথারীতি চায়ের কাৎলি, গুড়গুড়ি, পানের ডিবা ও সিগারেটের কৌটা উপস্থিত হইল। গৃহস্বামীর কনিষ্ঠপুত্র নিত্য-নারায়ণ নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের বাড়ীর মধ্যে অন্যত্র লইয়া গিয়া বসাইল। মাত্র কয়েকজন মহুয়া-তলার আড্ডায় রহিলেন।

সকলেই বাঙ্গালী, 'নিঃখরচায়' পাণ তামাকে পরিতৃপ্ত, সুতরাং এরূপ স্থানে যাহা হওয়া স্বাভাবিক, তাহাই হইতে লাগিল। অর্থাৎ ভারতমাতার দুঃখ বিমোচন-পরামর্শ চলিল। বেশ বুঝিলাম, ভারত-উদ্ধাররূপ অনায়াস-সাধ্য কর্মটি কেহ আর রাত্রি প্রভাতের জন্যও ফেলিয়া রাখিতে প্রস্তুত নহেন, সকলেরই মনোগত অভিপ্রায় এবং ঐকান্তিক চেষ্টা এই যে, এই পাণ-তামাক, পরে লুচি-কচুরীর সঙ্গেই সে কার্য্যটা শেষ করিয়া ফেলেন। আমার কিন্তু মনে পড়িল ৺দ্বিজু বাবুর সেই কথা—তা সে হবে কেন?

বাশুলী মন্দির নান্নুর।
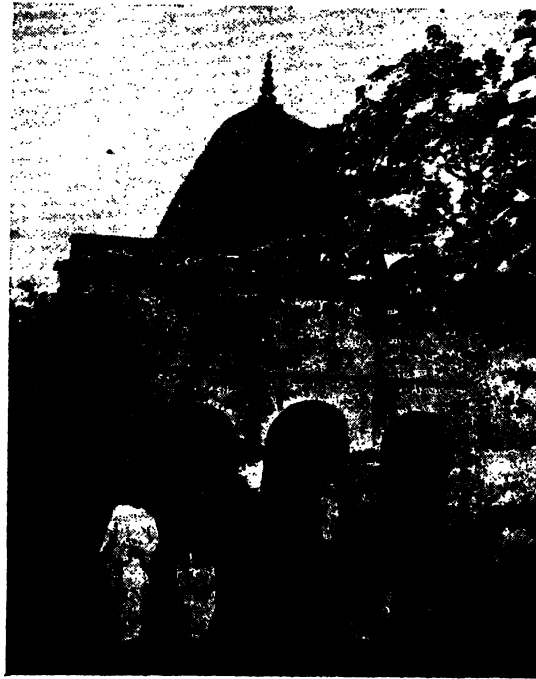
দেখিতে-দেখিতে ভারতমাতাকে শৃঙ্খলমুক্তা করিবার নিরাকার চেষ্টা সাকার হইয়া উঠিল। আমার ভীরুতা কাপুরুষতা অথবা দৈহিক-দুর্বলতা ঠিক-জানি-না-কোন্ কারণ বশতঃ সাকার দেশোদ্ধারটা আমার কোনকালেই হজম হয় না, চেষ্টা "রূপ" পরিগ্রহ করিতেই আমি সভয়ে সভা ত্যাগ করিলাম। অবশ্য ইহাতে দেশোদ্ধারকারী-সকলেই অল্প বিস্তর দুঃখিতও হইয়াছিলেন, আমি যে সংবাদপত্রসেবী-কলঙ্ক নিঃসন্দেহে ও নিরাপদে তাঁহারা ইহাও ধর্ত্তব্য করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাও আমার জানিতে বাকী ছিল না কিন্তু আমি কি করিতে পারি বলুন? কাগজে-কলমে এস, দেশ ত দেশ, দেশ-বিদেশ-পরদেশ সব সাফ্ উদ্ধার করিয়া দিব কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আমি মস্তক দিতে প্রস্তুত ছিলাম না, কারণ তাহা আমার নিজস্ব নহে, স্রেফ্ এই দেহের সম্পত্তি। "আমি"গেলে চলিতে পারে, খুব ভালভাবেই পারে কিন্তু মস্তিষ্ক-বিহনে একেবারেই অচল।

মহুয়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে বেড়াইতে বেড়াইতে ভারতোদ্ধার কার্য্যের পরিণতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এক সময়ে মনে হইল, বেচারা হরে-কৃষ্ণের মাথাটা পাঁচ সাত-জনে চিবাইয়াই বুঝি খাইয়া ফেলে, তর্কের অবস্থা তখন এতাদৃশ উত্তাল। হরেকৃষ্ণের গোঁ ভীষণ, আশু বিপদ বুঝিয়াও তিনি নিরস্ত নহেন,—বোধ করি প্রাণের মায়া মমতা এককালে ত্যাগ করিয়া ভারত-কল্যাণোদ্দেশ্যে সে নশ্বর দেহ উৎসর্গ করিতেও তিনি প্রস্তুত। নির্ম্মলশিব নাই যে বাঁচায়, আমিও পলাতক যে সাহায্য করি, হায় হায়, বেচারা বেঘোরে প্রাণ হারায় গা! হরি হরি!

নিত্য আসিয়া লাঠি ছুঁড়িল, সাপও মরিল, লাঠিও অটুট রহিল। নিত্য এমন একটি কথা বলিল যে ভারতমাতা ঠিক যেখানে ছিলেন, সেই খানেই রহিলেন, বাবুরাও তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া গাত্রোৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। ভগবানকে এবং নিত্যকে ধন্যবাদ দিলাম। ভগবানের ইচ্ছায়

সকল কর্ম হয় বটে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নিত্যই সে বিপদে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা।

হলঘরে চর্ব্বচূষ্য লেহ্য পেয় এবং তাহা সুসজ্জিত। ভারত-মাতার মুখোজ্জলকারী সন্তানগণ আহারে বসিলেন। ভারতমাতাও দেখিলাম, খুব ভাল। পুত্রগণকে বিপদে ফেলিতে আর কাহারো মানস-পটেও উদিত হইলেন না। পরম-পরিতোষ সহকারে আহার সমাপ্ত করিয়া যে-যার গৃহে শুভ-প্রত্যাগমন করিলেন। আমি মনে-মনে তাঁহাদের সুবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। ভারতমাতা দূরের বস্তু, পরহস্তগত ধন, "ছাড়িয়া মুখের গ্রাস যে জন" পরহস্তগত দ্রব্যে মন দেয়, মাতে, সে জন যে নিতান্ত দুর্বুদ্ধি তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই,— বাবুরা তা নন, কাজেই প্রশংসার্হ। নির্ম্মলশিববাবু, রেজিষ্ট্রার বাবু, মায় ত্রয়োদশ বর্ষীয় শ্রীমান্ নিত্য আমাকে সমর্থন করিলেন, তাঁহারাও বাবুদের সুবুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। কেবল হরেকৃষ্ণ দ্বিজেন্দ্রলালের সেই বিখ্যাত "হোতে পার্ত্তাম" শীর্ষক গানটির অনুকরণে কতক-গুলা-কি বকিতে-বকিতে মহুয়া-তলার ভাঙ্গা মজলিসে ময়রার খালি-দোকানে মাছির মত ভণ ভণ করিতে লাগিলেন। এই প্রবন্ধ-রচনা-সময়ে, আজ বীরপুঙ্গবগণের নিকট হইতে আমি দূরে অবস্থান করিলেও সেই রাত্রির কথা মনে করিয়া আনন্দানুভব করিতেছি এবং প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের ভারতোদ্ধারের সাধুপ্রচেষ্টার সাধুবাদ করিতেছি।

আমার কেমন একটা বদভ্যাস, কোনও অপরিচিত স্থানে প্রথম রাত্রিটা আমি ঘুমাইতে পারি না। সিমলা শৈল, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি শীতল দেশেও দেখিয়াছি, কেমন একটা অস্বস্তিভাব, কেমন একটা সঙ্কোচ, মানসিক অশান্তি জুটিয়া যায়-ই, ঘুম আসে না। এখানেও তাহাই হইল। আমার অতি নিকটে রেজিষ্ট্রার বাবু (তাঁর পরিবারবর্গ তখন অন্যত্র, কাজেই ভোজন শয়ন মন্ত্র-তন্ত্র এবং হট্ট মন্দিরেই হইয়া থাকে) ও হরেকৃষ্ণ যেন বাজী রাখিয়া নাক ডাকাইতেছেন, আর আমার 'নিদ নাহি আঁখি পাতে'! রাত্রি আর বেশী নাই, এইটুকু কাটিলেই নান্নুর যাত্রা করিব, ইহাই আমার চিন্তার প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, জাগিয়াই ত আছি, রজনীও জ্যোৎস্না-হসিতা, চণ্ডীদাসের একটি পদ গাইয়া ফেলি। কিন্তু না, cruelty to animalsএ আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। বেচারা-দের ঘুম ভাঙ্গাইয়া লাভ কি? এ-যে গলা, ঘুম — তা সে কুম্ভকর্ণ-ছাড়া যাহারই হউক ভাঙ্গিতেই হইবে।
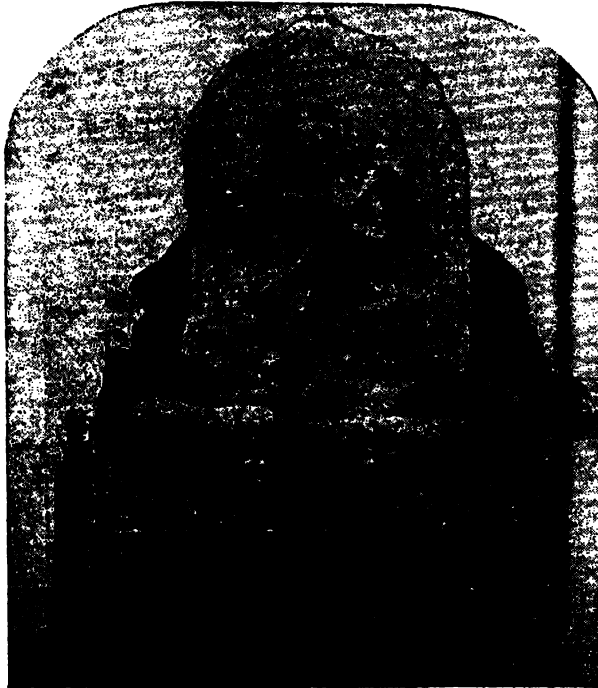
চণ্ডীদাস-পূজিতা নান্নুরের বাশুলী দেবী।
(পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বীণাপাণি মূর্ত্তি)

গৌরদাস অনেক দিনের পুরাণো চাকর, অতি প্রত্যুষেই চায়ের সরঞ্জাম লইয়া দর্শন দিল, আমরা হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া চা পান করিয়া লইলাম। কথা ছিল, নির্ম্মলশিব বাবুর মোটরেই নান্নুর যাওয়া-আসা হইবে, যথাসময়ে সাফুর নিবেদন করিল যে গাড়ীটির শারীরিক অবস্থা সুবিধাজনক নহে, পথে বিভ্রাট ঘটিতে পারে। যদিচ রোগ উৎকট নহে, কিন্তু যে-কোন মুহূর্ত্তে ভিন্নরূপ ধারণ করিতে পারে। মোটরে যাওয়া-আসা অল্প-সময়-সাপেক্ষ এবং সকল-রকমে সুবিধাকর হইলেও ইহা শুনিয়া আর কেহই মোটরে চড়িতে সাহস করিলেন না, দ্বি-অশ্ব-

বাহিত ল্যাণ্ডোই প্রস্তুত হইল। পথি-মধ্যে বর্ণনীয় বিশেষ কিছুই দেখিলাম না।

নান্নুর পৌছিতে প্রায় দশটা বাজিল। গাড়ী থামিল, থানার দরজায়। থানার হলঘরে প্রবলপ্রতাপান্বিত দারোগা-মহাশয় বার দিয়া বসিয়াছিলেন, আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দারোগা-বাবুটিকে আমার দারোগা-নামের কলঙ্ক বলিয়া মনে হইল। পুলিসের লোকের যে মহিমময় মূর্ত্তি এ দীনজনের মানস পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, মিলাইতে গিয়া দেখিলাম, এতটুকু সামঞ্জস্যও নাই। পুলিসের লোকে শুনিয়াছি, শ্বশুরের সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করে না, কারে পড়িলে শ্বশুরকেও 'পাণ' খাইবার খরচ যোগাইতে হইয়া থাকে, কিন্তু এই দারোগাটি তখনই চায়ের হুকুম দিলেন, গড়গড়া আসিল,সিগারেট আসিল। লোকটির সাহিত্যানুরাগও যথেষ্ট। আমরা কলিকাতা হইতে চণ্ডীদাস তীর্থ দেখিতেই আসিয়াছি শুনিয়া — আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিয়াছি, সেটা জ্যৈষ্ঠ মাস, ১০টা বাজিয়াছে, রৌদ্রের উত্তাপ ক্রমশঃই প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে, থানায় বসিয়া গল্প-গুজবে কালহরণ করিতে আমার মন সরিতে ছিল না। এ-কথা বলায় দারোগা বাবু বলিলেন—বেশ ত, ঘুরে এসেই জলটল খাওয়া হবে। চলুন আপনাকে দেখিয়ে আনি।" দারোগা বাবুও আমাদের সঙ্গে আসিলেন।
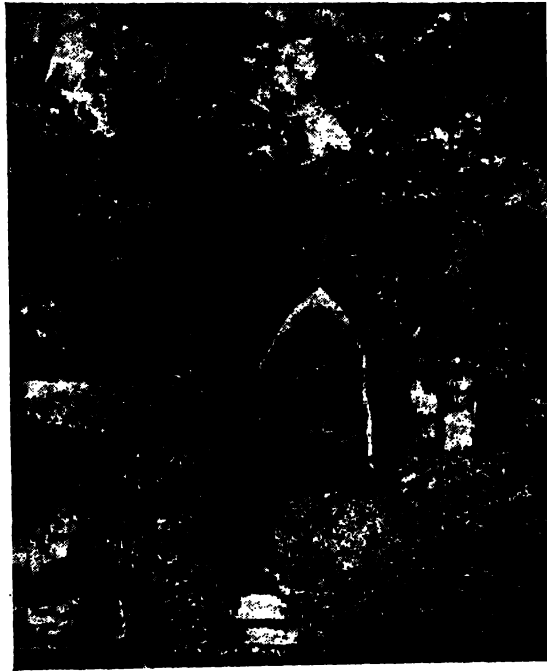
থানার পার্শ্বেই একটি পুষ্করিণী আছে, তাহারই পাড়ে রামী-রজকিনীর কাপড়-কাচা পাটাখানি পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। পাটাখানি প্রস্তরে পরিণত। জনসাধারণের বিশ্বাস রামী যখন কাপড় কাচিত, তখন তাহার পাটা ধোপার সাধারণ পাটার মত কাষ্ঠ-নির্ম্মিতই ছিল, সময়ে তাহা প্রস্তর হইয়া গিয়াছে। অবিশ্বাস করিবার কোনকারণ দেখিলাম না। জানি-না এই সেই পুকুর কি-না যেখানে রামী কাপড় কাচিত, আর বাশুলী-আদেশে চণ্ডীদাস পরকীয়া-ভজন সাধন করিতে রামী অনুরাগী হইয়া এই খানেই বসিয়া মাছ ধরিতেন কি-না, কেহ সঠিক সংবাদ দিতে পারিল না, তবে আমার মনে হইল, সে এই খানেই, এই খানেই।

চণ্ডীদাসের সমাধি-মন্দির—নান্নুর।

একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে বলিব। এই পুকুরটির পাড়ে—যদিও গণি নাই, তবু মনে হয় পঞ্চাশ ষাটটি লোককে বসিয়া এক অদ্ভুত কার্য্য করিতে দেখিয়াছিলাম। নান্নুরে এ-সময়ে ভীষণ জলাভাব, এমন একটি জলাশয় নাই, যাহার জলে গ্রামবাসীর প্রাণ রক্ষিত হইতে পারে। গ্রামবাসীগণ এক একখানি কোদাল, একটি কলস ও একটি নারিকেল মালা লইয়া পুকুরের গর্ত্তে বসিয়া আছে; এক কোদাল করিয়া মাটী কাটিতেছে, জল বাষ্পাকারে চোয়াইয়া উঠিতেছে, তাহাই মালায় সেঁচিয়া কলসে ভরিয়া লইতেছে। একটি কলস ভরিতে চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে, শুনিলাম। এই দীর্ঘ সময়টা সকলেই চুপ-চাপ বসিয়া আছে। কি অসীম ও অনন্ত ধৈর্য্য ইহাদের! আর কি অসাধারণ অপূর্ব্ব ঔদাস্য

আলস্য ইহাদের মৃতবৎ করিয়া দিয়াছে! দেখিয়া দুঃখ হয়, লজ্জা হয়! এক কোদাল মাটী কাটিয়া হা-পিত্যেশ করিয়া না বসিয়া গ্রামবাসীরা মিলিয়া যদি পুকুরটার বুকে রীতিমত অস্ত্র চালাইত, তবে কোন্‌কালে তাহার মথিত বক্ষ ভেদ করিয়া অমৃতের ধারা উঠিয়া আসিত! কিন্তু হায়, সে চেষ্টা কাহারও নাই আমরা দেশের কার্য্যে গভর্ণমেন্টের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকি; ইহারা অল্পশিক্ষিত, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ দরিদ্র চাষী—ভগবানের মুখ চাহিয়া, আপন-আপন শক্তি সামর্থ্য, কর্তব্য, পুরুষকার সব বিসর্জন দিয়া বসিয়া থাকে।

একটি স্কুল ও লাইব্রেরী স্থাপিত হইতেছে দেখিলাম। গৃহটি তখনও শেষ হয় নাই, মিস্ত্রি খাটিতেছে। শুনিলাম, লাইব্রেরীটির নাম-করণ করা হইবে, চণ্ডীদাস পাঠাগার! তবু ভাল! স্কুলের নামটার সঙ্গে মহাকবি চণ্ডীদাসের নামটা যোগ করিয়া দিলে আমার বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠাতাগণকে অতীতের স্মৃতির পূজক বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারিতাম।

সেখান হইতে আমরা বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির-চত্বরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। পূজারী আসিয়া মন্দির দ্বার খুলিয়া দিলেন; দেবী-মূর্ত্তির চরণে প্রণত হইলাম। এই সেই বাশুলী দেবী! এই দেবীর পূজারী ছিলেন, চণ্ডীদাস! এই দেবীর আদেশে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা গান গাহিয়াছিলেন; এই দেবীর অনুগ্রহেই চণ্ডীদাসের গান অক্ষয় অমর হইয়া গিয়াছে; মানবের চিত্ত-পটে যুগ-যুগান্তকাল চণ্ডীদাসের স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া আছে। এই বিশালাক্ষী দেবীর বরেই চণ্ডীদাস অমর, অজর, অবিনশ্বর হইয়া আছেন।

দেবীর মূর্ত্তি সমক্ষে দাঁড়াইয়া পাপী আমি, অধম আমি, নগণ্য আমি, আমারও মনে পড়িল সেই দিনের কথা, যেদিন চণ্ডীদাস নদী স্রোতে ভাসমান একটি পদ্ম আনিয়া এই বিশালাক্ষী দেবীর চরণে উৎসর্গ করিতে গিয়া দেবী-কর্ত্তৃক বাধা পাইয়াছিলেন। দেবী বলিয়াছিলেন—"ও ফুল আমার পায়ে ছোঁয়াস্‌ নে চণ্ডে। উহার দ্বারা আমার গুরুর পূজা হইয়াছে।" সাধক-চূড়ামণি, ভক্ত-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিয়াছিলেন—মা, তুই-ই ত ত্রিভুবনেশ্বরী, তোর আবার গুরু কে মা? ভক্তবৎসলা দেবী বলিয়াছিলেন—বাছা চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণ আমার গুরু! চণ্ডীদাস দেবীকে বলিয়াছিলেন, "মাগো, তোর রূপে, তোর গুণে আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। না-জানি তোর যিনি গুরু তিনি কেমন! মা, আমি তোর সেই গুরুকে দেখিব!" দেবী আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। সেইদিন হইতেই চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। চণ্ডীদাস কৃষ্ণের, শুধু কৃষ্ণের নয়, কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীমতী রাধিকার লীলা দর্শন করিলেন। সাধনার সঙ্গে প্রেম, কর্ত্তব্যের সঙ্গে নিষ্ঠা, ভক্তির সঙ্গে প্রীতি মিলাইল, চণ্ডীদাস অপূর্ব ভাষায়, অপূর্ব ছন্দোবন্ধে অপূর্ব প্রেম-লীলা রচনা করিলেন। যে শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাপরবশ হইয়া জীবের উদ্ধারের জন্য গোলক ছাড়িয়া ভূলোকে আসিয়া মানবের চিরমধুর বৃন্দাবন লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, যাঁহার রূপগুণ-কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিতে মানুষের লেখনী অক্ষম, সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত, লীলাময়, প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ চণ্ডীদাসের পদাবলীর নায়ক। কবির স্পর্দ্ধা বটে! এতখানি স্পর্দ্ধার বোধ হয় একমাত্র কারণ, চণ্ডীদাস সাধারণ মানুষ ছিলেন না।

"সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥

থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখানি বনা'ল রে
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ, জিনি করিশুণ্ড॥

কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐ ছন দেখি পীতাম্বর॥

বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বসাইল রে
এমতি লাগয়ে বুকের শোভা।
দাম কুসুমে কেবা সুষমা করেছে রে
এমতি তনুর দেখি আভা॥

আদলি উপরে কেবা কদলি রোপিল রে
ঐ ছন দেখি রযুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দর্পণ বসাইল রে
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥"

—যিনি কৃষ্ণকে না দেখিয়াছেন, এ-রূপ তিনি আঁকিবেন কিরূপে ?

বাশুলি মন্দিরের ঠিক পার্শ্বেই চণ্ডীদাসের সমাধিস্তূপ। চণ্ডীদাসের মৃত্যু-কাল ও স্থানের সঠিক সংবাদ আমি জানি না। এ-সম্বন্ধে নানাজনে নানাকথা কহে কেহ বলে তিনি নান্নুর হইতে দুইক্রোশ দূরে কীর্ণাহার গ্রামের কোন দেব মন্দিরে কীর্ত্তন করিতে গিয়া প্রিয়া রামী-সহ মন্দির চাপা পড়িয়া ইহ লীলা সম্বরণ করেন। আবার অনেকের ধারণা, এই যে স্তূপ, যেখানে আমরা দাঁড়াইয়া আছি, বাশুলি-দেবীর মন্দির পূর্বে এইখানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। চণ্ডীদাস বিশালাক্ষী দেবীর সম্মুখে দেবীর-গুরুর—সর্বগুণাধার শ্রীকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে দেবী ও রামী-সহ মন্দির চাপা পড়েন। রামীর ও চণ্ডীদাসের দেহ বা কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই, বহু বহুকাল পরে একজন তিলি স্তূপ খনন করিয়া দেবীকে উদ্ধার করিয়াছিল। শুনিলাম, সেই তিলির বংশধরগণ আজও বর্ত্তমান। তাহাদের বংশের সহিত বাশুলী-দেবীর কোনো সময়ের একটা নিকট সম্পর্ক ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। শারদীয়া নবমীর দিন তাহাদের প্রদত্ত ছাগ সর্বপ্রথমে দেবীর সমক্ষে উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমাদের বণিক-রাজারা পুরাতনের স্মৃতি সগৌরবে রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া একটা খ্যাতি আছে। তাঁহারা প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে গর্ব প্রকাশও করিয়া থাকেন। এখানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাই নাই বলিলে অসত্য বলা হইবে; তাঁহারা একখানা কাষ্ঠফলকে কতকগুলা কি লিখিয়া টাঙাইয়া দিয়াছেন দেখিলাম। ভাষা মনে নাই, তবে মর্ম ভুলি নাই, বোধহয় মন্দির হইতে পাছে কোন জিনিষ পত্র অপহৃত হয়, তাহারই বিরুদ্ধে সেই বিজ্ঞাপন—ব্যাস্! পুরাতন-স্মৃতি-রক্ষার এই চরম নিদর্শন।

আর আমরা? ক্ষণিকের উন্মাদনায় নান্নুর গিয়া চণ্ডীদাসের সমাধি দেখিয়া বারকতক তার অপূর্ব মধুর পদাবলী উচ্চারণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসি। ভারতের, বাঙ্গালার প্রাচীন কবির, ভক্ত সাধকের স্মৃতির যথেষ্ট সম্মান করিয়াছি, শ্রদ্ধা দেখাইয়াছি ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকি। কাজে-কাজেই চণ্ডীদাসের সমাধিকে যদি কেহ বামা ভুলের সমাধি বলিয়া আমাদের কাছে পরিচিত করাইত তাহা হইলে অবিশ্বাস করিবার কিছুই থাকিত না।

রাজা অন্ধকূপ-স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠায় যত্নবান; হয়ত মোপলা বিদ্রোহ দমনে তৎপর শাসক-সম্প্রদায় যেখানে মোপলারা চলন্ত অন্ধকূপে নিহত হইয়াছিল, কয়েক বর্ষ পরে তাহারই 'পরে একটা বিপরীত ইতিবৃত্ত-পূর্ণ মিথ্যা স্তম্ভ খাড়া করিয়া বিজয়-দুন্দুভি বাজাইবেন, কিন্তু দেশের মর্ম্ম যেখানে, প্রাণ যেখানে, বিশেষত্ব যেখানে—সেখানে রাজদৃষ্টি পড়িবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

বিলাতের বহিতে, মাসিক পত্রাদিতে পড়িয়াছি, সেক্সপীয়রের সমাধির অবস্থা, স্কটের, থ্যাকারের সমাধির বর্ণনা, আর চক্ষে দেখিলাম আমাদের দেশের একজন কবি-শ্রেষ্ঠের সমাধির এই নিদারুণ শোচনীয় দশা! তবু আমরা ইংরাজকে বলিতে চাই, আমরা স্বরাজ পাইবার যোগ্য হইয়াছি, স্বরাজ্য হইলে আমরা আমাদের দেশ রক্ষা করিতে পারিব। আমরা তাহাদের শুনাইয়া শুনাইয়া বলি, আমরা শিক্ষিত, আমরা সভ্য, আমরা জগৎ-সভায় তোমাদের সঙ্গে সমান আসন পাইবার যোগ্য, ধরিত্রির উপর তোমাদের যেমন দাবী, আমাদেরও তেমন দাবী, তেমনই অধিকার।

তাহারা বিশ্বাস করে না, হাসে! আমরা আমাদের যতখানি না-চিনি, না-জানি, তাহারা আমাদের তার চেয়ে বেশী জানে, বেশী চিনে,—তাই অধিকার-তর্কে নীরবে হাসে, উত্তর দেয় না।

দারোগাবাবুর পত্নী উত্তম জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, খাইতেই হইল। বেলা প্রায় বারোটা—আবার গাড়ীতে উঠিলাম। আসিবার সময়, গানে-গল্পে-কথায় চোদ্দো মাইল পথটা খুব শীঘ্রই কাটিয়াছিল। জানি-না কেন, এবার আর কাটিতে চাহে না; বোধ করি, কথাবার্ত্তা ছিল না বলিয়াই সময় এত ভারী—দূরত্ব এত বেশী হইয়া উঠিয়াছিল।

চন্দ্রাবতী

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী প্রভাতকালে একসঙ্গে ফুল তুলিত; জয়ানন্দ ডাল নোয়াইয়া ধরিত, চন্দ্রাবতী বাপের পূজার জন্য ফুল তুলিত! ক্রমে তাহাদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। বাল্যকালের ভালবাসা। কৈশোরে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে প্রেমলিপি লিখিল। চন্দ্রাবতী লিখিল আমার বাবা আছেন, বিবাহ দিবার কর্ত্তা তিনি, আমি কিছুই জানি না। কিন্তু মনে মনে কন্যা জয়ানন্দকে পতিত্বে বরণ করিল।

এদিকে পিতা কন্যার জন্য বর খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ভাল-ঘরে ভাল-বরে কন্যার বিয়া হয় এই বর শিবের নিকট দিনরাত মানেন। কন্যা মনে মনে বলেন যেন জন্মে জন্মে জয়ানন্দের মত পতি পাই।

ঘটক আসিল, জয়ানন্দের রূপ বিদ্যা ও কুলের পরিচয় দিল। কররকুষ্টির মিল হইল।

> আমগাছে নয়া পাতা ধরিয়াছে বউল
> এইমাসে বিয়া দিতে নাহি গোণ্ডগোল।

সম্বন্ধ, লগ্ন, সব স্থির হইল—

> দক্ষিণের হাওয়া বয় কোকিল করে রা
> আমের বউলে বসে গুঞ্জে ভ্রমরা।

বিবাহের ধুম উঠিল। সধবা এয়োগণের হুলুধ্বনিতে বাড়ী মুখরিত হইল।

সুন্ধা নদীর কূলে এক মুসলমান কন্যার সহিত জয়ানন্দের আঁখির মিলন হইল। চলনে খঞ্জন তার বলনে কোকিল। চম্পক বরণী কন্যা জয়ানন্দের অনুরাগিণী হইল। জয়ানন্দ জাতি খোয়াইয়া তাহাকেই বিবাহ করিল।

এদিকে চন্দ্রাবতীর বিবাহে ঢোল বাজে নহবৎ বাজে এমন সময় এই দুঃসংবাদ পঁহুছিল। জয়ানন্দ বাল্য প্রণয় উপেক্ষা করিয়া, মুসলমান নারী বিবাহ করিয়াছে। চন্দ্রাবতীর গৃহে ক্রন্দন উঠিল—

> কপালের দোষ, দোষ নহে বিধাতার।

ঘাটে আসিয়া সুখের ভরা নাও ডুবিল। চন্দ্রাবতীর পিতা মাথায় হাত দিয়া ধূলায় বসিয়া পড়িল।

> আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী
> মনেতে চাপিয়া রাখে মনের আগুণি।
>
> রাত্রিকালে শর শয্যা বহে চক্ষের পাণি
> বালিস ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছানি।
>
> শৈশবের যত কথা, আর ফুল তুলা
> নদীর কূলেতে গিয়া করি ছেলে খেলা
>
> সেই হাসি সেই কথা সদা পড়ে মনে
> ঘুমাইলে দেখে কন্যা তাহারে স্বপনে।

নানাদেশ হইতে বিদুষী ও রূপসী কন্যার সম্বন্ধ আসিল, পিতা বংশীদাস বিবাহের স্থির করিতে ইচ্ছা করিলেন।

> চন্দ্রাবতী বলে পিতা মম বাক্য ধর
> জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর।
>
> অনুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে
> শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে।

পিতা শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, কন্যা একনিষ্ঠ হইয়া দেব ত্রিপুরারিকে পূজা করে।

> সুধাইলে না কথা কয় মুখে নাহি হাসি
> একরাত্রে ফুট্যা ফুল ঝুইরা হইল বাসি।

বৈশাখ মাসে কন্যা শিবপূজা অন্তে এক পত্র পাইল জয়ানন্দ লিখিয়াছে—

শুন রে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই
মনের আগুণে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই।
অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল হলাহল।
জানিয়া ফুলের মালা কালসাপ গলে
মরণে ডাকিয়া আমি এনেছি অকালে।
তুলসী ছাড়িয়া আমি পূজিলাম সেওরা
আপনি মাথায় লইলাম দুঃখের পসরা।
একবার দেখিব তোমায় জন্মশোধ দেখা
একবার দেখিব তোমার নয়ন ভঙ্গি বাঁকা।
একবার শুনিব তোমার মধুরস বাণী
নয়ন জলে ভিজাইব রাঙ্গা পা দু'খানি।
শিশুকালের সঙ্গী তুমি যৌবন কালের মালা
তোমারে দেখিতে কন্যা মন হইল উতলা।
পত্র পড়ি চন্দ্রাবতী চক্ষের জলে ভাসে
শিশুকালের স্বপ্নের কথা মনের মধ্যে আসে।

পিতাকে পত্রের কথা বলিল এবং জয়ানন্দ তিলেকের জন্য তাহাকে দেখিতে চায় ইহাও জানাইল। পিতা বলিলেন—

একমনে পূজ তুমি দেব বিশ্বেশ্বর।
অন্যকথা স্থান কন্যা নাহি দিও মনে
জীবন মরণ হইল যাহার কারণে।

চন্দ্রাবতী পত্রের উত্তর দিল না, পিতার কথায় শিবের আরাধনায় মন দিল।

যোগাসনে বসে কন্যা নয়ন মুদিয়া
একমনে করে পূজা বিল্বদল দিয়া।
শুকাইল আঁখির জল সর্ব্ব-চিন্তা দূরে
একমনে পূজে কন্যা অনাদি শঙ্করে।

শৈশবের ও জয়ানন্দের কথা ভুলিল। একনিষ্ঠ হইয়া পূজায় রত আছে এমন সময় পাগল জয়ানন্দ রুদ্ধদ্বারে আসিয়া দ্বার খুলিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল—

কপালে আঘাত করে শিরে দিয়া হাত
বজ্রের সমান করে বুকেতে নির্ঘাত।
যোগাসনে আছে কন্যা সমাধি শয়ানে
বাহিরের কথা কিছু নাহি পশে কাণে।

জয়ানন্দ চীৎকার করিয়া কাঁদে ও বলে

দেব পূজার ফুল তুমি তুমি গঙ্গার পাণি
আমি যদি ছুঁই কন্যা হইবা পাতকিনী।

কেবল নয়ন ভৈরা দেখ্যা যাই জন্মশোধ দেখা—এই প্রার্থনা। রুদ্ধদ্বার খুলিল না। কবাটের উপর জয়ানন্দ বেদনার আঁকর লিখিয়া গেল।

চন্দ্রাবতীর যখন ধ্যান ভাঙ্গিল কেহই নাই, মন্দির হইতে বাহির হইয়া কবাটের লেখা পড়িল এবং মন্দির অপবিত্র হইল ভাবিয়া কলসী লইয়া নদীর ঘাটে মন্দির ধৌত করিবার জন্য জল আনিতে গেল। এমন সময় দেখিল—

জলের উপরে ভাসে জয়ানন্দের দেহ।
দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান
ঢেউয়ের উপর ভাসে পৌর্ণমাসির চাঁদ।

চন্দ্রাবতী অবাক হইয়া দেখিল—

আঁখিতে পলব নাই মুখে নাই বাণী
পাড়ে খাড়া হৈয়া দেখে উন্মত্ত কামিনী।

---

* রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট মহোদয়ের মৈমনসিং গীতিকার চন্দ্রাবতী পালা হইতে গৃহিত। চন্দ্রাবতী বিখ্যাত মনসা ভাষানের কবি বংশীদাসের বিখ্যাত বিদুষী কন্যা।

গিরিশ প্রসঙ্গ

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(১)

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় একদিন নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। নানা প্রসঙ্গের পর সাহিত্য-প্রসঙ্গ উঠিল! পণ্ডিত মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন—"আপনার রচনা এত সরল যে, স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত বুঝিতে কষ্ট হয় না—ইহাই আপনার ভাষার বিশেষত্ব। আমরা লিখিতে যাইলে ভাষাটা সংস্কৃতানুগামী হইয়া পড়ে—সাধারণে সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিরূপে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা যায়—এ সম্বন্ধে আমায় কিছু উপদেশ দিতে পারেন?" গিরিশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে উপদেশ কি দিব বলুন, তবে একটা কৌশল বলিয়া দিতে পারি।"

পণ্ডিত মহাশয় সাগ্রহে বলিলেন—"কৌশল—সে কিরূপ?"

গিরিশ বাবু বলিলেন, "আপনার বাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের সহিত যেরূপ ভাষায় কথা কহেন, সেইরূপ ভাষায় লিখিবেন; দেখিবেন—সে ভাষা বুঝিতে কাহারও কোন কষ্ট হইবে না এবং বারবার অভিধান খুলিবারও প্রয়োজন হইবে না।"

(২)

বিধুমৌলি বাগচী নামক জনৈক অভিনেতা এবং তবলা বাদক প্রতাপচাঁদ জহুরীর ন্যাসান্যাল থিয়েটারে একটী ঘর লইয়া থাকিতেন। তিনি মফঃস্বলবাসী—বিশেষ ভদ্র এবং সজ্জন ছিলেন, সম্প্রদায়স্থ সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন।

হঠাৎ একদিন প্রাতে প্রতাপচাঁদ বাবু থিয়েটারে আসিয়া হুকুম করিলেন, 'অভিনয় বা রিহারস্যাল শেষ হইবার পর কেহ আর থিয়েটারে থাকিতে পারিবে না!' হুকুম শুনিয়া বিধুমৌলি বাবু থিয়েটার হইতে চলিয়া যান।

অপরাহ্নে অভিনেতাগণ থিয়েটারে আসিয়া শুনিলেন—বিধুমৌলি বাবু প্রোপ্রাইটারের আদেশে থিয়েটার হইতে চলিয়া গিয়াছেন। অকারণে বিধুমৌলি বাবু তাড়িত হওয়ায় অভিনেতাগণ বড়ই ব্যথিত হইলেন। এবং সকলে একটা যুক্তি করিয়া থিয়েটায় হইতে বাহির হইয়া নিকটস্থ বিডন উদ্যানে একত্রিত হইয়া উক্ত থিয়েটারের ম্যানেজার গিরিশ বাবুর বাড়ীতে এই সংবাদ পাঠাইলেন।

সন্ধ্যার পর প্রতাপচাঁদ বাবু থিয়েটারে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া এবং দরোয়ানের মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া ব্যস্তভাবে বাগবাজারে গিরিশবাবুর বাটীতে গমন করিলেন।

বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু ঘরমে হ্যায়?" গিরিশবাবু উপরের বৈঠকখানা হইতে প্রতাপচাঁদ বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন—"বাবু নেই হ্যায়!" প্রতাপচাঁদ বাবু গিরিশবাবুর মুখে এইরূপ অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—"এ ক্যা বাৎ! আপ্ সাম্‌নে হ্যায়, আপ্ হামলোক্‌কা থিয়েটারকে ম্যানেজার্ হোকে কা বাতাতা হ্যায়?" গিরিশবাবু বলিলেন.—ঝুঠ বাৎ,—হাম থিয়েটার কা ম্যানেজার নেহি হুঁ। হাম ম্যানেজার হোনেসে আপ্ হামারা সল্লা লেকে হামরা অ্যাক্‌টার বিধুবাবুকো বাহার কর্‌তে। আপ্ যাইয়ে; বাবু নেই হ্যায়।" গিরিশবাবু জানালা বন্ধ করিয়া দিতে যাইতেছেন দেখিয়া প্রতাপচাঁদ বাবু অনুনয়-বিনয় করিয়া এবং নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া বিধুমৌলিবাবুকে থিয়েটারে সযত্নে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন; পরে গিরিশ বাবুর সহিত থিয়েটারে আসিয়া অভিনেতাগণকে শান্ত করিলেন।

অভিনেতাগণের মধ্যে তখন একটা বিশেষরূপ একতা এবং পরস্পরের মধ্যে একটা প্রবল সহানুভূতি ছিল।

(৩)

দীনবন্ধু বাবুর সুবিখ্যাত "নীলদর্পণ" নাটকে রোগ-সাহেব ক্ষেত্রমণির পেটে ঘুঁসি ম'রে,—সেই বিষম আঘাতে তাহার গর্ভস্রাব হইয়া যায়। কয়েকদিন যন্ত্রণাভোগ করিয়া সরলা পতিব্রতা সতীলোকে গমন করে। গ্রন্থকার সাধ্বী ক্ষেত্রমণির মৃত্যু-দৃশ্যে তাহার "শয্যা-কণ্টকি" বর্ণনা করিয়াছেন। নিরীহা ক্ষেত্রমণির মুখে তাহার সেই অন্তিম বাক্য—সঁ্যাকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, মরে গ্যালাম—আরে মলাম রে"—"খোস্তা কুড়ুল মা"—"গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ—হু—হু—হু—" ইত্যাদি নিদারুণ বাক্যে পাঠকমাত্রেরই অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। গিরিশচন্দ্র বলিতেন—"ক্ষেত্রমণির এই ভীষণ দৃশ্য আমি দেখিতে পারিতাম না। সরলা পতিপ্রাণার মুখে চরম সময়ের এই উক্তি আমার বড়ই বিসদৃশ বোধ হইত।"

(৪)

একদিন কোনও এক ভক্তের বাটীতে ঈশ্বরীয় কথা এবং সংকীর্ত্তনাদির পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই স্থানের ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া নিবারণ করিতে যাইলে ঠাকুর বলিলেন,—"কি জান —বহু ভক্তের সমাগমে এবং ঈশ্বরীয় কথা ও নাম-সংকীর্ত্তনে এই স্থান পবিত্র হইয়াছে, এ স্থানের ধূলি—ভক্তের পদধূলি —পরম পবিত্র!"

গিরিশচন্দ্র "রূপ-সনাতন" নাটকে (৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) কাশীধামে রূপ, অনুপম ও বৈষ্ণবগণ পরিপূর্ণ চন্দ্রশেখরের বাটীতে ঐরূপ চৈতন্যদেবের ভক্তগণের পদধূলি গ্রহণ দৃশ্য দেখাইয়াছেন। যথা :—

"২য় বৈষ্ণব। প্রভু, করুছেন কি ?

চৈতন্য। আমি কৃষ্ণ-বিরহে বড় কাতর, তাই ভক্ত-বৃন্দের পদরজ অঙ্গে ধারণ ক'রছি, ভক্তের কৃপা হবে।"

ষ্টার থিয়েটারে এই দৃশ্যের অভিনয় দর্শনে কোন কোন গোস্বামী বিরক্ত হন এবং মহাপ্রভুর এইরূপ ভক্ত-পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন অতি গর্হিত বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ, এমন কি কটূক্তিও করেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের বিরক্তিতে বিচলিত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন—"আমি যে স্বচক্ষে পরমহংসদেবকে ভক্ত-পদধূলি গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি।"

অনেকেই জানেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র তাঁহার শ্রীচরণে প্রথম পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। স্বয়ং উপলব্ধি না করিয়া তিনি কোনও বিষয় লিখিতেন না। বিনা চেষ্টায় তিনি পরমহংস দেবের দর্শন ও তাহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন। ইহার আভাস তিনি তাঁহার বিল্বমঙ্গল নাটকে (৩য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক) সোমগিরির মুখে গুরুতত্ত্ব-বর্ণনে দিয়াছেন। যথা :—

"অকস্মাৎ কোথা হ'তে কেবা আসে,
তার ভাষে হয় হৃদে আশার সঞ্চার,
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে।" ইত্যাদি—*

* অবিনাশবাবু গিরিশচন্দ্রের অনুক্ষণের সঙ্গী ছিলেন; কাজেই আশা করা যাইতেছে যে তাঁহার এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় নাট্য-সম্রাটের ও তখনকার রঙ্গ-মঞ্চের অনেক নূতন কথা জানিতে পারা যাইবে।

সঃ, সঃ পিঃ।

"ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী-বিপ্লব"

[শ্রীসফিয়া খাতুন বি-এ]

গ্রীকদের এক অদ্ভুত দেবতা ছিলেন। তাঁর পূজার আরতি দেবার সময় এক প্রথা ছিল। দেবতার মন্দিরের প্রায় এক মাইল দূর হতে সারি বেধে ঘোড়-সোয়াররা একেবারে মন্দির পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকত আর দেবীর মন্দিরের আলোর মশাল একটা ঘোড়-সোয়ারের হাত হতে আর একটা ঘোড়-সোয়ারের হাতে চালান দিয়ে দেবতার মন্দিরে পৌছিয়া দেওয়া হত।

নারীর স্তায্য অধিকার নিয়ে যেসব ঝগড়াঝাটি হয়ে গেছে তা মনে হলে এই গল্পটার কথা মনে হয়। নারী-বিপ্লব-আলোর মশাল ও ঠিক তেমনি প্রায় তিন হাজার বৎসর হতে একহাত হতে আর হাতে চালান হয়ে মিশর হতে সংক্রামিত হয়ে প্রথম ফ্রান্স, তারপর ইংলণ্ড ও জার্মাণীকে ভীষণভাবে সংক্রামিত করে। খুব সম্ভব পঞ্চম শতাব্দী হতে এই আন্দোলন সুরু হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে যেন তার প্রাণদান হয়েছিল—Heloiseএর আত্মত্যাগ ও Hypaticeর হত্যাতে। এই ঘটনার পর অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ডেপুটেশনের উপর ডেপুটেশন পাঠিয়ে নারীকে আশায় আশায় বসে থাকতে হয়েছিল। তা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাবালক হয়ে উঠে।

আন্দোলনটা খুব জাঁকাল রকমের হয়ে উঠে আমেরিকায়। সেই অভিযানের নেত্রী ছিলেন Mercy Warren and Abigail Adams. ওঁরা সত্যিকার মত কিছু করতে পারেন নাই বটে কিন্তু বিপ্লবের আগুন তাঁরাই প্রথম জালিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর আন্দোলন হঠাৎ একেবারে দমে যায়। আবার পুরুষদের মনগড়া আদর্শের বশবর্ত্তী হয়ে নারীকে চলতে হয়। দেশের যখন এই অবস্থা তখন স্কটলণ্ডে Frances Wright এসে দেখা দেন। এই মহিয়সী মহিলা গ্রামে গ্রামে যেয়ে নারীর স্তায্য অধিকার বিষয়ে অগ্নিময়ী বক্তৃতা দিয়ে দেশের মেয়েদেরে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। তিনি তখনকার আমেরিকান সরকার পক্ষের নিকট এই মর্ম্মে এক ডেপুটেশন পাঠালেন যে নারীর বিষয়ে আইন কানুন নারীকেই তৈরী করে দিতে হবে। কারণ নারীর অভাব অভিযোগ একমাত্র নারীই জানতে পারে। পুরুষের তা বুঝবার ক্ষমতা নাই। বরং পুরুষের অভাব অভিযোগ নারী বলে দিতে পারে, কারণ পুরুষ নারীর কোলে প্রতিপালিত। Frances Wright এর ডেপুটেশন নিয়ে আমেরিকায় এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ক্রমে Polish Jewess, Ernestine Rose, Sister Grimke এবং Quaker দলের ভক্তিমতী Abby Kellyর স্তায় জগৎ-বিখ্যাত মহিলারা Frances Wright এর সহিত যোগদান করেন। তখন কুসংস্কারাপন্ন ডিমক্রেট আমেরিকানরা তাঁদেরে নানাভাবে বিদ্রুপ করতে থাকে। রাস্তার লাইট পোষ্ট, ট্রামগাড়ী ও রেলগাড়ী প্রভৃতিতে ইহাদের নাম লিখে নানা অশ্লীল ও বিদ্রুপাত্মক কথা লিখে রাখত। এঁদের স্বভাব চরিত্র ভাল নয় বলে কতকগুলি লোক তাঁদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিত কিন্তু এঁরা সেসব কথায় মোটেই কাণ দিতেন না, বরং শুনে একটু হেসে চলে যেতেন। সরকার পক্ষ তাদের ডেপুটেশনে কাণ দেওয়া ত দূরের কথা, তাঁদেরে খুব করে শাসাতে লাগলেন, যদি তাঁরা বেশী বাড়াবাড়ি করেন তাহলে তাঁদেরে জেলে পোরা হবে। পরে তাও করা হয়েছিল। মিশনরীরা তাদেরে সামাজিক বিষয়ে বাধা দিতে লাগল। বিপ্লববাদী নারীকে চার্চ্চে গান গাইতে দেওয়া হত না। সেসব নির্য্যাতনের কাহিনী যদি কোন সহৃদয় পাঠিকা জানতে চান তাহলে তাঁকে Mrs Cady Stanton's "History" পড়তে বলি।

ঠিক সেই সময় কবি Whittirr তাঁহার জ্বালাময়ী

কবিতার ভিতর দিয়ে মিশনারীদের চৌদ্দপুরুষদের সর্ব্বস্বান্ত করতে থাকেন।

এই সময়ে ফ্রান্সে দ্বিতীয় রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে। সমস্ত ইউরোপ কূটনীতির ঢেউএ ভেসে যায়।

তার প্রধান নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল ১৮৩২ খৃঃ Reform Bill পাশ হয়ে যাওয়ায়। এই বিল পাশ হয়ে যাওয়ায় বিলাতের নারী সমাজে ভয়ঙ্কর চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এই Reform Parliament ১৮৩৫ খ্রীঃ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এক্ট হতে নারীর দাবী দাওয়া সব উঠিয়ে দেন। এই বিল পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডে জাগরণের একটা সাড়াও পড়ে যায়। নানাপ্রকারের নূতন নূতন কাজের সাড়া পড়ে যায়। কাজেই সেসব জনহিতকর কাজে যোগ দিবার ইচ্ছা স্বভাবতই নারীর প্রাণে জেগে উঠে। কিন্তু সেই বিলে নারীকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ঠিক সেই সময় Merry Wollstonecraftএর Vindication of the Rights of Women নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনের নামজাদা রাজনৈতিক William Godwin, William Thomson পর্য্যন্ত Mary Wollstonecraft এর অভিমত সমর্থন করেন। এদিকে বিলাতে Robert Owen এর তখন খুবই প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মেয়েদের নানাভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। ফলে মেয়েরা বিলাতের প্রসিদ্ধ Corn Law Agitationএ যোগ দেন। সেই আন্দোলনের সময় মেয়েরা জনসাধারনের কাজে নিজেদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি দেখিয়েছিলেন।

নারীর ন্যায্য দাবী বিষয়ে প্রায় ১৮৫০ খানা পেম্পলেট ছাপা হয়। আর নানারকমের প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপাও হয়। ১৮৫১ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ ছাড়া আর কোন একটা কাজ করতে দেখা যেত না। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ১৮৬১খ্রীঃ দেখা গেল বিলাতে ১৩০জন মেয়ে ফটোগ্রাফারের কাজ করে, ৩০৮জন দপ্তরী (Bookbinder)। ১৮৭১খৃঃ দেখা গেল ১৭৫৫জন দপ্তরী, ৭০০০ হাজার দোকানী। আজ বিলাতের অর্দ্ধেক মেয়েরা পারিবারিক কাজকর্ম্ম ছাড়া বাইরের অনেক কাজ করে যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করেন। বিবাহিত প্রায় এককোটীর উপর মেয়েরা চাকুরী করছেন। ublic Workএ মেয়েদের কৃতকার্য্যতা দেখে Mcabe বলেছেন "With this Enormous and increasing employment of women in view it is impossible to continue to talk of woman's place being the home, and quite ridiculous to make that thread-bare phrase a ground for limitation of woman's interests. To refuse them a right that only the most desperate stretch of imagination could represent as taking woman "out of the home" and at the same time to acquiese in an industrial development that effectively takes millions of them out of it, is a quaint aberration of reasoning.

কিন্তু মিশনারীরা Suffrage দেরে ভীষণভাবে বাধা দিতে লাগল। তারা চার্চ্চে চার্চ্চে বক্তৃতা দিতে লাগল যে মেয়েদের স্থান অন্তঃপুরে, বাহিরে নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় তখন বিলাতের লোক Frances Wright, Ernestine Rose Abbykelly প্রভৃতি মহিলাদেরে বিলাতে বক্তৃতা পর্য্যন্ত দিতে দেয় নাই। এদিকে আমেরিকায় মেয়েরা রাজনৈতিকক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে যোগদান করায় তাঁরা সকল রকমের সাহায্যই পুরুষের নিকট হ'তে পান। ফলে Americau Federation of labour এবং United Mine Workers ন্যায় এমন প্রবল ও প্রতাপান্বিত দল দুটিকে নিজ দলভুক্ত করেন।

১৮৬৯ খৃঃ আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট মেয়েদের দাবী মঞ্জুর করেন। আমেরিকার মেয়েদের কৃতকার্য্যতা দেখে বিলাতের মেয়েরা অসীম উৎসাহে কাজ চালাতে থাকে। ১৮৪৭ খৃঃ Mr. Holyoake আন্দোলন কিরূপে চালাতে হবে তার একটা প্রগ্রাম তৈরী করেন। সেই প্রগ্রাম অনুসারে প্রথম একখান পত্রিকা বাহির করা হয়। তারপরে মহিলাবক্তা তৈরী করে নিয়ে মেয়েদের ন্যায্য ও রাজনৈতিক অধিকারের জন্য তুমুল আন্দোলন চালাতে লাগলেন, দশ বৎসর পরে Miss. Harriet. Martinearro

Mess. Bessie. R. Parkes, Miss' Barbara. L. Smeth. Mrs. Satulfeld. Mrs Orowford এবং অন্যান্য অনেক মেয়েরা "Woman's journal" নামে একটি পত্রিকা বাহির করেন।

১৮৬৬ খৃঃ দ্বিতীয় Reform Billএর আন্দোলনে মেয়েদের আন্দোলন বিশেষ ভাবে জমাট বেধে ছিল। সে সময় Mrs. J. S, Mill এর "Are women fit for Politics?" নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ পাঠ করে Mr. Mill- যিনি নারীর ন্যায্য অধিকার দিবার ভয়ঙ্কর বিরোধী ছিলেন—তিনি নিজ পত্নীর প্রবন্ধ পাঠ করে শুধু যে, সেই আন্দোলনকে সমর্থন করে ছিলেন তা-নয়, ১৮৬৯ খৃঃ Subjection of woman নামক তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ক্রমে মাঞ্চেষ্টার ও লণ্ডনে দুইটি দল শক্তিশালী হয়ে উঠে. দুই সপ্তাহের ভেতর ১৪৯৯ জনের স্বাক্ষর দিয়ে একখানা আবেদন পত্র তৈরী করা হয়। সহরের নানা স্থানে সভা সমিতি করা হয়। সে সময় Dr. Pankhurst. এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ জনসাধারণ বক্তৃতা দিতে থাকেন।

তাহার ফলে ১৩৪০০০ মহিলা নিজেদের অভাব অভি-যোগ উল্লেখ করে পার্লেমেণ্টে আবেদন করেন তখন Gladstone এর সময় ছিল। তিনি নারীদের অধিকার দানে বিরোধী ছিলেন। তিনি নানাপ্রকারে বাধা দিতে থাকেন। যদিও মন্ত্রণা সভায় তখন মেয়েরা আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নাই কিন্তু তা হলেও তাদের উৎসাহ কমে যায় নাই, তাহারা ক্রমান্বয়ে ৩৪ বৎসর এমনি করে প্রতিবৎসর আবেদন পত্র পার্লেমেণ্টে পাঠাতে থাকেন। ১৮৮৩ খৃঃ সেই আবেদনের পক্ষে ছিল ১১৪ ভোট, এবং বিরুদ্ধে ১৩০ ছিল ১৮৮৪ খৃঃ ১৩৬ ভোট দ্বারা আবার মেয়েরা পরাজিত হন। সে সময় অনেক Liberal Member রা Gladstone এর ধমক খেয়ে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেয়েদের বিপক্ষে ভোট দিতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। ১৮৮৬ খৃঃ Electionএ মেয়েদের এই আন্দোলনের সমর্থন কারী ৩৪৩ জন সভ্য মন্ত্রণা সভায় প্রবেশলাভ করেন। ১৮৯২ খৃঃ আবার নতুন করে একটা আন্দোলন উত্থাপন করা হয়। সমর্থনকারীদের পক্ষে ছিলেন Mr. Balfour, Sir G. Wyndham এবং বিরুদ্ধে ছিলেন Mr. Asquith. ভোটে দেখা গেল মেয়েদের পক্ষে ১৫২ জন এবং বিপক্ষে ১৭৯জন! ১৮৯২খৃঃ জেনারেল ইলেক্সনে স্বপক্ষের লোক হঠাৎ কমে যায়। আবার ১৮৯৫খৃঃ ২৩২ জন হয়! ১৯০০খ্রীঃ ২৭৪জন শেষে ৪২০জন হয়েছিল। তার ফলে ১৬৯ জনের সংখ্যাধিক্য নিয়ে মেয়েদের বিল পাশ হয়ে যায়। এই বিল পাশ হবার পর মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করবার ক্ষমতা পান। আমেরিকায় মেয়েরা গ্রামে যেয়ে নিজেদের আন্দোলনের কাজ করবার সুযোগ পান্। পল্লীর যে সব মেয়েরা এই আন্দোলনের খোঁজ খবর রাখতেন না, তাদের বাড়ী বাড়ী যেয়ে আন্দোলনের বাণী পৌছিয়ে দেন। তাই আজ দেখতে পাই, আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মেয়েরা প্রাণ খুলে দেশের কাজে পুরুষের সঙ্গিনী হয়ে কাজ করছেন।

মায়া-নির্ঝর

(কথিকা)

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]
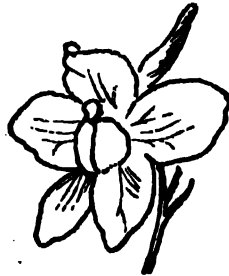
দারুণ গ্রীষ্ম।... ...

শিকার করিয়া ফিরিতেছিলাম। পা চলিতেছিল না। পরিশ্রান্ত দেহ, ভারাক্রান্ত মন কোনমতে টানিয়া টানিয়া নির্জ্জন বনের কণ্টক-পথে মন্থর গতিতে চলিতেছিলাম। দীর্ঘদিবসের নিস্ফল প্রয়াস--বনমৃগের পশ্চাদ্ধাবনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা দেহমনের উপর একটা প্রকাণ্ড পাথর-চাপ বসাইয়া দিয়াছিল, নিঃশ্বাস বহিতেছিল ধীরে—অতি ধীরে।

বনান্তরালে দিবসের শেষরশ্মি সিঁদুরের আলিপনা আঁকিয়া অস্তাচলে চলিয়া পড়িল। বাতাস নাই, গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়ে না। অসংখ্য পাখী মাথার উপর বিচিত্র কলরব তুলিয়া কুলায় চলিয়াছে।......

শূন্য মন, শুষ্ক কণ্ঠ। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে।---তৃষ্ণার জল কোথায়? শূন্য মন ভরিয়া তুলিবার মত সম্বল কোথায়? দেহ, মন, প্রাণ আজ একি নিস্ফলতার হাহাকারে গুমরিয়া মরিতেছে!......

আপন মনে একাকী গহন বনের নির্জ্জন পথে আলো আঁধারের ভিতর দিয়া টলিতে টলিতে চলিয়াছি। হঠাৎ দূরে কার পায়ের নূপুর নিক্কন ধ্বনিয়া উঠিল! কে যেন মধুর সুরে করুণ রাগিনী গাহিয়া উঠিল! কার কলকণ্ঠস্বরে আমার এ বিশুষ্ক চিত্তকে আকুল চঞ্চল করিয়া তুলিল! কে-সে? কোথায়—কতদূরে তার চরণরেণু কোন্ কুঞ্জতলে শুষ্ক তরুকে পুষ্প-কিশলয়ে মুঞ্জরিয়া তুলিতেছে?......

পথ চলিতেছিলাম—গতি অতি মন্থর। হঠাৎ গতি ফিরিয়া গেল! কে আমার শিথিল গতিকে এমন চঞ্চল করিয়া তুলিল? ব্যাকুলাগ্রহে পাগলের মত ছুটিলাম সেই সুরের সন্ধানে।—

দূর হইতে শব্দ শুনিয়াই যেন অন্তরে অনুভব করিয়াছিলাম—এ ধ্বনি যা'র সে আমারই অন্তরের তৃষ্ণা মিটাইতে পারিবে—আমার এ বিশুষ্ক কণ্ঠ শীতল স্নিগ্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইবে।.........

ছুটিয়া তাহারই পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। আঃ -কি স্নিগ্ধ তার পরশ! কি মধুঝঙ্কার তার কলকণ্ঠের কলকল তানে! তাহাকে দেখিয়া চোখ আমার জুড়াইয়া গেল—তাহার স্নিগ্ধ পরশে সর্ব্বদেহ যেন তৃপ্তিতে অবশ হইয়া আসিল!.........

অঞ্জলি ভরিয়া, আকণ্ঠ পান করিয়া মনে হইল আজ এতদিনের ব্যর্থ জীবন আমার সার্থক হইল। যে তৃপ্তি আজ আমার দেহ মনকে শান্তির কোলে ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছে—মনে হইল মৃত্যু এর কাছে তুচ্ছ--সংসারের সুখ দুঃখ, অভাব অবহেলা এর কাছে কিছু নয়!... ..

পৃথিবী তেমনি ভাবে চলিয়াছে।......

সূর্য্য উঠিয়া—সংসারকে জাগাইয়া আবার সন্ধ্যায় অস্ত যায়। পাখীরা গাহিয়া কুলায় বিশ্রাম করে। ফুল ফোটে, গন্ধ বিলায়, ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু আমার ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর নাই। আমি তাহারই যৌবনদৃপ্ত সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া, তাহার সেই চলচঞ্চল উচ্ছল ছলছল শীতল রসধারা আকণ্ঠ পান করিয়া বিভোর হইয়া আছি—তাহার কলকণ্ঠের কাকলী-কূজনে মুগ্ধচিত্তে নিদ্রালশ নেত্রে দিবসের পর দিবস কাটাইয়া দিতেছি।......চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, কোনকিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। সর্ব্বদেহে নবযৌবনের জোয়ার বহিয়া চলিয়াছে—সর্ব্ব অঙ্গ সঞ্চালনে যৌবন তরঙ্গভঙ্গির উদ্বেল নৃত্য ভঙ্গিমা,—উদ্বেলিত নয়নে তার তড়িৎপ্রবাহ বিচ্ছুরিত, ললাটে তার শুভ্র গরিমা, কণ্ঠে তাহার সুধাবর্ষী কলতান!...আমি তন্ময় হইয়া এই মানসী-প্রতিমার ধ্যানে, এই অপরূপ কলগীতার সৌন্দর্য্য-মদিরাপানে বিভোর হইয়া দিবসের পর দিবস কাটাইয়া দিলাম।.........

...কালের চক্রের বিরাম নাই—অবিরাম গতিতে সে ঘুরিয়াই চলিয়াছে। শুষ্কপাতা ঝরিয়া তরুশ্রেণী নবকিশলয়ে সাজিয়া উঠিল। পলাশ তরুশিরে রক্ত পতাকা আগুন ধরাইয়া দিল! নববসন্তের পরশপুলকে জাগিয়া উঠিয়া দেখি দীর্ঘ বরষ চলিয়া গিয়াছে।......

উঃ, একি মাদকতা সৌন্দর্য্যের! একি মৃত্যু-ভুলানো আকর্ষণ এই এই যৌবনপ্রদীপ্ত মাধুর্য্যের!.........

ভুলিয়া গিয়াছি—একদম ভুলিয়া গিয়াছি কোথায় চলিতেছিলাম—চলিতে চলিতে কোথায় থামিয়া গিয়াছি!......

কে এ মায়াবিনী! কে এ কুহকিনী? আমাকে এমন ভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া কে ভুলাইয়া রাখিল রে! যাদুকরী! তুমি কে?............

শিকারী আমি—চলিয়াছিলাম শিকার করিতে।...পথে কা'র মায়াজালে পা জড়াইয়া গেল?......

হঠাৎ মনে পড়িল—সেই আমার নির্জ্জন কুটীরবাসিনী সুহাসিনী প্রেয়সীর নয়ন ভুলানো চোখদুটী! স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর! সে দৃষ্টিতে অনল হানে না, সুধা বর্ষণ করে; দগ্ধ করে না, মুগ্ধ করিয়া

মৈর !……ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যাই তাঁর কাছে—লুটাইয়া পড়ি তার চরণপ্রান্তে। বলি ওগো, ক্ষমা কর ক্ষমা কর মোরে; মুহূর্ত্তের ভুলে যদি তোমাকে দুঃখ দিয়া থাকি সব ভুলিয়া যাও, তোমার অপর্য্যাপ্ত প্রেমধারায় আমায় ডুবাইয়া দাও, ভাসাইয়া দাও—আমি তোমারি বুকে আশ্রয় চাই—মরিয়া কৃতার্থ হইতে চাই। .....

ফিরিয়া চাহিতেই আবার সেই সকল-ভুলানো সৌন্দর্য্যের মুখে সেই বিশ্ববিমোহন হাসি! তাহার বুকে সেই উচ্ছল যৌবন-জল-তরঙ্গের নৃত্য—তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে। এই নির্জ্জন বনপ্রান্তে তাহারই অঞ্চলছায়াতলে যে অনাবিল শান্তি, তাহার স্নিগ্ধশীতল পরশে যে মধুর মাদকতা—কেমন করিয়া যাইব আমি ?…সব ছাড়িতে পারি, কিন্তু এই যে আমার মানসী-রাণী ইহাকে ছাড়িতে যে বুক ভাঙ্গিয়া যায় !...

কহিলাম প্রিয়ে! তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতেও আমার ইচ্ছা হয় না! কি মায়ার পরশ তুমি বুলাইয়া দিয়াছ আমার মনের উপর! কি যাদুমন্ত্রে ভুলাইয়া রাখিয়াছ আমার সর্ব্বচিন্তা সর্ব্বঅতীতস্মৃতি! মুক্তি দাও, একবার আমাকে মুক্তি দাও—ঘুরিয়া আসি—দেখিয়া আসি। ফিরিয়া আসিয়া আবার তোমার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া তোমার সুধাকণ্ঠের কলসঙ্গীতে শ্রবণ তৃপ্ত করিব—তোমার স্নেহরসসিঞ্চনে আমার এ তৃষিত ব্যথিতচিত্ত তৃপ্ত করিব।......

* * *

...গিয়াছিলাম– ফিরিয়া আসিয়াছি।

তখন ছিল পূর্ণিমার চল চল হাসি—আকাশে পৃথিবীতে জ্যোৎস্নার রজতধারা-প্রবাহ।...আর আজ একি অমানিশার ঘনান্ধকার চারিদিক ঢাকিয়া দিয়াছে।...উঃ, একি সূচীভেদ্য অন্ধকার—বুকের রক্ত যেন জমাট বাঁধিয়া যায়!...

ছুটিয়া গেলাম সেই আমার চিরপরিচিত, চির আকাঙ্ক্ষিত, চিরতৃপ্তির আশ্রয় ছায়াতলে।...কিন্তু একি! কোথায় সেই স্নিগ্ধ শীতল, রূপে চলচল প্রেয়সী আমার! কোথায় সেই সর্ব্বচিত্তবিভ্রমকারিণী, কলকূজিত, সদাউল্লসিত প্রিয় নির্ঝরিণী আমার! কোথায় তার চলচঞ্চল হিমস্নিগ্ধশীতল স্নিগ্ধধারা!……

হায় সব শুষ্ক—সব পাষাণ!...নাই-নাই, সে স্নিগ্ধ সরল কলকাকলী আর নাই...সে মুগ্ধকরী মধুসঙ্গীত আজ স্তব্ধ মৌন…যে অঞ্চলের ছায়াতলে একদিন সংসারের তৃষিত শুষ্ক চিত্ত শীতল হইয়াছে আজ সেখানে সাহারা মরুর তপ্তনিঃশ্বাস!......ওই শোন বহ্নি-তপ্ত-বায়ু বহিতেছে–সোঁ-সোঁ-সোঁ!.........

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়!......

আমিও স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! আবার সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছি। জানিনা এবারকার 'পথের ধারের ব্যাকুল বেণু' আকুল করিয়া কোথায় কোন্ দূর লইয়া যাইবে!

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৭ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [একচত্বারিংশ সপ্তাহ

গিরিশচন্দ্র*

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

হে গিরিশ, গেছ তুমি চলে আজ দূর লোকান্তরে
দূরতম অজ্ঞাত যে দেশ
মোদের এ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মিলাবে অসীমান্তরে
করিবে না সেথানে প্রবেশ!
করে যদি, তোমার কি লাভ? হয়ত ভাবিবে তুমি
এ বিদ্রূপ অকৃতজ্ঞদের!
যে বাক্য-সর্ব্বস্ব জাতি মুখরিয়া রাখে বঙ্গভূমি
মৌন ছিল কণ্ঠ সে সবের
উচ্চারিত ক্ষীণ সাধুবাদ দিতে বিন্দু স্নেহকণা
প্রতিভার করিতে আদর—
আজ সেই উপেক্ষিতে—পূজা মোর নহে যে ছলনা
বুঝাইতে হতেছি কাতর।

চিনিতে পারি নি মোরা কি যে তুমি ছিলে বঙ্গমা'র
হারাইয়া বুঝিয়াছি আজ,
পরশ পাথর পেয়ে না চিনিয়া করি পরিহার
সহিতেছি নির্ব্বোধের লাজ!
বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে নাট্যে-নটে চিত্রপটে সবে
লেখা আজ ব্যথা তোমাহীন
মাতা সম সর্ব্বত্যাগী স্নেহে রেখেছিলে যারে ভবে
বুকে করি একা এতদিন!
করিবারে বাণীপূজা পালিবারে আদেশ তাঁহার
সহিয়াছ অবনত শিরে
শত নিন্দা নির্য্যাতন নাহি ছাড়ি পথ আপনার
নাহি চাহি একবার ফিরে।

হে গিরিশ, গিরিশের মত তুমি নিয়ে শুধু ছাই
বাঙ্গালীরে দেছ' আশীর্ব্বাদ,
যাহাদের করে গেছ বড় তুমি হেন, তাহারাই
করে তব আজি নিন্দাবাদ!
শতধিক্ কালামুখী রুচি, ধন্য তোর বিবেচনা
তুই চাস্ অসম্ভব যত—
শুধু ছলা গুপ্তি মিথ্যাভাণ হৃদিহীন চাটুপণা
সাধনারে করে দিতে নত!
পঙ্কে ফোটা পঙ্কজে ফেলিয়া, তুই চাস্ ফুলাকারে
কাগজের গন্ধহীন ফুল
দেবতার মূর্ত্তি না গড়িয়া পেতে চাস্ তুই তাঁরে—
কি বুঝাব—এ কেমন ভুল!

হে গিরিশ, মধ্য-দিন-রবি, উদিলে এ বাঙ্গালায়
কি বিপুল প্রতিভারে লয়ে,
আপনার তেজে দৃপ্ত—আরম্ভিলে বাণী সাধনায়
উপেক্ষিয়া মান লজ্জা ভয়ে!
নিলে বরি গিরিশের মত তব সাধনার সাথী—
জগতের যত অপমান
পতিতা ও পরিত্যক্তে দিয়া সজ স্নেহে দিনরাতি
করে গেছ এ বৈভব দান!
এ কঠোর শব সাধনায় জীবন কাটায়ে, দিয়ে
বঙ্গমায়ে সম্পদ আনন্দ—
গেছ স্বর্গে মথি জ্ঞান নিধি নীলকণ্ঠ, বিষ পিয়ে
দেছ সুধা [illegible] মকরন্দ!
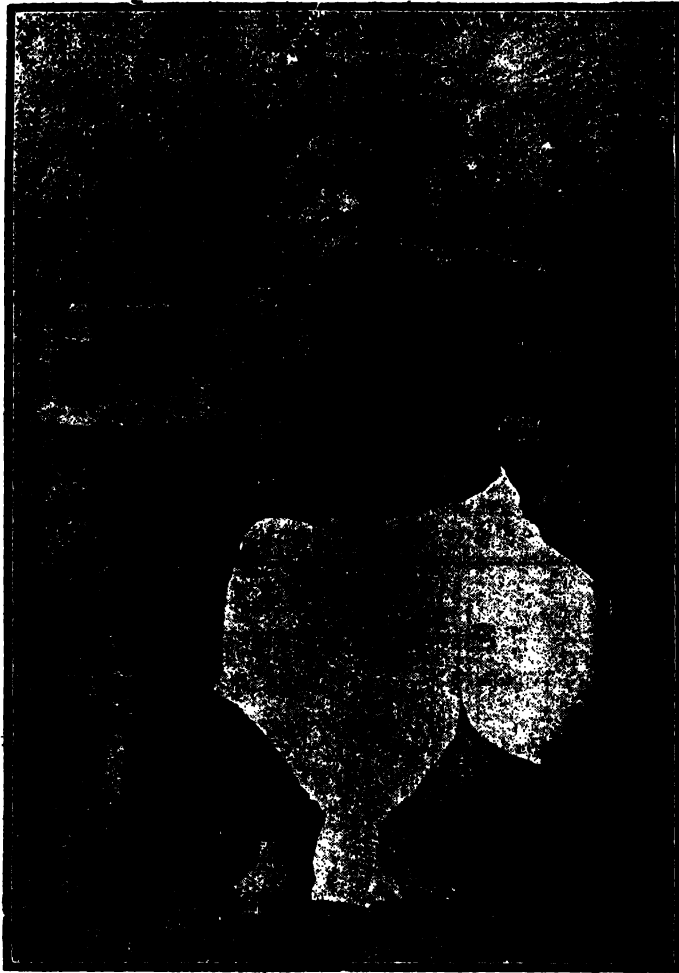
কবিবর, বাঙ্গালার ভক্তিধারা উৎসারিয়া দিতে—
দিলে বঙ্গে চারিটি যুগের
নর আর নারায়ণে আনি ; প্রেমানন্দ পূর্ণ চিত্তে
উথলিল স্মৃতি বিস্মৃতের !
সমাজের ক্রূর বর্ব্বরতা ব্যথিত অন্তরে কবি,
দেখাইলে কন্যা-বলিদান,
মদিরার পরিণাম, পতিতার ছলাময়ী ছবি,
সোদরের তীক্ষ্ণ ছুরিখান !
বাঙ্গালার অতীত গৌরব, দুই ভা'য়ে আদালত—
বুদ্ধ ও শঙ্করে পূজাদান,
চিত্রি চারু গৃহলক্ষ্মী তপোবলে পূর্ণ মনোরথ
দেছ' বঙ্গে অশেষ কল্যাণ !

হে মণীষি, শিল্পি, কবি, ওগো নট, ওগো নাট্যকার,
ওগো বঙ্গে বিধাতার দান,
ওগো স্বভাবের কবি, ব্রহ্মচারী বাণীর পূজার
তোমারে কি জানাব সম্মান ?
করিয়াছি যত অপমান নিজ মুখে চেয়ে দেখি
একটুও যায়নিক' বৃথা,
তোমারে না স্পর্শি তারা আমাদেরি মুখে আছে ঠেকি,
কিসে যায় এ কলঙ্ক-কথা ?
হে আপন চিরন্তন, এস আজ নিজ ঘরে ফিরে
অশ্রুজলে পাদ্যঅর্ঘ্য লহ'
নিত্য শত চিত্ত-ধূপে হইবে আরতি, এ মন্দিরে
দর্ভাসনে চিরকাল রহ' ।

* গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় পঠিত ।

একবিংশ-শতাব্দী-নারী-চরিতম্

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"হিন্দুস্থান" নামক দৈনিক পত্রটি নারীজাতির পরম ধন্যবাদ ভাজন। তাঁহারাই বিংশ শতাব্দীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে নারীকে আলোকিত জগতে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণ-পাত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারাই প্রথম উপলব্ধি করেন যে নারীরা নৃত্য-শিক্ষা না করিলে দেশের উন্নতি হইবে না, শ্রী ফিরিবে না, নারী—নারী নামের যোগ্য হইবে না। যাহাতে নারীরা প্রকাশ্যভাবে (অপ্রকাশ্যভাবেও ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচ নয়—কারণ তাহার কোন মূল্য নাই) নৃত্য-কলা দেখাইতে পারেন, তাহার স্বপক্ষে তাঁহারা অনেক কাগজ-কালি খরচ করিয়াছেন, তাঁহাদের জয় হোক!

"করিতে নাটক নভেল শ্রাদ্ধ করিতে নৃত্যগীত বাদ্য
বসিতে, উঠিতে, চলিতে, ফিরিতে, ঘুরিতে দিবস যামিনী।"

"আপনি পোজ্ দিতে জানেন না মশাই! বেশ একটু লীলায়িত হয়ে "
"ওঃ! লীলায়িত! এই নিন্।"

চিত্র-কলাতেও নারী যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। এখন অবলীলাক্রমে তাহারা নরের ফটো তুলিতে পারে, সিটিং লইয়া ছবি আঁকিতে পারে; পুরুষ-মডেল সংগ্রহ করিয়া মাসিক পত্রাদির জন্য ছবি আঁকিতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে যত মাসিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, দৈনিক, অ-দৈনিক, মাঝে-মাঝের কাগজ ছিল, সব তাতেই নারীর ছবি বাহির হইত, কারণ তখন চিত্রকর ছিল নর, আর মডেল ছিল নারী। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বড় বড় কাজের সঙ্গে ছোট-কাজেও নারী পশ্চাদ্পদ নহে। তাহারা জানে শুধু বড় কাজ করিলেই সংসার চলে না, পৃথিবী চলে না, বড় ছোট দুই-ই চাই। এখন তাহারা রাস্তায় রাস্তায় কাগজ হক্ করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। আর দ্বিধা, করিবেই বা কেন? স্বাধীন ব্যবসা যখন, আর সংসার প্রতি-পালন, স্বামী-পুত্র পালন যখন তাহাদেরই করিতে হয়, তখন অত বাছ-বিচার না করাই সঙ্গত।

শুধু বড় কাজে সংসার চলে না, বিশেষ স্বামী-পুত্র পালন করিতে হইলে কাজ করিতেই হইবে। অতএব—

"চাই সচিত্র শিশির?"

সেক্সপীয়ারের পোরসিয়া একদিন বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ; আজ সর্ব্বত্র পোরসিয়া ;—নীরস বিচারালয়ের শুষ্ক কাষ্ঠাসনগুলি ধন্য হইয়া গিয়াছে।
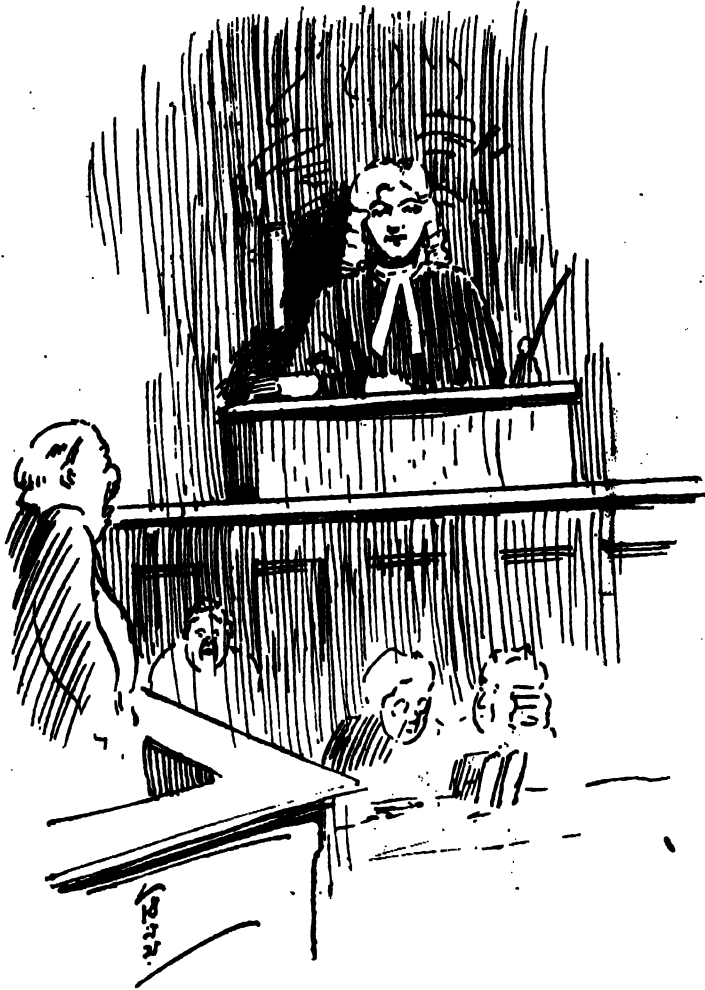
—A daniel has come to judgment,—
"Not Lordship, Say Ladyship."

বিংশ শতাব্দী হইতে প্রভেদ বাহিরেও যেমন দেখা গিয়াছে, ঘরেও তেমনি। নারী এখন রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং অলস 'নর'কে গৃহকর্ম্মের ভার দেওয়া হইয়াছে।

"ইউ ফুল্! ওকে কাঁদাচ্ছ কেন? আচ্ছা অকর্ম্মা তুমি ত!"
একটু পরে ও সুরে—"তোমারই তুলনা তুমি চাঁদ, অকর্ম্মার ধাড়ি!"

কিন্তু কিছু কিছু খারাপও হইয়াছে বৈ-কি! কিন্তু তজ্জন্য আমরা দুঃখিত নহি! চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে; চন্দ্রমা-সদৃশ যাহাদের মুখ, তাহাদের মুখেও ব্রণ উঠে, নিরুপায়! শুধু তাই নয়, বীরত্বের ইহা অঙ্গ। এক পাত্র পেটে পড়িলে বাঙ্গালীর নরম ভাষা মুখে থাকে না; বাঙ্গালীর মৃদু চরণ-ক্ষেপ যুদ্ধের ঘোড়ার মত হইয়া ওঠে,রণভেরীর শব্দে সৈনিকের প্রাণ যেমন নাচে, এ-সময়ে তেমনি নাচে সবার প্রাণ! বীর-সাধক যারা, তাদের পক্ষে একটু এটা-ওটা অত্যাবশ্যকীয়।

"এই ভব মরুভূমে সুরা জলাশয়, ঝড়ে সুরা পাকাবাড়ী;
আর মজারূপ বারাণসীতে যাইতে সুরাই রেলের গাড়ী।"

কণ্ঠহার

(গল্প)

[শ্রীগিরিবালা দেবী, সরস্বতী, রত্নপ্রভা]

অশুভক্ষণে নিতাই দাসের স্ত্রী পসারী জমিদার রমণীকান্তের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল। কৃষক বধূর নিখুঁত, নিটোল দেহের গঠন, অপূর্ব্ব উদ্দাম যৌবনশ্রী, সরস সুমিষ্ট হাসিভরা অধরোষ্ঠ ও আয়ত উজ্জ্বল আঁখিদুটি যুবক রমণীকান্তের মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ে একটা মহা বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল।

প্রথমে কেশ বেশের শোভন সংস্করণ করিয়া, মধুরকণ্ঠে নিধুবাবুর টপ্পা গাহিয়া, পসারীর গমনাগমন পথের ধারে পায়চারী করিয়া, রমণীকান্ত এই রমণীটির মনোহরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিহীনা, জ্ঞানহীনা কৃষক বালা সেই সুললিত প্রেমভিক্ষা-পূর্ণ বিলাপ-সঙ্গীতের মর্ম্ম জানিল না, ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বুঝিল না; জমিদারের কান্তরূপে মুগ্ধ হইল না। চাষার মেয়ের মূর্খতায় ক্ষুব্ধ হইয়া রমণীকান্তকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল।

জমিদারের পাপকার্য্যের সাহায্যকারিণী, গ্রামের সতী সাধ্বীদের জীবন্ত বিভীষিকা—নৃত্য গোয়ালিনী বাবুর বিলাস কক্ষে সমাদৃতা হইয়া, বড় গলাতেই আশ্বাস দিল—পসারী ত পসারী, হুজুরের হুকুম পাইলে হাজারটা পসারীকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট আছে। সবকাজের মূলাধার অর্থ, যাহাদের দুইবেলা ক্ষুধার অন্ন জোটে না, পরিধানের বস্ত্র জোটে না, তাহাদের আয়ত্ত করিতে আবার ভাবনা! নৃত্যর পাল্লায় পড়িলে তিনদিনেই বাছাধনকে সোজাপথে চলিতে হইবে।

কিন্তু তিনদিন ত দূরের কথা, একপক্ষ কাল বিপুল চেষ্টার দ্বারায় নৃত্য পসারীকে সে সোজা পথ ধরাইতে পারিল না। অধিকন্তু—পসারীর নিকট হইতে অপমানিতা ও বিতাড়িতা হইয়া—হতাশ-হৃদয় নৃত্যকে গৃহে ফিরিতে হইল। তাহার এতকালের অভিজ্ঞতা, বাকচাতুরী, কলা-কৌশল পসারীর তীক্ষ্ণধার বাক্যাবলীর আঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তরুণীর কোমল প্রকৃতির মধ্যে এমন রুদ্রমূর্ত্তির আশ্চর্য্য সমাবেশ নৃত্য আর কোনদিন নিরীক্ষণ করে নাই। পসারীর কঠোর তিরস্কারে সে যেমন অভিভূত হইল, ততোধিক রাগে জ্বলিতে লাগিল। দীনা, দরিদ্রার এত তেজ! এত গর্ব্ব! সতীত্বের এত বড়াই! যাঁহার পদরেণু স্পর্শে নারীজন্ম ধন্য হইয়া যায়, সফল হইয়া যায়, তাঁহারই হৃদয়ভরা প্রণয় নিবেদনে এত বিতৃষ্ণা, এত কটুক্তি, এমন ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান! ইহা কি রক্ত-মাংসের শরীরে সহ্য হয় গা? নারী হইয়া নারীর মুখের এমন অপমান নির্ব্বিবাদে হজম করা সম্ভবপর নহে। দর্পিতার এতদর্প ভাঙ্গিয়া দেখাইতে হইবে—নৃত্যর প্রতিহিংসা কত প্রবল, কত প্রখর।

নৃত্যর মুখে সত্য মিথ্যা সমস্ত শুনিয়া রমণীকান্ত তখনকার মত নিবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু পসারীর আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। যাহা আয়ত্তের অতীত, মানব হৃদয় স্বভাবতঃ তাহারই প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশী। নিত্য নূতন আমোদ প্রমোদ আনন্দ উল্লাসের মধ্যে রমণীকান্তের লালসা-বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণ মুগ্ধ-পতঙ্গের মত নিতাইর কুটীরের জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ-শিখাটির আশে পাশে অহরহ ছুটিয়া যাইত। সে উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলো দীনের দীন কুটীরের সমস্ত আঁধার বিদূরিত করিয়া মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল—বিলাসীর গীত বাদ্য বিক্ষুব্ধ, প্রমোদ-মদিরোচ্ছ্বসিত বিলাস ভবনে তাহার অভাব জনিত বেদনা একটু বেশী মাত্রাতেই রমণীকান্ত অনুভব করিতে লাগিলেন।

অভাব অনুভব করিলেও রমণীকান্ত বল-প্রয়োগের চেয়ে কৌশলেরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অতুলনীয়

রূপ, প্রভূত ক্ষমতা, সঙ্গীতের মোহিনী-শক্তি, ঐশ্বর্য্যের গরিমা এই বিবিধ গুণাবলীর পরিচয় দিয়া তিনি রমণী-হৃদয় জয় করিতে ভাল বাসিতেন। একবার জয়ের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার জয় করিবার প্রবল পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছিল। কয়েকদিন ভাবিয়া চিন্তিয়া নূতন উদ্যমে, নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া রমণীকান্ত সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন সুযোগ মিলিয়া গেল।

সেদিন শ্রাবণের অপরাহ্ণ। তাপদগ্ধ ধরণী-বুকে বর্ষার শ্যামশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৃক্ষ বল্লরী বর্ষা ধারায় স্নাত হইয়া নবীন কান্তিতে ঝলমল করিতেছিল। সমস্ত দিন বর্ষণের পর ক্ষান্ত-বর্ষণ আকাশে বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রধনুর পার্শে সূর্য্য অস্ত যাইতেছিলেন। বিদায়োন্মুখ তপনের কনক কিরণে কানন কুঞ্জ, নদী নালা স্বর্ণ আভায় ঝিকিমিকি করিতেছিল।

গৃহকাজ সারিয়া পসারী বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে ঘন বেষ্টিত ডোবার ধারে জাম গাছটির তলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাম খুঁজিতেছিল। সমস্ত আষাঢ় মাসটা ভরিয়া সুপ্রচুর ফল দান করিয়া বৃক্ষ ফলশূন্য হইলেও দৈবাৎ দুই একটি জাম বৃক্ষতলে পতিত হইত। সুস্বাদু কালোজামের আশাতেই লুব্ধ হইয়া পসারী আজও জাম কুড়াইতে আসিয়াছিল। হঠাৎ আনমনা পসারীর পশ্চাৎ হইতে ডাক আসিল—"পসারী"!

পসারী চমকিত হইয়া ঘাড় ফিরাইতেই দেখিল, রমণীকান্ত তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন! কিসের উত্তাপে তাঁহার চক্ষু যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। অধরে ক্রূর কুটিল হাস্য।

ভীতত্রস্ত পসারী ক্ষিপ্রহস্তে শিথিল অঞ্চল খানি মাথার উপর টানিয়া দিয়া সলজ্জ সুন্দর মুখখানি অবনত করিল।

রমণীকান্ত তৃষাতুর দৃষ্টিটা পসারির মুখের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া, পাঞ্জাবীর পকেট হইতে একছড়া হার বাহির করিলেন। পসারীর দিকে আরও একটু সরিয়া, হারছড়া দক্ষিণ হস্তের আঙুলে দোলাইতে দোলাইতে প্রীতি প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন পসারী? [illegible]টি কথা বল। এখানে কথা বল্লে কারুর বাপের সাধ্যি [illegible] যে দেখতে পাবে, শুনতে পাবে। যেদিন নেত্য তোমার কাছে এসেছিল, নেত্যকে তুমি বকে ঝকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।—তা তাড়িয়ে মন্দ কর নি, তাড়িয়ে দিয়েছিলে বলেই আজ আমাকে তোমার কাছে আস্‌তে হ'ল। আমি তোমার জন্যে এই হারগাছটি এনেছি, আমার বড় সাধ এটা আমি নিজের হাতে তোমার গলায় পরিয়ে দেই। এমন সুন্দর দেহখানি, একি বিনা গয়নায় মানায়!—না চাষার ঘরে মানায়!" বলিতে বলিতে রমণীকান্ত পসারীর দিকে হাত খানা প্রসারিত করিয়া দিলেন।

সচকিতা পসারী কয়েকপদ পশ্চাতে হটিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল। কেহ কোথাও নাই। পথ ঘাট জনশূন্য। কৃষকেরা ক্ষেতের কাজ সারিয়া গৃহে ফেরে নাই। যাহাদের ক্ষেতে কাজ নাই, তাহারা চটকলে কাজ করিতে গিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিবে না। নিতাইও চটকলের কুলী; তাহার ব্যবস্থাও সাধারণের মত। আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় বহুক্ষণ পূর্ব্বেই কৃষক রমণীগণ ঘাটের কাজ শেষ করিয়া গিয়াছে। কাহারও এদিকে আসিবার আশা নাই। সম্মুখে বর্ষাস্ফীত ডোবার জল থই থই করিতেছে; বামে নিবিড় জঙ্গল, শৃগালাদির আবাস ভূমি। দক্ষিণে বেতের ঝোপ, কণ্টকে কণ্টকে কণ্টকময়। পশ্চাতে সঙ্কীর্ণ বনপথটি আগুলিয়া রমণীকান্ত বিরাজিত;—এ অবস্থায় পসারী কি করিবে? কেমন করিয়া আপনাকে রক্ষা করিবে? আতঙ্কে পসারীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য।

আত্মীয় বান্ধব শূন্য নিতাই গৃহের একমাত্র অধিশ্বরী হইয়া, শাশুড়ী ননদিনীর শাসন তাড়ন হইতে অব্যাহতি পাইয়া অবধি স্বাধীনতার মধ্যে পসারীর শরীর ও মন দুইই সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। শরীর যেমন সবল, চিত্তও তেমনি দৃঢ়, মন তেজস্বীতায়, নির্ভীকতায় পরিপূর্ণ। ভয় সহজে তাহার নিকটে ঘেঁসিতে পারিত না। যে অবস্থায় সাধারণ মেয়ে ভয়-ভাবনায় দিশাহারা হইয়া যায়, সেই অবস্থার মাঝ খান দিয়া দিব্য সকৌতুকে সহাস্যে পসারী অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইতে পারে। কোথাও তাহাকে বাধে না। আজ রমণীকান্তের কাছেও তাহার বাধিল না।

পসারী নত মুখখানি তুলিয়া দুইচক্ষে অগ্নি বিকীর্ণ করিয়া

কঠোর তিক্তকণ্ঠে কহিল—"চাষার মেয়ের খালি গায়ে, খালি গলায় চাষার ঘরেই মানায় বাবু। চাষার মেয়ের ইজ্জতই মাথার মণি, সোয়ামীই গলার হার। আমি আপনার হার নিতে পারবো না। আপনি এমন কথা আর কখনো আমায় বল্‌বেন না। আমরা চাষা হলেও অধর্ম্মের কাজ করি না, বাবু আপনি জমিদার, মনিব, আপনি আমার বাপের মত এখন আমায় পথ ছেড়ে দিন, আমি ঘরে যাই।"

এই সুস্পষ্ট, সুধাময় সঙ্গীতের মত কোমল কঠোর তিরস্কারে রমণীকান্ত রাগের পরিবর্ত্তে বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মুগ্ধ দৃষ্টি আর ফিরিতে পারিল না। নির্জ্জন কানন বিহারিণী উদ্যান লতার অলৌকিক রূপের পরিমলে অন্ধ অলি আকুল হইয়া উঠিল। রমণীকান্ত অনুনয়ের সুরে "একটু দাঁড়াও পসারী, একটু ভেবে দেখ, গাঁয়ে এতলোক থাক্‌তে আমি কেন তোমার কাছে এসেছি, এটাও কি তুমি বুঝ্‌তে পার না? বোকার মত বলছ জমিদার বাপের তুল্য, কিন্তু সে আমার মত জমিদার নয়। তার বয়েস আমার বাবার মত হওয়া উচিত। তোমার কোন কথাই আমি শুন্‌তে চাই না, পসারী, এ হারছড়া তোমায় নিতেই হবে। আমি তোমার কথাই মনে করে এটি আনিয়েছি। জমিদারের জিনিসে প্রজার অধিকার আছে, অন্য সম্বন্ধ যদি স্বীকার নাই করতে চাও—তবু সেই কথাটা মনে করে এটা তোমাকে আমার সাম্‌নে গলায় পরতেই হবে।"

"ও অধর্ম্মের হার, পাপের হার আমি মরে গেলেও ছোঁব না বাবু, আপনার আর অনেক প্রজা আছে, তাদের দেবেন। ছোটলোকের ধর্ম্মই গলার হার, আশীর্ব্বাদ করবেন—তাই নিয়ে যেন মরতে পারি।" বলিয়া চঞ্চল বাতাসে চালিত একখণ্ড লঘু মেঘের মত রমণীকান্তের পাশ কাটাইয়া মৃদু পদক্ষেপে পসারী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিতাই গৃহে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হ্যারে পসার, আজ তোর মুখটা এত ভারী ভারী দেখ্‌চি কেন রে? চোকের কোনটা যেন ফোলা ফোলা দেখা যাচ্ছে! তোর কি অসুখ করেচে, না পাড়ার কারুর সাথে ঝগড়া করেছিস?"

পসারী ম্লান হাসির সহিত জবাব দিল "আমি বুঝি রোজ রোজ পাড়ার নোকের সাথে ঝগড়া করি, আর তুমি থামাতে এস! কথা শুনেই রাগ হয়। এখন ওসব কথা রেখে খাবে চল, খাওয়ার পর আজকের ঝগড়ার কথা শুন্‌তেই পাবে, এ ঝগড়া পাড়ার ঝগড়ার চেয়ে অনেক বড়।"

"তবে তাই আগে বল, খাওয়া না হয় পরেই হবে। আজ পথ থেকে যখন তোর যাঁতার ডাল ভাঙ্গার শব্দ পাই নি, সোনা রায়ের গান শুনিনি, তখুনি বুঝেচি তুই যেন কি কাণ্ড করে বসে আছিস! মণ্ডলদের গোরু বুঝি আজও ছুটে এসে তোর নাউগাছ খেয়ে গেছে তাই অনর্থ করেছিস?"

স্বামীর হাত হইতে হুকাটা লইয়া বেড়ার গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়া, রান্নার চালার দিকে যাইতে যাইতে পসারী ভারী গলায় কহিল "তোমার খাওয়ার আগে আমি একটি কথাও বলচি না গো, তোমার মুখটা বড্ড শুকিয়ে গেচে, সেই কোন্ সকাল সাত তাড়াতাড়ি ক'গাস ভাত মুখে দিয়ে দিনভর খাটুনী, এখন কি অন্য কথা কইবার সময়? তুমি আর দেরী করো না, উঠে এস, আমি ভাত বাড়ি গে।"

স্ত্রীর ত্বরায় তখনকার মত আজিকার বিবাদের বিষয় শুনিবার দুর্নিবার ইচ্ছাকে দমন করিয়া নিতাইকে আহারের নিমিত্ত উঠিতে হইল।

আহারান্তে নিতাই যাহা শুনিল, তাহা তাহার কল্পনাতীত; স্বপ্নাতীত; ভদ্রনামধারী শিক্ষিত লোকের শিক্ষার পরিচয়ে অশিক্ষিত ইতর চাষা—ঘৃণায়, ধিক্কারে জর্জ্জরিত হইল। তাহার শান্তমূর্ত্তি অকস্মাৎ ভীষণ হইয়া উঠিল। চক্ষু দুটি জ্বলিতে লাগিল; সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"মনিব হয়েচে বলে এত বাড়! ঘরের বৌয়ের অপমান! লাঠির চোটে দেখিয়ে দিতে পারি কত ধানে কত চাল। একবার না হয় জেল দেখে আসব কিন্তু যে মুখে তোকে এত কথা বলেচে সেই মুখখানা আমি ভেঙ্গে ছাতু ছাতু ক'রে দেব।"

এ নিষ্ফল আক্রোশের কোনই মূল্য নাই বুঝিয়া পসারী মিষ্টবাক্যে স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, আপনার মমতা ভরা হাতখানি স্বামীর গায়ে মাথায় বুলাইয়া তাহার চিত্তের ক্ষোভ মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিল।

অনেকক্ষণ পর নিতাই শান্ত হইয়া কহিল "তুই সত্যি

বলেচিস পসার, এখানে আমার গায়ের জোর খাটবে না। জমিদার, বড় মানুষ ; সে দিনে দুপুরে তোর হাত ধরে নিয়ে গেলেও গাঁয়ের লোক কথা কইবে না, বাধা দেবে না। কারণ আমি গরীব চাষা, বড় মানুষের পায়ের তলার পিঁপড়ে। তার চেয়ে চল, আমরা আর কোনখানে চলে যাই।"

পসারী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সবিষাদে উত্তর করিল—"আপনার বাপ ঠাকুর্দ্দার ভিটে ফেলে, আপনার [illegible] ফেলে কোথায় যাবে ? আমাদের এখানেই থাকতে হবে। যাবার যায়গা ত কোথাও রেখে আসি নি। এখানে আর যা হোক্ তবু আপনার ঘর, আপনার ঠাঁই, এত সহজে এক কথায় কি এখানকার মায়া কাটাতে পারবে ?"

নিতাই মনে মনে ভাবিয়া দেখিল এ স্থানের মায়া কাটান তাহার পক্ষেও সম্ভব নহে। এই ঘর, এই বাড়ী, এই ফল-ফুলের বৃক্ষ, বর্ষাসিক্ত প্রাঙ্গণ, পতনোন্মুখ গোয়াল, ইহার কিছুই ত তাহার অনাদর অবহেলার দ্রব্য নহে। পিতার স্মৃতি, মাতার স্নেহ, বাল্যের হাসি, অশ্রু, সুখ, দুঃখ ইহার প্রত্যেকটি জিনিষের সহিত যে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। আপনার বক্ষের হাড় একখানা খুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও ইহার এতটুকু পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।

নিতাই ম্লান মুখে কহিল "চৌদ্দ পুরুষের ভিটের মায়া কাটিয়ে যাওয়া সোজা নয় পসার, সাধ করে কেউ এমন কাজ করে না। কিন্তু ভিটের মায়া করতে যেয়ে শেষকালে তোকে না হারাই, সেই যে আমার মস্ত ভাবনা। তোকে আমি পেটভরে দু'বেলা ভাত দিতে পারি নে, একচুল সোণা রূপো দেবার মুরদ নেই আমার ; ভাল একখানা কাপড়ের মুখ বারোজন্মে দেখ্‌তে পাস না, এমনভাবে রোজ রোজ তোর চোখের সাম্‌নে সোনা-মণির যদি এত ছড়াছড়ি হয় তা হলে কি তুই মাথা ঠিক রাখতে পারবি ? আজ যা ঘেন্না করছিস, একদিন হয় ত—তা আর ঘেন্না করতে পারবি না।"

"ঘেন্নার জিনিষ চিরকালই মানুষের ঘেন্নারই থাকে। ছাই সোণা, ছাই রূপো, তাও লোভে···ছিঃ ছিঃ তুমি আমায় এম্‌নি ভাব ! আট বছরের মেয়ে বিয়ে হয়ে এসেছিলাম, সে আজ বারো বছরের কথা, এতকাল ভরে দেখে দেখে যার মনে এত ভয়, যে মানুষের মন জানে না,—তার মুখে আগুন।" বলিয়া দারুণ অভিমান ভরে পসারী নিতাইয়ের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল।

সতী সাধ্বী স্বামীগত প্রাণা পত্নীকে মনের প্রচ্ছন্ন সন্দেহের একটু আভাস জানাইয়া নিতাই লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া কহিল "রাগ করিস কেন পসার, আমি তোর রাগের কোন কথাই তো বলিনি, তোর মন কি আমার অজানা আছেরে,—তা নয়, তবে কি না—তুই মেয়ে মানুষ, গায়ের জোরে তো ব্যাটাছেলের সাথে পারবার যো নেই, যদি—"

পসারী স্বামীর কথায় বাধা দিয়া সতেজে কহিল,—"তোমার যদি এত ভয় থাকে বাবু, তুমি গিয়ে ইঁদুরের গর্ত্তে লুকোও গে, পসারী কাউকেও ভয় করে না, কারুর, গায়ের জোরকেও ভয় করে না ! ভগবান তাকে যা দিয়েছেন সে তা রক্ষা করতে জানে। সাপকে না মারলে কেউ তার মাথার মণি নিতে পারে না। আমাকে কেউ না মেরে ফেল্লে আমার মাথার মণি নিতে পারবে না। নেওয়া বল্লেই নেওয়া, একদিন এসেই বাছাধন কেমন মিষ্টিমুখ শুনে গেছেন, আর,—আর আসতে হবে না।"

—"তা হলে ত বেঁচে যাই, ভাবনা থাকে না।" বলিয়া নিতাই বহু সাধ্য সাধনায় স্ত্রীর অভিমান ভাঙ্গাইল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে পসারীর নির্ম্মল হৃদয়াকাশে যে মেঘোদয় হইয়াছিল, অল্প গর্জ্জন ও বর্ষণের পর সে মেঘরাশি অন্তর্হিত হইয়া একটা সুস্নিগ্ধ শান্তি আসিয়া তাহার সমস্ত হৃদয়খানি জুড়াইয়া দিল।

পূর্ব্বের মতনই বাঁধা নিয়মে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। পসারীর অনুমান মিথ্যা হইল না। তাহার মিষ্ট মুখের গুণেই হোক অথবা অন্য কারণেই হোক রমণীকান্ত এ পাড়ায় আসা একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। দেখিয়া শুনিয়া পসারী আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার বুকের উপর হইতে একখানি গুরুভার পাথর যেন নামিয়া গেল। পূর্ব্বের মতনই অভাব অনাটনে, হাসি কান্নায় তাহাদের একটানা জীবন যাত্রা ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইতেছিল।

একদিন নিতাই বলিল—"দেখ্ পসার, আমি একটা কাজ করব ঠিক করেচি। আমাদের কলে রাত দশটা অবধি খাট্‌লে অতিরিক্ত মাইনে পাওয়া যায়, কিছুদিন খেটে, আর কিছু ধার ধোর করে একখানা ধানের জমি যদি করতে পারি, তা হলেই আমার দুঃখু দূর হয়। পরাণ মণ্ডল মহাজনের দেনা শোধের জন্যে একখানা জমি বেচবে, আমি নিলে আমায় একটু সস্তায় দিতে পারে বল্লে। যদি জমিখানা নিতে পারি তার একটা চেষ্টা দেখতে হয়।"

পসারী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মমতাভরা কণ্ঠে কহিল "না, ধানের জমিতে কাজ নেই, এত খাটুনীর পর তোমায় আমি রাতে খাটতে আর দেব না। যা আনচ তাতেই আমাদের বেশ চলে যায়, বেশী দিয়ে কি হবে গো। যার জমি নেই তার কি দিন চলে না?"

"চলবে না কেন, খুব চলে পসার, আমাদেরও চলে যাচ্চে। তবু এ আর ভাল লাগে না। চাষার ছেলে চাষ আবাদ করে খাব; নিজের ইচ্ছা মতন কাজ, যখন ইচ্ছা এলেম যখন ইচ্ছা গেলেম—তা নয় চট কলের কুলী। আজ নয় দুটো পেট এক রকম করে চলে যাচ্চে, চিরকাল ত এভাবে যাবে না। ছেলে মেয়ের জন্যে, নিজেদের অসময়ের জন্যেও কিছু করে রাখা দরকার।"

নিতাইয়ের মুখে আপনার ভবিষ্যৎ মাতৃত্বের ইঙ্গিতে লজ্জায় আনন্দে পসারীর মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল; সে মানসনেত্রে দেখিল তার ক্ষুদ্র অঙ্গনে নধরকান্তি নব গোপালের মত একটি শিশু ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করিতেছে। কি সুন্দর শিশুর মুখখানি, কেমন মধু মাখান কণ্ঠস্বরটি! শিশুটি বাপের বড় আদরের ধন। কর্ম্মশ্রান্ত পিতা মাঠ হইতে ফিরিয়া কত আদরে কত সোহাগে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার মুখখানি তৃপ্তির হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে। শিশুর জননী কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া অনুযোগ দিতেছে—"তোমার কি চান্ নেই, খাওয়া নেই, রাতদিন কেবল ছেলেরি আদর, আমি যেন কেউ নয়?" শিশুর পিতা সহাস্যে কহিতেছেন "তুই আমার সব পসার, তোর থেকেই যে আমি খোকাকে পেয়েচি তাই খোকার এত আদর।"

সুখস্বপ্ন বিভোরা পসারী আর আপত্তি করিতে পারিল না। নিতাইয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইল!

পরদিন হইতে নিতাই অতিরিক্ত কাজে নিযুক্ত হইল। সকাল বেলা আহারান্তে চারিটী মুড়ি মুড়কি গামছার প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া নিতাই চটকলে রওনা হইত; আর রাত্রি বারটায় গৃহে ফিরিয়া আসিত। যে অর্থের নিমিত্ত স্বামীর এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, সেই অর্থাগমের জন্য পসারীও নিতাইয়ের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় প্রদীপের নিকটে বসিয়া পাড়ার মেয়েদের ফরমাজি কাঁথা সেলাই করিত, গম পিষিয়া ময়দা করিয়া দিত। কাহারো কাহারো বা শুপারী কুচাইয়া রাখিত; খুসী মনে কাছে ডাকিয়া যে যাহা পারিশ্রমিক দিত সন্তুষ্টচিত্তে সে তাহাই লইত। তাহার ভবিষ্যৎ ছেলে-মেয়েদের জন্য তাহার স্বামী এত খাটিতেছেন, সেকি ইহাতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারে? স্বামীর সুখ দুঃখের আরাম বিরামের অংশ যদি নাই লইতে পারে তবে আবার সে স্ত্রী কিসের?

সেদিন মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে পসারী প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিল। কিন্তু আরব্ধ কার্য্যে আজ তাহার মনোসংযোগ হইতেছিল না। কারণ কয়েক দিন হইল পসারীর শরীরটা ভাল ছিল না। পাটের আমের সহিত সমস্ত পল্লী ম্যালেরিয়ার বিষে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। ঘরে ঘরে জ্বর; ঘরে ঘরে রোগীর কাতর আর্ত্তনাদ। পসারীর দেহেও রোগ উপেক্ষনীয় ছিল না, সে সবল সুস্থ বলিয়া তখনও সম্পূর্ণরূপে রোগের নিকটে পরাজিত হয় নাই।

একটি লতার গায়ে সবুজ সুতার কয়েকটা পাতা সেলাই করিয়া পসারী কাঁথাখানা দড়ির আল্‌নার উপর রাখিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই যেন অসহ্য হইয়া আসিতেছিল। সর্ব্ব শরীর জ্বালা করিতেছিল। একখানি ছেঁড়া চাদরে গা মাথা ঢাকিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া পসারী পড়িয়া রহিল। কেমন একটা স্বপ্নে কেমন যেন যন্ত্রণাময় তন্দ্রায় তাহার চক্ষুপল্লব মুদিয়া আসিল।

নিতাইয়ের দ্বার ঠেলার শব্দে পসারীর সুপ্তির ঘোর যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টির তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। মেঘ গর্জ্জনের সহিত ঝড়ের সন্ সন্ শব্দ মিশিয়া

—পৃথিবীর বুকে যেন প্রলয়ের বিষাণ বাজিতেছে। গৃহের প্রদীপটি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। বিশ্বের অন্ধকার যেন ঘরখানাকে তাহার লীলাভূমি করিয়া তুলিয়াছে।

পসারী ত্রস্তে বিছানা হইতে উঠিয়া, বাঁ হাতে কপালটা টিপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কহিল "আহা, আজকের জল ঝড়ে পথে তোমার বড্ড কষ্ট হয়েচে। তুমি শীগগির ভিজে কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেল, আমি আলো জেলে একটু আগুন করে দিচ্ছি, হাত পা খানা সেঁকে নিলে একটু আরাম হবে।"

নিতাই নিরুত্তরে গৃহে প্রবেশ করিয়া দুইখানি প্রসারিত বাহুর মধ্যে পসারীকে আকর্ষণ করিল। বিস্মিত অভিভূত পসারী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল "এখন এ আবার কি রঙ্গ! আগুনের বদলে আমার গায়েই আজ হাত, পা তাতাবে নাকি? তা— আমার গা আজ খুব গরম হয়েচে, তোমার আগুনের কাজ করবে।" বলিয়া প্রেমবিহ্বলা মুগ্ধা তরুণী স্বামীর বক্ষে মস্তক স্থাপন করিতে গিয়া অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেতস পত্রের মত ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। একে! এই অন্ধকার দুর্য্যোগ রজনীর মধ্যে একে? কাহাকে সে রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে? স্বামীর সুশীতল সর্ব্বযাতনা-হরণ-বক্ষ ভাবিয়া সে আশাপূর্ণ হৃদয়ে কাহার বক্ষে মাথা রাখিতে গিয়াছে? এ তো নিতাইয়ের সেই স্নেহভরা প্রেমভরা প্রশস্ত বক্ষ নহে, সেই সুন্দর সুগঠিত বলিষ্ঠ বাহুর স্পর্শ নহে! বিবশা পসারী আর ভাবিতে পারিল না। মুক্ত দ্বারের দিকে সরিয়া গিয়া আকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "আঁধারে ভুল করে তুমি কে এসেছ গা? এটা তোমার ঘর নয়, তুমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে বোস, আমি আলো জাল্‌চি। আলো নিয়ে নিজের ঘর দেখে যেয়ো।"

"ভুল করে আসিনি পসারী, ভুল করবার লোক আমি নই। সেদিন আদর করে হার পরাতে এসেছিলাম, তা ভাল লেগে ছিল না। আর আজ জোর করে ফাঁসি পরাতে এসেছি, কে তোমায় এখন রক্ষা করিবে? চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও এ দুর্য্যোগে কারুর সাড়া পাবে না। এ রাতে, জল ঝড়ের ভিতর অতদূর থেকে তোমার স্বামীও আস্‌তে পারবে না. এখন তুমি কি কর্‌বে সুন্দরী? কার সঙ্গে চালাকী? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, মনে করতেই হাসি পায়।" বলিয়া সেই আগন্তুক পিশাচ-মূর্ত্তি সুরার তীব্র গন্ধে বাতাস আমোদিত করিয়া পৈশাচিক অট্টহাস্যে নীরব নিস্তব্ধ কুটিরখানি মুখরিত করিয়া তুলিল।

"আমার সোয়ামী আজ আস্‌তে পারবে না, ভেবে আপনি চোর হয়ে—না ডাকাত হয়ে এসেছেন বাবু, ছিঃ ছিঃ আপনারা আবার ভদ্দর, আপনারা আবার মানুষ! ঘরে কি আপনাদের মা, বোন নেই? বৌ নেই? মেয়ে নেই? থাক্‌লে কি মানুষ এমন পশু হতে পারে? জিজ্ঞাসা করচেন এখন আমায় কে রক্ষা করবে—চাষাদের মান ইজ্জত ভগবানই রক্ষা করেন, তেমন তেমন দরকার হলে নিজেরাও রক্ষা করিতে পারি।" দারুণ ঘৃণার ভরে কথা কয়টা বলিয়া ক্ষিপ্রপদে পসারী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্রোধ কম্পিতকণ্ঠে মত্ত রমণীকান্ত চীৎকার করিয়া উঠিলেন "মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌ হারামজাদি, আমি তোর কাছে নীতি কথা শুন্‌তে আসিনি, ঢের সহ্য করেচি, আর করবো না, এখন দেখি তোর কোন ভগবান-বাবা এসে আমার হাত থেকে তোকে বাঁচাতে পারে; আর তুইই বা কেমন করে তোর সতীপণা করতে পারিস!" বলিতে বলিতে শোণিত পিপাসু বাঘের মত রমণীকান্ত ছুটিয়া আসিয়া বজ্রমুষ্টিতে পসারীর হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিলেন।

এ অভাবিত অপ্রত্যাশিত স্পর্শে পসারী মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। শরীরের অভ্যন্তরে, কর্ণকুহরের মধ্যে মৃত্যু-রজনীর ঝিল্লি ধ্বনির মত একটা শব্দ হইতে লাগিল। পসারী একবার নীল নীরদমালা বিভূষিত দূর আকাশের পানে চাহিয়া মনে মনে বলিল "হায়, আজ তুমি আমার একি করিলে! আমায় এমন বিপদে ফেলিলে কেন দয়াময়? আমায় রক্ষা কর, যদি রক্ষা না করিতে পার, তবে আমায় মরিবার উপায় বলিয়া দাও।" প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার লুপ্ত সাহস আবার ফিরিয়া আসিল। হৃদয়ের স্বাভাবিক বল ফিরিয়া পাইয়া ব্যাধ ভয়ে ভীতা হরিণীর মত প্রাণপণ বলে রমণীকান্তের হস্তের মধ্য হইতে হাত দুইখানি মুক্ত করিয়া পসারী ছুটিয়া চলিল।

কোন আত্মীয় বন্ধুর কথা তাহার স্মরণ হইল না। প্রতিবেশী গৃহে আশ্রয় লইবার কথাও মনে পড়িল না। কেবল মনে পড়িল নিতাইয়ের মুখখানি, নিতাইয়ের সর্ব্বসন্তাপহরা প্রশস্ত প্রশান্ত বক্ষখানি, সেই বুকে আশ্রয় পাইবার নিমিত্ত, সেই বাহুর বন্ধনে বন্দী হইবার আশায় পসারী পাগলের মত পথের পানে ছুটিল। এই পথে তাহার স্বামী ফিরিবে, এখানেই তাহার দেখা মিলিবে— আশার এ ক্ষীণ আহ্বানে পসারী আর সব কথা ভুলিয়া গেল।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল, ঝড়ের বেগও মন্দীভূত হইয়াছিল, কিন্তু মেঘের গর্জ্জনের হ্রাস হয় নাই। কিসের আক্রোশে ফুলিয়া ফুলিয়া গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া হাঁকিয়া বিশ্ব কম্পিত করিয়া তুলিতেছিল। রহিয়া রহিয়া আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বিজলী কখন জ্বলিতেছিল, কখন নিভিতেছিল। আজ জগৎ যেন কিসের মদিরা পানে মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। আকাশ মাতাল, বাতাস মাতাল, মহা মদিরা পানে শ্রাবণের নদীটিও আজ উন্মাদিনী, তীরের তরুরাজীও মত্ততার আবেগে আন্দোলিত! এই মত্ত জগতের মাঝখানে স্বামীপ্রেমে বিভোরা সতী স্বামীর উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়া পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে—বাহ্যজ্ঞান রহিত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য মাতাল রমণীকান্ত।

কিন্তু এভাবে পসারীর পথ বাহিয়া অধিকদূর অগ্রসর হওয়া ঘটিয়া উঠিল না। হঠাৎ বিদ্যুতালোকে পথের বিপরীত দিক হইতে একটি মানুষকে তাহারই দিকে আসিতে দেখিয়া দিশাহারা তরুণীকে থামিতে হইল। যে আসিতেছিল সে যে সাধারণ পথিক—অথবা তাহারই স্বামী হইতে পারে একথাটুকু পসারীর স্মরণ হইল না। তাহার ভ্রম হইল, এবুঝি রমণী কান্তেরই উপযুক্ত অনুচর, তাহাকে ধরিবার জন্য তাহারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। একপার্শ্বে প্রভু, একপার্শ্বে ভৃত্য, এই দুই জনার মাঝখান্ হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? দুইজনা যদি একত্রে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার বল ত পসারীর নাই। নিরুপায় শক্তিহীনা শেষকালে কি তাহার নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন সতীত্বের পবিত্র 'কণ্ঠহার'টি দস্যুহস্তে অপহরণ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে? হউক সে চাষার মেয়ে, হউক সে অশিক্ষিতা, তবু নারীর প্রাণের চেয়ে যে মানের মূল্য বেশী—মান বাঁচাইতে গেলে প্রাণের মায়া করিলে ত চলিবে না। দুই পাশে শত্রু পথ রোধ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু নিম্নেই যে একমাত্র জুড়াইবার স্থান বিদ্যমান। দুইকূল প্লাবিত করিয়া, কুলুকুলু স্বরে নদী যেন তাহাকে ডাকিয়াই কহিতেছে "আয় ওরে নিরুপায়, আয়, ওরে অসহায়, আমার সুশীতল বুকে আয়, আমি তোকে লুকাইয়া রাখিব।" নদীর এ সস্নেহ আহ্বান পসারী অবহেলা করিতে পারিল না। অবহেলা করিবার অবসর ও ছিল না। কারণ পলাতক শিকারের অন্বেষণে ক্ষিপ্ত পশুর মত রমণীকান্ত পসারীর দিকে সবেগে ধাবিত হইতেছিল।

ওদিকে স্ত্রীর কথা মনে করিয়াই নিতাইও উতলা হইয়া গৃহে আসিতেছিল, কিন্তু যে স্ত্রীর জন্য তাহার এত উৎকণ্ঠা উদ্বেগ সেই স্ত্রী তাহাকে রমণীকান্তের অনুচর ভ্রমে প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া স্রোতস্বিনী নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার আর্দ্র কণ্ঠ হইতে শেষ বাণী ধ্বনিয়া উঠিল, "মা গঙ্গা, তোর কোলেই আমায় লুকিয়ে রাখ্ মা।" পরক্ষণেই সমস্ত নদীতট সচকিত করিয়া নিতাই চীৎকার করিয়া বলিল "তোর ভয় নেই পসার, কিচ্ছু ভয় নেই, আমি এসেচি, আর তোর ভয় নেই।" বলার সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের দেহও নদীগর্ভে পতিত হইল।

কড়্ কড়্ শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বাতাস গুমরিতে লাগিল। বৃক্ষশাখা দুলাইয়া কোন গোপন বার্ত্তা যেন আশ্রিতা লতিকার কর্ণে নিবেদন করিল। তীর তরুর সন্ সন্ শব্দের সহিত স্বর মিলাইয়া, বর্ষায় পরিপূর্ণা তরঙ্গময়ী নদীটি দুই তট সজাগ করিয়া তান ধরিল কুলু কুলু কুল! কুলু কুলু কুল!

* * * *

পরদিন প্রভাতে ধীবরগণ নদীর বাঁকে মাছ ধরিতে গিয়া, একটি আশ্চর্য্য দৃশ্যে বিস্মিত হইয়া, জমিদার রমণীকান্তকে ঘটনাস্থলে লইয়া গেল। জমিদার দেখিলেন জলমগ্ন গভীর শরবনের মধ্যে দুইটি মনুষ্য শব ভাসমান। নিষ্ঠুর নির্ম্মম মৃত্যু তাহাদের অমূল্য প্রাণ দুইটি অপহরণ করিয়াছে বটে কিন্তু সুনিবিড় আলিঙ্গন পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই।

নূতন যুগ

(উপন্যাস)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

আষাঢ়ের মেঘভরা একটী সন্ধ্যা।

বৈকাল হইতে খুব বৃষ্টি হইয়া গেলেও আকাশ এখনও পরিষ্কার হয় নাই। থাকিয়া থাকিয়া ঝির ঝির করিয়া এক একবার বৃষ্টি নামিয়া আসিতেছে, আবার তখনই ধরিয়া যাইতেছে।

খোলা জানালাটার কাছে বসিয়া দীপিকা অর্গানে সুর দিয়া তাহার সহিত নিজের কণ্ঠস্বর মিলাইতেছিল—

"রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের পরে—
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে"

নিকটে বসিয়া তাহার ছাত্রী সন্ধ্যা; সে বেচারা অনেক চেষ্টা করিয়া ও শিক্ষয়িত্রীর কণ্ঠস্বরের সহিত নিজের কণ্ঠস্বর মিলাইতে পারিতেছিল না। যেখানে সুর সপ্তমে উঠিবে সেখানে সে একেবারে খাদে নামিয়া যাইতেছিল, নিজের অকৃত কার্য্যতায় লজ্জিতা সে—তখনই চুপ করিয়া যাইতেছিল, খানিক সময় সে আর সুর তুলিতে পারিতেছিল না।

দীপিকা গাহিতে গাহিতে আড়ে আড়ে ছাত্রীর মুখের পানে চাহিতেছিল আর হাসিতে তাহার মুখখানা ভরিয়া উঠিতেছিল; কয়েকবার সে গান থামাইবার চেষ্টা ও করিয়াছিল কিন্তু বুঝিতে পারিয়া সন্ধ্যা আগেই ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"না ভাই দিদিমণি, গান থামিয়ো না, আমি পরে শিখব, তুমি গেয়ে নাও আগে।"

সেই বাদলভরা সন্ধ্যায় গানটী মানাইয়া ছিল বেশ, মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া উপভোগ করিবার যোগ্য বটে। যে গাহিতেছিল—তাহার প্রাণে আজিকার এই বাদল ভাবটা ছায়া ফেলিয়াছিল—সে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া একাগ্রচিত্তে তাই গাহিয়াই চলিয়াছিল।

গান ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যা মুগ্ধভাবে তখনও তেমনি আড়ষ্টভাবে বসিয়াছিল। গান ফুরাইল কিন্তু তাহার অন্তরে ধ্বনিত হইতেছিল—

"'এসেছে রে এসেছে' এই কথা বলে প্রাণ,
'এসেছে রে এসেছে' উঠিতেছে এই তান,
আমার নয়নে এসেছে হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে;
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।"

দীপিকা অর্গান বন্ধ করিয়া বলিল—"গান ফুরাল তবু হাঁ করে কি শুনছ সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"গান ফুরায় না দীপিকা'দি, গান বার ছেড়ে বুকের মধ্যে গম গম করে, মাথার মধ্যে চম চম করে, অবশ্য গান যদি তেমনিই হয়, আর গায়ক বা গায়িকা যদি তোমারই মতন হয়। সত্যি কি সুন্দর গলা ভাই তোমার, এমন গান গাও কি করে আমি তাই ভাবি।"

দীপিকা হাসিয়া বলিল "যে যাকে ভালবাসে ভাই, তার সবই সুন্দর সে দেখতে পায়। তুমি আমায় ভালবাস বলে আমার সবই সুন্দর মনে কর। যাই হোক—সে নিয়ে এখন ভাববার দরকার দেখছি নে, তোমার যে কিছু হচ্ছে না আমি তাই ভাবছি। এই কয়টা মাস নিত্য আসা যাওয়া করছি—নিত্য তোমায় সুর ধরাচ্ছি, কোথায় যে হারিয়ে ফেলছ তা কিচ্ছু বুঝতে পারছি নে। আমার এত কষ্ট সব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, এদিকে মিথ্যে মাস গেলে যা টটা করে টাকা—"

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া সন্ধ্যা ব্যগ্রভাবে বলিল—"ওকথা বলো না ভাই দীপিকা'দি, তা'হলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মের মত আড়ি দেওয়া হবে তা আগে হতেই বলে রাখছি। আমি ঠিক বলছি আর এক বছর আমায় সময় দাও, আমি গান শিখব।"

গালে হাতখানা রাখিয়া বিস্ময়ের সুরে দীপিকা বলিল

"তবেই হয়েছে! সাত মাস চলে গেল, এখনও সা রে গা মা শিখতে পারলে না! এক বছর কেন ভাই, দশটা বছর তোমায় দিলেও যে তুমি পারবে তা আমার বোধ হয় না। আমি দেখছি আমার কাছে তোমার কিছু হবে না। আমি শিরীষ বাবুকে বলি—তিনি অন্য টীচার আনুন—যে বেত দিয়ে ছাত্রীকে শাসন করতে পারবে। এ কি আমার কাজ?"

সন্ধ্যা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দীপিকা জিজ্ঞাসা করিল "হাসলে যে বড়! হাসা কতদূর অন্যায় আমার সামনে—সেটা তোমার জ্ঞান করা উচিৎ!"

হাসিটাকে অনেক কষ্টে সামলাইয়া সন্ধ্যা বিনীতস্বরে বলিল "হ্যাঁ, তা জানি বই কি দীপিকা'দি; কিন্তু তুমি তাঁকে বললেই তিনি তোমায় ছাড়বেন কি না—তাই ভেবে আমার হাসি এলো। তিনিই তো আরও বলছেন—"

সে থামিয়া গেল দেখিয়া দীপিকা বলিল—"আমায় এমনি করে রাখবেন—কেমন?"

সন্ধ্যা বলিল "আচ্ছা, তুমি বলো তাঁকে, আমিও বলব, তা হলে যেটুকু আমি চেষ্টা করি সা রে গা মা সাধতে তাও করব না।"

গম্ভীর মুখে দীপিকা বলিল "বড় দুষ্টু মেয়ে হয়েছ তুমি, তোমায় শাস্তি দেওয়া নিশ্চয়ই দরকার। বেতটা হাতের কাছে নেই, তাই বেঁচে গেলে। আচ্ছা, এদিকে এসো, তোমায় শাস্তি দিই—তোমার কাণ এগিয়ে আনো।"

বিনা আপত্তিতে ছাত্রী কাণ বাড়াইয়া দিল—"কিন্তু দীপিকা'দি, আমার কাণটায় বড় ব্যথা হয়েছে, একটু আস্তে ধরো।"

শাস্তি দিতে গিয়া দীপিকা তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল; তাহার উজ্জ্বল সুন্দর ললাটে একটা চুম্বন করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু দুইটী সজল হইয়া উঠিল, তাহার অজ্ঞাতসারে কখন সে অশ্রু চোখ ছাপাইয়া সন্ধ্যার ললাটে পড়িয়া গেল।

চমকাইয়া উঠিয়া সন্ধ্যা মুখ তুলিল "দীপিকা'দি!"

সলজ্জে দীপিকা তাহাকে বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল।

উৎকণ্ঠিতা কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কাঁদছো দীপিকা'দি! তুমি কাঁদছো কেন?"

মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া দীপিকা শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কাঁদব কেন ভাই, চোখে যেন কি পড়েছিল, তাইতেই বোধ হয়—"

তাহার মুখ হইতে হাতখানি জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া সন্ধ্যা সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "না তুমি মিথ্যে কথা বলছো, সত্যি তুমি কাঁদছো, তোমার গলার স্বরটাও যেন কান্নায় ভরে উঠেছে। দীপিকা'দি, সত্যি বল না, তোমার কি হয়েছে? আমার যতদূর ক্ষমতা আমি তোমার সাহায্য করব—যদি তোমার চোখের জল মুছাতে পারি।"

দীপিকা মুগ্ধ হইয়া গেল—কিশোরীকে আবার বুকের মধ্যে টানিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার ব্যথা দূর করবে বোন?—জগতে কেউ পারে নি, কেউ পারবে না; আমার ব্যথার ওষুধ কেউ আবিষ্কার করতে পারে নি, পারবেও না। না বোন, সত্যি ভারি লজ্জা পাচ্ছি—আজ হঠাৎ কোথা হতে আমার এ আবেগটা ভেসে এলো! আজকের এই বাদলা দিনটা কতদিনের পুরানো স্মৃতি আমার মনে জাগিয়ে তুলছে তার ঠিক নেই। না, থাক সে কথা, সে সব একদিন হবে, আজ রাত হয়ে গ্যাছে, নয়টা বাজে, উঠি তা হলে।"

"উঠবে দিদি, এখনি?"

হাসিয়া দীপিকা বলিল—"নয়টার পরে ও কি রাখতে চাও ভাই? আর না, আবার কাল ছটায় আসব। আমার যাওয়ার বন্দোবস্তটা—"

সন্ধ্যা বলিল "সে রোজই তো ঠিক থাকে।"

বিদায় লইয়া দীপিকা উঠিল।

(২)

কতদিনকার কত বেদনাময় ইতিহাস দীপিকার বুকের মধ্যে সঞ্চিত তাহা কি বলা যায়? সে ছিল কোথায়, আসিল কোথায়—সে সব কথা বলিতে গেলে এক বিস্তৃত কাহিনী হইয়া পড়ে।

সারাটা পথ গাড়ীতে সে নিজের কথাই ভাবিতেছিল। কতবার তাহার চোখ দুইটী জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, কতবার সে মুছিয়াছিল সে নিজেই তাহা জানে না।

নিজের গৃহে পৌছিয়া সে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। দাসী ডাকিল—"দিদিমণি, শুয়ে পড়লে যে, কিছু খেলে না?"

রুদ্ধকণ্ঠে সে উত্তর দিল—"না ঝি, আজ শরীরটা বড্ড খারাপ বোধ হচ্ছে, কিছু খাব না।"

কি ভীষণ তাহার জীবন খানা আজ, কি বিড়ম্বনা পূর্ণ। সে অন্যের সহিত নিজের তুলনা করিয়া হাঁপাইয়া উঠে, তাহার চোখে জল আসিয়া পড়ে।

ভগবান কেন তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন তাহাকে এ পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন? সে নিজেই ভাবিয়া পায় না এখনও সে জগতে বাঁচিয়া আছে কিসের আশায়? মানুষ একটা আশা ধরিয়া জগতে বাঁচিয়া থাকে, তাহার সকল আশাই তো ফুরাইয়া গিয়াছে।

হাঁ, ফুরাইয়া গিয়াছে বই কি, মাত্র একুশ বৎসর বয়স, তাহার জীবনের সীমা, মনে হইতেছে খুবই কাছে, কিন্তু ফুরায় কই? একটানা এই অনন্ত-দুঃখের মাঝখান দিয়া এ জীবন চলিয়াছে তো চলিয়াছেই, এ ফুরায় কই!

মনে পড়ে সেই সব কথা। কে জানিত তাহার ভাগ্য-চক্র এমন ভাবে ঘুরিয়া যাইবে, সে কোথায় যাইতে কোথায় আসিয়া পড়িল! আজ যে সন্ধ্যার স্বামী—সেই শিরীষ, সে-তো তখন সন্ধ্যার স্বামী ছিল না। দীপিকার পিতা শিরীষের পিতার ম্যানেজার ছিলেন, তখন হইতেই চেনা শোনা।

কিশোরী দীপিকা শিরীষকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল ইহাতে তখন দোষ ছিল না, তখন সে কুমারী। শিরীষও আভাস দিয়াছিল—যদি বিবাহ করিতেই হয় তবে সে তাহাকেই করিবে, আর কাহাকেও করিবে না।

মাতৃহীনা একমাত্র কন্যাকে আশুবাবু বিশেষরূপে শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। নিজে তিনি গায়কনামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রতিভা কতকটা তাঁহার কন্যার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শিরীষ কলিকাতায় থাকিয়া পড়িত; সেখানে থাকিতে বন্ধুর ভগ্নি সুন্দরী সন্ধ্যাকে দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া পড়ে, এবং কাল বিলম্ব না করিয়া সন্ধ্যাকে সে বিবাহ করিয়া ফেলে। তাহার পিতা কিছুদিন আগে মারা গিয়াছিলেন, বর্ত্তমান জমিদার সে নিজে; আর বরাবর সে কিছু একরোখা থাকায় মাও তাহাকে কোন কথা বলিতে পারেন নাই।

সংবাদটা দীপিকার কাণে গিয়া যখন পৌছাইল তখন তাহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। আশুবাবু সে সময় কন্যার বিবাহের পাত্র খুঁজিতে ছিলেন, দীপিকার আর বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না, নিজের জীবনটা সত্যই তাহার কাছে তখন মিথ্যা হইয়া গিয়াছিল। এদিকে দেনার দায়ে তখন আশুবাবু নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি যেমন তেমন করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইতে পারিলেই বাঁচিয়া যান। সেই দুঃসময়ে রাধিকানাথ আসিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিল।

লোকটী আদৌ শিক্ষিত ছিল না, তবে অর্থ ছিল বটে। আশুবাবুকে সে যে সাহায্য ও করিয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য, এবং আশুবাবুও এই অর্থে দেনা শোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহ অন্তে অঋণীভাবে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

তিনি গেলেন, কিন্তু বোঝাটা সবই চাপিল দীপিকার মাথায়।

দুশ্চরিত্র মাতাল স্বামী তাহার, জীবনের সুখ শান্তি পূর্ব্বেই তাহার ঘুচিয়া গিয়াছিল, এখন বেদনায় সে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছিল। হায়, কেন সে বিবাহ করিল, যদি তখন সে অমত করিত—যদি তখন সে বাঁকিয়া দাঁড়াইত! কিন্তু অমত করিবে কে? অমত করিবে এই বাংলার মেয়ে! নিজের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যদি যায়, তবু তাহাকে 'না' বলিবার যো নাই, নিজেকে সে দান করিয়াই যাইবে যে। বাংলার মেয়ের আত্মজ্ঞান আছে কি? নাই; আর তাহা নাই বলিয়াই বাংলার মেয়ে এমন ঢের যন্ত্রণা নীরবে সহিয়া যায়, আজীবন কাল সহিয়াই যায়, যতদিন না তাহার দেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। কত দগ্ধ হৃদয়ের বেদনা মিলায় সেইদিন যেদিন মৃত্যু আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করে। বাংলার মেয়ের মতামতের উপর বাংলার পুরুষ নির্ভর করে না, বাংলার পুরুষের

বিশেষত্ব যে এইখানেই খুব ভাল ভাবে ফুটিয়া উঠে। নির্ভর করে না বলিয়াই অনেক নারীর মুখের হাসি জোর করিয়া মুখে ফুটাইতে হয়।

বাংলার মেয়ে মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলিতে পারিলই বা, তাহার সে কথা কাণে তুলিবে কে? বাহিরের উচ্চ-চীৎকারে সে মৃদুকণ্ঠ ডুবিয়া যায়, হতাশায় বাংলার মেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, চোখের জল চোখেই শুকায়। এমনই আত্মদান বাংলার কত ঘরে হইয়া গিয়াছে, কত ঘরে হইতেছে কে তাহা ভাবে, কে তাহা বলে, কে তাহা শুনে? দোষ যে একজনের তাহা নহে, দোষ মিলিত শক্তির, আর এই মিলিত শক্তির এ রোগটা অনেকদিন আগেই সৃজিত হইয়াছে।

সবই সহিয়া যাইতে হইতেছিল, দীপিকা চুপ করিয়া নির্জ্জীবের মতই পড়িয়াছিল, দেখিতেছিল তাহার জীবনস্রোত কোন দিকে কি রকম করিয়া গড়াইয়া যায়।

কিন্তু সকলেরই একটা সীমা আছে, দীপিকারও সহ্য সীমাতিক্রম করিল সেইদিন যেদিন তাহার স্বামী মদ খাইয়া বাড়ী আসিয়া বিনাদোষে তাহাকে অপমান করিল। তাহার অদৃষ্টে সবই জুটিয়াছিল, এতদিন ঘটে নাই কেবল এইটাই। রক্ত তাহার তাই ঠাণ্ডাই ছিল, সেদিনকার সেই অপমানে রক্ত গরম হইয়া উঠিল। অত্যন্ত ক্ষোভে দুঃখে সে মাসীমার সহিত কলিকাতায় চলিয়া আসিল। স্ত্রীর এই নিদারুণ অবাধ্যতায় রাধিকানাথও আন্তরিক চটিয়া গেল। তাহার জ্ঞান ছিল স্ত্রী তাহার সকল রকম অত্যাচারই নীরবে সহিয়া যাইবে, কারণ এই সংসারে স্ত্রীজাতির দস্তুর নাকি তাহাই। স্ত্রীর যে অপমান বোধ হইতে পারে, সে যে স্বামী গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে ইহা সে কোনদিনই ভাবে নাই বলিয়াই অতটা বাড়িয়াছিল এবং সেইজন্যই সে ফুলিয়া সাতটা হইয়া উঠিয়াছিল। রাগের মাথায় সেও প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল এমন অবাধ্য দুর্নীতি-পরায়ণা স্ত্রীকে যদি সে কখনও গ্রহণ করে তবে যেন সে...ইত্যাদি। স্পষ্টকণ্ঠে সে প্রকাশ করিল—ইহার পর মেয়েদের কেহ যেন লেখাপড়া না শিখায়, কারণ মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইলেই তাহারা অবাধ্য হইয়া উঠে।

দরিদ্রা মাসিমা, কোনও ক্রমে নিজের দিন যাপন করিতেন, বোনঝিটি কাছে আসায় তাঁহাকে বিব্রত হইয়া উঠিতে হইল বড় কম নয়। তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া দীপিকা ইহার প্রতিকার করিবার চেষ্টায় রহিল।

এই সময় নবনিযুক্ত ম্যানেজার রমণীবাবুর নাম দিয়া শিরীষ একখানা বিজ্ঞাপন দিয়াছিল—একটী জমিদার ঘরের মেয়েকে গান শিখানোর জন্য শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক। এই বিজ্ঞাপনে শিরীষের নাম গন্ধও ছিল না। দীপিকা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য দরখাস্ত দিল।

বড় ভীষণ সময় ছিল সেইটী যখন রমণীবাবুর সহিত সে শিরীষের সম্মুখীন হইল। তাহার চোখের সম্মুখে সারা বিশ্ব অন্ধকার হইয়া আসিল, সমস্ত দেহখানা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভগবানের একি বিড়ম্বনা, একি দারুণ অপমান তাহার! ইহার চেয়ে মাতাল স্বামীর গৃহে থাকিয়া তাহার অপমান সহ্য করাও যে লক্ষ গুণে ভাল ছিল। সে স্বামী, কিন্তু সে তো তাহার কিছুই গ্রহণ করিতে পারে নাই, সতর্ক হইয়া এ পর্য্যন্ত নিজেকে সেই মাতালের কবল হইতে সে বাঁচাইয়া আসিয়াছে। তবু তাহার অপমান ভাল, কারণ সে পর—হাঁ, স্বামী হইলেও সে একেবারেই পর। কিন্তু যে তাহার সর্ব্বস্ব লইয়াছে, তাহার জীবনকে যে শুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারই দুয়ারে আজ সে নিজের জীবিকার্জ্জনের জন্য হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, তাহারই স্ত্রীকে সে শিক্ষা দিবে, তাহারই অর্থ সে গ্রহণ করিবে? অনন্ত তোমার লীলা প্রভু, ধারণা করাও যে যায় না। যাহার সংস্পর্শে দীপিকা আসিবেনা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজ তাহারই দুয়ারে তাহাকে এমন নিঃস্বের মত আনিয়া ফেলিলে কেন নাথ?

চকিতে শিরীষের মনেও বহুকাল আগেকার একটী কথা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মুখখানাও শবের মতই মলিন হইয়া গিয়াছিল, অন্যমনস্ক শিরীষ ভুলিয়া গিয়াছিল সে কোথায়—তাহার সম্মুখে কে।

রমণীবাবু উভয়ের ভাব কিছুই জানিতে পারিলেন না, বৃদ্ধ তিনি,এসব দিকে চোখ দিবার সময় তাঁহার নাই। তিনি বিষদ-ভাবে বুঝাইয়া দিলেন এই ভদ্র ঘরের মেয়েটী বিপদগ্রস্থ হইয়াই কাজ করিতে আসিয়াছে, শিরীষ এখন কি বলিতে চায়?

শিরীষ তখন পলাইতে পারিলে বাঁচে, চোখ তুলিয়া সে মেয়েটীর পানে মোটে চাহিতে পারিতেছিল না। কোনও মতে উত্তর দিল— বেশ, একেই রাখুন।

হায় রে, একদিন যেখানে তাহারই আসন পাতা ছিল আজ সেখানে সে শিক্ষা দিতে আসিয়াছে কাহাকে যে তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে আসিয়া বসিয়াছে, তাহাকে! সন্ধ্যার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার পানে চাহিতে চাহিতে সে তন্ময় হইয়া যাইত—ভগবান ঠিকই মিলাইয়াছেন, সুন্দরের পার্শে সুন্দরেরই স্থান, অসুন্দর যে, তাহার এখানে স্থান নাই, এ আসন সন্ধ্যারই প্রাপ্য, সে কিসের জন্য পাইবে, তাহার আছে কি? মানব চক্ষু প্রথম যাহা দেখিয়া আকৃষ্ট হয় সেই রূপ—তাহা তো তাহার নাই, সে যে কৃষ্ণাঙ্গী! গুণ-লেখাপড়া গান বাজনা, কিন্তু তাহা শিক্ষার উপরেই নির্ভর করে মাত্র। সন্ধ্যার যে টুকু খুঁত আছে তাহা শিক্ষা দ্বারা দূরীভূত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার যাহা নাই তাহা এখানে পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু হৃদয়—? হায় রে, ভিতরে যে সবই এক। কালোর বুকেও যা, সুন্দরের বুকেও তাই। স্নেহ প্রেম ভালবাসা এতো মানুষভেদে, রূপভেদে নাই, এ যে হৃদয়েরই একায়ত্ব করা ধন, নিজস্ব বস্তু। হায় প্রভু—যদি কালোই করিলে মনটাকে কেন তেমনই করিলে না? তাহার জীবনের দশটা দিক জমাইয়া পাথর করিয়া দিয়াছ, হৃদয়ের দিকটা জমাইয়া কেন পাথর করিয়া দিলে না গো? তাহা হইলে আজ তাহাকে এমন করিয়া গোপনে চক্ষের জল মুছিতে হইত না, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে হইত না।

অপরাধ কাহার—তাহার, সন্ধ্যার, অথবা শিরীষের? সে তো আসার জন্য প্রস্তুতই ছিল, একটী ডাকের অপেক্ষা করিয়াছিল সে, কিন্তু সে ডাক আসিল না। সন্ধ্যা—কিন্তু তাহারই বা অপরাধ কি? নিরপরাধিনী বালিকা সে, আত্ম ভুলিয়া আত্মদান করিয়াছে। সে জানিত না, বুঝিত না, তাহাকে তুলিয়া আনিয়া এ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। তবে—অপরাধ কি তাহারই নহে—যে ডাকিবার জন্য প্রথমে প্রস্তুত হইয়াছিল?

হাঁ, তাহারই বটে, কিন্তু ইহাও বলিতে হয় এতই বা কি অপরাধ তার? মানুষের স্বভাবজ তৃষাকে এড়াইবে সে কি করিয়া? সুন্দরকে এড়াইয়া কেহ অসুন্দরকে আরাধনা করিতে চায় না। মানুষের ধর্ম্ম সে পালন করিয়া গিয়াছে, অপরাধ তাহার নয়, অপরাধ মানব ধর্ম্মের।

সে রহিয়া গেল। যখন গিয়াই পড়িয়াছে তখনই চলিয়া আসা ভদ্রতা বিরুদ্ধ বলিয়াই রহিয়া গেল, ভাবিল—একমাস গেলেই কোনও একটা অছিলা খুঁজিয়া চলিয়া আসিবে, কিন্তু বালিকা সন্ধ্যা তাহাকে জড়াইয়া ফেলিল।

জলে ধোয়া যুঁই ফুলটীর মত সে পবিত্র, ময়লা বিহীন। তাহার বাহিরটা যত সুন্দর, অন্তর ততোধিক সুন্দর। সন্ধ্যার স্বভাবের বিশেষত্ব এই ছিল যে তাহাকে একবার যে কাছে আমল দিয়াছে সে আর সহজে তাহাকে ছাড়াইতে পারিত না।

সন্ধ্যার মায়ায় জড়াইয়া গিয়া দীপিকার এ বাড়ী ত্যাগ করা মুস্কিল হইয়া উঠিল। ক্রমে সে এমন নিবিড় ভাবে এই মেয়েটীকে ভাল বাসিয়া ফেলিল যে সাতমাসে শিরীষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যা যে শিরীষের স্ত্রী, সে কথা আর তাহার মনে রহিল না, সন্ধ্যা পবিত্রচিত্তা একটী ছোট মেয়ে—তাহার কথা ভাবিতে এই কথাই মনে জাগিয়া উঠিত।

এই সাত মাসের মধ্যে শিরীষ একদিনও ইহাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। সে এত দূরে দূরে চলিত, বুঝা যাইত না শিরীষ নামে কেহ সেখানে আছে কিনা; নিজের কাজ তাহাকে চাবুক মারিত—সে ততই দূরে সরিয়া যাইত। ইহাতে দীপিকা ও বড় আরামে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল, শিরীষের সহিত তাহার মোটেই দেখা না হয় এই তাহার একান্ত বাসনা ছিল।

এমনি ভাবেই দিন কাটিতেছিল। এই দুইটী প্রাণী ছাড়া আর কেহই জানিত না যে উভয়ে একদিন কত কাছাকাছি ছিল! আজ শিরীষ সন্ধ্যার স্বামী, দীপিকা রাধারমণের স্ত্রী, কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন দীপিকা—কিন্তু থাক কাজ নাই, সে কথার অতীত অতীতেই মিশিয়া যাক, বর্ত্তমান বর্ত্তমান থাক, ভবিষ্যৎ—সে শুধু নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা, সে অন্ধকারের মধ্য দিয়া দৃষ্টি যায় না।

(ক্রমশঃ)

ফুল্‌কো-লুচি

[বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর]

(১)

আমি যে সময়ের ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—তখন আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। সবে মাত্র Fourth classএ প্রমোশন পাইয়াছি। তখন বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুল্ল মাতামহ মহাশয় আলিপুরে হাকিমি করিতেছেন ও সপরিবারে বহুবাজার ঠাকুরদাস পালিতের লেনে একটা বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন। আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে যে তখন পর্য্যন্ত আমার শ্রদ্ধেয় মাতুল দ্বয় (পূর্ণবাবুর পুত্র) বেকার বসিয়াছিলেন ও সেই বাটীতেই আমার শ্রদ্ধেয় মাতুল শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পেনসন ভোগী সবজজ্, পূর্ণবাবুর মধ্যম পুত্র) তাঁহার বড় আদরের স্ত্রীকে অকালে নিমতলার শ্মশানে বিসর্জ্জন দেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পেন্‌সন লইবার পর হইতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল প্রত্যহ বৈকালে ঘরের ব্রুহাম করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গড়ের মাঠে ও গঙ্গার ধারে সান্ধ্য বায়ু সেবন করিয়া ফিরিবার পথে অনুজ পূর্ণবাবুর বাটী যাইয়া সেখানে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করিয়া পরে বাটী ফিরিয়া আসা। এই-রূপে কিছুদিন যায়। একদিন দৈব দুর্ব্বিপাকের কথা বলি। সেদিন মাতামহদেবের সহিত গাড়ীতে আমি ও আমার একজন সহোদর ছিল মাত্র, কে ছিল স্মরণ নাই। প্রতিদিনের নিয়মানুযায়ী গড়ের মাঠ গঙ্গার ধার প্রভৃতি বেড়াইয়া পূর্ণ বাবুর বাটী হইয়া যখন গাড়ী বৌবাজার অক্রুর দত্তর লেনে একটা গাড়ী-মেরামতী কারখানার সম্মুখে আসিয়া পৌছিয়াছে সেই সময় অশ্ব প্রবর—বুঝিতে পারিলাম না সম্মুখে কিছু দেখিয়া ভড়কাইয়া দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিল। অনবরত সম্মুখের দুই পা তুলিয়া নৃত্য করিবার চেষ্টা ও ভীতি ব্যঞ্জক কাতর ধ্বনি। মাতামহদেব গতিক বেগতিক দেখিয়া গাড়ীর ভিতর হইতে বলিলেন "কালু (কোচুয়ানের নাম) ঘোড়াকে খুলিয়া দাও—সহিসকে বলিয়া দাও উহাকে একটু টহলাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া আনুক। আমরা ততক্ষণ গাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকিয়া অপেক্ষা করি।" তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল। গাড়ীর ভিতরে যেখানে আমরা রহিলাম ও ঘোড়া-বিহীন গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিল ঠিক তাহার বিপরীত দিকে একটী সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা ছিল। আমি স্বভাবতঃই চঞ্চল প্রকৃতির, এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর বোধ হইল। আমাকে চনমন করিতে দেখিয়া মাতামহদেব বলিলেন "কিরে গরমে গাড়ীর ভেতর বসে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছে না—চল্ একটু গোলতলায় বেড়াইয়া যাই, কালু গাড়ী ঠিক করিয়া জুতিয়া লইয়া গোল-তলার ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে।" আমি উত্তরে বলিলাম "না দাদাবাবু, অত শত কিছু করতে হবে না, আমি ঐ সামনের বাড়ীর রোয়াকে গিয়া বসিব।" দাদাবাবু সহাস্যে বলিলেন "তথাস্তু।" পরে আমার সহোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কিহে তুমি কি করবে—তোমার বড়দা ত রোয়াক বেছে নিলে, তুমি কি দাওয়া টাওয়া বেছে নিতে চাও?" সহোদর কি বলিয়াছিল মনে নাই, তবে উহাদের গাড়ী হইতে নামিবার কোন লক্ষণ দেখিলাম না। কেবলমাত্র গাড়ীর ভিতর হইতে বলিলেন "কালু, বড়বাবু রোয়াকটায় বসতে যাচ্ছে, তুমি একটু খবরদারি করিও—একটু দেখিও শুনিও।"

(২)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাড়ীর রোয়াকে আমি বসিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম—তাহা বেশ সুন্দর দ্বিতল বাটী, রাস্তার ধারেই রোয়াকের ভিতরকার দিকে একটী

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত বৈঠকখানা ঘরের ভিতরে সেজে বাতি জ্বলিতেছে, বাহির হইতে ভৃত্য টানাপাখা টানিতেছে, ঘরের ভিতরে কতিপয় কিশোর বয়স্ক বালক, যুবা, প্রৌঢ় ভদ্রলোকগণ বসিয়া জটলা করিতেছেন। আমি গাড়ী হইতে নামিবার উদ্যোগ করিতেছি--হঠাৎ আকাশ পাতাল, সেই ঘর, আমাদিগের গাড়ী, সেই ক্ষুদ্র পরিসর গলিপথ কাঁপাইয়া দিক্‌দিগন্তে ছড়াইয়া সুমধুর হারমোনিয়মের ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে কাহারও মিঠা সুমধুর কণ্ঠে হারমোনিয়মের সঙ্গে—

"শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখবো বোলে হে—"

গীত প্রাণ মনকে পুলকে মাতাইয়া কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। মাতামহদেব আমাকে নামিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন "চুপ, বেশ স্থির হয়ে বসে গান শোন। কি খাসা মিষ্টি মধুর গাইছে।"

তখন গায়ক গাহিতেছে—

"আমি তাই এসেছিলেম এ গোকুলে
আমায় স্থান দিও রাই চরণ তলে।
দেখব বোলে হে—"

আমি মাতামহদেবকে বলিলাম "দাদাবাবু ঐ বাড়ীতে গিয়ে গান শুনে আসব, আপনি ডাক্‌লেই চলে আসব।"

মাতামহদেব। এক কড়ারে যেতে দিতে পারি, যদি তুমি বাড়ী গিয়ে ঠিক ঐ রকম অবিকল হারমোনিয়ম বাজিয়ে আমাকে ঐ গান ঐরকম ভাবে ও সুরে শোনাতে পার।

তখন গান চলিতেছে—

"মানের দায়ে তুই মানিনী
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কয়ে
ঘরে যাই যে চরণ ছুঁয়ে।"

আমি বলিলাম—"দাদাবাবু একদিনে কি করে আয়ত্ত কর্‌ব? তবে ঐঘরে গিয়ে দেখি—যে গাইছে তার হারমোনিয়ম বাজান ও কি কি পরদায় হাত দিচ্ছে বেশ করে দেখলে তবে চেষ্টা করে বাজাতে পারব।" এই সুখের সময় কালু কোচুয়ান নীরস ও কর্কশভাবে বলিল "হুজুর গাড়ী ঠিক হ্যায়—এখন কি কোঠি যাইব?" মাতামহদেব উত্তরে বলিলেন "ঘুমায় লেও পহেলা পূর্ণবাবুকা কোঠি—ফিন চলো।" কোচুয়ান দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ী ফিরাইয়া লইল। তখন শুনিতে পাইলাম অতি উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বত্র আনন্দে ডুবাইয়া আকাশ, ঘর, পথ, মুখরিত করিয়া গায়ক গাহিতেছে—

"যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী
তখন নয়ন জলে আপনি ভাসি।
যখন জয় রাধে শ্রীরাধে বলে—"

এই পর্য্যন্ত শুনিতে শুনিতে চলিলাম। ক্রমে গাড়ী পুনরায় পূর্ণবাবুর বাটীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বঙ্কিমচন্দ্র গাড়ী হইতে নামিয়া আমাকে বলিলেন "যা তোর ছোট দাদাবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।" আমি গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহাকে ডাকিতে চলিলাম। বেশীদূর যাইতে হইল না, কারণ—গাড়ী থামিতেই বাটীর সকলেই শশব্যস্ত হইয়া "কারণ" জানিবার জন্য সদর দরজার দিকে আসিতেছিলেন—সুতরাং মধ্যপথেই আমার সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইয়া গেল—সকলেই কৌতূহল দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল—"কি রে সিদু—কি ব্যাপার—পথে কোন বিপদ টিপদ হয় নিত? এরি মধ্যে তোর দাদাবাবু আবার কেন ফিরে এল বলত?" আমি উত্তরে বলিলাম—কৈ না, সে সবত কিছুই হয় নি—দাদাবাবু ফের কেন ফিরে এলেন জানি না, দাদাবাবু ছোট দাদাবাবুকে ডাকছেন। ছোট দাদাবাবু—আমার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ—সেজদাদা—কি খবর বলুনত—শরীর বেশ ভালত? হঠাৎ পথ থেকে ফিরে এলেন কেন—আমি ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি?"

বঙ্কিমচন্দ্র সহাস্যবদনে উত্তর দিলেন "না পূর্ণ—চিন্তার কোন কারণ নাই। পথের এক বাড়ীতে একটা গান শুনে বড় মধুর লাগল—তাই তোমাকে শোনাবার জন্যে ডাকতে এসেছি। চটপট গায়ে একটা জামা দিয়ে এস—আবার তোমাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে তবে আমি বাড়ী যাব।" পূর্ণচন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া—গায়ে পিরিহান (পিরাণ—

ইংরাজিতে যাহাকে বলে "Ripon shirt—single breast) চড়াইয়া, চটি জুতা পরে হাতে একটী কুকুরমুখো লাঠি লইয়া গাড়ীর ভিতর জম্‌কাইয়া বসিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভিতর হইতে হাঁকিলেন—"কালু—যে বাড়ীতে গান হচ্ছিল—সেই বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িও।" কালুও "যে হুকুম" বলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। যখন সেই বাড়ীর কাছ বরাবর আসিয়া পঁহুছিয়াছি শুনিতে পাইলাম—তখনও গায়ক গাহিতেছে—

"এখন চরণ নূপুর বেঁধে গলে—
পশিব যমুনা জলে—
আমায় স্থান দিয়ো রাই চরণ তলে
দেখ্‌ব বোলে হে—
শ্রীমুখপঙ্কজ"

গায়ক এই কয় লাইন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া—মনের আনন্দে—ছু'বার তিনবার গাইয়া গান বন্ধ করিলেন। গাড়ী তখন সেই বাড়ীর অপর দিকে কারখানার দেয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া—বঙ্কিমচন্দ্র চুপ করিয়া; কেবল পূর্ণবাবু আমাদের সহিত ২।৪ কথা আস্তে আস্তে কহিতেছেন। গান থামিলেই বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন "পূর্ণ শুনলে—কি খাসা মিষ্টি গলা! চল না ওদের ঘরে গিয়ে গানটী ফের গোড়া থেকে শুনে আসি।"

পূর্ণবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "সেজদা—কার বাড়ী কে জানে, হঠাৎ দুজন বুড়োমানুষ দেখে যদি তারা ভয় পেয়ে গান না গায়? তার চেয়ে সিদু একবার গিয়ে উঁহাদের সব কথা খুলিয়া বলিয়া জিজ্ঞাসা করুক—যদি উঁহারা রাজী হয় তখন না হয় আমরা যাইব।" আমি পুনরায় গাড়ী হইতে নামিবার উদ্যোগ করিতেছি হঠাৎ মাতামহ দেব বলিলেন "ভাখ্‌ খবরদার, আমাদের দুজনকার কারও নাম করিস্‌ নি। গিয়ে শুধু বলবি—যে দুজন বুড়ো মানুষ আপনাদের গান শুনে ভারী খুশী হয়েছেন আবার—আপনাদের গান শুনতে চান। তাঁরা গাড়ীর ভিতর বসে আছেন। যদি বলেন—আমি তাঁদিকে ডেকে নিয়ে আসি।" —আমি সেইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া একেবারে সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। আমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সেই প্রৌঢ় সুন্দর ভদ্রলোকটী সস্নেহে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে খোকা—কি চাও, গান শুনবে?" আমি ঈষৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম—"আমি খোকা নই, গান শুনতেই এসেছি, শুধু আমি একলা শুনব না। দেখছেন ঐ যে সামনে গাড়ীর কারখানার গায়ে একখানা ব্রুহাম গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে—তা'তে দুজন বুড়ো মানুষ বসে আছেন। তাঁরাও আপনাদের গান শোনবার জন্য ব্যস্ত। তাঁরা আপনাদের মতামত জানবার জন্য আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি বলেন তা হলে আমি তাঁদের ডেকে নিয়ে আসি।" সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী কি রকম এক প্রকার সন্দেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ চেয়ার হইতে লাফাইয়া আসিয়া আমার হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"খোকা তুমি ত বেশ ছোকরা হা—গাড়ীতে দুজন ভদ্রলোককে গরমের মধ্যে বসিয়ে রেখে নিজে এসেছ গান শুনতে! সেটী হচ্ছে না-চল দিকি যাই তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আসি।" সেই ভদ্রলোকটী বরাবর আমার সহিত গাড়ী পর্য্যন্ত আসিলেন, দেখি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সমস্ত লোক আসিয়াছে! সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী গাড়ীর দরজা খুলিয়া বিনীতভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে আপনারা অনর্থক গরমের ভিতর গাড়ীতে বসিয়া কেন কষ্ট পাইতেছেন, দয়া করিয়া গরীবদের বাটীতে পদধূলি দিন।" তখন বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণচন্দ্র গাড়ী হইতে নামিলেন—নামিয়া সহাস্য বদনে আমায় বলিলেন "কিরে তুই থাকবি না বাড়ী যাবি"—আমি বলিলাম "না আমি আপনার সঙ্গে বাড়ী যাইব।" তখন কোচ্‌মানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "কালু মেজদা বাবুকে কোঠি পঁহুছায়কে ঘোড়াকো দানা খিলায়কে ফিন্‌ গাড়ী হিঁয়া পর লে আও।" আমাকে বলিলেন, "চল তবে—আমি না মরিলে আর তোর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবো না।" কালু গাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল ও আমরা সকলে বৈঠকখানায় পৌঁছিলাম। বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিতেই সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক হইতে আরম্ভ করিয়া—ছেলে বুড়ো যে যেখানে ছিল সকলে আসিয়া ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিয়া—বঙ্কিমচন্দ্রকে ও পূর্ণচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইতে আরম্ভ করিল। প্রণাম

পাঠ শেষ হইলে তাঁহারা দুজনে ও আমি বৈঠকখানার তক্তপোশের উপর পরিষ্কার বিছানায় বসিলাম। সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী তাঁহাদিগকে দুইটী মোটা তাকিয়া আনিয়া দিলেন—তাঁহারা বেশ আরাম করিয়া বসিলেন। ক্ষণেক বিশ্রামের পর বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখবেন, অন্ধকারে ভাল ঠাহর করতে পারি নাই—নজরেও আমাদের ত বুড়ার চোখ। এ যে তোমার বাড়ী তা আমি জানিতাম না। বিষবৃক্ষে হরিদাসী বৈষ্ণবীর মুখ দিয়া যে কীর্ত্তন গাওয়াইয়াছিলাম—বহুকাল পরে আজ বাড়ী ফিরিবার পথে তোমার এখানে উহা সজীব অবস্থায় শুনিয়া ভারি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এত আনন্দ লাভ করিয়াছি যে একা উহা উপভোগ করিতে ইচ্ছা না হওয়ায়—আমার কণিষ্ঠ পূর্ণকে তাহার বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিয়াছি। আজকাল পূর্ণ তোমাদের পাড়াতেই বাস করিতেছে—তুমি কি ইহার কিছুই জান না?—"

কালবাবু উত্তর দিলেন "আজ্ঞে জানি—উহাকে প্রত্যহই কাছারীর ফেরৎ এইখান দিয়ে বাটী যাইতে দেখিতে পাই—তাছাড়া আপনাকেও মাঝে মাঝে ষষ্ঠীবুড়ী সাজিয়া নাতিদের লইয়া এই পথ দিয়া গাড়ী করিয়া পূর্ণবাবুর বাটীর দিকে যাইতে দেখিতে পাই। সিদুবাবুকে আমি বিলক্ষণ চিনি। যখনই সিদুবাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিল দুজন বুড়ো মানুষ গান শুনতে ইচ্ছুক—আপনাদের মত হলেই ডেকে নিয়ে আসি—তখনই আমি আঁচ করেছিলেম যে আপনি। কারণ ইহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই আপনাকে গাড়ী করিয়া সিদুবাবুর সঙ্গে পূর্ণবাবুর বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়াছিলাম।" বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন "থাক সে সব কথা, এখন আর একবার ঐ গানটী আগাগোড়া আমাকে শোনাও। কে গাহিতেছিল, তুমি নিজে না অপর কেহ?"

বগি। আজ্ঞে আমি হারমনিয়ম বাজাইতেছিলাম, আর আমার ছোট ভাই ভুতো গাহিতেছিল—আমিই তাহাকে গানটী শিখাইয়াছি।

তখন পুনরায় বগিবাবু হারমনিয়ম ধরিলেন ও তাহার কনিষ্ঠ ভুতো গানটী আগাগোড়া গাহিল। গান শেষ হইলে পূর্ণবাবু কহিলেন "সেজদা—এরূপ সুমধুর কণ্ঠস্বর ও গাহিবার ভঙ্গি কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই। এক বহুকাল পূর্ব্বে কাঁঠালপাড়ায় পূজার সময় আপনার বৈঠকখানায় শুইয়া তন্দ্রাঘোরে স্বর্গীয় যদুভট্টর কীর্ত্তন—"এস এস বঁধু এস"—শুনিয়া যেমন পুলকে আত্মহারা হইয়া অপার আনন্দে ঘুম ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া গানটী আগাগোড়া শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম আজ তেমনি ঐ অল্পবয়স্ক ছেলেদের গান শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।"

বঙ্কিমচন্দ্র কনিষ্ঠের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না। তাহার পর যতক্ষণ না গাড়ী আসিয়া পহুছিয়াছিল ততক্ষণ নানা কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সে সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যখন গাড়ী আসিল—বিদায় হইবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র বগিবাবুকে বলিলেন "দ্যাখ বগি— আমার এই নাতিটী বড়ই দুরন্ত। বড়ই চনমনে। ইহাকে শান্ত রাখিবার জন্য একটা হারমনিয়াম কিনিয়া দিয়াছি। তাহাতেও নিস্তার নাই, প্রত্যহই গুরুগিরি করিতে হয়। ছোকরা বেশ বাজাইতে শিখিয়াছে—আর এখন কোন গান শুনিলে অনেকটা সুর আয়ত্ত করিয়া বাজাইতে পারে। দেখ এই আসছে সামনের রবিবারে তোমাদের সকলকার আমার ওখানে সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণ বাড়ীর প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ রহিল। সকলেরই যাওয়া চাই। ভুতনাথকেও সঙ্গে লইবে। সেইদিন যাইয়া আমার এই দুরন্ত নাতিকে ঐ গানটী শিখাইয়া দিয়া আসিবে। আজ রাত্রি অনেক হইয়াছে, না হলে আরো খানিকক্ষণ থাকিয়া দু'চারটা গান শুনিতাম। আজ চলিলাম। এই পথেতে যাতায়াত করি, যেদিন ইচ্ছা হইবে আসিয়া গান শুনিয়া যাইব।" সকলেই পুনরায় বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রের চরণে প্রণত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়া পুনরায় বলিলেন—বগি যেন ভুলিও না—রবিবারে সদলবলে আসা চাই-ই। পূর্ণবাবুকে বাড়ী পহুছাইয়া দিয়া আমি ও মাতামহদেব রাত্র প্রায় ১০টার সময় বাড়ী আসিয়া পঁহুছিলাম।

যেদিন আমরা বগিবাবুর বাড়ীতে গান শুনিয়াছিলাম সেদিন শুক্রবার, মাঝে মাত্র শনিবার—রবিবার বগিবাবুর দলকে আমাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। রাত্রে

ঘুমাইয়াও স্বপ্ন দেখিলাম যে বগিবাবু স্বদলবলে আসিয়াছেন ও আমাকে ঐ গান শিখাইয়া দিতেছেন! শনিবার দিন প্রাতে মাতামহদেব বলিলেন "সিছু—অমন ভাল গান একলা শোন্‌বার ইচ্ছা হয় না, চল যাই আমারই মতন দু'চারজন বুড়ো মানুষকে গান শোনবার খবর দিয়ে আসি।" তৎক্ষণাৎ আস্তাবল হইতে গাড়ী জুড়িয়া আনিবার হুকুম পাঁড়ে দ্বারবানকে দিয়া—আমি কেশবিন্যাস করিতে অন্দরে যাইলাম ও মাতামহদেব চা-পান শেষ করিয়া—প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত নিজের বসিবার ঘরে যাইলেন।

গাড়ী আসিলে আমিও মাতামহদেব প্রথমে স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বাটী, পরে ঝামাপুকুরে স্বর্গীয় রাধিকা বাবু, চন্দ্রবাবুর বাটী হইয়া হ্যারিসন রোডের নিকটবর্ত্তী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহাশয়ের বাটী, স্বর্গীয় পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের বাটী ঘুরিয়া প্রায় বেলা ১০টার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি—আমাদের বাটীতে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রামস্থ দূর আত্মীয় ভাগিনেয় স্বরূপ স্বর্গীয় বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আমরা তাঁহাকে নাম ধরিয়া না ডাকিয়া "মামা" বলিতাম)—জীবনের শেষাবস্থা পর্য্যন্ত সংসার ভুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা উমাচরণ বাবুকে ভয় করিতাম, মান্য করিতাম। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর পিতৃদেব রাজকার্য্যে বিদেশে বাস করিবার হেতু উমাচরণ বাবু একপ্রকার আমাদের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। তিনি সংসারের যাবতীয় কার্য্য করিতেন ও বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। বাটীতে কাহারও কোন অসুখ বিসুখ করিলে স্বর্গীয় উমাচরণ বাবু ও পূজনীয়া স্বর্গীয়া মাতামহী দেবীর অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধামাতা এই দুইজনে দিবারাত্র রোগীর শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা, ঔষধ পত্র খাওয়ান—পথ্য দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিতেন—অনেক সময় ইঁহারা দুজনে রোগীর ঘরে থাকিয়া অনেক বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতেন। এক কথায়—ইঁহারা দুজনে না থাকিলে আমাদের সংসার এক প্রকার অচল হইয়া দাঁড়াইত। যাক—বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় কাজের কথা আরম্ভ করি।

আহারাদির পর বেলা দ্বিপ্রহরে মাতামহদেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "ছাখ্ কালকের হ্যাঙ্গামে তুইত একবারে কেতাব ছুঁসনি বুঝতে পারছি—তা বেশ, আজকের দিনটা বেশ করে মন দিয়ে পড়াশুনো করগে যা। রাত্রিতে আজকে তোর পড়া নেব—আমার সঙ্গে ঘুরে সকাল বেলাটাও কেতাব ছুঁসনি দেখতে পাচ্ছি। দেখিস্ খবরদার, যেন পড়া দেবার সময় একটুও ভুল চুক না হয়।" আমি আস্তে আস্তে সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া পড়িবার ঘরে বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহ নিজের পাঠ্যপুস্তক পড়িতে বসিলাম। সত্রাশ হৃদয়ে অতি গোপনে কাতরকণ্ঠে যেখানে যত দেবদেবী বিদ্যমান সকলের নিকট জোড়হাতে প্রার্থনা করিলাম—রাত্রে পড়া দিবার সময় যেন একটীও ভুল না হয়। বোধ হয় বালকের কাতর প্রার্থনা কোন কোন দেবতার কাণে পঁহুছিয়াছিল—কারণ—সেই রাত্রে মাতামহদেবের নিকট পরীক্ষা দিতে যাইয়া সামান্যই ভুল হইয়াছিল। যাহা হউক মাতামহদেব অসন্তুষ্ট না হইয়া সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন ও রাত্রি-কালে আহারাদির সময় মাতামহদেব পুরস্কার স্বরূপ প্রসাদী মাংসের বাটীটা আমাকে ধরিয়া দিয়া সহাস্য বদনে বলিয়াছিলেন "খা—যা না পারবি মাকে ঢেকে রেখে দিতে বলবি—কাল সকালে বাসি লুচির সঙ্গে বাসি মাংস বেশ "গ্রাণ্ড ব্রেক্‌ফাষ্ট" হবে।" তাহার পর শয্যায় যাইয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ি।

পরদিন প্রাতে দেখি মহাধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। মাতামহ-দেবের বসিবার ঘরে গিয়া দেখি—তিনি চা পান শেষ করিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতে খাইতে উমাচরণ বাবুকে (মামা) বলিতেছেন "ছাখ উমাচরণ, আজ জন কতক লোক রাত্রে এখানে খাবে। তুমি অন্দরে গিয়ে তোমার সেজমামীর কাছ থেকে তাঁহার নির্দ্দেশমত জিনিষের ফর্দ্দ করে নিয়ে—বাজার থেকে সেগুলো এই বেলাই আনিয়ে দাওগে। আর ছাখো, আমাদের এই গলির মোড়েই যে পাঁঠার দোকান সেখানে যদি একটী আস্ত কালধরন পাঁঠা—এই ধর আন্দাজ সের চার পাঁচ মাংস হতে পারে এমনিতর জ্যান্ত পাও তাহলে সেটিকে দরদস্তর করে কিনে নিয়ে—চোরবাগানের সিদ্ধেশ্বরীর তলায় বলি দিয়ে এনো। মুরলীকে (বঙ্কিমচন্দ্রের খাস

খানসামা) সঙ্গে নিও, সে ব্যাটা ওসব বিষয়ে খুব ওস্তাদ।" আমি মাতামহদেবের নিকট আবদার করিলাম—"দাদাবাবু আমি মামার সঙ্গে বাজারে যাব।" মাতামহদেব বলিলেন, উমাচরণ বাজার করবে না তোকে সামলাবে, সে কি করে হবে!"—আমি হতাশ হইয়া কাতর নয়নে উমাচরণ বাবুর দিকে চাহিলাম। উমাচরণ বাবু কহিলেন—"যখন সিচু যেতে চাচ্চে ছেলেমানুষ চলুক, মুরলীও ত সঙ্গে থাকবে—সে ভাবনা নাই।" মাতামহদেব বলিলেন "বেশ, যদি তোমাদের কোন অসুবিধে না হয় তাহলে ওকে সঙ্গে নিও।"

আমি ও উমাচরণ বাবু (মামা) চলিয়া আসিব উপক্রম করিতেছি, পুনরায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন "তা ছাখো উমচরণ তোমরা না হয় আস্তাবল থেকে গাড়ীখানা আনিয়ে নেও না। কি বল সিচু, এতে ঘোরবারও বিশেষ সুবিধে হবে।" উমাচরণ বাবু উত্তরে কেবল মাত্র "যে আজ্ঞে"—বলিয়া আমায় এক প্রকার জোর করিয়া টানিয়া লইয়া নীচেয় চলিয়া আসিলেন।

আমি তখন সবে বালকমাত্র—নীচে আসিয়া মুরলীকে বলিলাম—"যা চট করে আস্তাবল থেকে গাড়ী নিয়ে আয়। আমি, মামা আর তুই বাজারে যাব।" মুরলী কেবলমাত্র বলিল "আচ্ছা।"

আমি আনন্দে এক প্রকার নৃত্য করিতে করিতে অন্দরে পাকশালায় মাতামহী দেবীর নিকট হাজির হইয়া বলিলাম "সুধুমা (এইখানে বলিয়া রাখি আমরা নিতান্ত শিশুকাল হইতে মাতামহীকে "সুধুমা" ও মাতামহীর বৃদ্ধা মাতাকে "দিদিমা" বলিতাম) আমাদের এক্ষুনি বাজারে যেতে হবে। মামা আসছে—কি কি দরকার শীগ্‌গির শীগ্‌গির করে ফর্দ্দ করে দাও।" মাতামহী দেবী বলিলেন "যাহ'ক ভ্যালা ছেলে বাবু—সকাল বেলা থেকেই সুরু করেচ। আজ আর বুঝি বইটই ছোঁয়া হবে না! তোর দাদাবাবুকে বলিস একজামিনের সময় তোর হয়ে যেন তিনি একজামিন দিতে যান!"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"সুধুমা যেন রোজ রোজ ন্যাকা হচ্চেন—আজ যে রবিবার মনে আছে কি আজ ছুটি!"

মাতামহী দেবী বলিলেন "কে জানে বাবু, অত'ত কে মনে করে রেখে দিয়েছে।"

এমন সময় মামার শুভাগমনে সুধুমার বকুনি বন্ধ হইল। মামা আসিয়া বলিলেন "মেজমাসী আজকের ভোজে কি কি চাই বলুন, আমি দোয়াত কলম কাগজ এনেছি লিখে নিই; কি সিচু, তুমি এখনও কাপড় পর নাই, এই দেখছি তুমিই দেরী করে দেবে—যাও যাও চট করে কাপড় ছেড়ে এস, এতক্ষণ হয়ত গাড়ী এসে গ্যাছে।" আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উপরে কাপড় বদলাইবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলাম। আমার কাপড় বদলাইতে দশ মিনিটের বেশী সময় লাগে নাই। বাহিরে আসিয়া দেখি তখনও মামা ফর্দ্দ লইয়া ভিতর হইতে আসেন নাই। আমি মামাকে ডাকিতে ভিতরে যাইতেছি পথিমধ্যে দেখি মামা ও তৎপশ্চাৎ মুরলী মস্ত এক ধামা হাতে বাহিরের দিকে আসিতেছে। বাহিরে আসিয়া মামা তাঁহার থাকিবার ঘরে ঢুকিলেন ও মুরলীকে বলিলেন "মুরলী কৈ হে, এখনও যে গাড়ী এলো না, ভাল মুস্কিল, পাঁড়ে যেখানে যাবে সেইখানেই "বাঘের মাসি."ভাই ব্রাদারের সঙ্গে মুলাকাৎ না করিয়া ত ফিরিবে না। তুমি ততক্ষণ এক কলকে তামাক সাজ না হা।" মাতুল মহাশয় দুইবেলা আধভরি আফিম খাইতেন। সেইজন্য প্রত্যহ আফিমের দুধ সংসার হইতে লইতেন ও মুহুর্মুহু তামাক খাইতেন। মুরলী বেশ পরিপাটী করিয়া তামাক সাজিয়া মামার "কেটো হুকায়" বসাইয়া দিল ও মাতুলপ্রবর সেই হুকাতে লম্বা নল লাগাইয়া ভুড়ুক্‌ ভুড়ুক্‌ করিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন ও মুরলী খানসামা নিজেদের বসিবার ঘর হইতে হুকা লইয়া আসিয়া প্রসাদী কলকের অপেক্ষায় জমকাইয়া বসিল। উপর হইতে মাতামহ দেব বলিলেন "কৈ হে, তোমরা যে এখনও বেরুতে পারলে না, গাড়ী আসেনি বুঝি? না, এ কোচুয়ান দ্বারা আর চলবে না, যখনি গাড়ী জুততে বলবে তখনি মিছামিছি দেরী করবে। উমাচরণ, তুমি একটা ভাল দেখে কোচুয়ান দেখো হে, মাসকাবার হলেই একে জবাব দিয়ে দেবো।" এমন সময়ে পাঁড়ে আসিয়া বলিল গাড়ী আসিয়াছে। আমরা তিনজনে তখন শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমরা প্রথমেই "মেডিকেল কলেজের সম্মুখে হিন্দুর

পাঁঠার দোকানে” প্রবেশ করিলাম। তখন দোকানটী ছিল ঠিক গলির মোড়ে, কদমগাছের তলায় একখানি পাকা বাড়ীর নিম্নেকার ঘরে। সম্মুখেই মা করাল-বদনী লোলজিহ্বা দণ্ডায়মানা। তখন সেই দোকানের মালিক ছিল এক ব্রাহ্মণ, নাম জহরলাল। ক্রমশঃ হাত বদলি হইয়া সেই দোকান মায় মা কালি সুদ্ধ তিনকড়ি ঘোষের করকবলিত হয়। বোধহয় তিনকড়ি ঘোষের বিষয় আশয় শ্রীসুরেন্দ্র নাথ পান। তিনকড়ি ঘোষের মৃত্যুর পর উহার নাবালক ছেলেদের “অছি” হইয়া বহুকাল ধরিয়া সেই দোকান হইতে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করে ও দোকান পূর্ব্বস্থান হইতে তুলিয়া লইয়া ঠিক মেডিকেল কলেজের সম্মুখে খাপরেলের মাঠ কোঠার এক তলায় স্থানান্তরিত করে। এতাবৎকাল সেই প্রসিদ্ধ হিন্দুর পাঁঠার দোকানের অস্তিত্ব ছিল। সম্প্রতি উক্ত জমির মালিক ঐখানে পাকা ইমারত তুলিবার অভিপ্রায়ে উহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মাঠ করিয়া ফেলায় সেই মেডিকেল কলেজের সম্মুখে হিন্দুর পাঁঠার দোকানের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য লোপ পাইয়াছে। ভবিষ্যতে আবার সেইস্থানে সেই দোকান পুর্ব্বমত হইবে কি না তাহা সেই বিশ্ব জননী মহামায়াই জানেন। যাক, ধান ভানতে শিবের গীতের প্রয়োজন নাই। তারপর যাহা বলিতেছিলাম—আমরা দোকানে প্রবেশ করিতেই তখনকার মালিক জহরলাল আমাদিগকে যথেষ্ট খাতির করিয়া একখানা বেঞ্চি বসিবার জন্য আগাইয়া দিল। বেঞ্চিতে বসিয়া মামা বলিলেন“দেখ জহর, আজ বাবুর বাড়ীতে ভোজ। একটী নধর কালো ছোটখাটো পাঠা চাই। মাংস আন্দাজ ৫।৬সের হইলেই চলিবে। আছে কি? ঠিক ন্যায্য দাম নিও বাবু।” মামাতে আর তাহাতে নিভৃতে চোখে চোখে কি কথা হইল বুঝিতে পারিলাম না। মামাও ঈষৎ হাসিলেন আর সেও ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। তাহার পর সে একটী কাল কুচকুচে নধর কান্তি পাঁঠা বাহির করিয়া মামাকে সম্বোধন করিয়া বলিল “বাঁড়ুয্যে মশাই এই একটী মাত্র আছে। এর মাংস ৫সের খুব হইবে। এইটিই নিয়ে যান। দাম যাহা বলিয়া দিয়াছি তাহার এক পয়সা কম হইবে না। এরপর তখন মুরলীর হাত দিয়ে দাম পাঠিয়ে দেবেন।” মামা দাম কমাইবার জন্য প্রকাশ্যে বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু জহর-লাল কিছুতেই রাজী হইল না। অগত্যা মামা উহাতেই স্বীকৃত হইয়া পাঁঠাটাকে সহিসের দ্বারা বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন ও আমরা পুনরায় গাড়ী করিয়া নূতন বাজার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমস্ত দ্রব্যাদি ফর্দ্দমত কিনিয়া মামা পুনঃপুনঃ মিলাইয়া লইয়া গাড়ীজাত করিলেন ও আমরা সকলে বেলা ১০টার ভিতর বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

বাটী ফিরিয়া দেখি মাতামহ দেবের তখনও স্নান হয় নাই, তিনি আমার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতাবস্থায় বসিয়া আছেন। আমাকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন “হ্যাঁরে এত দেরী করতে হয়? আমি কতই ভাবছিলেম। মুরলী আমার স্নানের সব যোগাড় কর, ঢের বেলা হয়েছে।” মুরলী “যে আজ্ঞা” বলিয়া ধামা লইয়া অন্দরে ঢুকিল। মামা বলিলেন “দেখুন সব জিনিষই এনেছি, কেবল ঘি ময়দা আনি নাই। বিকেল বেলা তখন “দীনোর” (মুদী, উহার দোকান হইতে আমাদিগের মাসকাবারি জিনিষ সমস্তই আসিত) দোকান থেকে আসবে। মাতামহদেব উত্তরে বলিলেন “আচ্ছা।” তাহার পর তিনি স্নানের জন্য উঠিয়া যাইলেন ও আমিও তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া তৈল মর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলাম।

যে মহলে পাকশালা সেই মহলের উঠানে কলের সন্নিকটে একটী “চৌবাচ্ছা” ছিল, মাতামহদেব প্রত্যহ তৈল মাখিয়া ঐ চৌবাচ্ছায় অবগাহন স্নান করিতেন ও ডুব দিতেন। তাঁহার স্নান হইয়া গেলেই আমরা কয় ভ্রাতায় তাহাতে নামিয়া স্নান করিতাম ও মারামারি করিতাম। কেবল মাঝে মাঝে মাতামহী দেবী চীৎকার করিয়া বলিতেন “ওরে ছেলেরা ওঠ এতক্ষণ জলে পড়ে থাকলে অসুখ করবে।” কিন্তু কেবা কার কথা শোনে!

কিন্তু সেদিন স্নানপর্ব্ব শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিলাম। স্নানাহার সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি কখন মুরলী সেই পাঁঠাকে সিদ্ধেশ্বরীর নিকট বলি দিয়া তাহার ছাগত্ব ঘুচাইয়া আনিয়াছে। দেখি একরাশ মাংস দুভাগে বিভক্ত। এক ভাগ কাদার মতন, হাড়শূন্য তাল গোল পাকান. আর একভাগ পাঁঠা কুটিলে যে প্রকার হয় সেই প্রকার হাড় মাস যুক্ত। মাতামহদেব বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া মুরলীকে বলিতেছেন “ভাখ মুরলী—ঠাকুর মাংসটা ঠিক করিতে পারিবে কি না

বুঝিতে পারিতেছি না। তুই রান্নাঘরে থাকিয়া সমস্ত তদ্বির করবি, আর ঠাকুরকে দস্তুর মত দেখাইয়া দিবি যেন আজকের মাংস খারাপ না হয়। সিদুবাবু, বোধহয় তোমার ভাত খাওয়া হয়ে গেছে, যাও আমার ভাত দিতে বলগে।" আমি অন্দরে যাইয়া মাতামহদেবের ভাত দিতে বলিয়া রান্নাঘরে যেখানে মাংস রাঁধিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম—মনে মনে ইচ্ছা কি রকম ভাবে রান্না হয় তাহা দেখিব ও শিখিব। এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি—মুরলীকে মাংস রান্না শিখাইবার জন্ত মাতামহদেব ২৫।৩০টাকা মাহিয়ানায় একজন সুদক্ষ বাবুর্চি রাখিয়াছিলেন। মুরলীও মাতামহদেবের পয়সার বৃথা অপব্যবহার করায় নাই। কালে ক্রমে ক্রমে মুরলীও একজন পয়লা নম্বর "বাবুর্চি" হইয়াছিল। বাটীর সকলের তাড়না ভৎর্সনা সহ্য করিয়াও রান্নাঘরে মুরলীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মাংস রান্না কিছু শিখিয়াছি—তবে ফার্ষ্টক্লাস বাবুর্চি হইতে পারি নাই। মাংস প্রভৃতি আমিষ রান্না শিক্ষা বিষয়ে "মুরলী খানসামা" আমার গুরু। ক্রমে যখন দেখিলাম অপরাহ্ন হইয়া গিয়াছে, রৌদ্র রান্নাঘরের দেয়ালের উপরে পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে—তখন তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় হস্তমুখ ধুইয়া জামা কাপড় পরিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ঘড়িতে প্রায় ছ'টা বাজে! সদর বাটীতে ২টী বৈঠকখানা ছিল (এখনও বিদ্যমান) একটীতে মাতামহদেব সদা সর্ব্বদা বসিতেন, লেখা পড়ার কার্য্য—কেতাব বহি প্রভৃতি লেখা—যাবতীয় কার্য্য করিতেন। অপরটী—আগাগোড়া "ম্যাটিং" করা—তদুপরি সুবৃহৎ গালিচা পাতা, চারিধারে নানারকমের কৌচ কেদারা সোফা, মধ্যস্থানে একটী সুবৃহৎ শ্বেত প্রস্তরের টেবিল, তদুপরি ফুলদানি—গোলাপ ফুলের বৃহৎ তোড়া, একপার্শ্বে মাতামহদত্ত ছোট হারমোনিয়ম প্রভৃতি আসবাবাদিতে পরিপূর্ণ। এক্ষণে এই ঘরে ঐ সকল আসবাবাদির পরিবর্ত্তে শুধু ঢালা ফরাস বিছানা পাতা, তদুপরি কাঠির মাদুর। সকলি কালমাহাত্ম্য! উঠান হইতেই বুঝিলাম সেই ঘরটী বহুলোক পূর্ণ ও হাস্য কোলাহলে মুখরিত।

আমি বৈঠকখানায় ঢুকিতেই মাতামহদেব সহাস্যে বলিলেন "কৈ গো সিদুবাবু, তোমার বগিবাবুর যে এখনও দেখা নেই! এইসব লোককে আমি একলা কি করে সামলাই বলত? সন্ধ্যাও প্রায় হয়ে এল, আর কখন বগি বাবু এসে গান শোনাবে?" স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন "দেখলে সিধু তোমার দাদাবাবুর বুদ্ধি বিবেচনা! আমাদের গান শোনাবার নিমন্ত্রণ করে শেষকালে কিনা ফাঁকী!" স্বর্গীয় রাধিকাবাবু তামাক খাইতে খাইতে ভুঁড়ি দোলাইয়া বলিলেন "নাতি, না হয় তুমিই ততক্ষণ তোমার চন্দর দাদাকে গান শুনিয়ে ঠাণ্ডা রাখ।" স্বর্গীয় দামোদর বাবু বলিলেন "ব্যাই, না হয় একবার লোক পাঠিয়ে খবর নাও না, এইত কাছে, তাঁরা আসবেন কিনা সঠিক খবর পেলেও একরকম নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়।" এতক্ষণ স্বর্গীয় পণ্ডিত তারা-কুমার কবিরত্ন মহাশয় চুপ করিয়া কি পুস্তক দেখিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিলেন "ন চ বিদ্যা সঙ্গীতঃ পরম। যখন সঙ্গীত শোনবার নিমন্ত্রণ তখন সঙ্গীত না শুনে আমরা যাব না—তা সে বগিবাবুরই হক আর সিদু বাবুরই হক।" হঠাৎ সিড়িতে পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখি বগিবাবু স্বদলে উপরে উঠিতেছেন। পরম নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে ভাবিলাম—আঃ রাম বাঁচা গেল। আর কাহারও বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। বগিবাবু ও দলবল আসরে আসিয়া বসিলে মাতামহদেব বলিলেন "বগি এখনও তোমরা সময়ের মূল্য বুঝিলে না, চিরকালই একভাবে শিশুর মত কাটালে। এতগুলি ভদ্রলোক তোমাদের গান শোনবার আশায় হা পিত্যেশ করে বসে আছে আর তোমাদেরই দেখা নাই! দেখ দেখি প্রায় সাড়ে সাতটা বাজল—আর কখনই বা গান হবে। নাও আর দেরী করে কাজ নাই। একেবারে বাজনার কাছে সোফায় বস (বাজনা বাজাইবার জন্ত একরকম গদি ও চামড়া আঁটা টুল) আর যে দেখছ দুপাশে দুখানা টুল আছে, একটাতে "ভূতো" আর একটাতে "সিধে" বসুক। আমরা সেইরকম বসিলাম। কি রকম হইল জানেন? মধ্যস্থানে ভূতনাথ ভবানীপতি, আর দুইধারে "নন্দী ও ভৃঙ্গী।" ক্রমশঃ বগিবাবু হারমোনিয়মে সুর দিলেন। প্রথমে ধীরে, ধীরে, পরে উচ্চকণ্ঠে ঘর, আকাশ, গলিপথ কাঁপাইয়া সঙ্গীত লহরী বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া

বেড়াইতে লাগিল। চাহিয়া দেখি আমাদের বাটীতে ত স্থান নাই, লোক ধরে না, আশে পাশে বাটীর বারাণ্ডায় জানালায় লোকে লোকারণ্য! সকলেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ, যেন মন্ত্রমুগ্ধ, এত নিস্পন্দ যে সামান্য একটী আলপিন পড়িলে তাহার টুং শব্দটীও শুনিতে পাওয়া যায়।

বিষবৃক্ষ পুস্তকের চির নূতন গীত—

"শ্রীমুখপঙ্কজ দেখবো বোলে হে—"গীতটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানান ভাবে নানান ঢংএ গাহিয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে বন্ধ হইল। তখন যেন সকলের চমক ভাঙ্গিল। সকলেই একবাক্যে চীৎকার করিলেন—অমন সুমধুর কণ্ঠ, অমন সুমধুর কীর্ত্তন তাঁহারা বহুকাল শোনেন নাই। আজ শুনিয়া তাঁহারা যথার্থ আন্তরিক প্রীতিলাভ করিয়াছেন। তাহার পর আরো ২।৪টা গান হইল কিন্তু কোন গানই আর জমিল না। তাহার পর আহার পর্ব্ব। অন্দরে দ্বিতলের দরদালানে দুইদিকে সারি সারি পাতা সাজান, তদুপরি নানাবিধ ব্যঞ্জন—রসনা পরিতৃপ্তিকর মায়ের প্রসাদী, দেবদুর্লভ ছাগ মাংসের নানাপ্রকার অনুষ্ঠান। দালানের সংযোগ স্থলে যেখান হইতে দুইদিকই বেশ উত্তমরূপে নয়ন গোচর হয় ঠিক সেইস্থানেই একখানি বড় সোফার কেদারায় মাতামহদেব বসিয়া স্বয়ং সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন ও আমি ও মাতুল মহাশয় (উমাচরণ বাবু) তাঁহারই হুকুম ও নির্দ্দেশ মত পরিবেষণ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ মাতামহদেব বলিয়া উঠিলেন—সিদ্ধু কি পরিবেষণই করতে শিখেছ, দেখতে পাচ্ছ না ওদিক্‌কার সব পাত খালি। যাও, ঠাকুরকে বল শীঘ্র করিয়া গরম গরম ভাজা লুচি আনিয়া সকলকে দিক।" বগিবাবুর ভাই বলিয়া উঠিল "আজ্ঞে আমি আর লুচি লইব না, আমার পেট ভরিয়া গিয়াছে।" মাতামহদেব হাসিয়া বলিলেন "কিহে ছোকরা কি বলছ? তোমাদের ত এখনই খাবার সময়। কি এত খেলে যে এরি মধ্যে পেট ভরে গেল! সামান্য লুচি খেতে পার না, আর আমার বাড়ীর লুচি কি আর লুচি, ওতো সামান্য '**ফুলকো লুচি**' মাত্র।" ইত্যবসরে ঠাকুর আসিয়া সকলের পাতে পুনরায় লুচি দিয়া গেল। বলা বাহুল্য বগিবাবুর ভাইয়ের পাতে লুচি দিতে ছাড়ে নাই। সকলেই একবাক্যে মাংস রান্নার তারিফ করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় দামোদর বাবু, চন্দ্রবাবু ও রাধিকাবাবু পুনরায় মাংস চাহিয়া নাকি খাইয়াছিলেন। ক্রমে আহারাদি শেষ করিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া পুনরায় পান তামাকের ধ্বংস করিয়া যে যার বাড়ী ফিরিয়া যাইলেন। বাড়ী যাইবার সময় মাতামহদেব বগিবাবুকে বলিলেন "বগি যখনই ফুরসৎ ও সুবিধা হইবে তোমার ভাইকে পাঠিয়ে দিও, আমরাও গান শুনব আর সিদ্ধুরও গান বাজনা শেখা হবে। ওর গান বাজনা শেখবার বড় ঝোঁক, লেখাপড়া কিছুই হবে না।" বগিবাবু "যে আজ্ঞে" বলিয়া সদলে বিদায় হইলেন। ক্রমশঃ আসর নীরব হইল। ইহাই—

"ফুলকো লুচির বিবরণ।"

বিচিত্র বার্ত্তা

চিনি হইতে হীরক প্রস্তুত—

চিনিকে চেষ্টা করিলে হীরকে পরিণত করা যায় এ বাস্তবিকই একটা বিচিত্র সংবাদ বটে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন যে চিনির ভিতর হইতে কার্ব্বন বাহির করিয়া লইলেই অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা হইতে হীরক প্রস্তুত করা যায়। তবে আসল হীরকের চেয়ে এই কৃত্রিম হীরক নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু মজা এই—বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা পরীক্ষা (Test) করিয়া এই নকল হীরক সহজে ধরিতে পারা যায় না। আমরা কত চিনি ত খাইয়া হজম করিয়া ফেলিলাম—সঙ্গে সঙ্গে কত হীরকও যে আমাদের পেটে হজম হইয়া গেল কে তার হিসাব করিবে!

মানুষের আয়াস ও কাহারো সর্ব্বনাশ—

আমেরিকার কোন এক বড় সহরে সম্প্রতি একটা প্রকাণ্ড হোটেল খোলা হইয়াছে। হোটেলটী আধুনিক সুখ সুবিধার যতবিধ উপকরণ সকলই সংগ্রহ করিতে ত্রুটী করে নাই। ইহার প্রত্যেকটী ঘর ও বারান্দা বহুমূল্য কার্পেটে মোড়া। সবগুলি ঘর ও বারান্দা মুড়িতে ৩৭মাইল লম্বা কার্পেট লাগিয়াছিল। তোষক প্রস্তুত করিতে যে ঘোড়ার লোম ব্যবহার করা হয় তাহার ওজন হইতেছে ২৫০০০ পাউণ্ড! বালিশ প্রস্তুত করিতে ১০০০পাউণ্ড পাখীর পালকের প্রয়োজন হয় এবং সেইজন্য ৯০০০০ হাঁসের প্রাণ সংহার করা হয়! ইহাকেই বলে—কারো বা পৌষমাস, কারো বা সর্ব্বনাশ!

বোতলের সাগর পাড়ি—

কে একজন একটা বোতলের মুখে ছিপি আঁটিয়া শিল মোহর করিয়া আমেরিকার পশ্চিম তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল। সেই বোতল ভাসিতে ভাসিতে এবং ঢেউএর মাথায় দোল্ খাইতে খাইতে ৮৪০০ মাইল দূরবর্ত্তী নিউগিনিতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সুবিশাল প্রশান্ত মহাসাগরকে পাড়ি দিতে ঐ ক্ষুদ্র বোতলটীর দুই বৎসরেরও কিছু বেশী সময় লাগিয়াছে।

পৃথিবীতে খেয়ালী লোক যে কত রকমের আছে তাহা ঠিক করিয়া উঠা কঠিণ ব্যাপার।

২।১ তাঁতিবাগান লেন
কলিকাতা

পরম প্রীতিভাজন "সচিত্র শিশির" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন—

সেদিন 'সারদা' কার্য্যালয় হইতে বাটী ফিরিবার সময় পথে একটী মজার গান কুড়াইয়া পাইয়াছি। গানটী হাসির হইলেও আমার মতে, ইহাতে ভাবিবার ও বুঝিবার অনেক আছে। তাই আপনার প্রসিদ্ধ সচিত্র শিশির পাঠকের হস্তে গানটী উপহার দিতে চাই। আপনি যদি সমীচিন বোধ করেন আমার চিঠিখানিও গানের সহিত মুদ্রিত করিতে পারেন। ইতি—১৩ই আগষ্ট, ১৯২৩।

ভবদীয়—
শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতাবাসী উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের গান।

এ বয়সেই হলুম বুড়ো, লুটিয়ে পড়্‌ল উচ্চশির—
হ'য়ে কর-কবলিত হায়রে ক্ষুধা রাক্ষসীর।
ভাব্‌চি এখন কি যে করি? কেবল উপবাসে মরি
কেমন করে' অন্ন দিব মুখে কন্যা প্রেয়সীর?
উচ্চ শিক্ষার এম্‌নিরে গুণ জুটলে চাউল, জোটেনা নুন
বি, এ, এম, এ'র মুখে আগুণ, মুখে আগুণ এ জাতির!
তাতে এ কল্‌কাতা সহর—যেথা শুধু কোঁচার বহর—
পুরাইতে পেটের গহ্বর হয় যে সবার চক্ষুস্থির!
তবু পাড়া গাঁয়ের নামে ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গ ঘামে
আঁত্‌কে উঠি কেমন হ'য়ে—বুকে বাজে বিষম তীর!

বুদ্ধদেবের ভবিষ্য-বর্ণন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　১৪ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩১ সাল।　　[দ্বিচত্বারিংশ সপ্তাহ

"চন্দ্রগুপ্ত" চিত্র

নন্দের প্রমোদ-ভবন।

চন্দ্রগুপ্ত। এই চন্দ্রগুপ্ত তোমার সম্মুখে। অধম!……

চন্দ্রগুপ্ত—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেলেন। আজ সিন্ধুনদ-তীরে সেদিনকার সেই গরিমাময় সূর্য্যাস্ত মনে পড়ে। কোথায় সেই রবিকরোজ্জ্বল ভারত, কোথায় এই কুজ্ঝটিকাবৃত আফগানিস্থান! সেই মগধের রাজপুত্র!......

হেলেন—শ্রীমতী নীহারবালা।

হেলেন। আণ্টিগোন্‌স বীর। তিনি অপরাধ স্বীকার কচ্ছে'ন। এইবার—এই শেষবার তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁকে নির্ব্বাসিত করুন।

সেলুকস। না, সে শাস্তি যথেষ্ট নয়।

সেলুকস ও হেলেন—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী নীহারবালা।

সেলুকস। আবার নিভৃতে সাক্ষাৎ!

সেলুকস—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী।

সেলুকস ও হেলেন।

হেলেন। জানি বাবা, আপনি আন্টিগোনসকে মুক্ত ক'রে দেবেন।

সেলুকস। তোর যুক্তকরের কাছে সকল যুক্তি যে হার মানে হেলেন।

বন্দী সেলুকস ।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না। নিজের উপর প্রতিশোধ নেব ;...আমি আত্মহত্যা করব।

সেলুকস ও আন্টিগোনস।

সেলুকস। চক্ষে ঝাপসা দেখ্‌ছি। কে তুমি! কে তুমি!!

আন্টিগোনস—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়।

আলোক-চিত্র-শিল্পী—শ্রীএম্‌, দত্ত।

সম্প্রতি আর্ট থিয়েটার লিঃ পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারে "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকখানি খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া আমরা আলোক চিত্রগুলি তুলাইয়া লইয়াছিলাম।—সম্পাদক।

কাশ্মীর

[কর্পূরথালার চিফ্ জজ্ শ্রীযুক্ত রাজকুমার লিখিত]

এসিয়ার মুকুটমণি ভারতবর্ষ—আর ভারতের ভূ-স্বর্গ এই কাশ্মীর। কাশ্মীর সৌন্দর্য্যের রাণী—কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়াছে এমন একটী মানুষও পৃথিবীতে আছে কি-না সন্দেহ। এই কাশ্মীরের নামে পাগল হইয়া একদিন মোগল বাদসাহ তাঁহার শত সহস্র হস্তী উটের বহর লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, আর আজ কত সকলকেই চিরকাল ধরিয়া সমানভাবে আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছে। ইহার খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী, স্বচ্ছতোয়া ঝিলশ্রেণী, উন্মুক্ত উপত্যকা এবং নির্ব্বাক নীল- পর্ব্বতরাজি দর্শকের সৌন্দর্য্য-লিপ্সু চক্ষুকে চিরতৃপ্ত, মুগ্ধ করিয়া দেয়। প্রকৃতির রাজ্যে কি অতুলনীয় সম্পদ, কি অচিন্তনীয় রূপ-সম্ভার থাকিতে পারে তাহা কাশ্মীররাজ্য যে
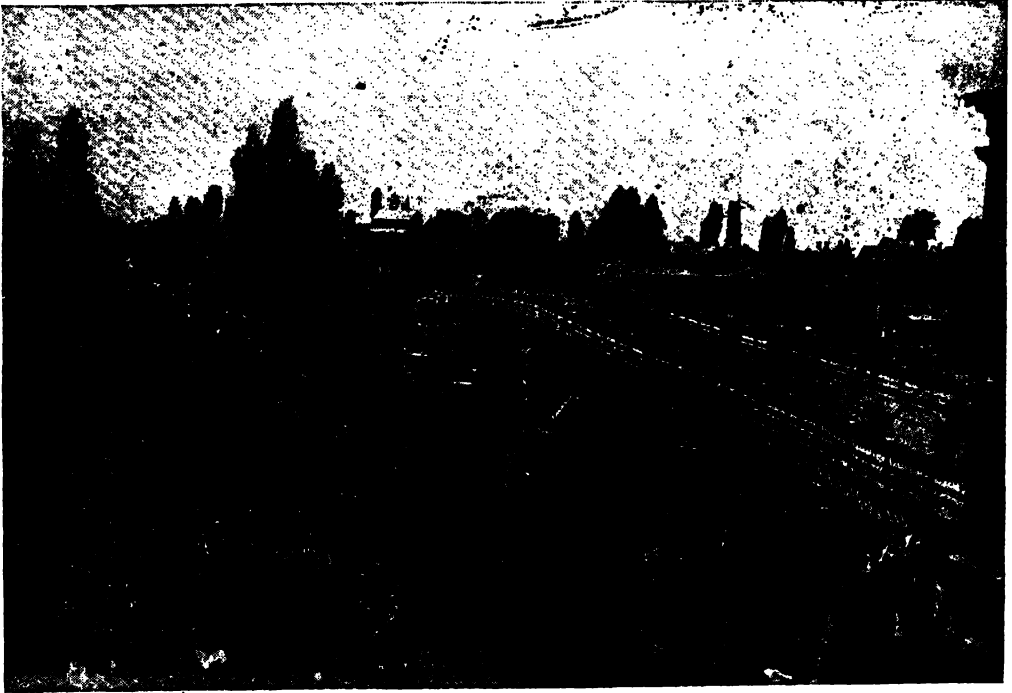
শ্রীনগরের প্রধান সেতু

শত সৌন্দর্য্যলিপ্সু এই কাশ্মীরের সৌন্দর্য্য-রসধারা পান করিতে যে পৃথিবীর নানাদিক হইতে ছুটিয়া আসে তাহার ইয়ত্তা নাই। অমৃতের স্বাদ যেমন ধনী দরিদ্র সকলের মুখেই সমান মিষ্টি লাগে, প্রস্ফুটিত পুষ্প সৌরভে যেমন সকলেই আকৃষ্ট হয়—মুগ্ধ হয়—তেমনি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উৎস কাশ্মীররাজ্য ছেলে বুড়ো, ধনী দরিদ্র না দেখিয়াছে সে কল্পনাও করিতে পারিবে না। পূর্ব্বকালে কাশ্মীর যাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার ছিল, কিন্তু আজ আর সে কষ্ট নাই। রাওলপিণ্ডি পর্য্যন্ত ট্রেণেই যাওয়া যায়। তারপর সেখান হইতে মোটরে চড়িয়া কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে পৌছা যায়। রাওলপিণ্ডি ট্রেণ হইতে নামিতেই মোটর চালকের দল আসিয়া ভিড় করিয়া

দাঁড়ায় এবং প্রত্যেকেই বুঝাইতে চেষ্টা করে যে তাহার মোটরে গেলেই সবচেয়ে কম ভাড়া এবং বেশী সুবিধা পাওয়া যাইবে।

রাওলপিণ্ডি হইতেই রাস্তা উপরের দিকে উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। মুরী পর্য্যন্ত রাস্তা ঠিক উত্তরের দিকে যাইয়া তারপর আবার নীচের দিকে নামিতে আরম্ভ করিয়া কোহাট ষ্টেশনে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। এই কোহাটে যাত্রীসহ দিবানিদ্রায় নিশ্চিন্ত আরামে কালাতিপাত করিতেছে। গাড়োয়ানদের নিয়মই এই—তাহারা দিনে পথ চলে না—রাত্রিতেই ধীর মন্থর গতিতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। দিনেরবেলা মোটর চলে বলিয়া এখানকার পথ চলার নিয়মই এই।

কাশ্মীর বাস্তবিকই একটা স্বপ্নরাজ্য এটা যেন সত্যি "স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" ঠিক সন্ধ্যার
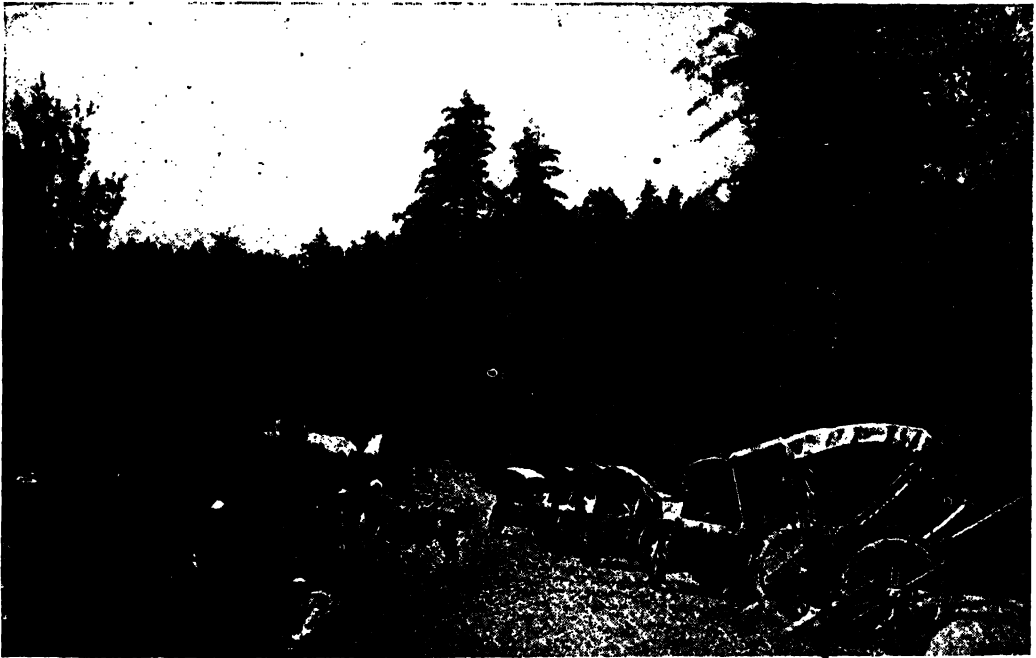
পথের দৃশ্য

একটী চমৎকার ডাকবাংলো আছে। কাশ্মীর যাত্রীগণ পথে এই ডাকবাংলোয় একরাত্রের জন্য সকলেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পরদিন সকালে উঠিয়া যখন শ্রীনগরের দিকে মোটর চলিতে আরম্ভ করে তখন চারিদিকের সৌন্দর্য্যে প্রাণমন একেবারে ভরিয়া যায়। ঝেলাম নদীটি এখান হইতেই শ্রীনগর পর্য্যন্ত পথিকের সঙ্গ লইয়া থাকে। পথের পাশে পাশে দেখা যায় মান্ধাতার আমলের সেই গরুর গাড়ীগুলি পূর্ব্বে যখন মোটর যাইয়া শ্রীনগরের দ্বারে পর্য্যটককে নামাইয়া দেয় তখন হঠাৎ বুঝিতেই পারা যায় না—একি পৃথিবীতেই আছি, না আর কোথাও পৃথিবীর বাইরে কোনও দেবলোকে চলিয়া আসিয়াছি! ঝেলাম নদীর বুকে অসংখ্য ভাসমান আবাস-তরী—তাহাদের ভিতর হইতে অগণিত দীপ শিখা ঠিক যেন এক প্রকাণ্ড আলোর মালা রচনা করিয়া দর্শকের দৃষ্টিপথে পড়িয়া বিভ্রম জন্মাইয়া দেয়।

এখানকার আশ্চর্য্য জিনিষ এই—তীরে যেমন মানুষ গৃহ

নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়া থাকে,জলের উপরও কাঠের ভাসমান নৌকাগৃহে এখানকার অধিকাংশ লোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। প্রথম দিন সন্ধ্যার নির্জ্জন অন্ধকারে মনে হইয়াছিল যেন দ্বিতীয় একটা রাজধানী ঝেলামের জলে ভাসিতেছে!

স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইত যদি না পরদিন সকালে প্রকৃত কাশ্মীরের ছবিটা চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। দরজা জানালা খুলিয়া দিতেই এখানে ভোরের আলো আসিয়া করিয়া মোটে একটা সিগারেট ধরাইয়াছি অমনি দেখি জানালা দিয়া আমার একটা নূতন কাশ্মীরি বন্ধু উঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন! আশ্চর্য্য এই, এখানকার অপরিচিত কেহ আসিয়া দেখা করিতে চাহিলে বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাক-হাঁক করা কিম্বা কার্ড পাঠাইয়া খবর দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সে সটান আসিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া "সেলাম সাহেব" বলিয়া আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করে এবং কি জিনিষ সে দেখাইতে আনিয়াছে তাহাও তখনি সে বলিয়া
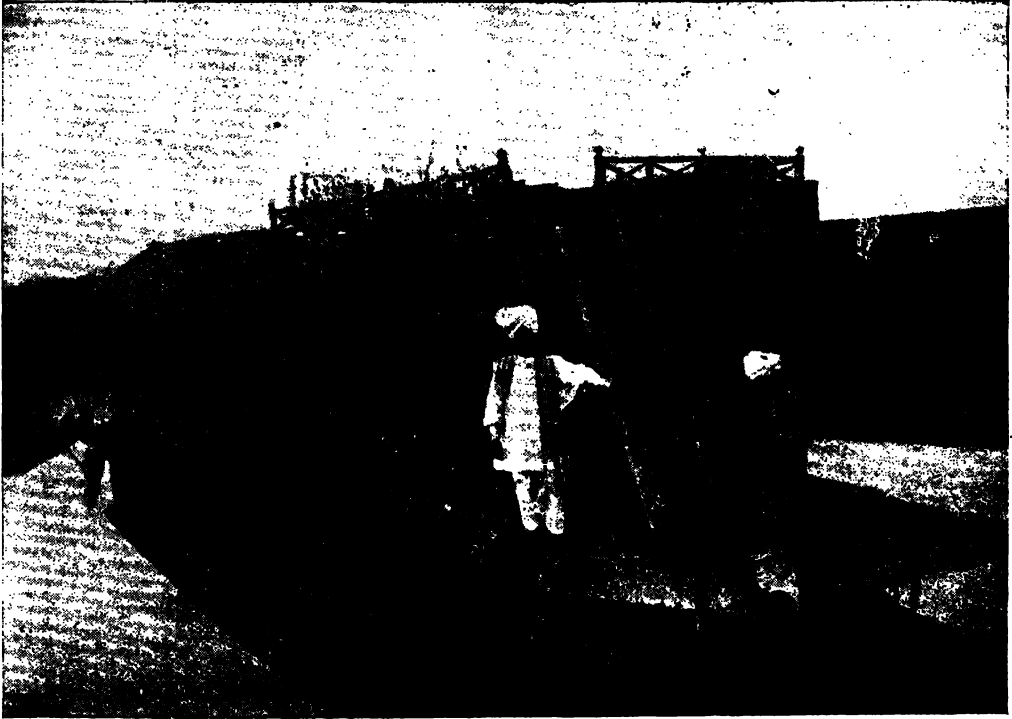
ভাসমান আবাস তরী

চোখে অঞ্জন পরাইয়া যায়—স্নিগ্ধ বাতাস সর্ব্ব অঙ্গে কোমল পরশ বুলাইয়া দিয়া যায়—বাহিরের নির্ম্মল নীলাকাশ ডাকিয়া বলে—এ তোমার মর্ত্ত্যলোক নয়, এযে ভূতলে অমরাবতী!

নূতন কোন ব্যক্তি কাশ্মীর দেখিতে আসিয়াছে দেখিলেই এখানকার নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া দরজায় ভোর হইতেই হানা দিতে আরম্ভ করে। আমি সকালে শয্যাত্যাগ ফেলে। কেহ কাশ্মীরি শাল লইয়া হাজির, কেহবা কাঠের নানাবিধ চারুশিল্প দ্রব্য লইয়া উপস্থিত, কেহ নানাবিধ শীতবস্ত্র লইয়া সেলাম ঠুকিতেছে। বলিতে কি, কাশ্মীরে আসিলে এবং এইরূপ নানাপ্রকার লোভনীয় দ্রব্য দেখিলে মনে হয়—হায় রে! আমি যদি কোটিপতি হইতাম!

এখানকার বিশেষত্ব এই—মানুষ এখানে উভচর হইয়া গিয়াছে—জলেও বাস করে, ডাঙ্গায়ও কাজ করিয়া ঘুরিয়া
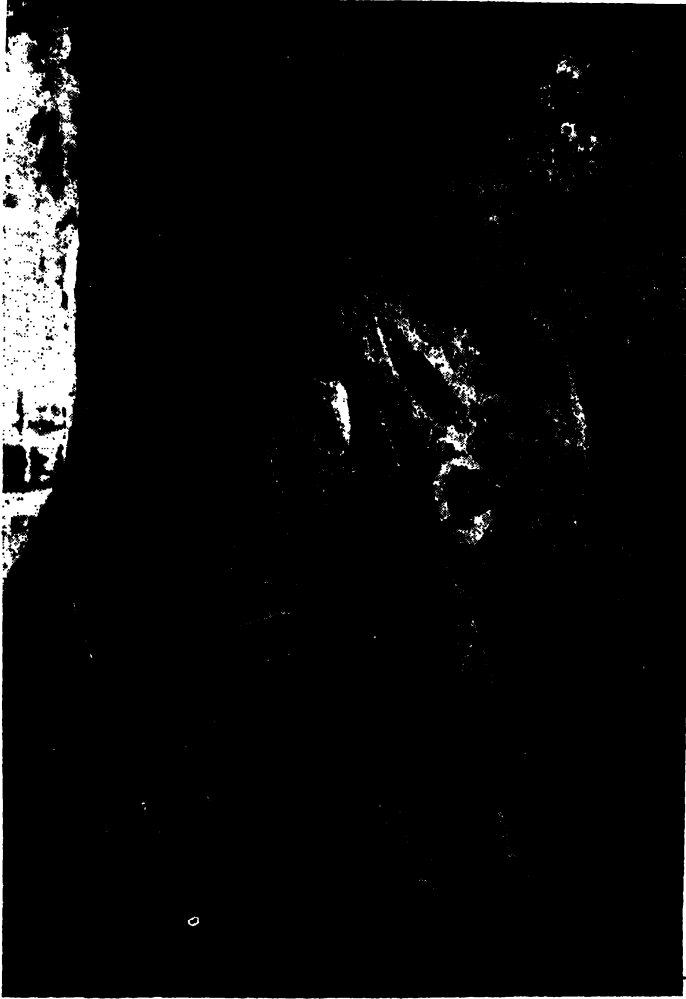
কাশ্মীরি বালিকা

বেড়ায়! যে সকল কাঠের নৌকায় মানুষ বাস করে সেগুলি অতি চমৎকার—ঠিক মনে হয় যেন ঘরবাড়ী লইয়া নদীর জলে ভাসিয়া চলিয়াছে। আমাদের নৌকা-গৃহটীর নাম ছিল "রাইনা।" রাইনার ভিতরে ৪টী কক্ষ এবং সুপ্রশস্ত বারান্দা আছে! তাছাড়া একটী সুন্দর পরিপাটি বৈঠকখানা ঘর, তাহাতে চারিটি বেতের আরাম কেদারা এবং এক-কোণে একটী ছোট টেবিল চিঠিপত্র লিখিবার জন্য সজ্জিত আছে। ঘরগুলি সবই কাশ্মীরি কার্পেটে মোড়া। রান্না ঘরটী সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অপর একটী নৌকার ভিতর এবং এই নৌকাটী আমাদের রাইনার সাথে দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। ঐ রান্নার নৌকাতেই অপর অংশে মাঝি তাহার পরিবার লইয়া বসবাস করে। বর্ষা শেষে কাশ্মীর অতি অপরূপ শ্রী ধারণ করে। যাহারা বর্ষান্তে এই কাশ্মীরে আসিয়া একবার জলে বাস করিয়া গিয়াছে তাহারা জীবনে কখনো সেই সুখ-স্মৃতিটুকু ভুলিয়া যাইতে পারিবে না।

কাশ্মীরের আরো একটী অতুলনীয় সম্পদ আছে—তাহা এখানকার সরল শ্রীমণ্ডিত অনিন্দ্যনীয় নারীসম্প্রদায়। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পাশে এই নারীসৌন্দর্য্য

দেখিয়া যে মুগ্ধ বিমোহিত না হয় সে অতি কৃপার পাত্র, তাহার অন্তরে অন্তরচক্ষু জাগ্রত থাকিলে এই বিধাতাসৃষ্ট সৌন্দর্য্যের স্বাদ সে না পাইয়া থাকিতেই পারিবে না। শিল্পী যে, সে এখানে আসিয়াই তুলিকা হস্তে আদর্শ সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি আঁকিয়া লইতে বসিয়া যাইবে। কুমারী কিশোরীদের শুভ্রোজ্জ্বলকান্তি, তাহাদের টানাটানা চোখের কোমল সরল দৃষ্টি বিদেশাগত পথিকের মন অতি সহজেই আকৃষ্ট করে—মুগ্ধ করিয়া দেয়। আর বয়স্কা, যৌবনদৃপ্তাদের নয়নবাণের কথা না হয়—নাই বলিলাম।

এখানে পর্দ্দাপ্রথা প্রচলিত নাই এবং সে জন্যই কাশ্মীরের নারীসৌন্দর্য্য হইতে পৃথিবীর কোন জাতি আজ বঞ্চিত নয়। যে আসিবে সে ইহাদের অনাবিল সৌন্দর্য্যসুধা পান করিয়া এখান হইতে পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতে পারিবে। রমণীরা এখানে পথে ঘাটে বাহির হইয়া থাকে—তাহাদের চালচলনে কোন দৃষ্টিকটু আড়ষ্ট ভাব নাই অথচ কোমল বিনীত সলজ্জভাবটুকু—যাহা রমণী চরিত্রের প্রধান অবলম্বন তাহা ইহাদের যথেষ্ট আছে।

সাধারণ রমণীদের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর মহিলাগণ একটু অধিক লজ্জাশীলা কিন্তু দেবমন্দিরাদিতে পূজার্চ্চনা করিতে সকলেই যাইয়া থাকেন। পুষ্পঅর্ঘ্য হস্তে, স্নাত, পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিহিতা, সমুন্নত-দেহা, বিম্বাধরা সেই পূজানীরতা কাশ্মীরি রমণীদের দেখিলে মনে হয় যেন মর্ত্ত্যের প্রাণী ওরা নয়—কোন্ দূর স্বর্গলোক হইতে যেন পৃথিবীর বুকে কক্ষ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে! উঁহারা পূজা দিতে যেন আসে নাই—পূজা লইতেই আসিয়াছে! বাস্তবিক তাহাদের সরল মুখচ্ছবিতে এমনি একটা ভাব মাখান আছে যে প্রাণ আপনা হইতেই পূজা করিতে সাগ্রহে ছুটিয়া যায়। কাশ্মীরে গিয়াছিলাম—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি দেখিয়া জীবন সার্থক করিয়া আসিয়াছি।

মুষ্টিযোগ

স্ত্রী কি পছন্দ করেন না?

তিনি রান্নাবান্না করাটাকে একমাত্র করণীয় কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন না।
" সন্তান পালন-দায়িত্ব, দুঃখ একাকী বহন করা পছন্দ করেন না।
" স্বামীর অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকা " " "
" স্বামীর অধিকমাত্রায় থিয়েটার প্রীতি " " "
" স্বামীর সস্ত্রীক-ভিন্ন থিয়েটারে যাওয়া আদৌ " " "
" মাহিনার টাকা স্বামীর বাক্সে উঠে, ইহা " " "
" স্বামীর অতি-নিয়মিত অফিস যাওয়া " " "
" সপ্তাহে একটিমাত্র রবিবার—ইহা " " "
" স্বামী কুম্ভকর্ণের নিদ্রাত্ব গ্রহণ করেন ইহা " " "
" স্বামীর ব্রত-কার্য্যে ও ধর্ম্মে-কর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, কেবল তাঁহার মৌনব্রত অবলম্বন " " "
" স্বামীর কাঞ্চন-বিদ্বেষ " " "
" বিশেষ করিয়া—ছিপ, তাস, পাশা, হার্ম্মোনিয়ম, বাঁয়া, তবলা, বাঁশী " " "
" পাকা চুল কৃত্রিম দাঁত, চশমা, মোটা লাঠি (ছড়ি নয়) একেবারেই " " "
" যে স্বামী তাঁহার পছন্দ মত কার্য্য না করেন তাঁহাকে " " "

জীবনের আদর্শ

[শ্রীস্বরুচি বালা রায়]

বর্ত্তমান সময়ে সমাজ সংস্কার, রাষ্ট্র সংস্কার, ধর্ম্ম সংস্কার ইত্যাদি সকল কিছুকেই আশ্রয় করিয়া ভারতে মস্ত একটা আলোড়ন দেখা দিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটী বিভিন্ন বিষয় নিয়াই দেশের বুকে যে একটা বিদ্রোহের বন্যা, কোথাও বা গা-ঢাকা দিয়া কোথাও বা প্রকাশ্য ভাবেই বহিয়া চলিয়াছে তাহা কাহারও আজ অবিদিত নাই। ইহার মীমাংসায় সমস্ত বিশ্ব আজ তাহার সকল যুক্তি, সকল পরামর্শ এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াও কোনদিক দিয়াই কোন কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না—চারিদিকে খট্‌কা কেবল বাড়িয়াই উঠিতেছে।

ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নতুন কিছু গড়িবার উদ্দেশ্যে মানুষের প্রকৃতি আজ উচ্ছল উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই কর্ম্ম পিপাসু উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির সর্ব্বনাশের পথ রোধ করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিবার মত যে একটা বিরাট আশ্রয় বা আদর্শের প্রয়োজন, সে আদর্শ মানুষের আজ কই? পশ্চিমের সম্মোহনে ভুলিয়া ভারত একদিন তার যে নিজস্বটুকু কালের স্রোতে প্রায় ঢালিয়া দিয়াছিল, আজ তাহারই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে নিষ্পেষিত হইয়া সহসা জাগিয়া উঠিয়া সে আবার তাহার পুরাতন স্মৃতি-মন্দিরে ফিরিয়া আসিতে চায়—কিন্তু বহুদিনের অব্যবহারে তাহার কুটীর আজ যে দৈন্য দশায় পরিণত হইয়াছে, তাহার সে হারানো রূপ ফিরিয়া পাইতে মানুষের যে কঠোর সাধনার দরকার, তাহার সে শক্তির আদর্শ আজ কোথায়?

সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশ জুড়িয়া আজ রব উঠিয়াছে—যে জাতির জীবনধারণের উপায় এবং তাহার মাপকাঠি যত উচ্চ সে জাতি সে পরিমাণে তত সভ্য; কিন্তু এই যে উপায়টী নির্দ্ধারণ করা, মানুষের সেখানেই গোলযোগ সবচেয়ে বেশি। কল্পনার দৃষ্টিতে এই মায়া-মরীচিকারূপ উপায়টীর পিছনে মানুষের মন কেবল উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়াই মরে, কিন্তু ইহার সত্যকার সন্ধান কোথাও মিলে না, এবং একই জায়গায় আসিয়া দলের পর দল পরস্পরে শুধু নূতন নূতন সংঘর্ষণে আপনাদের মানসিক এবং সামাজিক বিরোধ কেবল বাড়াইয়াই তোলে। কিন্তু ইহারই মধ্যে ক্বচিৎ এমন এক একজন সত্যকার মানুষের আবির্ভাব ঘটে যাঁহার শক্তির প্রভাব মানুষের জীবনের উপর একটা বড় রকমের কাজ করিয়া যায়। মানুষের এই দিকের ইতিহাসে ধর্ম্ম-সংস্কারের দিক দিয়া যে দুইজন স্বর্গীয় মহানুভবকে সর্ব্ব প্রথমে আমাদের চোখে পড়ে তাঁহাদের একজন রামমোহন রায় আর একজন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। আবার সমাজ সংস্কার বা কর্ম্মজীবনের মাঝে আমাদের জীবনকে যাঁহার স্মৃতি প্রতিনিয়ত উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তোলে, যাঁহার কর্ম্ম কোনো দেশ বিভাগ কিম্বা কোনো জাতি বিশেষকে নিয়াই ব্যাপৃত থাকিতে পারিত না, তরুণ জীবনের উপর যাঁহার প্রভাব শতধারে আপনার শক্তি বিকীর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতে থাকে—তিনি স্বামী বিবেকানন্দ।

সর্ব্বোপরি প্রেম এবং তাহার পর কর্ম্মদ্বারা মানুষ মানুষের মনের উপর যে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। মানুষের জটিল তর্ক-বিতর্ক, তাহাদের সিদ্ধান্তেই পরিসমাপ্তি লাভ করে, কিন্তু প্রেমের গৌরব এবং কর্ম্মের গুরুত্ব যুগে যুগে স্মরণের পথ দিয়াও মানুষকে মানুষ হইবার উপাদান যোগাইয়া চলে। এবং এই জন্যই শ্রীচৈতন্য এবং কৃষ্ণের প্রেমধারা আজিও একটা জাতির অন্তরতলে ফল্গুনদীর ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে; ন্যায় এবং অন্যায়ে, পাপ এবং পুণ্যে যেখানে নিত্য সংঘর্ষণ চলিয়াছে সেখানকার বিরোধের মাঝেও এ প্রেমের পরিচয় পাওয়া একেবারে বিরল নহে।

এই প্রেমে এবং কর্ম্মেই মানুষ পৃথিবীর সমুদায় সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র এবং এইখানেই তাহার অমরতা এবং অসমাপ্তি।

এই প্রেমে বা আসক্তিতে মানুষ তার নিজের মনে যে অনুভূতি পায়, তাহাতেই সে কর্ম্মের সন্ধান এবং কর্ম্মে শক্তি পাইয়া থাকে এবং এই আসক্তি হইতেই তাহার সহস্রবার চেষ্টা, সহস্রবার ভ্রম ও তাহার পুনরুক্তির সাধন হইয়া থাকে। এই ভ্রম এবং তাহার পুনঃসাধন যদি না থাকিত, মানুষের কর্ম্মের পরিমাপ তাহা হইলে ক্ষুদ্র হইয়া পড়িত, এবং মনুষ্য সমাজের ইতিহাস সেখানেই সমাপ্তি লাভ করিত। তরুণ জীবনের গঠনের প্রারম্ভে অতীতের ইতিহাস এবং সাহিত্যই তাই—মানুষের প্রধান খোরাকের যোগান দেয়। সাহিত্যে বা ইতিহাসে মানুষের চেহারা বা আকৃতি ফুটিয়া উঠে না সত্য কিন্তু ভ্রমের ভিতর দিয়া সাধনার পর তাঁহাদের যে সিদ্ধির পরিচয় আমরা পাই, আমাদের জীবনে তাহাই এক অপূর্ব্ব মন্ত্রৌষধির কাজ করে। সেইজন্য ঋষির পুণ্য তপোবনতলের অধ্যয়নরত ঋষিবালকগণের আকৃতি আমরা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের মনকে পুলকিত করিয়া তোলে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণ বা যুধিষ্ঠিরের দৈহিক রূপ আমরা দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের পূত চরিত্র গাথায় যে মূর্ত্তি আমাদের মানস চক্ষে ফুটিয়া ওঠে, জীবনে শিক্ষালাভের পক্ষে তাঁহাদের সে শিক্ষাই আমাদের যথেষ্ঠ। সারথি কৃষ্ণের রথ চালনায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়-বিয়োগ-বেদনায় অর্জ্জুনের সে অবসাদগ্রস্থ মূর্ত্তি চোখে আমাদের ফোটে না সত্য কিন্তু গীতার কাব্যে তাঁহাদের পরস্পরের যে কথোপকথন আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করে, শোকের দিনে তার চেয়ে সান্ত্বনা মানুষের আর কোথায়? রামের পিতৃভক্তি, ভরত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, সীতার চরিত্র গাথা যে শিক্ষা আমাদের দেয় বর্ত্তমানের মাঝে তেমন শিক্ষা কোথায় আমরা পাই? মানুষের জাতীয় জীবনে ইতিহাস বা সাহিত্যের মত বড় আদর্শ তাই আর অন্য কিছুই নয়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে আমরা প্রধানতঃ এইটাই দেখিতে পাই যে সেখানে সর্ব্বদাই গৃহধর্ম্ম পালনের কল্যাণ বন্ধন এবং অন্যদিকে আত্মাকে ত্যাগের কঠোরতার মাঝে মুক্তিদান, এই উভয়ের সংমিশ্রনই ভারতবর্ষের প্রধান বিশেষত্ব। ঋষিদের জীবনে আমরা কেবলমাত্র শুষ্ক কঠোর তপস্যাই দেখিতে পাই না, অরণ্যের গাছপালার প্রতি প্রীতিতে পুষ্প লতাপাতার প্রতি প্রাণের একটা গভীর আকর্ষণ, চঞ্চল পরাণ পশুপক্ষীর প্রতি প্রবল বাৎসল্যে এবং বল্কল পরিহিত ঋষিবালকগণের শ্রুতিমধুর সামগানের ভিতর হইতে তাঁহাদের শুষ্ক তপস্যায় সরসতার সঞ্চার করিত। ধর্ম্মকে তাঁহারা এমনি করিয়া আয়ত্বের মধ্যে পাইতেন এবং তাঁহাদের আত্মসংবৃত ভোগের কামনা ও প্রেম, শুধু আপনার চারিপার্শ্বস্থ এই কটিকে নিয়াই ভুলিয়া থাকিত না, সমস্ত বিশ্বে তাহাদের মাধুরী বিকীর্ণ করিয়া সার্থক হইয়া উঠিত। তাপস কুমারী শকুন্তলা, তপস্বিনী অরুন্ধতী বা অনসূয়া এমনই আশ্রম সংসারের ভিতর দিয়া মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে বিশ্বাস-নিষ্ঠ সরলতা ও ঋষি প্রদত্ত শিক্ষা তাঁহাদের জীবনকে সহস্র ঘাত প্রতিঘাত এবং শোকদুঃখের মাঝেও ক্ষমায় ধৈর্য্যে এবং কল্যাণে স্থির শান্ত রাখিত, পরবর্ত্তী জীবনে আমরা তেমন আর কোথায় দেখিতে পাই? ধর্ম্মকে ইঁহারা জীবনের মধ্যে অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, ধর্ম্মও তাই নিরন্তর তাঁহাদিগকে সম্পদে বিপদে আশ্রয় দান করিয়াই চলিত, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের এমন অচ্ছেদ্য সংযোগ কোথায় আর দেখিতে পাই? কিন্তু শুধু এই ঋষিদের জীবনেই নয়, গার্হস্থ্য জীবনেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাদের কোনো অকারণ লজ্জা, অহেতুক ভদ্রতা বা সভ্যতার ছলা-কলা কোথাও ছিল না, কিন্তু তথাপি সারাটা জীবনের ভিতর এমনই একটা সহজ সচ্ছন্দ গতি তাঁহাদের ছিল, যাহাতে তাঁহারা মরিয়াও অমর হইয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের যে আদর্শ সর্ব্বত্র তাঁহাদিগকে মাথা উঁচু করিয়া তুলিয়া রাখিত—সে আদর্শ পরবর্ত্তী জীবনে কোথায়?

কিন্তু এই মানুষ হইতে অতিমানুষ হইবার একটা প্রবল আকাঙ্খা যখন হইতে সমাজের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, তখন হইতেই অমরতা ঘুচিয়া আমাদের মধ্যে মরণ আসিয়া পড়িল এবং নিয়মের নাম করিয়া বহুসংখ্যক অমঙ্গল আসিয়া আমাদের জীবনকে ক্রমে ক্রমে যে শ্রীহীন নির্জ্জীবতা দান করিল, উহা এই অধঃপতিত জাতির মূর্চ্ছাবস্থা মাত্র। সমাজ সমাজ এবং সামাজিক আদর্শ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে

চীৎকার করিয়া যে সমস্ত আইন কানুন বিশেষজ্ঞরা সমাজের ভিতরে ঢুকাইয়া দিলেন, দিনে দিনে ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া সেই আইন কানুনই শুধু বজায় রহিল এবং যাহার জন্ম এ আইন, অত্যন্ত কঠোরতার পেষণে সে-ই শুধু বিনষ্ট হইয়া মারা পড়িল; শূন্য মন্দিরের ভিতর জাঁক জমক অর্চ্চনার বিধি ব্যবস্থা পূরাদমেই চলিল, কেবল যাঁহাকে অর্চ্চনা, যাঁহার পূজার জন্য এ বিধি ব্যবস্থা তিনিই শুধু বিদায় লইলেন। নিয়ম সর্ব্বস্ব জাতির অধঃ-পতন এমনি করিয়াই সুরু হইল।

স্বাধীনভাবে মানুষ যাহা লাভ করে তাহাই তাহার যথার্থ পাওয়া, অবিচারে এবং অজ্ঞানে সে যাহা গ্রহণ করে তাহা সে কোনদিনই পায় না। এ দেশের অবস্থা ক্রমে তাহাই হইয়াছে, বিধি ব্যবস্থা এবং আচার বিচারের প্রতি মন দিতে গিয়াই, এ দেশের মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং সমাজ-নীতি সুকঠিণ হওয়াতে ধর্ম্মনীতি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। নীচ জাতিকে স্পর্শ করিলে আমাদের জাতির শুচিতায় কলঙ্কের দাগ পড়ে, কিন্তু এই নীচজাতি সুলভ অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক গুরুতর পাপ করিয়াও আমরা সমাজের চক্ষে প্রধান হইয়াই থাকি। কেননা পাপ করিয়া ভয়ের কারণও আমাদের বিশেষ কিছু নাই, আস্তাকুঁড়ে ময়লা ফেলিবার মত আমাদের পাপ ঝাড়িয়া ফেলিবারও সুস্থান আমাদের গুরুপুরোহিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সারা বছর পাপ করিয়া বৎসরান্তে একবার করিয়া তীর্থে ঘুরিয়া আসিলে কিংবা প্রয়াগ বা গঙ্গায় একটা ডুব দিলেই ব্যাস্—সারা বছরের পাপ ধুইয়া যায়! দেহ এবং মনকে দুইটা বিভিন্নভাগে ভাগ করিয়া দিয়া আমাদের গুরুরা দেশের যথেষ্ট সুবিধা করিয়াই দিয়াছেন। মন অনবরত পাপ করিয়া যাক্ না—দেহের কৃচ্ছ্রসাধনে সে পাপের আর তিলমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না।

এই ত আমাদের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ! তিথি নক্ষত্র দিন ক্ষণ লগ্ন প্রভৃতি প্রত্যেকটীকে বিচার করিয়া করিয়া দৈনন্দিন কাজে চলিতে পারিলেই আমাদের ধর্ম্ম বজায় থাকে, ইহার বেশী আর অধিক কিছু আমাদের দরকার হয় না।

শুধু ইহাই নয়, ভক্তি বিষয়ে নিয়ম আমাদের আরও অপূর্ব্ব! কবে কোনকাল হইতে যে আমাদের দেশে গুরু পুরোহিত পূজা পুরুষানুক্রমে আজিও চলিয়া আসিতেছে, তাহা ঠিক হিসাব করিয়া বলা যায় না। কিন্তু আমাদের এই অন্ধ ভক্তি ভক্তিভাজনের গুণ বা ক্ষমতা বিচার করিয়া চলে না, এবং ঠিক এই হিসাবে গুরু পুরোহিত হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত যে অশিক্ষিত অতিশয় নোংরা পাচক জাতীয় জীব এবং যমরূপী পাণ্ডাগণও সর্ব্বসাধারণ হইতে বহু উচ্চে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া চলে, কেননা দেবদ্বিজে ভক্তি এই ধর্ম্মে পতিত ধর্ম্মপ্রাণ জাতির ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ।

আমাদের এই অন্ধ-ভক্তি দেশের এই গুরু পুরোহিত শ্রেণীর কেবল ক্ষতিই করিয়া চলিয়াছে। ভক্তি যদি আমাদের আরও একটু কম হইত তাহা হইলে এই ভক্তি-ভাজনেরা মানুষ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে পারিত। আমাদের এই ভক্তির গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া তাহারা নিজেদের পাপপুণ্যকে এমনই ভাবে সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া উদাসীন হইয়া থাকিত না।

মোহান্ত নিয়া এই যে গোলমাল আমাদের দেশে প্রথম নহে এবং সম্প্রতি যে এমনই গোলমাল একটা চলিয়াছে ইহার জন্য প্রধানতঃ দোষী দেশের জন-সাধারণ। ইহাদের যে অসামান্য ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় উহারা দেবতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাতে উহাদের এই অবস্থা হইতে উন্নত হইবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না। যাহাদের কদাচারের তুলনা নাই, যাহারা সুবিচার হইলে প্রতিনিয়তই জেলে যাইবার উপযুক্ত, আমাদের ভক্তি যদি তাহাদের চোখ টিপিয়া ধরিয়া নিজের ভুল তাহাকে দেখিতেও না দেয়, সেই দোষ কি তবে ভক্তিভাজনের? না, যারা ভক্তি করে তাহাদের? এইরূপ ক্ষেত্রে ভক্তি-ভাজন বা ভক্ত কাহার দোষ যে কম বা বেশী তাহা বলা যায় না। অনুরাগের ভিতর দিয়া যে ভক্তির সৃজন হয় নাই, কেবলমাত্র দেশের অন্ধ নিয়ম প্রতিপালনই যা'দের লক্ষ্য—দোষ যে তা'দের কতখানি সে বিচার করিবে কে?

কিন্তু এমন ভাবে ধর্ম্মকে খাজানা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া রাখা কতদিন আর চলে? দেশে নব যুগের প্রারম্ভে যে নবজীবনের সূচনা দেখা দিয়াছে তাহাতে প্রেমের সঙ্গে ধর্ম্মের এবং উভয়ের সংস্পর্শে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া দেশজোড়া এই প্রকাণ্ড ফাঁকিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিক্ - এবং তাহাতে দেব দ্বিজের শূন্য কাঠাম ভাঙ্গিয়া গিয়া সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ে নূতন শিক্ষায় নূতন আদর্শে দেশে আবার সেই তপোবনের সামগীতি ঝঙ্কৃত করিয়া তুলুক।

আদর্শ কেহ কাহারও সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে পারে না, শিক্ষার আলো জ্বলিলে আদর্শ আপনিই সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

মায়ের দান

[শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

(১)

"দাদা"

একটি পাঁচ ছয় বৎসরের প্রিয়দর্শন বালক একখানি চালা-ঘরের মাটির দাওয়ার ধারে বসিয়া আছে। কিছু দূরে দাওয়ার উপর একখানি ছিন্ন মাছুরে বসিয়া উনিশ কুড়ি বছরের একজন যুবা এক মনে কি লিখিতেছে। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া শিশুটি ডাকিল "দাদা।"

কোন উত্তর না পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চকণ্ঠে আবার ডাকিল "দাদা।"

যুবক লেখা হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—"কেন রে পটলা?"

"আচ্ছা, মা-দুর্গা ছেলেদের বেশী ভালবাসেন, না বড়দের বেশী ভালবাসেন?"

অভিনিবিষ্ট যুবার কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না, সে অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—"হুঁ।"

"হুঁ কি? বলনা দাদা?"

যুবা এইবার মুখ তুলিয়া বালকের প্রতি চাহিয়া কোমল-কণ্ঠে বলিল—"গোল কোরো না ভাই। দেখছ না আমি লিখছি।"

"কি লিখছ দাদা? রোজ রোজই তো এই রকম লেখ। এ তো চিঠি নয়, চিঠি এত বড় বড় কাগজে লেখে না।"

"দরখাস্ত লিখছি। শোন, দরখাস্ত লেখবার সময় গোল করতে নেই। গোল করলে আমার ভুল হয়ে যাবে, ভুল হলে আর চাকরি পাব না, টাকা পাব না।"

"দরখাস্ত লিখলে চাকরি পায়, টাকা পায়? দূর। সেই পরশু একটা লিখেছ, তার আগে একটা লিখেছ, তার আগে লিখেছ। কৈ, টাকা তো পাও নি! আজ যে মাকে বলছিলে টাকা নেই।"

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

যুবক কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বলিল "থাম্, আবার কথা বল্লে বড্ড বকব।"

নিমেষে বালকের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল, সে কয়েক মূহূর্ত্ত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া দাদার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। ভাদ্র মাস। দাওয়ার নীচে বর্ষার জল জমিয়া কচুগাছের ঘন জঙ্গল হইয়াছে, সেখানে গোটা কয়েক ব্যাং হঠাৎ চীৎকার করিতে আরম্ভ করায় বালকের মন সেইদিকে আকৃষ্ট হইল এবং সে অচিরে তন্ময় হইয়া ব্যাং-দিগের কীর্ত্তিকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

যুবকটির নাম তারাপদ ভট্টাচার্য্য। তাহার পিতা কামাক্ষ্যানাথ ভট্টাচার্য্য এই চণ্ডীহাটি গ্রামে যজন যাজন করিতেন। চণ্ডীহাটি গ্রামখানি কলিকাতা হইতে পনের কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী কোন রেল-ষ্টেশন হইতে তিনক্রোশ দূরে। গ্রামখানি পূর্ব্বে বেশ সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু এখন ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন প্রায়। স্থানে স্থানে ভগ্নদশাগ্রস্থ পরিত্যক্ত বড় বড় বাড়ী পূর্ব্ব সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিতেছে। ম্যালেরিয়ার তাড়নায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, যাহাদের নিতান্তই অন্য কোথাও যাইবার উপায় নাই তাহারাই কেবল পড়িয়া আছে। তাহারা সকলেই সামান্য অবস্থার লোক।

এখন গ্রামে একমাত্র প্রিয়নাথ রায়ই বেশ সম্পন্ন ব্যক্তি। প্রিয়নাথ বাবুর বনিয়াদি বংশ এবং তিনি নিজে পশ্চিমের একজন বড় উকিল। কিন্তু তিনি দেশে থাকেন না, সপরিবারে পশ্চিমে বাস করেন। বৎসরান্তে পূজার সময় একবার মাত্র চণ্ডীহাটিতে আসিয়া দিন দশেক বাস করিয়া ধূমধামের সহিত দুর্গাপূজা সম্পন্ন করেন। কামাক্ষ্যা ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রিয়নাথ বাবুদের কুল পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার নিকট যে মাসহারা পাইতেন তাহাই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। যজন যাজন করিয়া জীবন যাপন করা কিরূপ কঠিন দাঁড়াইতেছে দেখিয়া কামাক্ষ্যানাথ তারাপদকে ইংরাজি লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। ছেলেটি ধীর, সুবুদ্ধি ও শিষ্ট। সে দুইটি পাস দিয়া কলিকাতায় এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাটি থাকিয়া কলেজে পড়িতেছিল, এমন সময় কলেরা হইয়া হঠাৎ কামাক্ষ্যানাথের মৃত্যু হইল।

কামাক্ষ্যানাথ কিছুই সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই সুতরাং তারাপদকে চাকরির চেষ্টা করিতে হইতেছে। চৈত্রমাসে পিতার মৃত্যু হয়, এটা ভাদ্রমাস। গ্রামের যাহারা কলিকাতায় কাজ করে তাহাদের নিকট ও কলিকাতার নানা স্থানে হাঁটাহাঁটি করিয়া, নানা আফিসে দরখাস্ত দিয়া এ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই। এদিকে সংসার চলা ক্রমেই দুরূহ হইয়া আসিতেছে, তারাপদ কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না।

সংসারে মা ও ছোটভাই পটল ছাড়া আর কেহ নাই—কামাক্ষ্যানাথের আরও দুই তিনটি সন্তান হইয়াছিল, তাহারা শৈশবেই কালগ্রাসে পড়িয়াছে। মায়ের জন্যই তারাপদর বড় কষ্ট। কামাক্ষ্যানাথের মৃত্যুতে তাঁহার শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তারাপদর ভয় হয় তিনি বেশিদিন বাঁচিবেন না। উপার্জ্জন করিয়া কবে মায়ের দুঃখ লাঘব করিবে ও ছোটভাইটিকে সুখে রাখিবে ইহাই তারাপদর একমাত্র চিন্তা। ছোটভাই পটলকে তারাপদ প্রাণের অধিক ভালবাসে, যাহাতে সে পিতার অভাব বুঝিতে না পারে তারাপদ সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করে। পটলের কোন কষ্ট হইয়াছে বুঝিলে তারাপদর মন কাঁদিয়া উঠে।

(২)

দরখাস্ত লেখা শেষ করিয়া তারাপদ দেখিল পটল গম্ভীরভাবে কচুবনের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার ভর্ৎসনায় বালকের অভিমান হইয়াছে মনে করিয়া তারাপদ তাহার কাছে যাইয়া বসিয়া, স্নেহমাখাস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "বসে বসে কি ভাবছিস রে?"

"ব্যাং দেখছিলাম দাদা। ঐ দেখ, ঐ গোদা ব্যাংটা কচু গাছে চড়তে যাচ্ছে আর পিছলে পড়ে যাচ্ছে, কি মজা!" বলিয়া শিশু হাত-তালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। আবার পরক্ষণেই কি মনে হওয়ায় জিজ্ঞাসা করিল "দুর্গাপুজো কবে দাদা?"

"বেশী দেরি নেই, কুড়ি একুশ দিন পরে পুজো হবে। সে খোঁজে তোর কি দরকার?"

সে প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা, মা দুর্গা আমায় ভালবাসেন?"

"বাসেন বৈ কি। সব ছেলেকে তিনি ভাল বাসেন।"

"তবে কেন তিনি আমার কথা শুনলেন না?"

"কি কথা রে ?"

বালক নিরুত্তরে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, অবশেষে তারাপদর পীড়াপীড়িতে অন্য দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "বাবাকে কেন নিয়ে গেলেন ? আমি কত কেঁদেছিলাম।"

তারাপদর চক্ষু ছাপাইয়া জল আসিল। গোপনে চক্ষুর জল মুছিয়া সে গম্ভীরভাবে বলিল "ও কথা ভাবতে নেই ভাই। মা দুর্গা সব কথা শুনতে পান, আর ছেলেদের খুব ভাল বাসেন। তারা যা চায় তা দেবার হলে দেন, না দেবার হলে দেন না। তুমি মার কাছে তেঁতুলের আচার খেতে চাইলেই কি খেতে দেন ?"

ইহা বলিয়া বালককে অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে কাতুকুতু দিয়া হাসাইয়া বলিল "চল্, সেই সিঙ্গি-মামার গল্প শুনবি চল্।"

সিঙ্গিমামার গল্প শেষ হইলে বালক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া গল্পটি পরিপাক করিল, তাহার পর বলিয়া উঠিল "মা দুর্গা যে সিঙ্গিতে চড়েন সে সিঙ্গি বেশ দেখতে—— আচ্ছা দাদা, মা দুর্গার কাছে এবার যা চাইব তা দেবেন ?

তারাপদ সহাস্যে বলিল "ওরে বাঁদর, গল্পটল্প শুনেও আবার সেই কথা ! মা দুর্গার কাছে কি ধন-দৌলত চাইবি বল তো ? একটি টুক্‌টুকে বৌ বুঝি ?"

"যাও—তুমি বড় দুষ্টু হচ্ছ। আমি বলব না।"

পটলের মাথাটি ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে তারাপদ বলিল "বল্ বল্।"

তখন দাদার কাণের কাছে মুখ লইয়া পটল চুপি চুপি বলিল "এই—এই—জুতো চাইব। গেল বারে পুজার সময় রায়েদের অজিত যেমন জুতো পরেছিল সেই রকম জুতো পরে পুজো দেখতে গেলে বেশ মজা হয় দাদা। মা দুর্গার কাছে এ কথা বল্লে পাপ হয় না ?"

বালকের কথা ও ভঙ্গিতে তারাপদর মন ব্যথিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল "আহা, নিতান্ত শিশু কোন জিনিষ পাবার ইচ্ছা হলে তার জন্য বায়না করাই স্বাভাবিক। বাবা থাকতে এক এক সময় এটা সেটার জন্য কি রকম জিদ ধরত, না পেলে কান্নাকাটি করে অস্থির করে তুলত। কিন্তু এই ক'মাসেই বুঝেছে যে আর সে দিন নেই, তাই মার কাছে কি আমার কাছে আব্দার না করে মা দুর্গার কাছে চাইবে স্থির করেছে। আবার কথাটি কত সসঙ্কোচে আমার কাছে বল্লে।" তারাপদর ইচ্ছা হইতে লাগিল এখনই যাইয়া পটলের জুতা কিনিয়া আনে। কিন্তু যেরূপ জুতা সে চায় তাহার দাম চার পাঁচ টাকা, এ টাকা কোথা হইতে আসিবে ? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে তারাপদ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে যেমন করিয়া হউক সে ঐরূপ জুতা কিনিয়া পটলকে পরাইয়া পূজা দেখিতে পাঠাইবে।

(৩)

পূজা আগত প্রায়। ইতিমধ্যে তারাপদ কয়েকবার কলিকাতা যাইয়া চাকরির বৃথা চেষ্টায় নানা স্থানে ঘুরিয়া রাত্রে বাড়ি ফিরিয়াছে। সকাল সাতটার সময় দুটি ভাত গলাধঃকরণ করিয়া তিন ক্রোশ হাঁটিয়া ষ্টেশনে যাওয়া, ভাদ্রের রৌদ্র মাথায় করিয়া কলিকাতায় সমস্ত দিন অনাহারে ঘুরিয়া বেড়ান, সন্ধ্যার পর ক্ষুৎপিপাসাকাতর পরিশ্রমক্লিষ্ট দেহে নৈরাশ্য প্রপীড়িত মনে তিন ক্রোশ হাঁটিয়া ষ্টেশন হইতে গ্রামে ফেরা, কয়েক দিনের এইরূপ অত্যাচারে তারাপদর স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার এই কষ্ট দেখিয়া তাহার মাতা ঠাকুরাণীর মনোকষ্টের সীমা নাই। এ জন্য তাঁহার মনে তিলমাত্র শান্তি নাই। তিনি প্রায় ভাবেন "আহা, বাছার নধর শরীর শুকিয়ে গেছে, মুখ কালীবর্ণ ধারণ করেছে। বাছা আমার বালক বৈ নয়, কোথায় আমোদ আহ্লাদ করে বেড়াবে, তা নয়, সংসারের ভার মাথায় নিয়ে রোজগারের জন্যে দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হে মা কালী, অনেক কষ্ট দিলে মা, আর যে দেখতে পারি না, এইবার একবার মুখ তুলে চাও।" এই ভাবিয়া তাঁহার চক্ষু দিয়া টপ টপ করিয়া জল পড়িতে থাকে।

পূজার আর তিন দিন বাকি। প্রিয়নাথ বাবু সপরিবারে দেশে আসিয়াছেন। তাঁহার সুপারিশ-পত্র লইয়া তারাপদ আজ কলিকাতায় ডাক বিভাগের একজন বড় কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। পূজার ছুটি আসিতেছে বলিয়া তিনি বড় ব্যস্ত ছিলেন, অধিক কথাবার্ত্তা বলেন নাই, তবে তারাপদর দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন

যে তিনি তাহাকে লইতে পারিবেন কি না তাহা শীঘ্রই চিঠি লিখিয়া জানাইবেন। এ পর্য্যন্ত তারাপদ যত জায়গায় চাকরির জন্য গিয়াছে সকল স্থানেই এক বুলি শুনিয়াছে "কাজ খালি নাই, কিছু হইবে না," আজ কর্ম্মচারিটির নিকট সামান্ত সদয় ব্যবহার পাইয়া তাহার মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

অপরাহ্ন কাল। তারাপদ বৌবাজার ষ্ট্রীট ধরিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে কত কাপড় জামা জুতার দোকান, পূজা উপলক্ষে নানা বর্ণের বিবিধ ধরণের সাড়ি জামা প্রভৃতির বাহার, কোন কোন দোকানে গ্লাস-কেসে সুসজ্জিত সিল্ক সাটিন ও জরির উপর বিদ্যুতের আলোক পড়িয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে। সকল দোকানে ক্রেতার ভিড়।

এই সকল দেখিয়া পটলের জুতার কথা তারাপদর মনে হইল। এ কথাটি সে এক দিনও ভোলে নাই। সে দুই দিন পূর্ব্বে তাহার কয়েকখানি পাঠ্য-পুস্তক বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় পটলার জন্ত জুতা কিনিয়া অতি সঙ্গোপনে তাহাদের বাহিরের ঘরে কুলুঙ্গিতে পুরাতন পঞ্জিকার গাদার পশ্চাতে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে। জুতা কেনার কথা সে মাকে পর্য্যন্ত জানায় নাই, পটলাকেও না। সে মনে মনে ফন্দি করিয়াছে যে ষষ্ঠীর দিন সে জুতা জোড়াটি বাহির করিয়া পটলাকে দিয়া বলিবে "এই দেখ, মা দুর্গা তোমার জন্য কি পাঠিয়ে দিয়েছেন!" তখন পটলার কি আনন্দই হইবে এবং মা যদিও এত টাকা দিয়া জুতা কেনার জন্য মুখে অনুযোগ করিবেন কিন্তু মনে মনে তিনি সুখী হইবেন। এই আনন্দের ছবি স্মরণ করিয়া তারাপদর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আজ মন প্রফুল্ল থাকিলেও তারাপদর চলিতে কষ্ট হইতেছিল। যখন সে শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেণে যাইয়া বসিল তখন তাহার অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে, শরীর শীত শীত করিতেছে, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা। ট্রেণ ছাড়িবার পরই তাহার প্রবল জর আসিল। গ্রামের ষ্টেশনে যখন ট্রেণ পৌছিল তখন তাহার চলিবার শক্তি নাই। সৌভাগ্যক্রমে সেই ট্রেণেই প্রিয়নাথ বাবুর গোমস্তা কলিকাতায় পূজার বাজার করিয়া চণ্ডী হাটিতে ফিরিতেছিল ও তাহার সঙ্গের জিনিস-পত্র লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে গরুর গাড়ী উপস্থিত ছিল। গোমস্তা তারাপদকে তাহার গরুর গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া বাড়ী পৌছাইয়া দিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া তারাপদ "মা, বড় জর" বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, এবং মধ্যে মধ্যে "জল" "জল" "মাথা যায়" বলিয়া সারা রাত্রি বড় ছটফট করিল। তাহার মাতা পুত্রের শিয়রে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়া সে রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইলেন।

দুই দিন তারাপদর সমভাবে কাটিল এবং দুই রাত্রিও তাহার মাঝে একরূপ অনিদ্রায় যাপন করিতে হইল। পুত্রের অসুখে তাঁহার দারুণ অশান্তি হইলেও তাহার ম্যালেরিয়া জর হইয়াছে মনে করিয়া তিনি অত্যধিক উদ্বিগ্ন হন নাই। কিন্তু তৃতীয় দিনে তারাপদ বেহুঁস হইয়া পড়িল, ডাকিলে সাড়া দেয় না, দুই তিন ডাকের পর রক্তচক্ষু উন্মীলন করিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে, কথার জবাব দেয় না। ইহা দেখিয়া তারাপদর মাতার বুকের রক্ত শুকাইয়া গেল, তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। চেষ্টা করিয়া মন দৃঢ় করিয়া তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। ডাক্তার ডাকিতে হইবে কিন্তু ডাক্তারের বাড়ী অনেক দূরে, কে ডাকিতে যাইবে, কে ঔষধ আনিয়া দিবে? রায়েদের বাড়ী সকলে দুর্গোৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত, তাহা ছাড়া বড়লোকের বাড়ীর লোক কে গরিবের জন্ত কষ্ট স্বীকার করিতে রাজি হইবে? নিকটেই এক বৈরাগী বুড়া থাকিত, তারাপদর মাতার সানুনয় অনুরোধে সে গজগজ করিতে করিতে ডাক্তার ডাকিতে গেল, ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি আসিবার জন্ত তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

তখন চারিদিকে ইনফ্লুএঞ্জা হইতেছিল বলিয়া ডাক্তারের অবসর ছিল না। তিনি যখন আসিলেন তখন বিকাল বেলা। রোগী পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বাড়ীতে পুরুষ কেউ নেই?"

তারাপদর মাতা ঘোমটা দিয়া রোগীর শিয়রে বসিয়াছিলেন, তিনি মাথা নাড়িয়া জানাইলেন যে কেহ নাই।

"তাই তো, একজন কেউ থাকলে ভাল হ'ত।" তাহার

পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "রোগীর অবস্থা বেঁকে দাঁড়িয়েছে কিনা, রোগ বড় শক্ত, রোগী বড় দুর্ব্বল।"

তারাপদর মাতা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিয়া উঠিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন "ডাক্তার বাবু, আপনি আমার বাপ, আমার ছেলেকে বাঁচান। আমার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই, কেউ সহায় নেই।"

ডাক্তারটি যুবা, এখনও তাঁহার চিত্ত কঠিন হইয়া যায় নাই, তাঁহার হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি স্বার্থপূর্ণসংসারের সংস্পর্শে এখনও মুছিয়া যায় নাই। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া সজল নেত্রে বলিলেন "মা, আমার যতটুকু সাধ্য আছে করব। আপনার তো লোকজন নেই, আমি গিয়ে আমার কম্পাউণ্ডারের হাতে ওষুধ পাঠিয়ে দেব। কম্পাউণ্ডার আজ রাত্রিটা এখানেই থাকবে। সেই রোগীর ভার নেবে, ওষুধ-পথ্য খাওয়াবে। আপনাকে ওসব কিছু করতে হবে না। আপনার ওরকম উতলা হলে চলবে না, আপনার ওরকম ভাব দেখলে রোগী ভয় পাবে। আমি চল্লাম, কাল সকালে আবার আসব।"

ভিজিটের টাকা না লইয়াই ডাক্তার চলিয়া গেলেন। পুত্রের মাথাটি কোলে লইয়া তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মা বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে কি ঝড় বহিতে লাগিল তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই।

তারাপদ মৃদুস্বরে অসংলগ্ন কথা বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন "তারাপদ, কি বলছ বাবা?"

তারাপদ বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বলিল "জুতো চাই। ছোট জুতো। সিজিমামার জুতো।"

মা তারাপদর চিবুক ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "ওসব কি বলছ বাবা?"

তারাপদ এক-ঘেয়ে স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিল "জুতো আছে? নিদেন একটা দে।"

এমন সময় কম্পাউণ্ডার দুই তিনটা ঔষধের শিশি লইয়া প্রবেশ করিয়া বলিল "ওকি করছেন? ওকে বকাবেন না। কোল থেকে মাথা নাবিয়ে বালিসে রাখুন, নাড়াচাড়া করবেন না।"

সে একবার তারাপদর নাড়ী দেখিল, তাহার পর তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া ক্ষিপ্রহস্তে ঔষধের শিশি, জলের গ্লাস, থার্ম্মোমিটার প্রভৃতি গুছাইয়া লইয়া পাখা হস্তে রোগীর কাছে বসিয়া তারাপদর মাতাকে চটপটভাবে বলিল "আমি জেগে রইলাম, আপনি এইবার একবার শুয়ে পড়ুন। আপনার বিশ্রাম দরকার। আমি তো রইলাম, আপনার ভাবনা কি? দরকার হলেই আপনাকে ডাকব।"

মা কোন কথা না বলিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া প্রস্তর-মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন। এখন তারাপদর প্রলাপ বকা বন্ধ হইয়াছে, সে আর ছটফট করিতেছে না, নিশ্চল-ভাবে শুইয়া আছে।

মা কম্পাউণ্ডারকে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁ বাবা, এখন কি ও একটু ভাল আছে?"

কম্পাউণ্ডার দুইবার ঢোঁক গিলিয়া, একবার গলা শানাইয়া লইয়া বেশ সপ্রতিভভাবে বলিল "হ্যাঁ মা, ওষুধটা খেয়ে শরীরের যন্ত্রণাগুলো কমেছে কি না, ভাল আছে বলেই তো মনে হচ্ছে। আমাদের ডাক্তারবাবুর এই ওষুধটা ইন্‌ফ্লুএঞ্জা রোগে ভারি উপকার করে। কৈ মা, আপনি শুলেন না? আপনি নাই ঘুমুলেন, শুয়ে হাত পা গুলো একটু জুড়িয়ে নিন।"

তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তারাপদর মাতা তারাপদর অদূরে, তাহার মুখ দেখিতে পান এইরূপ স্থানে শয়ন করিলেন। তিনদিন অনিদ্রায় কাটিয়াছে। অচিরে সর্ব্ব-সন্তাপ-হারি নিদ্রা আসিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য তাঁহার সকল দুঃখ-কষ্ট হরণ করিল।

কম্পাউণ্ডার বসিয়া ঢুলিতে লাগিল। রোগীকে দুইবার ঔষধ খাওয়াইয়া সে একটু বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়া পা ছড়াইয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মাথা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল ও মৃদু নাসিকা-ধ্বনি হইতে লাগিল।

(৪)

তারাপদ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল মা অদূরে শুইয়া আছেন, এদিকে একজন দাড়িওয়ালা লোক

দেয়ালে ঠেস দিয়া ঘুমাইতেছে, তাহার কাছে দুই তিনটা ঔষধের শিশি থার্মোমিটার ইত্যাদি রহিয়াছে। তাহার অসুখ করিয়াছিল, শরীরে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছিল। এখন কিন্তু তাহার শরীর একেবারে ঝরঝর করিতেছে, দেহে কোন কষ্ট বা গ্লানি, এমন কি দুর্ব্বলতা পর্য্যন্ত নাই। একটা আরাম ও স্ফূর্ত্তির হিল্লোল তাহার শরীরের মধ্যে খেলিতেছে। জানলা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, অন্ধকার পাতলা হইয়া আসিয়াছে। ঘরের এক পাশে পটলকে ঘুমাইতে দেখিয়া তাহার জুতার কথা মনে হইল। পূজা কবে? অমনি তাহার মনে হইল রাত্রি প্রভাত হইলেই সপ্তমী পূজা – কি করিয়া এ কথাটা জানিতে পারিল তাহা তাহার খেয়াল হইল না। তাহার মনে হইল জুতা জোড়াটি বাহিরের ঘর হইতে আনিয়া পটলের মাথার শিয়রে রাখিয়া দেওয়া যাক, ঘুম ভাঙ্গিলেই দেখিতে পাইবে, তখন না জানি পটলের কত আনন্দই হইবে। তখন তারাপদ পটলকে বলিবে "দেখলে তো, মা দুর্গাকে ডাকলে তিনি শোনেন কি না?"

তারাপদ জুতা আনিতে বাহিরের ঘরে চলিল। চলিতে তাহার লেশমাত্র কষ্ট বোধ হইতেছে না, বরং শরীর বেশ লঘু বোধ হইতেছে। শেষ রাত্রি কি সুন্দর! আকাশে অধিক নক্ষত্র নাই, শুকতারা জলজল করিয়া জলিতেছে। কিছুক্ষণ উঠানে দাঁড়াইয়া তারাপদ সুষুপ্ত জগতের শোভা উপভোগ করিল।

বাড়ীর ভিতরদিকের দরজা দিয়া তারাপদ বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল। কুলুঙ্গির কাছে দাঁড়াইয়া সে পঞ্জিকাগুলি সরাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "তারাপদ"।

তারাপদ ফিরিয়া দেখিল একজন অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার প্রশান্তমূর্ত্তি, দীপ্ত মুখশ্রী, স্নিগ্ধ দৃষ্টি।

তারাপদ আশ্চর্য্য হইয়া অপরিচিতের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কে? এখানে কি করছেন?"

লোকটি স্নেহার্দ্র স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন "তোমায় নিতে এসেছি তারাপদ। আমার সঙ্গে চল।"

কি জানি কেন তারাপদর মনে হইল ইনি তাহার আপনার জন, তাঁহার প্রতি তারাপদর মন আকৃষ্ট হইল। কোনরূপ দ্বিধা তাহার মনে হইল না, সে বলিল "আপনার সঙ্গে যেতে হবে? বেশ, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ীর ভিতর থেকে চাদরখানা গায়ে দিয়ে আসি।"

লোকটির মুখে করুণামাখা হাস্য ফুটিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "চাদর গায়ে দিতে যাবে? কি হয়েছে বুঝতে পারছ না?"

তারাপদ একটু চিন্তা করিয়া বলিল "না,—কি হয়েছে?"

লোকটি বলিলেন "আমার সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে চল। বাড়ীর মধ্যে গেলে বুঝতে পারবে কি হয়েছে।"

যন্ত্র চালিতের মত তারাপদ তাঁহার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর চলিল। দেখিল পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়া আসিতেছে।

শয়ন-ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া লোকটি তারাপদকে ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিতে বলিলেন। তারাপদ দেখিল ওই মা শুইয়া আছেন, এক ধারে পটলা ঘুমাইতেছে, দাড়িওয়ালা লোকটি দেয়ালে ঠেস দিয়া নাক ডাকাইতেছে, আর বিছানার উপর আড়ষ্টভাবে পড়িয়া—ও কে? সে নিজে!

তারাপদর মনের মধ্যে যেন শত বৃশ্চিক একত্রে দংশন করিল, তাহার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। সে বসিয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল "আমি যাব না, যাব না। মাগো জগজ্জননী, আজ তুমি আনন্দময়ীরূপে পৃথিবীতে আসছ, আজ আমার দুঃখিনী মাকে পুত্রহারা কোরো না।"

সহসা তারাপদর চৈতন্য-লোপ হইল।

(৫)

রায়েদের বাড়ী বাজনা বাজিয়া উঠিল। সে আওয়াজে তারাপদর মা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। তাড়াতাড়ি তারাপদর কাছে যাইয়া তাহার কপালে হাত দিতেই তারাপদ চক্ষু খুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিল "মা"।

ব্যগ্রভাবে মা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ বাবা? একটু ভাল বোধ করছ কি?"

তারাপদ ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "মা, ক্ষিধে।"

মা যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাড়াতাড়ি কম্পাউণ্ডারকে উঠাইয়া দিয়া পথ্য প্রস্তুত করিতে গেলেন। কম্পাউণ্ডার রোগীর নাড়ি ও সাধারণ অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, সে মনে মনে বলিতে লাগিল "এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার তো কখনও দেখি নি।" সে তারাপদকে বল-কারক ঔষধ দিল, তাহার পর কিছু পথ্য খাইয়া তারাপদ সুস্থভাবে ঘুমাইতে লাগিল।

প্রত্যুষে ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। হর্ষোৎফুল্ল মুখে বলিলেন "মা, ভগবানের কৃপায় বিপদ কেটে গেছে, এখন দিন কতক সাবধানে ঔষধ পথ্য দিলে আর রোগীকে নাড়াচাড়া না করলে সেরে উঠবে।"

বেলা হইলে যখন তারাপদর ঘুম ভাঙ্গিল তখন সে যেন নূতন মানুষ। সে প্রথমেই পটলকে কাছে ডাকিয়া বাহিরের ঘরের কুলুঙ্গি হইতে জুতার বাক্স আনিতে কহিল। ক্ষণপরে জুতার বাক্সটি বুকে করিয়া পটল আনন্দদীপ্ত মুখে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল "মা, আমার জুতো, ওমা আমার জুতো।"

আনন্দের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পটল বলিল "দাদা, বাইরের ঘরে জানালার কাছে এই চিঠিখানা পড়ে ছিল।"

তারাপদ দেখিল একখানা বড় সরকারি লেফাফা; তাহার উপরে ছাপা Posts and Telegraphs. তারাপদর মাতা তাহার কথামত লেফাফা ছিঁড়িয়া তাহার মধ্যের পত্রখানা খুলিয়া তারাপদর সম্মুখে মেলিয়া ধরিলেন। চিঠিখানি দুই তিন বার পড়িয়া তারাপদ চক্ষু বুঁজিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার দুর্ব্বল কম্পিত হস্তখানি মাতার চরণের উপর রাখিয়া বলিল "মা, আমার চাকরি হয়েছে।"

বিসর্জ্জন

মশক কয় প্রকার?

চার প্রকার। বনের মশক, পুলিশ-মশক, সিবিলান-মশক, মন্ত্রী মশক।

কাহার কি কার্য্য?

চার জনেরই কার্য্য—রক্ত শোষণ। প্রথম জন, অল্প-অল্প শোষে; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মানুষকে, জাতিকে, দেশকে নিঃশেষ করে। বনের মশককে পার আছে, ধোঁয়া দিলে, ধুনা পুড়াইলে, কেরোসিন ঢালিলে নিস্তার পাওয়া যায়। শেষের তিনজন—স্বয়ং যম। তাহাদের মরণ নাই।

[দূরে বিজয়ার বাদ্য বাজিয়া উঠিল]

ভাদ্র মাসের মধ্য-সপ্তাহ, এখন বিসর্জ্জনের বাজনা বাজে যে!

মন্ত্রীদের নিরঞ্জন হইতেছে।

নিরঞ্জন! দেশের কাজের ক্ষতি হইবে না?

হইবে। ৬৪ হাজার করিয়া বাঁচিয়া যাইবে, রক্ত অনেকখানি করিয়া বাঁচিয়া যাইবে।

তাঁহারা কি কোন কর্ম্ম করিতেন না?

করিতেন। প্রভু লাটকে উঠিতে বসিতে সেলাম করিতেন, ভোজ খাইতেন; সভার শোভা হইয়া বসিয়া থাকিতেন; দাড়ী দুলাইতেন।

তাহা হইলে এই বিজয়ায় দেশবাসী দুঃখিত হয় নাই?

হয় নাই আবার! ভয়ঙ্কর দুঃখিত হইয়াছে। এত দুঃখিত হইয়াছে যে কাঁদিতে গিয়া নাচিয়া ফেলিতেছে; হাসিয়া ফেলিতেছে।

নূতন যুগ

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৩)

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই স্বামীকে দেখিয়া সন্ধ্যা চমকাইয়া পলাইতেছিল— শিরীষ উঠিয়া তাহার হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিল—"পালান হচ্ছিল যে, মানে ?"

সন্ধ্যা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত দু'খানা ছাড়াইবার অনেক চেষ্টা করিয়া বলিল "হ্যাঁ, পালাচ্ছিলুম বই কি ? আমি তোমায় মোটে দেখতে পাইনি—তাই—; বাঃ, হাত ছেড়ে দাও না, লাগে না বুঝি ?"

শিরীষ তাহাকে টানিয়া আনিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল—"দেখতে পাওনি, বড্ড ছোট মানুষটা কিনা আমি, তাই দেখতে পাওনি ! এই মিথ্যে কথার শাস্তি কি তা জানো ?"

আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বলিল "মিথ্যে বকোনা বলছি, তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও, এখনি দিদি আসবে—দেখে যদি ফেলে, তবে—"

"উঃ, দেখলেই একেবারে মরে গেলুম আর কি ?"

বলিতে বলিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—হাঁ, মরাই বটে, অথবা মরণেরও বেশী সে। মরণে লজ্জা ভয় সঙ্কোচ কিছু থাকে না, এ সব পার হইয়া গিয়া মরণকে বরণ করিতে হয়, কিন্তু এই দেখার মধ্যে লজ্জা সঙ্কোচ ভয়কে মাথায় তুলিয়া লইতে হয়, আর সারা জীবনটা ধরিয়া এই বোঝা বহন করিয়াই চলিতে হয়।

সন্ধ্যার হাত দু'খানা ছাড়িয়া দিয়া গর্ব্বভরা কণ্ঠ নরম করিয়া ফেলিয়া সে বলিল—"নাও, হলো তো ? এবার তোমার দিদি যদিই বা এসে পড়েন, আর কিছু বলতে পারবেন না বোধ হয়।"

বিস্রস্ত বসন যথাস্থানে ন্যস্ত করিতে করিতে সন্ধ্যা বলিল "ওই জন্যেই তো ছুটে পালাচ্ছিলুম। তুমি মনে কর আমি এখনও ছেলে মানুষ রয়েছি, তা নয় গো, তা নয়। পনের বছর বয়েস হলো আমার, সে জ্ঞানটা আছে কি ? এখন হ'তে আমার সঙ্গে অমন করে ছেলে-খেলা করতে এসো না, আগে হতে তোমায় বলে রাখছি।"

মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া ফেলিয়া শিরীষ বলিল "বটে, তা তো জানতুম না। পনের বছরের জল বাতাস তোমার পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা এনে দেছে, এ খবর আমার কাছে এই দুই মিনিট আগে পর্য্যন্তও এসে পৌছায় নি।"

সন্ধ্যা রাগ করিয়া মুখ ফিরাইল—"যাও, ঠাট্টা সব তাইতে, ওই জন্যেই তো রাগ হয়। তোমার জন্যে বাড়ীর ঝি বামণী, কেউ আমার মান রাখে না তা জানো ? মেনকাদি বলে—"

শিরীষ বলিল "সেটা আমার জন্যে না তোমার জন্যে ? রোসো, মেনকাকে আমি কাল বেশ করে বলবো, "মিছে আমার নামে দোষ দেওয়া।"

সন্ধ্যা এতটুকু হইয়া গিয়া বলিল "না না, মেনকাদি বলবে কেন ? মেনকাদি বলে নি, ওই রমা—"

শিরীষ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "তুমি বড্ড মিথ্যে কথা বলতে আরম্ভ করেছ সন্ধ্যা ! কই—আগে তো এ রকম বলতে না ! একবার এর নাম, একবার ওর নাম, একে কি বলে জানো ? সত্যি অথচ কেউই তোমায় কিছু বলে নি, তুমি মনগড়া কতকগুলো কথা নিয়ে এর ওর নাম দিয়ে চালাবার চেষ্টা করছো। টিচারের কাছে শিক্ষা হচ্ছে বুঝি এই, এমনি কতকগুলো মিথ্যে কথা ?"

সন্ধ্যা মলিন মুখে স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল, আস্তে আস্তে তাহার চোখ দুটী জলে ভরিয়া আসিল, ক্রমে সে

জল চোখ ছাপাইয়া হঠাৎ কখন গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

অনুতপ্ত শিরীষ বালিকা স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইল—তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে আদরের সুরে বলিল—ওকি সন্ধ্যা, কেঁদে ফেললে একেবারে—ছিঃ!"

স্বামীর বুকের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া সন্ধ্যা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। শিরীষ তাহার অশ্রুভরা মুখখানা উঁচু করিয়া ধরিল, কি সুন্দর সে মুখখানি! ধীরে ধীরে, আত্মহারা সে, নত হইয়া পড়িতেছে, ঠিক সেই সময়েই দ্বারের উপর হইতে অতি কোমল স্নিগ্ধ কণ্ঠে কে ডাকিল "সন্ধ্যা—"

বুকের উপর হইতে পত্নীর মুখখানা সরাইয়া ফেলিয়া তাহাকে জোর করিয়া উঠাইয়া দিয়া শিরীষ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দরজার উপরে নীলপর্দ্দা দু'হাতে দু'দিকে সরাইয়া ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে দীপিকা। স্বামী স্ত্রীর এই মিলনের মাঝে আসিয়া পড়িয়া সেও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, কি করিবে, কোন দিকে যাইবে সে জ্ঞান তাহার তখন একটুও ছিল না। এই দীর্ঘ সাত মাসের মধ্যে একটা দিনও শিরীষের সহিত তাহার সামনাসামনি দেখা হয় নাই, আজ একি অভাবনীয় সাক্ষাৎ! দীপিকা জানিত না শিরীষ আজ বাহিরে যায় নাই, সে জানিত সন্ধ্যা প্রত্যহ বৈকালে এই গৃহে একবার আসে, ফুলদানিতে ফুল সাজানো তাহার নিত্যকার কাজ। কতদিন এই কাজে দীপিকা তাহাকে সাহায্য করিয়াছে, নিজের মনের মত করিয়া এই ঘর খানিকে সাজাইয়া দিয়াছে। আজও সন্ধ্যা একাই এ গৃহে আছে জানিয়া সে অসঙ্কুচিত চিত্তেই আসিতেছিল, হঠাৎ সম্মুখে স্বামী স্ত্রীকে এভাবে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

"আমি বাইরে যাই, কাজ আছে।"

শিরীষ বিবর্ণমুখে দরজার দিকে অগ্রসর হইবামাত্র নীলপর্দ্দা ছাড়িয়া দিয়া দীপিকা চকিতে অন্তর্হিতা হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে শিরীষও ঝড়ের বেগে উধাও হইল।

গৃহের মধ্যে একা সন্ধ্যা, কিসে যে কি ঘটিয়া গেল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বালিকা বিহ্বলভাবে শুধু চাহিয়া ছিল। শিরীষকে দেখিয়া দীপিকাই বা এমন হইল কেন, আর শিরীষই বা এ-রকমভাবে ছুটিয়া পলাইল কেন? মনে সে ঠিক জানিয়া লইল লজ্জাই ইহার কারণ। স্বামী একটু আগে অতদূর গর্ব্বের কথা বলিয়া তাহার লজ্জাশীলতাকে ধিক্কার দিয়া নিজেই যে এমনি এত লজ্জা পাইলেন ইহা ভাবিতেই তাহার হাসি পাইল। এই কথা লইয়া শিরীষকে বেশ ক্ষেপানো যাইবে দিদি চলিয়া গেলে, উপস্থিত এখন তাহার নাগাল পাওয়া ভার, আর দিদিও আসিয়াছে।

বাহির হইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে সে দীপিকাকে পাইল থামের পাশে, সে রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছে। আকাশের পশ্চিম দিকটা তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে, সেই লাল আভা ছিটকাইয়া আসিয়া দীপিকার সমস্ত দেহখানাকে আরক্ত আভাযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার দৃষ্টি আকাশের কোন খানে ন্যস্ত আছে তাহা বুঝা যাইতেছিল না।

"বাঃ এই যে দিদিমণি, আমি তোমায় এদিক ওদিক খুঁজলুম, পেলুম না। এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ? এসো আমার ঘরে। আজ মালি একরাশ রজনীগন্ধা দিয়ে গ্যাছে, সেগুলো সাজাতে হবে তোমায়, আমি শুধু গোলাপ ক'টা সাজাব কিন্তু।"

হাতে বাঁধা ঘড়িটার পানে দৃষ্টি করিয়া দীপিকা শুষ্ককণ্ঠে বলিল "সাতটা বাজতে আর দেরী নেই সন্ধ্যা, মাত্র পনের মিনিট—"

অধীরভাবে তাহার হাতখানা ধরিয়া সন্ধ্যা বলিল "তা হোক, বাজুক না হয় সাতটা, অত টাইম ধরে চলতে গেলে আমার প্রাণ বাঁচে না দীপিকা'দি। তুমি এসো, না-হয় পনের মিনিটের মধ্যেই যেমন তেমন করে সাজিয়ে ফেলা যাবে এখন।"

দীপিকা বলিল "ওঘরে শিরীষবাবু—"

ব্যগ্রকণ্ঠে সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ, তিনি বসে থাকবার মানুষ কিনা তাই ঘরে বসে থাকবেন! এই যে এতদিন আসছ, কোনদিন দেখেছ তাঁকে? আজ কি মন হয়েছিল তাই বসে ছিলেন, তোমায় দেখে তখনি পালিয়েছেন, আবার ভেতরে আসবেন সেই রাত এগারটায়। এখন বাইরে বন্ধুদের বৈঠক বসবে, গান বাজনা তাস পাশা চলবে। তুমি এসো দিদি, অনর্থক সময়গুলো কেটে যাচ্ছে।"

তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সন্ধ্যা গৃহমধ্যে লইয়া গেল। দীপিকা শ্রান্তকণ্ঠে বলিল "সত্যি আমার আজ কিছু ভাল লাগছে না ভাই, তুমি সাজাও, আমি বসে দেখি। না হয় তোমায় আধঘণ্টা সময় দিচ্ছি ফুল সাজাবার জন্তে।"

সন্ধ্যা বলিল "তবে এই ইজিচেয়ারটায় বসো তুমি, আমি সাজাই।"

দীপিকা সে চেয়ারে বসিল না, একখানা টুল টানিয়া বসিয়া পড়িল। সন্ধ্যা ব্যস্ত হইয়া বলিল "টুলে কেন, চেয়ারখানায়—"

"কেন ভাই, বেশ বসেছি, আমার একটু কষ্ট হচ্ছে না। তুমি আর দেরী করো না, দেখতে দেখতে সাতটা মিনিট কেটে গেল যে।"

সন্ধ্যা মুখখানা অন্ধকার করিয়া বলিল "অত ঘড়ি ধরা কাজ আমার ভাল লাগে না বাপু। ঘণ্টা গণো, মিনিট গণো, আবার শেষকালে সেকেণ্ডও গণো, তবে কাজ করো। ওসব আবার কি বাপু, আমি একটুও ভালবাসি নে।" তাহার কথায় দীপিকা হাসিতে লাগিল।

মনের সে কুহেলী জাল কাটে নাই, কিন্তু চপলা সন্ধ্যার মুখরতায় তাহা বাড়িয়া উঠিতে পারিল না। কপোতীর মত সে বকিয়াই চলিল, তাহার অবিশ্রান্ত বকুনির মধ্যে একটু ফাঁক ছিল না যে সময়টুকু দীপিকাকে একটু মুহ্যমানা করিয়া ফেলিবে। সুখী, যথার্থ সুখী। আহা, তাই হোক, এই সরলা বালিকাটী যেন সংসারের কোনও আঘাত না সয়, ইহার এ প্রফুল্লতা যেন না শুকাইয়া যায়।

সেদিন সে গাহিতেছিল—

দীপ নিভে গ্যাছে মম নিশীথ সমীরে
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না-গো ফিরে।

গাহিতে গাহিতে তাহার কণ্ঠস্বর করুণ হইতেও করুণ হইয়া উঠিয়াছিল, গানের মূর্ত্তিতে রোদনই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—

এ পথে যখনি যাবে
আঁধারে চিনিতে পাবে
রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে।

কিন্তু সে কি দেখিতে পাইবে গো? অন্ধকারে সে, পা ফেলিয়া যে চলিয়াছে সে পাদক্ষেপেরই কি ঠিক আছে তার? মন্দিরে আজ পূজারিণীর অর্ঘ্য, সেই রজনীগন্ধার গন্ধ, কিন্তু হায় রে হায়, সেতো জানিবে না, সেতো অনুভব করিতে পারিবে না এ রজনীগন্ধা কাহার বুকের বাসনা, আজ ফুলের আকারে প্রকাশ হইয়া তাহারই প্রাণের কথা নীরব গন্ধাকারে বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে?

"ও দিদি তুমি ও-গান রেখে দাও, আমি ও-গান শিখব না। ও-গানটা শুনতে গেলে বড্ড কান্না আসে আমার।"

দীপিকার দৃষ্টি শূন্য হইতে ফিরিল, দেখিল সন্ধ্যার চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সন্ধ্যা বলিল "আহা, কার বুকের ব্যথা এমনভাবে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে দিদি, মনে হয় চোখের সামনে সে যেন এসে দাঁড়ায়। তার চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যায় না, ছায়ার মত দেখা যায়। যেন তার চোখ দুটো জলে ভরা, মুখখানা শুকিয়ে গেছে, দেহ তার জীর্ণ শীর্ণ, চলতে গেলে সে পড়ে যাবে। সত্যি দিদি, তোমার গানে কল্পনা কত মূর্ত্তি চোখের সামনে এঁকে দিয়ে যায় তা আর বলতে পারিনে। যাই হোক, তুমি এ-গান আর করো না, ওগান শুনতে বুকের মধ্যে বড় কি রকম করে।"

দীপিকা শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

আজ নয়টা বাজিবার অনেক আগেই তাহাকে উঠিতে হইল, মাসীমার অসুখ, ঝি চলিয়া গিয়াছে। সর্ব্বোপরি তাহার মনটাও আজ ভাল ছিল না।

সেদিন রাত্রে শিরীষ মুখ তুলিয়া সন্ধ্যার পানে চাহিতে পারিতেছিল না, তাহার মনে হইতেছিল সে আজ ধরা পড়িয়া গেছে, আজ তাহার গোপন থাকা একেবারেই মিথ্যা। সে আজ যেমনভাবে ছুটিয়া পলাইয়াছে যেন তাহাকে ভুতে তাড়া করিয়াছিল, সন্ধ্যার মনে কি ইহাতে সন্দেহ হয় নাই?

"আচ্ছা, কি-রকম মানুষ তুমি বল তো? যে-রকম করে ছুটে পালালে, দিদি কি মনে করলেন? ওঁরা কি আমাদের মত ঘরের যে যা-তা বলে বুঝানো যায়? দিদি ভেবেছেন নিশ্চয়ই তুমি একটা কি। এতদূর লেখাপড়া শিখেও মেয়েদের যে কিরকম সম্মান দেখাতে হয় তা শেখো

নি। সত্যি তোমার সে পাড়গেঁয়ে চাল এখনও যায় নি দেখছি। দিদি লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠে—"

"লাল নয় সন্ধ্যা, বল বেগুনে হয়ে উঠে—"

এক তাড়া দিয়া উঠিয়া মুখভঙ্গী করিয়া সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ, বেগুনে হয়ে উঠে বই কি! আমি দেখলুম লাল হয়ে উঠেছেন, আর তুমি বলছ বেগুনে হয়ে উঠেছেন? দেখতে পেতে যদি সামনে দাঁড়াতে, ছুটে পালিয়ে গেলে আবার বিস্তার জাহির হচ্ছে। একটা মেয়ের সামনে দাঁড়ানোর সাহস নেই—তুমি আবার কথা বল, ছিঃ!"

পরম শান্তিতে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শিরীষ বলিল "আচ্ছা তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি সন্ধ্যা; আমার এম, এ, জিনিষটা না হয় মাঠেই মারা যাক, আমি না হয় অসভ্য অশিক্ষিত বর্ব্বর পাড়াগাঁয়ের ভূতই হয়েছি; তোমার দিদির রং না হয় শ্যাম না হয়ে গৌর হলো, আর লজ্জার চিহ্নটা বেগুনে না হয়ে লালই হলো, তারপরে কি হলো বল দেখি শোনা যাক।"

তাহার আড় হইয়া পড়িয়া থাকার নিশ্চিন্ত ভাবটা এবং কথা বলার শ্রী শুনিয়াই সন্ধ্যার আপাদ মস্তক রাগে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল "তারপর আমার মুণ্ডু হলো। আমি বকতে পারিনে তোমার সঙ্গে। আজ আমি মার কাছে শোব, যাই।"

তাহার অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া শিরীষ বলিল "যেয়ো এখন, দুটো গল্পই না হয় করে যাও। তারপরে তোমার আজগুবি দিদিমণিটী কোন কথা বলেছিলেন কি? বোধহয় আমায় কতকগুলো এমন বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন যাতে তোমার কোমল বুকে ব্যথা লেগেছিল। সতীসাধ্বী মেয়েদের দস্তুরই যে তাই, কেউ যদি তাদের স্বামীনিন্দা করে, তা হলেই চালের খড়ে আগুন লাগে আর কি!"

সন্ধ্যা একটানে অঞ্চল ছিনাইয়া লইয়া বলিল "একটুও না। ভারি দায় পড়েছে কিনা আমার, তোমার নিন্দে শুনলে আমার বুকে ঘা লাগবে! কথা শুনে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। এখন চুপচাপ শুয়ে পড়ে ঘুমোও, আমি চললুম।"

নিমেষে সে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বালিকা স্ত্রীর এই দুর্দ্দান্তপনায় পরমপ্রীত স্বামী একটু হাসিল মাত্র, তাহার পর একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল। সন্ধ্যা যে সন্দেহ করিতে পারে নাই ইহাতে সে বড় শান্তি পাইল।

বই খোলা ভাবে সম্মুখেই পড়িয়া রহিল, সে ভাবনায় আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল।

সেই দীপিকা—আর সেই সে; সে সন্ধ্যাকে বিবাহ করিয়াছে, দীপিকারও বিবাহ হইয়াছে কিন্তু সে দিনের কথা কেহ কি ভুলিতে পারিয়াছে? সে তো পারে নাই—ঐ দীপিকাও নিশ্চয় পারে নাই। যদি পারিত তবে সে প্রাণপণ যত্নে তাহাকে এড়াইয়া চলে কেন? বাধ্য হইয়া উদরান্নের জন্য তাহারই দুয়ারে অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছে কিন্তু শিরীষের সহিত মাত্র দুই দিনের দেখা। সেই প্রথম দিনটায় তাহার মুখখানা শবের মতই মলিন হইয়া উঠিয়াছিল, দুই হাতে আর্ত্ত বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া নত মুখে একান্ত অসহায়ার মতই সে শিরীষের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সেই করুণ মুখখানা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। আর আজ—? কি দৃষ্টি ছিল তাহার চোখে, কি ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার মুখে! হায় অভাগিনী নারী, যে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী তুমিই হইতে পারিতে, আজ সেখানে তুমি বেতনভোগিনী মাত্র, তোমার সেখানে এক পা বাড়াইবারও অধিকার নাই!

কি বিষাদময়ী মূর্ত্তি সে, বেদনা তাহার মুখখানায় মূর্ত্ত হইয়াই ফুটিয়া উঠে; সে কথা বলে, তাহা যেন ব্যথায় ভরা; সে হাসে, সে হাসি রোদনের রূপান্তর মাত্র। হায় অভাগিনী, তবু উদরান্নের জন্য—যে তোমার শান্তি সুখ, সাধ আনন্দ সব হরণ করিয়া তোমায় পথের ভিখারিণী সাজাইয়াছে তাহারই দুয়ারে ভিক্ষার্থিনী বেশে দাঁড়াইয়াছ?

বইখানা মুখের উপর চাপা দিয়া শিরীষ পড়িয়া রহিল। খানিক পরে সন্ধ্যা অতি সন্তর্পণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, একবার নিদ্রিতের-ভাণে-শায়িত স্বামীর পানে চাহিয়া, আলো নিভাইয়া দিয়া দরজাটা বাহির হইতে টানিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

গিরিশ-প্রসঙ্গ

(শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

(৫)

পৌরাণিক নাটক

আধুনিক বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে নূতন শিল্পীর দল দেখা দিয়াছেন, কিন্তু এই নবীন পূজকের দল তাঁহাদিগের নাট্য-কলার অভিজ্ঞতা ও কৌশল দেখাইবার জন্য যে উপাদানের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ পুরাতন-পন্থীদিগের অবলম্বিত। মহাকবি গিরিশচন্দ্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পুরাণ লইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার শিক্ষিত শিল্পীগণ পুরাণ-বর্ণিত চরিত্রের অভিনয় করিয়া আসর মাৎ করিয়াছেন। আজিকার ঘটনা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। "History repeats itself."

বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালায় প্রথমে দীনবন্ধু বাবুর নাটকাবলী, তৎপরে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনীত হয়। তাহার পর ভাল নাটক না পাওয়ায় থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য সাধারণে বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। কিন্তু সেরূপ মনোনীত নাটক না পাওয়ায় বাধ্য হইয়া গিরিশচন্দ্র প্রথমে "রাবণ বধ" নাটক প্রণয়ন করেন। 'রাবণবধ' নাটকাভিনয়ে দর্শকগণ পরম প্রীতিলাভ করায় রামায়ণ ও মহাভারত হইতে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া ন্যাসান্যাল থিয়েটারে গিরিশ-চন্দ্রের 'সীতার বনবাস,' লক্ষণ বর্জ্জন,' অভিমন্যুবধ' ইত্যাদি বহু পৌরাণিক নাটক অভিনয় হইতে লাগিল। অভিনয়ে সফলতা ও যথেষ্ট অর্থাগম দেখিয়াও কতকগুলি সমালোচক বলেন,—"দীনবন্ধু বাবুর নাটক কতকটা নাটক ছিল, বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগুলি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াও কতকটা নাটক হয়। কিন্তু এইবার পৌরাণিক নাটকের অভিনয় প্রচলনে নাটকের দফা রফা হইল।" তাঁহারা সেকসপীয়ার প্রভৃতি বেদেশীয় নাটককারগণের সহিত তুলনা করিয়া পৌরাণিক নাটকগুলির প্রতি বিশেষ উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন এবং বলিতেন—"যদি কোন ভাল নাটক না পাওয়া যায়, সেকস্‌পীয়ার প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর নাটককারগণের নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া অভিনয় হউক।" এই বিরুদ্ধবাদী সমালোচকগণকে লক্ষ্য করিয়া গিরিশচন্দ্র যাহা বলিতেন এবং নানা প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই গুছাইয়া গাছাইয়া পাঠকগণের সম্মুখে ধরিলাম। আশা করি, নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের নিকট এ চয়ণ নীরস হইবে না।

"সেকস্‌পীয়ার প্রভৃতি নাটককারগণের নাটক কি, ও তাহা কি ভাবাপন্ন এবং এ দেশীয় রঙ্গমঞ্চে সে সকল নাটকের অভিনয় এ দেশের রুচির অনুমোদিত হইবে কি না,—সে সম্বন্ধে তাঁহারা চিন্তা করেন না, বা বুঝিয়াও বোঝেন না। যে দেশের যে নাট্যকারের তাঁহার দেশের জাতীয় হৃদয়ের উপর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তিনিই সেই দেশে সেই জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে গণ্য হন। সেকস্‌পীয়ার জার্ম্মানি ভাষায় নাটক লিখিলেও তিনি জার্ম্মান হৃদয়ে স্থান পাইতেন না, কারণ ইংরাজের জাতীয়ভাবে তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপ অধিকৃত। জার্ম্মান নাট্যকার সিলার, তিনি স্বয়ং সেকস্‌-পীয়ারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তথাপি জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ সেকস্‌পীয়ার অপেক্ষা তাঁহাদের জাতীয় নাট্যকার সিলারকেই উচ্চ স্থান প্রদান করেন। তাঁহারা সিলার প্রণীত 'জোয়ান অফ আর্ক' নাটক লইয়া সেকস্‌পীয়ারের রচনা পার্থিব স্থুলভাব লইয়া উচ্চ প্রতিভায় চালিত হইয়া যখন তিনি পার্থিব স্থুলভাব হইতে উচ্চে উড্ডীয়মান হইবার চেষ্টা পাইয়াছেন,—তখনই পার্থিব স্থুল আকর্ষণে নিম্নে 'ধড়াস' করিয়া (Comes down with a thud) পড়িয়াছেন। কিন্তু সিলার যিশু জননী কুমারী মেরীকে লইয়া মায়িক প্রেম

অতিক্রম পূর্ব্বক মহাপ্রেমের কথা কহেন। সেই মহাপ্রেমে স্বদেশহিতকর প্রভাবও তাহার অভাবে পতন, "জোয়ান অফ আর্কে" সিলার অদ্ভুত প্রতিমা চিত্রিত করিয়াছেন। আবার ইংরাজ সমালোচক 'জোয়ান অফ আর্কের' ভাবের প্রশংসা করিয়া তৎসঙ্গে জার্ম্মাণকে হিন্দুদিগের ন্যায় 'অপার্থিব স্বপ্নাচ্ছন্ন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই স্বপ্নাচ্ছন্ন জাতিই সাংসারিক বীরত্বে অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি পার্থিব-বাসনা-চালিত মহা বলবান জাতিকে তৃণবৎ ভস্মসাৎ করিয়াছে।

"ফলতঃ এক দেশের নাটক অপর দেশের নাটকের সহিত তুলনায় সমালোচনা হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দার্শনিক জার্ম্মাণ সিলার, ভার্জ্জিন মেরির অবতারণা করিয়া উচ্চ 'জোয়ান অফ আর্ক' নাটক রচনা করিয়াছেন,—কিন্তু সে ভাবে সেকস্‌পীয়ারের নাটক রচিত নয়। তাহার কারণ বোধ হয়—ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যানুযায়ী রুচির বিভিন্নতা। নির্ম্মল আকাশতলবাসী ইটালিয়ানের হৃদয়-ভাব কুজ্ঝটিকাবৃত, ঝটিকালোড়িত, তমাচ্ছন্ন পর্ব্বত-শৃঙ্গ-নিবাসী 'স্কচ্' হইতে অবশ্যই ভিন্ন। স্কচের সঙ্গীতে বিষাদ-ছায়া নিশ্চয় পতিত হইবে। সেইরূপ ইটালীতে হর্ষোৎফুল্লভাব প্রতিফলিত হইতে থাকিবে। চিত্ত-বিমোহন কাশ্মীর-প্রকৃতি-শোভা কালিদাসের কবিতা সুললিত করিয়াছে —নাটকেও কাটাকাটি হানাহানি নাই। কিন্তু সেকস্‌পীয়ার উচ্চ কবি হইলেও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটকগুলি বিয়োগান্তজনিত ঘোর ভীষণতাপূর্ণ। পশুযুদ্ধ (Bull-fight)—আনন্দপ্রিয় 'স্পেনের' নাটক নির্দ্দয়তা পূর্ণ। হাস্যোদ্দীপক, স্ফূর্ত্তিজনক মিলনান্ত নাটক স্পেনের বিশেষ প্রিয় হইবে না। "ডন-কুইক-সট" লোকে বলে—যাহার তুল্য হাস্যোদ্দীপক রচনা আর নাই, তাহার হাস্যও মানব-পীড়নে উদ্দীপিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নাটক সকল প্রায়ই বিপ্লবের ভীষণতায় পরিপূর্ণ। এইরূপ বহু দৃষ্টান্তে প্রমাণ করা যায় যে ভিন্ন দেশে ভিন্ন-মস্তিষ্ক-প্রসূত নাটক, ভিন্ন-ভাবাপন্নই হইয়া থাকে। আবার একদেশেই সময় বিশেষে নাটকেরও বিশেষত্ব হয়। যথা—এলিজাবেথের সময়ে নাটক সকল 'দ্বিতীয় চার্লস'এর সাময়িক নাটক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সকল বস্তুই দেশ-কাল-পাত্র-উপযোগী—সেই হেতু ভিন্ন দেশস্থ বা ভিন্ন সময়ের নাটক সুপাঠ্য হইলেও তাহার অনুকৃত রচনা আদরণীয় হয় না। সেকস্‌পীয়ারের সুবিখ্যাত 'ম্যাক্‌বেথ' নাটক, বহু যত্নে অনুবাদ ও প্রচুর অর্থব্যয়ে নিখুঁতভাবে অভিনয় করিয়াও, ইংরাজের অতি আদরের নাটক হিন্দুর হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আবার পাশ্চাত্য দেশে—নাটকের কাব্যাংশ প্রশংসায়-অনুবাদিত 'শকুন্তলা' দর্শক আকর্ষণ করিয়াছিল সত্য, কাব্যেরও প্রশংসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিজাতির নিকট স্থায়ী ভাবে গৃহীত হয় নাই বা হইতেও পারে না।

"ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম—ধর্ম্ম। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী-আদর করেন। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু,—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতিকে চিনে,—সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। যেরূপ বীর-চিত্র—যুদ্ধপ্রিয় বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষ্ণু, আত্মত্যাগী ও ধর্ম্মসম্মানকারী নায়ক—হিন্দু-হৃদয়ে স্থান পাইয়া থাকেন। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া স্থির গম্ভীর যুধিষ্ঠিরের ভাব—হিন্দুর প্রিয়,—কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুঃশাসনের মস্তকচ্ছেদন পাশ্চাত্য-প্রিয় হইত। এদেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্ম্মপ্রসূত। বহুগুণ-যুক্ত রাজা ব্যভিচারী হইলে—সতীত্বপূজক হিন্দু তাহাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণসীতা গঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করেন—শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ রাজা। অস্থিত্যাগী দধিচী—আদর্শত্যাগী ও অতিথিসেবক; কিন্তু এরূপ ত্যাগ বা এরূপ নির্ম্মলতা কঠোর দেশে বাতুলতা বলিয়া যদিচ উপহসিত না হয়, ভ্রান্তিমূলক বলিতে ত্রুটি করিবে না। সতী-নারীর অভিমান প্রত্যেক দেশেই হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু পাতাল প্রবিষ্টা জানকীর অভিমান—পতি-সহবাস পরিত্যক্তা অভিমানিনী হইতে অনেক প্রভেদ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতি যেরূপ ভাবাপন্ন—তাহাদের জাতীয় নাটকের সেইরূপ রসেরও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

"হিন্দুস্থানের মর্ম্মে-মর্ম্মে—ধর্ম্ম! মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্ম, বিদেশীর ভীষণ তরবারি-ধারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। আকবরের

রাজনৈতিক প্রভাবেও সমভাবে আছে। যদি নাটক সার্ব্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, 'কৃষ্ণ' নামেই হইবে। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হল-সঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও 'কৃষ্ণ' নাম জানে—তাহাদেরও মন 'কৃষ্ণ' নামে আকৃষ্ট। ইংরাজী ভাবে—বিদেশীয় ভাবে যাঁহারা ভাব করেন, তাঁহারা ভারতের মর্ম্ম বোঝেন না; সেই ভাবে জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না,—জাতির হৃদয়ের উপর—উন্নতির ভিত্তি।"

"কেহ কেহ বা 'মারা-কাটা লইয়া' নাটক রচনাটার পক্ষপাতী। কিন্তু তাঁহারা এমন কি নাটক লিখিবেন, যাহা ব্যাস-রচিত ভারতে নাই। এমন পাঁচ সাতটা সেক্সপীয়ারকে আসিয়া শিখিতে হইবে,—ব্যাস-রচিত ভারতে কি কি ভাব আছে। ম্যাক্‌বেথ, হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়ার প্রভৃতি সেক্সপীয়ার প্রণীত উচ্চ শ্রেণীর নাটক। এ সকল কঠোর নাটকেও পিতার আদেশে মাতার মস্তক ছেদন নাই, গর্ভস্থ শিশুবধ নাই, এবং কোন জাতীয় কোন নাটক বা কবিতায় সুপ্ত শিশুহন্তা অশ্বত্থামারও মার্জ্জনা নাই। এই বিশাল ভাবাপন্ন কাব্যক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত নাটকের যিনি ঘৃণা করেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি কি বলিতেছেন, তাহা তিনি জানেন না।

"যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার, পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জ্জিল,—খ্রীষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিল্টন, পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গলার মাইকেল। মেরি করেলি,—আধুনিক যাঁহার পুস্তক পাদ্রি বিদ্বেষিত হইয়াও এক সংস্করণে দেড়লক্ষ বিক্রয় হয়,—খ্রীষ্টীয় পুরাণ ও বাইবেল তাহার ভিত্তি। পৌরাণিক নাটক ভাল মন্দ হয় বা না হয়—এ কথার সমালোচনা হইতে পারে। কিন্তু পৌরাণিক নাটক যে উচ্চশ্রেণীর নাটক হয় না, ইহা যিনি বলিতে চান, তাঁর তুলনা তাঁহাতেই থাকুক।"

গিরিশবাবুর মন্তব্যের সত্যতা আজ প্রমাণিত হইতেছে, অধুনা রঙ্গালয়ের পৌরাণিক নাটকের অভিনয় সাফল্যে। ষ্টার থিয়েটারে অপরেশবাবুর "কর্ণার্জ্জুন" ১২৬ রাত্রি সমানভাবেই চলিতেছে, এবং মনে হয়—এখন ইহা সহজে পুরাতন হইবে না। মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে "সীতা" শিশিরবাবুর প্রথম নাটক। অ্যালফ্রেড থিয়েটারে 'মভার্ণ'রাও "রৈবতক" খুলিতেছেন। "Survival of the fittest" এ পরিচয় পাঠক ও দর্শক কালে পাইবেন। বাল্মীকি ও বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া আমরা উপস্থিত এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিলাম।

নর্ত্তক

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্র কুমার সেন
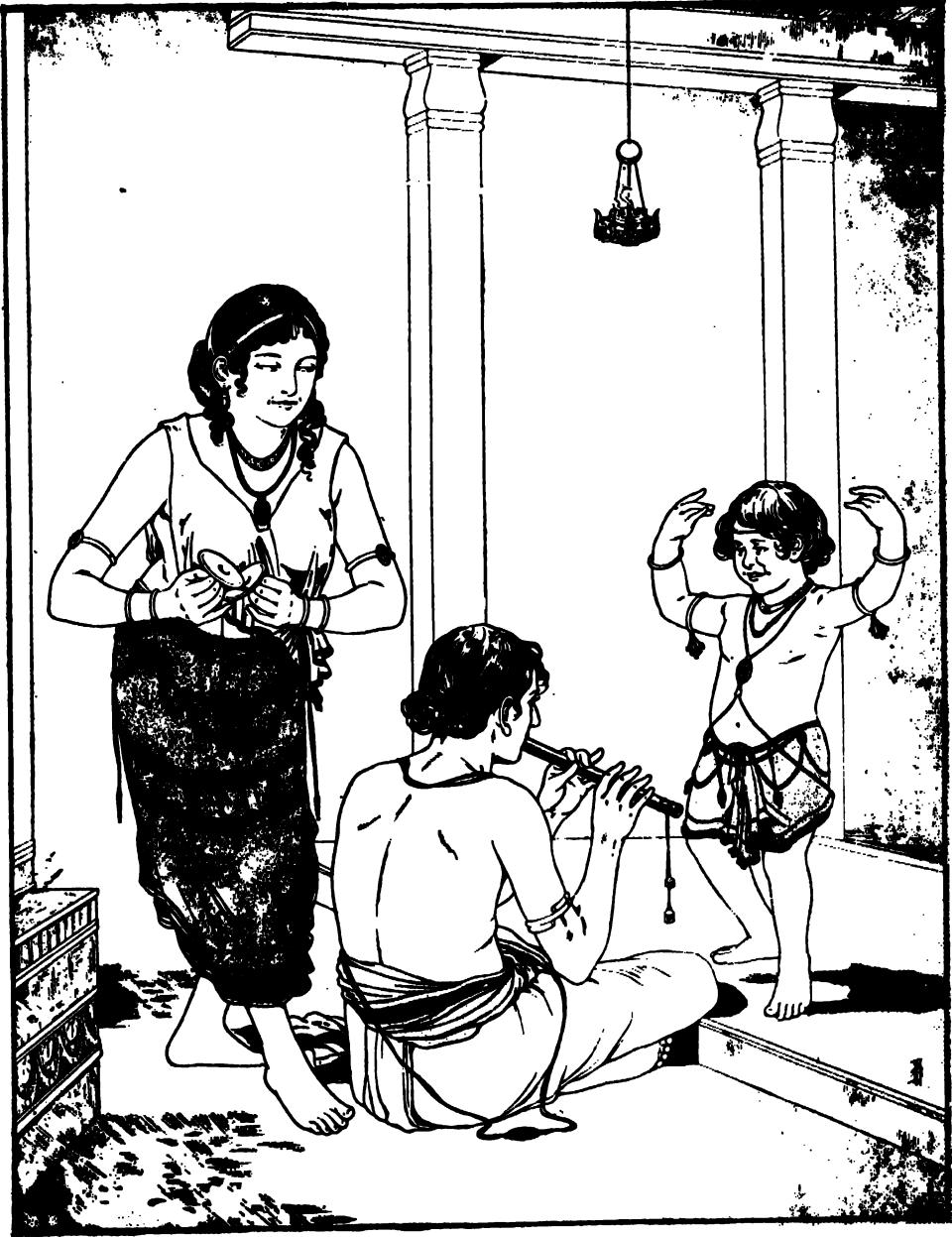
প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২১শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [ত্রয়শ্চত্বারিংশ সপ্তাহ

বাইরে ও ঘরে

(ঘরে বাইরে নয়, বাইরে ও ঘরে)

জননী জন্মভূমির উদ্দেশে—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি।"

ঘরে

জননী জন্মভূমির বন্দনা শ্রবণ-করিয়াছেন,—

এইবার গর্ভধারিণী জননীর গল-বন্দনা অবলোকন করুন

—নিকালো—

পত্নী—দানে প্রাপ্ত—দেনোমাল

অতএব—

—পদাঘাত—

বাহিরে—

"তুমি সে মম প্রাণের অধিক।"

ঘরে—ভৃত্য সকাশে

কে বলে বাঙ্গালী বীর নহে ?

বাহিরে

প্লীহা ফাটিবার উপক্রম করিল কিন্তু ফাটিল না;
বীর বলিয়াই ফাটিল না।

ষণ্ড কাহিনী

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, ভাগবতরত্ন]

ভাদ্রমাসের তালপাকান গরম। গাছের পাতাটী পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। তাহাতে আবার আকাশ ভরিয়া জ্যোৎস্নার আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এহেন রাত্রিতে ঘরে বসিয়া চুপটি করিয়া লেখাপড়া করিবার উপায়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। তাই মাদুরটী বিছাইয়া বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোকের মধ্যে কেরোসিনের আলোটী যেন মূর্ত্তিমান বিদ্রূপের মত দেখা যাইতে লাগিল।

পল্লী জীবনের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য সাধ করিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া বীরভূমের এক নীরব পল্লীতে আসিয়াছি। গ্রামটীর নাম হেতমপুর। এখানে একটা প্রথমশ্রেণীর কলেজ আছে, সেখানে একটু আধটু পড়াই—আর প্রকৃতি ঠাকুরাণীর গোপন ভাণ্ডারের মাধুর্য্য দেখিবার সন্ধানে ফিরি। পল্লীর মধ্যে বাস করিলে গ্রাম্য কথার মধ্যে থাকিতে হইবে আশঙ্কায় গ্রামের শেষ সীমানায় লোকালয়ের বাহিরে বাস করি। বাসাটীর দুইদিকে শাল বন, আর দুইদিকে শস্য-শ্যামল মাঠ—সম্মুখ দিয়া একটা লাল কাঁকর-বিছান পথ গিয়াছে। সে পথ দিয়া অনবরত গরুর গাড়ী ও লোকজন যাতায়াত করে। তাহাতেই আমরা জন-মানুষের মুখ দেখিতে পাই। এহেন নির্জ্জন স্থানের মধ্যে কবিত্ব করিতে আসিয়া সেদিন রাত্রে যে বিপদ হইয়াছিল, তাহারই কিছু পরিচয় আজ দিব।

একটী বন্ধু আমার নিকট হইতে তাঁহার এম এ, পরীক্ষার পূর্ব্বে কিছু পড়াশুনা জানিয়া লইতে আসিয়াছিলেন। বারান্দায় বসিতেই তিনি অবসর বুঝিয়া পাঁজিপুথি লইয়া উপস্থিত হইলেন। বৈকালে অত্যধিক বেড়ানোর ফলে শরীরটা একটু ক্লান্ত ছিল। তাহার উপর আবার অসহ্য গরম। সুতরাং তাঁহার পাঠের উদ্যমকে মনে মনে প্রশংসা করিলেও, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিতই ইতিহাসের শুষ্ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। জ্যোৎস্না দেখিলেই আমার মনটা কেমন উদাস হইয়া উঠে। পড়াইতে পড়াইতে প্রায়ই অন্যমনস্ক হইয়া উঠিতেছিলাম। খানিকক্ষণ যাইতেই দেখি গৃহিণীও আমাদের নীতি অনুসরণ করিয়া মাদুর বিছাইয়া বারান্দার অপর পাশে বসিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য জ্ঞান নাকি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বলিয়া তিনি সময়ে অসময়ে ঘোষণা করেন। তাই তিনি আর জ্যোৎস্নার আলোয় লণ্ঠন জ্বালিলেন না। অথচ হাতে দেখি নূতন চক্‌চকে একখানি নভেল। তখন বুঝিলাম তিনি চাঁদের আলোতে বসিয়া নভেল পড়িবেন! একেই বলে সাড়ে-ষোল আনা কবিত্ব।

যাক্, একপাশে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেছেন অথবা পড়ার ভাণ করিয়া বসিয়া আছেন, অন্যপাশে আমরা তখন Tudor যুগের পার্লামেণ্টের স্বরূপ নিরূপণে ব্যস্ত। এমন সময় শালবন ভেদ করিয়া মেঘমন্দ্র স্বরে এক প্রকাণ্ড গর্জ্জন হইল। যিনি কবিত্ব করিতেছিলেন, তিনি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া পলাইলেন—হাতের বইখানা বাহিরেই পড়িয়া থাকিল—আর যিনি পার্লামেণ্টের ক্ষমতা লইয়া তর্ক করিতেছিলেন, তিনিও তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ আস্ফালনের ফলে দোয়াতের কালি পড়িয়া গেল—খাতাপত্রগুলি মসীরঞ্জিত হইল। কিন্তু তখন আর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে কে? আবার—আবার সেই গর্জ্জন। আম্রবন ভেদ করিয়া কামান গর্জ্জন নহে, শালবনভেদ করিয়া ষণ্ডের নিনাদ! ছোটবেলায় হিতোপদেশে যূথভ্রষ্ট ক্রথনকের কাহিনী পড়িয়াছিলাম—কিন্তু তখন "বলীবর্দ্দেণ নর্দ্দিতম" কথার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। আজ অকস্মাৎ অতর্কিতভাবে ষণ্ডের ক্রোধোন্মত্ত গর্জ্জন জিনিষটা কি, তাহার জ্ঞান হইল।

আমি "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি। ভয়ের মধ্যেও ইচ্ছা—এমন ভাবে যে পশুটী

ডাকিতেছে, তাহার রূপটা কেমন একবার দেখিয়া লই। একটু পরেই বুঝিতে পারিলাম ষণ্ড মহাশয় একাকী নহেন, তাঁহার একটী বন্ধুও সঙ্গে আছেন। তিনিও গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। উভয় বন্ধুর মধ্যে কি কারণে যেন মনোমালিন্য ঘটিয়াছে—উভয়েই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। প্রবলবেগে ছুটীতে ছুটীতে ষণ্ড মহাশয়দ্বয় আমাদের বাসার দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বোধ হয় ইচ্ছা আমাদিগকে মধ্যস্থ রাখিয়া তাঁহারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আমার ছাত্র—বন্ধুটীর তখন ভয়ে তালু পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে—তিনি আমাকে তাঁহার ঘরের মধ্যে যাইবার জন্য বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন।

যখন নিতান্তই দেখিলাম, "রজতগিরিসন্নিভ" ষণ্ডদ্বয় আমাকে লক্ষ্য করিয়াই আসিয়া পড়িল, তখন আমিও "যঃ পলায়তে স জীবতি" পন্থার অনুসরণ করিলাম। বাহিরে তখন ষণ্ডদ্বয়ের প্রবল আস্ফালন ও গর্জ্জন। কিন্তু বন্ধুটীর নাকি পরীক্ষারূপ মৃত্যু একেবারে আসন্ন, তাই তিনি ঐ "প্রলয় ঘনঘোর গর্জ্জনং" সত্ত্বেও আবার সেই Tudor Parliament এর সহিত অষ্টম হেনরীর সম্বন্ধের কথা পাড়িলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পড়াইবার ইচ্ছা ছিল না, এখন তো একটা Plea (অজুহাত) জুটিল। আমি বলিলাম "এখন জীবন মরণ নিয়ে টান পাড়াপাড়ি, আর আপনি কি না Parliament কোন কালে কি ছিল, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। এখনই যে ষাঁড়দুটো বারান্দার উপর এসে দুয়ারে ঢুঁ মারিবে ও দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া আমাদের ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া দিবে! দরাব খাঁ ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে প্রাণ হারিয়ে ছিলেন, কিন্তু সে ষাঁড়ের শিংএ একটু গঙ্গার মাটী লেগেছিল, তাই তাঁর স্বর্গবাস কপালে জুটে ছিল। কিন্তু বীরভূমের ত্রিসীমানায় কোথাও যে গঙ্গা নাই—সুতরাং মরামাত্রই যে স্বর্গে যেয়ে উর্ব্বশীর নাচ দেখ্‌তে পাবো সে সম্ভাবনাও কম। এখন কি করিয়া প্রাণ বাঁচান যায়, সেই উপায় দেখুন।"

তখনও ষণ্ডদ্বয় বারান্দার কিছু দূরে রহিয়াছে, মধ্যের ঘরটীতে ছোট ভাইয়েরা তাহাদের মাষ্টার মশায়ের নিকট পড়িতেছিল—তাহাদিগকে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "সব একঘরে এসো—যাহোক্ একটা যুক্তি করা যাক্।" ছুটিয়া আমার নিজের ঘরটীতে সকলের সহিত প্রবেশ করিলাম। গৃহিণী ঠাকুরাণী পূর্ব্বেই সেখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঘরের মধ্যে আসিয়াই সকলে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু তখন আমার বন্ধুটীর মনে পড়িল—তাঁহাকে একমাস বাদে পরীক্ষা দিতেই হইবে ও তাঁহার Noteগুলি বারান্দায় পড়িয়া আছে—সেগুলি ষণ্ডদ্বয় যুদ্ধক্ষেত্রে নষ্ট করিয়া দিলে তাঁহার সমূহ বিপদ হইবে। তখন আবার তিনচারি জনে মিলিয়া তাঁহার পুঁথি পত্র লইয়া আসিলাম। কিন্তু সে যাওয়া একেবারে প্রাণ হাতে করিয়া যাওয়া। ষাঁড়ের লড়াই তখন আমাদের বারান্দার ঠিক পাশে হইতেছে, তাহাদের নাসিকা হইতে যে ফোঁস ফোঁস শব্দ হইতেছে, তাহা তাহাদের গর্জ্জন অপেক্ষাও ভীতিপ্রদ। উভয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। আমরা ঘরে আসিয়া ফের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ঠিক্ আমাদের ঘর খানির সম্মুখেই যেন যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

আমার মেজ ভাইটী বলিল "দাদা আলো দেখিলেই উহারা ক্ষেপিয়া আসিয়া আমাদের দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিবে, আলো নিবাইয়া দাও।" আমি রাজী ছিলাম, কিন্তু গৃহিণী ঠাকুরাণী আলোটীকে স্তিমিত করিয়া দিলেন। তখন আবার আমরা স্থির করিলাম যে কেহ যেন কথা না কয়; মানুষের সাড়া পাইলেই, তাহারা আমাদের সহিতই বা যুদ্ধ করিতে আসে। তখন সকলে চুপ করিয়া কাণ পাতিয়া ষণ্ডযুদ্ধের গর্জ্জন শুনিতে লাগিলাম।

কিন্তু ইতিমধ্যে সাতমাসের পুত্ররত্নটী জাগরিত হইয়া উঠিলেন। সে এতগুলি লোককে একসঙ্গে পাইয়া মহা উৎসাহে তাহার অস্ফুট ভাষায় আলাপ আরম্ভ করিয়া দিল। মহামুস্কিল! দুষ্ট ছেলে এখন কোথায় চুপ করিয়া থাকিবে, না গল্প আরম্ভ করিল! তখন বন্ধুটী ঠিক্ করিলেন এবার আর নিস্তার নাই। পুত্রের আনন্দোৎফুল্ল ঝঙ্কার শুনিয়া, নিশ্চয়ই উহারা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ঘরের মধ্যে আছে মনে করিয়া দরজা ভাঙ্গিতে আসিবে।

তখন আমরা ঘরের মধ্যে আক্রমণ হইলে কিরূপে আত্মরক্ষা করা যাইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ঘরে

কোনরূপ অস্ত্র নাই—একখানি ভাল লাঠি পর্য্যন্ত নাই। ঘরের মধ্যে যা জিনিষ আছে তাহাই লইয়া সকলে যুক্তি চালাইতে লাগিলাম। বন্ধুটীর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ—তিনি চট্ করিয়া আল্না হইতে আমার উরানী ও ছড়িখানি তুলিয়া লইলেন। ছড়ির সহিত উরানীখাণি জড়াইয়া লইলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "কি মতলব?" তিনি বলিলেন আক্রমণ করা মাত্র লণ্ঠণ হইতে কেরোসিন চাদরের উপর ঢালিয়া ধরাইয়া দিব। তাহার পর এই মশাল লইয়া উহাদের চোখের মধ্যে ঠাসিয়া ধরিব। তাহা হইলেই কেল্লা ফতে।" মেজ ভাইটী একখানি নারিকেল-কোঁরা অস্ত্র লইয়া সশস্ত্র হইয়া রহিল। সেজভাই তরকারী কাটা বটি হাতে দাঁড়াইল। আর ছয়বছরের ছোট ভাইটী বলিল "আমি চৌকীর তলায় বসিয়া থাকি, ষাঁড় ঘরের মধ্যে আসিলেও আমাকে দেখিতে পাইবে না।" সে চুপটী করিয়া চৌকীর তলায় বসিয়া রহিল। আমি কি করিব-কোন অস্ত্র আমার নাই! তবে ঘরে এক বোতল ভট্টাচার্য্যের নস্ত ছিল - আমি সেইটী হাতে করিয়া বীর দর্পে দাঁড়াইলাম। উদ্দেশ্য -ষাঁড় ঘরে ঢুকিবা মাত্র তাহাদের কপালে ঘা মারিয়া বোতল ভাঙ্গিয়া দিব। তাহাতে তাহারা আঘাতও পাইবে—আর নস্তের তীব্র গন্ধে হাঁচিতে হাঁচিতে পলায়ন করিবে।

এইরূপ যুক্তি পরামর্শের মধ্যে কিন্তু ষণ্ডমহাশয় দ্বয় আপনা আপনিই গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে বিভিন্ন মুখে চলিয়া গেল। যখন তাহাদের শব্দ দূরে একেবারে মিলাইয়া গেল, তখন আমরা দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলাম।

ভাইরা সকলেই খাওয়া দাওয়া করিয়া লইল। আমার সখ হইল জ্যোৎস্নায় বসিয়া খাই। খাইতে বসিয়াছি—এমন সময় অতি নিকটে আবার সেইরূপ গর্জ্জন। তখন ভাতের থালাখানি হাতে করিয়াই সদর্পে ঘরের ভিতর ছুট দিলাম। ক্ষুধার জ্বালা প্রবল, তাই থালাখানি বাহিরে রাখিতে পারি নাই। কিন্তু ঘরে ঢুকিতেই সেজভাইটী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল "দাদা—কেমন ডাক এবার কিন্তু ডেকেছি আমি!" আমি তাহার mimic (কৌতুক) এর প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সকালে উঠিয়া শুনিলাম রাত্রে বন্ধুটীর মোটেই ঘুম হয় নাই, কিন্তু যাহাদের প্রতীক্ষায় তিনি জাগিয়াছিলেন—সকালে আর তাহাদের খোঁজ পাওয়া গেল না।

মিনিট-মোহন গল্প

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

প্রত্যুৎপন্ন রসিকতা

মাতার আদেশে বালক প্রতিবেশিনীর গৃহে আগুন আনিতে গিয়াছে। প্রতিবেশিনী এই তরুণ দেবরটীকে পাইয়া একটু রসিকতা করিতে ছাড়িলেন না। একহাতা গন্‌গনে আগুন লইয়া তিনি বালকটীকে বলিলেন, "নে, হাত পাত।" বালকটী আগুন লইয়া যাইবার জন্ত কোনও পাত্র আনে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ঠকিয়া যাইবার পাত্র সে নহে। ইতস্ততঃ চক্ষু বিক্ষেপ করিয়া বুদ্ধিমান্ বালক রসিকা প্রতিবেশিনীর উঠানে স্তূপীকৃত বালুকা দেখিতে পাইল। তখন সে দুই করতল একত্র করিয়া তাহার উপর বালি লইয়া বলিল, "কই, দিন, আমি প্রস্তুত।"

অর্থশূণ্য নাম

কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে এক বন্ধু আসিয়াছেন। বন্ধুর অভ্যর্থনার জন্ত ভদ্রলোক তাঁহার ভৃত্যকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গোরাচাঁদ, পান তামাক আন।" অনেকক্ষণ পরেও যখন ভৃত্যের দর্শন পাওয়া গেল না, এবং আগন্তুক বন্ধু উঠিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন, তখন ভদ্রলোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঁচুগলায় গোরাচাঁদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। অবশেষে পানের ডিবা ও কলিকা হস্তে গোরাচাঁদ উপস্থিত হইল। আবলুসের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ গোরাচাঁদের রূপ দেখিয়া আগন্তুক বন্ধু বলিলেন, "বন্ধো! তোমার এই জলদ-শ্যামবর্ণ ভৃত্যের নাম যদি গোরাচাঁদ হয়, তবে কালাচাঁদ কার নাম হবে?"

আমার বিয়ে

[শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

অনেকদিন পরে ঠান্‌দি তার দাদার বাড়ী থেকে এসে বল্লে, কিলো নাত্নি, তোর বিয়ের ফুল ফুটলো ?

আমি নিবেদিতার জীবনী পড়ছিলুম। বইখানি মুড়ে নিজেকে আগে সাম্‌লে নিয়ে অনেক কষ্টে হেসে বল্লুম, ফুল আর ফুটে কাজ নেই ঠান্‌দি, অমন ফুলে আগুণ ধরে যাক্।

ঠানদি খুব খানিকটা জিব বের কোরে দাঁতে কাঁমড়ে বল্লে, বালাই, ওকি কথা লা ছুঁড়ি ? বে আবার কার কোথা না হয়েছে ? ছা-পোষা বাপ্, তাই একটু দেরী হচ্ছে। বে হবেনা তো আইবুড়ো থাক্‌বি নাকি ? কথার ছিরি দেখনা ! গায়ে বসন্তের হাওয়া লেগেচে বুঝি, তাই অত আই-ঢাই করছিস্ ?

ঠান্‌দির কথায় আমার হাসি নিভে ধুস্ হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় চেষ্টা কোরো হেসে বল্লুম, আমি কিন্তু আইবুড়ো থাক্‌বই ঠান্‌দি।

আমি আরো অনেক কথা বল্‌তে যাচ্ছিলুম। ঠান্‌দি— বাধা দিয়ে সহাস্যমুখে বল্লে, মুখে অমন সবাই বলে। মন কিন্তু অহরহ বলচে,—আমার বর মিলিয়ে দাও ঠাকুর, তোমার পুজো দেব। বুক চিরে রক্ত দেব।

আমি এবার গম্ভীর হয়ে বল্লুম, দেখে নিয়ো ঠান্‌দি। আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।

ঠান্‌দি মুচ্‌কে হেসে আমার কাণের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ কোরে বল্লে—কেন লো নাত্নি, অভিসারের নাগর জুটিয়েছিস্ নাকি ?

আমি রাগের অভিব্যক্তি দেখিয়ে বল্লুম, জোটাব না তো কি ? সমাজকে দশুকচু খাইয়ে তবে আমি ছাড়ব।

ঠানদি বল্লে, তার মানে ?

আমি বল্লুম, তার মানে, আমি বিয়ে করব না। বরের বাপেরা আমার বাপের ভিটে বিকিয়ে দিয়ে নিজেদের বাক্স ভর্ত্তি করবে মনে করছে। আমি তাদের সে গুড়ে বালি দেব।

ঠানদি এবার হো হো করে হেসে উঠ্‌লো। তার সে হাসির ভেতর যেন একটা অবজ্ঞার ভ্রূকুটি ফুটে উঠলো। তার হো-হো হাসির শব্দের ভেতর কে-যেন বোলে উঠল,—ওরে হতভাগি, তা হয় না। বিয়ে না করলে বাংলার সমাজ তোকে ঠাঁই দেবে না। কাণা খোঁড়া, স্বার্থান্ধ, মাতাল যাই হোক্ একজন পুরুষের পায়ে তোর কুমারী জীবনটা লুটিয়ে দিতেই হবে। জলে ডুবে, গলায় দড়ী দিয়ে, আগুণে পুড়ে যদি তোকে মর্‌তে হয়,—তোর বাপকে দেনার জ্বালায় যদি পাগল হোতে হয়, তোর মাকে যদি বেহাই বেয়ানের গঞ্জনায় অস্থিচর্ম্মসার হোতে হয়- সেও ভাল, তবু তোকে বিয়ে করতেই হবে।

ঠান্‌দি প্রাণ ভরে হেসে নিয়ে বল্লে, বলি—তাতো হোল, তোর নাগরটী কে লো ? ঘরে ঘরেই নাকি ? সত্যি ভাই, তোর বড়দাকে দেখে আমারি এই পাকা চুলে কলপ দিতে ইচ্ছে করে, তা—তোর তো এই প্রথম নতুন যৌবন !

আমি লজ্জায় দুহাতে তার মুখটা চেপে ধরে বল্‌লুম, তোমার পায়ে পড়ি ঠান্‌দি- অমন কোরে গালাগাল দিয়ো না।

ঠান্‌দি এবার তার হাসিটা চাপা দিয়ে ভয় দেখানোর একটা ভাব মুখের ওপর ফুটিয়ে তুলে বল্লে, তবে বল্ বলচি—কে তোর নাগর ?

আমি বল্‌লুম,—তুমি।

ঠান্‌দি বল্লে, এখনো বল্- তা না হোলে জানিস্‌তো আমার মুখ ? এখুনি মুখ ছোটাব !

আমি বল্‌লুম, সত্যি ঠান্‌দি- তুমি।

ঠান্‌দি গালে হাত দিয়ে মুচ্‌কে হেসে বোলে উঠ্‌লো, ওমা ! আমি তোর নাগর ? তা বেশ। তোর পছন্দের বাহাদুরি আছে বটে। আমাকে নিয়ে তোর কি হবে ভাই ? আমি যে মেয়েমানুষ।

আমি বল্‌লুম, মেয়েমানুষ হোলেই হবে। তুমি আমায় ভালবাসবে,—রাত্রে হয়তো আমাকে নিয়ে শোবে, হোল বা আদর কোরে গালে একটা চুমুও খাবে। সখ্ হোলে কোনদিন বা যাত্রাদলের একটা গোঁপদাড়ী পরিয়ে তোমায় পুরুষ সাজাব।

ঠান্‌দি মুখ টিপে হেসে বল্লে, তারপর?

আমি বল্‌লুম, তারপর আবার কি? এই-যে অনেকের বর তাদের স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করে না। তাদের কি দিন কাট্‌ছে না?

এবার আমি আর আমার মাথাটীকে খাড়া কোরে রাখ্‌তে পারলুম না। কথার সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটী নুয়ে পড়তেই ঠান্‌দি হাস্‌তে হাস্‌তে ঠাট্টা কোরে বল্লে, তা'হলে এক কাজ কর্ ভাই, তুই আমার বৌদি হ। দাদার তেমন আর বেশী কি বয়েস হয়েচে? এই চারকুড়ির্ বোধহয় বেশী নয়। দাদার স্ত্রীটী মারা গিয়ে—তাঁর বড্ড কষ্ট হয়েচে। এ অবস্থায় তুই আমার বৌদি হলে তাঁর সেবা হবে—তোর বাবারো একটা পয়সা পর্য্যন্ত লাগ্‌বে না। কেমন?

আমি গম্ভীর হয়ে বল্‌লুম, দরকার হোলে তাই করবো ঠান্‌দি।

ঠান্‌দি বল্লে, কিলো নাত্নি? মুখটা যে তেলোহাঁড়ি হোয়ে উঠ্‌লো কেন? এইতো বল্‌ছিলি—তুই আমাকে বিয়ে করবি। আমার সঙ্গে দাদার আর তফাৎ কি আছে বল্? দাদাও তোকে ভালবাস্‌বে। আদর কোরে হয়তো বা চুমুও খাবে। দাদার ছেলেরা কেউ উকিল—কেউ হাকিম, তারা তোকে কত যত্ন করবে। তা ছাড়া তোর একটা ঝঞ্ঝাটও কমে গেল।

আমি বল্লুম, কি?

ঠান্‌দি আমার দাড়ি ধোরে বল্লে, তাঁকে আর আমার মত গোঁপদাড়ি পরাতে হবেনা লো। সে যে পুরুষ! কিন্তু তবু ভাই তোকে ঠক্‌তে হবে।

আম তার কথায় জবাব দিতে যাচ্ছিলুম। মা ডাক্‌লে,—শান্তা। আমি 'যাই মা' বোলে ঠানদির দিকে একবার চেয়ে ছাদ থেকে নীচে নেমে গেলুম।

(২)

নীচে নেমে এসে দেখি, আবার সেই একঘেয়ে যাতনার সুরু হয়েচে। মা বল্লে, শ্রীরামপুর থেকে তোকে দেখ্‌তে এয়েচে। চুলটা বেঁধে দিই আয়। পছন্দ হোলে আজ তারা তোকে পাকা দেখে যাবে।

কড়্ কড়্ কোরে যেন একটা বাজ আমার মাথায় পড়লো! এখানকার বরকর্ত্তা নাকি আমার বাপকে ছা-পোষা দেখে দয়া কোরে তাঁর পাঁচ হাজার টাকার দামের ছেলেটীকে একুশশো টাকায় বিক্রি করবেন বোলে প্রতিশ্রুতি দিয়েচেন। একুশশো টাকার সমস্তটাই আমার বাপকে কর্জ্জ করতে হবে। নিজের মাথা দেনার দায়ে বিক্রি কোরে আমার জন্যে বাবা আজ একটী মূল্যবান্ জামাই কিনতে যাচ্ছেন! তাঁর দুঃসাহসিক কাজ দেখে আমার বুকের ভেতর গুর্ গুর্ কোরে উঠ্‌লো। চোখে জল এলো। এখনো যে আমার চারটী বোনের বিয়ে দিতে হবে,—তিনটী ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। বাবা যে আজ আমার বিয়ের জন্যে অস্থির হয়ে পড়ে সংসারের আর কারুর দিকে লক্ষ্য করছেন না তা বুঝ্‌তে পারলুম। আমি আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারলুম না। তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর গিয়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। মাকে বল্লুম, আমার বড্ড অসুখ করেচে মা—বুকের ভেতর ভয়ানক যাতনা কচ্চে। আজ তাদের ফিরে যেতে বল।

আমার এই বুকে ব্যথা ধরার ব্যাপারটা মায়ের কাছে নতুন ছিলনা। বড়লোকের বাড়ী থেকে সম্বন্ধ এলেই আমার এইরকম ব্যথা ধরতো। ব্যথা যে কেন ধরতো তা মা বুঝতেন, হাজার হোক—মা নারী।

মা অস্থির হয়ে বল্লেন, সে কি রে! তারা যে খবর পত্র কোরে এসেচে, তাদের ফিরিয়ে দেব কি বল্? তাদেরতো আর গরজ নয়।

আমার অন্তরের স্তরে স্তরে কে তখন কাঁটা ফুটিয়ে দিচ্ছিল। আমি যথেষ্ট কাতর হয়ে বল্লুম, তোমাদেরইবা এত গরজ হচ্চে কেন মা?

মা অনেকটা রাগে—অনেকটা দুঃখে বল্লেন, গরজ কি

সাধ কোরে হয়েচে বাছা? তোর বয়সের খোঁটা যে অসহ্য হয়ে পড়েচে। সমাজে যে আর মুখ দেখাতে পারছি না।

ধক্ ধক্ কোরে আমার বুকের ভেতর আগুন জ্বলে উঠলো। ওগো! বয়সের গতিকে যে রোধ করবার শক্তি আমার নেই। তা যদি থাক্‌তো তা হলে যেমন কোরে হোক্ আমার যৌবনোদ্‌গমের পথে একটা প্রকাণ্ড পাথরের প্রাচীর গড়ে তুলতুম।

যাক্। মা পুনরায় বোলে উঠ্‌লেন, উঠ্‌বি কি না বল্ বাছা? কপালদোষে যেমন তুই—তেমনি সমাজ হয়েচে। ইচ্ছে হয়—আত্মঘাতিনী হই, কেবল—

আমি মায়ের মুখের দিকে না চেয়ে বাধা দিয়ে বল্লুম, তোমার মত ভাবপ্রবণ মা-গুলোইতো সমাজকে এত নিষ্ঠুর কোরে তুলচে মা! আমার বয়স ও শরীরের দিকে না চেয়ে সমাজের মঙ্গলের দিকে বরং দৃষ্টিপাত কর। শাস্ত্রে আছে দরকার হোলে মেয়েকে অনূঢ়া রাখতে দোষ নেই। তবে কেন তোমরা ব্যতিব্যস্ত হও? শক্ত হও—সমাজকে নারীর অভাব বুঝতে দাও। তোমরা বিদ্রোহী হোলে বরের বাপেরা আর ক'দিন বুক ফুলিয়ে বোসে থাক্‌তে পারবে?

তবু মা কত অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন। তাঁর হাজার বলা সত্ত্বেও আমি বিছানা ছেড়ে উঠ্‌লুম না। কাজেই শ্রীরামপুরের বরকর্ত্তারা সেদিন ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

(৩)

আমার বাপ-মা মুস্কিলে পড়লেন। বড়লোকের বাড়ী থেকে সম্বন্ধ এলে আমার বুকে ব্যথা ধরতো—আর গরীবের বাড়ী থেকে কেউ দেখতে এলে বাবা ও মা দুজনেই মুখ ভার করতেন। এরূপ অবস্থায় আমার বিয়ে হওয়ার ব্যাপারটা খুবই সঙ্গীন্ হয়ে দাঁড়ালো।

ঘোষেদের ভোনাকে আমি একটা গেঞ্জী বুনে দিয়েছিলুম। সে লুকিয়ে আমায় এক ভরি আফিং কিনে এনে দিলে। দু'তিনবার ঝুকলুম—আফিংটা খাবার জন্যে। পারলুম না। বাবা মা ও ছোট ছোট ভাই-বোনগুলির মুখের দিকে চেয়ে পারলুম না। তা ছাড়া সমাজের ভিত্তিহীন কলঙ্কের ভয়ে মরতে আমার ঘৃণা হলো। প্রায় এক সপ্তাহ পরে নানা ভেবে চিন্তে আফিংটা আমি খিড়কীর পুকুরে ফেলে দিলুম।

মরতে আমার যতটা ঘৃণা হয়েছিল তার চেয়ে বেশী ঘৃণা হোল আমার বাঁচতে। পথে ঘাটে, গ্রামে গ্রামান্তরে নিন্দে ঠাট্টা ও কলঙ্কের ঢেউ উঠ্‌লো। বাবা অস্থির হয়ে এক জায়গায় আমার বিয়ের স্থির করে ফেল্‌লেন। শুন্‌লুম তারা নাকি টাকাকড়ি কিছুই নেবেন না—অথচ পাত্রটী খুব ভাল। এম এ পাশ কোরে আইন পড়ছেন। বাঁচলুম। সমাজের ওপর আমার যে দারুণ ঘৃণা জন্মেছিল আজ তা অনেকটা শ্রদ্ধায় পরিণত হয়ে গেল।

শাঁখ বেজে উঠলো। এয়োরা উলু দয়ে আমার গায়ে হলুদ দিয়ে গেল। ঠান্‌দি এসে মুচ্‌কি হেসে বল্লে তোর বিয়ের ফুল যে ঝাঁক্‌ড়ালো হয়ে ফুটলো নাত্নি! এতদিনের পর সেদিন আমি সত্যি সত্যি হাস্‌লুম। এমন কোরে প্রাণের ভেতর থেকে হাসি একদিনও আমার মুখে ফোটেনি।

হায়! ভয়ানক একটা দুর্য্যোগ নিয়ে আস্‌বার জন্যে ভগবান্ বুঝি আমাকে এ ক্ষণিকের হাসি দিয়ে তাজা কোরে তুল্‌লেন। বিয়ের দিন দুপুরবেলা পাত্রদের বাড়ী থেকে একখানা চিঠি এলো। চিঠিখানা এই :—

মহাশয়ের সঙ্গে কথা ছিল যে কথিত কুড়ি বিঘা জমি বিবাহের পর রেজেষ্টারী করা হইবে। দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের তাহাতে অমত হইয়াছে। আগামী কল্য মঙ্গলবারে আপনি উক্ত জমি রেজেষ্টারী করিয়া দিলে বুধবারে শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ইতি—

বাবার চোখ দিয়ে ঝর ঝর কোরে জল পড়তে লাগ্‌লো। তিনি চিঠিখানি সেইখানে ফেলে রেখে খিড়কীর দিকে বেরিয়ে গেলেন। জেলেরা মাছ ধরতে এসেছিল, তাদের বুঝিয়ে ফিরিয়ে দিলেন।

রোয়াকের একপাশে চিঠিখানা পড়েছিল। কুড়িয়ে নিয়ে পড়লুম। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হোল আকাশটা যেন হুড়মুড় কোরে আমার মাথার ওপর ভেঙে পড়লো। ওগো! এ রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ঐ আকাশ-সীমার বাইরে যাবার যে কোন উপায় নেই! তবে কি করব?

মরব? না—না, মরা হবে না। বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে বোলে সমাজের সাম্নে আত্মহত্যা কোরে আমি আমার নারীত্বকে কিছুতেই এত হীন হোতে দেব না। তবে উপায়? হয় মরা—না হয় বিয়ে করা। দুটোর একটা যে করতেই হবে। মরা যখন হোল না, তখন বিয়ে। না—না, কিছুতেই আমি বিয়ে করতে পারব না। কুড়ি বিঘে জমিই যে বাবার ভাতভিত্তি। আমার জন্যে তিনি কাচ্চা-বাচ্চার হাত ধোরে পথে দাঁড়াবেন? তা হয় না। মেয়ে হয়ে বাপ মার এত বড় শত্রু হ'তে আমি পারব না—পারব না।

ওঃ, জীবনের সে সন্ধিক্ষণ স্মরণ করতে আজও আমার হৃদ্‌কম্প হয়। একবার মনে হোল বাবার পাদুটো জড়িয়ে ধরে বলি, আমার বিয়ে না দিয়ে তুমি এক-ঘরে হও বাবা। এক-ঘরে না হওয়ার জন্যে তোমার যা অনিষ্ট হবে তার চেয়ে এ অনিষ্ট ঢের ছোট। বলা হোল না। যতবার বল্‌তে গেলুম ততবারই লজ্জা এসে আমার গলা যেন টিপে ধরতে লাগলো।

সহসা সহানুভূতির স্বরে পিছনদিক থেকে কে বোলে উঠ্‌লো,—ওমা! কি ছোটলোক গো, এই নাকি তারা এক পয়সাও নেবে না?

ফিরে চেয়ে দেখি,—ঠান্‌দি। আমি যেন পাগলের মত হয়ে তার হাতটা ধরে হড়্ হড়্ কোরে একেবারে ছাদের ওপর টেনে নিয়ে গেলুম। বল্লুম,—তোমার দাদার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দাও ঠান্‌দি। যাতে তিনি আমায় পায়ে কোরে নেন – তুমি দয়া কোরে তা কোরে দাও।

বল্‌তে বল্‌তে ঠান্‌দির বুকের ওপর মাথা গুঁজে আমি কেঁদে ফেল্‌লুম। টপ্ টপ্ কোরে গরম জলের ফোঁটা আমার মাথায় পড়তে লাগ্‌লো। বুঝ্‌লুম—আমার ব্যথা ঠানদির বুকে বজ্র হয়ে বেজেছে।

দু'তিন মিনিট পরে ঠান্‌দি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লে, আমাদের বাড়ীতে গিয়ে বসগে যা, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। তোর কথায়তো আর হবে না ভাই! তোর বাপ মাকে আগে জিজ্ঞাসা করি।

এবার আমি তার মুখের দিকে চেয়ে আবেগের স্বরে বলে উঠলুম, না ঠানদি, তোমার পায়ে পড়ি, তাঁদের কোন কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। আমি জানি,—কিছুতেই তাঁরা এতে মত দিতে পারবেন না। আমি লুকিয়ে এ বিয়ে করব।

ঠান্‌দি গম্ভীরভাবে বল্লে, তুই যা, আমি যেমন কোরে পারি—তোর বাপ মা'র মত করিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি আশ্বস্ত হয়ে ঠানদির বাড়ীতে গিয়ে বস্‌লুম। একটু পরেই ঠান্‌দি হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে এলো। ব্যস্ত-বাগীশ হয়ে বল্লে, শিগ্‌গির কোরে সেজে গুজে নে। আমি পাল্কী ডেকে এনেচি।

আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই ঠান্‌দি আমার হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। লোহার সিন্দুক থেকে একরাশ গয়না বের কোরে আমায় পরিয়ে দিলে। ভাল একখানা শাড়ী বের কোরে দিয়ে বল্লে, নে নে, চট্ কোরে পরে নে। কখন কি হবে বল্ দেখি?

ঠান্‌দি আমায় এমন ব্যস্ত কোরে তুল্লে যে, তখন আমি আমার অবস্থার কথা একটু তলিয়ে ভাববারও অবকাশ পেলুম না।

আমরা দুজনে পাল্কীতে গিয়ে উঠ্‌লুম। তখন বেলা দুটো।

(৪)

ঘণ্টাখানেক পরে আমার ভাবী-বরের বাড়ীতে পাল্কী এসে হাজির হল। বুঝ্‌লুম—এবার আমার অগ্নিপরীক্ষার পালা সুরু হবে। গঙ্গাবতরণকালে শিব যেমন তাঁর বেগ ধারণ করবার জন্যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আমিও তেমনি আমার মনটাকে খুব শক্তকোরে নিয়ে সকল রকমে প্রস্তুত হয়ে তবে পাল্কী থেকে নামলুম।

একি! সুমুখেই যে ঠান্‌দির দাদা দাঁড়িয়ে! অন্যবারে এসে তাঁকেই যে প্রথমে প্রণাম করেছি। কিন্তু আজ! আজ আমি কি করব? ফিরে দেখি ঠান্‌দির দাদা আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছে। দারুণ লজ্জায় আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। পাশে একটা দরজা ছিল, আমি সেই দরজার আড়ালে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে তবে বাঁচলুম।

ঠান্‌দি জিজ্ঞাসা করলে, আমার চিঠি পেয়েছ দাদা? ঠানদির দাদা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন,—নিমে বাগ্‌দী এই একটু আগে তোমার চিঠি নিয়ে এল। বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে পড়লো। তা হোক্‌গে। আমি এক্ষুনি সব বন্দোবস্ত কোরে ফেলচি। তুমি বাড়ীর ভেতর গিয়ে এদিককার জোগাড় সব কোরে ফেল।

আমি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে তবে নিঃশ্বাস ফেল্লুম। ঠান্‌দির দাদা এক কথায় রাজী হয়েচেন দেখে আমি ভগবানকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলুম। তিনি দয়া না করলে আমার এ কঠোর যজ্ঞ আজ যে কিছুতেই পূর্ণ হতনা।

ঠান্‌দি আমায় বাড়ীর ভেতর নিয়ে গিয়ে বেশ সাজানো গুছানো একখানি ঘরে বসিয়ে দিলে। সেখানে একলা বসে সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত আমি আমার স্বামী দেবতার প্রথম পূজার জোগাড় করতে লাগ্‌লুম। আমার জীবন-নৈবেদ্যটাকে বেশ কোরে সাজালুম—স্বামীকে উৎসর্গ কোরে দেবার জন্যে।

তোমরা হয়ত এটা অসম্ভব ভেবে অবজ্ঞা কোরে হাসচ। হাস্‌বারই কথা। তবে একটা কথা এই যে, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ আমার মত ছা-পোষা বাপের মেয়ে হতে,—সমাজের অত্যাচার যদি আমার মত কাউকে উৎপীড়িত কোরে তুলতো তা হলে দেখ্‌তে এটা খুবই সম্ভব। বিবাহের পর আমারও মনে হয়েছিল যে, আমি সে লোক নই—যে একদিন একজন আশীবছরের পঙ্গু বুড়োকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পেরেছিল!

যাক্, গোধূলি লগ্ন উপস্থিত হল। আত্মীয় কুটুম্বে বাড়ীটা একদম ভরে উঠেচে। সকলেই এক একবার এসে আমায় দেখে মুচকে হেসে চলে যাচ্ছে। তাদের হাসির অর্থ আমি খুব ভাল রকমই বুঝ্‌তে পারলুম। তারা "বুড়ো শিবের" বিয়ে দেখ্‌তে এসেচে কি না!

সহসা বাইরের রাস্তায় একটী ছেলে করুণ-কণ্ঠে গেয়ে উঠ্‌লো,—

"উলু নয় রোদনধ্বনি—
প্রাণ কাঁপে শাঁকের ডাকে"

ওগো! কে আছ? আমায় ধর ধর। আর বুঝি আমি আমার নারীত্বকে খাঁড়া কোরে রাখ্‌তে পারলুম না। আমার এ পবিত্র মন্দিরটী এক ফুঁয়ে তাসের ঘরের মত বুঝি ভূমিসাৎ হয়ে যায়! বুকের ভেতর দুর্ দুর্ কোরে উঠ্‌লো। মনে হোল দৌড়ে গিয়ে ছোঁড়াটাকে ধরে তা'র দাঁতগুলো একটা নোড়া দিয়ে ভেঙ্গে দি। ছেলেটী গানের এককলি গেয়েই থেমে গেল। আ-আঃ, বাঁচ্‌লুম। আবার আমি আমার মনটাকে বেশ গুছিয়ে নিয়ে আরো বেশী রকমে তাজা কোরে তুলতে লাগ্‌লুম।

ঠান্‌দি এলো একখানা বেনারসী চেলী নিয়ে। তাড়াতাড়ি আমায় পরিয়ে দিয়ে বল্লে, শিগ্‌গির কোরে চল্—লগ্নের সময় খুব অল্প। ঠানদি আমার হাত ধরে নিয়ে বিবাহ-মণ্ডপে উপস্থিত হোল। গিয়ে দেখি—আমাদের সদানন্দ পুরুত মহাশয় বাবাকে মন্ত্র বলাচ্ছেন! বাবাকে দেখে আমার সাহস বেড়ে উঠ্‌লো। তোমরা বিশ্বাস করবে কি না তা জানি না—বুড়ো বরকে বিয়ে করচি বোলে কোন দুঃখকষ্ট তখন আমার প্রাণে তো ছিলই না—এবং আনন্দ হয়েছিল এই ভেবে যে, আমি আমার বাবাকে এমন সহজে কন্যাদায় থেকে মুক্ত করতে পেরেচি।

যথারীতি বিয়ের অনুষ্ঠাণগুলো একে একে চলতে লাগ্‌লো। স্বামী আমার হাতটা নিয়ে তাঁর হাতের ভেতর রেখে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। উভয়ে মালা বদল করলুম।

তারপর শুভদৃষ্টির পালা। ছাউনীর নীচে বরের সামে আমায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলো। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বেশ ভাল কোরে শুভদৃষ্টি করবার জন্যে চারদিক থেকে উপর্য্যুপরি আদেশ অনুরোধ কত কি আসতে লাগ্‌লো। পাছে আমার এত মনের জোর একটা হীণতায় পরিণত হয় এই ভয়ে আমি আমার সকল লজ্জার বাধা ঠেলে ফেলে স্বামীর দিকে বেশ ভাল কোরেই চাইলুম।

কিন্তু একি! এ কি দেখ্‌চি আমি? এত পূণ্য আমি কোথায় পেলুম গো? আমার এ জীবন-জোড়া দুঃখের দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীর ভেদ কোরে সুখৈশ্বর্য্যের এ বিরাট আশা কে নিয়ে এলো? ইনিতো ঠান্‌দির দাদা নন্,—ইনি যে ঠান্‌দির ভাইপো নরেশবাবু! এই সেদিন যে ইনি নতুন হাকিম হয়েচেন! ভগবান্, ভগবান্! আমি যে বড় অভাগী। তুমি এত দয়া আমায় কেন করলে প্রভু? আমি যে এত সুখের বোঝা বইতে পারব না—আমি যে দুঃখকেই বরণ করে নিতে এসেছিলুম—সুখের জন্য তো আজ আমি প্রস্তুত হয়ে আসিনি ঠাকুর!

বহু চেষ্টা কোরেও চোখের জল থামিয়ে রাখ্‌তে পারলুম না। টস্ টস্ কোরে চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগলো।

* * * *

বাসর ঘরে যাবার আগে ঠানদিকে দেখ্‌তে পেয়ে আমি তাঁর পায়ের উপর মুখটা গুঁজে ধরে "ঠান্‌দি—ঠান্‌দি" বোলে কেঁদে উঠ্‌তেই ঠানদি সস্নেহে আমায় চুমু খেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, আ মরণ, আমি যে তোর শাশুড়ী লো, এখনো ঠান্‌দি বলতে আছে কি?

গরীব

[শ্রীপূর্ণিমা দেবী বি-এ]

গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢঙ্ ঢঙ্ করে দশটা বেজে গেল। তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে নীচে এসে ডাকলুম "ঠাকুর! ভাত দিয়ে যাও।"

রমানাথ প্রায় দশ বছর ধরে আমাদের কাছে চাকরী করছে। ভারী বিশ্বাসী সে। এখানকার বাসায় শুধু বড়দা আর আমি থাকি। বড়দা ঠিকাদারের কাজ করেন। সকাল হতেই তাঁকে বেরুতে হয়। দুপুরে খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য ঘণ্টা দুইমাত্র বাড়ীতে থাকেন। তারপর আবার যখন কাজ সেরে ফিরে আসেন তখন সন্ধ্যা হয়ে যায়। আমি ডাক্তারী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। দশটা এগারটার পর থেকে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত আমাকেও বাইরে কাটাতে হয়। রমানাথ একা ঘরে থাকে। আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য পরিশ্রম করিতে তাকে কোনদিনই কাতর দেখি নি। লোকটার চরিত্রবল যেমনি, গায়ের জোরও তেমনি অসাধারণ। তার যে কোনদিন অসুখ করতে পারে সে ধারণাই আমাদের ছিল না।

দুবার ডাক দিয়েও রমানাথের কোনও জবাব না পেয়ে হঠাৎ কেমন একটা আশঙ্কা হল। রান্নাঘরে তাকে দেখতে পেলুম না। আহারের কোন জোগাড় পর্য্যন্ত ছিল না। ব্যাপার কি! সে গেলই বা কোথায়? উদ্বিগ্ন হয়ে এ-ঘর সে-ঘর খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলুম সিঁড়ির ধারের ঘরটায় শুধু মেঝের উপর শুয়ে অস্ফুট কাতরোক্তি করছে। ব'ললে পায়ে অসহ্য ব্যথা। কাণের গোড়া, মুখ, চোখ সমস্তই ফুলেছে দেখতে পেলুম। তবে কি এ প্লেগ? আহা—হয়ত সে আর বাঁচবে না! আর এ রোগ্‌টাও ভারী ছোঁয়াচে। বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। রমানাথকে বললুম, "আমাদের কলেজের হাঁসপাতালে তোকে রেখে আসব?" একথা শুনে ঠাকুর কেঁদে ফেললে। বল্লে "বামুনের ছেলে হয়ে বাবু, হাঁসপাতালের ভাত খেয়ে জাত খোয়াব? নিজের জীবনের মায়ায় বাপ পিতাম'র অধোগতি করব? তা পারব না!"

কিন্তু বাড়ীতেই বা তাকে কি বলে থাকতে দিই! তবে আর এক কাজ করা যাক, আমরাই না হয় দিন পাঁচ সাতের জন্য একটা মেসে শোবার ও খাবার বন্দোবস্ত করিগে। আর ওকে কিছু টাকা দিই এবং বাড়ীতেই থেকে চিকিৎসা চালাবার জন্য একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিই। ভগবানের কৃপায় সে বেঁচে উঠুক। আমার মনের কথা আন্দাজ করে রমানাথ বললে "আমার জন্য কিছু ভেবনা দাদাবাবু। মরতে ত একদিন হবেই, দুদিন আগে, নয় দুদিন শেষে। কিন্তু—এই বলে সে ছোট ছেলের মত কেঁদে উঠ্‌ল। বল্লুম "এত উতলা হচ্ছ কেন? তুমি যে মরবেই তা কে বললে? এই বাঘের মত জোয়ান চেহারা তোমার, যদি সামান্য একটু জ্বর কিম্বা যাতনায় নুয়ে পড়—"

রমানাথ চোখ মুছে বললে "ভয়? না দাদাবাবু, ভয় কাকে বলে আমি জানি না। মরতে ভয় করি না আমি মোটেই। দিনের কাজের শেষে ঘুমিয়ে পড়ব,—এত' সুখের কথা। তবে··· ·······দেশে আমার একটী পাঁচবছরের ছেলে আছে, নাম তার মণ্টু, দুমাস ছমাসের পর এক একবার তাকে গিয়ে যখন দেখে আসি, কত আহ্লাদ যে হয় তা বলতে পারি না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সে আমার পথ চেয়ে বসে আছে। মাঘ মাসে তার জন্য রাঙা কাপড়, ছবির বই, ঘাগড়া-পরা পুতুল নিয়ে যাব বলে সব কিনে রেখেছি। দাদাবাবু! আমি ছাড়া তার আর যে কেউ আপন বলতে নেই! যাদের আশ্রয়ে আছে, একমাস টাকা না পাঠালে তারাও আর দেখবে না, শুধু তার জন্যেই আমি বাঁচতে চাই। আমায় বাঁচাও দাদাবাবু—আমি মরতে পারব না!—"

জলভরা চোখের ব্যথিত চাহনি বড় করুণ বোধ হল। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে আমি তাকে আশ্বাস দিতে বৃথা চেষ্টা করলুম!

আহা, বেচারী, গরীব! সামান্য দুটী পয়সার জন্য পরের অনুগ্রহ ও আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে, সবার নীচে থেকে এক কোণে পড়ে রয়েছে। গরীব সে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে জীবিকার সংস্থান করে! কিন্তু তাহলেও তার ওই কুশ্রী বিকট দেহখানার ভিতরেও এমন একটী প্রাণ আছে, যে সন্তানের কল্যাণ কামনায় সতত উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে, দয়িতের ওষ্ঠাধরে সুখের হাসি খেলতে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে। আমরা ভুলে যাই,—তারাও মানুষ—তারাও বৃদ্ধ পিতামাতার অবলম্বন—রমণীর স্বামী—সন্তানের পিতা!

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার সঙ্গে করে বাড়ী এসে দেখলুম দাদা ফিরেছেন।

রমানাথ কেমন আছে জিজ্ঞাসা করতে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি বললেন "পাগল হয়েছিস্ তুই! প্লেগের রোগী,—ঘরে রেখে চিকিৎসা করাব? আমি বাড়ী এসেই, তাকে দশটী টাকা দিয়ে হাঁসপাতালে কিম্বা আর কোথাও আশ্রয় নিতে বলে দিয়েছি।"

"সে যে উঠে বসতে পাচ্ছিলনা দাদা! কোথায় তাকে পাঠালে? মাথা ঘুরে পথে যে মরে পড়ে থাকবে!"

"গরীব বেচারা, ও ছাড়া আর কি গতি তাদের হবে? তাইবলে ঘরের ভেতর প্লেগের রোগীকে থাকতে দিতে পারি না। কেমন ডাক্তার বাবু? আপনিই বলুনত, শেষে কি একটা চাকরের জন্য পৈতৃক প্রাণটা এমনি বেঘোরে খোয়াব?"

আহা! হতভাগ্যের সব চেয়ে বড় অপরাধ সে গরীব! আজ যদি তার বদলে দাদার কিম্বা আমার নিজের এই রোগ ধরত!

সারা দিনটা বৃথাই পথে পথে অন্বেষণ করলুম। কোনও সন্ধান মিলল না। উপযুক্ত চিকিৎসা হলে যদিও বা সে বাঁচত, আমাদের অবহেলায় সে অকালে প্রাণ হারাল!

দিন পাঁচ ছয় পরে কলেজের শবব্যবচ্ছেদাগারে নূতন যে মৃতদেহ এসেছিল তার মাথা ও গলার অংশ পরীক্ষা করবার ভার আমরা পেয়েছিলুম। সেই উদ্দেশ্যে আমি ও আমার এক সতীর্থ সেখানে যেতেই চমকে উঠলুম—এইত রমানাথ! রমানাথ! হায়, তুমি যে গরীব! এছাড়া আর কি গতি তোমার হবে? সারা-জীবন ধরে আমাদের সেবা যত্ন করে শেষের দিনে একবিন্দু সহানুভূতিরও দাবী তোদের নেই!

চোখের কোণে তখনো সেই ব্যথিত চাহনিটুকু লেগে ছিল। ওই করুণ আঁখির দৃষ্টি যেন বলছে "দাদাবাবু—পাঁচবছরের ছেলে মণ্টু—তার যে আর কেউ নেই। শুধু তার জন্যই আমায় বাঁচাও তুমি!"

তার নগ্ন বিকৃত দেহটার শেষ গতিটুকুও কি আমাদেরই করতে হবে এই রকম শকুনির মত হাড় মাংস নিয়ে খেলা করে?

পরিণাম

(গল্প)

[শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়]

রামধন ঘোষাল ধনাঢ্য ব্যক্তি। পৈতৃক প্রভূত ভূসম্পত্তি ও তেজারতি কারবার সুদক্ষভাবে পরিচালনা করিয়া বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতায় কয়েকখানি বাড়ী খরিদ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন বহু সুপ্রসিদ্ধ যৌথ কারবারের অংশীদারও হইয়াছেন। বিধাতার বিচিত্র লীলা—ধনকুবের রামধনের মনে সুখের লেশমাত্রও নাই। আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে রামধনের আপনার বলিতে যে কয়জন ছিলেন- পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্ত্রী, একে একে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। উপর্য্যুপরি এরূপ আত্মজন বিয়োগে রামধন বাবু সর্ব্বদাই শোকে মুহ্যমান থাকেন। বৈষয়িক কার্য্যাদি সাঙ্গ হইলে তিনি তাঁহার একমাত্র কন্যা মায়ার সহিত কথাবার্ত্তায় লিপ্ত থাকিয়া কিছুক্ষণের জন্য শান্তি উপভোগ করিতেন। মায়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তিনি নিদারুণ শোক-তাপ বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতেন। মায়া পরমাসুন্দরী ও সর্ব্বগুণ সম্পন্না বালিকা। বয়স মাত্র নয় বৎসর। অগাধ ঐশ্বর্য্য ও সর্ব্বদা দাসদাসী পরিবৃতা থাকা সত্ত্বেও মায়ার চিত্তেও শান্তি ছিল না। কেবলমাত্র সকালে ও বিকালে যখন তাহার খেলার সাথী জ্ঞানেন্দ্রনাথ খেলিতে আসিত তখনই কেবলমাত্র মায়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া খেলিত। অন্য সময়ে ক্ষুদ্র বালিকা কি যেন একটা অজানা, অব্যক্ত অভাব অনুভব করিয়া বিমর্ষ হইয়া থাকিত। রামধনবাবু শত চেষ্টাতেও মায়ার এ ভাব দূর করিতে পারেন নাই। বহু অর্থব্যয় করিয়া নানারূপ অলঙ্কার, বেশভূষা, খেলানা, পুস্তকাদি কিনিয়া কন্যাকে দিতেন; লেখাপড়া শিল্পশিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহ বৈকালে সহর ভ্রমণ ও নিজের এবং কন্যার মন ভুলাইবার জন্য বায়স্কোপাদি দর্শন করিয়াও নিজের বা কন্যার মনে রামধনবাবু আকাঙ্খিত শান্তি আনিতে পারিতেন না। রামধনবাবু পুনরায় দার-পরিগ্রহের বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনরায় স্ত্রী-বিয়োগের আশঙ্কায় ও পাছে মায়ার অযত্ন হয় এই ভয়ে তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁহার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের পুত্র। ধীর, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ও সুন্দর বালক। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে জ্ঞানেন্দ্রও পিতৃ-মাতৃহীন। রামধন প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অভিপ্রায় মনে মনে পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যে "স্বজন নাশ" যোগ তাঁর মত জ্ঞানেন্দ্রেরও আছে ভাবিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। আরও ভাবিলেন যে পোষ্যপুত্র লইলে পুত্র ও কন্যার মধ্যে হয়ত সদ্ভাব না হইতে পারে। পরস্পর পরস্পরকে স্নেহের চক্ষে না দেখিলে ভবিষ্যতে সকলের জীবনই দুঃখময় হইবে এই ভাবিয়াও বিশেষতঃ তিনি পোষ্যপুত্র লওয়া অসঙ্গত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এদিকে জ্ঞানেন্দ্রের প্রতি তাঁরও স্নেহ জন্মিয়াছে। তার উপর মায়া ও জ্ঞানেন্দ্রের বালসুলভ প্রীতিতে জ্ঞানেন্দ্রের প্রতি তাঁহার স্নেহ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতঃপর তিনি স্থির করিলেন যে জ্ঞানেন্দ্রকেই জামাতৃপদে বরণ করিবেন। জ্ঞানেন্দ্রর লেখা-পড়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। জ্ঞানেন্দ্র, পৈতৃক ভিটায় তার বিধবা পিসিমার নিকটই থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। রামধনবাবু সেই অনাথা বিধবার মনে কষ্ট দিয়া জ্ঞানেন্দ্রকে নিজ বাটীতে রাখিতে অনিচ্ছুক হইলেন। রামধনের মনোভাব কিন্তু কেহই জানিত না।

রামধনবাবুর ভৈরব বলিয়া একটী যুবক কর্ম্মচারী ছিল। ভৈরবের কার্য্য নিপুণতায় সে অল্পদিন মধ্যে মনিবের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। ফলে ভৈরবের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া রামধন নিশ্চিন্ত থাকিতেন। ভৈরব অতিশয় চতুর ও ক্রূর প্রকৃতি। তাহার মিষ্টভাষে সকলেই তুষ্ট হইত। কেহই

জানিতে পারিত না যে ভৈরবের মনের মধ্যে অন্য এক ভাবের প্রবল তরঙ্গ সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইতেছে। ঐশ্বর্য্য ও বংশ মর্য্যাদায় অতিশয় হীন হইলেও সামাজিক হিসাবে রামধনের পাল্টা ঘর এই ভাবিয়া মনে মনে মায়াকে বিবাহ করিবার আশা সে গোপনে সযত্নে পোষণ করিত। কি প্রকারে সে মায়াকে তুষ্ট করিবে এবং তাহা হইলেই রামধনবাবুও সন্তুষ্ট হইবেন, এই চিন্তায় সে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিত। কাজেই ভৈরবের এসব কার্য্যের জন্য অর্থাভাব হইল। ভিতরে ভিতরে সে মনিবের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করিল।

মায়ার বয়স দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইতে চলিল। রামধনবাবু যোগ্য পাত্রের অনুসন্ধানে কয়েকজন বিজ্ঞ প্রবীন ঘটক নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রকে জামাতা করিবার আশা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক আছে।

আজ বি-এ পাশের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। রামধন বাটীতে আসিয়া বৈকালে অন্যান্য দিনের মত জ্ঞানেন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জ্ঞানেন্দ্র যে সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে এ বিশ্বাস রামধনের ছিল। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রকে অবনত মস্তকে জলভারাক্রান্ত নয়নে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "জ্ঞান! কোন ডিভিশনে পাশ করিলে এবার—?" জ্ঞান নীরব স্পন্দহীন। "তবে কি ফেল হয়েছ? আমার সব আশা নষ্ট করলে? আমি যে বড় সাধ করেছিলাম তুমি বি-এ পাশ করলেই মায়ার সঙ্গে তোমার বে দিয়ে তোমায় 'ল' কলেজে ভর্ত্তি করে দিব।" বহুদিনের সঞ্চিত আশা "মায়ার সহিত জ্ঞানেন্দ্রের বিবাহ" একথা আজ আবেগভরে রামধনবাবু বলিয়া ফেলিয়াছেন। এ কল্পনাতীত অচিন্তনীয় পুরস্কার লাভের আশা জ্ঞানেন্দ্র স্বপ্নেও করেন নাই। সহসা একথা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে সত্যই তিনি জাগ্রত কি নিদ্রিত। ঘরের দরজায় মায়ার সলাজ প্রফুল্ল নয়ন তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল। মায়াকে দেখিবামাত্রই জ্ঞানেন্দ্রের ঘৃণা, ক্ষোভ ও লজ্জা শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। সে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া রামধনের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রামধন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এবার বি-এ পাশ করিয়া তবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিও।" পরে মনে মনে ভাবিলেন যে মেয়েটার বিবাহে আমার দেরী পড়িল।

মায়া আর এখন বালিকা নহে। সে সবই একটু আধটু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইবে বাপের নিকট শুনিয়া আন্তরিক অত্যন্ত খুসী হইল। যাহাতে এবার জ্ঞানেন্দ্র ফেল না হয় সেজন্য দেব-দেবীর নিকট কত কি মানসিক করিল। ঐদিন হইতেই মায়ার বালিকাসুলভ চপলতা অন্তর্হিত হইল। সে আর বৈঠকখানায় পিতার নিকট যাওয়া বন্ধ করিল। প্রয়োজন হইলে পিতাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইত। বহুদিন পরে রামধনের সংসারে আবার অন্তঃপুর সৃষ্ট হইল।

মায়ার সহিত জ্ঞানেন্দ্রের বিবাহ-ই রামধনের ইচ্ছা একণে অনেকে জানিতে পারিল। ইহাতে ভৈরব ব্যতীত অন্য সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিল। জ্ঞানেন্দ্রের প্রতি ভৈরবের ঈর্ষা সহস্রগুণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। জ্ঞানেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে উপযুক্ত অবসর পাইয়া ভৈরব সুযোগ বুঝিয়া প্রায়ই রামধনবাবুর নিকট জ্ঞানেন্দ্রের নামে অযথা নিন্দা ও দোষারোপ করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একবৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। রামধনবাবু প্রাতঃকালেই সংবাদ পত্র শশব্যস্তে পাঠ করিতে লাগিলেন। সহসা আনন্দে অধীর হইয়া "ভোলা" "ভোলা" বলিয়া তাহার পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভোলা রামধনকে কোলে পিঠে করে মানুষ করিয়া ছিল। জ্ঞানেন্দ্রকে অদ্য সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবার জন্য ভোলাকে আদেশ করিলেন। পরক্ষণেই কি জানি কি ভাবিয়া আবার তাহাকে ডাকিয়া জ্ঞানেন্দ্রের পিসিমাকেও ঐ সঙ্গে গাড়ী করিয়া আনিতে বলিলেন। ভোলা চলিয়া গেল। পিতার নিকট যথাসময়ে মায়া এ কথা শুনিয়া মনে মনে বড়ই প্রীতা হইল। "পিসিমার" অভ্যর্থনার জন্য সে স্বয়ং উদ্যোগ করিতে লাগিল।

রামধনবাবু ও জ্ঞানেন্দ্র উভয়ের মধ্যে আজ সর্ব্বাপেক্ষা কে অধিক সুখী তাহা পাঠক পাঠিকাগণের বিচারাধীন।

জ্ঞানেন্দ্রের পিসিমা তাঁর ভাবী "বধূমাতা"কে পাইয়া আত্মহারা হইয়া গল্প করিতেছেন। আজ তাঁর অনাথ যুবক জ্ঞানেন্দ্রের জমীদার রামধনবাবুর একমাত্র কন্যা মায়ার সহিত বিবাহ—দানহীন জ্ঞানেন্দ্রের দুঃখের অমানিশা কাটিয়া সুখের দিন উদয় হইল—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা পত্নী, সঙ্গে সঙ্গে কুবেরের ভাণ্ডারের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ এই চিন্তাই তাঁহার শুষ্ক হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দের বন্যা ছুটাইয়া দিল। তিনি বলিলেন "মা—তোমাদের চার হাত এক হ'ক, তোমরা রাজা রাণী হয়ে সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি। এবার আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে মরতে পারব।" কল্পনায় আজ সকলেই মনে মনে মোহিনী চিত্রাবলী অঙ্কিত করিতে ব্যস্ত কিন্তু নিয়তি দেবী যে ভাগ্যচক্র অন্যপথে চালিত করিতেছেন তাহা কেহই স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই এমনই আনন্দে মত্ত।

আহারান্তে সকলের বায়স্কোপ দেখিতে যাওয়া স্থির হইল। ভৈরব মোটরগাড়ী প্রস্তুত করিয়া আনিতে হুকুম পাঠাইল। যথাকালে রামধনবাবু, মায়া ও পিসিমা বায়স্কোপ দেখিতে চলিয়া যাইলেন। জ্ঞানেন্দ্রের শরীর অসুস্থ থাকায় যাইতে পারিল না। সে রামধনবাবুর শয়নকক্ষের পাশের ঘরে শুইয়া পড়িল।

ভৈরব মধ্যে মধ্যে যেরূপ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিত তাহাতে তাহার তৃপ্তি হইত না। আজ রাত্রে বাটীতে কেহ নাই—এ অপূর্ব্ব সুযোগ সে ত্যাগকরিতে পারিল না। রাত্রি ১১টার পর যখন দাস দাসী সকলেই নিদ্রিত তখন সে নীরবে রামধনের ঘরে প্রবেশ করিয়া, লোহার সিন্দুক খুলিয়া ফেলিয়া মনের সাধে কার্য্য সাধন করিতে লাগিল।

মায়ার সহিত বিবাহ হইবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া ভবিষ্যতের সুখের ছবি কল্পনায় নানা ভাবে অঙ্কিত করিতে আজ জ্ঞানেন্দ্র মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষে ঘুম নাই। সহসা পাশের ঘরে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুক খোলার আওয়াজ শুনিয়া জ্ঞানেন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হইল। সে রামধনবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন ভাবিয়া অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ মানসে—কিরূপ বায়স্কোপ দেখিলেন, ভাল লাগিল কিনা প্রভৃতি জানিবার জন্যই যেন নগ্ন পদেই দেখা করিতে গেল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই ভৈরবকে দেখিয়া বিস্ময়ে চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় ক্ষণেকের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। ভৈরব জানিত যে জ্ঞানেন্দ্রও রামধনবাবুর সহিত বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছেন। সহসা জ্ঞানেন্দ্রকে দেখিয়া সে ভীত চকিত ও স্তম্ভিত হইল। মুহূর্ত্তেই ভৈরবের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া জ্ঞানেন্দ্র উহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বন্ধন ও মুক্তির ঘোরতর দ্বন্দ্ব অবাধে চলিতে লাগিল।

এদিকে যথা সময়ে বায়স্কোপ দেখিয়া রামধনবাবু ফিরিলেন। মায়া ও পিসিমা ভিন্নপথ দিয়া অন্দরমহলে চলিয়া যাইলেন। বাহিরের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবামাত্রই মারামারি ও গালাগালির শব্দ শুনিয়া ভয় চকিত রামধনবাবু শশব্যস্তে নিজ ঘরে ছুটিয়া গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। ব্যাপার খানা যে কি তাহা তিনি বুঝিতেই পারিলেন না। তাঁর ধারণায় আসিল না যে ভৈরব ও জ্ঞান উভয়ে রাত্রি কালে তাঁহার কক্ষে মল্লযুদ্ধ কেন করিবে? সহসা উন্মুক্ত সিন্দুক ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুদ্রার থলি গুলি দেখিয়া ঘটনাটী বুঝিতে আর বাকী রহিল না। জ্ঞানেন্দ্র ও ভৈরব উভয়েই রামধনবাবুকে দেখিয়া নিরস্ত হইল। জ্ঞানেন্দ্র আদ্যোপান্ত ঘটনা রামধনবাবুকে বলিতে না বলিতে ক্ষিপ্ত ভৈরব অবসর পাইয়া রামধনবাবুর শয্যাতল হইতে রিভলভার বাহির করিয়া লইয়াই জ্ঞানেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। বিধাতার বিধান অন্যরূপ। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় জ্ঞানেন্দ্রের পরিবর্ত্তে রামধনবাবু আহত হইলেন। তাঁহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূমিতে লুটাইল। উত্তেজিত জ্ঞানেন্দ্র প্রাণ উপেক্ষা করিয়া পুনরায় ভৈরবকে অমিততেজে জড়াইয়া ধরিলেন। নৈরাশ্য পীড়িত ভৈরব লোভ ও ঈর্ষানলে প্রজ্জলিত হইয়া উন্মুক্ত উগ্র ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সে পিস্তলের দ্বারা সজোরে জ্ঞানেন্দ্রের মস্তকে আঘাত করায় জ্ঞানেন্দ্র হতচেতন হইল। মূর্চ্ছিত জ্ঞানেন্দ্রের হাতে রিভলভারটী দিয়া ধূর্ত্ত আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। এই ঘটনা

বিবৃত করিতে বা পাঠক পাঠিকার পাঠ করিতে যে সময় লাগিল তদপেক্ষা অতি অল্প সময় মধ্যেই এই সব কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল।

পিস্তলের শব্দ, রামধনবাবুর চীৎকার, জ্ঞানেন্দ্রের আর্তনাদে মায়া ও পিসিমা অন্দর মহল হইতে এবং দ্বারবান চাকরেরা সদর হইতে দৌড়িয়া আসিয়া উভয়ের রুধিরাপ্লুত দেহ দেখিয়া ক্ষণেক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। পরক্ষণেই প্রতিবাসী ও পুলিশ কনেষ্টবলে গৃহ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। ভৈরবের কথামত সংজ্ঞাহীন জ্ঞানেন্দ্রকে পুলিশ ধৃত করিয়া হাসপাতালে চালান দিল। ভৈরবের চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে রামধনের মৃতদেহ পুলিশ স্পর্শও করিল না। তাহাতে প্রতিবাসী বৃন্দ সকলেই ভৈরবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

বিচারে জ্ঞানেন্দ্রের সাত বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। মায়া ও পিসিমা রোদন করিতে লাগিলেন অভাগিনী মায়ার আপনার বলিতে আর কেহই রহিল না। জ্ঞানেন্দ্রের নিরপরাধিতা সম্বন্ধে মায়ার কোনও সন্দেহ নাই। সে পিসিমাকে সর্ব্বদাই বুঝাইতে লাগিল যে জ্ঞানেন্দ্র নিরপরাধী—এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন নিষ্কলঙ্ক জ্ঞানেন্দ্র আবার সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন। জ্ঞানেন্দ্রের প্রতি মায়ার অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস আছে দেখিয়া মায়ার কাতর অনুরোধে পিসিমা মায়াকে একাকিনী অসহায়া রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। দুজনে স্ব স্ব অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া প্রত্যহ রোদন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

মায়ার আদেশে জ্ঞানেন্দ্রের বাটী ভাড়া দেওয়া হইল।

ভৈরব এখন সর্ব্বময় কর্ত্তা। যতদিন না মায়ার বিবাহ হয় ততদিন আদালত হইতে ভৈরব-ই অভিভাবকরূপে নিযুক্ত হইল। মায়া বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় ভৈরব দুটী বিশেষ কারণে আপত্তি করিল না। প্রথমতঃ যতদিন না বিবাহ হয় ততদিন সে অভিভাবকরূপে সমুদায় সম্পত্তি যথেচ্ছা ভোগ করিতে পাইবে। আর যদি ভবিষ্যতে সুব্যবহারে কোনও রূপে মায়ার মন ভুলাইতে পারে তবে তাহাকে পত্নীরূপে লাভও করিতে পারিবে। এই আশা ভৈরব হৃদয়ে সযত্নে সংগোপনে পোষণ করিতে লাগিল।

ঘটনাচক্রে দোষী আততায়ী ভৈরব নিষ্পাপ, আর নিরপরাধী জ্ঞানেন্দ্র চুরী ও হত্যাপরাধে দণ্ডিত! পাপের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি নারকী ভৈরব আজ রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে—আর ধর্ম্মপ্রাণ আদর্শচরিত্র জ্ঞানেন্দ্র রাজ কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ! ভৈরব ও জ্ঞানেন্দ্র উভয়েই এই চিন্তা অহরহ করিতেছিল। বিলাসোন্মত্ত উদ্দাম-প্রবৃত্তি ভৈরব স্বীয় পৈশাচিক কার্য্যাবলী সত্বেও সাধারণে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ায় যথেচ্ছাচারী আরও পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে লাগিল।

সুরাপানে বিকৃত মস্তিষ্ক ভৈরব একদিন রামধন বাবুর কক্ষে বসিয়া,—যে ঘরে সে সিন্দুক খুলিয়া টাকা চুরি করিতেছিল—যেখানে সে রামধন বাবুকে হত্যা করিয়াছে—যে স্থানে জ্ঞানেন্দ্র পিস্তল প্রহারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল—সেই কক্ষে বসিয়া রামধন বাবুর তৈলচিত্র দেখিতে দেখিতে সহসা মনের আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। সুরাপায়ীদের মনে নানাভাবের উদয় হইয়া থাকে। ভৈরব বালকের ন্যায় অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। নেশার ঝোঁকে সহসা সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিয়া একখানি কাগজে লিখিল। মায়াকে বিবাহ করিয়া বিষয় লাভের আশা, মায়ার সহিত জ্ঞানেন্দ্রের বিবাহ বাসনা রামধন বাবু প্রকাশ করিলে ভৈরবের জ্ঞানেন্দ্রের উপর আক্রোশ—অর্থাভাবে রামধনের হাতবাক্স হইতে টাকা চুরি, পরে সিন্দুক খুলিয়া টাকা চুরি, জ্ঞানেন্দ্রের সহিত মারামারি, জ্ঞানেন্দ্রকে গুলি করিয়া মারিতে যাইয়া লক্ষ্যভ্রষ্টে রামধনকে হত্যা—জ্ঞানেন্দ্রের হাতে রিভলবার দিয়া নিজ দোষস্খালনের চেষ্টা—জ্ঞানেন্দ্রের কারাদণ্ড সমস্ত বিবৃত করিয়া কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী স্বীকারোক্তি লিখিয়া ফেলিল। নেশার ঝোঁকে, বিবেকের তাড়নায় উহা বারবার পড়িতে পড়িতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ক্রন্দন রবে ভীতা হইয়া মায়া ও পিসিমা "আবার কি দুর্ঘটনা হইল" ভাবিতে ভাবিতে দাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে একখানি পত্র পড়িতে পড়িতে ও মধ্যে মধ্যে রামধন বাবুর তৈলচিত্রের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া ভৈরব কাঁদিতেছে। সহসা ভৈরব উহাদিগকে দেখিতে

পাইয়া পাছে তাহার মাতাল অবস্থা উহারা জানিতে পারেন এই ভাবিয়া আত্মসংবরণ করিয়া শশব্যস্তে চলিয়া গেল। কাগজখানি পড়িয়া রহিল। কৌতূহল বশবর্ত্তিনী হইয়া মায়া উহা কুড়াইয়া লইয়া নিজকক্ষে আসিয়া পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে মায়ার আরক্তিম বদন-কমল হইতে অজস্র ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। পিসিমা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "আচ্ছা মায়া! ওটা কিসের চিঠি? ভৈরব পড়ে' কাঁদলে, তুইও পড়ে কাঁদ্‌ছিস্—কে লিখেছে মা? জ্ঞান আমার ভাল আছে ত?"

উত্তেজিতা মায়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিয়া উঠিল—"লিখবে আর কে? ঐ খুনে বিশ্বাসঘাতক ভৈরবই লিখেছে"—পরক্ষণেই সংযতা হইয়া সে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরিয়া পিসিমাকে সব বুঝাইয়া বলিল।

এক্ষণে কি উপায়ে জ্ঞানেন্দ্রকে মুক্ত করিবে এই চিন্তা তাহার মনোমধ্যে সতত উদয় হইতে লাগিল। অবশেষে অনেক চিন্তার পর নিজ পুরোহিতের দ্বারা তাহার পিতৃবন্ধু সত্যচরণ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সত্যবাবু একজন খ্যাতনামা উকীল, রামধন বাবুর বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ভৈরবের অনুপস্থিত কালে মায়া সত্যবাবুকে আনাইয়া তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল। সত্যবাবু জ্ঞানেন্দ্রকেও বাল্যকাল হইতে জানিতেন। প্রথমে তিনিও এই হত্যা ব্যাপারে বিস্মিত হইয়াছিলেন। তবে অর্থই সর্ব্ব অনর্থের মূল ভাবিয়া জ্ঞানেন্দ্রকে তিনিও দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে মায়ার নিকট অন্য রকম শুনিয়া প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণে তিনিও উৎসুক হইলেন। সত্যবাবুর ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া ও নির্দ্দোষী উদ্ধারে স্থির সঙ্কল্প বুঝিয়া মায়া তাঁহার উপর কার্য্যভার দিল এবং স্বীকারোক্তিখানিও সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যে দিল। সত্যবাবুর চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রহরী দ্বারা ভৈরব ধৃত হইল।

বিচারকালে ভৈরব একটী কথাও গোপন করিল না। বিবেকের তাড়নায় ভৈরব এ কয়দিন উন্মত্ত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। মনকে ভুলাইবার জন্য নানারূপ আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়াছিল; কিছুতেই শান্তি পায় নাই। অবশেষে অপরিমিত সুরাপানে সমস্ত বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিল—তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া স্বীকারোক্তি লিখিয়া এবং অকপটে বিচারালয়ে দোষ স্বীকার করিয়া কতকটা শান্তিলাভ করিল। এতদিনে সত্য উদ্‌ঘাটন হইল দেখিয়া বিচারক হইতে জনসাধারণ সকলেই অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। বিচারক, জ্ঞানেন্দ্রের সসম্মান মুক্তি ও ভৈরবের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিলেন। জ্ঞানেন্দ্র শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াই দৌড়িয়া ভৈরবের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তুমি মহৎ, স্বেচ্ছায় নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছ।" শৃঙ্খলিত ভৈরব উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল "আমার ফাঁসি হইল না কেন? সারাজীবন এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে—অহরহঃ রামধনের রুধিরাপ্লুত দেহ শয়নে, স্বপনে, জাগরণে দেখিতে হইবে! উঃ—ভগবান!" ভৈরব মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে অতিরিক্ত সুরাপান হেতু ভৈরবের মৃত্যু হইয়াছে।

সত্যবাবুর অধ্যক্ষতায় মায়ার সহিত জ্ঞানেন্দ্রের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইল। মায়া সগর্ব্বে বলিল "কেমন পিসিমা, বলেছিলাম যে একদিন আসিবে যেদিন ভগবান তোমার ভাইপোকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিবেন—কেমন, দেখলে ঠিক হল ত?" পিসিমা হাসিয়া বলিলেন "তা'ত বটেই, তবে আমি যে তোমায় প্রত্যহ শিবপূজা করাইয়াছিলাম তার ফলও হাতে হাতে ফলিল, দেখলে ত?" আর জ্ঞানেন্দ্র—"মায়ার" মোহিনী-মায়ায়-মুগ্ধ-জ্ঞানেন্দ্র সমস্ত যাতনা ভুলিয়া জীবন সঙ্গিনী মায়াকে লইয়া সদাই আনন্দে বিভোর।

এতদিন পরে সংসারে আবার আনন্দের অনাবিল প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল।

নূতন যুগ

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৪)

মাসীমা বিন্দুবাসিনী চিরটাকাল স্বামীর সহিত বিদেশেই ঘুরিয়াছেন। তাঁহার স্বামী ছিলেন আধুনিক তন্ত্রের লোক, সমাজের কোনও রূপ বাধ্য বাধকতার ধার তিনি ধারিতেন না, অথচ তিনি সমাজকে ত্যাগও করেন নাই। সংস্কার দোষটাকে তিনি এড়াইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, এই জন্য দেশে তাঁহার স্থান হয় নাই। কলিকাতায় ছোট একখানা বাড়ী করিয়াছিলেন, সস্ত্রীক সেখানেই বাস করিতেন। সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, দিনগুলা একরূপ কাটিয়া যাইত মন্দ নয়।

এরূপ স্বামীর স্ত্রীকেও অনেকটা সংস্কার ত্যাগ করিয়া চলিতে হয়, বাধ্য হইয়া বিন্দুবাসিনীকেও অনেকটা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মনটা তাঁহার উদার সরল ছিল, ভগবানকে ডাকিয়া পাড়ার ছেলেমেয়েদের লইয়া তাঁহার দিন বেশ কাটিত। বেশীর ভাগ ছোঁওয়া ছুঁয়ি ব্যাপারটা তাঁহার মধ্যে ছিল না বলিয়া সকল ছেলে মেয়েই তাঁহার কাছে সমান আদৃত হইত।

এমন স্নেহময়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়া দীপিকা বাঁচিয়া গিয়াছিল। সে সাংসারিক কষ্ট অনুভব করিয়া যখন কাজে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা করিল, বিন্দুবাসিনী তাহাতে মত দিলেন। তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল বাহির হইলেই মেয়েদের ধর্ম্ম চলিয়া যায় না. বরং মেয়েরা বাহিরের সহিত মিশিয়া বাহিরকেও চিনিতে শেখে।

দিন বেশ কাটিতেছিল কিন্তু হঠাৎ বিভ্রাট ঘটিল একদিন।

বিন্দুবাসিনীর একটী দেবর ছিলেন, বহুকাল পূর্ব্বে ইনিই ভ্রাতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রথমে অগ্রসর হন। জন্মভূমিতে ইনিই রাষ্ট্র করিয়া দেন তাঁহার দাদা সস্ত্রীক খৃষ্টান হইয়া গিয়াছেন। ইহার পর নরেন্দ্রনাথ সস্ত্রীক যখন দেশে গিয়াছিলেন তখন এই সব কথা শুনিয়া এবং এই কথার উত্থাপনকারী যে তাঁহারই সহোদর ইহা জানিতে পারিয়া দেশ পরিত্যাগ করেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি আর দেশে যান নাই। আজ দুই বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সংবাদটা তখনই নগেন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হইয়াছিল কিন্তু অনেক ভাবিয়া তিনি বিধবা ভ্রাতৃজায়ার দিকেও ঘেঁসেন নাই। এক কারণ—ভ্রাতৃজায়া যথার্থই খৃষ্টান হইয়াছেন, তিনি পরম হিন্দু, খৃষ্টানের ছায়া স্পর্শও মহাপাপ। দ্বিতীয় কারণ—এখন সে সব বাধা ঠেলিয়াও কলিকাতার বাড়ীখানির লোভে তিনি যান, ভ্রাতৃজায়া আমল দিবে কি? এই দীর্ঘ দুইটী বৎসর তাঁহার বিবেচনা করিতেই কাটিয়া গিয়াছে, অবশেষে যখন শুনিলেন ভ্রাতৃজায়ার বোনঝি তাঁহার কাছে আসিয়া জুটিয়াছে, তখন তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কলিকাতার বাড়খানা বুঝি তাঁহার প্রবল হিন্দুয়ানীর বর্ম্মে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে! তিনি আর বিলম্ব করিলেন না, বাড়ীতে সাড়া দিলেন "গঙ্গা স্নান করিতে কলিকাতায় যেতে হবে, সব ঠিক ঠাক হয়ে নাও।" এই বাড়ীখানা যদি কোনও ক্রমে নিজের করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা একান্ত উচিৎ, আর সে চেষ্টাও করিতে হইবে এই সময়ে। দিন যত যাইবে তাঁহারই ক্ষতির পরিমাণ তত বাড়িবে।

মনের মধ্যে অনেকখানি দ্বিধা আসিয়া জমিয়াছিল, তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া খৃষ্টানের বাড়ীতে যাইতেছেন। তা হোক, গঙ্গাস্নান করিয়া ফেলিলেই সে দোষটা কাটিয়া যাইবে। আর কলিকাতার বাড়ী? একটা বাড়ীতে মুসলমান ভাড়াটিয়া উঠিয়া যায়, হিন্দু আসিয়া বসে। বাড়ী ফিরিয়া খানিকটা

গোময় গিলিয়া ফেলিলে মাতৃী শুদ্ধ হইয়া যাইবে, গঙ্গাস্নানে বাহিরের ময়লাটা কাটিবে।

এই শক্ত প্রায়শ্চিত্তের কল্পনা করিয়া এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান চিত্তে কিছু শান্তিলাভ করিলেন, তাহার পর একদিন সদলবলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-জামাতাসহ কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

যাত্রার আগে পত্র দিয়াছিলেন ঘর যেন ঠিক করিয়া রাখা হয়, কারণ অনেকদিন তিনি বউদিদির শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত, এই যাত্রায় গঙ্গাস্নানও হইবে, বউদিদির শ্রীচরণ দর্শনও ঘটিবে। তাহার পর নিতান্ত বিনয়ের সঙ্গে জানাইয়াছিলেন বউদিদি নিশ্চয়ই জানেন তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা করেন, পূজাদি করেন, ইত্যাদি। তাঁহার নারায়ণকে তিনি গলায় ঝুলাইয়া লইয়া যাইবেন—কেন না ট্রেণে নারায়ণকে গলায় ঝুলাইয়া লইয়া যাইবার বিধি শাস্ত্রে আছে।

পত্র পাইয়া—তাঁহার একা আসার সম্ভাবনা জানিয়া বিন্দুবাসিনী উপরের একটা ঘরই পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বৃহৎ বাহিনীটি যখন দুখানা গাড়ী হইতে ঢালাই হইয়া তাঁহার ছোট উঠানটীতে স্তূপীকৃত হইল তখন তাহার পানে তাকাইয়াই তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

তবুও সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া উপরে লইয়া গেলেন, ঘরখানা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "এই ঘরে বসো সব, আমি ও ঘরটাও খালি করে দেবার ব্যবস্থা করে দিই। ঠাকুরপোর পত্র পেয়ে আমি ভেবেছিলুম একা তিনিই আসবেন, কলকাতায় ঘর দোর বেশী তো নেই, এ বাসায় মাত্র তিনখানি শোবার যোগ্য ঘর আছে।"

তখনি অতিথিদের স্থান হইয়া গেল। উপরের দুইটা গৃহই অতিথিরা দখল করিয়া বসিলেন, নীচের স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার গৃহখানি মাসিমা ও বোনঝির রহিল। রন্ধনের চালাখানি দেবর পত্নী তারা একতাল গোবর ঢালিয়া নিকাইয়া লইলেন, তাহার উপর গঙ্গাজলও ছিটানো হইয়া গেল, সে চালায় বিন্দুবাসিনী বা দীপিকার প্রবেশের অনুমতি রহিল না। এইরূপে এই দুইটী নারী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াও সকল হইতে বঞ্চিতা হইলেন, যাঁহারা আসিলেন তাঁহারা গোবর ও গঙ্গাজলের সাহায্যে বাড়ীখানা, মায় উঠানটুকু পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া ফেলিলেন।

কর্ত্তা নগেন্দ্রনাথ মাথার শিখা দুলাইয়া চিন্তিতমুখে বলিলেন "তাই তো—একটা তুলসী গাছ নেই, হিন্দু আমরা, যদিও বউদির বাড়ীতে এসেছি, তবু তো একটা রাখা দরকার, অন্ততঃ যতদিন আমরা এখানে থাকব ততদিনের জন্যও রাখা দরকার তো।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন "সে জন্যে তোমার কিছু ভাবনা নেই ঠাকুর পো, আমি এখনি তুলসী গাছ আনিয়ে দিচ্ছি।"

তিনি বাহির হইতেছিলেন, মাথা নাড়িয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "উঁহু, তাতো হবেনা বউদি, তুমি আনলে তো হবে না। তোমার সঙ্গে ভূতো না হয় যাক, সেই গিয়ে নিয়ে আসবে এখন।"

অত্যন্ত আহতা হইয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন "আচ্ছা, তাই না হয় আসুক, আমি এই পাশের বাড়ী হতে তুলসী গাছ আনিয়ে দিচ্ছি।"

এখনও এই সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বে যতটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল এখন ততটা দমিয়া গেল। তথাপি তিনি ভূতোকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন, খানিক পরেই তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

নগেন্দ্রনাথ শুদ্ধচিত্তে একটা টিনে মাটি ভরিয়া তাহাতে তুলসী গাছটা বসাইতে বসাইতে বলিলেন "একটা কথা বলব বউদি, এই গাছটা বড় ভয়ানক গোছের, অবশ্য তোমরা এটা মানো না, তা জানি। কিন্তু আমরা যতদিন থাকব এখানে সে কয়টা দিন এদিকে না এসে যদি তফাতে তফাতে থাকো—"

বাধা দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বিন্দুবাসিনী বলিলেন "তফাতে থাকব বই কি ঠাকুরপো, খুব তফাতেই থাকব। ওখানে যাওয়ার কি দরকারই বা আমার?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "আর তোমার বোনঝি?"

"না, ও ওদিকে যাবে না, তার মাসী যতটা দূরে থাকবে, সেও ঠিক ততটা দূরে থাকবে ঠাকুরপো।"

দীপিকা বিস্ময়ে ব্যাপার দেখিয়া যাইতেছিল, একবার

দীপিকা যখন ফাঁকা হইয়া গেল, তখন চুপিচুপি সে জিজ্ঞাসা করিল "এসব কি কাণ্ড মাসীমা ?"

মাসীমা চুপ করিয়াই রহিলেন, কথা যেন তাঁহার কাণেই যায় নাই।

"মাসীমা, আমাদের শোওয়ার ঘর যেন এইটাই ঠিক হল, কিন্তু রান্না হবে কোথায় ?"

মাসীমা একটু হাসির রেখা মুখে ফুটাইয়া তুলিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিলেন "কেন মা, রান্নার জায়গার অভাব আছে কিছু ? এই উঠানের একপাশে কয়খান ইট পেতে বেশ রান্না করা যাবে। একবেলা রান্না, তুমি তো ওবেলাও কিছু খাওনা মা, এ একবেলা একখানা তরকারী ভাত বেশ হবে।"

তাহাই হইল। সেদিন উঠানের একপাশে কয়খানা ইট পাতিয়া এক অভিনব উনান তৈয়ারী করিয়া তাহারই উপর রন্ধন হইয়া গেল।

বিকাল বেলা সন্ধ্যার কাছে যাইবার জন্য দীপিকা যখন প্রস্তুত হইতেছিল, তারা তাহার অভিনব সাজ-সজ্জাদির দিকে তাকাইয়া হাঁ করিয়া রহিলেন। তাহার পর দরজায় আসিয়া যখন মোটরখানা থামিল তখন বাড়ীতে সে এক ভীষণ ব্যাপার পড়িয়া গেল। স্বয়ং নগেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত হুঁকা হাতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মেয়েরা দরজায় জানালায় দাঁড়াইয়া গেল।

"দিদি, গাড়ীতে করে কে যাবে গো—তোমার বোনঝি বুঝি ? কোথায় যাবে ?"

বিন্দুবাসিনী হঠাৎ থতমত খাইয়া গেলেন, উত্তর যে কি দিবেন তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। দীপিকা গানের বইখানা হাতে লইয়া একটু হাসিয়া বলিল "আমি শিখাতে যাই মাসীমা, একটী মেয়েকে রোজ আমায় পড়া শিখাতে যেতে হয়, তাদেরই গাড়ী এসেছে আমাকে নিতে।"

তারা বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, নগেন্দ্রনাথ বাহির হইতে শুনিয়া নিষ্ঠিবন ত্যাগ করিলেন, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র অবিনাশ করধৃত বিড়িতে সজোরে একটা টান দিয়া আধখানা নিঃশেষ করিয়া বলিয়া উঠিল—"হায় রে, কলিকালে কতই হল !"

জামাতা মোহিত বিস্ময়ভাবে সরিয়া গেল।

মোটরখানা দীপিকাকে লইয়া চলিয়া গেল। ভিতরে আসিতে আসিতে নগেন্দ্রনাথ বিন্দুবাসিনীকে ডাকিয়া বলিলেন "এসব কি রকম স্বাধীনতা তোমার ভাতো বুঝতে পারিনে বউদি, সব তাইতেই এতটা বাড়াবাড়ি করা কি ভালো ?"

শুষ্কভাবে বিন্দুবাসিনী বলিলেন "কি স্বাধীনতা দেখলে ঠাকুরপো ?"

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "বোনঝিটাকে যেখানে সেখানে যেতে দাও। এখন কি ওর এমনি করে বেড়ানোর সময় হয়েছে ? এসব কি রকম বাড়াবাড়ি তা বুঝতে পারি নে। কথাতেই আছে না—মেয়েদের স্বাধীনতা দিলে—"

বলিতে বলিতে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন, শেষার্দ্ধ আর শুনা গেল না।

(৫)

নিজের বাড়ীতে নিজেই চোর, বিন্দুবাসিনীর অবস্থা তেমনিই। তাঁহার স্বাধীনতা একটু ছিল না, নিজের ঘরটীতে প্রায় বন্দিনী হইয়াই থাকিতে হয়, বাহির হইতে ভয় হয়—পাছে ছোঁয়া যায়। অত্যন্ত আত্মাভিমানীনি ছিলেন তিনি, কিছুতেই এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের কাছে পরিচয় দিতে পারিলেন না যে তিনি খৃষ্টান নন, মুসলমান নন, উঁহাদেরই মত হিন্দু। তিনি আগে প্রত্যহ প্রাতে সন্ধ্যায় যে গীতা পাঠ করিতেন সে সব ইহারা আসার পরই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে ইহারা যাহা ধারণা করিয়াছে, সেই ধারণাই থাক, তিনি মুখের জোরে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান লইতে চান না।

দীপিকা এ অত্যাচার সহিতে পারিতেছিল না, ইচ্ছা হইতেছিল একবার সে আত্মপ্রকাশ করিয়া এই গোঁড়ামী ভাঙ্গিয়া দেয়, চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয় এই গোড়ামীর মূলে কিছুই নাই, ইহা মিথ্যার ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে। এক সময়ে সত্যের প্রকাশ হইবেই, আর তখন যে ভীষণ প্রলয় ঝঞ্ঝা উঠিবে, ভীষণ ভূকম্পন হইবে তখন এই গোড়ামী-ইমারত ভাঙ্গিয়া পড়িবে, মাটীর জিনিষ মাটী হইয়াই যাইবে, ইহার মধ্যে এতটুকু সার থাকিবে না যাহা এই গোঁড়াদের একটু সান্ত্বনা দিতে পারিবে।

উপরের ঘরে দেরাজের মধ্যে তাহার একখানা বই ছিল, সেখানা আনিবার দরকার পড়ায় সেদিন তাহাকে উপরে যাইতে হইল।

তারা মুক্তছাদে কাপড় শুকাইতে দিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "কিগো, কি মনে করে ?"

দীপিকা বলিল "দেরাজের মধ্যে আমার একখানা বই আছে, তাই নিতে এসেছি।"

তারা বিস্ফারিত চোখে বলিলেন "ওঘরে যে ঠাকুর আছে গো, তুমি যাবে কি রকম ?"

কথাটা বড়ই অসহ্য বলিয়া ঠেকিল, দীপিকা একটু দীপ্ত ভাবেই বলিল "আমি ঘরে গেলেই ঠাকুর অশুদ্ধ হয়ে যাবেন! আমি খৃষ্টান নই মাসিমা, আমি হিন্দু।"

তারা বিজ্ঞভাবে মাথা দুলাইয়া বলিলেন "তা হও বাছা হিন্দু, অবিনাশ বললে তোমরা হিন্দুও নও খৃষ্টানও নও, ব্রেহ্ম। তা সত্যি বাছা, তোমাদের চাল-চলন গুলো বেহ্মদৈত্যের মতই বটে, সেকালের বেহ্মদৈত্যেরা তোমাদেরই মত ছিল বোধ হয়। তা হোক, তারা তবু ঠাকুর দেবতা মান্‌ত, তোমরা তাও মানোনা, তোমাদের সঙ্গে বনে ভাল আমার জামাইটীর, জামাইতো নয়, যেন গোরা, ওঁর সামনে একটী কথা চলে না, আস্তিন গুটিয়ে লড়তে যায় আমার অবিনাশের সঙ্গে। অবিনাশকে বলি—বাবা তুই চুপ করে থাক, যা বলে বলুক, তুই শুনে যা। ছেলের গায়ে যদি জোর থাকত বলতুম এগিয়ে যেতে, ছেলে আমার বায়ে হেলছে, বাতাসে দুলছে," তা তুমি বই নিতে এসেছ বাছা, চাবিটা আমায় দাও, আমিই বার করে এনে দিচ্ছি। যে কয়টা দিন থাকি, ঘর খানায় যেয়োনা, একটু তফাতে তফাতেই থেকো।"

দীপিকা মাথা নাড়িয়া বলিল "উহু, চাবি দিতে পারব না, আমার ও ঘরে যেতেই হবে, দেরাজের চাবি যার তার হাতে দেওয়া যায় না, ওতে আমার অনেক জিনিষ রয়েছে।"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে তারা বলিয়া উঠিলেন "স্পষ্ট বাছা চোর বললে ? চাবি আমার হাতে দিলে আমি তোমার সর্ব্বস্ব চুরি করে নেব—তাই বুঝি ভাবছ! ওগো বাছা, তা নয় গো তা নয়। গরীব পাড়াগাঁয়ের লোক সত্যি চোর হয় না, বরং চোর হয় এই কলকাতায় লোকেরা। বলছি গিয়ে ওঁকে, ঠাকুর বার করুন, তবে তুমি ঘরে যাবে।"

নগেন্দ্রনাথ অপর কক্ষ হইতে সবই শুনিতেছিলেন, রুক্ষ কণ্ঠে বলিলেন "কেন, চাবিটাই নাও গে, এখন আবার ঠাকুর বার করতে যাবে কে ?"

তারা বলিলেন "সে বললে চলছে না গো, বার করতেই হবে। ওদের বাড়ী ওদের ঘর, ওরা যখনই হুকুম করবে তখনই আমাদের শুনতে হবে। এখনই দূর হয়ে যেতে বললে দূর হয়ে যেতে হবে—আমাদের কথা এখানে শুনবে কে ?"

বড় অপমান দীপিকার বুকের মধ্যে আগুণ ধরাইয়া দিল, তাহার দুই চোখে আগুণ জলিয়া উঠিল; কি কথা একটা বলিতে গিয়া সে চাপিয়া গেল, তাহার পর হঠাৎ দ্রুতপদে ফিরিয়া চলিল।

হায় রে এমন সংস্কার, ঠাকুর ঘরে আছে সে ঘরে যাইতে পারিবে না! শুধু ইহাদের ব্যবহারেই সে ক্ষুব্ধ হইল না, এই নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দুয়ানির আচার ব্যবহার ভাবিয়াই সে বড় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

জগতের ঈশ্বর যিনি, তাঁহাকে কি কেবল ওই সামান্য সীমার মধ্যেই বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে ? নারায়ণ কি ওই শীলার মধ্যেই আছেন, তাই তাঁহাকে সকল প্রকার অনাচার হইতে মুক্ত রাখার জন্য এত ব্যগ্রতা ? হায় প্রভু, বিশাল জগৎ হইতে আপনাকে গুটাইয়া লইয়া ওই এতটুকু শিলায় মধ্যেই নিজেকে রাখিয়াছ ? একি তোমারই ইচ্ছায় দেবতা, একি ইচ্ছা ইচ্ছাময় ? না, কখনই না, এ তোমার ইচ্ছা নয়, তুমি সর্ব্বজীবেই তো রহিয়াছ, সর্ব্বভূতেই তো তোমার বিকাশ প্রভু, ওই সীমার মাঝে তুমি কখনই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পার না। তুমি অনন্ত, তুমি বিরাট, তুমি অসীম; তোমায় কল্পনা করিতে পারে কে, তোমায় ধারণা করিতে পারে কে ? এই মূর্খের দল তোমায় আবদ্ধ করিয়াছে ভাবিয়াছে, কিন্তু তুমি যে তাহাদের সীমার বাহিরে গিয়াছ তাহা ধারণা করিতে পারে নাই।

সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল মোহিত, আবেগে দীপিকা তাহাকে অতটা লক্ষ্যই করে নাই! অল্প পরিসর

সিঁড়িতে দু'জনের স্থান নাই, মোহিত ইহা লক্ষ্য করিয়া নীচে নামিয়া যাইতেছিল। তাহাকে পিছাইতে দেখিয়া দীপিকা দাঁড়াইল—"আপনি নামবেন না, আমি উঠছি।"

মোহিত একবার চোখ তুলিয়া এই মেয়েটীর পানে চাহিল, শান্তভাবে একটা নমস্কার করিয়া বলিল "আপনি নেমে আসুন, আমি তারপর যাব এখন।"

এই আজ প্রথম তাহাদের কথা, এ কয়দিন কেহ কাহারও সহিত একটাও কথা বলে নাই। আজ দীপিকা তাহার মুখে এইমাত্র এই ছেলেটীর একটুখানি পরিচয় পাইয়াছিল, তাহাতেই সে যেন মোহিতের সম্বন্ধে অনেকখানি জানিয়া ফেলিয়াছিল, সেইজন্যই সে আজ কথা কহিল, এবং নামিতে নামিতে নীচে সিঁড়ির ধারে দণ্ডায়মান এই উন্নত বলিষ্ঠ দেহ শান্ত প্রকৃতি যুবকটীর মুখের পানে চাহিল।

সে নামিয়া গেলে মোহিত যখন উপরে গেল তখন সেখানে রীতিমত একটা মিটিং বসিয়া গিয়াছে। নগেন্দ্রনাথ, তারা, মোহিতের স্ত্রী রাণী, এবং চিররুগ্ন অবিনাশও জুটিয়াছে। মোহিতকে দেখিয়াই রাণী দেড়হাত অবগুণ্ঠন টানিয়া ছুটিয়া পলাইল। এদিকে এতখানি অবগুণ্ঠন টানিতে পিঠখানা তাহার সম্পূর্ণ অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল, মোহিতের মুখে একটু শুধু হাসি ফুটিয়া উঠিল মাত্র। সেটা নিজের স্ত্রীর এই পলায়নে প্রফুল্লতার পরিচায়ক নহে, দেশের মেয়ের চির প্রচলিত লজ্জা দেখিয়া। সে সম্পূর্ণ আধুনিক তন্ত্রের ছেলে, এখানে বোর্ডিংএ থাকে, বি-এ পড়ে। তাহার মতটা অত্যন্ত উদার ভাবের, এ সংসারের সহিত একটুও মিলিত না। দেশের মেয়েদের এই অভিনব লজ্জাটা তাহার চোখে অত্যন্ত নূতন বলিয়াই ঠেকে। পিঠ মুক্ত থাক কিন্তু মুখে দেড়হাত দুইহাত অবগুণ্ঠন টানিতে এ দেশের মেয়েরা খুব পটু। লজ্জা শুধু মুখে, দেহে কিছুমাত্র নাই। পল্লী অঞ্চলের মেয়েদের দেখিতে পাওয়া যায় আবক্ষ অবগুণ্ঠন টানিয়া সন্তানকে স্তন্য পান করাইতেছে। সন্তানকে দুগ্ধদান লজ্জার কথা নহে—কিন্তু দেহটাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত রাখিয়া মুখখানাকে এরূপভাবে ঢাকিয়া রাখার অর্থ মোহিত এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

মাতঙ্গী মাথার কাপড়খানা তুলিয়া দিলেন, অবগুণ্ঠন নাসাগ্র পর্য্যন্ত পৌছাইল। বলিলেন—"বসো বাবা, বসো।"

মোহিত বসিল, জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে মা?"

নগেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন "আর বাবা, সে কথা বলতেও পারা যায় না। ভেবেছিলাম মাস দুই গঙ্গাতীরে কাটাব, তা এই সব ব্রাহ্ম খৃষ্টানদের অত্যাচারে আর থাকতে পারি কই? বাধ্য হয়ে আবার সব গুটাবার মতলব করছি।"

আরক্তমুখী দীপিকাকে মোহিত যেরূপ অসংযত পাদক্ষেপে নামিতে দেখিয়াছিল তাহাতেই সে বুঝিয়াছিল উপরে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা নগেন্দ্রনাথ বেশ রং চং দিয়া অনেকখানি ফাঁপাইয়া তুলিয়া বিস্তৃত করিয়া বলিলেন। পল্লীগ্রামের অনেক পুরুষের এ গুণটী থাকে, নারীর ভাবটা অনেকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মোহিত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এই মেয়েটীর পরিচয় সে আগেই পাইয়াছিল; এযে কিরূপ তেজস্বিনী তাহা সে জানিত। তাহার আদর্শ ঠিক এইরূপই ছিল, তাই দীপিকার সহিত পরিচিত হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই সে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। আজিকার কথাগুলি শুনিয়া সে চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু হৃদয় তাহার বলিতেছিল—ঠিক এইরূপ মেয়েই চাই, ইহারাই তেজস্বীতার বর্ম পরিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে, ইহারাই জাতির জননী।

একটুখানি বসিয়াই সে উঠিয়া পড়িল, নীচে নামিয়া আসিল।

বারাণ্ডার একপাশে বিন্দুবাসিনী মলিনমুখে বসিয়াছিলেন, কাছেই বসিয়া দীপিকা কি করিতেছিল, মোহিতের পদশব্দ পাইয়া সে মাথার কাপড়খানা টানিয়া দিল, উঠিয়া গেল না।

মোহিত অগ্রসর হইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের কাছে যাওয়া উচিত কি-না একবার তাহাই ভাবিয়া লইল, তাহার পর সব দ্বিধা সঙ্কোচ কাটাইয়া সে অগ্রসর হইয়া পড়িল। বিন্দুবাসিনীর পায়ের কাছে নত হইয়া পড়িয়া পায়ের ধূলা লইতে যাইবামাত্র শশব্যস্তে বিন্দুবাসিনী বলিয়া উঠিলেন "না না, ছি, অমন কাজ করতে নেই।"

"খুব করতে আছে মা, আপনি বললেই আমি ছাড়ব কিনা। মায়ের কাছে সন্তানের দাবী করবার যে অধিকার

আছে, আমি আজ সেই অধিকার নিয়ে আপনার কাছে এসেছি; আপনার ক্ষমতা কি যে আমায় ঠেকিয়ে রাখবেন ?"

জোর করিয়া সে পায়ের ধূলা মাথায় দিল।

তাহাকে একখানা আসনে বসিতে দিয়া বিষণ্ণ হাসিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"কিন্তু তোমার কাজটা তো মোটেই ভাল হলো না বাবা! আমি কে তা জানো কি ?"

মোহিত ভাল করিয়া বসিয়া বলিল "খুব জানি। সন্তান মাকে যতটা চেনে ততটা আর কেউ চিনতে পারে না, তা জানেন তো ? আপনি পায়ের ধূলো দিতে অতটা সঙ্কুচিতা হয়ে উঠলেন কেন বলুন তো ?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন—"আমি কি তা জানো কি ?"

"জানি মা, আপনি সত্য একটা মানুষ, আপনিই সত্যকে যথার্থ চিনেছেন। ওদের মত মিথ্যের মধ্যে দিয়ে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যান নি, মিথ্যার আড়ম্বরকে ঘৃণা করেই দূরে সরিয়ে ফেলেছেন। এর বেশী মানুষের পরিচয় দেবার কথা আর কি থাকতে পারে মা! আপনি যা ধরেছেন এই সত্য, আর এই সত্যই বরাবর টিকে থাকবে। দুদিনের জন্যে যে মিথ্যা দেখতে পাবেন এই সত্যের ঘা খেয়ে তাকে পালাতেই হবে। আপনাকে ওরা খ্রীষ্টান বলছে, ব্রাহ্ম বলছে, বলুক না মা, বলতে দিন। আপনি যদি সত্যই খ্রীষ্টান হতেন তা হলেও আমি এমনি করে আপনার পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিতুম। আমি তো জানি মা মানুষ বললেই তার একই পরিচয় হয়ে গেল—তার মধ্যে সেই একই ভগবান আত্মারূপে বিরাজ করেন। সত্যি মা, আমাদের এই অন্ধকার হিন্দু সমাজের জন্যেই আজ হিন্দুর পতন হচ্ছে। এরা সত্যকে বুঝতে চায় না, মিথ্যের মোহে ভুলে কতকগুলো সংস্কার জড়িয়ে মরার মত পড়ে আছে। হিন্দু ছিল একমাত্র জাগ্রত জাতি, আজ সে হয়েছে মরা, কারণ সে তার যথার্থ লক্ষ্য হারিয়ে ফেলেছে, সে ভুলপথ বেয়ে চলেছে। এই ভুলপথে চলার দরুণ তাকে কতটা ক্ষতি সহ্য করতে হচ্ছে তা দেখছেন কি ? কিন্তু তবু— এই দারুণ ক্ষতি সহ্য করেও হিন্দু তার সংস্কার ত্যাগ করতে চায় না। আপনি হিন্দু হয়েও কি রকম দূরে রয়েছেন সে কি শুধু ওদের সংস্কারের জন্যেই নয় ? এমনি করে এই হিন্দু সমাজ কত হিন্দুকে দূরে ঠেলে ফেলেছে, অন্য সমাজ তাদের পেয়ে ধন্য হয়ে গেছে। তারা আমাদের সমাজে থাকতে পেলে তাতে লাভ হতো আমাদেরই, কিন্তু থাকতে দেবে কে ? কত ছোট বড় শ্রেণী আমরাই সৃজন করে ফেলেছি তা দেখেছেন কি ? মূল ধরতে গেলে সবাই পরিচয় দেবে আমরা হিন্দু, কিন্তু কত পার্থক্য। অনেক নীচশ্রেণী সৃজন হয়েছে যাদের আমরা ছুঁইনে, তাদের ছায়াও মাড়াই নে। এরা কি রকম কষ্ট হৃদয়ে পোষণ করে! হয় তো কোনও সময়ে যখন ব্যথা পায় সেই সময়েই অন্যের প্ররোচনায় ভুলে এ ধর্ম্ম ছেড়ে চলে যায়। অনেকে এমনও আছে যারা এমনই করে হিন্দু সমাজের পরে রাগ করে অন্য ধর্ম্ম নেছে, তারা আবার ফিরে আসতে চায়, কিন্তু এ সমাজ তাদের নেবে না, নিতে চাইবেও না। আজকাল অনেক জায়গায় এ বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা চলছে, কেউ কেউ অনেকটা এগিয়েও গেছেন, কিন্তু সমস্ত দেশে এখনও এ আলো ছড়িয়ে পড়ে নি। কিন্তু পড়বে—বিশ্বাস করুন, একদিন এ আলো সমস্ত দেশে পড়বে, সেদিন আসছে। এই যে ভণ্ডামী আজও দেখতে পাচ্ছেন, কিছুদিন অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন এ মুখোস খসে পড়েছে।"

মুগ্ধ বিস্ময়ে বিন্দুবাসিনী এই যুবকটীর সরল জ্যোতিঃ মণ্ডিত মুখখানার পানে তাকাইয়াছিলেন, দীপিকার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

আস্তে আস্তে সে জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা মোহিতবাবু, ওদের মতের সঙ্গে আপনার মত তো একটু মেলে না তবে—"

বাধা দিয়া হাসিমুখে মোহিত বলিল "ওই তো দিদিমণি, ওই 'তবে' কথাটার মধ্যেই অনেকখানি মানে আছে। দেখুন জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এই তিনটের 'পরে মানুষের হাত মোটে চলতে পারে না। চলতে পারে না বলেই আমি এসে ওই গোঁড়ামীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি; মনে একটু আশা এখনও আছে ওঁদের চোখ ফোটাব, এই গোঁড়ামীগুলো ছাড়াব। জাতি বলতে চান বলুন, ব্রাহ্মণ তাঁরা, ব্রাহ্মণ হয়েই থাকুন, কেবল এই গোঁড়ামীগুলো, আর এই ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপারগুলো ছেড়ে

দিন। আমার মনে হচ্ছে আমার আশা সফল হবে নয় কি দিদিমনি ?"

তাহার এই সরল দিদিমনি সম্বোধনে দীপিকার কুণ্ঠিত ভাবটা কাটিয়া গেল, সে উৎসাহের সহিত বলিল "হবে বই কি ভাই! তোমাদের মত ছেলেরা যদি চেষ্টা করে তবে কোন কাজটা না হতে পারে ? তোমরা আজ ছেলে রয়েছ, কাল তোমরাই সংসারের কর্ত্তা হবে, তোমাদের মনের ভাবটা, তোমাদের গঠন শক্তিটা পূর্ণতা লাভ করবে সন্তানে। এমনি করে দেশে জাতিবলে পরিচয় দেবার মত লোক দাঁড়াবে, তার একটা দৃষ্টান্তও থেকে যাবে।"

সেদিন অনেক কথাবার্ত্তাই চলিয়াছিল। মোহিত যখন উঠিল তখন তাহার মনটা অত্যন্ত হালকা হইয়া গিয়াছে। দীপিকার মনের অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়াছে। একটী ভাইকে যে আজ বেদনার মাঝখানে শান্তিধারারূপে ফুটিয়া উঠিতে দেখিল, তাহাকে সে কুড়াইয়া লইল। বড় তৃপ্তি তাহার—একজন জানিল তাহারা সত্যই হিন্দু, তাহারা বিধর্ম্মী নহে।

(৬)

সে দিন দীপিকা শরীর অসুস্থতার জন্ম আসিতে পারিল না, তাহার পর ও দুই তিন দিন কাটিয়া গেল দীপিকা আসিল না।

ব্যস্ত হইয়া সন্ধ্যা স্বামীকে গিয়া বলিল "একবার খবর নাও না, দিদি আসছেন না কেন, কেমন আছেন।

দীপিকা যে কয়দিন আসে নাই শিরীষ সে দিকে মোটে মন দেয় নাই। সে জানিত দীপিকা আসিবেই, একটা দিন যে সে না আসিয়া থাকিবে এ সম্ভাবনা সে কোনও দিনই করে নাই। সেই দিনকার সেই ঘটনা হইতে বৈকাল পাঁচটা বাজিবার আগে সে বাহিরে চলিয়া যাইত, রাত এগারটার কমে কোনও দিনই ভিতরে আসিত না। সন্ধ্যাকে আগে গানের কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু সেইদিন হইতে সে একেবারেই মুখ বন্ধ করিয়াছিল। সন্ধ্যা যদি কোনও দিন সে কথা তুলিবার চেষ্টা করিত, নানা কথা পাড়িয়া, নানা গল্প তুলিয়া সন্ধ্যাকে সে ভুলাইয়া দিত। বালিকা সন্ধ্যা স্বামীর এ চাতুরী বুঝিতে পারিত না, হাঁ করিয়া গল্পই শুনিয়া যাইত।

শিরীষ তখন বাহির হইবে, বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াইয়া মাথার চুল ফিরাইতেছে। কথাটা শুনিয়া তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সেই ছায়াটা আয়নার প্রতি ফলিত হইল, লক্ষ্য করিয়া শিরীষ সরিয়া গেল, বলিল "আসেন না, মানে ?"

সন্ধ্যা বলিল, "মানে কি করে বলব ? মানেই যদি জানলুম তা হলে তোমায় বলতে আসতুম না।"

শিরীষ মুক্ত গবাক্ষপথে বাহিরের পানে চাহিল "কয়দিন আসেন নি ?

সন্ধ্যা গনিয়া দেখিয়া বলিল, "সোমবার হতে আসেনি, আজ শুক্রবার, তা হলে দেখ,এই পাঁচটাদিন, আজও আসবেন এমন তো বোধ হয় না। তুমি একবার কাউকে পাঠিয়ে দেখ না কেমন আছেন। অসুক বিশুক হলো, কি হলো, মানুষটার খোঁজ নেওয়া দরকার তো। হলোই বা অন্য ধর্ম্মের লোক, তবু --"

শিরীষ বিস্ফারিত নেত্রে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল "অন্য ধর্ম্মের লোক, অর্থাৎ—"

সন্ধ্যা বলিল, "খৃষ্টান।"

শিরীষ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল "ক্ষেপেছ সন্ধ্যা সে খৃষ্টান নয় গো, তোমারই মত হিন্দুঘরের মেয়ে।

সন্ধ্যা সন্দিগ্ধভাবে বলিল "হ্যাঁ, তা হলে ঠাকুরকে প্রণাম করে না কেন ? প্রণাম করবার কথা বললে শুধু হাসে, আর বলে ঠাকুর আমার সব কেড়ে নিয়ে এখন প্রণাম নিতে চান। আমার কাছ হতে যদি পূজা নেওয়ার ইচ্ছা থাকতো তাঁর, তিনি আমায় এ বেশে সাজাতেন না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শিরীষ আত্মভোলার মতই বলিল "বড় বুকফাটা কষ্টের কথা এটা সন্ধ্যা, তার সত্যি বড় যন্ত্রণা, বড় কষ্টেই এ কথা বলেছে সে।"

"কিন্তু, আমি যা জানতে পারি নি তুমি তা জানতে পারিলে কি করে ? তুমি তো কোনও দিন দিদির সামনে এসো নি।

শিরীষ সতর্ক হইয়া গেল, "কি বলতে কি বলছি তার

ঠিক নেই। আমি বলছিলুম হয় তো তার কোনও যন্ত্রণা থাকতে পারে, হয় তো ;—আচ্ছা, যাক, আমি এখনই কাউকে সেখানে পাঠাচ্ছি খবরটা নিয়ে আসতে, আমি আজ খেলতে যাচ্ছি মাঠে, ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, আজ নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার গান শুনব সন্ধ্যা, তুমি ততক্ষণ গলাটাকে সেধে রেখে দাও। আমি কি জানি যে তোমার দিদিমনিটী এ কয়দিন আসেন নি তা হলেতো তোমায় নিয়েই বসতুম।"

কথাটাকে কোন ক্রমে চাপা দিয়া সে বাহির হইয়া গেল। দীপিকার বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া সে মাঠে খেলিতে গেল। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিয়া খবর পাইল দীপিকার অসুখ হইয়াছে, ভাল না হইলে সে আসিতে পারিবে না।

সন্ধ্যাকে লইয়া সে বসিল, সে দিন বাহিরে মজলিস্ বসিল না।

বেচারা সন্ধ্যা হার্ম্মোনিয়াম ধরিয়া ঘামিয়াই সারা হইল, সুর বাহির করা দূরে রহিল। অনেকক্ষণ বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে সে ধরিয়া বসিল "ও আমার দ্বারা হবে না।"

শিরীষ একটু হাসিয়া বলিল "হবে না কেন? আজ প্রায় এক বছর হতে চললো গান শিখছো—তবু বলছো হবে না?"

নিজের অকৃতকার্য্যতার দরুণ দারুণ লজ্জায় সন্ধ্যা মুখ তুলিতে পারিতেছিল না, তাহার চক্ষু দুইটী জলভারে আনত হইয়া পড়িয়াছিল, রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল সত্যি আমি পারব না, তুমি মিথ্যে কেবল খরচ করছ আমার জন্যে।"

শিরীষ স্ত্রীকে কাছে টানিয়া লইয়া সস্নেহে তাহার ললাট হইতে চূর্ণ-অলকগুচ্ছ সরাইয়া দিতে দিতে বলিল "তাতে তোমার কাঁদবার মত কি আছে সন্ধ্যা? ছিঃ মোছ চোখের জল, আমার কথা শোনো। আমার মিথ্যে খরচ হয় হোক, এতে আমি মরে যাব না, তবু তোমার চেষ্টা করতে হবে। আর এক বছর অনেক চেষ্টা কর, তারপর যা হয় হবে।"

সন্ধ্যা চোখ মুছিয়া ফেলিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "দিদি ও কতদিন এই কথা বলে ছুটি চেয়েছেন। মিথ্যে তাঁরও কর্ম্ম-ভোগ হচ্ছে, তোমারও অর্থব্যয় হচ্ছে, অথচ কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, সামান্য একটা গানের সুরও আমি করতে পারি নে।"

শিরীষ সে কথা চাপা দিবার জন্য বলিল "যাক গিয়ে, তুমি একখানা বই পড় শোনা যাক। না হয় গান নাই হলো, পড়াশুনা করা হোক।"

রবিবাবুর শেফালি খানা নির্ব্বাচিত করিয়া সে স্ত্রীর হাতে তুলিয়া দিল। কিন্তু হায়, পড়িতে গিয়া কণ্ঠ এড়াইয়া আসে, সুর ফুটিয়া উঠিল না। এক সময় অধৈর্য্যভাবে শিরীষ বলিয়া উঠিল "থাক সন্ধ্যা, আর পড়তে হবে না, তুমি যাও।"

বার বার নিজের অকৃতকার্য্যতা, সন্ধ্যার জীবনে আজ এই প্রথম অন্ধকারের রেখা ঘনাইয়া আসিল; বইখানা তাহার হাত হইতে কখন খসিয়া পড়িল; নতমুখে সে বসিয়া রহিল। অসহফুভাবে শিরীষ একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সন্ধ্যার সে গৃহে থাকার অস্তিত্ব সে ভুলিয়াই গিয়াছিল, হঠাৎ কখন মুখ তুলিতেই সন্ধ্যার আনত লজ্জিত মুখখানা তাহার চোখে পড়িয়া গেল।

"সন্ধ্যা—"

সে স্নেহের আহ্বানটী শুনিয়া ও সন্ধ্যা মুখ তুলিল না, নিঃশব্দে তাহার চোখ দিয়া কেবল অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

নিজের রুক্ষ স্বভাবের জন্য শিরীষ নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল আজকাল সে সত্যই সন্ধ্যার উপর এমনই কঠোর ব্যবহার করে সময় সময় তাহার মেজাজ হঠাৎ কেন যে বদলাইয়া যায় তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে না। বিবাহের পর এই দুই বৎসর কাটিয়াছে ইহার মধ্যে একদিনও তো সে এরূপ হয় নাই।

"এদিকে এসো সন্ধ্যা, একটা কথা শোনো।"

সন্ধ্যা উঠিল, কিন্তু শিরীষের দিকে গেল না, ধীর-পদে বাহির হইয়া গেল। বিস্ময়ে শিরীষ শুধু চাহিয়া রহিল, নির্ম্মল নীল গগনে কে একখানি কালো মেঘ সঞ্চার হইতেছে তাহা সে বুঝিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার অজ্ঞাতেই ঝরিয়া পড়িল। তাহার বৃত্তি মানবধর্ম্মানুসারেই চলিয়াছে, মানব ধর্ম্ম কোনও নীতির মধ্য দিয়া চলে না। এই মানব ধর্ম্মানুসারেই সে প্রথমে দীপিকাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকে

বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। পিতা মত দিবেন না তাই কিছুকালের জন্য সে কথাটা ভুলিতে পারে নাই। তাহার পর সে সন্ধ্যাকে দেখিল, তাহার অনিন্দ্যরূপে মুগ্ধ হইয়া গেল, গুণ ছাড়িয়া রূপের ভক্ত হইয়া পড়িল।

কিন্তু এযে গন্ধশূন্য পলাশফুল, দেখিতেই সুন্দর, তাই রূপের তৃষ্ণা যখন মিটিয়া গেল তখন শিরীষের হৃদয় হাহাকার করিতে লাগিল। তাহার বাসনা তখন তৃপ্ত হইয়াছিল, সন্ধ্যার রূপের মোহ তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। মানুষ তাই চায়, রূপের তৃষ্ণা যখন মিটিয়া যায় তখন গুণ খুঁজিয়া দেখো সন্ধ্যার আছে শুধু রূপ' আত্মহারা ভালবাসা, আর কিছু নাই? সে শিরীষের মনের মত লেখাপড়া জানে না, গান শিখিতে পারিল না, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাহার নাই; সে লতার মত তাহারই উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। সে রাগ করিতে জানে না, অভিমান জানে না জানে কেবল ভালবাসা দিতে। নিজের অনুভূতি এই ভালবাসার টানে সে হারাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু এত নির্ভরতা শিরীষ মোটেই পছন্দ করে না।

সে চায় এখন সর্ব্বগুণের আধার একটি নারী; তাহার অন্তর যাহার জন্য হাহাকার করিয়া মরিতেছে সে কই? তাহারই কাছে থাকিয়া সে আজ বহুদূরে।

শিরীষ ভাবিতেছে কেন সে রূপের মোহে মজিল? এই আত্মভোলা নারী লইয়া দিন তাহার কাটিতে চায় না যে। রূপের উপাসনা করে সকলেই, কিন্তু গুণহীন রূপের মোহ কাটিয়াও যায় দুইদিনে, গুণহীনা দুইদিন পরেই পুরাতন হইয়া যায়, তাহার মধ্যে পাইবার মত আর কিছুই থাকে না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার বুকখানা মথিত করিয়া বাহির হইয়া পড়িল আর পাইবার যো নাই যে, সেযে এখন অতীতের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। যখন পাওয়ার সময় ছিল তখন মোহে ভুলিয়া তাহাকে প্রত্যাখান করিয়াছে।

কিন্তু পাওয়া যায় না কি?

কথাটা মনে হইতেই সে অত্যন্ত চমকাইয়া উঠিল, ছিঃ, একি চিন্তা আসিয়া জুটিল? এ চিন্তা মনে আনাও যে মহাপাপ। পরনারী মাতৃ-তুল্যা যে।

মুখে হাসি আসে, পরনারী মাতৃতুল্যাই বটে, কিন্তু মন মানে কই? যে বাধাটা প্রবল ছিল ক্রমশঃই তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসে, বিরুদ্ধ যুক্তি হৃদয় ছাইয়া ফেলে। পরনারী মাতৃতুল্যা কথাটা বলা যায়, কিন্তু যথার্থ তাহা ভাবিতে পারা যায় কি? প্রাণ ভরিয়া যাহাকে ভালবাসা যায়, যদিই সে অপরের হয়, তাহাকে মাতৃভাবে ভাবিতে পারা যায় কি?

সুমতির পরাজয় ঘটিল, কুমতিই জয়লাভ করিল। নিবিড়ভাবে ভালবাসে, নহিলে তাহাকে সম্মুখে দেখিতেই সে মুখখানা অত বিবর্ণ হইয়া উঠে কখনও? তাহার হৃদয়ের ব্যথাটা মূর্ত্ত হইয়া উঠে তাহার চোখ দুইটাতে, তাহা তো লুকানো যায় না।

সমাজ, ধর্ম্ম চুলায় যাক, মানবের হৃদয়-ধর্ম্ম জয়লাভ করুক। ব্যথিত দুইটী প্রাণ সান্ত্বনা লাভ করুক, চোখ থাকিতে কেন তাহারা অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবে? তাহার স্ত্রী আছে, দীপিকার স্বামী আছে—

সব যাক, ভালবাসার জয় হোক। সেতো রাজি, কিন্তু দীপিকা—সে কি বলিবে?

বইখানা বুকের উপর রাখিয়া শিরীষ গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিল, কখন নিদ্রা আসিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিল তাহা সে জানে না।

(ক্রমশঃ)

পাঠরতা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২৮শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [চতুশ্চত্বারিংশ সপ্তাহ

বাইরে ও ঘরে

(ঘরে বাইরে নয়, বাইরে ও ঘরে)

পোষাকী

শ্রীশ্রীসুহৃদপত্নীর শ্রীকরকমলে

ক্ষুদ্র উপহার।

আটপৌরে—

দোহাই বাবা, বন্ধুর বিয়েতে সব খরচ হ'য়ে গেল,
এইবার তোমাদের মিটিয়ে দিচ্ছি বাবা !

পোষাকী

সান্ধ্যভ্রমণ—

"তুমি কোন গগণের ফুল
তুমি কোন গগণের তারা।"

আটপৌরে

দশটা—পাঁচটা !

"প্রাণ আর বাঁচে কেমনে ?"

পোষাকী

"পরের খরচায়।"

আটপৌরে

বড় ছুর্দ্দিন, কিছু পাইয়ে দাও ঠাকুর! ঠাকুর হে!

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

[শ্রীশিবরতন মিত্র]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাসে, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের স্থান,অত্যন্ত উচ্চ। দ্বিতীয় গোস্বামীর পর,

তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ও রসতত্ত্ববিৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে আর কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও বনদেব বিদ্যাভূষণ এই দুইজন মনীষী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার আকাশে শেষ উজ্জ্বলতম দুইটি নক্ষত্র। বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের শিষ্য। রস-তত্ত্বের গভীর ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বলদেব বিদ্যাভূষণের স্থান কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। স্বকীয়-বাদ ও পরকীয়-বাদ লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মতভেদ চলিতেছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার রচনায় সর্ব্বত্রই পরকীয়-বাদের সমর্থন করিয়াছেন। বিশ্বনাথ ও বলদেব উভয়েই বাঙ্গালী। বলদেবের বেদান্ত-ভাষ্যের অনুবাদ পানীনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থের ভূমিকা-অনুবাদক, বেদান্ত-ব্যাখ্যায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব আলোচনা করিবার জন্য সমগ্র পৃথিবীর দার্শনিকগণকে আহ্বান করিয়াছেন। বিশ্বনাথের গ্রন্থাবলী সমগ্র পৃথিবীর জন্য ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সংস্কৃত রচনাবলীর বিশুদ্ধ ও সুবোধ্য বাঙ্গলা অনুবাদও বাহির হয় নাই এবং তাঁহার দার্শনিক মতের কোনরূপ তুলনামূলক আলোচনাও হয় নাই। বিশ্বনাথের টীকা সমগ্র ভারতবর্ষে পণ্ডিত সমাজে সমাদরের সহিত

পঠিত হইয়া থাকে। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালী জাতির প্রতিভা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

মৎপ্রণীত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক' নামক বঙ্গভাষার পরলোক গত গ্রন্থকারগণের চরিতাভিধান গ্রন্থের জন্য, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের যে সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সংগ্রহ করিয়াছি, অথচ প্রকাশ করি নাই, "সচিত্র শিশিরে"র পাঠক পাঠিকাগণকে তাহাই উপহার দিলাম।

বঙ্গের গৌরব স্থল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ন্যায় মনীষীর সম্বন্ধে যাহাতে ভালরূপ আলোচনা হয়, এই প্রবন্ধের দ্বারা আমি তাহারই সূত্রপাত করিলাম। যোগ্যতর সুলেখক-গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক ইহাই আমার প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা।

রচিত গ্রন্থাদি—বিশ্বনাথ 'ক্ষণদা গীত চিন্তামণি' নামক বৈষ্ণবপদ সংগ্রহ পুস্তক সঙ্কলয়িতা এবং সংস্কৃত ভাষায় (১) 'সারার্থ দর্শনী' (সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, এই টীকার রচনা সমাপ্তিকাল ১২২৬ শক); (২) 'সারার্থ বর্ষিণী' (শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের টীকা); (৩) 'সুবোধিনী (কবিকর্ণপুর প্রণীত অলঙ্কার কৌস্তুভ গ্রন্থের টীকা); (৪) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনাত্মক বিংশ সর্গে সম্পূর্ণ 'ভাবনামৃত' নামক মহাকাব্য (১৬০০ শক); (৫ 'স্বপ্নবিলামৃত' না ক ক্ষুদ্র কাব্য, (৬) 'মাধুর্য্য কাদম্বিনী,' (৭) 'ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী' (৮) 'স্তবামৃত লহরী' (৯) 'চমৎকার চন্দ্রিকা' (১০) 'গৌরাঙ্গ লীলামৃত' (১১) বঙ্গভাষায় রচিত কবিরাজ গোস্বামীর 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা (১২) রূপ গোস্বামী বিরচিত 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থের 'আনন্দ চন্দ্রিকা' নামক টীকা; (১৩) গোপাল তাপনীর টীকা; (১৪) 'গৌরগণ চন্দ্রিকা' (১৫) 'উজ্জ্বল নীলমণি কিরণ'; (১৬) 'ভক্তি রসামৃত সিন্ধুবিন্দু' (১৭) 'ভাগবতামৃতকণা' (১৮) 'রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা' (১৯) 'গুণামৃত লহরী'; (২০) 'প্রেম সম্পুট,' (২১) 'রাধামাধব রূপচিন্তামণি,' (২২) 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম,' (২৩) 'সাধ্যসাধন কৌমুদী' (২৪) 'স্মরণ ক্রমমালা,' (২৫) 'ব্রহ্ম সংহিতার টীকা,' (২৬) 'হংস দূতের' টীকা প্রভৃতি রচয়িতা।

জীবনী—ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত (মতান্তরে মুর্শিদা-বাদের পশ্চিম ঝিল্লিখাস পুরের নিকট) দেবগ্রামে, রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণকুলে ১৫৮৬ শক, বাং ১০৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বনাথের দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন—জ্যেষ্ঠ রামভদ্র, মধ্যম রঘুনাথ। বিশ্বনাথ স্বগ্রামে এক অধ্যাপকের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। বিশ্বনাথ বাল্যকালেই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। 'নরোত্তম বিলাস' গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন কালেই একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইনি মুর্শীদাবাদ জেলার অন্তর্গত সৈদাবাদ নিবাসী কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া তথায় বহুকাল বাস করিয়া ছিলেন, সেইজন্য তিনি 'অলঙ্কার কৌস্তুভ' গ্রন্থের টীকায় নিজকে সৈদাবাদবাসী বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বনাথ দেখিতে অতি রূপবান ছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার এক পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সম্মত হন নাই। বিশ্বনাথ বাটীতে অবস্থান কালেই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন—ইহার ফলে তাঁহার বৈরাগ্য বাড়িয়া উঠে। পুত্রবৎসল জনক, স্নেহময়ী জননী, রূপবতী ভার্য্যা, বিপুল ঐশ্বর্য্য- এ সকলের মায়া তিনি চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম যাত্রা করেন এবং তথাকার সমস্ত তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিয়া স্থায়ীভাবে গোবর্দ্ধনের নিকট আরিটগ্রামে রাধাকুণ্ড তীরে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পবিত্র কুটীরে কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য মুকুন্দ দাসের সহিত বাস করেন। মধ্যে একবার কয়েকদিনের জন্য তিনি স্বদেশে আসিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন-ধামে তিনি গোকুলানন্দ নামে এক বিগ্রহ সেবা ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রদত্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী সেবিত গোবর্দ্ধন শিলারও সেবা আরাধনা করিতেন।

বিশ্বনাথের বহুশিষ্য ছিল—সুবিখ্যাত 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতা মুর্শীদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গীপুরের নিকট রেঞাপুর গ্রাম নিবাসী জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী তন্মধ্যে অন্যতম।

'বিশ্বনাথ কাব্যশাস্ত্রে সুবিখ্যাত পণ্ডিত। ইঁহার সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ অবলোকন করিলে, ইঁহার অসাধারণ কবিত্ব অনুমান করা যায়। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিলেও একমাত্র সুবৃহৎ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা লিখিয়া বৈষ্ণব জগতে চিরজীবিতের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত 'ভাবনামৃত' মহাকাব্যখানি বিবিধ রস, ভাব, অলঙ্কার ও প্রসাদাদি গুণে পরিপূর্ণ। এতদ্ভিন্ন ইঁহার লেখার যে কোন স্থানেই যখনই পাঠ করা যাউক না কেন, তখনই পাঠককে মুগ্ধ হইতে হইবে।' (গৌঃ পঃ তঃ খৃঃ ১৮৬)

কথিত আছে বিশ্বনাথ পরকীয়া মতাবলম্বী ছিলেন এবং রাজসভায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ 'হরিবল্লভ' নামে স্বরচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে ভণিতা দিয়াছেন। 'স্তবামৃত লহরীর' অন্তর্গত গীতাবলীও 'হরিবল্লভ' ও 'বল্লভ' ভণিতাযুক্ত। বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি এই নামেই সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন 'হরিবল্লভ' তাঁহার গুরু কৃষ্ণচরণের নামান্তর—তিনি এতই নিষ্কিঞ্চন ও আত্ম প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন যে তাঁহার গুরুর নামেই ভণিতা দিয়া পদাবলী রচনা করিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সঙ্গীতশাস্ত্রেও বিশেষ পটু ছিলেন।

রাগানুগীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের ভজন সাধনের নিমিত্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'ক্ষণদাগীত চিন্তামণি' নামক বৈষ্ণব-পদাবলী-সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ব্রজরস যাহাদের সাধনের ধন, হৃদয়ের সার সম্পদ এবং ব্রজ কিশোর কিশোরীর মধুর প্রেমলীলা সম্পাদন ও বিস্তারকারিণী সখিগণের দাসীরূপে আনুগত্য যাহাদের ভজনের তাৎপর্য্য ও বাসনার সার, সেই সকল ভজনানন্দী ভক্তগণের ভজন সাহায্যার্থ স্বনামধন্য রাগানুগীয় ভজন-পদ্ধতির সুপ্রদর্শক মহাত্মা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই প্রেমময় প্রেমময়ীর রসলীলা বর্ণন অনুসঙ্গে সখীভাবে সাধকের লোভ উৎপাদনার্থ সখীগণের স্বভাব, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, সুখ, দুঃখ, অধিকার, আদর ও চাতুর্য্যাদি বিশেষভাবে এবং অতি সুন্দররূপে এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে' (ক্ষণদা-চিন্তামণি—ভূমিকা)। এই গ্রন্থখানিতে কৃষ্ণপক্ষের প্রথমা হইতে অমাবস্যা এবং শুক্লপক্ষের প্রথমা হইতে পূর্ণিমা এই ত্রিংশ ক্ষণদায় বা ত্রিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। কৃষ্ণপক্ষীয় ক্ষণদায় ১৫২টি পদ আছে এবং শুক্ল পক্ষীয় ক্ষণদায় ১৬৩ পদ, সর্ব্বসমেত ৩১৫টি পদ আছে। এই গ্রন্থে স্বরচিত পদাবলী ব্যতীত কবিশেখর গোবিন্দ দাস, ঘনশ্যাম দাস, জ্ঞান দাস, নরহরি, নয়নানন্দ, নরোত্তম, বলরাম দাস, বংশী দাস, বাসু ঘোষ, বিদ্যাপতি, বৃন্দাবন দাস, রামানন্দ, বসুও রায়, লোচন দাস, শ্যামানন্দ প্রভৃতি ৪৩ জন সুবিখ্যাত পদকর্ত্তার পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই গ্রন্থে স্বরচিত ২৭টি পদ 'হরিবল্লভ' ভণিতা সহ সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রচিত একটি পদ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

শ্যামের তনু অব গৌরবরণ।

গোকুল ছড়ি অব, নদীয়া আওল, বংশীছোড়ি কীরতন॥ ধ্রু॥
কালিন্দী তট ছোড়ি, সুরসরিৎ তট, অবহুঁ করত বিলাস।
অরুণ বরণ, ডোর কৌপিন অব, ছোড়ি পীত ধরা বাস॥
বামে নহত অব, রাই সুধা মুখী, ব্রজবধূ নহত নিয়ড়ে।
গদাধর পণ্ডিত, কিরত বামে অব, সদা নঞে ভকত বিহরে॥
ছোড়ি মোহন চূড়া, শিরে শিখা রাখল, মুখে বহুত রা-রা রা-রা।
কহ হরি বল্লভ, তেরহ চাহনি ছোড়ি, দু'নয়নে গলত ধারা॥

কলাকাহিনী

(গল্প)

[শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়]

হরলাল কতকগুলি মাসিক পত্রিকার নিয়মিত গল্পলেখক। প্রেরণা আস্থক না আস্থক, গল্প তাহাকে লিখিতেই হয়, নতুবা সম্পাদকগণ তাগাদায় অস্থির করিয়া তোলেন। প্রথম অবস্থায়, সত্যসত্যই প্রেরণা আসিলে সে কতকগুলি গল্প লিখিয়া রাখিয়াছিল এবং ক্রমে বিভিন্ন মাসিকের সম্পাদকগণকে তোষামোদে বশীভূত করিয়া সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তারপর পালা পড়িল। সেই গল্পগুলির প্রশংসা হওয়াতে এখন আর তাহাকে সম্পাদকগণের দ্বারস্থ হইতে হয় না, সম্পাদকগণই তাহার দ্বারস্থ হন। এ গৌরব সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না; কাজেই গল্প লেখাটা এখন পেশার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। লিখিতে লিখিতে হাত সারিয়াছিল বটে কিন্তু গল্পাংশ (Plot) আর জোগায় না। গল্পাংশ (Plot) জোগাড় হইলে লেখার মুন্সিয়ানা দ্বারা সেটাকে সুখপাঠ্য করিয়া তুলিবার ক্ষমতা তাহার হইয়াছিল কিন্তু গল্পাংশ (Plot) জোটাই এখন মুস্কিল দাঁড়াইয়াছে।

একটা মেসে থাকিয়া সে এক সাহেব কোম্পানীর আফিসে চাকরি করিত এবং অবসর সময়ে গল্প লিখিত। আফিসের বড়সাহেবের প্রধান সহকারী বলিয়া কাজকর্ম্মের সুবিধার নিমিত্ত বড়সাহেব তাহার মেসের কক্ষে কোম্পানীর খরচায় একটী টেলিফোণ দিয়াছিলেন। তাহার বসিবার টেবিলেই সেটী স্থাপিত হইয়াছিল। হরলাল কবিজনোচিত সৌখিন ছিল। কক্ষটী তাহার বেশ ছিম্‌ছাম্‌ এবং নানা সংগ্রহ দ্বারা সজ্জিত। আলমারীতে সমুদ্রের ফেনা, কড়ি, বিভিন্ন বর্ণের ঝিনুক, নানাদেশের ডাক টিকিট, রকমারী পাথর,—এইরূপ নানা অনাবশ্যক জিনিষের অনাটন ছিল না। মেসের বন্ধুগণ ঠাট্টা করিয়া বলিত, "এইবার ঔপন্যাসিক হইতে প্রত্নতাত্ত্বিকে প্রোমোশন লইবে নাকি?"

হরলাল নিজকক্ষে বসিয়া গল্প লিখিবার চেষ্টা করিতেছিল। একটা প্লটের জন্য সে একবার কড়ি কাঠের পানে, একবার মেঝের পানে, একবার বা দেওয়ালের পানে চাহিয়া সাহায্য ভিক্ষা করিতেছিল,—তাহাদের নিকট হইতে কোন সাহায্যই মিলিল না। শেষে বিরক্ত হইয়া মোটামোটা অক্ষরে কাগজের শিরোনামার স্থানে লিখিয়া দিল "কলাকাহিনী," তারপর সেই লেখাটার দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ ভাবিল, আচ্ছা এই কলার উপর দিয়াই কোন গল্প লেখা সম্ভব কি না? নামটা কিন্তু দৈবাৎ বড় চটকদার হইয়াছে,—"কলাকাহিনী" যাহারই চক্ষে নামটা পড়িবে সেই ইহার শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া থাকিতে পারিবে না; ভাবিবে, 'কলার আবার কি কাহিনী লিখিল, একটা কলার কি কাহিনীই বা থাকিতে পারে? পড়িয়াই দেখা যাক্‌।' আহা, যদি এই সামান্য-কলাকেই অবলম্বন করিয়া একটা বেশ জমাট গল্প তৈয়ারী করিতে পারি তাহা হইলে কি চমৎকারই না হয়!

তা তো হয়, কিন্তু কিছুই মাথায় আসে না যে? হরলাল হাতদিয়া দুই পাশের রগ চাপিয়া ধরিল, যেন প্লটটা মাথার মধ্যেই রহিয়াছে, কেবল বাহিরে আসিতে চাহিতেছে না, নিঙড়াইলেই সেটা বাহির হইবে।

তাহাতেও যখন প্লট বাহির হইল না তখন ভাবিল, আগে নামগুলা ঠিক করে ফেলা যাক্‌, তাতে যদি কিছু সুবিধা হয়। ধর, নায়িকার নাম হল - সুশীলা, বর্ণ তার চাঁপাফুলের মত, চোখ দুটী তার কৃষ্ণতার; নায়কের নাম হল রণেন—যদিও সে ক্ষত্রিয়ও হবে না—যুদ্ধও করবে না। আর একজন--মালিটালিগোছ একটা হাসাবার চরিত্র করতে হয় -সেই যেন কলাবাগানের মালি। কিন্তু কলাবাগানে কোন নায়ক নায়িকাকে প্রেম করতে আজও দেখা যায় নাই। আচ্ছা, কলাটা বাদ দিয়া যদি ঝিঙে, শশা, কি উচ্ছের কাহিনী নাম করা যায় তবেই বা কেমন হয়?

ছাই হয়।

পাশে সেদিনকার খবরের কাগজটা পড়িয়াছিল, সেটাকে অকস্মাৎ তুলিয়া লইয়া একবার চোখ বুলাইল—যদি তাহাতে এমন কোন খুন জখমের সংবাদ থাকে যে একটু এদিক ওদিক করিয়া কলাবাগানে লইয়া গিয়া একটা ডিটেক্‌টিভ গল্পই লেখা যায়!

হরলালের কপালে ঘর্ম্ম বাহির হইল কিন্তু ঐ মর্ম্মের কোন সংবাদ সেদিনকার সংবাদ পত্রে ছিল না। শুধুই রয়টারের টেলিগ্রাম, না হয় তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ!

এমনি করিয়া হরলাল প্লট সম্বন্ধে যতই হতাশ হইতে লাগিল ততই নানারূপ আজগুবি প্লট শেষে তাহার মাথায় দেখা দিতে লাগিল। নায়ক, নায়িকার জন্য অপেক্ষার কালে কলাবাগানে চুরি করিয়া কলা খাইতেছিল, মালি তাড়া করিল। মুখের কলা গিলিয়া ফেলিতে দম্‌ আটকাইয়া নায়ক গেল মারা! নায়িকা তাহার জন্য কাঁদিয়া বেড়ায় "হায় প্রাণবল্লভ, কোথায় তুমি?" নায়ক মরিয়াও নায়িকার প্রেম ভুলিতে পারে নাই; কলা বাগান হইতে তাহার অশরীরি-আত্মা উত্তর করিল, "প্রিয়ে তোমা বিহনে—"

দূর ছাই, হচ্ছিল শুধু গল্প, তা'থেকে ডিটেক্‌টিভ কাহিনী, শেষে কিনা অলৌকিক কাহিনীতে এসে দাঁড়াল! সম্পাদক যে না পড়েই ছিঁড়ে ফেলে দেবে।

এমন সময় জোরে টেলিফোণের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। হরলাল বিরক্ত ভাবে টেলিফোণ ধরিয়া বলিল "হ্যাল্লো!"

স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর আসিল "হাঁগা, তুমি কি?"

হরলাল স্ত্রীকণ্ঠ অনুভব করিয়া নরমসুরে উত্তর দিল "কাকে চাই?"

"আমি সুশীলা। শোন প্রিয়, আমি বড় বিপদে পড়েছি। দয়া করে এখনি একবার এস, নইলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত।"

হরলাল আশ্চর্য্য হইল। সে আজিও বিবাহ করে নাই, কোন হীনপরিচয়ের স্ত্রীলোকের সহিতও তাহার পরিচয় নাই, তাহাকে 'প্রিয়' বলিয়া সম্বোধন করে কে? সে উত্তর দিল "দেখুন, আমার বোধ হয় আপনি ভুল—"

তাহার কথা শেষ না হইতেই স্ত্রীলোকটী বলিয়া উঠিল "ওগো, তারা যে এসে পড়বে। এখানে আমাকে দেখলে তারা মেরে ফেলবে। তোমার দুটী পায়ে পড়ি প্রিয়, শীগ্‌গীর এস; না এলে সত্যিসত্যিই আমার মরা মুখ দেখবে। আমি ৩২নং বেনেটোলায় উঠেছি, নীচে তোমাকে ছেড়ে দেবে,—কলা…"তারপরই স্ত্রীলোকটী টেলিফোণের রিসিভার নামাইয়া রাখিল,—শেষের কথাটা কলের খড়খড় শব্দে আর বোঝা গেল না।

হরলালও হতাশ হইয়া রিসিভার নামাইয়া রাখিল। স্ত্রীলোকটীর ফোণ নম্বর তো জানা নাই যে পুনরায় টেলিফোণে ডাকিয়া শেষের সঙ্কেতটা জানিয়া লইবে বা বলিবে যে সে কাহারও 'প্রিয়' নহে—টেলিফোণের মাগীগুলা উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়াছে—তাই 'প্রিয়'র কথা 'অপ্রিয়ের কাণে' আসিয়া পৌঁছিতেছে।

কিন্তু কি শুনিলাম? স্ত্রীলোকটীও 'কলা' বলিয়া কি বলিল নয়? না উহা আমারই চিন্তার প্রতিধ্বনি,—ঘুরিয়া টেলিফোণের মধ্য দিয়া আমারই কর্ণে প্রবেশ করিল? কলার কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে কি টেলিফোণেও কলা প্রবেশ করিল নাকি? না জগৎশুদ্ধ লোকে একই সঙ্গে কলার কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে? ব্যাপার খানাই বা কি! ঠিকানা বলিল ৩২নং বেনেটোলা। যাব নাকি? দেখেই আসা যাক না, কি বিপদ? আর স্ত্রীলোকটীই বা কেমন? সেও যেন 'কলা' বলে কি বল্লে! সেখানে আমার এই 'কলাকাহিনীর' জন্যে একটা প্লট পেয়ে যেতেও পারি বলে মনে হচ্ছে। সত্যঘটনা যদি গল্পের আকারে লেখা যায় তবে তার চেয়ে চমৎকার কল্পনা করে কি কেউ লিখতে পারে? সমালোচকরাও জব্দ। এমন হয় না বলবার উপায় নাই। যদি বলে, তখন সত্যঘটনা বলে জানিয়ে দিলেই মুখ চুণ করে চুপ করতে হবে। কিন্তু ঘটনাটা সত্য ব'লে প্রকাশ হ'লে লেখকের বাহাদুরী থাকে না। দুএকজন সমালোচক 'এমন হয় না' বলে বসবে; আজকাল সমালোচনার দাম তো ভারী! কিন্তু বিপদটা কি ধরণের? শেষে খুন জখমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ব না তো? হাঃ, খুনজখম দিনরাত বসে রয়েছে কি না! এমনও তো হতে পারে যে মেয়েটী অবিবাহিতা, স্বজাতীয়া এবং পরমা সুন্দরী।

আমিও ত অবিবাহিত। একটা কাব্যময় মিলনও তো ঘটতে পারে! তার বিপদ, আমি গিয়ে তাকে উদ্ধার করলাম; করে তাকেও ঘোড়ায় তুলে নিয়ে—আর দুত্তোর ঘোড়া। কলকাতা সহর, এখানে কি ওসব চলে? যাই হ'ক, দেখে আসা যাক্ ব্যাপার খানা কি?

হরলাল সুসজ্জিত হইয়া রওনা হইল। পথে ভাবনা হইল,—সে ঘরে ঢুকিয়াছে, এমন সময় যদি সত্যিকার 'প্রিয়' আসিয়া পড়ে তবে "কাঁধে বাড়ি বলরাম" হইয়া যাইবে! আবার ভাবিল, না, সে তো আর খবর পাইল না—আসিবে কেমন করিয়া? কিন্তু গিয়া যদি দেখি সে একটা ষাট বছরের বুড়ী? তাহ'লে ধুল্ ধুল্ পায়েই লম্বা। না; বুড়ী কিন্তু হতে পারে না। বুড়ীতে কি আর 'প্রিয়' বলে ডাকে? তারা 'ওগো হাঁগো'তেই সারে। আর বুড়ী হলে টেলিফোনেও তার কোফোগলার ঘড় ঘড় শোনা যেত। এ স্বর একেবারে চাঁচাছোলা। স্বরেই মনে হচ্ছে সে যুবতী ও সুন্দরী। আবার ভাবিল, আচ্ছা, আমাকে তাহার মনে ধরিবে তো? আমি এমনই বা কি কুশ্রী? নাটক নভেল ছাড়া তেমন সুশ্রী তো চোখে পড়ে না। আচ্ছা মনেও না হয় ধরল কিন্তু সে যদি গরীব কেরাণী দেখে বিয়ে না করতে চায়? শুধু ভাল চেহারা হলে বা ভাল গল্প লিখিয়ে বলে নাম থাকলেই তো হয় না; সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের দিকটাও মেয়েরা দেখবে বৈ কি? বাস্তবিক আমি তো গরীব কেরাণী বই আর কিছু নয়, একটা মাত্র পেট, খরচ তো আমার কিছুই নাই আমার যে অনেক টাকা জমতে পারে· একথা কি সে বুঝে নিতে পারবে না? ইঙ্গিতে যদি পরিচয় দিই তাহ'লে সে ইঙ্গিত বুঝে নেবার মত বুদ্ধিমতী কি সে হবে? কিন্তু নিজের পরিচয় নিজে দেওয়াও বড় লজ্জার কথা। আচ্ছা, এতসব তো ভাবছি কিন্তু সে যদি বেশ্যা হয়? সর্ব্বনাশ, তা হলেই তো গেছি! নাঃ, ভগবান কি এমনই করবেন?

হরলাল ভাবিতেছিল আর বেনেটোলার বাড়ীর নম্বর পড়িতেছিল। ২৮, ২৯, ২৯।১, ৩০, ৩১, ৩২,—এই যে! কিন্তু ৩২নং বাড়ীতে তো একটা কাচের দোকান। নানা রকমের ঝাড়, লণ্ঠন, হাঁড়, দেওয়ালগিরি প্রভৃতিতে ঘরে যেন পা বাড়াইবার জায়গা নাই। ভিতরে বছর ৮০ বয়সের একটা খোসা (গোঁপদাড়ীহীন) লোক চোখ বুঁজিয়া বসিয়া মালা জপিতেছে।

হরলাল পুনরায় বাড়ীটার নম্বর পড়িল, দেখিল ৩২-ই বটে। কিন্তু একি গরামল! কোথায় সেই কল্পনায় গড়া সুন্দরী, আর কোথায় এই অযাত্রা—বৃদ্ধ! ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া হরলাল দুর্গা বলিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ চোখ বুঁজিয়াছিল, পদশব্দে চোখ মেলিয়া এমন ভ্রুকুটির সহিত হরলালের দিকে চাহিল যে হরলাল থতমত খাইয়া এক করিতে আর করিয়া বসিল। মন্দ কাজ করিতে আসিয়া ধরা পড়িলে লোকে যেমন আবোল তাবোল কৈফিয়ৎ দেয় কতকটা সেই রকম। হরলাল হঠাৎ বৃদ্ধের ভ্রুকুটির উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল কাচের গ্লাস আছে?"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "টাম্বলার না ওয়াইন গ্লাস?"

হরলাল শেষোক্ত কথাটাই যেন প্রতিধ্বনির মত উচ্চারণ করিয়া ফেলিল—'ওয়াইন্ গ্লাস্।'

বৃদ্ধ তখন ডাঁটির উপর দাঁড়ানো ছোট মদের গ্লাস বাহির করিয়া, বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া হরলালের সামনে ধরিল। বলা বাহুল্য হরলাল মদ খাইত না এবং এ গ্লাস যে তাহার কি কাজে আসিবে তাহাও সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তবু অবস্থাটা এমন বলিয়া তাহার মনে হইল যে এইবার দাম না জিজ্ঞাসা করিলে আর যেন কিছু বলিবার নাই। দাম জিজ্ঞাসা করিল। দাম শুনিল ডজন ১২৲ টাকা, খুচরা দুটী একটী বিক্রয় নাকি সে করে না। আর কথা বাড়াইতে ইচ্ছা না করিয়া সে ১২৲ টী টাকা ফেলিয়া দিল এবং বৃদ্ধ গ্লাসগুলি ভালভাবে প্যাক করিতে লাগিল।

হরলাল ভাবিল কি দুর্দ্দৈব! খামকা বারোবারোটা টাকা গেল! মিউনিসিপালমার্কেটের মেম খরিদ্দারদের মত অভদ্রও সে হইতে পারিল না যে অনেক দর কসাকসির পর তাহারই দরে যখন দোকানদার রাজী হইল, তখন অন্যত্র আরও সস্তা হইবে ভাবিয়া, বিনা কৈফিয়তে সে সরিয়া পড়িবে।

ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া হরলাল বুক ঠুকিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি একটু আগে আপনার দোকান থেকে কা'কেও ফোণ করেছিলেন?"

বৃদ্ধ তেমনি ভ্রুকুটি করিয়া বলিল "টেলিফোণ? কই! আমার দোকানে তো টেলিফোণ নাই!"

"ও" বলিয়া হরলাল চুপ করিল কিন্তু টাকা বারোটা অনর্থক গেল বলিয়া বড়ই গা কচকচ্ করিতে লাগিল। সে আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, "টাকা ক'টা দিয়ে না ফেল্লে, জিনিষ পছন্দ হ'ল না বলে আস্তে আস্তে সরে পড়লেই হ'ত। ওআর আমার কি কলা করত?"

কিছুই করিতে পারিল না, অথচ টাকা বারটা গেল এই আপশোষে 'কলা' কথাটা একটু জোরেই তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। বৃদ্ধ গ্রাস মুড়িতে মুড়িতে আসিয়া হরলালের মুখের উপর তেমনি ভ্রুকুটি করিয়া বলিল 'কলা' এতক্ষণ বলেন নাই কেন? ঐ যে দরজা দেখছেন, ওর ভেতর একটা সিঁড়ি দেখবেন; সেই সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে চলে যান, সে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে।"

হরলাল এতক্ষণে যেন কূল পাইল এবং আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া বৃদ্ধের নির্দ্দেশমত সেই দরজার দিকে চলিল। দেখিল তাহার ভিতরে একটা অপরিস্কার এবং অপরিসর সিঁড়ি। সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া দেখিল একটী ছোট ঘরে ব্রাহ্মিকাদের মত পোষাকপরা একটী যুবতী, বর্ণ তার চাঁপাফুলের মত, চোখদুটী তার কৃষ্ণতার, দরজার দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্ন মুখে বসিয়া আছে।

হরলালকে দেখিবামাত্র যুবতী তাহার অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল "আঃ, তুমি এসেছ? তুমি এসেছ?" যুবতী হরলালকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গালে গাল রাখিয়া নিশ্চল প্রতিমার মত ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল।

হরলালও বেকুব নহে। এ অবস্থায় তাহার কি কর্ত্তব্য তাহা চট্ করিয়া স্থির করিয়া লইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেও যুবতীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, চোরের রাত্রিবাসই লাভ। ভুল ভাঙ্গিবার আগে পর্য্যন্তও যদি সেই স্পর্শ পাওয়া যায় তাই বা মন্দ কি? ভুলভাঙ্গার পর অঙ্গসেবা যদি অনিবার্য্যই হয় তবে, এই কোমলস্পর্শে তাহা উশুল গিয়াছে ভাবিতে পারা যাইবে। যুবতীর কোমলস্পর্শ, তাহার বাহু বেষ্টন, তাহার গণ্ডে গণ্ড স্থাপন, তাহার সুরভিত নিশ্বাস, তাহার বস্ত্রের সুবাস,—সকল গুলি একসঙ্গে মিলিয়া যে উন্মাদনার সঞ্চার করিল তাহাতে হরলালের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তারপর যুবতী যেন আবেশ কাটাইয়া ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল। হরলাল ইচ্ছা করিলেও, বাধা দিতে সাহস করিল না।—

যুবতী হরলালের মুখের উপর সলজ্জদৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল "ওঃ, একি হ'ল, একি করলাম? তোমার সঙ্গে আর না দেখা হওয়াই যে আমার ভাল ছিল। কখনও তো এমন আত্মহারা হই নাই। কিন্তু কি পরিবর্ত্তন হয়েছে তোমার, আগের চেয়ে তোমার চোখ মুখ সবই যেন পৃথক কিন্তু তুমি আগের চেয়ে সহস্রগুণে সুন্দর হয়েছ। অনেক দিনের পর দেখা, তাই কি এত মনে হচ্ছে?"

হরলাল ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিয়া ফেলিল "তাই নাকি?" মনে মনে বলিল "মন, পাগল হয়ে যেওনা—এমন সময়ে যেন খি হারিয়ে বস না।"

যুবতী তৃষিত নেত্রে পুনরায় হরলালের পানে চাহিয়া বলিল "আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? নইলে বারবার—তোমাকে চুম্বন করবার ইচ্ছে হচ্ছে কেন? যদি আর দেখা না হয় ভেবে কি?"

সপ্রতিভ হরলাল বলিল "আপনার যতবার ইচ্ছে আপনি চুম্বন করতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নাই। আমি এই গাল পেতে দিচ্ছি।" ভাবিল, আমি কে? এ আমাকে কা'কে মনে করেছে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য সুন্দরী এ! যার অপেক্ষা সে করছিল সে সত্যিসত্যি এসে পড়ে এমন মধুর সময়টা তেতো করে দেবে না তো?

যুবতী পুনরায় নিজেকে হরলালের আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে কেউ অনুসরণ করে নাই?"

"না।"

"ওঃ, কিন্তু তারা যে বড় চতুর। তুমি তা'দিগে জান না। রামহরিবাবু ভীষণ লোক।"

স্ত্রীলোকের নিকট—বিশেষতঃ এমন স্ত্রীলোকের নিকট কে খাটো হইতে চায়? হরলাল সগর্ব্বে বলিল "তা হ'ক

রামহরি ভীষণ লোক, এখানে তার চেয়েও এমন ভীষণতর লোক থাকতে পারে যে তাকে ঠাণ্ডা করে দিতে পারে।"

যুবতী বলিল "তোমার এখনকার চেহারা দেখে মনে হয় তুমি সিংহ, রামহরিবাবু তোমার কাছে শৃগাল। শোন, আমার সন্ধান পেলে তারা হয় তো আমাকে মেরেই ফেলতো। অবলা—কি করব, কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় তোমার কথা মনে পড়ল। চুপ, কে আসছে নয়?" হরলাল ভাবিল, সেই আসল লোকটা, সেই 'কাঁধে বাড়ি বলরাম' বুঝি তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিতে আসিতেছে!

নীচের দোকানঘরে বাস্তবিকই পদশব্দ শোনা গেল। যেখানে দাঁড়াইয়াছিল হরলালকে সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া যুবতী পা টিপিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল এবং একবার উঁকি মারিয়া, মৃতের মত সাদা ফ্যাকাশে মুখে চাপা গলায় বলিল "ওগো, প্রিয়, পুলিশ এসে পড়েছে যে! কি হবে? তোমার কাছে ছুরী কি রিভলভার আছে?"

সবিস্ময়ে হরলাল বলিল "বলকি! বলচ পুলিশ আসছে; তুমি কি আমাকে পুলিশ খুন করতে বল নাকি?"

যুবতী কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিল "প্রিয়, তুমি কি পাগল হ'লে? পুলিশকে খুন করতে না পারলে, পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করবে।"

"পুলিশ কি করবে?" কথাটা যেন ভাল করিয়া হরলালের কাণে গেল না কিন্তু না গেলেও যেন কেমন একটা অশান্তির ঢেউ বুক হইতে গলার দিকে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। চঞ্চল চক্ষে যে দরজা দিয়া পুলিশ আসিতেছে সেই দরজাটা এবং অপর দরজাটাও একবার দেখিয়া লইল; একবার একটা পা-ও উঠাইল; কি—ভোঁ দৌড় দেওয়া,—না বীরোচিত, না প্রেমিকোচিত, না কবিজনোচিত হইবে ভাবিয়া পা আবার যথাস্থানে রাখিল।

পদশব্দ অতি নিকটবর্ত্তী হইল। যুবতী এক নিঃশ্বাসে হরলালের কাণে কাণে বলিল "ঐ তা'রা এসে পড়ল! সব কথা অস্বীকার ক'রো। এখন একমাত্র আশা—অস্বীকার করায়।"

হরলাল বলিল "সে তো আমার পক্ষে খুব সোজা কাজ। আর সে কিছু মিথ্যেও হবে না।"

সাদাসিদা পোষাক পরা দুইজন লোক এই সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং দুইজনের মধ্যে যে লোকটা বেঁটে এবং খেঁটে গোছের সে বলিল, "সৌরভীর খুনের জন্য আপনাকে এ্যারেষ্ট করলুম প্রিয়তোষবাবু; আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। হাঙ্গামা না করে চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলে আসুন।"

যুবতী অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

এতক্ষণে ব্যাপারটা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া হরলাল বলিল, "মশায়, আপনারা বিষম ভুল করছেন। আমার নাম প্রিয়তোষ নয়—হরলাল।"

বেঁটে এবং খেঁটে গোছের ডিটেকটিভটী বলিল, "সে পরে দেখা যাবে, এখন তো আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন?"

ক্রন্দনের সুরে যুবতী বলিল, "প্রিয়, ওরা যাতে তোমাকে ধরে না নিয়ে যায়, তার কোন ব্যবস্থা করতে পার না কি?"

যুবতীর সেই বিষাদাচ্ছন্ন, মমতা-মাখানো স্বরে হরলালের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আহা, নিতান্তই নিঃসহায়া সে! নিশ্চয়ই কলিকাতায় তাহার এমন কোন আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি নাই যে তাহার এই বিপদে সাহায্য করিতে পারে। থাকিলে কি অপরিচিত তাহাকে আশ্রয় স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহার কণ্ঠলগ্ন হইত? একমাত্র আত্মীয় বোধহয় ঐ প্রিয়তোষ। ইহাদের কথাবার্ত্তায় মনে হইতেছে, সে ধরা পড়িবার ভয়ে কোথায় গা ঢাকা দিয়াছে এবং তাহার প্রণয়িনী—এই নারী তাহাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য অথবা নিজেও যদি কোন দৈব দুর্বিপাকে ঐ সৌরভীর খুনের সঙ্গে লিপ্ত হইয়া গিয়া থাকে তবে নিজেও বাঁচিবার জন্য টেলিফোণে প্রিয়তোষকেই ডাকিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু "উল্টা বুঝলি রাম" হইয়া 'প্রিয়'র স্থানে 'হর' আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

ডিটেকটিভদ্বয় এবার একসঙ্গেই তাগাদা দিল।

হরলাল বিনীতভাবে বলিল, "এই যুবতীর নিকট বিদায় লইবার একটু সময়ও কি আপনারা দিবেন না? ভদ্রলোক আপনারা—"

কথাশেষ হইবার পূর্ব্বেই ডিটেক্‌টিভদ্বয় হরলালকে মুক্তি দিল এবং হরলাল যুবতীকে কক্ষের অপর কোনে লইয়া আসিয়া নিম্ন অথচ দ্রুত স্বরে বলিল, 'আমি পুলিশকে যা বললাম তা ঠিক, তোমার কথা মত অস্বীকার করবার জন্ম কিছু বলি নাই। সত্যই আমার নাম প্রিয়তোষ নয়, আমার নাম হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সকালে যখন তুমি টেলিফোণ কর তখন ভুলক্রমে এক্সচেঞ্জ অফিস আমার টেলিফোণের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছিল। যদিও আমি বুঝেছিলাম যে আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় নাই, তথাচ তোমার বিপদ বুঝে আমি আসাই উচিৎ বিবেচনা করেছিলাম—এলামও; কারণ —কারণ আর কি? এলাম্ এই পর্য্যন্ত।"

বিস্মিতদৃষ্টিতে হরলালের মুখের পানে চাহিয়া যুবতী কহিল,"সেকি! তোমার নাম—আপনার নাম প্রিয়তোষ নয়?"

"না।"

"না? আমি যে আপনাকে চুম্বন করলাম! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!"

"তাতে আর কি এলগেল? সে ঠিকই হয়েছে। পূর্ব্বে, রাজা অশোক কি হংসধ্বজের আমলে চুম্বন নিন্দনীয় তো ছিলই না, বরং প্রথার মধ্যেই ছিল।—এখন সাহেবদের যেমন আছে। মা, বোন, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, বন্ধু, সবাইকেই চুম্বন করা চলে—কোন দোষ হয় না। ওর জন্তে তুমি মনে কিছু কর না। সে যা হ'ক, এখন আমি যা বলি শোন। আমি যে প্রিয়তোষ নই—তা আমি সহজেই প্রমাণিত করতে পারব; আর এদের হাত থেকে মুক্তিও পাব। ফিরে এসে আমি তোমার সব কথা শুনব—শোনা তো কিছুই হ'ল না—কিছু বুঝলামও না। মোটামুটি এই বুঝলাম যে একটা খুনের ব্যাপার এর মধ্যে আছে। ইতিমধ্যে তোমার প্রিয়তোষকে ইচ্ছা করলে তুমি সাবধান করে দিতে পার। আমি এদের দুজনকে খানিক ক্ষণ আটকে রাখতে পারব। এদের এ ভুলে বোধ হয় তোমার সুবিধাই হল। তারপর আমি ফিরে এসে—"

বেঁটে ডিটেকটিভ হাঁকিল, "হ'ল?" তারপর বিড় বিড় করিয়া বলিল, "আঃ, কথা আর ফুরোয় না, ছোঁড়াছুঁড়ীদের গতিকই ঐ!"

"এই হয়েছে" বলিয়া হরলাল বলিল "দেখ, ইতিমধ্যে যদি আমাকে কিছু জানানো আবশ্যক মনে কর তবে আমাকে টেলিফোণ ক'রো। আমার নম্বর বড়বাজার ১৭৫; এবার কিন্তু ভাল করে যাচিয়ে নিও, যেন আর কারো সঙ্গে যোগ না করে দেয়।"

সজল কৃতজ্ঞদৃষ্টি হরলালের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া যুবতী বলিল, "আচ্ছা।"

এখন আর বলিবার বিশেষ কিছু ছিল না, তবু কিন্তু হরলাল ইতস্তত করিতে লাগিল। ভাবে মনে হইল কিছু যেন বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। যুবতী তাহা বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু কি বলতে চান?"

হরলাল দুইটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, বলছিলাম কি,—বলছিলাম কি—যে রাজা অশোকের সময়কার প্রথাটা খুব ভালই ছিল। অন্যসময় যত না হ'ক, বিদায়কালে ও প্রথাটা তখন সকলেই বিশেষ করে মানতো।"

সলজ্জ মৃদুহাসিতে ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া যুবতী কটাক্ষ দ্বারা ডিটেকটিভ দ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করিল এবং সেই কটাক্ষ অনুসরণে হরলালও ডিটেকটিভ দ্বয়ের দিকে চাহিয়া বুঝিল যে ঐ লোকদুইটার উপস্থিতিই যুবতীকে এমন মধুর —রাজা অশোকের সময়কার 'প্রথা' পালনে বাধা দিল, নতুবা যুবতীর কোন আপত্তি ছিল না। হরলাল লোক দুইটার উপর হাড়ে চটিয়া গেল কিন্তু নিরুপায়ে তাহাদেরই অনুসরণ করিল।

পথে বাহির হইয়া হরলাল বেঁটে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি বুঝি ডিটেক্‌টিভ ইন্সপেক্টার?"

"হুঁ, রামহরি ইন্সপেক্টারের নাম শুনেছেন বোধ হয়?" হরলাল তেমন বিখ্যাত নাম শুনিয়াছে কি না শুনিয়াছে সে উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া বিখ্যাত রামহরি বলিল "আমিই সেই রামহরি ইন্সপেক্টার—আর ইনি আমাদের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রসিক বাবু। যে রসিক মুন্সীর নামে আগে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খেত।"

যদিই বা বাঘে বলদে একঘাটে জল-খাওয়া-রূপ অঘটন পুরাকালে কাহারও নামের দাপে ঘটিয়াছিল, হরলালের তাহা জানা ছিল না—কিন্তু তথাপি পুলিশ কর্ম্মচারীদ্বয়কে সন্তুষ্ট

রসিকবাবুর অভিপ্রায়ে অতিমাত্রায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—"ওঃ আপনারাই সেই! দেশবিখ্যাত নাম আপনাদের! আপনাদের নাম আর কে না শুনেছে।"

রামহরির মুখে হাস্যরেখা বিকশিত হইল কিন্তু যাঁহার পিতৃদত্ত নাম রসিক, তাঁহার মুখে কোন রসেরই বিকাশ বোঝা গেল না। হরলালও বুঝিতে পারিল না যে তাহার তোষামোদ রসিকের উপর কোন কাজ করিল কি না!

যাহা হউক রসিককে বাদ দিয়া হরলাল রামহরির সহিতই কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। বলিল, "দেখুন, এখন কাজের কথায় আসা যাক্। কি লোকটার নাম বল্লেন? প্রিয়নাথ না প্রিয়তোষ? তা দেখুন, আমি সত্যিসত্যিই প্রিয়তোষ নই। আমার নাম হরলাল—আগেই তো বলেছি। আমি বারটন হামফ্রে কোংর বড় সাহেবের পারসোনাল এসিট্যাণ্ট, তাছাড়া নানা মাসিক কাগজে গল্প লেখা আমার পেশা। আমার সঙ্গে যদি অনুগ্রহ করে আমাদের মেস পর্য্যন্ত যান তা'হলে সত্যই যে আমি হরলাল, প্রিয়তোষ নই, তার অনেক প্রমাণ দিতে পারি।"

রামহরি ভাবিতে লাগিল, ভাবে মনে হইল সে যেন ভাবিতেছে "তা গিয়ে দেখলে ক্ষতি কি?" রসিক কিন্তু তত সহজে ভুলিবার পাত্র বলিয়া মনে হইল না। সে বলিল, "কিন্তু মশায়ের স্মরণ আছে কি,—যুবতীটিও তো আপনাকে 'প্রিয়' বলে সম্বোধন করছিল?"

"ওঃ, সে অন্য কারণে। আপনাদের কাছে স্বীকার করায় ক্ষতি নাই যে কোন গোপনীয় কারণে যুবতী 'প্রিয়' বলে সম্বোধন করাতে আমি কোন প্রতিবাদ করি নাই। যে কোন কারণেই হ'ক আমি যুবতীর কাছে নিজেকে 'প্রিয়' বলেই প্রথমটা চালাচ্ছিলাম।"

রসিক বলিল, "অসম্ভব নয়—এমন হতে পারে। কিন্তু পথে দাঁড়িয়ে সব কথা শোনা হয় না, আগে থানায় চলুন, তারপর আপনার কাহিনী শোনা যাবে। ওহে রামহরি, ঐ ট্যাক্সিটাকে ডাক না?"

রামহরি ট্যাক্সি ডাকিল এবং তিনজনেই তাহাতে উঠিল।

গম্ভীর-প্রকৃতি রসিককে বলায় তেমন ফল নাই বুঝিয়া হরলাল শেষ চেষ্টাস্বরূপ অপেক্ষাকৃত সদয় প্রকৃতি রামহরির সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। বলিল, "দেখুন ইন্সপেক্টার বাবু, একবার আমাদের মেসে এসে, আমি যা বলছি তা সত্যি কিনা—দেখলে দোষ কি? ট্যাক্সিভাড়াটা না হয় আমিই দেবো, আর পাঁচমিনিটের বেশী দেরী করব না।"

রামহরি একবার হরলালের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "বেশ তাই চলুন। আপনার কথার ভাবে মনে হচ্ছে আপনি মিছে বলেন নাই। আর একটা ভুল-লোককে যদি থানায় নিয়ে যাই তবে আমাদেরও বোকা বন্‌তে হবে। আপনার ঠিকানাটা কি?"

"হ্যারিসন রোড। শিয়ালদহের দিকে।"

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে শিয়ালদহের দিকে গাড়ী চালাইতে বলা হইল এবং কতকটা পথ আসিয়া হরলাল একটা ত্রিতল বাড়ীর সামনে গাড়ী থামাইতে আদেশ করিল।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াই রামহরি বলিল, "দেখুন, খামকা একটা হৈ চৈ ক'রে কোন লাভ নেই। আমরা সাদা পোষাকেই আছি; কাউকে জানিয়েই বা দরকার কি যে আমরা পুলিশ? আমরা দু'জন যেন আপনার কোন বন্ধু, আপনার মেসে বেড়াতে এসেছি।"

এই সদ্বিবেচনার কথা শুনিয়া হরলাল সবিশেষ আনন্দিত হইল এবং সি, আই, ডি পুলিশের উপর তাহার ভীষণ অশ্রদ্ধাটা অকস্মাৎ ভীষণ শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়া গেল।

মধ্যপথে মেসের চাকর—রামধনের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং হরলাল অপ্রত্যাশিত ভদ্রতার সহিত, কথা কহিবার জন্যই কথা কহিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "কি রামধনি, কোথায় চলেছ?"

রামধনি বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় উত্তর দিল, "আজ্ঞে, হরলালবাবু, এই একবার বাজার চলিয়েছে; হামার কি ছুটী আছে? পিয়ারীবাবু বল্লন কিনা, রামধনি, দো-পয়েসাকা কচেইরি, আউর চার পয়েসাকা অমিবৃতি লে আও।"

রামধনি যখন হরলালবাবুর নাম করিল তখন হরলাল একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ডিটেকটিভ দ্বয়ের প্রতি চাহিল—যাহার সুস্পষ্ট অর্থ, দেখছেন তো মশায়, মেসের চাকর 'হরলাল' বাবু বলিয়াই সম্বোধন করিল, 'প্রিয়তোষ' বলিয়া করিল না? রামধনিকে বলিল, "তা বেশ, বেশ। তা, হাঁ

দেখ রামধনি, আমার এই বন্ধু দুটীর সঙ্গে আমার এই মেসে থাকার সময় নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। তুমি তো এখানকার পুরাণো চাকর; তোমার মনে আছে কি, কতদিন আমি এই মেসে এসেছি?"

আহ্লাদিত হইয়া রামধনি বলিল, "হামার চেয়ে পুরাণো এখানে কই নেহি আসে হরলালবাবু। ঠাকুর ভি নয়া, ঝিভি নয়া। হামিই তো ওদের আনলো, হামার মনে থাকবে না তো কি ঐ সব নয়া আদমীর থাকবে? কই সাড়ে তিন চার বরষ হোগা আপ আসিয়েসেন।"

আবার উভয়ের প্রতি সেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টি করিয়া হরলাল বলিল, "আমিও তাই এঁদিগে বলছিলাম।"

রামহরির মুখে হাসি কিন্তু রসিকের মুখ তেমনি গম্ভীর। হরলাল ভাবিল, এ লোকটার পোড়ারমুখে কি গাম্ভীর্য্য ছাড়া আর কিছুই নাই?

রসিক হরলালের চাহনীতে তাহাকে উত্তর প্রত্যাশী বুঝিয়া বলিল, "একে চরম প্রমাণ বলা চলে না। ওপরে আপনার ঘরেই আগে চলুন না।"

দরজার চাবী খুলিয়া আগে হরলাল এবং পিছনে রামহরি ও রসিক হরলালের ঘরে প্রবেশ করিল।

যেমন ছাড়িয়া গিয়াছিল, ঘর সেই অবস্থাতেই আছে—মায় টেবিলের উপর শিরোনামায় "কলা কাহিনী"-মাত্র লেখা সেই কাগজটা পর্য্যন্ত। সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে সেই লেখাটার উপর পড়িল এবং রসিক আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, "কলা-কাহিনী? হুঁ, সে সঙ্কেতটা কি হে রামহরি? কলা-ই নয়?"

রামহরি হাসিয়াই বলিল "হাঁ।"

হরলালের মুখ শুকাইল। তাহারও মনে পড়িল, সঙ্কেতটা কলা-ই বলিয়াছিল। একি ফ্যাসাদ! একি ভীষণ দৈবের যোগাযোগ! কোন পাপ নাই, অথচ গল্পের 'কলায়' আর সঙ্কেতের 'কলায়' মিলিয়া গিয়া বুঝি তাহার গলাতেই ফাঁস পরায়! তাহার মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা হইল। এত জিনিষ সংসারে থাকিতে কেন মরিতে রাগিয়া ঐ 'কলা' কথাটাই, কাগজের সমস্তটা সাদা রাখিয়া, শিরোনামায় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল? সত্যই কোন দোষ করিলে কৈফিয়তের উত্তরে লোকে যেমন আঁকাবাঁকি করিয়া দোষ-স্খালনের চেষ্টা করে, তেমনিভাবে হরলাল বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে তাঁহারা যাহা ভাবিতেছেন আসলে সে সব কিছুই নয়; উহা তাহার গল্পের শিরোনামা মাত্র।

রসিক বিষম গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গল্প? তা বেশ, গল্পই না হয় হ'ল। 'কলা'র গল্পটাই কি না হয় বলুন? ঐ কলা নিয়েই তো যত গোল বেঁধেছে।"

হা ভগবান, গল্পই যদি জুটিবে তবে আর "কলা-কাহিনী" গল্পের নাম দিব কেন? কিন্তু তা বলিলে কি ঐ গম্ভীর লোকটা বুঝিবে? তবু, আর কিছু বলিবার মত না পাইয়া, গল্পের অভাবেই যে "কলা-কাহিনী" নামের সৃষ্টি—এই কথাই বলিল। এইবার রসিকের গম্ভীর বদনে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়া একমুহূর্ত্তে হরলালকে বুঝাইয়া দিল যে কতবড় অবিশ্বাস্য কথাই না সে বলিয়াছে। হরলালের মনে হইল সে মাথার চুল ছেঁড়ে, না হয় হাত কামড়ায়, না হয় রসিকের গালে কসিয়া একটা চড়ই মারে। কিন্তু কোনটাই না করিতে পারিয়া, টেবিলের দেরাজ হইতে কতকগুলা পত্র বাহির করিয়া খামের ঠিকানায় তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, "এই দেখুন, এতো আর জাল হ'তে পারে না?" তারপর ব্যাঙ্কের চেক বহি, পাস বহি, জীবন-বীমার কাগজ ধড়াধ্বড় বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, "আর কি দেখতে চান বলুন—দেখাচ্ছি।"

যে সমস্ত কাগজ পত্রাদি টেবিলের উপর এইরূপে স্তূপীকৃত হইল, রামহরি একে একে ধীরে ধীরে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল এবং কতকগুলা দেখা হইবার পর বলিল, "আমার কথা আমি এই পর্য্যন্ত বলতে পারি যে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে, আমি আর কোন প্রমাণ চাই না। কিন্তু তা বলে এই প্রমাণের উপর আমার দায়িত্বে আপনাকে মুক্তিও দিতে পারি না। আপনিই বলুন দেখি—এমন কি হতে পারে না যে যদিও আপনি হরলাল নামে এই মেসে এতদিন ধরে বাস করছেন কিন্তু হরলাল আর প্রিয়তোষ এই দুটো নামই কি আপনার হতে পারে না? মেসে হরলাল নামই প্রচার করেছেন, আবার স্থানান্তরে প্রিয়তোষ বলেও তো নিজেকে চালাতে পারেন?"

অতি বিস্ময়ে হাঁ করিয়া ফেলিয়া হরলাল বলিল, "বলেন কি মশায় ?" এমন সন্দেহ যে উপন্যাসের বাহিরে, মানুষ মানুষকে করিতে পারে তাহা হরলাল ধারণাতেও আনিতে পারিতেছিল না।

রামহরি বলিল, "আপনার ঘরটা বেশ করে খানাতল্লাসী করা যাক, আপনার আঙুলের টিপ নেওয়া যাক, তারপর সদরে টেলিফোণ করে হুকুম নিয়ে, হুকুম মত কাজ করা যাবে। এতে আপনার কোন আপত্তি আছে ?"

আপত্তি থাকিলেই বা কি ? আর এতো বেশ ভাল কথাই ; আপত্তিই বা থাকিবে কেন ? হরলালও তাহাই বলিল। উপরন্তু বলিল যে "আপনারা এই সূত্রে যে কোন রকম তদন্ত করিলে খুশী হ'ন আমি তাতেই প্রস্তুত আছি। মনে জানি—আমি নিরপরাধ, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার গোপনীয় কিছুই থাকতে পারে না।"

রামহরি বলিল, "তা'হলে আপনি বাবুর সঙ্গে ওঘরে একটু গেলে ভাল হয়, আমি নিরিবিলিতে তদন্ত করতে চাই।"

হরলার বলিল, "ওঁতে আমাতে তাহলে আমার ঐ ছোট ঘরটায় গিয়ে বসি ?" বলিল বটে কিন্তু অরসিক রসিকের সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে যে কতক্ষণ অপর কক্ষে যাপন করিতে হইবে তাহার কোন স্থিরতা না থাকায় হরলালের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

রামহরি যেন তাহা বুঝিতে পারিল, বলিল, "আর আপনি যদি এমন ইচ্ছা করেন যে আপনাতে আমাতে ওঘরে বসি, আর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব গোপন তদন্ত করেন তাতেও আমার কোন আপত্তি নাই, অবশ্য যদি রসিকবাবু কোন অসুবিধা বোধ না করেন !"

অসুবিধা বোধ করা দূরে থাক, বরং রসিকবাবু বলিলেন যে গোপন তদন্তটা রামহরির পরিবর্ত্তে তিনিই করিতে ইচ্ছা করেন।

হরলাল এবং রামহরি অপর কক্ষের দিকে অগ্রসর হইবা মাত্র রসিকবাবু টেবিলের জিনিষ পত্র নাড়াচাড়া করিয়া তদন্ত সুরু করিয়া দিলেন এবং ঘরে ঢুকিয়া যখন রামহরি দরজা বন্ধ করিতেছিলেন তখন শোনা গেল, রসিকবাবু টেলিফোণে কোন এক থানায় ইন্‌সপেক্টারকে যেন ডাকিতেছেন। রিসিভার কিন্তু তখনও কলের উপরই রহিয়াছে—হরলাল যেন আবছায়া এমনি দেখিল। তারপর দরজা বন্ধ হইয়া গেল, আর কোন কথা শুনিতে পাওয়া গেল না। হরলাল ভাবিল, রিসিভার না তুলিয়া টেলিফোণ করিতেছে—এ কি-রকম ! পুলিশের লোক টেলিফোণ করিতে জানে না ইহাও তো সম্ভব নয়। তবে ভুলই বা দেখিল !

ঘরে জলের একটি কুঁজো ও তাহার মাথায় উপুড় করা একটা কাচের গ্লাস দেখিয়া রামহরিবাবু জল চাহিলেন এবং হরলাল জল গড়াইয়া আনিয়া বলিল, "আমি আগে একঢোক খেয়ে সপ্রমাণ করব কি যে জলে বিষ মিশিয়ে দিই নাই ?"

রামহরি হাসিয়া হরলালের হাত হইতে গ্লাস লইয়া জল পান করিলেন এবং সবিনয়ে বলিলেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না মশায়। আমাদের পেশাটাই এমনি পাজী যে মনে বিশ্বাস করলেও বাহ্যতঃ কতকগুলো লেফাফা-দোরস্ত অপ্রিয় কাজ করতে হয়। গোড়া থেকেই আমার বিশ্বাস, —আমরা ভুলপথে চলছি, আপনি প্রকৃত পক্ষেই সে লোক নন কিন্তু আমার বিশ্বাস বললে ওপরওয়ালারা তো শুনবে না ; তারা চাইবে প্রমাণ। যদি আপনি সহজে এবং সত্বরে ছাড়া পেতে চান তবে এই সব হাঙ্গামাগুলো বরদাস্ত করতেই হবে ; নইলে উপায় কি বলুন ?"

হরলাল বিমর্ষ ভাবে বলিল, "সে তো ঠিক কথাই কিন্তু সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রসিকবাবুর এখনও বেশ বিশ্বাস হয়েছে বলে মনে হয় না। লোকটি যেন কেমন একরকম—"

বাধা দিয়া রামহরি বলিল, "না, না, উনি খাসালোক। একবার মিশলে তখন বুঝতে পারবেন। তবে সহজে উনি কোন কথা বিশ্বাস করতে চান না কিন্তু একবার বিশ্বাস কোন রকমে হয়ে গেলে তখন দেখবেন, ওঁর মত লোক সংসারে বিরল। তখন আপনি টেনে ফাঁস গলায় নিতে চাইলে উনি জোর করে সে ফাঁস কেটে দেবেন।"

"তাই নাকি ? আমি তো তা'হলে ভারী ভুল করেছিলাম" বলিয়া বেফাঁস কথাটাকে চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল, "দেখুন ইন্‌সপেক্টারবাবু, ঘটনাটা আমাকে বলতে কোন আপত্তি আছে কি ? সৌরভীটিই বা কে ? আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কি ? তাকে

আমি খুনই বা করলাম কেন? এসব কথা জানবার জন্য আমার ভয়ানক আগ্রহ হচ্ছে।"

রামহরি মৃদু হাসিয়া বলিল, "কাল খবরের কাগজেই সব জানতে পারবেন।"

রামহরির সদয় ব্যবহারে হরলালের মনে হইতেছিল—রামহরির সহিত তাহার যথেষ্ট বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছে, তাই অন্তরঙ্গ জেনে একটু রসিকতার সুরে বলিল, "আরে ভাই, কালকের কথা কাল; এখন আজ বাঁচি কি করে? বল কি, সৌরভীকে খুন তো করলাম; কেন করলাম'এ-না জানতে পারলে কি রাত্রে ঘুম হয়? আমার সঙ্গে আর পুলিশের কায়দার দরকার কি? আমরা তো এখন বন্ধু— ভাই—ভাই।" এই বলিয়া আহ্লাদে রামহরিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, বেশ করিয়া বার-দুই ঝাঁকানি দিয়া বন্ধুত্বটাকে যেন বেশ করিয়া গছাইয়া লইল।

রামহরি উত্তরে প্রত্যালিঙ্গন না করিলেও তাহার সেই পরিচিত হাসিটীর দ্বারা হরলালের বন্ধুত্ব স্বীকার করিয়া লইল এবং বলিল, "নিতান্তই যখন ছাড়বে না—বিশেষতঃ রাত্রে যখন ঘুম হবে না বলছ, তখন বলছি শোন। সৌরভী ছিল একজন অতি গরীব বেশ্যা। খোলার ঘরে থাকত। হঠাৎ লাফে লাফে সে ধনী হতে আরম্ভ করে অথচ কিসে থেকে তার এ সৌভাগ্যের সূত্রপাত ও বৃদ্ধি, তা কেউ বুঝতে পারলে না। বেশ্যারা সাধারণতঃ তাদের "বাবু"র কৃপায় বা বাবুর সর্ব্বনাশ করে' অবস্থার উন্নতি করে। এর তেমন কোন ধনী 'বাবু' থাকা দূরে থাক, যে ছিল তাকে 'বাবু' বল্লে ও অভিধানটার অপমান করা হয়। কেউ কেউ কাণাঘুসো করত সৌরভী নাকি গোপনে কোকেনের ব্যবসা করে। পুলিশ চেষ্টা করেও কিন্তু তার কোন প্রমাণ পায় নাই। অল্পদিন পরে সে একটা বন্ধকী কারবার খোলে। প্রথমে বেশ্যা মহলেই এ কারবার চালাতো, ক্রমে ভদ্র মহলেও গহনা বা জিনিষ বন্ধক রেখে চড়া সুদে টাকা ধার দিতে আরম্ভ করে; চড়া সুদের দরুণ বাঁধা গহনা বা জিনিষপত্র বড় একটা কেউ ছাড়াতে পারত না। এমনি করে সৌরভীর ধন এবং শত্রু দুই-ই বাড়তে লাগল। তারপর একদিন সকাল বেলা দেখা গেল তারই শোবার ঘরে সে মরে পড়ে আছে—ঘরে রক্তের ঢেউ খেলে যাচ্ছে! সেইদিন হতে তার সেই 'বাবু' নামের অযোগ্য 'বাবু'—প্রিয়তোষও ফেরার। কে খুন করেছে এখনও জানা যায় নাই বটে, কিন্তু ফেরার প্রিয়তোষের সন্ধান মিললে এ খুনের সূত্র মিলতে পারে—এই আশায় তাকে খুঁজে বাহির করবার ভার আমাদের দু'জনার ওপর পড়েছে।"

এমন সময় অপর ঘর হইতে রসিক রামহরিকে কি একটা কথা বলিবার জন্য ডাকিল এবং বলিল, "ওঁকে ঐ ঘরেই রেখে তুমি একা এস।" অগত্যা শেষ শুনিবার কৌতুহল দমন করিয়া হরলাল, খুন, খুনী, যে খুন হইয়াছে তাহার ও তাহার বাবু প্রিয়তোষের সহিত যুবতীটীর সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তা করিতে করিতে একটা ভীষণ কথা তাহার মনে জাগিল যে প্রিয়তোষের মত হীন পরিচয়ের লোকের সহিত যাহার এত ঘনিষ্টতা সে তবে কোন শ্রেণীর? কথাবার্ত্তা বা পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া ভদ্রশ্রেণীর বলিয়াই যদিও ধারণা হয়, তথাচ বেশ্যাদের মধ্যেও আজকাল অনেকে কিছু বেশীদূর পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিতেছে,নাটক নভেল পড়িয়া ভদ্রসমাজের এমন অনুকরণ ও অনুসরণ করিতেছে যে পার্থক্য বুঝিয়া উঠা দায়! বেশ্যাই যদি সে হয় তবে রাজা অশোকের আমলের 'প্রথা' সম্বন্ধে অত করিয়া তাহাকে বুঝাইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল, রামহরি আর ফেরে না। অপেক্ষা করিয়া থাকিলে সময়টাও বড় বেশী বলিয়া মনে হয়। হরলালের মনে হইতে লাগিল রামহরি যেন গত কল্য সেই "একটা কথা" শুনিতে গিয়াছে—আজও ফিরিতেছে না! অপেক্ষায় ক্লান্ত হইয়া হরলাল শেষে দরজার নিকটে গিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মশায়দের হ'ল কি? আর একা কতক্ষণ বসে থাকব?" কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। দ্বারে কাণ পাতিয়া শব্দ অনুভব করিবার চেষ্টা করিল, ঘরে যে কোন লোক আছে এমন মনে হইল না। শেষে চীৎকার করিয়া বলিল, "অপরাধ নেবেন না মশায়রা, আর বসে থাকা যায় না, ডাকলেও উত্তর দিচ্ছেন না; আমি বেরুলাম, আপনাদের যদি কিছু সামলাবার থাকে—সামলান! বলিয়া সামলাইবার সময় দিবার জন্য আরও খানিক অপেক্ষা

করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। সবিস্ময়ে দেখিল অপরকক্ষে জনপ্রাণী নাই!

ঘরের অবস্থা দেখিয়া হরলালের চক্ষুঃস্থির হইয়া গেল। ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়ার পর ভাড়া ঘরের যেমন চেহারা হয়, ঘরটা যেন তেমনি বিশৃঙ্খলা হইয়া গিয়াছে, তেমনি খাঁ খাঁ করিতেছে। বাক্সের ডালাটা খোলা, আলমারীর দেরাজ একটা নীচে নামানো, একটা আধখোলা, লোহার সিন্দুক—যাহাতে তাহার আজীবন সঞ্চিত টাকাকড়ি এবং সোনাদানা থাকিত, তাহারও দরজা অর্দ্ধমুক্ত। খানাতল্লাসী করিলে কতকটা এমনি বিশৃঙ্খল হয় বটে কিন্তু তাহার বাক্স সিন্দুক খানাতল্লাসী যে তাহার চাবী না চাহিয়া তাহার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে করিবে তাহা তো তাহার ধারণাও ছিল না! ব্যাপার কি? প্রথমেই হরলাল নিজের সিন্দুক খুলিল—শূন্য! তারপর ক্রমান্বয়ে দুই তিনটি বাক্স—তাহার অবস্থাও তদ্রূপ।

এমন সময় ভৃত্য রামধনি তথায় উপস্থিত হইল এবং বলিল, "হরলালবাবু, আপলোককো বন্ধু দুজন বোললেন, আপনি একঠো গাড়ী করকে উন্‌লোককো মেসমে বাকী চিজ-সব লেকে যান। উন্‌লোক খালি তিনঠো বড়া বাকস্ লে গিয়া। টিক্সিমে চড়ায়া, বাকী বহুৎ মুস্কিল সে।"

হরলালের কণ্ঠ তখন শুষ্ক। ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় তারা গেল?"

রামধনি বিস্মিতভাবে বলিল,"সেকি হরলালবাবু! আপনি জানেন না, কাঁহা উন্‌লোক গিয়া? তব্ আপনি উন্‌কো মেসমে যাইবেন ক্যায়সে? আপকো বন্ধুলোক তো বোললেন যে হামারা মেস আপনি ছোড়িয়ে দিয়ে উন-লোককো মেসমে যাচ্ছেন, তাইতো হামি আপকো বাক্‌সো-ওকসো টিক্সিতে উঠিয়ে দিয়েসে। আপনি দোসরা বাবুর সাথ ওঘরে বাতচিৎ করছিলেন কিনা, ওসি-ওয়াস্তে আপনাকে আর দিক করলো না। পিছে দোসরা বাবু টিক্সিতে বৈঠকে হামকো বোললেন যে হরলালবাবু তোমকো বোলাতা হ্যায়। তা হরলালবাবু আপনি,—কেউ জানলো না, কেউ শুনলো না—হঠাৎ হামাদের মেস ছোড়িয়ে দিলেন কেন?"

রামধনির প্রশ্নের উত্তর না দিয়া হরলাল টেলিফোনে থানার ইন্সপেক্টারকে ডাকিল এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি মনে হয়?"

থানার ইন্সপেক্টার উত্তরে বলিলেন, "আমার মনে কিছুই হয় না। আমি জানি এ জীবনের দলের কাজ। দলে তাদের মোট তিনটি লোক—একজন বেঁটে এবং খেঁটে গোছের,একজন একটু ফর্সা আর ঢ্যাঙা, আর একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক, কিন্তু তিনজনেই তারা আমাদের শশব্যস্ত করে তুলেছে। রোজই তাদের একটা-না-একটা খবর আছেই। আচ্ছা প্রথমে বোধহয় মেয়েটা আপনাকে টেলিফোনে ডেকে একটা কিছু বিপদে সাহায্য চেয়েছিল, তারপর এক ব্যাটা খোসা-বুড়োর কাচের-দোকানের উপরে প্রেমে মত্ত হয়েছিলেন, তারপর বোধহয় দুটোলোক ঐ বেঁটে আর খেঁটে আর ঢ্যাঙা—আপনাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে এসে একজন অন্তঘরে আপনাকে একটা গল্পে আটকে রাখলে; তারপর কোনো কৌশলে দুইজনেই ঘরের দামী জিনিষপত্র সব নিয়ে লম্বা দিলে—এইতো?"

হরলাল বলিল "হাঁ, তাইতো! এখন উপায়?" হাসিয়া ইন্সপেক্টার বলিলেন, "নিরুপায়। এমন অনেক কাণ্ড তারা এই ক'দিনে করেছে, আমরা একটারও কিনারা করতে পারি নাই। ভারী তুখোড় দল।"

অমন সুন্দরী স্ত্রীলোকটী যে এমন কদর্য্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারে, সমস্ত শুনিয়াও হরলালের তাহা কেমন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না, তাই বলিল, "কিন্তু সেই সুন্দরী স্ত্রীলোকটী—সেও কি এর মধ্যে আছে বলতে চান্?"

ইন্সপেক্টার হাসিয়া বলিলেন, "আমি বলতে কিছুই চাই না। আমি জানি সেই মেয়েটারই দল। তারই নাম জীবনবালা। পুলিশের খাতায় ও দলটার নামই হল জীবনের গ্যাঙ্গ (Gang)—ওদের গ্যাঙ্গের রীতিই হল, মেয়েটা প্রথমে মিষ্টিকথায়, রঙে ঢঙে মন ভোলায়, তারপর যখন বোঝে তার রূপে, ব্যবহারে লোকটার মুণ্ডু ঘুরে গিয়ে বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে,তখন পুরুষ দুটোকে লেলিয়ে দেয়।"

হরলাল অকস্মাৎ বলিল, "আচ্ছা, খোসা বুড়ো কাচ-ওয়ালার দোকানে যখন এইসব কাণ্ড হয় তখন তাকে ধরলেই তো সব বেরুতে পারে?"

ইন্সপেক্টার হাসিয়া বলিলেন, "আপনার সুপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। আপনার আগে পুলিশের মাথায়ও ও বুদ্ধি এসেছিল। কিন্তু বুড়োকে আইনের প্যাঁচে ফেলবার সাধ্যি হয় নাই—এমনি আইন বাঁচিয়ে সে বুড়ো কাজ করে। সে বলে—ঘর ভাড়া দেওয়া তার ব্যবসা, আর তার দোকানে তো কোন ঘটনাই ঘটে নাই। যদি ঘটনার পরামর্শ মাত্র তার দোকানে হয়ে থাকে, নীচে থেকে তা শোনাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। যাহোক, মোট কথা, তাকে ধরে কোন লাভ হবে না। নমস্কার।" এই বলিয়া ইন্সপেক্টারবাবু টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন। হরলাল তখন টেবিলের সামনে বসিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। সম্মুখে সেই গল্পের শিরোনামা "কলাকাহিনী" তাহার চোখে পড়িল। ভাবিল গল্পের প্লটের জন্য আর ভাবিতে হইবে না, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া, যাহা ঘটিল—সেইটাই যথাযথভাবে লিখিয়া দিলেই একটা গল্প হইতে পারে—এবং 'কলাকাহিনী' নামটাও নিতান্ত বেখাপ হইবে না বোধহয়। *

* একটী ইংরাজী গল্পের ভাব অবলম্বনে।

মিলন

শ্রীশতদলবাসিনী দেবী

(সচিত্র শিশির গল্প-প্রতিযোগিতায় ভাদ্রের পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা)

নারায়ণশিলা সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের উদ্বাহ ঘটিলেও মিলন কোন দিনই হয় নাই; শুভ-দৃষ্টিতে, পুরোহিতের মিলনমন্ত্র গানের পরেও তাহারা এই দিনের আগের দিন পর্য্যন্ত যেমন উভয়ে উভয়ের অপরিচিত ছিল, তেমনি রহিয়া গেল। দু'জনে সামনা-সামনি হইলেও বাক্যালাপ করিত না, চোখে-চোখে দেখা হইলেও কেহ কখনো কাহাকে চিনিত না, এমন করিয়াই দিন কাটিতেছিল, কমলার বিবাহিত জীবনের ছয়টি সুদীর্ঘ বৎসর এমনই ভাবে কাটিয়া গেল।

হেমন্তরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। লোকে বলিত, হেমন্তর বিধবা জননী বিত্তশালিনী, হেমন্ত তাঁহার একটিমাত্র ছেলে, চাকরি-বাকরী না করিলেও তাহাদের চলিয়া যাইত। কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু হেমন্ত বি-এ পাশ করিয়া চাকরীর উমেদারী করিয়া একটা ভাল চাকরী জোটাইয়া ফেলিল। সে তাহার মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত ছিল; সেই ক্ষতিটা পূরণ করিবার জন্ত মাতার নিকট হাত না পাতিয়া সে চাকরী করিতে লাগিল; তাহার বরাত ভাল ছিল, চাকরীতে অল্প সময়ের মধ্যেই সে উন্নতি করিল। দুই বৎসরের মধ্যেই সে দুই শত টাকা বেতনের বড় চাকুরে হইয়া পড়িল! হেমন্ত চরিত্র হারাইয়া ফেলিয়াছিল। অল্প বয়সে কু-সঙ্গে পড়িয়া সে মদ্যপ হইয়া উঠিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে অন্ত দোষও হইয়াছিল, হেমন্ত রাত্রে গৃহে বাস করিত না। মাতার মনোকষ্টের অবধি নাই, একমাত্র পুত্র দুশ্চরিত্র, ইহার চেয়ে মনস্তাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? মাতা তাহাকে বিত্ত হইতে বঞ্চিত করিবেন, নিজে সব ফেলিয়া কাশীবাসিনী হইবেন কত ভয় দেখাইলেন, কত অনুযোগ করিলেন, হেমন্ত সে-সব কাণেই তুলিল না! বহু অশ্রুপাতের পর, বহু সাধ্য সাধনার পর মাতা যখন মনের বাসনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না, তখন আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইতে চাহিলেন।

সেদিন ছিল রবিবার, হেমন্ত মধ্যাহ্ন-আহারের পর নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল, মাতা সাশ্রুনয়নে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন—তুই আমার একটিমাত্র সন্তান; তোকে কোলে করিয়াই আমি বিধবা হইয়াছি, তদবধি তোকে বুকে করিয়াই আমার দিন কাটিয়াছে। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, তুই আমার একটা ছেলে। তুই যদি মনস্তাপ দিস্, শেষ বয়সে আমাকে এমন করিয়া জ্বালাইয়া পোড়াইয়া মারিস তবে এ ছার জীবন রাখিয়া আর কি হইবে! আত্মহত্যা পাপ, মহাপাপ, তাহা আমি জানি কিন্তু যে জ্বালায় জ্বলিতেছি, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত আমি আত্মহত্যাই করিব, সাত জন্ম নরকে পচিয়া মরিব, সে'ও ভাল, এমন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর পুত্রের সংসারে একটি দিনও আর থাকিব না।

কাপুরুষ হেমন্তর মন মাতার অশ্রুজলে ভিজিয়া উঠিল; হেমন্তর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

মা বলিলেন—আমি আত্মহত্যা করব হেমন্ত। আজকের রাত পোয়ালে আর তোর মাকে তুই জ্যান্ত দেখতে পাবি নে। আর আমি তোকে জ্বালাতে আসব না, আজই তার শেষ। কাল সকালে যখন তুই বাড়ী ফিরবি, দেখবি তোর মা মরেছে। হেমন্ত, একটা কথা আমার রাখিস্, নিজে না পারিস, গোটা দুই ব্রাহ্মণ দিয়ে সংকার করাস্, দেখিস্ তোর মা'কে যেন মুচী মুদ্দফরাসে না ছোঁয়। এই কথাটা

তুই আমার রাখিস্। আমি তোর মা, গর্ভধারিণী, এই তার শেষ অনুরোধ!—মা অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

হেমন্ত দুর্ব্বলচিত্ত ও কাপুরুষ, গলিয়া গিয়া বলিল—ওসব কথা কেন? কি চাও, কি করতে হবে তাই কেন বল না?

মা বলিলেন—তা কি কখনও বলিনি হেমন্ত?

হেমন্ত বলিল—বলেছ—বলেছ! আজও বল-মা।

মা ছেলের চিবুক ধরিয়া আশাপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—বলব বাবা, রাখবি? মা'র কথা রাখবি?

মা ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—হেমন্ত বাবা আমার, বিয়ে কর। তুই সংসারী হয়েছিস দেখে আমি সুখে মরতে পারি। 'না' করিস নে বাবা; আমি তোর মা, গুরুজন, আমাকে সুখী করিছিস জান্‌লে ভগবান তোর ওপর প্রসন্ন হবেন, সুখী হবি বাবা।

হেমন্ত নীরব।

মা ব্যাকুলভাবে পুত্রের মুখের পানে চাহিলেন; কাকুতি, মিনতি, অনুনয়-বিনয় সব যেন সেই দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিল; বলিলেন—বাবা আমার! আমি সব ঠিক করিছি বাবা, সুন্দরী মেয়ে, লেখাপড়া জানে, গাইতে পারে, মত কর বাবা!

হেমন্ত বলিল—আচ্ছা দেখ!

মা অশ্রুজলে ভাসিয়া, ছেলেকে চাপিয়া ধরিয়া, শত-সহস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই হেমন্ত বিবাহ করিয়া জননীর 'দাসী' লইয়া গৃহে ফিরিল। হেমন্তের জননীর প্রাণটি যেন ইহারই অপেক্ষায় পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিল। তিনদিন না কাটিতেই তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। বাস্তবিক হেমন্ত যে দাসীকে আনিয়াছিল. সে প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল; যমের গ্রাস হইতে তাঁহাকে ফিরাইবার আগ্রহ যেন তাহারই সকলের চেয়ে বেশী। ক্ষুদ্রা নারীর দু'টি কোমল হস্তের বজ্রমুক্ত করিয়া শক্তিমান যমরাজ তাঁহার শিকারটিকে কাড়িয়া লইলেন। তবে বড় অল্পে পারেন নাই, কিছু-অধিক একটি মাস কাল তাঁহাকে সেই নারীর সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

সংসারে অন্য লোক থাকিলে নব-বধূকে নিশ্চয়ই অপয়া অলক্ষণা প্রভৃতি কটু সম্ভাষণে সম্ভাষিত হইতে হইত, হেমন্তর সংসারে কেহ ছিল না, কাজেই বধূ দুঃখটাকে বুকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিতা হইল না।

মাতার বিয়োগে হেমন্তও দুঃখ পাইয়াছিল; তিন চারিদিন সে ঘর হইতে বাহির হইল না; কাহার সঙ্গে কথা কহিল না। কমলা হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া তাহার সামনে ঢালিয়া দিয়া বসিয়া থাকত, হেমন্ত কোনদিন খাইত, কোনদিন খাইত-ও না। সারারাত্রি সে ঘুমাইতে পারে না, ছট্‌ফট করে, কমলা তাই তাহার গায়ে মাথায় পায়ে হাত বুলাইয়া দেয়, নানা উপায়ে তাহার নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা করিয়া থাকে। কৃতকার্য্য না হইয়া ভাবে, মা'র অভাব কি অন্যে পূরণ করিতে পারে?—কিশোরী নিজেই উত্তর দেয়-না পারে না।

অশৌচান্ত হইয়া গেল। আঁশপান্নার পরদিন কমলা স্বহস্তে নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাত্রে দ্বিতলে স্বামীকে ডাকিতে আসিয়া ভৃত্যের মুখে সংবাদ পাইল, তিনি সন্ধ্যার পরই বাহির হইয়া গিয়াছেন। কমলা জানিতে চাহিল—কখন্ আসিবেন কিছু বলিয়া গিয়াছেন কি-না। ভৃত্য সে কথার উত্তর না দিয়া মৃদু হাসিল। কমলা এ হাস্যের অর্থ বুঝিল না। বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। রাত্রি ক্রমেই বাড়িয়া গেল; পাড়া নিঃশব্দ হইল; কমলা পুনর্ব্বার ভৃত্যকে সেই একই প্রশ্ন করিল। ভৃত্য বলিল—বাবু রাত্রে ফিরবেন না, একেবারে কাল সকালে আসবেন!

কমলা ভয়ে ভয়ে আস্তেআস্তে জিজ্ঞাসা করিল—বাবু কি কিছু বলে গেছেন?

না।

তবে তুমি জানলে কি করে' হরি?

জানি-গো জানি। বাবু রাত্রে ঘরে আসে না।

কমলার হাত পা বুক কাঁপিতেছিল,—আসে না!

না।

কতদিন?

যতদিন আমি আছি, বাবুকে বাড়ী থাকতে দেখিনি।

কমলা শুনিয়াছিল, হরি ইহাদের বাড়ীতে তিন বৎসরের উপর আছে। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তি হইল না; কমলা কাঁপিতে কাঁপিতে ফিরিয়া যাইতেছিল,

হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—কোথায় থাকেন ?

হরি বলিল—সে আমি কি জানি বৌমা! তবে এই নিয়ে মা'র সঙ্গে রোজ তকরার হ'ত; মা কাঁদতেন।

কমলা রান্নাঘরে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়াছিল। তারপর—ছ'বছর এমনি কাটিয়াছে; কমলা ছয় বৎসরের ২১৯০টি রজনী একাকী বিনিদ্র কাটাইয়াছে, স্বামী-প্রেম-বঞ্চিতা, স্বামী-সুখ-রহিতা নারীর জীবন এমনই অনাদরে উপেক্ষায় অতিবাহিত হইয়াছে।

(২)

শ্রাবণ মাস, অপরাহ্ন হইতেই কখন মুসলধারে, কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িয়া পৃথিবী ভিজিয়া উঠিয়াছে। কমলা তাহার ঘরের জানালায় পথের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। কয়দিন স্বামী একেবারেই গৃহে আসেন নাই; হরি কতস্থান অন্বেষণ করিয়া আসিয়াছে, নিত্য আফিসে গিয়া খবর লইয়া আসিয়াছে, বাবুর কোন সন্ধান পায় নাই। নেহাৎ না করিলে নয়, তাই কমলা সংসার করিতেছিল। সংসারে যদি দাস-দাসী দুইটার খাবার ভার তাহারা নিজেরা লইত কমলার মনের ও দেহের সে অবস্থায় সে শয্যা ত্যাগই করিত না। সেই কোন্ সকালে তাহাদের খাওয়াইয়া কমলা বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছিল, এইমাত্র উঠিয়া জানালাটায় বসিয়াছে। আকাশ কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধ্যা হইতে দেরী থাকিলেও মনে হয় যেন সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে।

হরি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল—মা, বাবু এসেছেন, গাড়ীতে বসে আছেন, তোমাকে ডাকছেন।

কমলা দাঁড়াইয়া উঠিল; বলিল—গাড়ীতে ?

হ্যাঁ। তোমাকে ডাকছেন।

রাগ-অভিমান কমলার ছিল না। থাকিবেই বা কোথা হইতে ? করিবে কাহার উপর ? যাহার সঙ্গে কখনো দেখা হয় নাই, বাক্য-বিনিময় হয় নাই, তাহার উপর রাগ অভিমান কি হয় ? দুঃখ হয়, তাহাও তাহার উপর নয়, নিজের অদৃষ্টের উপর। কমলা হরির পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া সদর দরজায় গাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। কমলা চক্ষু নত করিয়াই আসিয়াছিল কিন্তু গাড়ীর সামনে দাঁড়াইতেই আপনা হইতেই চক্ষু দু'টি উঠিয়া পড়িল। একদৃষ্টিতে সে দেখিতে পাইল—স্বামীর চেহারা অত্যন্ত শুষ্ক, শীর্ণ, যেন রোগগ্রস্ত।

হেমন্ত বলিল—সংসার খরচের টাকাকড়ি তোমার কাছে নেই বোধহয় ?

কমলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

দুদিনও চালাতে পারবে না ?

তা—পারব।

তা'হলেই হ'ল। দু'দিন পরে ১লা, এই চিঠি খানা হরিকে দিয়ে আফিসে পাঠিয়ে দিও, টাকা আনবে।

কমলা জিজ্ঞাসিল—আপনি ?

আমি! হাসপাতাল যাচ্ছি।

কমলা মুখ তুলিয়া বলিল—হাসপাতাল কেন ?

অসুখ।

কি অসুখ ?

খারাপ অসুখ।—নাম করলেও তুমি বুঝতে পারবে না।

বাড়ীতে চিকিৎসা হয় না ?

হয়। কিন্তু…

কমলা ব্যাকুলনয়নে চাহিল।

কিন্তু নার্সিং বাড়ীতে হয় না; খারাপ অসুখ, খাটবে কে ?

কমলা মৃদুস্বরে বলিল—কেন—আমি!

হেমন্ত অবজ্ঞায় হাসিয়া বলিল—তুমি! তুমি পারবে না।

পারব।

তোমার কষ্ট হবে।

না। আপনি নেবে আসুন। আমার একটুও কষ্ট হবে না। আমার বাবা কাশ-রোগে এক-বছর ভুগেছিলেন, আমি একাই তাঁর সেবা করেছিলুম।

হেমন্ত কি ভাবিল, তারপর বলিল—না; ও হাঁসপাতালেই ভাল। কেন তোমাকে কষ্ট দিই কতকগুলো!

কমলা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—সে আমার কষ্ট নয়!

* * * *

হেমন্তর হাতখানা হাতের মধ্যে লইয়া কমলা বলিল—সমস্ত রাত ভয়ে কেঁপেছি, কি-হয় কি-হয় করেছি, যে যন্ত্রণা পেয়েছ, মনে করলে এখনো আমার রক্ত জল হয়ে যায়। কেবল ভগবানকে ডেকেছি, বলেছি, মা কালী তোমাকে

সারিয়ে দিন, আমি বুক চিরে রক্ত দেব। আজ বাইশদিন পরে ডাক্তার বলে গেলেন, সিঙ্গি মাছের ঝোল আর দু'টী পোরের ভাত দিতে, আজই সকালে গঙ্গাস্নান করে বুক চিরে সোনার বাটীতে ক'রে রক্ত দিয়ে মা'র পূজো দিয়ে এসেছি।

হেমন্ত বলিল—কমলা, তোমার ঋণ এ-জীবনে আমি শুধ্‌তে পারব না।

কমলা জিব কাটিয়া বলিল—ছিঃ ছিঃ ওকথা কি বলতে আছে! আমার আবার ঋণ কিসের!

হেমন্ত বলিল—না কমলা, এ জীবন ত গেছল, তুমিই ফিরিয়ে দিয়েছ, তার শোধ কি আমি দিতে পারব।

কমলা হঠাৎ বলিল—আর কিন্তু কোথাও যেও না।

হেমন্ত বলিল না। আবার?

আশান্বিত হৃদয়ে কমলা জিজ্ঞাসিল—যাবেনা ত?

না।

আমার গা ছুঁয়ে বলছ?—তখনও হেমন্তর শীর্ণ হস্তখানি কমলার কোমল করে আবদ্ধ ছিল। কমলা বলিল—আমার গা ছুঁয়ে বলছ?—সে সাগ্রহে হাতটায় একটু চাপ দিল।

এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

কমলা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতে, দুর্ব্বল হেমন্ত তাহাকে আস্তে আস্তে কাছে টানিয়া তাহার মুখে একটি চুম্বন করিল।

(৩)

মাসখানেক পরে কমলা সেই জানালাটিতে বসিয়া আছে, স্বামী রাস্তায় পাদচারণ করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে উপরের দিকে চাহিতেছেন, চারিচক্ষে মিলন হইতেছে, উভয়ের চক্ষুই উজ্জল হইয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যা হইয়া গেল। মালকোঁচা বাঁধা, মই ঘাড়ে একটা লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ছুটিয়া রাস্তার গ্যাস-গুলি জ্বালিয়া দিয়া গেল। কমলা গ্যাসালোকে রাস্তার পানে চাহিয়া দেখিল, একটা হিন্দুস্থানী হেমন্তর হাতে একখানি পত্র দিল; তিনি আলোর কাছে দাঁড়াইয়া সেখানি মন দিয়া পড়িলেন; তারপর তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া আবার পত্র-খানি পড়িয়া লোকটাকে কি বলিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন। কমলাকে বলিলেন—কমলা আমি একটু বেরুচ্ছি, আস্‌তে একটু দেরী হবে হয়ত। তুমি খেয়ে নিয়ো, আমার খাবার ঢেকেই রেখো।

কমলা জিজ্ঞাসিল—কোথায় যাবে?

একটু দরকার আছে।

কমলা কাছে আসিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে বলিল কোথায়—বল?

নাই বা শুনলে কমলা!

কমলা অভিমানে ফুলিয়া বলিল—বেশ শুন্‌ব না।

হেমন্ত জামা পরিতে পরিতে বলিল—আচ্ছা দেরী করব না; যাব আর আসব।

কমলা কথা কহিল না।

হেমন্ত হাত-ঘড়ি বাঁধিয়া, কেশ সংস্কার করিয়া কাছে আসিয়া বলিল—রাগ করলে?

না।

তবে চুপ করে আছ কেন?

একটা কথা ভাবছি।

কি কথা কমলা?

তুমি কোথায় যাবে—আমি জানি।

কোথায়?

তার বাড়ী।

হেমন্ত সাশ্চর্য্যে বলিল—তুমি কেমন করে জান্‌লে কমলা?

কমলা বলিল—আমি জানি।

কেমন করে' জান্‌লে—বল?

সেখানে তোমার যাওয়ার সঙ্গে আমার মরণের যোগ আছে—জান-না?

তুমি পাগল!

পাগল নই।—দেখো। সেই যে আমার গা ছুঁয়ে দিব্বি করেছিলে, যাবেনা, মনে আছে?

আছে।

গা ছুঁয়ে দিব্বির কি মানে জান?—মরতে আমি ভয় পাইনে কিন্তু তোমার যে কষ্ট হবে—বলিতে বলিতে কমলা কাঁদিয়া ফেলিল।

হেমন্তের চক্ষে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। তাড়াতাড়ি জল মুছিয়া, পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া কমলার হাতে দিয়া বলিল—পড় দিকিন কমলা।

কমলার পড়া হইলে জিজ্ঞাসিল—কি মনে হয়?

কষ্টে পড়েছে, টাকা চাই; টাকার জন্যে তোমায় চায়।

ঠিক বলেছ! আজকের মত কিছু পাঠিয়ে দিই; পরে যেন না আসে—বলে দিই কেমন?

হ্যাঁ।

কমলা যেমন যেমন বলিল, হেমন্ত সেইরূপ কার্য্যই করিল। আজ কমলার উপদেশ হেমন্ত নিজ অন্তরের উপদেশ বলিয়া মনে করিল; আজই তাহাদের প্রকৃত মিলন হইল।

ষ্টারে—"প্রফুল্ল"

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

সত্যই স্থানকাল পাত্রের একটি অপূর্ব্ব মহিমা আছে। সেদিন বহুদিন পরে ষ্টারে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের হিন্দু সমাজের নিখুঁত জীবন্ত ফটোগ্রাফ মহানাটক "প্রফুল্ল" অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাটকখানি বহু শিল্পীর দ্বারা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে সংখ্যাতীতবার সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে এবং অতীতকালের সে স্মৃতি এখনও দর্শকবৃন্দের মন হইতে মলিন হইয়া যায় নাই। "প্রফুল্ল" দেখেন নাই, থিয়েটার অনুরাগী দর্শক এমন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এমন কি, "প্রফুল্ল" বাংলার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে সমাজের উন্নতিকল্পে শিক্ষিত অবৈতনিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে এবং এখনও হইয়া থাকে। ষ্টার থিয়েটার পরিচালক দি আর্ট থিয়েটার লিমিটেড—বাংলা রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বদিক হইতে বিশেষ সংস্কার সংসাধিত করিয়াছেন তাহা আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। প্রমাণ সমালোচনার অপেক্ষা এক "কর্ণার্জ্জুন" নাটকে শিল্পীগণের অভিনয় নৈপুণ্য, প্রায় দেড়শত রাত্রি ক্রমান্বয় সমানভাবে দর্শকের ভিড় জমাট বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের কৃতিত্ব, সহস্র নিন্দুকের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে তাঁহাদের অভিনেতৃগণের অভিনয় লিপি কুশলতা দেখিয়া দর্শকের সত্য মিথ্যা বিচারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত অন্তর সমালোচক আপনার দাহিকাশক্তির অন্যায় আবির্ভাবে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

প্রফুল্ল নাটকখানি বহুদিন পরে পুনরায় অভিনয় করিয়া আর্ট থিয়েটারের পরিচালকগণ সত্যসত্যই প্রকৃত নাটক অভিনয়-কলা-কুশলতা দেখাইয়া দর্শকবৃন্দের আনন্দ ভাজন হইয়াছেন। এই নাটকখানি অভিনয় করিতে বহুদক্ষ অভিনেতার প্রয়োজন। অন্যান্য নাটক অভিনয় করা অপেক্ষা সামাজিক নাটক অভিনয় করার মধ্যে বিশেষ শক্তি ও কৃতিত্বের প্রয়োজন। সামাজিক নাটক প্রত্যেক দর্শকের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি সুতরাং ইহা অভিনয় করিতে হইলে সামান্য খুঁটিনাটিপূর্ণ ঘটনাগুলিও নাটকে অভিনয় সাফল্যের সম্পূর্ণ সাহায্য করিয়া থাকে। কোন একটি অংশ অসমঞ্জস বা অস্বাভাবিক হইলে তখনই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমস্ত জিনিসটাকেই দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এই সব নাটক অভিনয় দর্শনে তথাকথিত সংসার অনভিজ্ঞ সহরের আনন্দ দুলাল সমালোচকগণের দাঁত ফুটাইবার অধিকার খুবই কম। Observation হইতে অভিজ্ঞতার জন্ম এবং সে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে সমাজ ও বয়সের যে প্রয়োজন ইহা হয়ত কেহ অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন না। এই সকল সামাজিক নাটকের সমালোচনা করার মধ্যে অন্তরের অনুভূতি থাকা আবশ্যক। অন্তঃপুরবাসিনী কুলললনাগণ এই নাটক দেখিয়া নিজ নিজ গৃহে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যে সমালোচনা করেন, তাহাতে হয়ত আপনারা আর্টের দিক দিয়া অনেক ক্রটী অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারেন, সত্য, কিন্তু খাঁটি সত্যের উপলব্ধি তাহাদের অপক্ষপাত সরল উচ্ছ্বাসের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে,তাহার দ্বারাই সমাজে প্রকৃত উপকার সাধিত হয়। "প্রফুল্ল" নাটকের শত সহস্র সমালোচনা প্রসিদ্ধ বিশিষ্ট রসজ্ঞের হাতে হইয়া গিয়াছে। এই নাটক সম্বন্ধে নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন না থাকিলেও বর্ত্তমান যুগ-মহিমা ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু সমাজকে উপন্যাস ও নাটকের মধ্য দিয়া অধোগতির পথটি যে প্রশস্ত করিয়া দিতেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। উপযুক্ত সময়েই আর্ট থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তাঁহারা প্রথমেই পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য "কর্ণার্জ্জুন" ও তারপরই সামাজিক নাটক "প্রফুল্ল" অভিনয় করিয়া যথার্থ দেশের উপকার করিয়াছেন। প্রফুল্ল নাটকখানিকে তাহারা অভিনয় ও দৃশ্যপটে ও সাজ সজ্জার দিক দিয়া সত্যসত্যই অভিনব করিয়া তুলিয়াছেন। নিন্দা করিবার মন

ও সঙ্কল্প লইয়া বসিলেও নিন্দা করিবার সুযোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হতাশ হইয়া অনিচ্ছাসত্বে মুখ দিয়া সুখ্যাতি বাহির হইয়া পড়ে। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় একটী সুরে বাজিয়া ছিল। কোন রূপ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহা বড় কম শক্তি ও সাধনার কথা নয়। ষ্টার থিয়েটারে প্রফুল্লের অভিনয় অপূর্ব্ব হইয়াছে। দানীবাবুকে যোগেশের অংশে আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু সেদিন নূতন ও পুরাতনের সম্মিলন ক্ষেত্রে তাঁহাকে অনেকগুলি স্থলে নূতন অভিব্যঞ্জনা দিতে দেখিয়াছি।

ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গিয়াছে এই সংবাদ পীতাম্বরের নিকট হইতে যোগেশ যে কি বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ একদিনে এক মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইলে রক্ত মাংসের মানুষ কি নিদারুণ মর্ম্মবেদনা ও নৈরাশ্যের সহিত তাহার আঘাত সহ্য করে এবং তাহার হৃদয়ের অভিব্যক্তি মুখে কি নির্ম্মম হইয়া ফুটিয়া ওঠে তাহা যোগেশের অভিনয় দেখিয়া ও তাহার তৎকালীন কণ্ঠস্বর শুনিয়া দর্শকগণের নয়ন ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইয়াছিল। শুঁড়ির দোকান হইতে যোগেশ যখন মাতাল অবস্থায় ছুটিয়া মাতালদের সঙ্গে মিলিল,সেখানে মদের নেশার প্রকৃত রূপটি এত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়বিদারক হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে যেন যোগেশের বিশেষত্ব একেবারে লোপ পায় নাই এমন নিষ্ঠুর সত্যটি উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল। "উকিল কি চিজ," "বড় বৌ তুমি কি বলচো" "সাজান বাগান শুকিয়ে গেল," "ওহে একটি পয়সা দাও," "মনে করেচো আমি মাতাল হয়েছি, "বড় বৌ রাস্তায় মরচে তা আমি কি করবো" এই সমস্ত মর্ম্মস্পর্শী, হৃদয়বিদারক কথাগুলি উচ্চারণে অনেকস্থলে মনে হয় তাঁহার স্বর্গীয় পিতার যশ মহিমান্বিত করিয়া, দানী বাবু নূতন যুগে আত্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।

সকলের অগ্রে পুরাতনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে জগার অভিনয়। যেন বাস্তব জগতে আছি, মোটেই অভিনয় দেখিতেছি বলিয়া মনে হয় না—অদ্ভুত! অপূর্ব্ব! এই অংশ অভিনয় করিতে তাহার সমকক্ষ অভিনেতৃ বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে আছে বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না।

নূতন যুগের দুইটি অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী রমেশের অংশে, ইন্দুবাবু সুরেশের অংশে যে সুন্দর স্বাভাবিক অভিনয় করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন—যেখানে সত্যিকার আর্ট সেখানে নূতন পুরাতন নাই। আর্টের জন্যই আর্ট, সে পুরাতনকে অবহেলা বা উপেক্ষা করেনা বা নূতনকে অকারণ সমাদর দেখায় না। সত্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ। সত্য ও প্রকৃত অভিনয়ে আর্টের বিকাশ। জ্ঞানদার ও পীতাম্বরের অভিনয় আশাতীত সুন্দর হইয়াছিল। কাঙ্গালীচরণের কণ্ঠস্বর বড়ই অস্বাভাবিক। এইরূপ কণ্ঠস্বরে অভিনয়ের কোনরূপ বিশেষত্ব মোটেই পরিলক্ষিত হয় না। কেহ একবার এইরূপ করিয়াছে বলিয়া এই বিকৃত কণ্ঠস্বর যে চিরদিন অনুকৃত হইবে এমন কোন কথা নাই—এটি আর্ট থিয়েটারের আর্টের দিক দিয়া বড়ই অশোভন হইয়াছে। পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে মদন ঘোষ ও প্রফুল্ল অপূর্ব্ব চিত্র। এই দৃশ্যটি দেখিয়া সত্য সত্যই বলিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! মদন ঘোষের নিকট পুত্রহারা জননীর হৃদয়ের দারুণ বেদনা কাতর করুণ ভিক্ষা—প্রফুল্লের সমস্ত অন্তরটি যেন যাদবের অদর্শনে অধীর হইয়া মদন ঘোষের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছিল—সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য ও চমৎকার অভিনয়। প্রফুল্লের অংশ নীহারবালা যেরূপ অভিনয় করিয়াছেন তাহা আমরা স্বপ্নেও আশা করিতে পারি নাই। গৃহস্থ ঘরের লজ্জা ভয় বিজড়িত কুলবধূ ধীরে ধীরে কেমন করিয়া সত্য ও ধর্ম্মের জন্য স্নেহের সামগ্রী যাদবের কণ্ঠ জড়াইয়া তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে—জগতের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উঠিলেন—দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ইহা অনুভব করিবার জিনিষ,—শোনাইবার নয়। প্রফুল্লকে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতীব নৈপুণ্যের সহিত গৃহস্থঘরের সরলা কুলবধূর মর্য্যাদা রাখিয়া অভিনয় করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ছোট দেবর সুরেশের প্রতি তাহার কি পবিত্র স্নেহ ও যত্ন, তাহা প্রফুল্লের প্রত্যেক কথার ভাবে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকদিন এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নূতন যুগ

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৭)

বিন্দুবাসিনী আহারান্তে পাশের বাড়ীতে গিয়াছেন। সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়, এখনও তিনি ফিরেন নাই। পাশের বাড়ীতে একঘর কৈবর্ত্ত ভাড়াটিয়া ছিল, তাহাদের একটী ছেলের বড় অসুখ, সংবাদটা বিন্দুবাসিনীর কাণে আসিলে তিনি আর থাকিতে পারেন নাই।

দীপিকাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু বিন্দুবাসিনী তাহাকে সঙ্গে নেন নাই। কয়দিন জ্বর ভোগের পর আজ মাত্র সে ভাল আছে, এ সময় রোগীর কাছে তাহার না যাওয়াই উচিৎ, এই কথা বলিয়া তাহাকে থামাইয়া গৃহে রাখিয়া গিয়াছেন।

দুইদিনের স্থলে আসিয়া নগেন্দ্রনাথের ইচ্ছা এখানে দুইমাস অন্ততঃপক্ষে থাকিয়া যান, বর্ষাটা দেশে থাকিতে তিনি চান না। সেখানে নিত্য অসুখ, ঔষধে তাঁহাকে জেরবার হইয়া পড়িতে হয়, আর ছেলেপুলেগুলোর চেহারা দেখিতে চোখের জল সামলানো যায় না। কুইনাইন অপর্য্যাপ্ত গিলে' এমন অবস্থা শেষটায় হয় যে বেচারা ছেলেপুলের দল তাহার তিক্ততাই আর অনুভব করিতে পারে না।

বিন্দুবাসিনী একটাও কথা বলেন নাই, চুপ করিয়া শুধু তাঁহার দারুণ দুঃখের কথা শুনিয়া যাইতেছিলেন। দীপিকা একটু হাসিয়াছিল কিন্তু তাহাও অতি গোপনে।

সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত তখন, দীপিকা বারাণ্ডার এক পাশে একটা আসনের উপর বসিয়া একখানা বই দেখিতেছিল। আকাশ তখনও উজ্জ্বল, শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদখানা সীমাবদ্ধ আকাশের মাঝখানে শুভ্র রেখাকারে ফুটিয়া রহিয়াছে।

অনেকক্ষণ দুর্ব্বল শরীরে এক ভাবে বইয়ের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া দীপিকার চোখ টল টল করিতেছিল; ঘাড় ব্যথা করিতেছিল, তাই সে বই হইতে চোখ তুলিয়া শান্তভাবে আকাশ পানে চাহিল।

অনেকদিন পূর্ব্বের কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, এই বইখানিতে তাহারই পূর্ব্বস্মৃতির ছায়া পড়িয়াছিল, সে অত নিবিষ্ট চিত্তে সেই জন্যই বইখানি পড়িতেছিল। ইহার মধ্যে কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া শেষটা একবার দেখিয়া লইয়াছিল গল্পের নায়িকা শেষে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছিল, গ্রন্থকার ইহার পরে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতে পারেন না মেয়েটী মৃত্যুর পরে শান্তি পাইয়াছিল কিনা।

এই মন্তব্যটা পড়িয়া দীপিকার বড় হাসি পাইয়াছিল। তিনি বলিতে পারেন না, অথচ বেচারা মেয়েটীর মৃত্যুটী স্বচ্ছন্দে ঘটাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। মরিলেই কি জয়ী হইতে পারা যায়! সে যে একেবারেই পরাজিত হওয়া। মানুষ আত্মহত্যা করে দুর্ব্বলতার জন্য, সবলতা যদি তাহার থাকে সে যুদ্ধ করিবে, পরাজয় স্বীকার কখনই করিবে না।

নিজের ভবিষ্যতের পানে সে চাহিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার জীবনও তো এইরূপই, নিকষকালো অন্ধকারে ভরা, আলো পাইবে না বলিয়া সে আত্মহত্যা করিবে? ছিঃ, পদে পদে সে পরাজিতা হইয়া অবশেষে সেই হারের মধ্য দিয়াই নিজেকে শেষ করিয়া দিবে? কখনও না, এরূপ হইবে না। নিজের ভবিষ্যৎ সে নিজেই গঠন করিয়া লইবে, কাহারও উপর নিজের ভবিষ্যতের ভার অর্পণ করিবে না।

সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল, কে বাহির হইতে কড়া নাড়িল। বিন্দুবাসিনী ফিরিয়াছেন মনে করিয়া দীপিকা উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিল।

কিন্তু—এ কে! দীপিকা নিজের চোখকে হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে তো কখনই ভাবিতে পারে নাই শিরীষ তাহার দরজায় আসিয়া কোনদিন এ ভাবে দাঁড়াইবে। হঠাৎ তাহাকে সম্মুখে দেখিয়াই দীপিকা বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া গেল, নির্ব্বাকে সে শুধু চাহিয়া রহিল, বড় রাস্তার উপরেই ফুটপাথের ধারে সে যে খোলা দরজার উপর এমন ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা তাহার মনেই ছিল না।

ঝোঁকের বশে শিরীষ এতখানি আসিয়া পড়িয়াছিল, দীপিকার মুখখানা সামনে পড়িবা মাত্র তাহার সদ্‌বুদ্ধি সত্যচেতনা ফিরিয়া আসিল, সেও কি বলিবে ভাবিয়া পাইতে ছিল না।

দীপিকার চেতনা ফিরিয়া আসিল, মাথায় কাপড়খানা টানিয়া দিয়া দরজার পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আসুন, এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন যে?"

শিরীষ তাহার সহিত ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। দীপিকা তাহাকে সেই আসন খানায় বসাইয়া নিজে খানিক দূরে দাঁড়াইল, শিরীষ চারিদিকে চাহিতেছিল, কথা একটাও তাহার মুখে ফুটিতেছিল না।

কি কথা বলিবে সে? আজ কোন্ বুদ্ধিপরিচালিত হইয়া সে একেবারে দীপিকার কাছে আসিয়া পড়িল। দীপিকার পানে চোখ তুলিয়া চাহিতেও সে পারিতেছিল না, মনে হইতেছিল তাহার মনের গুপ্ত কথাটা এখনি তাহার চোখে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। একি দুর্ব্বলতা! এরূপ দুর্ব্বল যে সে তাহাতো মিনিট কত আগেও সে বুঝিতে পারে নাই।

দীপিকা নিজেই কথা কহিল, বেশ সহজ স্বর তাহার— "আপনি আজ কি মনে করে এসেছেন এখানে?"

শিরীষ বিবর্ণমুখে বলিল—"না, কিছু মনে করে নয়, আপনার অসুখ হয়েছে—তাই শুনে—"

বাধা দিয়া শুষ্কস্বরে দীপিকা বলিল "আমায় 'আপনি' বলবেন না, 'তুমি' বলে কথা বলবেন।"

কথাটা চাবুকের মতই যেন সপাৎ করিয়া পড়িল। পাঁচ বৎসর আগে দীপিকার সে বড় কাছে ছিল, এ 'আপনি'-সেতু তখন ছিল না। পাঁচ বৎসর আগে তাহারা ছিল বড় আপনার, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে তাহারা একেবারেই পর, এ সম্মানীয় পদটা দীপিকা আজ চায় না, বিদ্রূপ বলিয়াই তাহার বুকে বাজে।

শিরীষ নত মস্তকে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র, সেই নিঃশ্বাসের শব্দে দীপিকা তাহার পানে চাহিল।

সে বুদ্ধিমতী, বেশ বুঝিতে পারিয়াছে শিরীষ বিনা উদ্দেশ্যে এখানে আসে নাই। না চিনিতে পারিয়া সে শিরীষেরই বাড়ীতে কর্ম্ম প্রার্থিনী হইয়া গিয়াছিল, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই দুই একমাস কাজ করিয়া সে বিদায় চাহিয়াছিল, কিন্তু বিদায় পায় নাই, কে বলিবে শিরীষের ইহাতে কোনও উদ্দেশ্য নাই? সে প্রাণপণে শিরীষকে এড়াইয়া চলে, শিরীষ তাহা জানে এবং জানিয়াও কেন আজ তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে? তাহার মনের মধ্যে যদি কোন কুভাব না থাকিত সে নিজেই সন্ধ্যার সম্মুখে তাহার সহিত কথা বলিতে সাহস করিত। দীপিকা স্পষ্ট চক্ষে দেখিতে পাইল শিরীষের হৃদয় পাপে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, একটী সরলা বালিকাকে সে প্রবঞ্চনা করিতেছে।

হায় মোহান্ধ পুরুষ, ব্যর্থ তোমার সব! তুমি সেই বালিকাটীকে ভুলাইতে পার, দীপিকাকে ভুলাইতে পার না। দীপিকা সাংসারিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তোমারই নিকট হইতে, দিন দিন তাহার সে অভিজ্ঞতা আরও বাড়িতেছে। তাহার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে পুরুষ শুধু প্রবঞ্চনা করিতেই জানে, নারীর প্রাণভরা ভালবাসা লইয়া ইহারা খেলা করে। পুরুষের হাতে নারীর ভার রক্ষিত বলিয়া গর্ব্বে অন্ধ সে—মনে ভাবে যাহাই করুক না কেন, সবই তাহার মানাইয়া যাইবে। এ পর্য্যন্ত তাহারা অত্যাচারই করিয়া আসিতেছে, নারীকে দুই পায়ে দলন করিয়াই আসিতেছে, কখনও নারীর নিকট হইতে সেরূপ ব্যবহার পায় নাই তাই। কিন্তু আর না; কথায় আছে অত্যাচারে রাজ্য থাকে না কখন, তাই নারীর বুকের মধ্যে আঘাতের ফলে একটা চির-লুক্কায়িত শক্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিয়াছে, এই শক্তি অন্যায়ের উপর ঘৃণা ধরাইয়া দিবে, আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বহু দূরে সরিয়া যাইবে, খেয়ালী পুরুষ তাহার নাগাল পাইবে না।

শিরীষ মুখ তুলিল, দীপিকার পানে চাহিতেই সে মুখ ফিরাইয়া লইল, সে মুখে তখন দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

"বেশ, এবার হতে 'আপনি' বলব না তোমায়, যেমন চিরকাল ঘনিষ্ঠভাবে—"

অসহিষ্ণুভাবে দীপিকা বলিল—"না না, দয়া করে মাপ করবেন আমায়, আপনার সঙ্গে সে রকম ঘনিষ্ঠভাবে আমার মেশা উচিৎ নয়। আগের কথা ভুলে যান, মনে করুন আমরা অপরিচিত, এই আট নয় মাস যেমন অপরিচিতের ভাবে কাটিয়েছেন, তেমনি ভাবে—বাধ্য হয়ে আর যে কয়টা মাস আপনার বাড়ীতে কাজ করব, কাটাবেন। আমার দস্তুর জানেন না, আমি বেশী ঘনিষ্ঠতা মোটেই ভালবাসি নে।"

অত্যন্ত আহত হইয়া শিরীষ একটু খানি নীরব রহিল, তাহার পর বিষণ্নভাবে বলিল—"তুমি একথা বলতে পার দীপিকা, একথা বলবার অধিকার তোমার আছে। এর চেয়ে আরও অনেক কথা বলতে পার তুমি, যেগুলো ঠিক সত্য, আর সেগুলো আমিই তোমার সামনে এঁকেছি।"

"মাপ করবেন, আমি সব ভুলে গেছি, আমার সে গত জন্মের কথা তুলে মিথ্যে আমার মনকে খারাপ করতে চাই নে।"

উৎসাহিতভাবে শিরীষ বলিল—"তা হলে নিশ্চয়ই সে সব কথা ভাবো তুমি, নইলে মন খারাপ হবে কেন? কিন্তু যাক—আমি সে সব কথা তুলব না দীপিকা, গত কাহিনী তুলে মনকে ব্যথা দিতে আমিও চাই নে। তোমার জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম"—

দীপিকা অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল—"হয়েছিল, কিন্তু এখন বেশ ভালই আছি।"

উদ্বিগ্নের মত শিরীষ বলিল—"ভাল আছ বলছো, কিন্তু ভালর চিহ্ন তো তোমার মধ্যে একটুও ফোটে নি দীপিকা! পথ্য করেছ?"

শান্তস্বরে দীপিকা বলিল—"আজ মাত্র ভাল আছি।"

সন্ধ্যার মলিন অন্ধকার তখন ঝরিয়া পড়িতেছিল, আকাশে রেখাকার চাঁদখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। বারাণ্ডার ভিতর আবছাগোছের তরল আঁধার জমিতে জমিতে ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল, শিরীষ তাহার মধ্যে দীপিকার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিল না।

উভয়েই নীরব, পূর্ব্বস্মৃতি উভয়ের মনের মধ্যে আনা গোনা করিতেছিল, তাহাতে উভয়েই বিভোর।

"হ্যাঁরে দীপা, রাস্তায় দরজার পাশে তাদের মোটরখানা দাঁড়িয়ে আছে কেন, কেউ এসেছেন নাকি?"

বিন্দুবাসিনী উঠানে আসিতেই দীপিকা নামিয়া গেল, "হ্যাঁ মাসীমা, শিরীষ বাবু এসেছেন।"

শিরীষ বাবুর কোন ঘটনাই বিন্দুবাসিনীর কাছে গোপনীয় ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে এই ছেলেটীকে দেখিয়া, ইহার সহিত দীপিকার বিবাহ দিতে তিনিই বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠেন, শিরীষের কোন কথাই দীপিকা তাঁহাকে লুকায় নাই। মাতৃসমা মাসীমার কাছে মনের কথাগুলা ভাবঘোরে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া সে যথার্থই বাঁচিয়া গিয়াছিল।

এই সন্ধ্যার সময় শিরীষের এভাবে আসার কারণ বিন্দুবাসিনী খুঁজিয়া পাইলেন না, তাঁহার মুখখানা শুধু অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র শিরীষ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে যে স্নেহাদর পাইয়াছিল তাহা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে উসখুস করিতে লাগিল, এখন কোনও ক্রমে উঠিয়া পড়িতে পারিলেই সে বাঁচিয়া যায়।

অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল আছ তো বাবা? অনেক কাল দেখিনি। দীপা মা, একটা আলো নিয়ে এসো তো।"

দীপিকা একটা লণ্ঠন জালিয়া বিন্দুবাসিনীর পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ চোখে উজ্জ্বল আলোকের দীপ্তি লাগিয়া শিরীষের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, সে হাত দিয়া মুখের সে পাশটা আবৃত করিল, বিন্দুবাসিনী আলোটা সরাইয়া একটা বালতীর পার্শ্বে রাখিলেন।

কুণ্ঠিতভাবে জড়াইয়া জড়াইয়া শিরীষ কি উত্তর দিল তাহা বুঝা গেল না। বিন্দুবাসিনী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন "বেশ করেছ বাবা, এসেছ, ভারি খুসি হয়েছি। দীপা যে তোমাদেরই বাড়ীতে কাজ নিয়েছে এতকাল সেকথা আমি জানতে পারি নি, কাল যে লোকটীকে খবর নিতে পাঠিয়ে-

ছিলে তারই কাছে শুনলুম। ছোটবেলা হতে ওকে বোনের মত দেখে আসছ, এখনও দেখবে, যাতে সৎপথে থেকে নিজের জীবিকার্জ্জন করতে পারে তারই চেষ্টা করবে এই আশাই করছি। অদৃষ্টটা ওর একেবারেই খারাপ, নইলে কি এমন হয়?”

কৌতূহলী শিরীষ একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিল দীপিকা সেখানে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল—“রাধিকানাথবাবু তো বেশ লোক মাসীমা—তবে—”

মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন “হ্যাঁ, খুব সৎলোক, তার পরিচয় এই মেয়েটা যত পেয়েছে এত আর কেউ পায় নি। অদৃষ্ট খারাপ বলেই বাংলার মেয়ে হয়ে জন্মেছে, আর বাংলার মেয়ে বলেই জেনেশুনে সেই অপদার্থটার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। যতটা অত্যাচার সয় এই দেশের মেয়ে, এতটা আর কোনও দেশের মেয়ে সইতে পারে না। এদের মুখ নেই, তাই সব সয়ে যায়। তোমরা অপমান কর, প্রতারণা কর, লাথি মার, ঘর হতে বার করে দাও, এ দেশের মেয়ে সব সইবে। এই যে মেয়েটা, এর জীবনের একটা আশা মিটল না, একটু তৃপ্তি এ জীবনে পেলে না, এর মূল কি তোমরাই নও বাবা? একটা মানুষের জীবনকে পলে পলে পুড়াচ্ছো, তার ভবিষ্যতও যেমন বর্ত্তমানও তেমনি, অতীত যাতনায় ভরা। নির্দ্দয় পুরুষ তোমরা বাবা, তোমরা নিজেদের ক্ষমতামদে অন্ধ, মেয়েরা যে কতখানি সহ্য করে যায়, কতখানি ত্যাগের মধ্যে দিয়ে যায় সেটা যদি দেখতে, তা হলে—”

শিরীষ উত্তর দিতে পারিল না, মাথা নত করিয়াই বসিয়া রহিল। বিন্দুবাসিনী চোখ মুছিয়া আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন, গৃহমধ্য হইতে দীপিকা ডাকিল—“মাসীমা—”

সে আহ্বান শুনিয়াই মাসীমা কিছু জড়সড় হইয়া পড়িলেন। যে বেদনার সৃষ্টিকারী, তাহারই কাছে বেদনার কথা—দীপিকার গায়ে আগুণ জ্বালাইয়া দিয়াছিল। ইহাতেই তো অপদার্থ পুরুষগুলা আরও স্পর্দ্ধা পায়, তাহারা ভাবে তাহারাই হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। এই সব মহাপুরুষেরাই বেদনার সৃষ্টিকর্ত্তা, ইঁহারাই হাসেন, বিদ্রূপ করেন!

“আজ উঠি মাসীমা, আর একদিন এসে—”

ত্রস্ত হইয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন “সেকি কথা বাবা, একটু জল খেয়ে যাও।”

“আজ মাপ করবেন মাসীমা, আর একদিন দেখা যাবে।”

খুব তাড়াতাড়িই সে বাহির হইয়া পড়িল। আজ সে কেন এখানে আসিয়াছিল ভাবিয়া নিজের উপরেই তাহার রাগ হইতেছিল। আর কখনই সে এ বাড়ীর এই দরজা পার হইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া মোটরে উঠিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

মিনিট-মোহন গল্প

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ]

আংশিক জ্ঞান

তিনজন অন্ধ স্পর্শ দ্বারা হস্তীর উপলব্ধি করিতেছিল। তাহারা কেহই পূর্ব্বে হস্তীর আকারের বিষয় জানিত না। তাহাদের মধ্যে একজন হস্তীর পদ স্পর্শ করিয়া বলিল, “ওঃ, বুঝেছি; হস্তী স্তম্ভাকার।” আর একজন শুণ্ড স্পর্শ করিয়াছিল। সে বলিল, “না, না, স্তম্ভাকার নয়; হস্তী সর্পাকার।” তৃতীয় ব্যক্তি দৈবক্রমে হস্তীর কর্ণ স্পর্শ করিয়াছিল। সে বলিল, “তোমরা দুজনেই ভুল বলছ; হস্তী সূর্পাকার (কুলোর মত)।” সুতরাং তিনজনে বিবাদ বাধিয়া গেল। বিবাদে মাতিয়া যখন তাহারা মারামারির উপক্রম করিল, তখন একজন চক্ষুষ্মান্ লোক তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, “তোমরা সকলেই সত্যকথা বলছ। কিন্তু কেউ সমগ্র সত্যটা জান না। তোমাদের অনুভূতি হয়েছে হস্তীর এক একটা অঙ্গের, সমগ্র শরীরের অনুভূতি হয় নি।”

লিপি

শিল্পী—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সিংহ

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৪ঠা আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [পঞ্চচত্বারিংশ সপ্তাহ

প্রাচীন মিশরের দেবদেবী

[শ্রীকালিপ্রসাদ ঘোষ বি-এস্-সি]

টুটান খামেনের কবর আবিষ্কৃত হবার পর থেকে সারা পৃথিবীর নজর এসে পড়েছে এই প্রাচীন মিশরীদের উপর। কৌতূহলটা মানুষের স্বভাবতই একটু বেশী। তাই এই যে জাতটা প্রায় ৫।৬ হাজার বছর আগে পরিপূর্ণ গৌরবে, কল্পনার অতীত জাঁক-জমকে বাস করে গেছে, তাদের সম্বন্ধে কোন কথা, কিরূপ তাদের হাবভাব, আচার-পদ্ধতি, কেমন তাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা প্রণালী,—সামাজিক জীবনে ধর্ম্মজীবনে আমাদের সঙ্গে—এই ছ'হাজার বছরের পরের যুগের মানুষের সঙ্গে তাদের কি তফাৎ—এ সব খবরের এতটুকু টুকরো পেলেও দুনিয়ার লোকে আকুল আগ্রহে তা শুনছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আরব্য-উপন্যাসের যে দৈত্য আর অতুল ঐশ্বর্য্যের কাহিনী আমরা হাঁ করে অবাক্ হয়ে শুনি, তার তো সবটুকুই কল্পনা;—কিন্তু প্রাচীন যুগের এই যে একটা জাতি আরব্যোপন্যাসের কাহিনীরই মত ঐশ্বর্য্য ও জাঁক-জমক নিয়ে বাস করে গেছে এর মাঝে মিথ্যা কল্পনা তো এতটুকুও নেই;—প্রমাণ যে তার আমাদের চোখের সামনেই এসে হাজির হয়েছে!

এই প্রাচীন মিশরীদের কবরের সম্বন্ধে নানারকম খবর অনেকেই আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকাদের সামনে ধরেছেন; কিন্তু এদের দেবদেবীদের সম্বন্ধে কোনও খবর আজও পর্য্যন্ত কেউ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই। আমরা ভারতবাসীরা নাকি ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। দেবদেবী নিয়েই আমাদের ঘর-কন্না। তাই এই প্রাচীন মিশরীদের দেবদেবী সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের কৌতূহলটা একটু

বেশী হবে বলেই আমি মনে করি। আজ এই সম্বন্ধেই কিছু বলতে চাই,—যদি পারি তো পরে মিশরীদের সম্বন্ধে অন্য কথাও কিছু বলবার ইচ্ছা আছে।

প্রাচীন মিশরীদের দেবদেবী সংখ্যায় অনেকগুলি,—আর রকম বেরকমের। এদের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া দায়। এর কারণ এই যে প্রাচীন মিশরীরা কোনও একটা বিশিষ্ট জাতি নয়। যুগের পর যুগ ধরে অনেক নূতন নূতন জাতি এসে মিশর জয় করেছে, সেই দেশে বাস করেছে;—আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেছে;—কিন্তু একেবারে নিখুঁত-ভাবে মিলিয়ে যায় নি। এই সব ভিন্ন ভিন্ন জাতির দেবতা, প্রথমে কেউ নিজের দেবতা ছাড়া আর কাউকে পূজো করবে না——কিন্তু কালে এই সব দেবতাদের আবার কতক কতক মিশে গিয়ে নতুন নতুন জাতীয় দেবতাদের সৃষ্টি।

আমাদের দেশের দেবদেবীদের সঙ্গে প্রাচীন মিশরের দেবদেবীরা কেউ অমর নয়;—মানুষের মতই তাঁরা দুঃখ কষ্ট জরা মৃত্যুর অধীন। মিশরের দেবদেবীদের ক্ষমতা কিম্বা জ্ঞানও অসীম নয়;—অবশ্য মানুষের চেয়ে ক্ষমতা তাঁদের নিশ্চয়ই বেশী। দূত এসে সংবাদ দিয়ে না গেলে কোনও দেবতারই জানবার উপায় নেই—পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে।

মিশরীদের এক একটা দলের এক একটা দেবতা। দলের মধ্যে কেবলমাত্র সেই দেবতারই পূজা চলত। তিনিই সেই দলের রক্ষাকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, আবার শাস্তিদাতা। মোটামুটি ব্যবস্থা এরকম হলেও দলের দেবতা ছাড়া অন্য দেবতার পূজা করায় বাধা কিছু ছিল না। অন্য দেবতার পূজা করলে যে দলের দেবতা চটে যাবেন এমনও নয়। এই কারণেই শেষে মিশরের অসংখ্য দলের মধ্যেও কতকগুলি জাতীয় দেবতার পূজা সম্ভব হয়েছিল।

যীশু খৃষ্ট জন্মাবার দশ হাজার বৎসর আগেকার মিশরে দেবদেবীর নামে কতকগুলি জানোয়ার আর পাখীরই পূজো হত। বেবুন, সিংহী, বেড়াল, ষাঁড়, গরু, ভেড়া, শিয়াল, বাজপাখী, কুমীর, সাপ এইগুলি ছিল তখনকার যুগের পবিত্র জীব।

কুমীরমুখো দেবতা সেবেক

এর পরের যুগে, যখন মানুষের আকারের দেবতা নিয়ে নতুন নতুন জাতি মিশরে হাজির হল; তখন জানোয়ার পূজো মোটামুটি উঠে গেলেও একেবারে গেল না। লোকে

মানুষের শরীরের উপর জানোয়ারের মুণ্ড বসিয়ে নতুন নতুন দেবতার মূর্ত্তি গড়ে তারই পূজো করতে লাগল—কতকটা আমাদের দেশের নৃসিংহ বা বরাহমূর্ত্তি পূজার মতন আইসিস, বাজমুখো দেবতা হোরাস্ এই যুগের প্রধান দেবদেবী। কুমীরমুখো দেবতা সেবেক একজন জলদেবতা। শিয়ালমুখো দেবতা, আনুবিষ হচ্ছেন যমপুরীর পাহারাদার

শেয়ালমুখো দেবতা আনুবিষ।

এই সব জানোয়ার মুখো দেবতার আধিক্য প্রাচীন মিশরের একটা বিশেষত্ব। কুমীরমুখো দেবতা সেবেক, শিয়ালমুখো দেবতা আনুবিষ, সিংহীমুখী দেবী সেখমেত, গোমুখী দেবী মরবার পর লোকদের আত্মাটীকে যমপুরে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেটিকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেন এবং পাপ-পুণ্যের গুরুত্ব অনুসারে আত্মাদের থাকবার জায়গা ঠিক করে দেন।

গোমুখী দেবী আইসিস আর বাজমুখো দেবতা হোরাস্-এর পরের যুগে মিশরের দুটী শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

সিংহমুখী দেবী সেখমেত।

খৃঃ পূর্ব্ব ৮০১০ বছরের পর থেকে জানোয়ার মুখো দেবতাদের বদলে পুরোপুরি মনুষ্যাকৃতি দেবতাদেরই প্রাধান্য হয়। এই মনুষ্যাকৃতি দেবতাদের মধ্যে ওসিরিস্, আইসিস্ ও হোরাস্ এই তিনজন দেবতাই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। ধরতে গেলে এঁরা তিনজনই যুগের পর যুগ ধরে মিশরের সকল অংশের পূজা সমানভাবে পেয়েছেন। ওসিরিস হচ্ছেন পিতা ;—আইসিস্ মাতা আর হোরাস্ পুত্র। ওসিরিস্ খুব ভাল দেবতা ছিলেন, তিনি কৃষির দেবতা ; সেট্ নামক এক সয়তান দেবতা ওসিরিস্কে হত্যা করেন। মৃত্যুর পর ওসিরিস্ যমপুরীর ভার পান ;—এবং সেখানেই ধর্ম্মরাজ যমের কাজ করতে থাকেন। ওসিরিস্ দেবতার যতগুলি

গোমুখী দেবী আইসিস্

মূর্ত্তি আছে, তার সবগুলিতেই দেখাযায় যে তাঁর দুটী হাত বুকের উপর রাখা, তাঁর একহাতে একটা বেঁকান হুক্ আর একহাতে একটা চাবুক। তাঁর মাথায় একটা গম্বুজের মত টুপি। আইসিস্ দেবী ওসিরিসের স্ত্রী। ইনি জগজ্জননী ও সর্ব্বমঙ্গলা। কখনও কখনও ইনি চন্দ্রমা বলেও পূজো পেয়েছেন। সেইজন্য আইসিস্ দেবীর মুকুটে একটী পূর্ণচন্দ্র আঁকা থাকে। আইসিস্ দেবীর যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া যায় তার অধিকাংশ গুলিতেই দেখা যায় তিনি তার পুত্র হোরাস্‌কে স্তন দিচ্ছেন। যে যুগে জানোয়ারমুখো দেবতার পূজো হত সে যুগে আইসিস্ দেবীকে গোমুখী কল্পনা করা হত তা আগেই বলেছি। এর কারণ বোধ হয় এই যে, গাভী নিজের দুধ দিয়ে মানুষকে পালন করে। ওসিরিস্ ও আইসিসের পুত্র হোরাস্। ইনি মিশরের শিশুদেবতা। যখন সয়তান-দেবতা সেট ওসিরিস্‌কে হত্যা করে; তখন হোরাস্ মাতৃগর্ভে। বড় হয়ে হোরাস্ সেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' তাকে বধ করেন ;—এবং পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন।
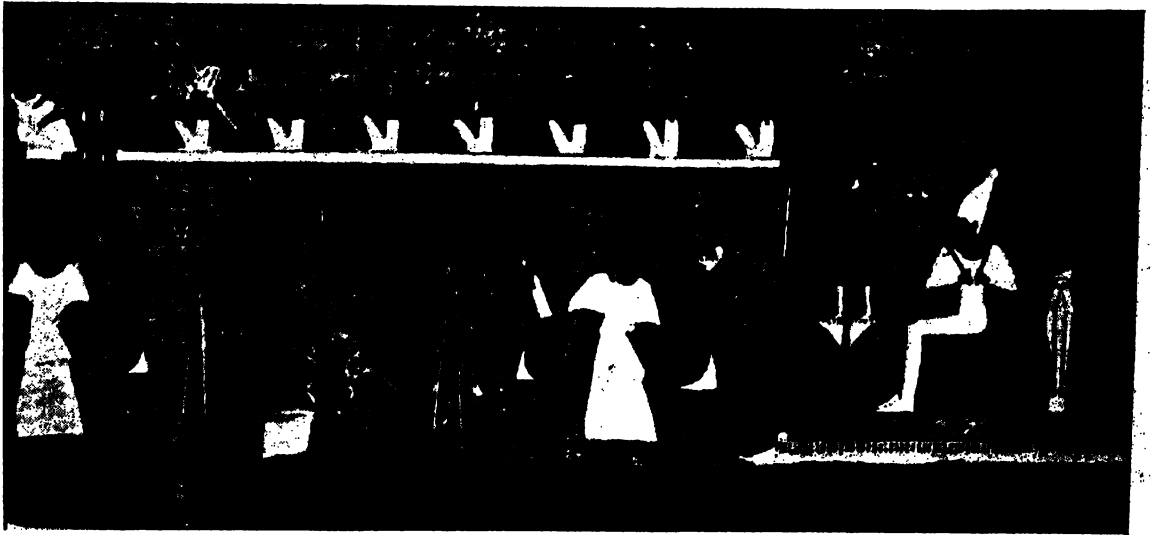
……নিয়ে গিয়ে সেটিকে দাঁড়ীপাল্লায় ওজন করেন।

সেইজন্ত হোরাস্‌কে লোকে প্রতিহিংসার দেবতা বলে। বাজপাখী পাখীদের রাজা এবং খুব বল শালী বলে' জানোয়ার

ওসায়রস হচ্ছেন পিতা।

মুখো দেবতাদের যুগে, হোরাস্‌কে বাজমুখো দেবতা বলে পূজো পেয়েছেন। হোরাস্ মিশর দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা। হোরাসের জীবনের সঙ্গে আমাদের দেশের শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অনেক সামঞ্জস্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণ যেমন পিতৃমাতৃ নির্য্যাতনকারী কংসকে বধ করেছিলেন, হোরাস্‌ও তেমনি তাঁর পিতৃঘাতক ও মাতৃনির্য্যাতনকারী সয়তানদেবতা সেটকে বধ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বকাসুর বৃত্রাসুর

আইসিস মাতা।

প্রভৃতি বধ করে' এবং কালিয় সাপকে দমন করে রাজ্যশুদ্ধ লোককে নির্ভয় করেছিলেন, হোরাস্ ও তেমনি অনেক ভীষণ ভীষণ জানোয়ার বধ করে রাজ্যশুদ্ধ লোককে নির্ভয় করেছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রথম যুগে, অনেক মিশরী

খৃষ্টকে হোরাসেরই অবতার বলে পূজা করত। সয়তানদেবতা সেটের পত্নী হচ্ছেন নেভাট্;—কিন্তু তিনি কখনও ওসিরিস্ বা তাহার স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে শত্রুতা করেন নি;—আইসিসের সঙ্গে তাঁর বেশ ভাবই ছিল।

হোরাসপুত্র

(ক্রমশঃ)

বিদ্রোহী

(গল্প)

[শ্রীমণীন্দ্র নাথ রায় বি-এ]

শ্রাবণ মাস। রাত প্রায় বারোটা। বাহিরে অশ্রান্ত বৃষ্টির ঝম ঝম এবং প্রবল বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যাইতেছিল। বীরেন ডাক্তার ঘরের আলোটা নিভাইয়া একখানা চাদর গায়ের উপর টানিয়া লইয়া এইমাত্র শুইয়া পড়িয়াছে, অমনি সদরের কড়া খট্ খট্ করিয়া উঠিল। এত-রাত্রে আবার রোগী আসিয়াছে এই ভাবনাটা তাহার মনটাকে বিরক্তিতে ভরিয়া তুলিল। সমস্তদিন জল ঝড় মাথায় করিয়া, রোগীর পচা ঘা ঘাঁটিয়া এবং নাড়ি টিপিয়া তাহার সমস্ত মন ও শরীর ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল এবং মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিল এতরাত্রে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আজ আর কিছুতেই বাহির হইবে না।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল—চাকর শিবু আসিয়া জানাইল রোগী আসিয়াছে—দেখা করিতে চায়। বীরেন বলিল "গিয়ে বল্—ডাক্তারবাবুর শরীর আজ ভাল নেই—দেখা হ'বে না—কাল আসতে বল্লেন।" শিবু চলিয়া গেল—বীরেন নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়া আবার শুইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেই শিবু আসিয়া বলিল লোকটা বড়ই কাঁদাকাটি করিতেছে—দেখা না করিয়া কিছুতেই যাইতে চাহে না। বীরেন বিরক্ত হইয়া কহিল "জালাতন—আচ্ছা তাকে উপরেই নিয়ে আয়, আমি বলে দিচ্ছি।" শিবু চলিয়া যাইতেই ডাক্তারবাবু ঘরের আলোটা জ্বালিয়া ফেলিল এবং লোকটার আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

শিবুর সঙ্গে একটী ভদ্রলোক ঘরে ঢুকিয়া বীরেনকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। বীরেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি চাই আপনার ?" লোকটী বিনীতভাবে উত্তর করিল "আজ্ঞে আমার একটী আত্মীয়ার খুব শক্ত অসুখ—কলেরা হয়েছে। অনেক ডাক্তারের বাড়ী ঘুরে এসেছি—এতরাত্রে কেউ যেতে রাজি হচ্ছেন না।—আপনি দয়া করে যদি একবার—" লোকটী থামিয়া পড়িয়া বীরেনের মুখের দিকে ব্যাকুল-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বীরেন বলিল "আজ ত আমি এখন যেতে পার্ব্ব না, শরীরটা ভাল নেই—তারপর আবার যে জল ঝড় হচ্ছে—আপনি ঠিকানা রেখে যান—কাল ভোরেই আমি যাব—এখন একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি গিয়ে খাওয়ান।" লোকটী যেন বিশেষ কাতর হইয়া পড়িল—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বীরেনের পা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল "ডাক্তারবাবু দয়া করুন—একটা লোকের জীবন রক্ষা করুন।" বীরেন ব্যস্ত হইয়া পা টানিয়া লইয়া বলিল—"ব্যস্ত হচ্ছেন কেন—আপনি একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বসুন—না হয় যাওয়াই যাবে—" বলিয়া বীরেন ভদ্রলোকটীর হাত ধরিয়া পাশের চেয়ারে বসাইল। তাহার পর কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে জিজ্ঞাসা করিল "কতদূর যেতে হ'বে ?" লোকটী উত্তর করিল—"আজ্ঞে কাছেই - ১০ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট।" বীরেনের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে বলিল "সেটা ত বেশ্যাপাড়া !" লোকটী মাটীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল "আজ্ঞে—হ্যাঁ।" বীরেন কঠিন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার আত্মীয়া তা হ'লে বেশ্যা ?" লোকটী মুখ না তুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া শুধু বুঝাইয়া দিল ডাক্তারবাবুর অনুমান সত্য। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বীরেন সহজকণ্ঠে বলিল—"আপনি মিথ্যা কষ্ট কল্লেন—আমি ত ওদের বাড়ী যাই না।" লোকটীর সমস্ত শরীর যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল—মুখ তুলিয়া চাহিল—সে মুখে লজ্জা এবং আশাভঙ্গের বেদনা এমন সুতীব্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে বীরেন সে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না। লোকটী অস্ফুটস্বরে কি বলিতেই ডাক্তারবাবু অস্বাভাবিক গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "না—চিকিৎসা কর্ত্তেও না—শুধু সময় নষ্ট করবেন না।" লোকটী আর কিছুই না বলিয়া ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ইলেক্‌ট্রিকের উজ্জ্বল

আলোতে বীরেন লক্ষ্য করিল লোকটীর চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে।

বীরেন আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল কিন্তু কেন যেন মোটেই স্বস্থবোধ করিতে পারিল না। কিসের যেন একটা অন্যায়ের বেদনা তাহার সমস্ত বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে বারবার প্রশ্ন উঠিতে লাগিল এই ভদ্রলোকটীর চোখের জলের আকুল আহ্বান কেন সে অগ্রাহ্য করিল? এটা কি নৈতিক দুর্ব্বলতা? তাহার বলিষ্ঠ পুরুষচিত্ত মনের মধ্যে এই খোঁচার আঘাত পাইবা-মাত্রই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সাধারণ লোকের মত সেত নীতির মিথ্যা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে বন্ধ করিয়া রাখে নাই। পাপের উপর তাহার একটা ঘৃণা আছে বটে কিন্তু পাপীকে ছোট করিয়া দেখিবার মত এত ক্ষুদ্র মন ত তাহার নয়। মানুষের দুর্ব্বলতা পাপ নয় একথা সে জানে, শাস্ত্রের হিতকথা, সমাজের শাসন চিরকালই ত সে তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে। মানুষকে ব্যাপক ভাবে দেখিবার প্রশস্ততা ত তাহার আছে। .. তবে পতিতার নামে তাহার মন এমন তিক্ত হইয়া উঠিল কেন? আসন্ন মৃত্যুর সাম্‌নে দাঁড়াইয়াও কেন তাহাদের একজন তাহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইল? ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িল এক মুহূর্ত্তের কত বড় নির্ম্মম একটা আঘাত তাহার সমস্ত সুবুদ্ধি এবং উদারতাকে তুচ্ছ করিয়া তাহার নারীর উপরের শ্রদ্ধার ধারণাকে কত সম্পূর্ণভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। সেদিন হইতে নারী মাত্রই তাহার মনে একটা অসীম বিরক্তির ছায়া ছাড়া আর কিছুই জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই। সে বুঝিতে পারিল পতিতার নামে তাহার মনে যে বিরক্তির উদয় হইয়াছিল তাহারও কারণ তাহার হৃদয়ের এই বদ্ধমূল ধারণা, এবং তারই প্রেরণায় আজ একটা জীবনকে এমন তুচ্ছভাবে সে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে তাহার ঘুম ছুটিয়া গেল—রক্ত মাথায় উঠিয়া ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। বীরেন বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আলোটা জ্বালিয়া ফেলিল। বন্ধ জানালাটা খুলিয়া দিতেই সিক্ত-রাত্রির এক ঝাপটা শীতল বাতাস প্রিয়-স্পর্শের মত তাহার সমস্ত উত্তেজনাকে একমুহূর্ত্তে দূর করিয়া দিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল সমস্ত আকাশ জুড়িয়া ছাই-রংএর একখানা বিরাট মেঘ যেন শ্রান্তদেহ এলাইয়া দিয়া পড়িয়া আছে। বাতাস এবং বৃষ্টির আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ শ্রাবণ রাত্রি এই নিস্তব্ধ সীমাহীন অন্ধকার তাহার চিন্তা পীড়িত মনটাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করিল, সে অন্ধকারের দিকে অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল—তাহার মধ্যে সে যেন তাহার গত জীবনের বিষাদের ছবি দেখিতে পাইল। সমুদ্র তরঙ্গের মত চিন্তার ধারা তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। থাকিয়া থাকিয়া সেই লোকটীর অশ্রু-সজল কাতর মুখখানা তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে খোঁচা দিতেছিল। জানালাটা বন্ধ করিয়া সে চেয়ারে বসিয়া কি যেন ভাবিল—এবং একসময় হঠাৎ শিবুকে জলদি গাড়ী জুতিবার হুকুম দিল।

বীরেন ডাক্তারের গাড়ী যখন ১০নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল তখনও সেই পল্লীর অনেক বাড়ী হইতে তন্দ্রা-জড়িত রমণী কণ্ঠের বিকট সঙ্গীতের কর্কশ ধ্বনী উঠিয়া একটা জঘন্য কদর্য্যতার সৃষ্টি করিতেছিল। সে বাড়ীতেও উৎসব বন্ধ ছিল না। গাড়োয়ান হাঁক দিতেই উপরের জানালা খুলিয়া একটী রমণী জিজ্ঞাসা করিল "কে?" গাড়োয়ান উত্তর করিল "ডাক্তার বাবু আয়া।" রমণী জানালা হইতে সরিয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে বসিয়া বীরেন ভাবিতে লাগিল মানুষের মন কতখানি বিকৃত হইলে সে এক মানুষেরই মৃত্যু শিয়রে বসিয়া এমন বীভৎস আমোদে মত্ত হইতে পারে।

সেই ভদ্রলোকটী ডাক্তারের নাম শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া নীচে আসিয়া বীরেনকে দেখিয়াই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল না এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন কি ঘটিল যাহাতে একটু পূর্ব্বে যাহাকে সে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়াও এখানে আসিতে সম্মত করাইতে পারে নাই সে নিজে সাধিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল কেন! বহুকষ্টে বিস্ময় দমন করিয়া সে কহিল "আপনি আসবেন—একথা কিছুতেই ভাবতে পারি নি—যখন এসেছেন দয়া করে চলুন—রোগীর অবস্থা ভাল নয়।" ডাক্তার বাবু কোনও কথা কহিল না—শুধু লোকটীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া

তাহার সঙ্গে ধীরে ধীরে রোগীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরটী বেশ বড় এবং হাল ফ্যাসানে সজ্জিত। চেয়ার, টেবিল, কোচ, দামী আসবাব পত্র গৃহস্বামিনীর সচ্ছল অবস্থার পরিচয় দিতেছিল। রোগী ঘরের এককোণে একখানা খাটের উপর শুইয়া যন্ত্রনায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছিল। তাহারই পাশে একখানা চেয়ারে বসিয়া একটী রমণী তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। ডাক্তার কাছে আসিতেই সেই রমণী তাঁহাকে দেখিয়া চমকাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার মুখের উপর আনন্দ, ভয় এবং বেদনার আভা মূহুর্ত্তের মধ্যে এত দ্রুত খেলিয়া গেল যে তাহাকে যে খুব ভাল করিয়া না চেনে সে কিছুই বুঝিতে পারিবে না। বেদনার ছায়াটা তাহার মুখের উপর সুতীব্র হইয়া ফুটিয়া মুখখানাকে বিকৃত করিয়া ফেলিল। সে তাড়াতাড়ি পাশের একটা আলমারীর পশ্চাতে নিজেকে লুকাইয়া ফেলিল। বীরেন তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। সে যদি বেশ্যাদের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হইত তবে এই রমণীর ভদ্রঘরের মেয়েদের মত অপরিচিত পুরুষের কাছে নিজেকে গোপন করিবার চেষ্টাটা তাহার কাছে একটু অদ্ভুত লাগিত। বীরেন রোগী-পরীক্ষা শেষ করিয়া যখন প্রেসক্রিপসন লিখিতেছিল তখন সেই মেয়েটী হাতের ইসারায় ভদ্রলোকটিকে ডাকিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিতেই সে পাশের দরজা দিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বীরেন চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইতেই আলমারীর পাশ হইতে সে বাহির হইয়া আসিল এবং কাছে আসিয়া মুখের কাপড়টা একটু সরাইয়া ধরা গলায় কহিল "আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন কি?" ডাক্তারবাবু চমকাইয়া উঠিয়া তাহার দিকে চাহিল—এবং বিকারগ্রস্থ রোগী যেমন অর্থশূন্য দৃষ্টিতে একদিকে তাকাইয়া থাকে তেমনি সে সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ অস্বাভাবিক জোরে সে বলিয়া উঠিল—"তুমি রমা! তুমি এখানে?" বেদনায় তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিল—সে ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। অসহ্য ব্যথায় সে নিজের বুকটা অসম্ভব জোরে চাপিয়া ধরিল। তাহার মনে হইতে লাগিল কে যেন একখানা মরচে-ধরা ছুরি দিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডটা কুঁচি কুঁচি করিয়া কাটিয়া ফেলিতেছে। নিবিড় বেদনার ছাপ তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল, রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখের উপর শিরাগুলো ফুলিয়া উঠিয়া টন্ টন্ করিতে লাগিল। মাথার মধ্যে এমন একটা এলো-মেলো ভাবের সৃষ্টি হইল যে তাহার ভয় হইতে লাগিল শীঘ্রই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। হঠাৎ কি যেন পড়িয়া যাইবার মত একটা শব্দ হইতেই সে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিল তাহার সঙ্গিনী জ্ঞান হারাইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছে! এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সে নিজের ব্যথা ভুলিয়া গেল। রমাকে তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করিয়া বীরেন বুঝিতে পারিল যে সে হিষ্টিরিয়া ফিটে আক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুদ্রিত নয়ন এবং স্পন্দন-হীন ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে চাহিয়া বীরেনের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। টেবিলের উপরের জলপাত্র হইতে জল লইয়া বীরেন রমার মাথায়, চোখে এবং কপালে বারবার জল সিঞ্চন করিতে লাগিল; অল্পক্ষণ পরেই তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। চোখ মেলিয়া চাহিয়াই বীরেনের চিন্তাক্লিষ্ট মুখ-খানা দেখিতে পাইয়া রমা একদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল—যেন তাহার অন্তরের এক ক্ষুধিত ব্যাকুল বাসনা তাহার চোখের দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিয়া বীরেনের কাছে মিনতি ভিক্ষা করিতেছে। একটা প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাহার সমস্ত বুকটা কাঁপিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু হইতে অশ্রান্ত অশ্রু অসাড়ে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বীরেনের বোধশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে শুধু মাটীর দিকে মুখ নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। একটু পরে রমা উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেই বীরেন যেন নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া বলিল "এখন উঠ না, আর একটুখানি শুয়ে থাক।" অশ্রু-সজল ক্ষীণকণ্ঠে রমা বলিল "আমার এ অসুখ অনেকদিনের—কিছু ক্ষতি হবে না।" কিন্তু সে উঠিয়া বসিল না—শান্ত শিশুটীর মত শুইয়া রহিল। বীরেনের কাছে সহানুভূতির এই স্পর্শ পাইয়া তাহার মন একটা নিবিড় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। বীরেন কি যেন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, রমা বাধা দিয়া কহিল "আজ আমাকে ক্ষমা কর—কিছু

জিজ্ঞেস কোরো না—তোমায় অনেক কথা আমার বলবার আছে—এখন আমার সে শক্তি নেই। আমি জানি তোমাকে আমার সঙ্গে দেখা কত্তে বলবার অধিকার আমার নেই—তবু যদি দয়া করে একবার দেখা দাও—" বলিয়া রমা ব্যাকুল ভাবে বীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বীরেন বলিল "তুমি যদি বল আমি নিশ্চয়ই আসব।" রমা বলিল "আমিত তোমাকে খুবই জানি—তুমি আসবেই—কাল বিকেলে একবার এস, আজ এখন কিছুই বলতে পাল্লুম না—তবু এইটুকু বলে রাখি, যতখানি মন্দ তুমি আমায় সে দিন থেকে ভেবে রেখেছো—ঠিক ততখানি মন্দ হয়ত আমি সত্যি নই—।" বলিতে বলিতে রমা বীরেনের হাতখানা একবার জোরে চাপিয়া ধরিয়াই ছাড়িয়া দিয়া অনুতপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আমাকে ক্ষমা করো—তোমাকে অপমান কল্লাম—মনটা বড়ই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। আজ তুমি এখন ফিরে যাও।" তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। রমার সঙ্গে এমন অপ্রত্যাশিত এবং অস্বাভাবিকভাবে দেখা হওয়ায় বীরেনের মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহার গুরুত্ব সে তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। সে কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল—রমা বলিল "কাল আসবে ত?" সে শুধু মস্তক নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীতে আসিয়া বসিল। নির্জ্জন রাস্তা পাইয়া গাড়ী দ্রুতগতিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বীরেনের জীবনের যে অধ্যায়টা রমাকে বেষ্টন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার আরম্ভ হইয়াছিল সাধারণ ভাবেই। একই পাড়ায় পাশাপাশি বাড়ীতে অনেকদিন একসঙ্গে বাস করিবার জন্য বীরেন ও রমাদের পরিবারের মধ্যে যে সম্পর্কটার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রতিবেশীর মৌখিক সম্বন্ধ ছাড়াইয়া বন্ধুত্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বীরেনের পিতা এবং হরকান্তবাবু একই কোর্টে practice করিতেন—তাঁহাদের দুইজনের মধ্যেও বেশ একটা সহজ সখ্যভাব জন্মিয়াছিল। ছেলেবেলায় বীরেনের মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। বীরেন হরকান্তবাবুর স্ত্রীকে মা বলিয়া ডাকিত এবং যখন তখন তাহাদের বাড়ী যাওয়া আসা করিত। হরকান্তবাবুর স্ত্রীও বীরেনকে ছেলের মত ভালবাসিতেন এবং মায়ের মত যত্নে তাহার সমস্ত আব্দার রক্ষা করিয়া চলিতেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় "মা" বলিয়া হরকান্তবাবুর স্ত্রীর ঘরে যাইয়াই বীরেন থামিয়া গেল। সে দেখিল একটী অপরিচিতা কিশোরী তাহার মার সঙ্গে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে। এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে একটী ১৫ বছরের মেয়ের সামনে পড়িয়া অনভ্যস্ততার জন্য সে খুবই বিব্রত হইয়া পড়িল। বীরেনের মা তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং বীরেনকে এই বিরক্তিজনক অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য বলিলেন "এস বীরেন, এত দিন আস নি কেন?" তাহার পর সেই মেয়েটীরদিকে চাহিয়া বলিলেন "একে তুমি এর আগে দেখনি—আমিও আজই প্রথম দেখলাম। এর নাম রমা—আমার দিদির মেয়ে।" একটী ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "দিদি মারা গেছেন—তাই রমা আমার কাছে থাকবে বলে এসেছে, ওকে কিছু লজ্জা করবার নাই।" পরিচয় পাইয়া বীরেন রমার দিকে চাহিতেই সে একটু হাসিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল "মাসীমা এতক্ষণ আপনার কথাই আমাকে বলছিলেন—"। রমার কথার ভঙ্গি এবং মুখের হাসিতে এমন একটা সহজ পরিচিত ভাব ছিল যে বীরেনের সঙ্কোচ এক মুহূর্ত্তে অনেক কমিয়া গেল। সে একটু হাসিয়া বলিল "নিজের পরিচয় নিজের মুখে দেবার লজ্জা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে মা আমার ভালই করেছেন।" রমা বলিল কিন্তু সেটা আপনার সামনে হলেই ভাল হত—কারণ তাতে আপনার অনেক প্রশংসা ছিল।" বীরেন বলিল—"অবশ্য আত্মপ্রশংসা শুনতে সবারই ভাল লাগে যদি তার ভেতর একটু মাত্রও সত্যি থাকে। মার প্রশংসার কোন মূল্যই নেই—নিজের ছেলেকে কেই বা না ভাল বলে?" রমা বলিল "কেন বলতে পারি না আমার কিন্তু মনে হচ্ছে—সবার প্রশংসা পাবারই আপনি উপযুক্ত—কি বলেন মাসীমা?" বলিয়া রমা তাহার মাসীমাকে মধ্যস্থ মানিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমার কথার কোন মূল্যই ত ও দেবে না—আমি আর কি বলব বল।" তাঁহার কথা শেষ না হইতেই কে যেন তাঁহাকে ডাকিল, তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বীরেন রমার

সঙ্গে অনেক ক্ষণ ধরিয়া গল্প করিয়া একটু বেশী রাত্রি করিয়াই সে দিন বাড়ী ফিরিল।

রমার বাহ্যিক চেহারার সঙ্গে তাহার অন্তরের প্রবৃত্তি এবং চরিত্রের একটা বিশেষ সামঞ্জস্য ছিল। সাধারণ মেয়েদের অপেক্ষা সে একটু লম্বা—ছিপছিপে ধরণের। মাথায় খুব ঘন কালো একরাশ কোঁকড়ান চুল কিন্তু বেশী বড় নয়। গায়ের রংটা সাদা ধপধপে—যেন শরীরে রক্তের লেশ মাত্র নাই। মুখে সংসার-অভিজ্ঞতার ছাপ পড়িয়া ছিল কিন্তু বাল্যের সরলতা তখনও একবারে দূর হইয়া যায় নাই। তাহার গলার এবং হাতের উপরের স্ফীত স্নায়ু এবং তাহার মুখের একটু ক্লান্ত হাসির রেখা দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইত যে সে খুবই চঞ্চল প্রকৃতি—এবং প্রবৃত্তির ঝোঁকে অনেক সময়েই ভাল মন্দ বিচার না করিয়া কাজ করিয়া বসে। কিন্তু তাহার মুখের ভঙ্গিতে এবং ঠোঁটের কোণের দুষ্ট হাসিতে যে ভাবটা প্রকাশ পাইত সেটা তাহার নিজের এবং তাহার প্রিয়জনের সবার পক্ষেই ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইত। রমার চক্ষু দুইটী সত্যই ছিল অদ্ভুত। পটে-আঁকা ছবির মত টানা টানা চোখ দুইটী -তাহার মধ্যে নিবিড়কালো তারা দুটী যেন একটা অজানা ভাবের রাজ্য হইতে বাহিরের এই জগতের দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই চাহিয়া থাকিত। সে দৃষ্টির মধ্যে বুদ্ধি এবং চিন্তা যেন মূর্ত্তি পাইয়া প্রকাশ হইত। যে স্কুলে সে পড়িত সেখানে তাহার বুদ্ধি এবং ক্ষমতার জন্য সে সকলের প্রশংসা পাইয়াছিল। কিন্তু অনেকেই তাহার অস্থির স্বভাব এবং অকারণ খেয়ালের জন্য নিন্দা করিত। একটি স্কুল টিচার তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন—Her passion will be her ruin—অস্থির চিত্ততাই তাহার ধ্বংসের কারণ হইবে। রমা কাহারও সঙ্গে মিশিত না বলিয়া স্কুলের সকল ছাত্রীরা রমাকে অহঙ্কারী বলিয়া মনে করিত। বাড়ীতে রমা যে স্বাধীনতা পাইয়াছিল তাহা তাহার চরিত্রকে স্বাভাবিক ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল হইয়াছিল। রমার অভিভাবকেরা কোনও দিনই তাহার উপর উপদেশ এবং বিধি নিষেধের ভার চাপাইয়া তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া দেন নাই।

প্রথম দিনের পরিচয় এবং আলাপের পর হইতেই বীরেন রমার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিল। এই বুদ্ধিমতি—চঞ্চল-প্রকৃতি মেয়েটার মধ্যে এমন একটা বিশেষ কিছু ছিল যাহা তাহার যৌবনের আকাঙ্খাকে তীব্র ভাবে আঘাত করিয়া জাগাইয়া তুলিল। আগুনের লেলিহান উন্মাদ শিখা যেমন করিয়া জ্বলন্ত বাড়ী খানাকে সম্পূর্ণ ভাবে তাহার নিজের করিয়া লয়, রমাও বীরেনকে শীঘ্রই সেইরূপ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কিন্তু রমা তাহার চারিদিকে রহস্যের একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়িয়া তুলিল। বীরেন মনের নিভৃত কোণেও কল্পনায় কোনও দিন ভাবিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারে নাই যে রমার কাছে সে তাহার প্রেমের প্রতিদান পাইবে। পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ট হইয়া উঠিবার পর গভীর ব্যথার সহিত বীরেন লক্ষ্য করিল—রমা যেন দিন দিন তাহার কাছ হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। এমন কি রমা ক্রমে ক্রমে এমন ভাব দেখাইতে আরম্ভ করিল যেন বীরেন তাহার একদম শত্রু। রমার গর্ব্বিত মন বীরেনের কাছে নীরবে শুধু অধীনতা খুঁজিয়া বেড়াইত এবং বীরেন অজ্ঞাত ভাবে অনেক সময়ই তাহার সহজ ব্যবহারে তাহাকে আঘাত করিত। রমা কোনও দিনই সে আঘাতের বেদনা বিন্দুমাত্রও প্রকাশ করিবার হীনতা অর্জ্জন করে নাই কিন্তু সে আঘাতের বেদনা তাহার হৃদয়টাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। রমণী হৃদয়ের অতি বিচিত্র এবং বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ বীরেনের ভাগ্যে কোনও দিনই ঘটিয়া উঠে নাই। রমার এই অবহেলা এবং আঘাতের অন্তরালে প্রেম আত্মগোপন করিয়া আছে কি না তাহা বীরেন কোনও দিনই ভাবিয়া দেখে নাই। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় একটা দুর্নিবার শক্তি তাহাকে রমাদের বাড়ী পৌছাইয়া দিত। বীরেন ঘরের মধ্যে অনেক সময় বসিয়া থাকিত, মাঝে মাঝে তাহার মা আসিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করিয়া যাইতেন। রমা অনেক সময়েই বীরেনের দৃষ্টি অবস্থান করিত—সে যেন শুধু বীরেনকে আঘাত করিবার জন্য। রমা তাহার মুখের ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে এমন একটা বিরক্তি এবং অসুস্থতার ভাব দেখাইত যাহাতে বীরেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিত যে

তাহার আগমনটা রমার কাছে একেবারেই প্রীতিকর নহে। সময় সময় রমা অকারণ উচ্চহাসি এবং অদ্ভুত কথাবার্ত্তায় প্রমাণ করিয়া দিত যে সে বীরেনকে গ্রাহ্যই করে না। মাঝে মাঝে এমন প্রাণহীন দৃষ্টিতে সে বীরেনের দিকে চাহিত যেন সে একটা জড় পদার্থ। বীরেন গোপনে এই নিষ্ঠুর রমণীটিকে বার বার দেখিয়া লইত এবং হৃদয়ের মধ্যে একটা অসহ্য তীব্র জ্বালা উঠিয়া তাহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিত। খাঁচার মধ্যে বদ্ধ পাখীর মতই সে এই নিষ্ঠুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিত। ঝড়ের আঘাতে ক্ষিপ্ত সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন নিমগ্নমান জাহাজ খানাকে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত করিয়া তাহার ইচ্ছার অধীন করিয়া লয়, বীরেনও সেইরূপ রমার আয়ত্বের মধ্যে ধরা পড়িয়া দিনে দিনে শুধু অতলের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। দুঃখ এবং অপমান এমন তীব্র ভাবে অবিরত তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল যে তাহার মস্তিস্ক বিকৃত হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। একদিন হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া সে কোথায় চলিয়া গেল এবং অল্প কয়েক দিন পরে ক্লান্ত মন এবং শ্রান্ত দেহ কোনওক্রমে বহন করিয়া ফিরিয়া আসিল। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে রমাও এই কয়েক দিনের মধ্যে বিশেষ কৃশ হইয়া উঠিল। কিন্তু পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক বেশী তাচ্ছিল্য এবং অবহেলার আঘাতে বীরেনকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর হঠাৎ একদিন যেন প্রেমের দেবতা রমার হৃদয়ে উৎসবে মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার মনের মধ্যে যে উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে যেন তাহার হৃদয়ের কঠিন ভালবাসা গলিয়া অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

এক ক্ষান্ত বর্ষণ বর্ষা সন্ধ্যায় বীরেন রমার ঘরে জানালার কাছে একখানা চেয়ারে বসিয়া কর্দ্দম-সিক্ত কলিকাতার রাস্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। রমা আনতমুখে মাথাটা দুইহাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবেই চুপ করিয়া বীরেনের কাছে বসিয়া ছিল। পাঁচ ছয় দিন হইতে রমা বীরেনের সঙ্গে একটী কথা বলে নাই—তাহার সম্মুখে একবার বাহিরও হয় নাই। অকারণে তাহার মুখের উপর নানারূপ বিভিন্ন ভাবরাশি ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে যেন তাহার প্রাণের সমস্ত বাসনা এবং মনের সমস্ত চিন্তা দ্বারা একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিতেছে। বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বর্ষাস্নাত ম্লান পৃথিবীর বিষাদের রূপ বীরেনের মনটাকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহার হৃদয়ের ব্যথাটা এমনভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিল যে এমনভাবে বসিয়া থাকা তাহার কাছে অসম্ভব হইয়া উঠিল। চেয়ার ছাড়িয়া দরজা পর্য্যন্ত যাইতেই রমার চাপা কম্পিত কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে বীণার সুমিষ্ট মুর্চ্ছনার মত ধ্বনিত হইল "যেয়ো না।" বীরেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—তাহার হৃদয়ের মধ্যে রক্ত আছাড় খাইয়া নাচিয়া উঠিল। এই ছোট একটীমাত্র কথা আশ্রয় করিয়া রমার মনের যে অতি গোপন ভাবটা আজ এই বর্ষা সন্ধ্যায় বীরেনের কাছে আত্মপ্রকাশ করিল বীরেন কোনওদিনই তাহার বিন্দুমাত্র আভাসও রমার কাছ হইতে কোনওদিন পায় নাই। বীরেন রমার দিকে ফিরিয়া দেখিতে পাইল সে তাহার দিকে ম্লানদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে আবার বলিল "যেয়ো না"—তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে আরও নামিয়া আসিল। হঠাৎ রমার এইরূপ আশাতীত ব্যবহারে বীরেন স্তম্ভীত হইয়া পড়িল। ভাল করিয়া কিছু না বুঝিয়া এবং চিন্তা না করিয়া সে রমার কাছে আসিয়া তাহার হাতখানা বাড়াইয়া দিল। মজ্জমান ব্যক্তি সমুদ্র-বক্ষে কোনও ভাসমান পদার্থ যতখানি আনন্দ এবং আগ্রহের সঙ্গে আশ্রয় করে, রমাও ততখানি আবেগের সঙ্গেই বীরেনের হাতখানি চাপিয়া ধরিল। বীরেনের স্পর্শে তাহার নিঃশ্বাস ঘন হইয়া উঠিল—লজ্জায় সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সমস্ত শরীরটা বার বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। হঠাৎ সে ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া বীরেনের কাছে বসিয়া পড়িল। মুখে কোনও কথা সে যেন বলিতে পারিতেছিল না—তাহার বুক ঠেলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস উঠিতে লাগিল।

রমার অবহেলা এবং প্রত্যাখ্যানে বীরেনের মন যতখানি তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার কাছে ভালবাসার আভাস মাত্র পাইয়াই তাহার মন ততখানি মাধুর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বীরেন রমার কাছে বিদায় লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল কিন্তু এই বিরাট উল্লাসের বেগ ক্ষুদ্র ঘরের দিকে তাহাকে যাইতে দিল না। টিপি টিপি বৃষ্টির মধ্যে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে আত্মহারার মত কলিকাতার রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—এবং মনে মনে রমার প্রতিদিনের অবহেলা এবং আঘাতের সঙ্গে অদ্যকার এই প্রেম-নিবেদনের একটা সামঞ্জস্য অন্ধভাবে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু তাহার সমস্ত ভাবনাকে ছাপাইয়া এই কথাটা শুধু বার বার মনে পড়িয়া আনন্দে সে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল যে রমা তাহাকে ভালবাসে।

তাহার পর প্রতিদিনই রমা তাহার সমস্ত গর্ব্ব এবং সমস্ত উগ্র প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া বীরেনের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। তাহার যেন আর একটা বিভিন্ন স্বত্বাই রহিল না। শান্ত শিশুটীর মত সে শুধু বীরেনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই সুখী হইতে লাগিল। একদিন বীরেন রমার কাছে আসিয়া দেখিল যে তাহারই একখানা ফটো লইয়া সেইদিকে চাহিয়া আছে। দেখিয়া বীরেনের মনে পুলকের সঞ্চার হইল। কিন্তু মাঝে মাঝে রমার প্রবৃত্তি অকারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া দুই জনের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইত এবং রমাই চোখের জলের সঙ্গে বীরেনের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সমস্ত ঝগড়া মিটাইয়া ফেলিত। একদিন এমনি একটা ক্ষণিক ঝড়ের পর রমা বীরেনের হাতের মধ্যে হাত রাখিয়া ম্লান ভাবে কহিল "তুমি আমাকে চিরকাল ক্ষমাই কর—আমি অনেক সময় এমন অনেক কাজ করি—যা সত্যিই আমার কত্তে ইচ্ছে করে না—আর সে কাজের যে তীব্র জ্বালা সেটা আমাকে যত বেশী দুঃখ দেয় তত আর কাউকেই দিতে পারে না।" বীরেন শুধু তাহার সজল চোখের উপর একটী স্নেহের চুম্বন আঁকিয়া দিয়া বুঝাইয়া দিল যে সে তাহাকে কোন দিনই সেজন্য অপরাধী করিবে না।

এইভাবে মান অভিমান, হাসি কান্নার মধ্য দিয়া তাহাদের জীবন-তরণী যখন একটা সুখ-বন্দরের দিকেই ভাসিয়া চলিয়াছিল, তখন হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া তাহাদের তরণীর পাল ছিঁড়িয়া দিল এবং তাহারা অকূল সমুদ্রে পথ হারাইয়া ফেলিল।

সেবার শীতের সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া রমার জর হইয়া পড়িল। বীরেন অনেক সময় তাহার কলেজে অনুপস্থিত হইয়াও তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া থাকিত। অসুস্থ অবস্থায় মানুষের মন প্রিয়-সঙ্গ লাভের জন্য বড়ই আকাঙ্খিত হইয়া উঠে। রমা বীরেনকে সব সময়ই তাহার কাছে পাইবার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই সময় বীরেনের কাছে হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার একটী বিশেষ বন্ধুর অসুখ—তাহাকে পুরী যাইতেই হইবে। রমাকে অসুস্থ রাখিয়া বীরেনের পুরী যাইতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা হইল না কিন্তু না গেলেও চলিবে না তাহাও সে বুঝিল। রমাকে পুরী যাইবার কথা বলিতেই সে শুধু গম্ভীর ভাবে বলিল, "না—এখন কোথাও তুমি যেতে পার্ব্বে না—আমি একা থাকতে পার্ব্ব না।" বীরেন অনেক যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে তাহার যাওয়াটা একান্তই দরকার, কিন্তু রমা কিছুতেই বীরেনকে ছাড়িয়া থাকিতে রাজি হইল না—সে অভিমান করিয়া কহিল "তোমার যদি আমার কাছে থাকতে ইচ্ছে না হয়, চলে যেতে পার—আমি বারণ কর্চ্ছি না - আর আমার বারণ তুমি শুনবেই বা কেন?" বীরেন মহা বিপদে পড়িল। সে ভাবিল শুধু অসুখ বলিয়াই রমা তাহাকে যাইতে দিতে রাজি হইতেছে না—এখন চলিয়া গেলে তাহার হয়ত কষ্ট হইবে কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে শান্ত করিতেও বেশী বেগ পাইতে হইবে না। রমাকে আর কিছু না বলিয়া সে পুরী চলিয়া গেল।

পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বীরেন দেখিল রমার অসুখ সারিয়া গিয়াছে কিন্তু সে বড়ই রোগা হইয়া পড়িয়াছে। সে আরও দেখিল এ কয়দিনে রমার মধ্যে একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বীরেন যখন হাসিমুখে রমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছ?" রমা তখন এমন ভাব দেখাইল যেন সে বীরেনকে চিনিতেই পারিতেছে না! রমার ব্যবহারে আবার অবহেলা ফুটিয়া উঠিল। সে একদিন স্পষ্টই বীরেনকে বলিয়া বসিল যে সে কোনও দিনই তাহাকে ভালবাসে নাই—কোনও দিন ভালবাসিবেও না—বীরেন যেন তাহাকে আর বিরক্ত না করে। তাহার কথার

ভঙ্গিতে এত বড় একটা অপমানের সুর ধ্বনিত হইল যে বীরেন তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সেও একটু রাগের সঙ্গে উত্তর করিল—"তবে কি তুমি এতদিন আমার সঙ্গে শুধু অভিনয় কর্চ্ছিলে? এর ত কোনও প্রয়োজন ছিল না।" রমাও উত্তর করিল "আমি তোমার সঙ্গে আলাপ কর্ত্তেও ঘৃণা বোধ করি। (সত্যিই তাহার মুখে তখন একটা ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল) বিড়াল যেমন শিকার নিয়ে খেলা করে আমিও ঠিক তেমনি তোমাকে নিয়ে এতদিন খেলা করেছি—আমার আর ভাল লাগছে না—তুমি যেখানে খুসি যেতে পার—আমার কাছে আর এসো না।"

বীরেন অপমানের তীব্র আঘাত নীরবে সহ্য করিয়া চলিয়া আসিল—আর রমার সঙ্গে দেখা করিল না।

* * * *

তিনমাস পরে রমার বিবাহ হইয়া গেল। বীরেন তাহার মার কাছে জানিতে পারিল রমা কেন যে বিবাহের চার-পাঁচদিন পূর্ব্ব হইতেই ভয়ানক কাঁদিয়াছে তাহা কেহই জানে না—এবং সেই জন্য তাহার চোখ এত ফুলিয়াছিল যে সে অন্ধ হইবার মত হইয়াছে। বীরেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য কেমন একটা জ্বালা অনুভব করিল, তাহার পর একটা অসীম ঘৃণা আসিয়া রমার স্মৃতিটাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল।

তাহার পর সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজ প্রথম বীরেনের সঙ্গে রমার দেখা। প্রথম যেদিন রমার অপমান সুতীব্রভাবে তাহার হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করিয়াছিল সে দিনের স্মৃতি আজ ম্লান হইয়া গিয়াছে। সেইদিন হইতে রমণীর প্রেম তাহার কাছে কোনও মূল্যই পায় নাই। রমা তাহার মনের মধ্যে যতখানি সুধার উৎস সৃজন করিয়াছিল তাহার এই অকারণ নিষ্ঠুরতায় ততখানি বিষই উদ্গীর্ণ হইয়াছিল এবং তাহার সমস্তটাই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল রমণীজাতির উপর। সে অনেকদিন ভাবিয়াছে কিন্তু কেন যে রমা তাহাকে অমন নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল সে রহস্যের মিমাংসা সে কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারে নাই। আজ এই বেশ্যার আবরণের অন্তরালে তাহার ভালবাসার রমাকে দেখিতে পাইয়া তাহার মনের কোণে একটা বিরাট সন্দেহ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিল। বীরেনের মনে হইতে লাগিল হয়ত রমার প্রতি তাহারই কোন অজ্ঞাত অপরাধের জন্য রমার আজ এই পরিণাম। সে স্মৃতির দ্বারে বার বার আঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল কিন্তু তাহার এই ধারণার কোনও কারণই খুঁজিয়া পাইল না—তবুও তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

পরদিন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া যখন বর্ষা-ক্লান্ত পৃথিবীর উপর নামিয়া আসিতেছিল বীরেন ডাক্তার তখন পূর্ব্বদিনের কথা-মত রমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যাত্রা করিল। তাহার মনের মধ্যে রমার সঙ্গলাভের জন্য বাসনার পীড়া সে অনুভব করিতেছিল না - শুধু একটা অদম্য কৌতূহল রমার জীবনের সমস্ত ইতিহাস জানিবার জন্য তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহার হৃদয়ের আঘাতটাকে শীতল করিয়া সেখানে যে মৃদু মধুর হাওয়া দোলা দিয়া উঠিতেছিল—একথা সে মনের মধ্যেও স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছিল—যদিও মুখের উপর তাহার প্রভাব সে লুকাইতে পারে নাই। রমাদের বাড়ীর দরজায় পৌঁছিতেই তাহার বুকটা দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। একটুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই দেখিল সামনেই রমা যেন কাহার প্রতীক্ষায় অসীম ব্যগ্রতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একমুহূর্ত্তে তাহার মনের পাষাণভারটা যেন হাল্কা হইয়া উঠিল। অপরাধীর মত রমা বলিল "তুমি এসেছো!" তাহার গলার স্বর ভারি মনে হইল। বীরেন তাচ্ছিল্যের ভাণ করিয়া কহিল—"তুমি কাল বল্লে—তোমার কি বলবার আছে,তাই শুনতে এলাম।" কিন্তু তাহার কথার ধরণে আগ্রহ অপ্রকাশ রহিল না। রমা বীরেনকে তাহার ঘরে লইয়া আসিয়া যেখানে বসিতে দিল ঠিক তাহার সামনের দেওয়ালে বীরেনের একখানা ফটো শুষ্ক এবং টাটকা ফুল চন্দনের মালায় সজ্জিত হইয়া ঘরের দেবতার স্থান পূর্ণ করিতেছিল। চকিতের মধ্যে ইহার এখানে আগমন এবং অবস্থানের কারণ তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেই সে রমার দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল সে দুইহাতের মধ্যে মুখটাকে লুকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার সমস্ত দেহটা স্নায়ুর উত্তেজনায় বারবার কাঁপিয়া

উঠিতেছিল। তাহার সমস্ত চেহারার মধ্য দিয়া এমন একটা দীনতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল যে সেই গর্ব্বিত রমার এই পরিণাম দেখিয়া বীরেনের চোখ সজল হইয়া উঠিল। বীরেন তাহার কাছে যাইয়া দাঁড়াইতেই সজলকণ্ঠে রমা বলিল "আজকের মত সৌভাগ্য আমার জীবনে আর আসবে না, তাই নিজের ব্যথায় কাতর হ'য়ে এ সুযোগকে আমি হারাতে চাই না। তুমি জানতে চাও কেন তোমাকে অতখানি দুঃখ দিয়ে চলে গেছলুম?" বীরেনের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সে বলিল "তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না—চিরদিনই তোমায় ভালবাসতুম—শুধু একটা প্রকাণ্ড ভুল এবং অসীম অভিমানের জন্যই তোমাকে ছেড়ে এসেছিলাম—তার শাস্তির ব্যবস্থা নিজের হাতেই আমি ক'রে নিয়েছি। যেদিন তুমি আমার কথা না শুনে, আমায় অসুস্থ রেখে পুরী চ'লে গেছলে সেইদিন থেকে তোমার ভালবাসার'পরে আমার সন্দেহ হ'য়েছিল। অভিমানে আমার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলুম—যদি তুমি আমার সে অভিমান ভেঙ্গে দিতে—" সে আর বলিতে পারিল না। কান্না আসিয়া তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া দিল। বীরেন শুধু চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রমা বলিতে লাগিল "যাক—সে জন্য আমি তোমায় অপরাধী করছি না—" তারপরে একটু থামিয়া শান্ত হইয়া বলিল "যেদিন থেকে তোমাকে ছেড়ে এসেছিলাম সেদিন থেকে আমার দুঃখের ইতিহাসটা তোমাকে জানাবার বড়ই ইচ্ছে হচ্ছে—কিন্তু তোমার হয়ত ধৈর্য্য থাকবে না—জীবনে অনেক দুঃখই তোমাকে দিয়েছি—তোমাকে আর বিরক্ত করব না। রাগে অন্ধ হ'য়ে বিয়ে করেছিলাম বটে কিন্তু তার তাপ যে এত অসহ্য হয়ে উঠবে তা আমি জানতুম না। মনের সঙ্গে দিন-রাত যুদ্ধ করে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। সবই সহ্য করে-ছিলুম, হয়ত শেষদিন পর্য্যন্ত থাকতুমও—কিন্তু যেদিন আমার স্বামী-দেবতা তাঁর পৌরুষ গর্ব্বে আমার নারীত্বকে অপমান কল্লেন সেদিন আমি আর সহ্য কত্তে পাল্লুম না। একবার ইচ্ছে হল—আত্মহত্যা করি—কিন্তু যে পাপ করেছিলুম—তার ভোগ না করে মরতে পারলুম না। ভবিষ্যতের ভাবনা না করেই স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম—তারপর কি হয়েছিল—তা তোমার জানবার দরকার নেই। আজ তুমি নিজের চক্ষেই দেখতে পাচ্ছ আমি বিশ্বের ঘৃণ্য—জগতের অভিসম্পাত! এই আমার উপযুক্ত শাস্তি। মেয়েদের কাছে এ শাস্তি যে কত ভয়ানক তা তুমি কল্পনাও কত্তে পার্ব্বে না। মনের মধ্যে একটা কামারশালা খুলে দিয়েছি—সেখানে দশ বিশটা হাতুড়ী দিনরাত পেটা হচ্ছে—কি তার বেদনা! আর ওপরে—মিথ্যা প্রণয়ের ভাণ করে, হাসি দিয়ে কটাক্ষে চোখ ঘুরিয়ে সব পুরুষের মন ভোলাচ্ছি! শুধু তাই নয়—পয়সা নিয়ে ষোল বছরের ছেলে থেকে ষাট বছরের বুড়োর কাছে দেহ বিক্রয় করছি।" হঠাৎ রমা থামিয়া গেল। একটা অব্যক্ত বেদনা এবং অসীম ঘৃণায় তাহার সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহার একটা সুগভীর ছাপ তাহার সুন্দর মুখখানাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। ঘরে আলো ছিল না, চাঁদের অস্পষ্ট আলোকে ঠিক বোঝা যাইতেছিল না সে মুখখানা মৃত না জীবিত। একটুক্ষণ পরে আবার সে বলিল—"অজ্ঞানে অপরাধ যা করেছি তার সবচেয়ে বড় শাস্তিটাই আমি নিজেই বেছে নিয়েছি—শুধু তুমি আমাকে ক্ষমা করো।" তাহার অন্তরের কান্নার সমুদ্রের স্রোতকে এতক্ষণ সে বহুকষ্টে বাধা দিয়া রাখিয়াছিল, আর পারিল না। বন্যার প্লাবনের মত তাহার দুইচোখ ছাপাইয়া অশ্রু-সমুদ্র বান ডাকিয়া আসিল। বীরেনের জ্ঞান যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। রমার এই অফুরন্ত কান্নায় তাহার যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। রমার দুঃখে তাহার হৃদয় সহানুভূতিতে কোমল হইয়া আসিয়াছিল এবং রমার প্রতি তাহার যে ভালবাসা নিদ্রিত হইয়াছিল তাহাও জাগিয়া উঠিল। গভীর শ্রদ্ধা এবং স্নেহের সঙ্গে রমার হাতখানা সে ধরিয়া ফেলিল। রমার সমস্ত শরীর সহসা প্রবলবেগে কাঁপিয়া উঠিল—সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না—মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বীরেন তাহার মাথাটা নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া কপালের উপরের চুলগুলি আস্তে আস্তে সরাইয়া দিতে লাগিল। বীরেনের প্রেমের স্পর্শ রমাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। আনন্দের তীব্র পীড়ন তাহার অনুভবশক্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। রমা এইভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বীরেনের

কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া রহিল—যেন তাহার আর মরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উঠিবার ইচ্ছা নাই। হঠাৎ রমা উঠিয়া বসিল—তাহার চোখ দুইটা লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। সে যেন প্রাণপণে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কহিল "তুমি আমায় ক্ষমা করেছো—এই আমার যথেষ্ট। আজকের এই স্মৃতিটুকু সম্বল করেই আমি শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটিয়ে দেবো। তুমি আর কোনও দিন এখানে এসো না—আজ এখন বাড়ী ফিরে যাও। আমার পাপের বোঝা আমাকে কঠিন ভাবেই বয়ে বেড়াতে দাও।" বীরেন অনেকক্ষণ কি যেন ভাবিল, তা'র পর অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে কহিল "আমি যাচ্ছি, কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।" রমা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"আমার যাবার স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও কি আছে?" বীরেন বলিল "হাঁ আছে—আমার সঙ্গে, আমার বাড়ীতে—তোমাকে যেতেই হবে। আমি তোমাকে কিছুতেই এ নরকে থাকতে দেবো না।" তাহার গলার স্বরে এমন একটা কঠিন জোর প্রকাশ পাইল যাহাতে রমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। রমা বলিল "আমাকে নিয়ে তুমি কি কর্ব্বে? আমিত তোমার সঙ্গে তোমার বাড়ী যাবার অধিকার নিজের হাতেই নষ্ট করে ফেলেছি।" বীরেন যেন রমার কথা শুনিতে পাইতেছিল না। তাহার মনের মধ্যে একটা গভীর চিন্তা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। হঠাৎ বীরেন বলিয়া উঠিল "না-তোমাকে যেতেই হ'বে, তোমার জীবনের ওপর আমার দাবী আছে—সেটা তুমি অস্বীকার কর্ত্তে পার?" রমা উত্তর করিল "অস্বীকার কল্লে সেটা শুধু আমার মুখের কথাই হবে, কিন্তু আমার অন্তর কখনও যেতে সম্মতি দেবে না।" বীরেন বলিল "তবে সে জীবনকে আমি কিছুতেই এমন ভাবে ব্যর্থ হ'তে দিতে পার্ব্ব না।" রমা দুঃখের ভিতরও একটু হাসিল। সে হাসিতে তাহার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত খানি দুঃখ এবং গ্লানি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল "আমি তোমার—চিরদিন তোমারই আছি—থাকবও; কিন্তু আমার অপবিত্র দেহ তোমাকে ত দান কর্ত্তে পার্ব্ব না—আমাকে উদ্ধার কত্তে নিয়ে গিয়ে তুমিই নষ্ট হ'য়ে যাবে!" বীরেন বলিল "মানুষের দেহ কখনো অপবিত্র হ'তে পারেনা—অপবিত্র হয় শুধু মনই; শুধু দেহের দিক দিয়ে দেখতে হ'লে স্বামী-স্ত্রী এবং পতিতা-পুরুষের সম্বন্ধ এক বলা যায় না কি? তফাৎ শুধু সংখ্যায় বইত নয়, যে জিনিষটা পাপ—সে পাপই, সেত একবার বা দশবারের অপেক্ষা রাখে না। বিবাহিত স্ত্রী এবং পতিতার মধ্যে সাধারণতঃ মনের তফাৎ থাকেই—যেখানে সে তফাৎ নেই সেখানে কোনও পাপই থাকতে পারে না। তুমি আমার সঙ্গে চল—চিরদিন—আমার কাছে আমার স্ত্রী হ'য়ে থাকবে। আমার অসুবিধার কথা বলছ? আমি তা ভাবি না। তোমার সঙ্গে মিলিত হ'তে হলে সমাজকে আমায় অগ্রাহ্য কর্ত্তেই হ'বে—এবং তার মূল্যও আমাকে দিতে হবে—কিন্তু তোমাকে পাবার জন্য আমি তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু দিতেও রাজি আছি রমা।" বীরেনের উত্তেজিত বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর রমার বুকে আঘাত করিয়া তাহাকে আত্মহারা করিয়া ফেলিল। তাহার বুকের মধ্যে চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা আজ আবার প্রবল হইয়া জাগিয়া উঠিল, তাহাকে বাধা দিবার শক্তি ক্রমেই লোপ পাইতেছিল। তবুও নিশ্চিত মৃত্যুকে ঠেকাইবার জন্য মানুষ যেমন বৃথা চেষ্টা করে তেমনি সে বলিল "কিন্তু আমাদের সন্তানদের কি হবে?" বীরেনের উত্তেজনা তখনও পুরামাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। সে যেন রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"বর্ত্তমানে অসীম দুঃখ এবং বিরাট অন্যায়ের বোঝা মাথায় করে নিতে হবে শুধু ভবিষ্যতের অন্যায় এবং দুঃখকে বাঁচাবার জন্য—এত সুবুদ্ধি আমার নেই। আমার ছেলেদের কাল্পনিক দুঃখের মুখ ভেবে আজ যদি আমি তোমাকে গ্রহণ না করি—সেটা আমার পক্ষে কাপুরুষতাই হবে।" বীরেন রমার মুখের দিকে চাহিল। রমা হঠাৎ বীরেনের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ওগো, তুমি আমায় এ নরক থেকে নিয়ে যাও—আমি আর পাচ্ছি না—এত ব্যথা এত গ্লানি আমি আর সইতে পাচ্ছি না গো আমার বুক ভেঙ্গে গেল।" বীরেন কোঁচার খোঁট দিয়া তাহার চোখ দুইটী সযত্নে মুছাইয়া দিয়া তাহার উপর একটী সপ্রেম চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্ত

(জন্মের পূর্ব্বে অলৌকিক দৈবী শঙ্খধ্বনি)

[বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীদিব্যেন্দুসুন্দর]

ইংরাজী ১৮৩৮সাল ভারতবর্ষের একটী স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসর পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহের তিরোভাব ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব।

ইংরাজী সাল ১৮৩৮—২রা মাস—শকাব্দ ১৭৬০—বাঙ্গলা সাল ১২৪৫—৩রা আষাঢ়—বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রি ও প্রভাতের সন্ধিক্ষণে) ২৪পরগণা জিলার অন্তর্গত গঙ্গার পূর্ব্বপারে—কাঁটাল পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনের সর্ব্বপ্রথম অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় বাবু বিপিন চন্দ্র পাল সভাপতি হয়েন। তিনি সেই সময়ে "বাঙ্গলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার বিস্তার" বর্ণনা করিতে করিতে—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই একটা প্রশ্ন করেন "এত বড় বড় দেশ সহর বন্দর থাকিতে বঙ্কিমচন্দ্র এই নির্জ্জন, নীরস—অজ সেকেলে পাড়াগাঁ—কাঁটাল পাড়া গ্রামে কেন জন্মগ্রহণ করিলেন?" পাল মহাশয় ইহার বেশ সহজ-বোধ্য যুক্তিতর্ক দ্বারা—সদুত্তরও দিয়া সমবেত সুধীমণ্ডলীকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু আমার ন্যায় অনুর্ব্বর মস্তিষ্ক উহা ঠিক সহজ সরলভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়—জীবাত্মা দেহত্যাগ করিয়া মুক্তপুরুষ হইলেই অনায়াসেই বুঝিতে পারে দেহধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে কামনা ও বাসনার ধ্বংস হইয়াছে কি-না। যদি বুঝিতে পারে কামনা অতৃপ্ত রহিয়া গিয়াছে, বাসনা তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয় নাই,—তখন—মুক্ত জীবাত্মা—জন্মগ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্থান, কাল, পাত্র, কুল প্রভৃতি বাছিয়া স্থির করিয়া লয়। সূক্ষ্ম দেহধারী মুক্ত জীবাত্মা স্থূল দেহধারী মানব অপেক্ষা সহস্রগুণ অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন, তাহাদিগের সূক্ষ্মদৃষ্টি দিব্যদৃষ্টির মত সহস্রগুণ বেশী। মুক্ত জীবাত্মা সেই অন্তঃস্থল ভেদী সূক্ষ্ম ও দিব্যদৃষ্টির দ্বারা অতি সহজেই বুঝিতে পারে—কোনস্থানে কোন কুলে মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে—সেই জন্মাধিকৃত স্থূল মনুষ্য দেহ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বকামনা বাসনার সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইয়া—সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা। সূক্ষ্মদেহধারী মুক্ত জীবাত্মার সূক্ষ্ম ও দিব্য দৃষ্টি সুদূর ভবিষ্যতের ঘনান্ধকারাবৃত যবনিকাও ভেদ করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সেই অন্তদৃষ্টির সাহায্যে মুক্ত জীবাত্মা পূর্ব্ব হইতেই স্থান, কাল. পাত্র, কুল বাছিয়া ঠিক করিয়া লইয়া পরে পুনরায় মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল মুক্ত জীবাত্মা সূক্ষ্মদৃষ্টির দ্বারা আরো বেশ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে—কোন স্থানে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাদের নিজেদের অতৃপ্ত বাসনা কামনা পরিতৃপ্ত করিতে কোন বাধা উপস্থিত হইবে না। নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধি ও সাধন পথে সারাজীবন উৎসর্গ করিলেও কেহ কখনও অঙ্গুলি হেলনে তাহাদিগকে সাধনা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবে না—আর নিজ নিজ সাধনার তপস্যায়—সমস্ত জীবন একাগ্র চিত্ত হইয়া, জগৎকে ধন্য ও পরলোককে স্তম্ভিত করিয়া—মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়া—দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কামনা বাসনাকে জয় করিয়া--নিষ্পাপী নিস্পৃহ হইয়া চির নির্ব্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

আমার অনুমান হয় বঙ্কিমচন্দ্র কোন যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ। কোন একটা গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি পুনরায় মানব শরীর ধারণ করিয়া মরলোকে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বজন্মের মুক্ত জীবাত্মা পূর্ব্ব হইতেই কাঁঠালপাড়া গ্রাম—তদ্দেশবাসী চট্টোপাধ্যায় বংশীয়দিগের কুল ও গৃহ পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া লইয়া শুভ মুহূর্ত্তে শুভ বাসরে—রাত্রি ও দিবার ঠিক সন্ধিস্থলে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহময়ী জননী পূর্ব্ব রাত্রি—সন্ধ্যার পর হইতেই প্রসব বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন। সে আজ প্রায় বাট

সত্তর বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন একালের সভ্যতার দিনের ন্যায়—অলিতে গলিতে, পথে ঘাটে মাঠে রাস্তায় এম-বি, এম-ডি, পাসকরা ডাক্তার (নামের সঙ্গে লেজুড়—ধাত্রিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ও স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত) ও লেডি ডাক্তার প্রভৃতির ছড়াছড়ি ছিল না। তখনকার দিনে একমাত্র গণ্ড-মূর্খা—হাতে-কলমে-শিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে ধাইমা ভিন্ন অন্য গতি ছিল না। সেই ধাইমা সন্ধ্যার পর হইতেই হাজির ছিল—কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থায়।

মহাপুরুষ মাত্রেরই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা অলৌকিক বা অন্ততঃ পক্ষে অসাধারণ ঘটনা সংশ্লিষ্ট থাকে শুনা যায়। সে সব বিবরণ কতদূর সত্য বা কাল্পনিক তাহা কেহ বলিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম সম্বন্ধেও ঐরূপ অসাধারণ অলৌকিক ঘটনার কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে। কথিত আছে—যখন বঙ্কিমচন্দ্রের জননী প্রসব বেদনায় বিশেষ কাতর—অসহ্য যন্ত্রণায় মুহ্যমান, ধাত্রী ও গৃহস্থ সকলে বিশেষ ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন—সেইসময় এক আশ্চর্য্য শঙ্খধ্বনি সমগ্র বাড়ীখানির চারিদিকে ধ্বনিত হইতে সকলে শুনিয়াছিলেন! ধাত্রী তাড়াতাড়ি ছেলে ধরিবার নিমিত্ত হাত বাড়াইয়া দিয়া হতাশাস হইয়া গেল। সমবেত পুরুষ অভিভাবকেরা শঙ্খধ্বনি শুনিয়া ছেলে হইয়াছে মনে করিয়া সূতিকাগারের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন—"এ কিরূপ দৈব-বিড়ম্বনা বুঝিতে পারিতেছি না।" বাটীর আশেপাশে আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি সকলে নিজ নিজ বাটী হইতে অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি শুনিয়া—ছেলে হইয়াছে মনে করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া ব্যাপার শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে যে যেখানে সুবিধা পাইয়াছিল সেইখানেই বসিয়া পড়িয়াছিল।

কেবলমাত্র পরোপকারী, উদারচেতা, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্মরণীয় যাদবচন্দ্র (বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃদেব) অচল অটলভাবে কুলদেবতা রাধাবল্লভের চরণে সমস্ত অর্পণ করিয়া ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এ দারুণ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত কাতরপ্রার্থনা করিতেছিলেন। তিনিও সেই অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সেই অদ্ভুত-ধ্বনি টলাইতে পারে নাই। ইহার অল্পক্ষণ পরেই ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিষ্ট হইলেন! ধাত্রী ছেলে হাতে করিয়া ধরিয়া একটু মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল—প্রসূতিও প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছিতপ্রায়—সকলেই যেন একটু মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহাও অতি অল্পক্ষণের জন্য। ধাত্রী প্রকৃতিস্থা হইয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"ওগো শাঁক বাজাও, শাঁক বাজাও—রাজপুত্রের মত সোনারচাঁদ খোকা হইয়াছে।" সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের আনন্দ কোলাহলে অন্দর মুখরিত হইয়া উঠিল। তখন সকলে পুনরায় অন্দরে সূতিকাগারের দ্বারে যাইয়া পুত্রমুখ দেখিয়া—তৃপ্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুস্থির হইলেন। কিন্তু যাদবচন্দ্র তখন পর্য্যন্ত সেই রাধাবল্লভের ধ্যানে তন্ময়—বাহ্যজ্ঞানশূন্য। হঠাৎ—"ও কর্ত্তাবাবু এখনও ঝিমুচ্চো সোনার চাঁদ রাজপুত্তুর খোকা হয়েছে—দেখতে যাওনি?—যাও যাও খোকার চাঁদমুখ দেখে ধন্য হওগে—" নারীকণ্ঠে উচ্চারিত এই বাক্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি পুরাতন দাসীর সহিত অন্দরে যাইয়া পুত্রমুখ দেখিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরে বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া যাদবচন্দ্র পূর্ব্বকার শঙ্খধ্বনির বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। যখন সেই শঙ্খধ্বনি কোথা হইতে হইয়াছিল—কে করিয়াছিল—কেন করিয়াছিল—বিশেষ অনুসন্ধানেও কোন সঠিক সংবাদ পাইলেন না তখন যাদবচন্দ্র ভক্তিরসে গদগদ হইয়া সানন্দে রাধাবল্লভের রাঙ্গা-চরণোদ্দেশে বারম্বার প্রণাম করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

শঙ্খধ্বনির গল্পটি সত্য হইতে পারে, আবার মিথ্যাও হইতে পারে। অনেকে হয়ত ইহা একেবারে বাগবাজারের আড্ডার গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা যে খাঁটী সত্য ইহার প্রমাণ যদি কেহ চাহেন তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি তাঁহাদের সুবিধা ও সুযোগ মত আমার সহিত একবার বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠাল পাড়া গ্রামে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইতে স্বীকৃত হউন, সেখানে এখন পর্য্যন্ত এমন অশীতি-বৎসর বৃদ্ধ জীবিত আছেন যিনি স্বকর্ণে এই অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি শুনিয়াছিলেন—বলিয়া প্রমাণ দিবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম বিবরণ সম্বন্ধে ইহাই অলৌকিক ঘটনা।

শত্রু

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

জীবনপথের সাথী ছিল সে; কিন্তু সে-ই ছিল আমার জীবনের প্রধান শত্রু। কোন স্বার্থের ভিতরে নয়, কোন কাজের উমেদারীতে নয়, কোন প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীতায়ও নয়—কিন্তু তবু সে ছিল আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। কোন বিষয়েই আমাদের মতের মিল ছিল না—যখনি আমরা মিলিত হইয়াছি, অফুরন্ত তর্কের স্রোত তখনি বহিয়া চলিয়াছে আমাদের দুজনার ভিতরদিয়া। উঃ—সে কি তর্ক! দুনিয়াতে এমন কোন বিষয় ছিল না যাহা লইয়া আমাদের তর্ক না চলিত—ধর্ম্ম বল, বিজ্ঞান বল, শিল্প বল, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ সংস্কার, জীবন, মৃত্যু—বিশেষ করিয়া মৃত্যুর পর মানবাত্মা কোথায় যায়, কি ভাবে থাকে এই লইয়াই তুমুল তর্কযুদ্ধ আমাদের ভিতর অহরহ চলিত।

সে ছিল বিশ্বাসী—গভীর বিশ্বাসী। পরলোক সম্বন্ধে সে যাহা বলিত সরল বিশ্বাসই ছিল তাহার একমাত্র সত্য আশ্রয়।

একদিন সে আসিয়া আমাকে বলিল—"বন্ধু, তুমি আমার সকল কথাই আজ হাসিয়া তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতেছ বটে, কিন্তু তোমার আগে যদি আমার মৃত্যু হয় তবে ঠিক জানিয়ো—আমি আসিব, সেই পরলোক হইতে আসিয়া আমি তোমায় দেখা দিব··· ··· ···তখন দেখা যাইবে তোমার এই মুখে এই রকম হাসি সেদিন ফুটিয়া উঠে কি না!"······

সত্যি সত্যি সে মারা গেল।

আমার পূর্ব্বে, যৌবনকালেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়—আমি তাহার সেই প্রতিজ্ঞার কথা—সেই যে দেখাদিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া গিয়াছিল সেই কথা ভুলিয়া গিয়াছি—একদম ভুলিয়া গিয়াছি।···

নিশীথ রাত্রি।

শয্যায় শুইয়া আছি কিন্তু ঘুম আমার কিছুতেই আসিতেছে না। শূন্য কক্ষে প্রদীপ নাই। জানালা খোলা রহিয়াছে। সেই মুক্ত গবাক্ষ পথে নক্ষত্রখচিত আকাশের প্রতিফলিত ম্লানালোক নববধুর লজ্জাজড়িত পদের মত অতি সন্তর্পণে কক্ষতলে প্রবেশ করিতেছে। অর্থহীণ শূণ্যদৃষ্টিতে সেইদিকে কেবল চাহিয়া আছি।

সহসা এ কি দেখিলাম! কা'র এ মলিন ছায়ামূর্ত্তি? এ যে সেই—সেই আমার জীবনের পুরাতন শত্রু! দুই জানালার মাঝখানে নিঃশব্দ ভাবে সে দাঁড়াইয়া আছে। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সে ধীরে, অতি ধীরে তার মাথা খানা দুলাইতেছে। উঃ—তাহার এই দাঁড়াইবার ভঙ্গিটি কি করুণ!······ এই নীরব মাথাদোলানোর দৃশ্যটী কি মর্ম্মান্তিক!·········

কিন্তু আশ্চর্য্য এই—ভয় বা বিস্ময় কোন কিছুতেই আমাকে অভিভূত করিতে পারিল না। দুরন্ত সাহস যেন আমাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মাথা তুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমি ছায়ামূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিলাম। ছায়ামূর্ত্তি তেমনি নির্ব্বিকার মৌনভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল।

অসহ্য!

তাহার এই নীরব নৈশ-অভিযান আমার কাছে অসহ্য বোধ হইল। সহ্য করিতে পারিলাম না; তীব্র কণ্ঠে তাহাকে প্রশ্ন করিলাম—"কি হে! চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন? কেমন আছ তুমি? ··· ··· ··· কি দেখিতে পাইলে? তোমার কথাই কি ঠিক? পরলোক আছে? ··· কথা কইছ না যে? কেন আসিয়াছ তবে?—আমাকে সাবধান করিতে, না গালাগাল দিতে?··· ··· ··· কি রকম বুঝ্‌ছ সেখানে? নরকের নির্য্যাতন? না—স্বর্গের সুখসম্ভোগ? বল, বল,—একটী শব্দ উচ্চারণ করিয়া আমাকে উত্তর দাও!"

কিন্তু শত্রু আমার নীরব, সে একটী শব্দমাত্র করিল না; যেমন সে নীরবে দাঁড়াইয়া মাথা দুলাইতেছিল তেমনি ঐ জানালার পাশে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দ করুণভাবে মাথা দুলাইতে লাগিল।

নৈশনীরবতা ভঙ্গ করিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাম—হা, হা, হা, হা, !··· ··· পলক ফেলিতে চাহিয়া দেখিলাম —ছায়ামূর্ত্তি শূণ্যে মিলাইয়া গিয়াছে।*

---

* রুষ লেখক ইভান্ টুর্গেনিভ হইতে।

গিরিশ প্রসঙ্গ

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়]

(৬)

গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটক প্রথমে মিনার্ভা থিয়েটারে (৯ই পৌষ, ১৩০০ সাল) অভিনীত হয়। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত চুনিলাল দেব ইহাতে অর্জ্জুনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম অভিনয়রজনীর পর অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত চুনিবাবু গিরিশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন,—"রণস্থলে প্রবীর পতনের পর অর্জ্জুন, প্রবীরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাকুলভাবে বলিয়া থাকেন,—

'হরি, জীবিত কুমারে হেরি,
ঔষধে কি হবে হে উপায় ?' ইত্যাদি

কিন্তু যদ্যপি অর্জ্জুন প্রবীরের মস্তক কোলে লইয়া এই কথাগুলি বলে, তাহা হইলে কিরূপ হয় ?" তদুত্তরে গিরিশ বাবু বলেন,—"ইহাতে Stage effect বেশ হয় এবং Postures দেখিতে সুন্দর হয় বটে, কিন্তু Realistic হিসাবে দেখিতে গেলে অসঙ্গত হয়। কেননা, পতিত মরণোন্মুখী শত্রু সুযোগ পাইলে প্রতিহিংসা গ্রহণে কখনই বিমুখ হইবে না। নিজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কিছুই নয়, সেই নিমিত্তই ঐভাবে অভিনয় সমীচীন নহে।"

(৭)

থিয়েটারে কম বিক্রয় হইলে বা ভাবুক শ্রোতার অভাব দেখিলে অনেক সময়ে অভিনেতারা অবহেলার সহিত অভিনয় করিয়া থাকেন। গিরিশবাবু বিরক্তির সহিত তাঁহাদিগকে এরূপ ভাবে অভিনয় করিতে নিষেধ করিতেন। একদিন বলিলেন,—"গোপাল চক্রবর্ত্তী একজন সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন, তিনি তাঁহার ছাত্রগণকে উপদেশ দিতেন, 'যেমন সভাই হোক, কখনো অনাস্থা ক'রে গান ক'রো না। সে আসরে একজনও সমজদার থাকতে পারেন—তাঁকে ব্যথা দিও না। সেই একজনের তৃপ্তিতেই তোমার আশাতীত পুরস্কার জানবে।' গোপালবাবুর এই উপদেশ, তোমরা অভিনেতা, তোমাদের প্রতিও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। যদ্যপি উৎকৃষ্ট অভিনেতা বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার এই অমূল্য উপদেশটী সদাসর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।"

(৮)

কবি ও নাট্যকার অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ না করিয়াও স্বীয় কল্পনাবলে প্রকৃতির স্বরূপ মূর্ত্তি চিত্রিত করেন। ষ্টার থিয়েটারে 'কমলে কামিনী' নাটক লিখিবার পূর্ব্বে গিরিশবাবু সমুদ্রদর্শন করেন নাই। 'কমলে কামিনী' নাটকে বনবিহারিনী ওরফে 'ভুনি' নাম্নী জনৈক অভিনেত্রী 'শ্রীমন্তের' ভূমিকা অভিনয় করিত। ইহার কিছুদিন পরে সে ৺পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনে গমন করে। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, একদিন থিয়েটারে সে গিরিশবাবুকে বলিল,—"মহাশয়, আপনি 'কমলে কামিনী' নাটকে যে রকম সমুদ্রের বর্ণনা ক'রেছেন, ঠিক সেই রকম সাগর দেখে এলুম। আপনি সমুদ্র দেখে এসে বুঝি সেই ছবিটী মিলিয়ে নাটকে লিখেছেন ?" গিরিশ বাবু বলিলেন,—"আমি এ পর্য্যন্ত সাগর দেখি নাই, তবে নানা বইএ সমুদ্রের বর্ণনা পড়েছি—লোকের মুখে শুনেছি,—সেই ভাবেই লিখেছি।" বনবিহারিনী কোনওমতে গিরিশ বাবুর কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে পুনরায় বলিল, "না ম'শায়, চোখে না দেখে, শুধু বই প'ড়ে এমন ঠিকঠাক্‌টী লেখা যায় না।"

(৯)

মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন 'বিল্বমঙ্গল' নাটক অভিনয় হইতেছে। চতুর্থ অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে কাননমধ্যে উপবিষ্ট বিল্বমঙ্গল যে সময়ে বলেন :—

"দিন গেল, দিন যায়, রহে না ত দিন,—
কবে তবে কৃষ্ণ পাব ?"

এমন সময় নেপথ্যে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি হইতে থাকে। সেই শঙ্খ-ঘণ্টা-নাদ শ্রবণে, যিনি বিল্বমঙ্গল অভিনয় করিতেছিলেন, তিনি নেপথ্যে মুখ ফিরাইয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে বলেন :—

"ওই শঙ্খ ঘণ্টা-নাদে—
সায়ংসন্ধ্যা করে দ্বিজগণে।" ইত্যাদি

অভিনয় শেষ হইলে গিরিশবাবু উক্ত অভিনেতাকে বলিলেন,—শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি শুনিবামাত্র কেবল নেপথ্যে মুখ ফিরাইলেই হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দের অনুসরণে অভিনেতার কাণ খাড়া হইয়া উঠিবে—শব্দের দিকে মনোনিবেশ দর্শকগণ সুস্পষ্টরূপ বুঝিতে পারিবে।"

কথায় কথায় অভিনয়-প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। গিরিশবাবু বলিলেন,—"অভিনয়কালীন—রসের তারতম্যানুসারে—অভিনেতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তৎসঙ্গে পরিচালিত হইবে; কিন্তু তাহা বলিয়া ইহার বাড়াবাড়ি করাও কর্ত্তব্য নহে। আকাশের কথা হইলেই উর্দ্ধে অঙ্গুলী উত্তোলন, মেদিনীর কথা হইলেই নিম্নে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ এবং 'আমি' বলিতে হইলেই বক্ষে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ভাল নহে।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি পুরাকালীন বেঙ্গল থিয়েটারের একটী গল্প বলেন। গল্পটী এইরূপ :—

বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা এইরূপ অত্যধিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা করিতেন। অভিনয়ে ভগবানের কথা থাকিলেই উর্দ্ধে 'ড্রেসসার্কেলের' দিকে হস্ত প্রসারণ করিতেন—যেন ভগবান সেইখানে বসিয়া আছেন। পৃথিবী, মৃত্তিকা, ধরিত্রী এই সব শব্দ পাইলেই ষ্টেজের প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চাহিতেন অথবা পা ঠুকিয়া উহা নির্দ্দেশ করিতেন। এইরূপ অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত অভিনয়-পদ্ধতিকে বিদ্রূপ করিয়া তখনকার বিপক্ষ থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে একটী ছড়া লিখিত হইয়াছিল। ছড়াটী সব স্মরণ হইতেছে না :—দুই ছত্র এই :—

"পৃথিবী দেখাতে হ'লে মাটি ফেলেন চ'ষে।
বিমুখ বিধাতা আছে ড্রেস সার্কেলে ব'সে॥"

গিরিশচন্দ্র তাহারপর বলিলেন,—"অভিনয় স্বভাবের অনুকরণ,—বিশেষ কারণ ব্যতীত আমরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করি না। নক্ষত্রখচিত আকাশ বলিতে হইলে আমরা আকাশ দেখাই না, কিন্তু "আকাশে ভীষণ মেঘ উঠিতেছে" বলিলে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করা সঙ্গত। ফলতঃ প্রতি কথায় অঙ্গভঙ্গি দেখাইতে হইলে যেখানে বিশেষ রূপে দেখান কর্ত্তব্য, তাহার আর বিশেষত্ব থাকিবে না এবং অভিনয়ও একঘেয়ে হইয়া উঠিবে।"

(১০)

নটকুল-শেখর ও নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী মহাশয়ের জীবনীতে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"কবি, নট ও চিত্রকরের প্রায়ই বিষয়বুদ্ধি কম হইয়া থাকে। চিন্তার পাছে বিঘ্ন হয়, এ নিমিত্ত বিষয়ীর সংঘর্ষ প্রায়ই তাঁহারা পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহারা হিসাবের এক পয়সার জন্য বাদানুবাদ করিতে, এক পয়সার জন্য মাসাবধি খাতা উল্‌টাইয়া রেওয়া মিলাইবার নিমিত্ত বিব্রত থাকিতে, এক পয়সা খরচ কমাইবার জন্য তিন দিন মস্তিষ্ক ঘামাইতে কিছুমাত্র ক্লেশ বিবেচনা করেন না; কিন্তু নট প্রভৃতি যাঁহারা কল্পনার পথে দিবারাত্র বিচরণ করেন,—তাঁহাদের বিষয়কর্ম্মের ভিতর একবার আহারের চেষ্টা থাকে, তাহা ফুরাইলে আবার কল্পনায় বিভোর হইয়া পড়েন,—বৈষয়িক সংসর্গ তাঁহাদের একেবারেই বিরক্তিকর।"

* গত ১৪ই ভাদ্রের (১ম বর্ষ, ৪২ সপ্তাহ) সচিত্র শিশিরের ১৩৩২ পৃষ্ঠায় 'গিরিশ-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধের, ২য় স্তম্ভে ২১পংক্তির 'জোয়ানঅফ আর্ক' নাটক লইয়া সেকস্‌পীয়ারের' পর এই কথাগুলি বসিবে—"সহিত তুলনা করিয়া বলেন, সেকস্‌পীয়ারের"—তাহারপর যেরূপ আছে অর্থাৎ-'রচনা পার্থিব স্থূলভাব লইয়া; উচ্চ প্রতিভায় চালিত হইয়া' ইত্যাদি।

নূতন যুগ

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(৮)

সন্ধ্যার ভবিষ্যৎ দিন দিন অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, তাহার চিরহাস্যময় মুখখানার উপরেও আজকাল এক এক সময় সেই অন্ধকারের ছায়া ফুটিয়া উঠে। সন্ধ্যা বুঝিতে পারে না কেন সময়ে সময়ে তাহার মনটা এ রকম বিষণ্ণ হইয়া উঠে, কেন তাহার নির্জ্জনতা ভাল লাগে।

স্বামী স্পষ্ট কোনদিন তাহাকে কোন কথাই বলেন নাই; তবে যে সময় সময় বিরক্তি ভাবটা প্রকাশ করেন, তাহার জন্যই কি তাহার এই ভাবান্তর? বিবাহের পরে দুইটা বৎসর অনাবিল সুখশান্তির মধ্য দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, কবে আসিল কবে গেল সে মোটে হিসাবই করে নাই। তাহার পর কবে তৃতীয় বৎসর আসিল, এই বৎসরটার বুকের মধ্যেই কি এই অশান্তি ভাবটা লুকাইয়া ছিল?

শিরীষ মুখে কোনদিন কোন কথা না বলিলেও সন্ধ্যা তাহার পরিবর্ত্তন চট করিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছে। মেয়েরা এই বিষয়টাতে বেশ চালাক হয়, নহিলে সন্ধ্যার মত আত্ম-ভোলা মেয়েটী কেমন করিয়া ধরিল? সে অনেক ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিল না তাহার স্বামীর এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি?

হয়তো এ পরিবর্ত্তন অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছে, সে বিভোর প্রাণে ছিল বলিয়াই ধরিতে পারে নাই। সমস্ত দিনটা স্বামীর সে যত ভাবিত, আর একজনের জন্যও তত ভাবিত। স্বামীর জন্য আশাপথ প্রতীক্ষায় যেমন থাকিত, দীপিকার আশাপথ চাওয়াও সেইরূপ ছিল। দীপিকার উপর অর্দ্ধেক মনটা পড়িয়া থাকিত বলিয়া স্বামীর এই পরিবর্ত্তন তাহার চোখে পড়ে নাই। কয়দিনের জন্য দীপিকা সরিয়া যাওয়ায় সে যখন মনটাকে সম্পূর্ণভাবে গুটাইয় আনিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল তখনই তাহার চোখে পড়িল তাহার স্বামীর এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন।

সে দেখিল শিরীষ তাহাকে লইয়া কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছে না। শিরীষ যাহা চায় তাহার তাহা নাই, এই অভাবটা তাহাকে পীড়ন করিল বড় কম নয়, তাহার বুক ফাটিয়া তাই কান্না আসিতে লাগিল। ভগবান তাহাকে গন্ধশূন্য পলাশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, স্বামীর মনের মত গুণ দিলেন না কেন?

এবার খুব মন দিয়া সে লেখাপড়া ও গান শিখিতে বসিল, তাহার এই একাগ্রতা দেখিয়া দীপিকা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কিন্তু হায় রে, তাহার তবু শেখা হইল না, মনের একান্ত বাসনা তাহার সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে হার মানিল, কাঁদিল, কিন্তু মনেই যে থাকে না, গানের সুর হয় না।

কান্নাভরাস্বরে সে শিরীষকে বলিল "আমাকে দিয়ে তোমার কিছু লাভ হলো না, আমার মরতে ইচ্ছে করছে।"

একটু হাসিয়া শিরীষ বলিল "লাভ না হওয়ার জন্যে আমি কোনদিনই তো তোমায় কিছু বলিনি সন্ধ্যা, যাতে তোমার মরতে ইচ্ছে হবে।"

এবার তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে বলিল, "তুমি বলনি, কিন্তু তোমার মনের ভাবটা বুঝতে আমার কিছু বাকি নেই তো। তুমি যে রকম চাও আমি সে রকম নই; আমি লেখাপড়া ভাল জানি নে, আমি গান জানি নে, আমি—"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল, শিরীষ চুপ করিয়া রহিল, সত্যই সে একটা কথা বলিতে

পারিল না। এযে যথার্থ সত্য কথা, এই সত্যটাকে কি মিথ্যার আবরণে আর ঢাকিয়া রাখা যায়?

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সন্ধ্যা বলিল "আমি ভাবি, যদি আমার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে তোমার বিয়ে দিদির সঙ্গে হতো তা হলে—"

"সন্ধ্যা—"

কিন্তু না; এই একবার তাহার নামটা উচ্চারণ করিয়াই শিরীষ থামিয়া গেল। হাঁ, তাহার অন্তরও যে এই কথা বলিতেছে, অন্তরে অভাব যে হাহাকার করিতেছে, যদি এ না আসিয়া সে আসিত! তাহার অন্তর বুঝি সন্ধ্যার অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, সন্ধ্যাও বুঝিয়াছে তাই সে সেই সত্য কথাটাই বলিয়া ফেলিল। এ সত্যকে আর কি ঠেকাইতে পারা যায়?

সন্ধ্যা চোখ তুলিয়া স্বামীর মুখের উপর স্থাপন করিল, তাহার চোখ বহিয়া শুধু অজস্রধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তি কিশোরীকে শিরীষ বুকের মধ্যে টানিয়া লইল, মনে হইল মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়া গেল। এই একমুহূর্ত্ত সময় না পাওয়ার দুঃখ তাহার কবল হইতে শিরীষকে নিষ্কৃতি দিল।

যখন পাওয়ার আশা ছিল তখন শিরীষ তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকে লইয়া সে কেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না? না পাওয়ার প্রবল বেদনা কেন তাহার বুকের মধ্যে অনুভব হইতেছে?

এটা মানুষের ধর্ম্ম। যতক্ষণ পাইবার আশা থাকে, ইচ্ছা করিলেই যখন পাওয়া যায়, তখন মানুষ পাইতে চায় না, কিন্তু যখন পাওয়ার আশা ফুরাইয়া যায়, যখন জানা যায় আর কিছুতেই পাওয়া যাইবে না তখন তাহার জন্যই মানুষ ছটফট করে, মনস্তাপে অধীর হইয়া উঠে। সামাজিক ধর্ম্মানুসারে দীপিকা শিরীষের পাওয়ার অনেক বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, মানুষের ধর্ম্মও তাহাকে আমল দিবে না, দীপিকা সব রকমেই এড়াইয়া গিয়াছে। দীপিকার মুখে সে দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছে, দীপিকার কথার মধ্যে সে দৃঢ়তা দেখিতে পাইয়াছে। দীপিকা অনেকদূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহার ধারণা সত্য, দীপিকা এখনও তাহাকে তেমনি—কি তাহার চেয়েও বেশী ভালবাসে, কিন্তু ইহাও তেমনি সত্য—সে ভালবাসা সে আজীবনকাল এমনই ভাবে চাপিয়াই রাখিবে, ভালবাসার খাতিরে শিরীষের হাতে নিজের দেহ তুলিয়া দিবে না।

কি ভুল বাসনায় মজিয়া সে নিজেকে অসুখী করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আধফুটন্ত ফুল সন্ধ্যাকেও শুলাইয়া তুলিতেছে! সে বলিবে কি, সে প্রকাশ করিবে কি—দীপিকার সহিত একদিন সে কি ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিল? এ কথা আর যে সে গোপনে রাখিতে পারিতেছে না, সন্ধ্যার কাছে বলিবার জন্য প্রাণটা ছটফট করিতেছে।

না, এখন বলা কোন মতেই উচিত নয়। এতদিন বলিলেও হইত, সন্ধ্যা সেটা আনন্দের সহিত শুনিত কিন্তু এখন শুনিলে অন্য কথা মনে করিয়া সে আরও ব্যথিতা হইয়া উঠিবে।

শিরীষ বলিতে পারিল না, মুখে আসিয়া সে কথা আবার ফিরিয়া গেল।

দীপিকা রীতিমত আসিয়া গান শিখাইতে বসিত আজকাল গানেও সন্ধ্যার মোটে আসক্তি ছিল না। গান শুনিতে শুনিতে সে অন্য ভাবনা ভাবিতে বসিত, গান ফুরাইয়া গেলে হাঁ করিয়া দীপিকার মুখপানে চাহিয়া থাকিত। দীপিকা বিরক্ত হইয়া হার্ম্মোনিয়াম বন্ধ করিয়া, বই লইয়া বসিত, কিন্তু কোথায় তাহার পড়া! একটা বানান পর্য্যন্ত সে বলিতে পারিত না, সব গোলমাল হইয়া যাইত।

দীপিকা জিজ্ঞাসা করিল "আজকাল তোমার এ রকম ভাব হয়েছে কেন সন্ধ্যা? কিছুতেই তোমার মন নেই কেন? মনটা তোমার পড়ার সময় কোথায় বেড়াতে যায় বলতে পারো?"

সন্ধ্যা লজ্জিত আরক্ত মুখ নত করিল। মনটা কোথায়-যায় সে কথা কি বলিতে পারা যায়? জীবন গেলেও স্বামীর কথা সে কাহাকেও বলিতে পারিবে না। এ সব কথা যে শুনিবে সেই কে হাসিবে, ঠাট্টা করিবে।

অবশেষে বিরক্ত দীপিকা বলিল "তোমার কিছুই হবে না সন্ধ্যা, কেন অনর্থক নিজেও কষ্ট পাচ্ছ, আমাকেও কষ্ট

দিচ্ছ ? এ সব ছেড়ে দাও, আমাকেও ছুটি দাও। একবছর হয়ে গেল, তোমায় কিছু শিখাতে পারলুম না, অথচ মাস গেলে টাকা হাত পেতে নিচ্ছি, এতে আমার বড় লজ্জা করে।"

অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে সন্ধ্যা বলিল "আমিও তো তাই বলছি কিন্তু উনি তবু আশা করেন আমি শিখতে পারব। আজ বলব এখন তুমি এই কথা বলেছ, তা হলে আর জোর করতে হবে না।"

সেদিন স্বামী আসিবামাত্র সে দীপিকার কথাটা শুনাইল, বলিল "তিনি নিজেই কাজ করতে চাচ্ছেন না, আমার শেখা হবে না বলেছেন।"

গম্ভীরমুখে শিরীষ বলিল "আচ্ছা, সে আমি দেখব।"

(৯)

তথাপি দীপিকা আসিতে লাগিল এবং শিরীষও মাস মাস বেতন দিতে লাগিল, সন্ধ্যাকেও সেই বই খাতা হার্মোনিয়াম নিয়া বসিতে হইতেছিল। অন্তরটা তাহার নিদারুণ বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিলেও সে দ্বিরুক্তি করিতে পারে না, কারণ এ তাহার স্বামীর ইচ্ছা।

সেদিন রাত্রে দীপিকা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিল, সেই সময় অকস্মাৎ ভীষণ বৃষ্টি আসিয়া পড়ার দরুণ তাহাকে খানিকক্ষণ আটকাইয়া থাকিতে হইল। রাত প্রায় সাড়ে দশটা এগারটার সময় যখন বৃষ্টি থামিয়া গেল, তখন দাদা শোফারকে ডাকিতে গিয়া খবর আনিল সে সন্ধ্যাবেলা ছুটি লইয়া গিয়াছে, আজ আর আসিবে না।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দীপিকা বলিল "উপায় ?"

সন্ধ্যা তাহাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিল। খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল "বেশ হয়েছে, আজ থেকে যাও দিদিমনি, কাল সকালেই তোমায় পাঠিয়ে দেব।"

দীপিকা একটু হাসিল "তা হলে শিরীষবাবু—"

ওষ্ঠ ফুলাইয়া সন্ধ্যা বলিল—"তাঁর ও বেশ মজা হবে। তিনি তো একাই থাকতে চান। না এখানে থাকতে বেশ ভাল হতো, কেন না আমি মায়ের কাছেই থাকতুম, মা গিয়ে ভারি মুস্কিল হয়েছে। আজ তিনি শান্তিতে ঘুমাতে পারবেন, আর তোমায় আশীর্ব্বাদ করবেন।"

দীপিকার মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সে অন্যমনস্কভাবে খানিক লাইটটার পানে চাহিয়া রহিল, দেখিল আজিকার এই বাদলের রাত্রে বাহির হইতে কতকগুলো ভঙ্গ আসিয়া আলোর চারিদিকে কি রকম করিয়া উড়িতেছে, চিমনীতে লাগিয়া পড়িয়া যাইতেছে, আবার উড়িতেছে; এমনই ভাবে অবশেষে মৃত্যুর কোলে নিজেদের সমর্পণ করিতেছে।

হঠাৎ সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া আপত্তি তুলিল "না আজ আমায় যেতেই হল, থাকতে পারব না।"

সন্ধ্যার হাস্যোদ্দীপ্ত মুখখানা অন্ধকার হইয়া গেল—"কেন দিদিমনি, একটা রাত থাকলে কি—"

তাহার চিবুক ধরিয়া আদরের স্বরে দীপিকা বলিল "থাকতে কোনও আপত্তি নেই ভাই, কিন্তু মাসীমা মোটেই এটা পছন্দ করেন না। আমার ফিরতে একটু রাত হ'লে তিনি বড্ড ভাবেন। রাত্রে না গেলে তিনি ছটফট করবেন। এমন একটী লোক নেই বাড়ীতে যে খবর নেবেন।"

সন্ধ্যা বলিল "ওই যে কারা আছেন শুনেছি।"

দীপিকা বলিল "ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা কিছুর মধ্যেই নেই ভাই।"

সন্ধ্যা কলিল "আমি এখুনি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

দীপিকা গম্ভীরমুখে বলিল "না ভাই, সে হবে না, আমায় যেতেই হবে। যা হয় একখানা গাড়ী ডেকে দিতে বল, আমি যেতে পারব এখন।"

বাহিরে শিরীষের কাছে এ সংবাদ পাঠাইতে সে বলিয়া পাঠাইল "এতরাত্রে দীপিকাকে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে একা ছাড়িয়া দিতে তাহার সাহস হয় না।"

দীপিকা সন্ধ্যাকে বলিল "তুমি বলে পাঠাও—আমার একটুও ভয় নেই, রাস্তা চিনি, গাড়ী একখানা উপলক্ষ্য মাত্র। আর তা যদি না হয়, একজন কাউকে আমার সঙ্গে দিন, পৌছে দিয়ে চলে আসবে।"

শিরীষ নিজে যাইতে চাহিল।

দীপিকা তাহার কথা শুনিয়া খানিকটা গুম্ হইয়া

দাঁড়াইয়া রহিল, সন্ধ্যা অনুনয়ের সুরে বলিল "তাই যাও দিদি, সত্যি আর কাউকে আজকের দিনে বিশ্বাস করতে নেই। যে রকম মেয়েদের নির্য্যাতনের পালা বেড়ে চলছে শুনছো তো, পড়ে শুনে বড্ড ভয় লাগে। আমাদের বুড়ো সোফার খুব বিশ্বাসী, তাই তার সঙ্গে তোমায় একা পাঠাতে ভয় হয় না। তোমার ভয় নেই বললে আমাদের ভয় আছে তো, ভদ্রলোকের মেয়ে তুমি, তোমার ইজ্জত রাখবার ভার আমাদের'পরে—যখন আমাদেরই বাড়ীতে তুমি আসা যাওয়া করছো।"

একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়া শিরীষ দীপিকাকে উঠাইয়া নিজেও উঠিয়া বসিল।

দীপিকা বাহিরের পানে চাহিয়া ছিল, পার্শ্বোপবিষ্ট শিরীষের পানে চাহিতে পারে নাই, কিন্তু শিরীষ তাহার পানেই চাহিয়া ছিল।

"দীপিকা—"

চমকাইয়া দীপিকা তাহার পানে চাহিল।

আজ শিরীষের সঙ্কোচ, লজ্জা, ভয় কিছুই ছিল না, সে চোখ নামাইল না, স্থিরকণ্ঠে বলিল "আজ তোমার সঙ্গে গোটাকত কথা বলব বলে এই কৌশলে তোমার সঙ্গ নিয়েছি। বাড়ীতে সন্ধ্যা তোমার পাশে থাকে, তোমার বাড়ীতে তোমার মাসীমা থাকেন, কাজেই কথা বলবার স্থান আমাদের এই রাস্তা। অসন্তুষ্ট হয়ো না দীপিকা, রাগ করো না এর জন্যে।" দীপিকা নির্ব্বাকে শুধু চাহিয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

আবেগে শিরীষ বলিয়া চলিল "বড় ভুল করেছিলুম আমি, আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। মনে ভাববে আমি বড্ড সুখী, কিন্তু তা নয় দীপিকা, বাইরে হাসি দেখে ভুল করো না। মনে যে কান্না অনবরত গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে এ হাসি তারই রূপান্তর মাত্র, স্ফূর্ত্তির বা সুখের হাসি এ নয়। আমি জানি তুমিও তেমনি অসুখী, আমার জন্যেই তোমার জীবনটা এমনি বিষময় হয়ে গেছে—;"

দীপিকা বলিয়া উঠিল "না না, আপনি ওসব কথা বলবেন না, ওতে আমার—"

বাধা দিয়া শিরীষ তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া জোরে চাপিয়া রাখিয়া বলিল "থামো, আমার কথা একেবারে একনিঃশ্বাসে শেষ করতে দাও, তারপরে কথা বলো। আমার ভুলে আমার সুখশান্তি গেছে, তোমার সুখশান্তি গেছে, আমরা দুজনেই অভিশপ্ত জীব, ভুতের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এরও তো প্রতিবিধানের উপায় আছে দীপিকা, আর সেই কথাটা নিয়ে আজকাল দেশে যে আন্দোলনটা চলেছে তাও বোধহয় পড়ছো। মানবধর্ম্ম চায় ভালবাসা, ভালবাসার জন্যই সংসারে নিত্য ঘটে আসছে, আমাদের সামাজিক মিলন হবে না, হতে পারবে না, কারণ তুমি বিবাহিতা, আমি বিবাহিত; তোমার স্বামী আমার স্ত্রী বর্ত্তমান, কিন্তু তা হলেও আজ এই মানব-ধর্ম্মের হৃদয়বৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে এই সংসারেই তো আমরা স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে পারি—।"

"শিরীষদা!"

আর্ত্তকণ্ঠে দীপিকা বলিয়া উঠিল "একি কথা বলছেন শিরীষদা!"

শিরীষ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "হ্যাঁ, সত্যিকথা বলছি। একটা ভুল করে ফেলেছি, শুধ্‌রাবার পথ যুগধর্ম্ম আমাদের সামনে ধরে দিয়েছে, এগিয়ে যেতে বলছে। আমরা সমাজের অনুশাসন মেনে চিরজন্মের জন্তে দুঃখকে বরণ করে নেব না, আমরা সমাজ-ধর্ম্মের জয়গান করব না, আমরা যুগধর্ম্মের, মানবের হৃদয় ধর্ম্মের, পবিত্র ভালবাসার জয়গান করব।"

সজোরে তাহার হাত হইতে নিজের হাত ছিনাইয়া লইয়া দীপিকা রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আমি আপনার এই যুগ-ধর্ম্মের অনুমোদন করতে পারছি নে।"

ক্ষুব্ধ শিরীষ বলিল "কেন পারবে না? এইখানে এত লেখাপড়া শিখে, এত দৃঢ়তা থেকেও এত দুর্ব্বল হয়ে পড়ছ, এত ভীরু স্বভাব তোমাদের?"

দীপিকা বলিল "হ্যাঁ শিরীষদা, এত দুর্ব্বল আমরা, এত ভীরু স্বভাব আমাদের! হতে পারে যুগ তার নূতন বার্ত্তা এনে আমাদের দরজায় দাঁড়িয়েছে কিন্তু আমরা—মেয়েরা তাকে এমনভাবে কিছুতেই বরণ করে নিতে পারব না, কারণ এ. আমাদের দেশের জিনিষ নয় এর সঙ্গে আমরা কখনও পরিচিত নই। নিতান্ত নূতন বলে কথাটা শুনে আমরা

স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি, একে গ্রহণ করা দূরের কথা। আপনি জানেন যাকে যা উৎসর্গ করা যায় সে জিনিষ তারই হয়, আর কাউকেই তা ধরে দেওয়া যায় না। আমি আপনাকে ভালবাসতে পারি, ভক্তি করতে পারি, কিন্তু দেহ দান করতে পারি নে কারণ দেহের পরে আমার নিজেরই অধিকার নেই। এই যে যুগ যুগান্তর ধরে সমাজ নীতিই বলুন আর যাই বলুন—নীতিটা চলে আসছে, আপনার যুগ-ধর্ম্ম, মানুষের হৃদয়-বৃত্তি, তা যে সহজে ভাঙ্গতে পারবে আমার তা বোধ হয় না। আমার এই ভালবাসা যদি আপনি কামনা জড়িত বলে মনে করেন জানবেন ভুল করেছেন। আমি আমার স্বামীরই—কারণ তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়েটাকে আপনি অগ্রাহ্য করতে পারেন, কিন্তু আমি হিন্দুর মেয়ে, সংস্কারের মধ্যে বেড়ে উঠেছি, অগ্রাহ্য করতে পারব না, একে মেনে নিতেই হবে। আপনি যে যুগধর্ম্মের নাম দিচ্ছেন, ভাবলাসার জয় গাচ্ছেন, বিয়েটাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন, এটা এসেছে যেখান হতে—সেখানে আজও বিয়ের মান রয়েছে, ভালবাসার জয় বিয়ের উপরে আসন নিতে পারে নি। আপনার পায়ে পড়ছি শিরীষদা, এ রকম করে আমায় অপমান করবেন না, একে আমি অপমান বলেই মনে করি। আপনি যদি সত্যই আমায় ভালবাসেন আমার নারী মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখুন, আমায় এমনি স্বাধীনভাবে থাকতে দিন। ভালবাসার নামে যে অত্যাচারের চিত্র আমার সামনে আপনি ধরেচেন তাতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।"

শিরীষ স্তব্ধ হইয়া রহিল, অবোধ নারী জাতটার উপর তাহার রাগ হইতেছিল বড় কম নয়।

"তুমি অনুমোদন নাই করলে দীপিকা, কিন্তু এটাকে নেহাৎ খেলো কথা বলে উড়িয়ে দিয়ো না। আজ তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিলে, কিন্তু দু'বছর বাদে দেখতে পাবে এই ভালবাসার জয় সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ ক্রমে ক্রমে নিচ্ছে একেবারে নিচ্ছে না একজন দৃষ্টান্ত দেবে, দশজনে নেবে! দেশে কোনটা ছিল বল—। এই যে হিন্দু মুসলমানে বিয়ে একে কি বলতে চাও? যুগধর্ম্ম, মানবের হৃদয় বৃত্তিরই জয় বলতে হবে নাকি? কোনদিন এ রকম ঘটবে বলে কেউ আশা করেছিল কি? এই যে সব জাতি মিশছে, অস্পৃশ্যতা দূর করতে এগিয়ে যাচ্ছে, এ কেউ আশা করেছিল কি?"

দীপিকা মাথা নাড়িয়া বলিল "না, আশা করে নি, কিন্তু এ ছিল একদিন তাই হয়েছে। এ দেশ সাম্যের রাজত্ব ছিল, এককালে তাই এ-রকম ঘটেছিল, দেশের দুরবস্থার দিকে নজর পড়ে দেশের লোক সেই সাম্যের যুগটাই ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে। হিন্দু মুসলমানে বিয়েতে দুইটী বৃহৎ জাতিকে এক করে দেশের মঙ্গলেরই সহায়তা করবে কিন্তু এই যুগান্তমোহিত বিদেশ হতে বয়ে আনা জিনিসটায় দেশের কি মঙ্গল হবে তাই জিজ্ঞাসা করি; এতে দেশে হাহাকার উঠবে যে, দেশ শ্মশানে পরিণত হবে, মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ জেনে যাকে দিতেপারবেন যে ধর্ম্মকে সহায় করে তিনি এগিয়ে যেতে বলছেন সে ধর্ম্ম কোথায় যাবে, তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে কি? এরই নাম স্বেচ্ছাচারীতা, ব্যভিচারিতা। দেশের মঙ্গল এই স্বেচ্ছাচারীতার মধ্যে দিকে সাধিত হবে যিনি বলেছেন তিনি এখনও সেদিকটা ভেবে দেখেন নি তাহলে বুঝতে পারতেন। এ যে ভারতবর্ষ শিরীষ দা, এ দেশের মেয়েদের আদর্শ, সীতা, সাবিত্রী সতী দময়ন্তী, এই আদর্শ নিয়ে এ দেশের মেয়ে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে ও। বিলাতী হাওয়া যদি এদের পর দিয়ে বয়ে যায়, এ আদর্শ তারা হারাবে দেশ সত্যি মরে যাবে, একটী প্রকৃত মা সে দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমার কথা যদি বলে আমার এই প্রার্থিব জীবন কারণ এ জীবন আমার সার্থক করতে পারব পরের কাজ দিয়ে। হাঁ, স্বামী যদি আমার পরে ভাল ব্যবহার করতেন, দেশের নিয়মে নিজের ধর্ম্মের পানে তাকিয়ে আমি সেখানেই পড়ে থাকতুম। সেটা আমার অনুচিৎ মনে হল, আমি তা সইতেপারলুম না, আমার আত্ম সম্মান খর্ব্ব হতে বসল বলে আমি চলে এসেছি। আমায় যদি আপনি সে রকম হীন ভাবে একে থাকেন, মুছে ফেলুন, আপনি যা ভেবেছেন আমি তা নই এখন হতে তাই ভাবুন।

শিরীষ একটা নিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র।

দীপিকা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল আপনি ভাবছেন বোধ হয়

হিন্দুঘরের মেয়েদের সব বিষয়েই গোঁড়ামী, হতো যদি অন্ত ঘরের মেয়ে তবে বুঝতো। এটা আপনার ভুল ধারণা আমার সঙ্গে যাঁদের আলাপ আছে সবারই মুখে এই এক কথাই শুনে আসছি। আপনিও যদি খোঁজ করেন—

শিরীষ বিমর্ষভাবে বলিল "কি হবে খোঁজ নিয়ে দীপিকা, সত্যি তোমায় অপমান করেছি, এর জন্তে মাপ চাচ্ছি।

মোটর বাড়ীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। দীপিকা উঠিয়া বলিল দেখুন, আমি একটা কথা আজ কয়দিন হতে বলব ভেবেছি কিন্তু বলতে পারি নি। আজ যখন আপনার সঙ্গে এতগুলো কথা হয়ে গেল তখন সে কথাটাই বা বাকী থাকে কেন? কথাটা হচ্ছে কি—আমি আর আপনার বাড়ীতে যেতে ইচ্ছা করি নে।"

স্তম্ভিত শিরীষ ধীরে ধীরে বলিল "বোধহয় আমার আজকের কথার জন্তে তুমি এই কথাটা বলছো দীপিকা?"

দীপিকা বলিল ঠিক তা নয়, তবে ব্যবহার আর মনোবৃত্তির সঙ্গে কতকটা সম্পর্ক আছে বই কি। সন্ধ্যা আমার কাছে কিছু শিখতে পারবে না, ওকে অন্ত বিচারের অধীনে রাখবেন আর একটা সত্যি কথা—আমি যাওয়া আসা করছি বলেই সেই পুরানো কথাটা আপনার মনে হয়ে গেছে। ভালবাসা মরে যায় আবার বাঁচে এ কথাটায় বিশ্বাস করেন কি? ভালবাসার উপাদান না তুললেই সে মরে যায়, কিছুতেই বাঁচে না। আপনার এ ভালবাসা মরে গেছল, উপাদান পেয়ে ধীরে ধীরে বেঁচে উঠেছে, আপনি তাকে বাড়িয়েই তুলছেন তার ধাকা সামলাতে এখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বলছেন সুখী হন নি, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়, তা হলে বিয়ের পর দুই বছর আপনার দিন গুলো অমন ভাবে কাটত না। আপনার তৃষ্ণা মিটে গেছল, সামনে আমায় দেখলেন, নিজেকে সামলাতে পারলেন না। আমার জন্তে যে আপনি অসুখী হন্ সন্ধ্যার মুখের হাসি শুখায় সেটা আমি ইচ্ছা করি নে। আমায় মাপ করবেন, কাল হতে আমি আর যাব না।"

একটা ছোট নমস্কার করিয়া সে বলিয়া গেল। স্তম্ভিত শিরীষ তাহার পানে শুধু চাহিয়া রহিল।

(১০)

সেদিন একটী অস্পৃশ্য চণ্ডালের মেয়েকে কোথা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া মোহিত উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল "মা" বিন্দুবাসিনী বাহির হইয়া বলিলেন, "কাকে ডাকছো বাবা?"

মোহিত মাথা নাড়িয়া বলিল "আপনি ভাবেন আপনিই শুধু মা আছেন, আর কেউ মা নেই। এ বাড়ীতে আমার আরও একটী মা আছেন, তাঁকে ডাকছি। আগে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হোক, তারপর আপনি তো আছেনই, আর দিদিমনিও আছেন, দেখুন এখন ব্যাপারখানা।"

তাহার ব্যবহারটা কিছু অস্বাভাবিক গোছের ছিল বলিয়া বিন্দুবাসিনী আর তাহাকে নাড়াচাড়া করিলেন না, একটু হাসিয়া আবার গৃহমধ্যে চলিয়া গেলেন।

মোহিত ডাকিল "অবিনাশ, মাকে সঙ্গে নিয়ে একবার নীচে এসো তো ভাই, বিশেষ দরকার পড়েছে।"

ক্ষীণকায় অবিনাশ উপরের বারাণ্ডা হইতে একবার মুখ বাড়াইয়া তাহাকে দেখিয়া লইল, মেয়েটীকে তাহার সঙ্গে দেখিয়া সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল "মেয়েটী কে হে?"

মোহিত বলিল "মাকে নিয়ে এসো তো, বলছি।"

পুত্রের সহিত তাঁহারা নামিয়া আসিলেন।

সাত আট বছরের মেয়েটী অতিশয় শীর্ণ চেহারা তাহার, যেন কতকাল ধরিয়া সে রোগে ভুগিয়াছে। মোহিত তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল "এই মেয়েটীকে পথে কুড়িয়ে পেলুম মা, এর কেউ নেই, কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিল, তাই সঙ্গে করে নিয়ে এলুম। জাতটা ছোট, চাঁড়ালের মেয়ে। এই মেয়েটা, মাকে প্রণাম করলি নে?"

মেয়েটী অগ্রসর হইতেই তাঁরা ভীষণভাবে চমকাইয়া পিছনে সরিয়া গেলেন—"এই মেয়েটা, ছুঁস নে!"

অবিনাশ বলিল—"তোমার একটু আক্কেল যদি থাকে মোহিত, এই চাঁড়ালের মেয়েটাকে কুড়িয়ে আনলে? জানো চাঁড়াল অস্পৃশ্য জাত, ওদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াতে নেই?"

মোহিত বলিল "সেই জন্তেই তো এনেছি।"

"সেই জন্তে এনেছ?" অবিনাশ যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আজ একবৎসর মোহিতের বিবাহ হইয়াছে, এই

খামখেয়ালি ছেলেটীকে ইহার মধ্যে বুঝিতে পারা গেল না।

মোহিত বলিল "সত্যি সেই জন্তেই এনেছি। কালই তোমার সঙ্গে আমার এ বিষয় নিয়ে কথা হয়েছিল, তুমি খুব উদার ভাবে বলেছিলে আত্মা মাত্রই ভগবান। তুমি আমায় শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনিয়েছিলে—যে সূর্য্যের আলো পবিত্র গঙ্গাজলে পড়ে, সেই সূর্য্যের আলো নর্দ্দমার জলেও পড়ে, সূর্য্যের সঙ্গে আত্মার তুলনা করেছিলে। একই ভগবান তোমার দেহে, এই চণ্ডালের দেহে, তবে এ অস্পৃশ্য হলো কি করে? শঙ্কর জ্ঞান পেয়ে চণ্ডালকে আলিঙ্গন করে ছিলেন, তাঁর দ্বিভাব চলে গিয়েছিল, আর তোমরা—জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, তোমরা এই অনাথা চণ্ডালের মেয়েকে একটু আশ্রয় দিতে পারলে না? আধার ভেদে এত ঘৃণা, এত সঙ্কোচ, এত কুণ্ঠা, এতে তুমি মানুষ হতে চাও অবিনাশ?"

উত্তেজিত অবিনাশ বলিল "বলে অনেকেই, কিন্তু কাজে করতে পারে কয়জন মোহিত? তিন চার মাস কলকাতায় এসেছি, অনেক দেখলুম শুনলুম, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী দেখলুম কয়টী? অনেককে দেখেছি বাইরে জোর গলায় বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু তাঁর বাড়ীর ভেতর গিয়ে একবার দেখে এসো। একটী ভদ্রলোক অবশ্য নাম করব না, দেখেছি বাইরে স্ত্রী-স্বাধীনতা, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন নিয়ে খুব লাফালাফি করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ভেতরের পরিচয় হঠাৎ একদিন পেয়ে জেনেছি সব ভুয়ো। এই যে তোমরা খদ্দর চরকা নিয়ে এত আন্দোলন করলে, আজ বাংলায় দেখি কয়টী ঘরে চরকা চলছে, কতখানি করে সূতো তৈরি হচ্ছে, আর কয়টী লোক খদ্দর পরছে? সব ভুয়ো হে, সব ভুয়ো। কিছুই হবে না, যা তাই থাকবে, মাঝে হতে জাতটাই যাবে।"

"জাত যাবে!" মোহিত এত দুঃখেও হাসিয়া ফেলিল—"হায়রে জাতের বড়াই! নিষ্ঠাবান হিন্দু তুমি, কিন্তু সত্যি করে বল দেখি তোমার জাত আছে কি? জাতটা কি আগে সেইটেই ভাবতে শেখো, তারপর জাত যাওয়া আর থাকা সম্বন্ধে কথা বলো। কতকগুলো সংস্কার দিয়ে গড়ে তুলেছ যাকে সেই হচ্ছে তোমার জাত, কিন্তু সত্যিকার জাত যে তোমার ধুলোয় পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে তার হিসেব করে দেখ না। হিন্দুর জাতটা এতই ঠুনকো জিনিষ যে একটু ছোঁয়া লাগলে, একটু বাতাস লাগলে ভেঙ্গে যায়। এই জাতের বড়াই করে হিন্দু একে একে সব হারাতে বসেছে, কত গেছে সেটা হিসাব করে দেখা হয়েছে কি? অবশ্য মেয়েটীকে নেবার লোক আছে, আমি একে এনেছি তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যে, পরীক্ষা করা আমার শেষ হয়ে গেছে। তোমায় শুধু বলে রাখি—জগতে মন্দের দিকটা দেখে সেইটাই নির্ব্বাচন করে নিয়ো না। মুখে কথা বলবে—কিন্তু তার আগে নিজেকে প্রস্তুত কর, তারপরে লোককে উপদেশ দিয়ো। ওই যে একটী ভদ্রলোকের কথা বললে, তাঁর কথাটাই মনে গেঁথে রেখেছ, কিন্তু ভাল যাঁরা আছেন, যাঁরা নিজেকে এই সব ভণ্ডামীর জাল ছিঁড়ে বার করে ফেলেছেন, তাঁদের ভাবটা নিতে পার নি।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল "তোমাদের কত ত্রুটি রয়েছে আমি সে গুলো সব দেখিয়ে দিতে পারি। তোমার বোন চরকা কাটে, সত্যি এ ভারি আনন্দের কথা, কিন্তু তার সঙ্গে মনটাকে তেমনি উন্নত করলে ভাল হতো না কি? সেটা তোমাদের শিক্ষার দোষ, হ্যাঁ, রাগ করো না, আমি বলছি তা সত্যি কিনা ভাল করে ভেবে দেখো।"

মায়ের পানে তাকাইয়া অবিনাশ বিরক্তভাবে বলিল "তোমার যেমন কাজ নেই মা তাই হাঁ করে এই সব কথা শুনছো। এর সঙ্গে মেলে এদের, আমাদের সঙ্গে কখনো মিলবে না। যত সব ম্লেচ্ছ—তেমনি চালে চলেছে। এসব ম্লেচ্ছপনা। আমাদের ঘরে হবার যো নেই। বাবার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ ছিল না তাই বিশেষ করে পরিচয় না নিয়ে মেয়েটাকে—"

মোহিত হাসিল "মেয়েটাকে হাত পা ধরে জলে ফেলে দেছে, কেমন? কথাটা বলতে বলতে থেমে গেলে কেন হে, শেষ করে ফেললেই ভাল হতো! যান মা, আমি দেখি এর যদি কোনও উপায় করতে পারি।"

দীপিকা বারাণ্ডার একপাশে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে-

ছিল, অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল "আমায় দিন দাদা, আমি এই মেয়েটির সব ভার নিচ্ছি।"

মোহিতের চোখে প্রচুর আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল "আপনি নেবেন. দিদিমনি, আপনি—"

বাধা দিয়া দীপিকা স্থিরকণ্ঠে বলিল "হ্যাঁ, আমিই নিচ্ছি দাদা, একে নিয়ে আপনাকে এই সন্ধ্যেবেলা কোথাও যেতে হবে না।"

অবিনাশ উপরে উঠিতে উঠিতে মোহিতকে শুনাইয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "শুনছ মা ?"

মা বিকৃত মুখে বলিলেন "মরুক গে, এবার এখানকার বাস উঠাতেই হবে দেখছি।"

মোহিত হাসি চাপিয়া বলিল "তাই বটে, এত ম্লেচ্ছপনার মধ্যে হিন্দু কখনও টেঁকে থাকতে পারে ? কিন্তু দিদিমনি আপনি তো ভার নিচ্ছেন, মা কিছু বলবেন না তো ?"

দীপিকা মাথা নাড়িয়া বলিল "এখনও মাসিমাকে চিনতে পারেন নি দাদা, তাই এ কথা বলছেন। মাসিমা বেশী কথা বলতে ভালবাসেন না, নিঃশব্দে নিজের কাজটী করে যান। আচ্ছা, একটু বসুন, আমি তাঁকে ডাকছি।"

বিন্দুবাসিনী তখন সন্ধ্যায় বসিয়াছিলেন, যখন বাহিরে আসিলেন, মোহিত মেয়েটী দেখাইয়া তাঁহার মত কি জানিতে চাহিল।

সস্নেহে মেয়েটীকে কাছে বসাইয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন "আমি আগেই বুঝেছি বাবা, আমি এ রকম অনাথ অনাথা নিতে খুব রাজি আছি। আমার সমাজ তো নেই-ই, ধর্ম্মও নেই। যে ধর্ম্মের কথা আমার স্বামীর মুখে শুনেছি সে ধর্ম্ম অনুদার নয়, উদার—সেই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম, আমি সেই ধর্ম্মের উপাসীকা। আজ আমরা কতকগুলো সংস্কারের বোঝা মাথায় নিয়ে যে ধর্ম্মের অহঙ্কার করছি, সেই ধর্ম্মের জন্যে আমি হিন্দুবলে এই মেয়েটাকে যদি আজ তাড়িয়ে দিই এর অবস্থা কি হবে তা ভাবতে গেলে জ্ঞান থাকে না। হিন্দু কোন ভদ্রলোকই একে আশ্রয় যদি না দেয়, অন্য কোনও জাতি একে গ্রহণ করবে, অন্যথা অপবিত্র স্থানে গিয়ে পড়বে, শেষটা এর পরিণাম ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে। বাবা, যা বলেছ সে খাঁটি সত্যি কথা, নারায়ণ একের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, সকলের মধ্যে সমানভাবেই আছেন। আমাদের ভুল ধারণা, তাই ওই একটার মধ্যে আছেন বলে পুজো করে যাই, সত্যমূর্ত্তি পেছনে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদে, সামনে তারই ছায়া নিয়ে বিভোর হয়ে থাকি।"

(ক্রমশঃ)

নিবেদন

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন
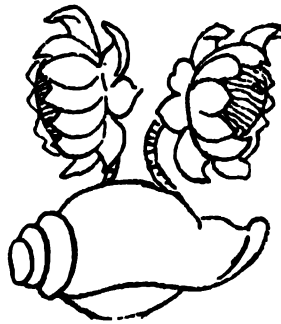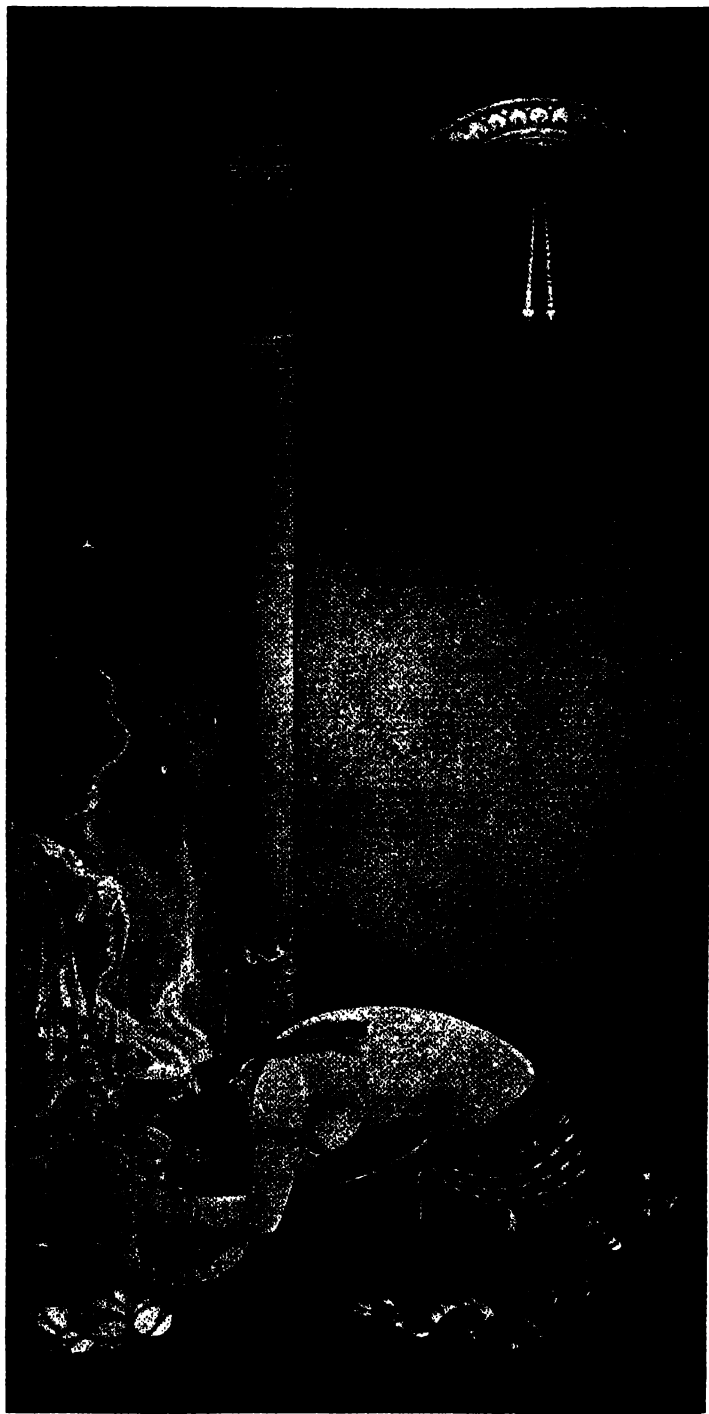
প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৯ই—৩০শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৩১ সাল। [৪৬শ—৪৯শ সপ্তাহ

আগমনী

গিরি কার কণ্ঠহার, আনিলে গিরিপুরে।

এতো সে উমা নয়

ভয়ঙ্করী হে, দশভূজা মেয়ে

উমা কোন কালে ত্রিশূলে অসুরে সংহারে।

হায়, আমার সেই বিমলা, অতি শান্তশীলা,

রণবেশে কেন আসবে ঘরে

মুখে মৃদুহাসি সুধারাশি হে,

আমার উমাশশীর এযে মেদিনী কাঁপায় হুঙ্কারে

ঝঙ্কারে।

হায় হেন রণবেশে এল এলোকেশে

এ নারীকে কেবা চিন্তে পারে—

রসিকচন্দ্র বলে, চিন্তে পারিলে, চিন্তা থাকে না গো

যেন এই বেশে মা আমার কাল ভয় নিবারে।

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে স্বর্গ বৈদ্যের উপদেশ

[শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এ্যাট-ল]

(১)

খৃঃ একাদশ শতাব্দীর কোনও একদিন (বার তারিখ এখনও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নির্ণয় করিতে পারেন নাই) মালব দেশাধিপতি ভোজরাজ, একটা খুব খারাপ কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন—বনের মধ্যে একটি পুকুরের ধারে নামিয়া, নিতান্ত চাষাভুষার মত,অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া জল পান করিয়াছিলেন। অবশ্য মৃগয়া করিতে করিতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াই তিনি এ কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃগয়া যাত্রার পূর্ব্বে একটা থার্ম্মস-ফ্ল্যাস্কে ভরিয়া চূর্ণ বরফ—অভাব পক্ষে শীতল জল, ষ্ট্রাপে বাঁধিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়া গেলেই হইত। কিন্তু সেকালের রাজারা—ঐ একরকমের মানুষ ছিলেন!

মৃগয়া করিয়া রাজা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু মাথার ভিতর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। মাথার ভিতরে কি যেন খুস খুস করে! ঘুম হয় না, খাদ্যে রুচি চলিয়া গেল। হইল কি?

দুই চারি দিন এইভাবে কাটিলে, মাথার ভিতর রীতিমত যন্ত্রণা আরম্ভ হইল। রাজবৈদ্য মহাশয় আসিলেন; নাড়ি টিপিলেন, মাথাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, এবং রোগ নির্ণয়ে অক্ষম হইয়া, তাহা ঢাকিয়া লইবার জন্য অনেক শ্লোক ঝাড়িলেন; খাইবার ঔষধ, শুঁকিবার ঔষধ, মাথায় মালিসের তৈল—খুব দামী দামী সব ঔষধ আনিয়া রাজার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হইল না; উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। "মাথা গেল মাথা গেল" শব্দ—আর বিছানায় পড়িয়া ছটফটানি! রাজা দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। রাজ্যের যেখানে যে চিকিৎসক ছিল, সবাই আসিল, সকলে মিলিয়া বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া 'কন্‌সল্টেশন' করিল; দিনে দুইবার করিয়া প্রেস্কৃপশন বদল হইতে লাগিল;—কিন্তু রোগ যেমন তেমনি—রোজ রোজ বাড়িয়াই যাইতেছে।

অবশেষে সকলেই রাজার প্রাণের আশা পরিত্যাগই করিল। রাণীরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল, আমলারা বিষণ্ণ বদন, প্রজারা হায়-হায় করিতে লাগিল—"আহা, এমন রাজা আর হবে না!"

(২)

দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গের সমস্ত এবং মর্ত্তের অনেকগুলি খবরের কাগজের গ্রাহক ছিলেন। সব কাগজ যে তিনি পড়িবার সময় পাইতেন তাহা নহে। তথাপি মূল্য দিয়া লইতেন, কারণ সৎসাহিত্যকে উৎসাহদান করা তিনি নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

একদিন রবিবারে, কাছারি না থাকায়, অলস্য মধ্যাহ্ন যাপনের জন্য তিনি খবরের কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। "মালোয়া টাইম্‌স্" খুলিয়া দেখিলেন, কি সর্ব্বনাশ! ভোজরাজ যে মরো মরো! আহা, বড় ভাল রাজা! যেমন পণ্ডিত, তেমনি পুণ্যবান। কাগজে লিখিয়াছে চিকিৎসায় কিছুমাত্র ফল পাওয়া যাইতেছে না। দেবরাজ আপন মনে বলিলেন, "নাঃ, এ কাজের কথা নয়।" কাগজ ফেলিয়া, চশমা খুলিয়া রাখিয়া হাঁকিলেন "কোই হায়!"

"হুজুর"—বলিয়া একজন বেয়ারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল।

দেবরাজ সংক্ষেপে বলিলেন, "ডক্টর সাহেব।"

পাঁচমিনিটের মধ্যে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেবরাজ কাগজখানা তাঁহাদের হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়।"

পড়িয়া তাঁহারা বলিলেন, "এ কি কাণ্ড! রোগী মরে অথচ এখনও পর্য্যন্ত রোগ নির্ণয় হল না। হুঁঃ—যত সব—"

ইন্দ্র বলিলেন "বড় কুমার, এখনি তুমি যাও—অদৃশ্য ভাবে যাবে। রাজাকে দেখে এসে, আমাকে বল তাঁর কি হয়েচে।"

বড়কুমার হুস্ করিয়া মর্ত্তে নামিয়া গেলেন,—একবারে

ভোজরাজের শয়ন কক্ষে। রাজার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তাঁহার (রণ্টগেন রে অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ) দিব্যদৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিলেন, মস্তিষ্কের মধ্যে একটি পাঠীন (বোয়াল) মৎস্যের "পোনা" শুইয়া আছে, এবং মাঝে মাঝে নড়িতেছে চড়িতেছে। দেখিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বর্গে ফিরিয়া, দেবরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

ইন্দ্র। কিহে বড়কুমার, কি দেখে এলে?

বড়কুমার। মহারাজ! কেস্ সঙীন। ভোজরাজের মস্তিষ্কমধ্যে বোয়াল মাছের একটি জেয়াস্ত ছানা।

ই। অ্যাঁ?—বল কি হে? বোয়াল মাছের ছানা? রাজার মাথায় কি কোরে ঢুকলো?

বড়কু। তাও আমি যোগবলে জানতে পেরেছি। রাজা একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে, বনের মধ্যে এক পুকুরে নেমে আঁজলা আঁজলা ভরে' জলপান করেছিলেন, সেই সময় তাঁর নাকের ফুটো দিয়ে সদ্য ডিমফোটা এক বোয়াল মাছের সূক্ষ্ম ছানা প্রবেশ করে এবং ক্রমে মস্তিষ্কে গিয়ে বাসা বাঁধে। রাজমস্তকের খাঁটি ঘি খেয়ে খেয়ে সে এখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।

ই। কি সর্ব্বনাশ! তবে এখন উপায়?

বড়কু। উপায়—অপারেশন। মাথার খুলি উঠিয়ে ফেলে, মাছটাকে বের কর্‌তে হবে। এ ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

ই। এ ত খুব সাংঘাতিক অপারেশন! তুমি তবে যাও—তাই কর। ছোটকুমার এখানেই থাকুন, সময়টা বড় খারাপ—কখন কার কি হয়! কাল থেকে আমার শরীরটেও কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ কচ্ছে! তুমি গিয়ে রাজার চিকিৎসা কর। মোট কথা—তাঁকে বাঁচাতেই হবে। আহা, বড় ভাল রাজা!

বড়কু। আজ্ঞে, আমি তা'হলে যাই।

ই। হ্যাঁ, আর দেখ, এবার ত অদৃশ্য হয়ে গেলে চলবে না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে যাবে—'রাজাকে আমি বাঁচিয়ে দিতে পারি' একথা বল্‌লেই, তারা তোমার হাতে রাজাকে ছেড়ে দেবে এখন।

বড়কুমার তাঁহার ব্যাগে যন্ত্রপাতি, ব্যাণ্ডেজের সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র ভরিয়া, সেই দিনই যাইয়া ধারানগরীর রাজবাটিতে উপস্থিত হইলেন।

(৩)

রোগীর কক্ষ হইতে সমস্ত লোক বাহির করিয়া দিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া, বড় কুমার ভাবিলেন, "যে রকম শক্ত অপারেশন, আর রোগী যে রকম দুর্ব্বল, এ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে যদি পটল তোলে? তার চেয়ে ক্লোরোফর্ম্ম করি।" (পাঠক ইহা পরিহাস ভাবিবেন না। মূল ভোজপ্রবন্ধে আছে, "মোহচূর্ণেন মোহয়িত্বা শিরঃকপালমাদায়..."—সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৯০০ বৎসর পূর্ব্বেও কবিরাজ মহাশয়গণ ক্লোরোফর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত ছিলেন।)

ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া অশ্বিনীকুমার রাজাকে বসাইয়া, তাঁহার মাথার চামড়া কাটিয়া খুলি খসাইয়া ফেলিলেন। মাছটাকে বাহির করিয়া জলপূর্ণ একটা হাঁড়ির মধ্যে ফেলিলেন। তার পর খুলি বসাইয়া, চামড়া সেলাই করিয়া, ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া রাজাকে আবার শোয়াইয়া দিলেন। আরামসূচক একটা আঃ-শব্দ করিয়া, পাশ ফিরিয়া রাজা ঘুমাইতে লাগিলেন।

দ্বার খোলা হইল। সকলে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাজা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। রোগ হইবার পর, এই প্রথম তাহারা রাজাকে ঘুমাইতে দেখিল। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছিল মশাই?"

অশ্বিনীকুমার হাঁড়ি দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমাদের রাজার মস্তিষ্কের ভিতর ঐ মাছ ছিল।" কি করিয়া মাছ ঢুকিয়াছিল, তাহাও তিনি সকলকে বলিয়া দিলেন সকলে শুনিয়া ত অবাক্।

পূরা ৪৮ ঘণ্টা রাজা ঘুমাইলেন। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলেন, মাথায় আর কোনও যন্ত্রণা নাই—কেবল দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাঁহাকে বলকারক ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হইতে লাগিল।

প্রজারা, আমলারা, চিকিৎসক মহাশয়কে তখনই যাইতে দিল না। বলিল, "রাজা আগে শরীরে বল পান, উঠে হেঁটে

বেড়ান, তখন আপনি যাবেন। কি জানি আবার যদি কোনও উপসর্গ দেখা দেয়!"

সুতরাং অশ্বিনীকুমার কয়েকদিন রহিয়া গেলেন। রাজা দিন দিন সবল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। খুব উচ্চ বেতনে ইঁহাকে তিনি নিজ ষ্টেট-ফিজিসিয়ন নিযুক্ত করিতে চাহিলেন—কিন্তু কবিরাজ মহাশয় রাজি হইলেন না।

অবশেষে তাঁহার বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল। ভোজরাজ রাজসভা মধ্যে, কবিরাজ মহাশয়কে বহুসম্মানে ভূষিত করিলেন। ঘড়া-ঘড়া মোহর, মণি মুক্তা, হাতী ঘোড়া প্রভৃতি তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদত্ত হইল। অবশেষে রাজা বলিলেন, "কবিরাজ মশায়, আপনি ত চল্লেন—আপনাকে রাখতে আমরা পারলাম না। তা, সে ক্ষোভ করা আর বৃথা। আপনার তুল্য মহাপণ্ডিত সুচিকিৎসক ত আমাদের নজরে কখনও আসে নি। তা, একটা কথা আপনার কাছে জেনে নিতে চাই!"

"কি বলুন?"

"আহার বিহার প্রভৃতিতে, কি রকম নিয়ম পালন কর্লে, আমাদের দেহ বেশ ভাল থাকে,—সেইটে আমাদের বলে যান। অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে পথ্য কি কি?"

অশ্বিনীকুমার কহিলেন—

অশীতেনাম্ভসি স্নানং পয়ঃ পানং বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।

এতদ্ বো মানুষাঃ পথ্যং—

শ্লোক শেষ হইল না—ভোজরাজ খপ্ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"মানুষাঃ—আপনি আমাদের 'হে মানুষগণ' বলে সম্বোধন করছেন, আপনি কি তাহলে মানুষ ন'ন? আপনি কে বলুন।"

ভানুমতীর খেল!—কবিরাজ মহাশয় সেখানে নাই। ধরা পড়িয়াই, একদম্ অন্তর্দ্ধান। পারিতোষিকের ঘড়া ঘড়া মোহর, মণিমুক্তা, হাতী ঘোড়া সবই পড়িয়া রহিল। রাজা বোকা বনিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

বিস্ময় কতকটা অপগত হইলে, রাজা বলিলেন, "ইনি নিশ্চয়ই অশ্বিনীকুমার—আমার পিতৃপুরুষের পুণ্যফলে, আমায় এসে বাঁচিয়ে গেলেন। কিন্তু হায় হায় কি আপশোষ, শ্লোকটি যে শেষ হল না! উপদেশটি যে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল! এখন উপায়? কে এই শ্লোকটির যথার্থরূপে পাদ পূরণ করে' দিতে পারে?"

সকলে বলিল, "কালিদাস ভিন্ন আর কেউ এ শ্লোক পূরণ করতে পারবে না। পারবে না কেন? একটা যা তা দিয়ে শ্লোক পূরিয়ে,অক্ষর গুণে দেখিয়ে দেবে এখন। বাধা না পেলে অশ্বিনীকুমার যা বল্তেন, কেবল কালিদাসের মুখ থেকেই তা বেরুবে, কেননা তাঁর জিহ্বাগ্রে মা সরস্বতী বাস করেন।"

কালিদাসের ডাক পড়িল। তিনি আসিয়া পাদপূরণ করিলেন—"স্নিগ্ধমুষ্ণং চ ভোজনম্।" সম্পূর্ণ শ্লোকটি দাঁড়াইল—

অশীতেনাম্ভসি স্নানং পয়ঃপানং বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
এতদ্ বো মানুষাঃ পথ্যং স্নিগ্ধমুষ্ণং চ ভোজনম্॥

অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে তোমাদের উৎকৃষ্ট পথ্য এইগুলি—

"অ-শীতল জলে স্নান, দুগ্ধপান, উত্তমা স্ত্রীগণের সঙ্গ, উষ্ণ এবং ঘৃতাদিযুক্ত দ্রব্য ভোজন।"

—অতএব, পাঠকগণ, এখন হইতে জলকে সামান্য মাত্র গরম করিয়া স্নান করুন, ঘৃত দুগ্ধের বরাদ্দটা কিছু বাড়াইয়া দিন,—দিনের বেলা আপিস যাইতে হয়, গরম ভাত ত খাইয়াই থাকেন,—রাত্রে বেশী দেরী করিয়া বাড়ী ফিরিবেন না—ভাত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে;—এবং, যাঁহাদের একটি মাত্র স্ত্রী, তাঁহারা অন্ততঃ আর দুইটি সুপাত্রীর সন্ধানে ঘটক লাগাইয়া দিন - কারণ শ্লোকে আছে "স্ত্রিয়ঃ"—একবচনও নয়, দ্বিবচনও—একেবারে বহুবচন।

দুইদিক

ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করেন এবং একলক্ষ নাম জপ না
করিয়া জলস্পর্শই করেন না।

রাত্রে—

হিসাবের খাতায় সুদ কষেন ও আঙ্গুলে
টাকা বাজাইয়া মিঠা আওয়াজ শোনেন।
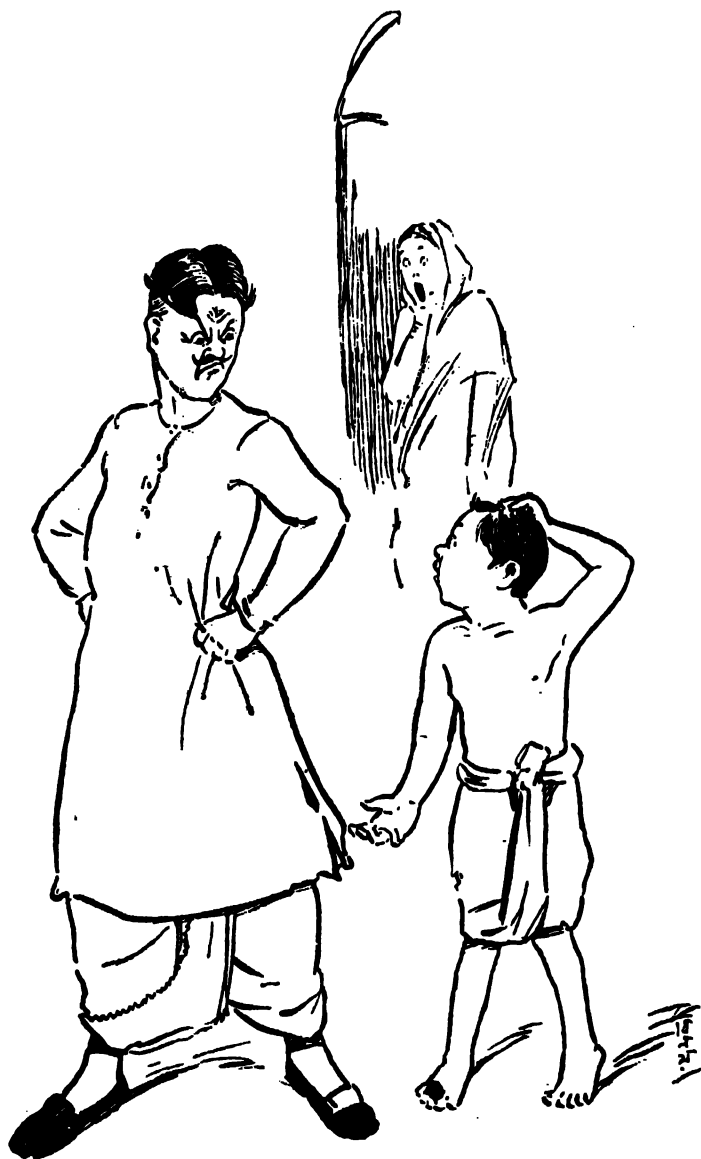
ছেলের স্কুলের 'মাইনে' দিতে পারেন না।

অথচ—

ওস্তাদ রেখে তুম তেরে না-ধুম্—শেখা হয়।

পূজার স্মৃতি

[সফিয়া খাতুন বি-এ]

খুব ছেলেবেলাকার কথা বলছি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সদর রাস্তায় একটী পাগলের গান শুনতে পেলাম। সে গাইছিল—

"এবারে উমা এলে আবার যেতে করব মানা।
মা আমার কৈলাসেতে পায়না খেতে চিনে বাদাম
ঘুঘ্‌নী দানা॥"

পাশের ঘর হতে বাবা চীৎকার দিয়ে পাগলকে ডাকতে লাগলেন। পাগল জবাব না দিয়ে বেশ নির্বিকার পুরুষের মত অতি সাধের একতারা লাউ বাজাতে বাজাতে আমাদের বাড়ীর গেটে এসে দাঁড়াল। তার দু'চোখ হতে ঝর ঝর করে অশ্রু বুক ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সে যেন কত যুগ যুগান্তরের ব্যথার অতীত স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে গান গাইছিল। মনে হয়েছিল যেন কোন স্নেহাতুর পিতা না জানি কোন অজানা দূর দূরান্তে তাঁর একমাত্র অন্ধের যষ্টি নয়নের মণি শিশু কন্যাকে বিয়ে দিয়ে শুধু তার সুখ দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে এই গান গাইছে। তখনও হিন্দুর দুর্গোৎসব যে কি তা বুঝবার ক্ষমতা আমার ছিল না। কিন্তু বাবা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে পাগলটি সত্যিই তার একটী মেয়ের জন্য গান গাইছে। সে মেয়ে তার এমনি মেয়ে যে তাকে সে মেয়ের মত ভালও বাসে আবার পূজাও করে।

আজকাল কত আস্তিক নাস্তিকেরই রং বেরংএর কবিতা ও গান দেখতে পাই কিন্তু এমনি করে শুধু একটী লাইনে অফুরন্ত পিতৃস্নেহকে জাগিয়ে তোলার মত কবিতা কি গান আজও শুনি নাই। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি সেই মহাকবি কা'কে উল্লেখ করে এই গান লিখে গেছেন। হিন্দুর দুর্গোৎসবের সঙ্গে কত অতীত যুগ যুগান্তের সভ্যতার স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে তা কে জানে। আজ বুঝতে পারছি হিন্দুস্থান স্ত্রীজাতিকে কেন মা বলে থাকে। দুর্গোৎসব যে মা আদ্যাশক্তির একটা স্মৃতি। তাই হিন্দু কবিরা স্ত্রীজাতিকে শক্তি স্বরূপা আদ্যাশক্তির অংশীভূত রূপে বর্ণনা করে গেছেন। পৃথিবীর জন্মের পরে তাকে নিয়ে যত যুদ্ধ হয়েছে তার সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ হয়েছিল দেবীযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের কাণ্ডারী ছিলেন এই উমা মেয়েটী। মার্কণ্ডেয় মুনি বর্ণীত চণ্ডীতে দেবীযুদ্ধের বিবরণ পাঠ করে নারীশক্তির অপূর্ব্ব বর্ণনা দেখে ভয়ে বিস্ময়ে ভক্তিতে অভিভূত হতে হয়। ধন্য সে কবি যিনি মহামায়া আদ্যাশক্তিকে সর্ব্বভূতে চেতন, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃ, ভ্রান্তি প্রভৃতি রূপে প্রার্থনা করিতেছেন। এইত আদ্যাশক্তির প্রকৃত বর্ণনা। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সবাই যে নিজ নিজ উপাস্যকে ঠিক এইভাবেই ডেকে থাকে। সত্যই ত আমরা সেই মহাশক্তির মহামায়াতে মায়াবদ্ধ জীব হয়ে আছি। তা না'হলে যে মা ছেলেকে, স্বামী স্ত্রীকে, পিতা পুত্রকে ছেড়ে চলে যেত। তাই বোধহয় হিন্দু আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাই তাঁকে মা বলে থাকে। তিনি যে সন্তানের পিতামাতার মা, সন্তানেরও মা। সেইজন্যই তো তাঁকে মহামায়া বলেছেন। হিন্দুর মৃত্তিকাময় মূর্ত্তিরূপে মহামায়ার পূজা আমরা কোনদিনই হয়ত সমর্থন করব না কিন্তু তাঁদের এই-যে সার্ব্বজনীন মাতৃভাব—সে বড় সুন্দর, বড় পবিত্র। আশ্বিন মাস আসতেই ছোট ছোট শিশুরা পর্য্যন্ত যে আশা করে ব'সে থাকে—তাদের মা আসবে কবে—তা অতি সুন্দর। ধনী, নির্ধন, রাজা, প্রজা, দুঃখী, কাঙ্গালী, কুলী, মজুর, মুটে, মেথর, ছাত্র, কেরাণী সবাই সেই তিনটি দিনের আশায় বসে থাকে। সেদিন হিন্দু-মা সন্তানকে কাঁদিতে বারণ করেন, কারণ সকলের মা যখন দেশে আসছেন তখন আর দুঃখ কি।

কাশী প্রবাসী পিতৃবন্ধু মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথপ্রসাদ জীর পাঠাগার-বাড়ীতে দুর্গোৎসব দেখতে অনেকবারই

গিয়েছি। অবশ্য ছেলেবেলায়। আরতির সময় ছেলেবুড়ো সবাই জোড়হাত হয়ে যখন মা মা বলে ডাকতে থাকেন তখন কা'র না আনন্দ হয়? কিন্তু বিদায় দিনের দৃশ্য—উঃ, সে সত্যই বড় হৃদয়-বিদারক। অ—হিন্দু সমাজের পাঠক পাঠিকা যারা এই সার্ব্বজনীন মাতৃযজ্ঞে যোগদান করেন নাই তাঁরা হয়ত সেটা বুঝতে পারবেন না। কিন্তু—তা এত কষ্টদায়ক যে সেই ছেলেবেলার-দৃশ্য, বোধহয় চৌদ্দ পনের বৎসরের ভেতর দুর্গাপূজা দেখি নাই কিন্তু তা এখনও যেন প্রাণে বিঁধে আছে। সে বিদায়-দৃশ্য সত্যিই কন্যা-বিদায়ের মত। ছোট্ট মেয়েকে স্বামীর বাড়ী পাঠাতে মা বাপ ঠাকুমা, বৌদি ও দাদা দিদির প্রাণ যেমনি কেঁদে উঠে, সেই মাটির তৈরী মূর্ত্তিকে জলে ভাসিয়ে দেবার বেলায় বাড়ীর আবাল বৃদ্ধ বণিতারাও সকলে চোখের জল মুছে তেমনি কাঁদতে থাকেন।

অনেকে হয়ত বলবেন—এটা অজ্ঞানতা। কিন্তু আমি এখানে জ্ঞান অজ্ঞান বিচার করতে আসি নাই। নিজে যদিও মূর্ত্তিপূজার ঘোর বিরোধী, তা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হচ্ছি আজ যদি সেই বিদায় দৃশ্য আর একবার দেখি তা'হলে না কেঁদে থাকতে পারব না। কথা হচ্ছে এই কান্নার ভেতর কতখানি শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ ভালবাসা জড়িত হয়ে আছে তা দেখতে হবে। মূর্ত্তিতে কোন সত্য না থাকতে পারে কিন্তু এই যে পিতা-পুত্র স্ত্রী-কন্যা সকলেরই শ্রদ্ধা ভক্তি ও স্নেহ ভালবাসা পূর্ণ কান্না, তাতে যে সত্য আছে তা চির সত্য, চির উদ্ভাসিত। একেই বলে মহা-মানবের মহা-মিলন, একেই বলে বিশ্ব প্রেমময়ী বিশ্বমাতার জগৎ জোড়া প্রেম। তা কারো অস্বীকার করবার জো নেই, তা সে যত বড় ঘোর নাস্তিকই হউক না কেন। এ যে হিন্দুর "রমজান।"

যে রমজানের পিযুষ-ধারায় একদিন সিরিয়া, স্পেন, মিশর, আরব ও তাতারের তপ্তমরুর বুকে আশার বাণী এনে দিয়েছেন, যে রমজান দুঃখী কাঙ্গালী ও অধঃপতীত ভারতবাসীর প্রাণে স্নেহ করুণার স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছিল, যে রমজান জগৎবাসীকে সাম্য মৈত্রি ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ দেখিয়েছিল, হিন্দুর এ যে সেই রমজান। এযে সেই আত্মাশক্তির আহ্বান—যে আহ্বান প্রতিচীর গুরু যিশু, প্রাচ্যের গুরু হজরত মহম্মদ, বুদ্ধ, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও মহাবীর পেয়েছিলেন। এতে দলাদলি বা জাত্যাভিমান নাই, শুধু আছে মিলন। তাই বলি—এস হে হিন্দু, হে মুসলমান, হে খৃষ্টান, হে বৌদ্ধ—মহামায়ার মহামিলনে যোগ দাও, ভুলে যাও পৌত্তলিকতা, ভুলে যাও তোমার সাকার নিরাকার, ভুলে যাও শাক্ত বৈষ্ণব। শুধু বল মা, তুমি ভারতে মা, তুমি জগতের মা, আমরা তোমার সন্তান, আমরা কেউ বা তোমায় "আল্লা হো আক্‌বর"বলছি, কেউ বা "মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী" বলছি, কেউ বা "গড্" বলছি। কিন্তু আমরা সবাই তোমার সন্তান-সন্ততি; আমাদেরে মিলিয়ে দে মা।" আর হিন্দু! ভুলে যাও তুমি তোমার অন্ধ জাত্যাভিমান, ভুলে যাও তোমার গোঁড়ামি, এ তোমার মহামায়া চান না। শুধু ফুল বেল-পাতা দিয়ে পূজা দিয়ে মায়ের পূজা হয় না। তাঁকে মন-ফুলে পূজা করতে হবে। ব্রাহ্মণ! মনে রেখো মাতৃহারা কাঙ্গালিনী যদি মা না পায় তবে কিসের উৎসব? কিসের এত পূজা আয়োজন? তোমার সবই বিফল হয়ে যাবে। ফুল বেলপাতা দিয়ে দেবীকে ঢেকে রাখ, মণি-মাণিক্য জহরতাদি দিয়ে তোমার দেবীকে নব নব সাজে সাজাও, কিছু হবেনা বলছি—যদি মুচী মুদ্দফরাস সবাইকে তোমার সমান অধিকার না দিয়ে মায়ের পূজা কর। পূজারী! তোমার মায়ের পূজার অর্থ শুধু চালকলা নৈবেদ্য নয়। যদি তোমার মাকে পাদ্য-অর্ঘ্য দেবার মত কোনো জিনিষ থেকে থাকে ত সে হচ্ছে দুঃখী, কাঙ্গালী, মাতৃহারা, গৃহহারা, অন্ধ, আতুর, পঙ্গু ও অন্নহীনের কাছে। তোমার অর্ঘ্য তাদের চোখের জল। যাও, তাদেরে মা ভাই ও বোনের মত ভালবেসে, স্নেহ করে, চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাদেরে নিয়ে তোমার মাকে ডাক, তবে তোমার মা শুনবে। সে সব দুঃখী কাঙ্গালীর 'অশ্রুশিক্ত মৌন বেদনার' অর্ঘ্য এনে তোমার মাকে পূজা দাও। তবেই সে পূজায় শুধু তোমার নয়, সমগ্র ভারতবাসীর কল্যাণ হবে। তা হলেই তোমাদের কবি-বাক্য সার্থক হবে—

মিলেছি আজ মায়ের ডাকে!
ঘরের হয়ে পরের মত
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।

গোবর্দ্ধন গোঁ চরিত

(নক্সা)

[কপিঞ্জল]

গোবর্দ্ধন গোঁ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। শুনা যায় তিনি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম গুড়ের আত্মীয় ছিলেন। তিনি দেখিতে স্থন্দর ছিলেন না, অনেকে অনুমান করেন দীনবন্ধু মিত্রের হোঁদল কুৎকুতের পরিকল্পনা তাঁহাকে দেখিয়াই।

'ঠোঁট হেরে সারে শোক যেন দুটী মোটা জোঁক
অধর রুধির করে পান,
আহা কিবা পদ দুটী যেন গরাণের খুঁটী
কেটে মাটী করে খান খান।'

ইহাও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া লেখা। তদানীন্তন ইংরাজী নবিশেরা বলিতেন সেক্সপীয়ারের কালিবন (Calibon) ডিকেন্সের মিঃ কুইল্প (Mr. Quilp) এবং গোল্ডস্মিথের বো টিব (Bow tib) প্রভৃতির অনেক উপাদান গোবর্দ্ধন গোঁএ অভাব ছিল না।

বড়লোকের শত্রু চিরদিনই থাকে, গোবর্দ্ধনেরও ছিল। একজন রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন স্বর্ণলতার গদাধরচন্দ্র, দুর্গেশনন্দিনীর গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ এবং Merchant of Venice-এর লনসিলট গেবোকে (Lancelot Gobo) যদি একত্র দেখিতে চান আমাদের গোবর্দ্ধনকে দেখুন। এ সকল উক্তি যে একটু অতিরঞ্জিত তাহা গোবর্দ্ধনের বন্ধুগণও বলিতেন এবং প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিই বলিবেন।

বাঙ্গলা দেশে বিস্তৃত এবং বিশ্বস্ত জীবনীর একান্ত অভাব। দেশের দুর্ভাগ্য,এদেশে (Don Quixote) ডন কুইক সোট অনেক জন্মায় কিন্তু (Cervantes) সারভ্যানটিস্ কই?

গোবর্দ্ধন চরিত্রে কোনো দোষ ছিল না একথা বলা চলে না, Man is imperfect, কবিও বলিয়াছেন

'দুর্ব্বল মোরা কত ভুল করি।'

গোবর্দ্ধন অকারণে ও অবলীলাক্রমে মিথ্যা বলিতেন-নিঃস্বার্থভাবে পর-অপকার করিতেন। তাঁহার বিবেক অত্যন্ত নমনীয় ছিল, সত্যের খাতিরে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা গৃহীর কর্ত্তব্য নহে, আমাদের গোবর্দ্ধন গৃহীই ছিলেন। মুখ ও মনের মিলন তিনি পছন্দ করিতেন না। তোষামোদকে তিনি কলা বিদ্যার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন এবং ইহার চর্চ্চায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইত। চাতুর্য্য তাঁহার অনন্য-সাধারণ কিন্তু তদনুরূপ বুদ্ধি হইতে বঞ্চিত থাকায় তিনি অনেক ক্ষেত্রেই সফলকাম হইতে পারিতেন না।

শিশুকাল হইতেই গোবর্দ্ধন উদার প্রকৃতির ছিলেন, আত্মপর জ্ঞান ছিল না, তাহার সঙ্গীগণের মধ্যে যখন কেহ আঁচল ভরা মুড়ি লাড়ু লইয়া তাঁহার নিকট বেড়াইতে আসিত, তখন গোবর্দ্ধন একমুখ হাসিয়া গলা ধরিয়া বলিতেন, 'ভাই, ভাই, একটা নূতন খেলা খেলবি? আয় আমি তোর ফুটকড়াই মুড়কী খাই, তুই আমার খাবি ফুটকুণি গাল।'

কথাটী সামান্য কিন্তু—

'ভিতরে প্রথম ইটখানিতেই গোটা বাড়ীর কথা।'

পাঠাগারেও গোবর্দ্ধন অসাধারণত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যেমন টোলেই প্রতিভার প্রমাণ দেন, ধূর্ত্ত গোবর্দ্ধনও তেমনি স্কুলেই মৌলিকতার ছাপ অঙ্কিত করেন। তাঁহার তদানীন্তন প্রশ্নোত্তরে তাহার সাক্ষ্য দিবে—

'বনস্পতির' অর্থ কি? বানর, কারণ সে-ই আম তেঁতুল খায় এবং বনের কর্ত্তা।

গুরুর স্ত্রীলিঙ্গ কি? মা ঠাকরুণ।

আর্য্যগণ কোথা হইতে আসেন?	এঁড়েদহ হইতে আর্য্যগণ আসেন।
প্রমাণ কি?	আঁকড়ো এঁকা এবং এঁড়ে গরু তাহার প্রমাণ।
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? কেন?	মিরজাফর, কারণ তিনি ইংরাজ সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা পর্য্যন্ত করিয়াছেন।
আকবর কেন হিন্দুর প্রিয় ছিলেন?	কাঁছা দিতেন বলিয়া আকবর হিন্দুর প্রিয় ছিলেন।
টাইগ্রিস কি এবং কোথায়?	বাঘের স্ত্রী, সুন্দরবনে থাকেন।
গ্রীকরা কি জন্য ভারতে আসে?	তাহারা ছাতার শিক বেচিতে আসে।
কি চিহ্ন রাখিয়া যায়?	রেলিব্রাদার্সকে রাখিয়া যায়, সেখানে এখনো তার ছাতা পাওয়া যায়।
আমেরিকা কে আবিষ্কার করেন?	গাই ফকস্
গ্রহের মধ্যে বড় কে?	রাহু, কারণ চন্দ্র সূর্য্যকে সে নাকাল করিতে পারে!
পশুরাজ কে?	কুকুর, কারণ সে বড়ই প্রভুভক্ত।

প্রত্যেক উত্তরেই গোবর্দ্ধনের প্রতিভা প্রতিভাত।

পাঠ শেষ করিয়া গোবর্দ্ধন গ্রাম্য যাত্রাদলে যোগ দিলেন। তাঁহার আকৃতি অসুন্দর হওয়ায় তাঁহাকে দৈত্যের অংশই অভিনয় করিতে হইত। একবার এক পালায় তাঁহাকে অসুর সাজিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। মাথার তাজ খসিয়া পড়িতেছে, পরচুলা উড়িয়া যাইতেছে, কোমরবন্দ শ্লথ হইতে লাগিল কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নাই। সব্যসাচি হয়রাণ হইয়া উঠিলেন। বড় দারোগা যাত্রা দেখিতে আসিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধনের ঐকান্তিকতা দেখিয়া পরদিনই তাঁহাকে কনেষ্টবল করিয়া লইলেন।

একার্য্যেও গোবর্দ্ধনের অশিক্ষিত পটুত্ব। পুলিশ সাহেবকে একদিন বলিয়া ফেলিলেন—Your honour, I can bring tiger's milk sir. হুজুর আমি বাঘের দুধ আনিতে পারি। পুলিশ সাহেব বড়ই রসিক ছিলেন, তিনি গোবর্দ্ধনের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অল্পদিনেই জমাদার পদে উন্নীত করিলেন।

জমাদার হইয়া গোবর্দ্ধন ১৩৷৷৹ সাড়ে তের টাকায় মায় জিন লাগাম এক ঘোটক ক্রয় করিলেন। Don Quixote তাঁহার উপযুক্ত বাহন পাইলেন। সন্ধ্যাকালে যখন সেই অস্থিপঞ্জর সার পক্ষীরাজে আরোহণ করিয়া হস্তপদ দ্রুত সঞ্চালন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন অগ্রসর হইতেন তখন মনে হইত যেন মড়কের প্রেতাত্মা সশরীরে পল্লীপথে ভ্রমণ করিতেছেন! জমাদারী পাইয়া গোবর্দ্ধন ভাবিলেন বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার মসনদ তাঁহারি—His will is Law, তাঁহার ইচ্ছাই আইন।

There a tide in the affairs of man. এই সময় একটী ঘটনা ঘটিল—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র। সরকার ঘোষনা দিলেন বিখ্যাত ডাকাত সর্দ্দার 'রব্বাণীকে' যে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে তাহার হাজার টাকা পুরস্কার। চতুর্দ্দিকে খুব অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

গভীর রাত্রি, সূচীভেদ্য অন্ধকার, কবি হয়ত বলিতেন— "আজ তোরা কেউ যাসনে ঘরের বাহিরে" কিন্তু এমনি ঘনঘোর বরষায় গোবর্দ্ধন গ্রামান্তর হইতে ফিরিতেছেন। হঠাৎ দূরে একটা মশালের খর আলোক দৃষ্টিগোচর হইল। গোবর্দ্ধন সাহসী বলিয়া খ্যাত, তবু তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, তিনি মধুসূদন নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং Royal Readerএর Braggart (মিঃ ব্রাগার্টের) ন্যায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত সম্মুখস্থ বটবৃক্ষে উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার সন্তর্পণিত পুষ্করিণী মনে পড়িল, গৃহ দেবতাকে আকুলকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন এবং রাত্রি প্রভাতে যদি বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে এ কার্য্যে ইস্তফা দিয়া পৈত্রিক কৃষি কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু—

Man Proposes god disposes.

'সে যে আসে আসে আসে' আলো ক্রমে ক্রমে সেই বৃক্ষের দিকে এবং শেষে সেই বৃক্ষের তলে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিম্নে ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি! মামদো কি পেত্না তাহা বিচার করিবার মত সময় বা জ্ঞান তখন গোবর্দ্ধনের ছিল না।

তিন আর থাকিতে পারিলেন না, ভীতি বিজড়িত কণ্ঠে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে ভীষণ শব্দে Avalanche তুষারস্তূপের ন্যায় সেই মূর্ত্তির উপর খসিয়া পড়িলেন হিমালয় হইতে যেমন পড়ে। দুইজনে ধরাশায়ী মরণ আলিঙ্গনে।

'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,' কৃষক কুল ভোরে ভয়াকুল লোচনে দেখিল দুইটা দৈত্য কিম্বা যুগল ভল্লুক বৃক্ষতলে পড়িয়া আছে।

গোবর্দ্ধনের তখন অল্প জ্ঞান হইয়াছে, অন্যমূর্ত্তি তখনো সংজ্ঞাহীন। কৃষকদের যত্নে গোবর্দ্ধন প্রকৃতিস্থ হইলেন,দিবালোক স্পষ্ট হইলে দেখিলেন তাঁহার পতনে আহত ব্যক্তি আর কেহই নহে, ডাকাত সর্দ্দার 'রব্বানী' স্বয়ং যাহাকে অগ্নি বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন সে স্পর্শক্ষম রত্ন। গোবর্দ্ধনের আনন্দের সীমা রহিল না, 'ভবিতব্যানাং দ্বারানি ভবতি সর্ব্বত্র' কৃষকগণের সাহায্যে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া থানায় হাজির করিলেন। গোবর্দ্ধনের অসীম সাহসিকতার কথা দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইল। তাঁহার যশ-সৌরভে দশদিক আমোদিত হইল। সরকার তাঁহাকে প্রতিশ্রুত হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন। তাঁহার আবার পদবৃদ্ধি হইল, তিনি দারোগা হইলেন, কবি কিপলিং লিখিয়াছেন—

'For a long time he served the state,
To the growth of his purse and the girth
of his 'পেট'।

গোবর্দ্ধনের প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল, সিন্দুক টাকায় তমস্থকে ভরিয়া উঠিল এবং উদরও সেই অনুপাতে স্ফীতি লাভ করিতে লাগিল।

মুচিরাম গুড়ের ন্যায় তাঁহার আরও অনেক উন্নতি হইল। কিন্তু সকলেরই একটা সীমা আছে, গোবর্দ্ধনের চরিত্রগত হীনতা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহার কুটিলতা ও ভণ্ডামি নানারূপে নব নব ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তাঁহার পাপ চারিপোয়া পূর্ণ হইয়াছিল, প্রায়শ্চিত্তের সময় নিকট। কোনো অচিন্তনীয় কারণে গোবর্দ্ধনের চাকরী গেল। তাঁহার অর্থের খেদ নাই, পূর্ব্ব-সঞ্চিত প্রচুর অর্থ ও ভূসম্পত্তি তাঁহার এখনো অটুট আছে। তিনি গভর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ জাতির উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন। যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে রেলের গার্ডকে Your Honour বলিয়া রেলের ভাড়া হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, 'গৌরাঙ্গ দেখিলে ধুলায় লুটাই' যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র, তিনি বাঁকিলেন। বলিতেন - ইংরাজ জাতি গুণের মর্য্যাদা জানে না। ইংরাজের অতি বড় শত্রুও বলিবে তাহারা আর কিছু না জানুক এটা পুরা মাত্রায় জানে।

এই সময়ে ধর্ম্মের দিকে গোবর্দ্ধনের একটু দৃষ্টি পড়িল। মাথার টিকি আরও স্থূল ও দীর্ঘ হইল এবং গৃহে দোল ও সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। গোপনে তিনি একটা কর্ত্তা-ভজার দলও করিয়াছিলেন এবং একজন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হইবেন এরূপ আশা করিয়াছিলেন—It is the last infirmity of a noble mind, বড় মনের এ একটা ব্যাধি।

মানব জীবন পদ্মপত্রের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। গোণা দিন, দিন ফুরাইয়া আসিতেছে—

'লোকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল প্রাণেপ্রাণে
কোথায় মঙ্গল তোমার আয়ু ক্ষয় দিনে দিনে।'

গোবর্দ্ধন রথে বামন দর্শন করিয়া পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার আকাঙ্ক্ষায় শ্রীধাম পুরী দর্শনে একান্ত উৎসুক হইলেন। পরপারের পাথেয় সংগ্রহ করা চাইত।

শুভ কি অশুভ ক্ষণে তিনি বিখ্যাত (St. Lawrence) সেণ্ট লরেন্স জাহাজে যাত্রী হইলেন, তখন পুরী যাইবার রেল হয় নাই। জাহাজে সাড়ে সাত শত যাত্রী ছিল। ভীষণ ঝঞ্ঝায় গভীর রাত্রে অকূল সমুদ্রে সে জাহাজ জলমগ্ন হয়, কোথায় কেহ জানে না। একটী প্রাণী রক্ষা পাইল কিনা তাহার সংবাদ কেহ পাইল না। গোবর্দ্ধন সেই জাহাজে ছিলেন, তাঁহারও কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কয়েক বৎসর হইল একদিন এক নুলিয়া বালক একটী বোতল সমুদ্র সৈকতে দেখিতে পাইল, তাহা বোধহয় বহুদূর হইতে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে এখানে আসিয়া লাগিয়াছে। আমরা ঘিরিয়া দাঁড়াইলাম, বালক বোতলটী খুলিল। তাহার মধ্যে কিছুই নাই, কেবল এক খানি কাগজ, বোধ হয় কোনো

যাত্রী জলমগ্ন জাহাজ হইতে ভাসাইয়া দিয়াছে। এরূপ রীতি যে আছে তাহা সকলেই জানেন। কাগজ খুলিয়া দেখা গেল বাঙলা অক্ষরে প্রথমেই লেখা—

'কোথায় আনিলে
আনিয়ে ভব সাগরে তরঙ্গে তরী ডুবালে।

তারপর—

'জীবনে বাকী বড় রাখিনি কিছু
ছুটেছি প্রাণে প্রাণে পাপেরি পিছু।
করেছি বহুবিধ গর্হিত কাজ
ভীত সে ভণ্ডামি স্মরিয়া আজ।
যেমন হীনমনা তেমনি ক্রূর
পুণ্যে লাথিমেরে করেছি দূর।
বুকেতে কাপুরুষ মুখেতে বীর
সাক্ষী আজি এই আঁখির নীর।
লাঙল ছিল ভাল ছিল না ক্লেশ
লেখনী দেয় নাই সুখের লেশ।
সুমুখে নোনা জলে উঠিছে ঢেউ
ত্রাতা কি পরিজন নাহিক কেউ,
দিয়েছি ব্যথা যারে দিয়েছি দুখ
হাসিছে চারিদিকে সেসব মুখ।
পাতালে বলিরাজা ডাকিছে ভাই
নরকে গৃহ কেনা কোথায় যাই ?
পাপীরে ক্ষমো হরি উঠিছে জল
আয়রে সুশীতল সাগর তল।'

নীচে নাম সহি—গোবর্দ্ধন গোঁ।

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে গোবর্দ্ধন পড়িয়াছিলেন—

'Between the devil and the deep sea'

যাহা হউক, তিনি জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অন্তিম কালে হরিনাম করিয়া করিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন তিনি এখনো বাঁচিয়া আছেন এবং দ্বীপ বিশেষে বহুরূপীর ব্যবসা করিতেছেন—ইহার কোনো প্রমাণ নাই।

অতএব—শান্তি শান্তি শান্তি!

দুমিনিট

[সব্‌জান্তা]

চা বাগানের ম্যানেজার পেণ্ডেলবারী সাহেব সেদিন বিলাত গিয়েই একটা ফুটফুটে মেম বিয়ে করে এসেছে। বেচারার মেম কিন্তু হিন্দি জানে না। খানসামা বেটা কিন্তু হিন্দুস্থানী। একদিন কি কাণ্ড হয়েছে শুন বলছি। সাহেব বাঙলোয় নেই। ডিনারের সময় হয়ে এসেছে, খানসামা মেম সাহেবকে খানা দিয়ে গেল। কিন্তু চামচ্‌খানা দিতে সে ভুলে গিয়েছিল। হিন্দিতে "স্পুন"কে কি বলে তা'ত আর মেম জানে না, তাই কোনরকমে হিন্দি ইংরেজীর খিচুড়ী করে বল্লে—"বয়, হামকো একঠো চুমা দেও।" বেয়ারা তো অবাক! মেম একি বলে! তাকে আমি চুমা দেব! বাপরে, সাহেব যে একেবারে খুন করে ফেলবে। তাই সে ভয়ে ভয়ে শুধু বলতে লাগল "হুজুরকো বাৎ।" মেম কিন্তু ভারি চটে গেল। তিনি রেগে মেগে বল্লেন "ইউ ব্লাডি, আবি হামকো চুমা দেও or get out." ঠিক সেই সময় সাহেবও এসে হাজির। সাহেবকে দেখে মেমেরও অভিমান বেড়ে গেল। এমনি বোকা চাকর রাখার জন্য সাহেবকে যথেষ্ট গাল দিলেন। মেমের সব কথা শুনে সাহেব বল্লে "বয়কে তুমি কি বলেছিলে?" মেম বল্লে "কেন? বলেছি—হামকো একঠো চুমা দেও।" সাহেব মেমের কথা শুনে লজ্জায় মুখে রুমাল দিয়ে বল্লে "উঃ সেম্ সেম্!" মেম ব্যস্ত হয়ে বল্লে "কি হয়েছে?" "আর কি হবে, Do you like that your boy should kiss you?" মেম লজ্জায় মাথায় হাত দিয়ে শুধু বল্লে "ওঃ ড্যাম, ড্যাম্ ইণ্ডিয়া।"

নিত্যানন্দের সংসার

[শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন]

প্রায় পাঁচশত বৎসর গত হইয়া গেল, দেশে যে সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছিল, আজিও তাহার নিরসন হয় নাই। বরং সে দিনের অপেক্ষা আজিকার সমস্যা আরো জটিলতর, সমাধানের পথ আরো বিঘ্ন বহুল, বাধা সংকুল,—অবস্থা সমধিক শোচনীয়। সে দিন—জাতীয় জীবনে পরাধীনতার শৃঙ্খল এমন অষ্টপাশের সুদৃঢ় কর্ষণে চাপিয়া বসে নাই। মুসলমান অল্প দিন হইল এ দেশে আসিয়াছে,—কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যেই নবাগত বৈদেশিক সভ্যতা,—বৈদেশিক আচার ব্যবহার দেশকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, দেশবাসী ভোগবিলাসের মোহমদিরায় মজিয়া আত্মনাশের পথে দ্রুততর গতিতে ছুটিয়াছে, তথাপি বিগত স্বাধীনতার মৃত সঞ্জীবনী ধারা একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় নাই। হৃদয় বিশেষে আপন স্বরূপে উত্তাল তরঙ্গে, কোথাও বা শীর্ণ স্রোতে, কোথাও বা ফল্গু প্রবাহে তাহা তখনো দেশকে সরস, সজীব এবং সতেজ রাখিয়াছিল। তখনো বাঙ্গালার 'নৌবাট হী হী রব' শত্রুর হৃদয়ে ভীতির স্পন্দন তুলিত, তখনো বাঙ্গালীর করী তুরগ পদাতী সৈন্যের প্রখর প্রতাপ দিল্লীর সুদুর্গম সম্রাট প্রাসাদে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিত। গৌড় সিংহাসন বিদেশীর করায়ত্ত হইলেও রাজ্য রক্ষা করিত বাঙ্গালী; তখনো সেনাপতি বাঙ্গালী, মন্ত্রী বাঙ্গালী, কোষাধ্যক্ষ বাঙ্গালী; সিংহাসনের বত্রিশ পুত্তলিকা তখনো অতীত গৌরবে গর্ব্বান্বিত ছিল, এমন কাপুরুষের জড়ত্বে চৈতন্যহীন হয় নাই। গণেশ, প্রতাপ, কেদার ইহার ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যঞ্জনা;—কিন্তু কাল তখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দেশের রূপ বদলাইয়াছে, দেশবাসী জন সাধারণ নূতন পথে চলিয়াছে, তাই দেশের দুর্দ্দশায়, সমাজের বিশৃঙ্খলায় বিগলিত প্রাণ সহৃদয়গণের নেত্রে যে নব গঙ্গোত্রীর প্রবাহ বহিয়াছিল সুরধুনী তীরে নবদ্বীপে তাহারই পুঞ্জীভূত মূর্ত্তি আকার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—যুগাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব। দেশকাল পাত্রের উপযোগী—অথচ সার্ব্বজনীন এবং চিরন্তন যে মহাবাণী তিনি প্রচার করিয়াছিলেন—তাহাই এ যুগের একমাত্র সত্যবার্ত্তা। গত চারিশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর নব নব চিন্তা ধারায় তাহা নব নব প্রতিভায় বিকশিত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য—জাতি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বান্তঃকরণে সে মহাসত্য গ্রহণ করিয়া আজিও সাগর সঙ্গমের সন্ধানে সমর্থ হয় নাই। অভিশপ্ত সগর সন্তানগণ আজিও মুক্তিলাভে কৃতার্থ হইতে পারে নাই!

যাঁহারা বলেন ভগবান ভাষ্যকারের প্রচারিত মায়াবাদ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, যাঁহারা বলেন শ্রীচৈতন্য প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম দেশের ক্ষত্রশক্তিকে বিলুপ্ত করিয়াছে, তাঁহারা যুগধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণে সচেষ্ট হইয়াছেন কিনা জানি না। বাঙ্গালার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের আমূলকাহিনী যাঁহারা জানেন, অপ্রত্যাশিত ঘটনা পরম্পরায় মুক্তিকামী বাঙ্গালীর ক্ষত্র প্রচেষ্টার শোচনীয় বিফলতার ইতিকথা যাঁহারা অবগত আছেন—তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই যে রুধির প্রদিগ্ধ স্বাধীনতা এ-দেশে এ কালের ধাতু প্রকৃতির অনুকূল নহে, সে কালেও অনুকূল ছিল না। আত্মশুদ্ধি না ঘটিলে মনোভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে, যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীর দ্বারাই যে দেশের সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইতে পারে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। ভবানন্দ, কৃষ্ণচন্দ্র, মীরজাফর, জগৎশেঠ ইঁহারা যে বৈষ্ণব ছিলেন, ভরসা করি এমন কথা কেহ বলিবেন না। অবশ্য—শুষ্ক—আচারের কঙ্কালকে আঁকড়িয়া ধরিয়া হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করা, খোল কর-তালের সম্মিলিত রোলের সঙ্গে সঙ্গে—ভগবৎ প্রসঙ্গের ব্যঙ্গাত্মক প্রাণহীন উচ্চ চীৎকার করা, অথবা অন্তরে পূতিগন্ধ লুকায়িত রাখিয়া দেহ খানিকে কণ্ঠী তিলকে সুশোভিত করা যে ধর্ম্ম নহে, একথা তো কেহ

অস্বীকার করে না। ত্যাগের ছদ্ম আবরণে ভোগের যে লালসাতুর বীভৎসতা সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, বৈরাগ্যের গৈরিক অন্তরালে বিলাসের যে অভিনব পন্থা দেশকে প্রলুব্ধ করিতেছে, ধর্ম্মের নামে মঠ মন্দির গড়িয়া প্রণামী গ্রহণ, দীক্ষাদান প্রভৃতি যে ঘৃণিত ব্যবসায় সুরু হইয়াছে, ইহার সর্ব্বতোভাবে উচ্ছেদ সাধন যে সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয় এ কথা কে না বলিবে? কিন্তু শ্রীচৈতন্য দেব তো ইহার জন্য দায়ী নহেন, তাঁহার বাণী তো এ বার্ত্তা প্রচার করে নাই। তাঁহার উপদেশ সুস্পষ্ট, তিনি নিজের জীবনে আচরণ করিয়া, ভক্তদের দ্বারা আচরণ করাইয়া সংসারী হইতে সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর মানবের শৃঙ্খলমুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অধিকার এবং রুচি ভেদে ঋজু কুটীল নানা পথবৈচিত্রের কথা গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সঙ্গে আলোচনায় বেশ পরিস্কার রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আজ তাহার প্রয়োজন আছে কিনা জানি না, তবে অসাম্প্রদায়িক ভাবে কালোপযোগী প্রণালীতে এই সমস্ত বিষয় যে বিশদরূপে আলোচিত হওয়া উচিত, এই রূপই আমাদের বিশ্বাস। সুখের বিষয় প্রবাসী পত্রিকা কিছুদিন পূর্ব্বে এই শ্রেণীর আলোচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম মধ্যস্থবাদ স্বীকার করেন না, অর্থাৎ মধ্যে একজন গুরু থাকিয়া যে মানুষকে মুক্তির দ্বারে পৌছাইয়া দিতে পারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে এ বিশ্বাসের স্থান নাই,—তথাপি পত্রিকা পরিচালন ব্যবসায়ের খাতিরেই হউক—অথবা স্ত্রী শিক্ষার দিক দিয়াই হউক ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শত শত যুবকের দীক্ষাদাত্রী, গুরুস্থানীয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া সারদামণি দেবীর জীবনী আলোচনা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমানে এরূপ আলোচনার আবশ্যকতা যে কত, তাহা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এই অমানী-মানদ, তরু সদৃশ সহিষ্ণু মহামানবের লোকোত্তর চরিত আলোচনার শক্তিও আমাদের নাই। আজ দিক্ দর্শন হিসাবে তাঁহার অভিন্ন হৃদয় সহচর অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ দেবের জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রীনিত্যানন্দ দেব—আকুমার সন্ন্যাসী, বীরভূমের একচক্রা গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান, পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, সেই সময় একজন সন্ন্যাসী একচক্রায় আসিয়া আপনার পথের সঙ্গী করিবার জন্য—সেবা শুশ্রূষার জন্য হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর নিকট তাঁহাদের এই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। সেকালের গৃহস্থের এই আতিথেয়তা ও দ্বাদশ বৎসরের বালকের এই পিতৃ মাতৃভক্তি বৈষ্ণব কবিগণের লেখনীকে পবিত্র করিয়াছে, কিন্তু একালে তাহার স্থান কোথায়? সন্ন্যাসী একচক্রা ত্যাগ করিলেন, বালক নিতাই কোন্ অজানা পথে সেই অচেনা যাত্রীর সঙ্গী হইলেন, তাহার পর কত দিন গেল, কত দেশ দেশান্তরে ফিরিতে হইল; কালে সেই সন্ন্যাসীর লোকান্তর ঘটিল। অতঃপর একদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীপাদ্ মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—তুমি নবদ্বীপে যাও। নিতাই নবদ্বীপে আসিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে অগ্রজের মর্য্যাদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীবাস অঙ্গনে তখন নাম কীর্ত্তন সুরু হইয়াছে, এইবার নদীয়ার রাজপথে প্রকাশ্য ভাবে প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইল। এই কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইলেন হরিদাস এবং নিত্যানন্দ, একজন বিশ্বাসের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, সহিষ্ণুতার অবতার, আর একজন অক্রোধ পরমানন্দ করুণার সাকার বিগ্রহ। ধর্ম্মকে কেমন করিয়া জীবনের সঙ্গে গ্রহণ করিতে হয়, স্বীয় মতের উপর কিরূপ সুদৃঢ় নিষ্ঠা থাকিলে তাহা সর্ব্ববিধ বিরুদ্ধতাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, যবন হরিদাসের জীবন তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। ক্ষমতা বিষমন্ত্রের উদ্যত ফণা কি করুণা মন্ত্রে শান্ত করিতে হয়, অত্যাচারের দৃপ্ত দাবানল আপনার শোণিত দানে কেমন করিয়া নির্ব্বাপিত করিতে হয় জগাই মাধাই উদ্ধারে নিত্যানন্দের আচরণ তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অধুনা সমাজ সংস্কারের কথা উঠিয়াছে, দেশের উন্নতি কল্পে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার অঙ্গ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা, উপযুক্ত কর্ম্মী,

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ

এবং জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল প্রণালীবদ্ধ কার্য্যের অভাবে যে তাহা সফল হইতেছে না সেদিকে তো কাহারো দৃষ্টি দেখিতেছি না। সহরের বুকে সভা বসাইয়া উচ্চ চীৎকারে আকাশ কাঁপাইয়া বিংশতি মুদ্রার রসগোল্লা গলাধঃকরণে যে অস্পৃশ্যতা দূরীভূত হয় না, ইহা বুঝিবার লোক যদি বাঙ্গালায় না থাকে, তবে তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? এই চৌরস পথটী হয় তো রাজনৈতিক চালবাজীর অথবা নামকরণ অর্থ উপার্জ্জন প্রভৃতি স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে প্রশস্ততর হইতে পারে, কিন্তু সমাজের সংবাদ যাঁহারা জানেন তাঁহারাই বলিবেন সম্পূর্ণ কার্য্য সংসিদ্ধির একমাত্র সহায়ক খ্যাতিহীন পল্লীবীথির সঙ্গে ইহার কোনো সংস্রব নাই। সাধু জনেরও করণীয় আছে অনেক স্বীকার করি, তথাপি একজন অসাধুকে তুমি অসাধু নও বলিয়া আলিঙ্গন দিলেই যে তাহার অসাধুতা অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় ইহা স্বীকার করিতে পারি না। অস্পৃশ্য যে—তাহাকে আপনার অস্পৃশ্যতা আপনি দূর করিতে হইবে; শিক্ষায়, চরিত্রে, আচারে ব্যবহারে আপনাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে; অবশ্য সে পক্ষে অগ্রগামীগণের সাহায্যে ও সহানুভূতি বিশেষ আবশ্যক। নতুবা আমলাতন্ত্রের ভেদনীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এক পক্ষ যদি অসম্ভব দাবী করিয়া বসেন, কিম্বা অপর পক্ষ যদি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হীনতর আপোষে মিলন রচনা করেন, তাহাতে অস্পৃশ্য-স্পৃশ্য উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন। মিলন হয় সমানে সমানে, পরস্পরের যোগ্যতাই পরস্পরকে সৌখ্যসূত্রে আবদ্ধ করে। আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া তবে অন্যের সম্মুখীন হইতে হইবে, এ কথা উভয়পক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে। চোরের দলে ভিড়িয়া সাধুও চোর হইয়া যায়, আবার সাধুর সংসর্গে চোরও সাধুতা লাভ করে। সুতরাং সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে—এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত। অনেকেই জানেন তথাকথিত অনাচরণীয় সম্প্রদায়ের সুবর্ণ বণিক জাতীয় উদ্ধার। দত্ত মহাশয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রভুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম বলিয়া পূজা প্রাপ্ত হন। উদ্ধারণ দত্ত শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয়তম ভক্ত ছিলেন।

"অবধৌত নাহি ছিল জাতির কথাটী,
উদ্ধারণ দত্ত যাঁর ভা'লে দেয় কাঠী।"

উদ্ধারণকে তিনি এতই স্নেহ করিতেন। কিন্তু এই উদ্ধারণ দত্ত অথবা যে তথাকথিত নীচ জাতীয় "ঝড় ঠাকুর" চৌষট্টি মোহান্তের একজন রূপে আজিও সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে সম্মানিত, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলেও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই যাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রকৃত অধিকারী কে। কেমন করিয়া সমাজের অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হয়, সে স্পর্শ-মণি তোমার হৃদয়ে আছে কি, যাহার স্পর্শে লৌহ কাঞ্চনে পরিণত হইবে? সে চরিত্রবল তোমার কোথায়, যাহার যাদু দণ্ড আমার সমস্ত দৈন, সমস্ত হীনতা মুছিয়া ফেলিয়া আমাকে মনুষ্যত্ব লাভে উদ্বুদ্ধ করিবে? এ প্রবন্ধে আমরা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি না, আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য ইহাই,—যে যদিও ধনী দরিদ্র এবং তথাকথিত শিক্ষিত অশিক্ষিত লইয়া সমাজে নব জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, কাঞ্চন-কৌলীন্য বিস্তার লাভ করিয়াছে, তথাপি গুণের পূজা আজিও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। গুণবান সজ্জন ব্যক্তি যে জাতীয় হউন, পল্লী সমাজে তিনি কখনো অনাদৃত হইয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। সুতরাং এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে আপন অন্তরের সর্ব্ববিধ অস্পৃশ্যতা সর্ব্বাগ্রে দূর করিতে হইবে, এবং যে অস্পৃশ্য আছে, সমাজে তাহাকে অন্তরে বাহিরে সকল রকমে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। প্রচুর রজত মুদ্রা না দিলে স্বজাতীয়া একটী কৃষ্ণাঙ্গী বালিকা যদি আমার নিকট অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে অন্য জাতির অস্পৃশ্যতা নাশে অগ্রসর হওয়া আমার ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? একত্র ভোজনে যদি অস্পৃশ্যতা দূর হইত তাহা হইলে এতদিন তাহার অস্তিত্ব থাকিত না, কারণ ছত্রিশ জাতি মিলিয়া আশ্রম বিশেষে গিয়া বাবুর্চ্চি নামধেয় সূপকার পাচিত ভোজ্য গ্রহণে আমরা অনেক দিন হইতেই অভ্যস্থ হইয়াছি, কিন্তু সমাজের অস্পৃশ্যতা পাপ সে দিনেও যেমন ছিল, আজিও তো তেমনি রহিয়াছে।

সমাজের প্রকৃত সংস্কার কার্য্য যে-কালে এত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ শ্রীচৈতন্য পার্ষদগণ তাহাতে

কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার অনেক কাহিনী উল্লিখিত আছে। শ্রীনিত্যানন্দের সমগ্র জীবন আলোচনার স্থান নাই, অক্ষমতার কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাত্র আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীলাচলে অবস্থিতি করিতেছেন। বিরহের অসহ আকুলতায় প্রাণ তাঁহার অধীর হইয়া উঠিয়াছে, কান্ত প্রেম বিষে অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। দিন যায়,—রাত্রি আসে; আহার নাই, নিদ্রা নাই—মুখে শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি। সন্ন্যাস ক্লিষ্ট গোরা তনু দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কষিত কাঞ্চন কান্তি মলিন হইয়া গিয়াছে, ভক্তগণের উৎকণ্ঠার আর অবধি নাই। রায় রামানন্দ স্বরূপ দামোদর নিশিদিন বিনিদ্র নয়নে পাশে বসিয়া অবিরাম কৃষ্ণ নাম শুনাইয়া ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এমনি একদিন মহাপ্রভু—

বিরলে নিতাই লইয়া হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কহে ধীরে ধীরে,
জীবেরে সদয় হঞা হরিনাম লেওয়াও গিঞা
যাও নিতাই সুরধুনী তীরে।"

নিত্যানন্দকে সংসারে ফিরিয়া দার পরিগ্রহে অনুরোধ করিলেন। নিত্যানন্দের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এতদিন পরে আজ তোমার এ কি আদেশ প্রভু! তুমি কেন তবে সন্ন্যাসী হইলে? প্রেমময়ী গুণবতী ভার্য্যা, স্নেহময়ী মাতা, অমানুষী প্রতিভা, অসাধারণ শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, অলৌকিক রূপলাবণ্য, অতুলনীয় যশ-খ্যাতি, গুণমুগ্ধ আত্মীয় স্বজন ভক্ত বন্ধু, তোর কিসের অভাব ছিল নিঠুর! যৌবনে যুবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া, অভাগিনী বিষ্ণু প্রিয়ার শিরে বাজ হানিয়া, জননীর নয়নের মণি তুই—বিশ্বরূপের শোকে পাগল, স্বামীর শোকে মর্ম্ম পীড়িতা স্থবিরাকে কাঁদাইয়া তুই কেন সংসার ছাড়িলি, আর আমি আকুমার সংসার ত্যাগী—আমার প্রতি তোর এই আদেশ? প্রভু তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন—

"প্রতিজ্ঞা করিনু আমি আপনার মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥
তুমিও রহিলে যদি মুনি ধর্ম্ম ধরি।
আপন উদ্দামভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
ভক্তি রস দাতা তুমি তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার তুমি কেনে বা করিলে॥
এতেক আমার বাক্য সত্য যদি চাও।
তবে অবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন॥"

নিত্যানন্দ ভাবিতে লাগিলেন—সন্ন্যাসী হইয়া কি করিয়া এমন কাজ করিব? চিরদিনের তরে এ কলঙ্ক পশরা শিরে না তুলিয়া দিলে কি তোমার তৃপ্তি হইতেছে না? লোকে কি বলিবে বল দেখি, পরছিদ্রান্বেষী সমাজ, তার উপর ধৌত শুক্ল বস্ত্রে মসীবিন্দুর মত সন্ন্যাসীর আচার ভ্রংশতা তো সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কিন্তু আর তো প্রতিবাদের উপায় নাই, চিন্তা করিয়া কোন ফল নাই, আদেশ যখন—তখন যাইতেই হইবে। নিত্যানন্দ সে আদেশ গ্রহণ করিলেন, জীবনের আজন্মপোষিত কামনার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের ধারণা, সন্ন্যাসের সাধনা সমুদ্রসৈকতে প্রভুপদে বিসর্জ্জন দিয়া, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গ চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বাঙ্গালার পথে অগ্রসর হইলেন।

আজ বাঙ্গালী বিবাহের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায়। অন্ধ খঞ্জ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ব্যাধিগ্রস্ত জরাতুর বিবাহের নামে উন্মাদ, বিবাহ যাহার অদৃষ্টে জোটে না তাহার ব্যভিচারে সমাজ অতিষ্ঠ্য, বিবাহতে অত্যাচারও বড় কম নাই, কামচরিতার্থতাই এখন মানব জীবনের একমাত্র কাম্য! সে কালে কিন্তু এতটা ছিল না। প্রকৃত বৈরাগ্য বশতঃ সংসারত্যাগ তখনো নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীলক্ষ্মীপতিপুরী, শ্রীকেশব ভারতী প্রভৃতি বাঙ্গালী সন্ন্যাসীগণের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তদানীন্তন গৌড়েশ্বর সম্রাট হুসেন সাহের অন্যতম সচিব ও ধনাধ্যক্ষ শ্রীরূপ সনাতন ভ্রাতৃদ্বয়ের তীব্র বৈরাগ্য আজীবন ত্যাগী সন্ন্যাসীর আদর্শস্থল হইয়া আছে। সপ্তগ্রামের ধন কুবের যুবক রঘুনাথ দাসের সংসার ত্যাগ কাহিনী আজিও লোকলোচনে অশ্রু সঞ্চার করে। সুতরাং সেকালের দিনে শ্রীনিত্যানন্দের প্রৌঢ় বয়সে এই সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন যে কত বড় মহত্ত্ব, কি অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার, কি অপূর্ব্ব দাস্য নিষ্ঠার পরিচায়ক, এ কালের অনেকে তাহা বুঝিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

নিত্যানন্দ-গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশনামী একটী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এই জন্য বৈষ্ণব গ্রন্থে তিনি অবধূত এবং স্বরূপ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। স্বরূপ দামোদরের পরিচয়ে আমরা জানিতে পারি –

"সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্রত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ"॥

নিত্যানন্দদেবও শিখা এবং যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর প্রবর্ত্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের নিদর্শন যোগ-পট্ট গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিল না। অম্বিকা নিবাসী সূর্য্যদাস সরখেল মহাশয় আপনার জাহ্নবা এবং বসুধা নাম্নী দুই কন্যাকে নিত্যানন্দের করে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কুলাচার্য্য গণ নিত্যানন্দকে বটব্যাল নামে পরিচিত করিয়াছেন। জাহ্নবাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। বসুধার গর্ভে নিত্যানন্দের বীরভদ্র নামে এক পুত্র এবং গঙ্গানাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের পরে পত্নীসহ নিত্যানন্দ খড়দহে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। অতঃপর কখনো তিনি জন্মভূমি একচক্রায় আসিয়াছিলেন কিনা জানিতে পারা যায় না। একচক্রাগ্রামে বীরভদ্রের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবঙ্কিমরায় বিগ্রহ আজিও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর জাহ্নবা দেবীই তদানীন্তন বৈষ্ণব সমাজের নেত্রী স্থানীয়া ছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার পবিত্রতম জীবন, মহনীয় আদর্শ এবং বহু মূল্য উপদেশ শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কিত পথে বৈষ্ণব সমাজকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। ইনি যখন শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শনে গমন করেন, বৃন্দাবনস্থ শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব মণ্ডলী তখন বিশেষ ভক্তি সহকারে পরম সমাদরে ইহাঁর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর খেতরীর বৈষ্ণব সম্মিলনে নেতৃত্ব করিয়া যাজী গ্রাম যাইবার পথে জাহ্নবাদেবী একবার একচক্রায় আগমন করেন। সে সময় কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আচার্য্য, রঘুপতি বৈদ্য, মনোহর উপাধ্যায়, পরমেশ্বরী দাস, মুকুন্দ প্রভৃতি দেবীর অনুযাত্রী ছিলেন। পুত্র বীরভদ্র ইহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া— পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণে, শ্রীচৈতন্যদেবের অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বীরভদ্রের সে কার্য্যের সহায় ছিলেন ঠাকুর নরোত্তম, আচার্য্য শ্রীনিবাস, এবং প্রভু শ্যামানন্দ। তাহার পর প্রায় দুইশত বৎসর অতীত হইল, সমাজের অগ্রগতিরুদ্ধ হইয়াছিল। এতদিনের পর উত্তরাধিকারী মিলিয়াছে, পথ প্রদর্শক আসিয়াছে। দূরে— সবরমতি তীরে বীরাবধূত মহাত্মার বীরবাণী ধ্বনিত হইতেছে, হিমাদ্রী হইতে কন্যা কুমারী, গুর্জ্জর হইতে কামরূপ, আসমুদ্র ভারত পরিব্যাপ্ত করিয়া সে মুক্তিবাণীর প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে, বাঙ্গালী কি তাহা শুনিবে না?

অন্ধের অন্ধকার

[রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর]

আমি অন্ধ। আমার কাছে এখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার। কিছুদিন পূর্ব্বে কিছুই অন্ধকার ছিল না, তোমাদের দশ জনের মত আমিও আলোক দেখিতে পাইতাম; তোমাদের দশ জনের একজন আমিও ছিলাম। এখন সব অন্ধকার। যে আলোক দেখিয়াছে, যে সূর্য্যরশ্মি দেখিয়াছে, যে পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না দেখিয়া পুলকিত হইয়াছে, যে আত্মীয় স্বজনগণের সহাস্য বদন দেখিয়া আনন্দলাভ করিয়াছে, তাহার নিকট একদিন সব অন্ধকার হইয়া গেলে তাহার যে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা হয় তাহা তোমরা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কেমন করিয়া বুঝিবে? আমি সে কথা তোমাদিগকে কি বলিয়া বুঝাইব? অন্ধের অন্ধকারের কথা কোন্ ভাষায় প্রকাশ করিব? অন্ধের কথা তোমরা শুনিবে কি?

আমি জন্মান্ধ নহি; তাহা হইলে ত কোন গোলই ছিল না। এখন যাহাকে আমি অন্ধকার বলিতেছি তাহা ত আমার নিকট অন্ধকার বলিয়াই বোধ হইত না। আলোক কাহাকে বলে, অন্ধকার কাহাকে বলে, তাহা ত আমি বুঝিতেই পারিতাম না। আমার কাছে আলোক অন্ধকার কিছুই থাকিত না; আমি এই পৃথিবীকে শব্দময়ী, স্পর্শময়ী বলিয়াই মনে করিতাম। আমি ত তাহা হইলে তোমাদিগকে দেখিতে চাহিতাম না; তোমাদের কথা শুনিয়া, তোমাদের স্পর্শ অনুভব করিয়াই অতুল আনন্দ উপভোগ করিতাম। আমি জন্মান্ধ নহি; বাইস বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিশক্তি ছিল—আমি সব দেখিতে পাইতাম। তবে তোমরা অনেকে-না-হয় খালি চক্ষুতে দেখিতে পাইতে, আমি-না-হয় চস্‌মা ব্যবহার করিতাম। কতজন ত ফ্যাসনের খাতিরে চস্‌মা পরিত, আমি ক্ষীণদৃষ্টির জন্যই চস্‌মা ব্যবহার করিতাম। এখন আমি অন্ধ।

জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজের স্কুল বিভাগ হইতে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই; পনরটাকা বৃত্তিও পাইয়াছিলাম। তাহার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হই। তখন আমার পিতা মাতা বর্ত্তমান ছিলেন, দাদা তখন বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে শিক্ষানবিশী করিতেন, দিদির তখন বিবাহ হইয়াছে। আমার ভগিনীপতির বাড়ী ভবানীপুরে, আমাদের বাড়ী বাদুড় বাগানে। এক দিদি ও এক দাদা ব্যতীত আমাদের আর ভাই বোন ছিল না। বাবা ফিন্‌লে মিউর কোম্পানীর বাড়ীতে ক্যাসে কাজ করিতেন। একশত টাকা বেতন ছিল, দুপয়সা পাওনাও ছিল। কলিকাতায় নিজেদের বাড়ী; সুতরাং সংসারে অসচ্ছলতা ছিল না। আমি যে বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হই, সেই বৎসরই দাদার বিবাহ হয়। দাদা বি,এ ফেল; কিন্তু বি,এ ফেলে বিয়ে করা আট্‌কায় না,—তখনও আট্‌কাইত না, এখন ত মোটেই না।

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইবার একমাস পরেই আমার জ্বর হয়; কয়েকদিন পরে ডাক্তারেরা বলিলেন টাইফয়েড জ্বর। অনেক চিকিৎসায় জীবনরক্ষা পাইল, কিন্তু দৃষ্টি ক্ষীণ হইল। ডাক্তারেরা অধিক পড়াশুনা করিতে নিষেধ করিলেন; আমি সে নিষেধ শুনিলাম না, লেখাপড়া না শিখিলে কি গরীব কায়স্থের ছেলের চলে? আমি চস্‌মা লইলাম। আমার ভগিনীপতি একদিন ঠাট্টা করিয়া বলিলেন "এদের বিদ্যা যে ভারি সূক্ষ্ম, চস্‌মা নইলে কি চলে?"

যথা সময়ে এল-এ পাশ করিলাম, কিন্তু একদিনের বিলম্ব জন্য বাবা সে সংবাদ পাইলেন না। পাশের সংবাদ বাহির হইবার পূর্ব্ব দিন শেষ রাত্রিতে বাবা বসন্তরোগে মারা যান। আমরা যখন নিমতলার শ্মশানঘাটে, সেই সময় একটী বন্ধু আসিয়া আমার প্রথম বিভাগে পাশের সংবাদ দিলেন। আমি মায়ের কোলের কাছে বসিয়া ছিলাম। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। বাবা তখন চিতা-শয্যায়।

এই সময় আমার দৃষ্টি অকস্মাৎ প্রখর হইল। পূর্ব্বে চসমা ব্যতীত পড়িতে পারিতাম না. দূর-দৃষ্টি একেবারেই ছিল না; এখন সব পরিষ্কার হইয়া গেল। দাদা একজন ভাল চক্ষু-চিকিৎসকের দ্বারা আমার চক্ষু পরীক্ষা করাইলেন; ডাক্তারবাবু নানা যন্ত্র সাহায্যে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আমার চক্ষু বিলক্ষণ সবল হইয়াছে; দৃষ্টি-হীনতার আশঙ্কা মোটেই নাই; সুতরাং আমার পড়া-শুনা করিবার বাধা কাটিয়া গেল। আমি পরম উৎসাহে বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

দুই বৎসর বেশ কাটিয়া গেল। পরীক্ষার সময় একটু বেশী পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; সেই সময় দুই একদিন চক্ষু জ্বালা করিত; কিন্তু, আমি সেজন্য ভীত হই নাই।

যে দিন পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল, সেই দিন বাড়ী আসিবার পর আমার চক্ষুর যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল। সারা রাত্রি ঘুমাইতে পারিলাম না। এ যন্ত্রণার কথা কিন্তু রাত্রিতে মা, বৌ-দিদি, দাদা কাহাকেও জানাই নাই। শেষ রাত্রির দিকে আমার একটু তন্দ্রার আবেশ হইয়াছিল; সে কতক্ষণের জন্য, তাহা আমি বলিতে পারি না। যখন তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া গেল, তখন চারিদিকে চাহিয়া দেখি সব অন্ধকার। ভাবিলাম হয় ত' তখনও রাত্রি আছে। ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া, পাশের দেওয়ালে যেখানে বিজলী বাতির 'সুইস্' ছিল, সেখানে যাইয়া সুইস্ টিপিলাম। ঘর আলোকিত হইল বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু আমার চক্ষুর উপর হইতে ত কৃষ্ণ যবনিকা অন্তর্হিত হইল না। সব অন্ধকার! আমি অন্ধ হইয়াছি! আমি তখন চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

পার্শ্বের ঘরেই মা নিদ্রিতা ছিলেন। অকস্মাৎ আমার প্রাণপণ চীৎকার শুনিয়া তিনি 'কি হয়েছে, কি হয়েছে' বলিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। আমার তখন সংজ্ঞা লোপ হইয়াছিল।

কতক্ষণ এ অবস্থায় ছিলাম, জানি না; যখন জ্ঞান হইল তখন বুঝিলাম ঘরের মধ্যে অনেক লোক বসিয়া আছে। আমি একটু নড়িতেই মা স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন 'মহেন্দ্র, বাবা, এখন শরীর কেমন বোধ হচ্ছে ?'

আমি বলিলাম "মা, আমি যে কিছুই দেখ্তে পাচ্ছিনে, আমার সুমুখে সব অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছে।"

"দাদা আমার শিয়রেই বসিয়া ছিলেন; তিনি বলিলেন — ভয় কি, ডাক্তার ডাকতে লোক গিয়াছে; তিনি এসে এখনই তোমার চোখ ভাল করে দেবেন। এ কয়দিন বেশী পরিশ্রমে বোধ হয় চোখ দুটো অবসন্ন হয়ে পড়েছে, এখনই ভাল হয়ে যাবে।"

আমি বলিলাম "না দাদা, আর আমি তোমাদের দেখ্তে পাব না, কি অন্ধকার, অন্ধকার!" আমি আর কথা বলিতে পারিলাম না।

একটু পরেই ডাক্তার আসিলেন; পূর্ব্বের মত আবার অনেকক্ষণ নানা যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিলেন; শেষে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিলেন "তাই ত, হঠাৎ এমন হোলো কেন ?"

দাদা আমার অত্যধিক পরিশ্রমের কথা বলিলেন। ডাক্তার বলিলেন "তারই জন্য এমন হয়েছে। তবে আমার মনে হচ্ছে, এ দৃষ্টিহীনতা 'স্থায়ী' হবে না; নিয়ম মত ঔষধ ব্যবহার করলে সেরেও যেতে পারে।"

আমি বলিলাম "আর সে আশা নেই; আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার এ অন্ধত্ব আর ঘুচবে না।"

সকলেই নানা প্রকার আশা দিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই আমার প্রাণে লাগিল না;—সেখান হইতে আমার আর্ত্ত প্রাণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতে লাগিল—আমি অন্ধ! অন্ধ!

যাহার জন্য এ অন্ধত্ব বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহা লাভ হইয়াছে। চির অন্ধকারের মধ্যে মাস দেড়েক পরে একদিন দাদা আসিয়া সংবাদ দিলেন, আমি বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে সর্ব্ব প্রথম পাশ হইয়াছি। সংবাদ শুনিয়া মা কাঁদিয়া উঠিলেন—"আর পাশে কি হবে! এরই জন্য বাছা আমার দুটী চক্ষু হারিয়েছে।"

* * * *

অন্ধের অন্ধকার জীবন-যাত্রা যেমন করিয়া চলে, আমারও তেমনই করিয়া চলিতে লাগিল। আমি সংসারের গলগ্রহ হইলাম; আমার অন্ধের যষ্টি হইলেন আমার মা, আর আমার বৌদিদি। এখন শব্দ আর স্পর্শই আমার সম্বল; মা ও বৌদিদির স্বর ও স্পর্শ আমার প্রাণে গভীর

সান্ত্বনা আনিয়া দিত—সে স্বর কি স্নেহমাখা, সে স্পর্শ কি কোমলতা-মণ্ডিত! এখন এই বিপুলা ধরণী আমার কাছে শুধু শব্দময়ী, স্পর্শময়ী! অন্ধের প্রাণের আবেগ তোমাদিগকে কি বলিয়া বুঝাইব।

দুই তিন মাস এইভাবে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার পর বৌদিদি কাহাকে সঙ্গে করিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি তখন সময় কাটাইবার জন্য হারমোনিয়াম সহযোগে আপন খেয়ালে মত্ত হইয়া এই ভাঙা গলায় গান করিতেছিলাম। গান গাহিতে জানি না, কখনও তেমন আগ্রহের সহিত শিক্ষাও করি নাই; চলনসই মত একটু আধটুকু হারমোনিয়ম বাজাইতে পারিতাম। আমি গাহিতেছিলাম——

"আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,
সখি, জাগো জাগো।"

বৌদিদির আগমন বুঝিতে পারিয়া আমি গান বন্ধ করিলাম। এখন যে আমি পায়ের শব্দ পাইলেই মানুষ চিনিতে পারি। বৌদিদির সম্মুখে গান করিতে আমার কোন দিনই লজ্জা করে না; কিন্তু আজ যে তাঁর পদশব্দের সঙ্গে আর একজন অপরিচিতের পদধ্বনি আমার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল; তাই আমি চুপ করিলাম।

বৌদিদি আমাকে গান বন্ধ করিতে দেখিয়া বলিলেন "ঠাকুরপো, চুপ করলে কেন? তোমার গান শোনবার জন্য যে আমার বোন প্রভাকে নিয়ে এলাম। প্রভাকে বুঝি তুমি চেন না? ও আমার মামার মেয়ে। ওরা ভাগলপুরে থাকে, কখনও কলকাতায় আসে নি। এবার আর না এসে পারল না। প্রভা, এই আমার ঠাকুরপো মহেন্দ্রবাবু। এঁকে প্রণাম কর।"

প্রভা তখন অগ্রসর হইয়া আমার পায়ের কাছে মাথা লইয়া আসিতেই আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম "ও কি করছ, প্রণাম কেন?"

মেয়েটী বলিল "আপনি যে বড়দিদির দেওর।"

এমন মধুমাখা কণ্ঠস্বর আমি অনেকদিন শুনি নাই। সেই স্পর্শে আমার হৃদয়ের মধ্যে যে পুলকের সঞ্চার হইল, তাহা চক্ষুষ্মান পাঠক, তোমাকে বুঝাইবার ভাষা যে আমার ভাণ্ডারে নাই। আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে সত্যসত্যই পাখী ডাকিয়া উঠিল; অন্ধের ঊষর-মরু-হৃদয়ে বসন্তের মদির হিল্লোল প্রবাহিত হইল; আমার অন্ধকার প্রাণের মধ্যে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল; আমি ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম, কোথায় আমার অন্ধত্ব, কোথায় গেল অন্ধকার! হৃদয়ের অন্তস্থলে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য সম্ভার লইয়া ইন্দ্রাণীর মত হেম-সিংহাসনে বসিয়া আছে। সেই স্পর্শে সহস্র সহস্র বসরাই গোলাপের সুবাসে যেন গগন-পবন সুরভিত হইল; সেই শব্দে যেন বিশ্বের মোহন কাকলী একত্র সম্মিলিত হইয়া ত্রিদিবের আনন্দলোকের বার্ত্তা আমার নিকট উপস্থিত করিল। আমি আকুল আগ্রহে তাহার সেই কুসুম-কোমল হাতখানি ধরিয়া রহিলাম। এ কি নব বসন্তের সমাগম আমার অন্ধত্বকে মহীয়ান করিয়া তুলিল!

প্রভা আমার মনের কথা বুঝিতে পারিল কিনা বলিতে পারিনা; সে বীণাবিনিন্দিত স্বরে বলিল "আপনার বড় কষ্ট হয়, মহেন্দ্র বাবু?"

এমন ব্যথাভরা, এমন সহানুভূতিপূর্ণ কথা শুনিয়া আমি তাহার মুখের দিকে আমার দৃষ্টিহীন নয়ন ফিরাইলাম। দেখিলাম—সত্য-সত্যই মানস-নয়নে দেখিলাম, আমার সম্মুখে এক করুণাময়ী দেবী দাঁড়াইয়া আছেন।

আমার এ সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া বৌদিদি বলিলেন "ঠাকুরপো, বিভা দুই তিন দিন আমার বাড়ীতেই থাকবে। ও বেশ গাইতে পারে; তোমাকে অনেক গান শোনাবে। এইমাত্র ও এখানে এসেছে। এসেই তোমার কথা শুনে তোমাকে প্রণাম করতে এসেছে। এখন চল্ বিভ, তিন দিন ত আছিস্; দেখ্‌তে পাবি, কি অমূল্য রত্ন আমরা পেয়েও প্রাণভোরে ভোগ করতে পারছিনে!" বৌদিদি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রভার হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন। আমার বসন্তোৎসব—গৃহের আলোকরাশি যেন সহসা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আমার সেই অন্ধকার। এ যে আরও গভীর। হায় ভগবান!

তাহার পর তিনদিন যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল, তাহার বর্ণনা দিতে পারিব না। সে তিনদিন আমি

পৃথিবীতে ছিলাম না, স্বর্গের চিদানন্দের মধ্যে আমি ডুবিয়া ছিলাম।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর বিভা বিদায় গ্রহণ করিতে আসিল। অতি কোমলস্বরে বলিল "মহেন্দ্রবাবু, আমরা এখন ভাগলপুরে যাব।"

বৌদিদিও সঙ্গে ছিলেন; তিনি বলিলেন "যে জন্য ওরা এসেছিল, তা হয়ে গেল। যাদের বাড়ীতে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে, তারা ভাগলপুরে গিয়ে মেয়ে দেখ্‌তে চায় ন; তাই ওকে এখানে আনা হয়েছিল। তারা আজ দেখে মেয়ে পছন্দ করেছে, কথাবার্ত্তাও হয়ে গেল; তারা আশীর্ব্বাদ করে গিয়েছে; মামা আর তোমার দাদাও বরকে আশীর্ব্বাদ করে এলেন। এই অগ্রহায়ণ মাসেই ভাগলপুরে বিয়ে হওয়া স্থির হয়ে গেল।"

সব কথা শুনতে পেয়েছিলাম কি না সন্দেহ; কিন্তু ঐ বিয়ে স্থির হয়ে গেল কথাটা যেন বজ্রের মত আমার বুকে আসিয়া লাগিল; আমি এক মুহূর্ত্তে যেন মহাসাগরের অতল গর্ত্তে নিমগ্ন হইলাম। হায় অন্ধ, তোমার সব দিকই যে বন্ধ!

প্রভা আমাকে প্রণাম করিল। আবার সেই স্পর্শ। ইচ্ছা করিল, তাহাকে একবার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরি—একবার দেবতা শুধু একবার। তারপর আমরণ সেই স্পর্শের স্মৃতিকে পাথেয় করিয়াই আমার জীবন কাটাইতে পারিব।

প্রভা চলিয়া গেল; আমি একটা কথাও বলিতে পারিলাম না—একটা বিদায় বাণীও আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। শুধু একটা হৃদয়ভেদী হাহাকার আমার সেই অন্ধকার গৃহের মধ্যে হায় হায় করিয়া ঘুরিয়া মরিতে লাগিল।

সেই সময় আমাদের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় একটা পথ-ভিখারী গাহিয়া উঠিল—

"মন তোমার এ ভুল গেল না হায়!
কত আঁধারে তেল দেবে পায়।"

———

মণ্ডলের খেদ

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ]

(১)

আর খেতে পারিনে আমি
　　জল্‌সা দেশের তরকারী,
ক্ষণে ক্ষণে পড়ছে মনে
　　ডাঙ্গার ডাঁটা থোড় বড়ি।
বেগুণ কচু পুনকো পুঁয়ে
ঠাঁই নাহি আজ আমার ভুঁয়ে
সাধের মাচা পড়ছে নুয়ে
　　কাঁদছে আমার ঘর বাড়ী।

(২)

কুম্‌ড়োতে হায় চাল ঘিরেছে
　　দাপিয়ে বেড়াই লাউ লতা
কচি শশা যায় বুড়িয়ে
　　তুলতে নাহি কেউ কোথা।
গাছের তেঁতুল ঝুলছে গাছে
আপল মারে দীঘির মাছে
আমার যে হায় নেইক সময়
　　কলম ফেলে মরবারই।

(৩)

বাটা মাছের ঝোল খেয়ে ভাই
　　জিব যে হ'লো পান্‌সে রে!
দু'মাস ধরে একই কপি
　　খায় কি করে মান্‌সে রে।
বালাম আমি আর খাব্‌না,
দাও ফিরে দাও আমার সোনা,
আবার করো গাঁয়ের মোড়ল
　　সহর তোমায় গড় করি।

(৪)

সিগারেটের সখ মিটেছে
　　পুচ্‌কে বিড়ীর মূল্য কি,
তারা আমার বাঁধা হুঁকোর
　　একটা টানের তুল্য কি?
সরস্বতী এ নিব নে-মা
লক্ষ্মী আবার কোদাল দেমা
কুঁড়েয় বসে আগলাবো ভুঁই—
　　নেই চাকুরীর দরকারই,
আর খেতে পারিনে আমি
　　জল্‌সা দেশের তরকারী।

———

শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ

(সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

[সম্পাদক]

এ কথা অকুণ্ঠ চিত্তে বলা যাইতে পারে শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান বাঙ্গালার লুপ্ত শিল্পগৌরবের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা। আমরা তাঁহার জীবন বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইব না; কেবল মাত্র যে সকল দুর্ল্লভ সদ্‌গুণের তিনি অধিকারী ও কি কি উপায়ে তাহা লাভ করিয়াছেন সেই সকল আলোচনার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কারণ শিল্পের বিষয় জানিতে হইলে শিল্পীকে অজানা রাখিলে চলিবে কেন? যথার্থ সময় না আসিলে জিনিষের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না; সেইজন্যই সাধারণের নিকট এখনও হেমেন্দ্রনাথের শিল্প প্রতিভা এতটা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান আলোচনায় দুইটা লাভ আছে—এক, অধ্যাবসায়ের সম্মান করা আর—উদীয়মানদের জন্য একটা উজ্জ্বল রাস্তা প্রদর্শন করা।

বন্ধুবর হেমেন্দ্রনাথ বাঙ্গাল। ময়মনসিংহ জেলার গচিহাটা গ্রামে তাহার জন্ম হয়। তাঁহার পরিবারের কেহই কখন ললিতকলার উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, কাজেই চিত্রবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ কিরূপ হইয়াছিল তাহা তাহার নিজ ভাষায়ই লিপিবদ্ধ করিতেছি—

"যেদিন চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিব বলিয়া পরিবারের সকলের নিকট অভিলাষ জানাইলাম সেইদিনটা যে কি বিষম একটা দিন ছিল তাহা আজও ভুলি নাই। সকলেই আমার উপর খড়্গহস্ত। সেদিন আমার আহার হইয়াছিল কি না মনে নাই। একবাক্যে সকলেই বলিলেন ওসব খেয়াল ছাড়, হয় উকীল হও না হয় ডাক্তার পেস্‌কার ইত্যাদি কিছু একটা হও। আমি বেহায়ার মত তখনও অবিচালত। ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়িয়া ইংরাজী ১৯১০ সনের শেষভাগে কলিকাতায় আমার সহোদরার বাসায় আসিয়া উঠিলাম। দেশের এমনি স্রোত তিনিও বুঝাইলেন লক্ষী ভাইটী ওসব ছেড়ে দিয়ে আমার এখানে আসিয়াই না হয় লেখাপড়া কর ইত্যাদি তবুও যখন দেখিলেন পা নড়ে না তখন অগত্যা অনিচ্ছায় আমাকে গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। আর্টস্কুলে আসিবার পূর্ব্বে আমার একটা ধারণা ছিল যাহারা এই লাইনে আসে তাহারা বিরাট পুরুষ! বহুপুণ্য ফলে আর্টস্কুলের ছাত্র হয়। মনে মনে ঐ সময় ভাবিতাম জোর করিয়া সেখানে যাইতেছি যদি আমাকে অযোগ্য ভাবিয়া না গ্রহণ করে তবে উপায়? চিত্রবিদ্যা না শিখিতে পারিলে জীবনে মরা বাঁচা সমান। স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে প্রমোশন পাইলাম; আর দেখিলাম একটা ছাত্রও কাজে মন দেয় না, কেবল বাজে গল্প ও সমালোচনা। ভাবিলাম যাহাদের বিষয় সুদূরে বসিয়া 'অমানুষিক' কল্পনা করিতাম এরা কি তাই?—আমি নিরাশ হইলাম কয়টাদিন খুব ভাবিলাম–কেনইবা আসিলাম আবার কি ফিরিয়া যাইব? অগত্যা স্থির করিলাম কিছুদিন চেষ্টা করি। এক বৎসর পড়াশুনার পর আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। ইংরাজী ১৯১১ কি ১৯১২ মনে নাই, সেই সময় ঘোষণা হইল সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ ভারতের রাজধানী কলিকাতায় আসিতেছেন। সেই উপলক্ষ্যে রাস্তাঘাট সজ্জিত করা হইবে। শেষে শুনিলাম আমাদের স্কুলের সাহেব একটা মোটা টাকায় সেটার ভার নিয়াছেন; তিনি ঐ সমস্ত কাজ অর্থব্যয় করিয়া কারিকর দ্বারা না করাইয়া স্কুলের ছাত্রদ্বারাই করিবেন মনস্থঃ করিলেন তাহাতে বিশেষ লাভ হইবে। সমস্ত মাষ্টারকে ইঙ্গিত করিলেন (জানিনা বখ্‌রা পাবেন কি না) তাহারা আমাদিগকে ব্যাপার বুঝাইলেন। আরও বলিলেন—প্রত্যহ ৵০ করিয়া জল খাবার পাবে। কাজ হইল আটা দিয়া কাগজ লাগান, ফুল ফল তৈরী করা ইত্যাদি। আমার ব্যাপার বুঝিতে দেরী হইল না, মাষ্টারকে

পাড়ার মেয়ে

শিল্পী — হেমেন্দ্রনাথ

Lakshmibilas Press, Calcutta
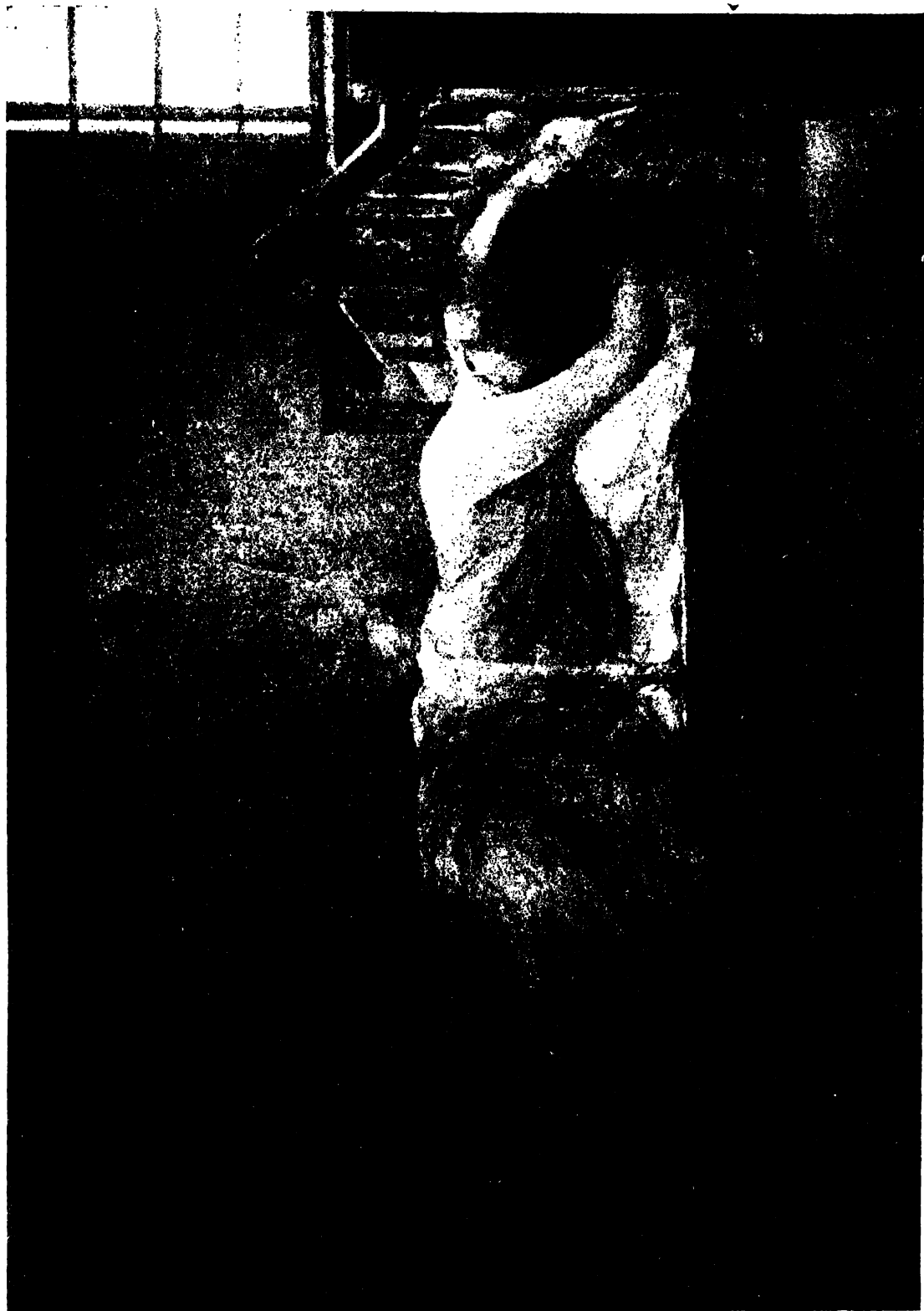
বলিলাম "সার, আমরা ওসব পারব না, ৶০ আনা জলখাবার খেয়ে লাভ কি ? ট্রাম ভাড়াই ৶০ আনা দিই।" তিনি চটিলেন। বলিলেন—সাহেব শুনিলে তাড়াইয়া দিবে। আমি বলিলাম—'বেশ ত, যাদের ইচ্ছা যাক, আমরা কয়জন যাব না' বলিয়া গোটাকতক ছাত্রকে লেক্‌চার দিয়া দলে আনিলাম ও বলিলাম "ভাই দেখ, আমরা সকলেই একরূপ গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তারপর যা একটু শিক্ষা হবে তারও এই লক্ষণ, এস নিজেরা ক্লাসে বসিয়া কিছু একটা আঁকি।' তখন নিরুপায় হইয়া জনহীন ক্লাসের একধারে কতকগুলি model drawing figure ছিল, তাই পুনরায় বিভিন্ন প্রকারে অঙ্কন করিতে সুরু করিলাম। কয়েকদিন পরেই দেখিলাম মাষ্টার আসিয়া আমাকে বলিলেন "দেখ হেমেন্দ্র, তুমি নাকি ছাত্রদিগকে সাহেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছ ? এসব ভাল কাজ নয়"—ইত্যাদি পরক্ষণেই সাহেবের হুকুম আসিল—"See me at once."আমার মাথায় বাজ পড়িল ; ভবিষ্যতের ভাবনাও নিমেষে ভাবিলাম, মাষ্টার মশাইকে মনে মনে শ্রাদ্ধ করিয়া ভয়ে ভয়ে সাহেবের নিকট চলিলাম। দেখিলাম হেডমাষ্টার মশাইও (হরি নারায়ণ বোস) ওখানে। তিনি একটু মৃদুস্বরে সাহেবের পক্ষ হইতে বলিলেন "হেম, সাহেব একটা দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়াছে, তোমরা সাহায্য না করিলে চলিবে কেন ? সাহেব তোমাকে Scholarship দিবে বলছিল, তাকে অসন্তুষ্ট করিলে টাকাটা মাটী হবে।" হেডমাষ্টার মশাই বড় ভাল লোক ও আমায় বড়ই স্নেহ করিতেন, তিনি এরূপ বলাতে আমার বড়ই অভিমান হইল,বলিলাম—"বেশ, কাল থেকে আর এই স্কুলে আসব না।" হেডমাষ্টার নীরব হইলেন। সাহেব বলিলেন "ধর, এই চার মাস অসুস্থ আছ।" আমি বলিলাম "আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি কি করিব।" এর মধ্যেই খবর পাইলাম 'জুবিলী আর্ট একাডেমী' বলে একটা প্রাইভেটস্কুল বেশ ভাল ভাবে চলিতেছে বাড়ী আসিয়াই তাহা দেখিতে গেলাম। স্কুলের কাজ দেখিয়া আমি নূতন আশায় মনে বল পাইলাম। স্থির করিলাম দেশে চিঠি লিখে দিব গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুল ছাড়িয়া দিয়াছি। চিঠির উত্তর যাহা আসিল তাহাতে চক্ষুস্থির ! বড় দাদা সুদীর্ঘ চিঠি লিখিলেন তাহা আজ ১০।১২ বৎসরের কথা, সব ঠিক মনে নাই, তবে সারাংশটুকু এই – জীবনে তোমার কিছু হইবে না, যাঁহারা চিত্রজগতে বরণীয় হইয়াছেন তাঁহারা ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের চেষ্টায়ই হইয়াছেন। তোমার চিত্ত অস্থির এবং গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল ছাড়িয়াছি এইজন্য টিপ্পনি করিয়াছেন—It is a jump from Sublime to the ludicrous ! • • যা তোমার ইচ্ছা করিতে পার • • আমি অদ্যই বাবাকে পত্র দিতেছি। তারপর গভর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়িলে অন্ততঃ একটা 'সার্টিফিকেট' পেতে—বাজে স্কুলে পড়লে ভাত জুটবে না। বাবাও ঐ সুরে পত্র দিলেন, লিখলেন—তোমার বড়দা বিদ্বান, বুদ্ধিমান—তুমি মূর্খ ও বোকা, তাহার কথা অমান্য করা দোষের ও পাপের। মাও লিখিলেন, তবে তাহাতে গালাগাল ছিল না, বিলাপমাত্র করিয়াছিলেন। কয়েকদিনের মত আমার মাথাটা ধরিল ও চক্ষুটার জ্বালা হইল। ক্ষুধাও কমিয়া গেল। শেষে স্থির করিলাম পত্রলিখা বন্ধ না করিলে উপায় নাই। দিদিকে বলিলাম তুমিই মাঝে মাঝে লিখিও বেঁচে আছি দুই বৎসর দেশে যাওয়া বন্ধ করিলাম। রাত্রে সকলে ঘুমাইলেও ১৷৷০ টা পর্য্যন্ত Anatomy বা শারীরতত্ত্ব আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। এইভাবে দুই বৎসর কাটিল। হাতটা একটুমাত্র তৈরী হইয়াছে। তখন দেখিলাম আশে পাশে ভদ্রলোকেরা কারুর বাবার পুরাণো ফটো আনিয়া বলিলেন ১০৲ টাকা দিব আঁকিয়া দিবে—কেউ বা ফরমাস করিলেন "ওগো আমার মার ফটো তুলিবার সময় পাই নাই, এই নিমতলায় রাত্রিতে কোন ফটোগ্রাফারকে দিয়া তুলিতে হইয়াছে, ইহাকে একখানা নামাবলী গায়ে, বসাইয়া, চাহিয়া আছেন আঁকিয়া দিতে পারিবে ? পারিলে ২০৲ টাকা দিব।" আমি ছবি দেখিয়া মনে মনে বলিলাম এ ছবিকে বসাইতে হইবে ও চাহিয়া আছেন এরূপ করিতে হইবে, এ কাজ ত আমার গুরুর গুরুর চৌদ্দপুরুষেও পারিবে না, আমি সবে মাত্র তুলি ধরিতে সুরু করিয়াছি। মাঝে দু একটা ভাল ফটো পাইলে আঁকিয়া দিতে লাগিলাম, তাহাতে মাসে ২০।২৫ টাকা আয় হইতে লাগিল। আমার একটু আনন্দ হইল। ভাবিলাম তখনই যদি এই পাই, বছর দু চার পরে কি আর ৬০।৭০ টাকা পাব না ? তবেই জীবন কোনরূপে কাটিয়া

যাইবে। চার বৎসর পর জুবিলী আর্ট স্কুল ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে বসিয়া কঠিন পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু তথাপি মনের মতন কিছুই হচ্ছে না। নিতান্তই দমিয়া গেলাম! শেষে বিলাত হইতে বহু ভাল ভাল শিল্পীর রচিত বই আনাইয়া পড়িতে সুরু করিলাম। তখন বুঝিলাম স্কুলে যাহা শিখিয়াছি তাহা সর্বৈব মিথ্যা। আমার মাথায় বাজ পড়িল। চক্ষু অন্ধকার হইল। ভাবিলাম আবার এই সাত বছরের বিদ্যা সব ভুলিয়া নূতন করিয়া এদের ছন্দে শিখিতে হইবে? সময় কৈ, বয়স কৈ? যাহাই হউক আমার মনে কে যেন একটা নবীন আশা দিল, সমস্ত দিনরাত খাটিয়া আবার নূতনভাবে কাজে লাগিলাম। দুই বৎসরে একরূপ পথে আসিলাম।"

হেমেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিবার সময় এখনও আদৌ আসে নাই, তিনি একটা যুগ আনিয়া দিয়াছেন এ কথাটা যাঁরা তাঁর মূল চিত্র একটীবার দেখিয়াছেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে এদেশে চিত্রের মূল্য ১০০৲, ১৫০, ২০০,বড় জোর ৪০০৲ পর্য্যন্ত হইত। তিনি তাঁহার চিত্র হাজার দু' হাজারের নীচে বড় একটা বেচেন না। পূর্বে একটা কথা শিল্পীরা বলিত "এদেশে ছবির মূল্য কেহ দেয় না, কি আঁকব?" কিন্তু যথার্থ গুণীচিত্র হইলে লোকে মূল্য দেয় হেমেন্দ্রনাথ তাহা দেখাইয়াছেন। কলিকাতায় এমন বড় লোক খুব কম আছেন যাঁদের বাড়ীতে তাঁহার অঙ্কিত চিত্র না আছে।

ইংরাজী ১৯২০ সনে প্রথম হেমেন্দ্রনাথ প্রদর্শনীর জন্য চিত্র অঙ্কিত করেন। ইতঃপূর্ব্বে অনেক ভাল চিত্র অঙ্কিত করিয়াও তিনি সাধারণের নিকট প্রদর্শন করেন নাই, কারণ সেগুলি তখনও তাঁহার মনের মতন হয় নাই (১৯২০ সনে তিনি সর্বপ্রথম ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী বোম্বাইএ চিত্র প্রেরণ করেন ও সেই বৎসরই প্রদর্শনীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসর মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতেও তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ১৯২১ ও ১৯২২ সনেও আবার বোম্বাইএ শ্রেষ্ঠ পদক প্রাপ্ত হন। উপর্য্যুপরি তিনবার বোম্বাইএ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করায় সেখানে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। শেষবার বিখ্যাত Bombay Chronicle কাগজে লিখিত হইল "One Mr. H. Mazumdar of Calcutta won three times the First prize of the Exhibition * * It is a disgrace to the Bombay artists * * * Either the Judging Committee must be * * For Mr. Mazumdar is too high for the Exhibition."

মান্দ্রাজেও উপর উপর দুইবার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। কলিকাতায় তিনবার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। সিমলা প্রদর্শনীতে Lalchand and Sons এর Calendar এর জন্য Village Love" নামক চিত্রে এক হাজার টাকার তোড়া প্রাপ্ত হন। আমাদের বাঙলাদেশ অপেক্ষা পশ্চিম অঞ্চলে তাঁহার খ্যাতি অনেক বেশী। একবার হেমেন্দ্রনাথের নিকট বোম্বাইএর কোন ধনী ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, হেমেন্দ্রনাথ তখন বন্ধুদের সঙ্গে এক স্থানে বসিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটী আসিয়া বলিলেন "I want to see Mr. Mazumdar." জনৈক বন্ধু হেমেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন He is Mr. Mazumdar. তখন সেই ধনী ভদ্রলোকটী বলিলেন—"No, I want Senior Mazumdar—I mean the artist," তাঁহারা বলিলেন -ইনিই Artist Mr. Mazumdar. ভদ্র লোকটী অবাক হইয়া করমর্দন করিতে করিতে বলিলেন I see, you are a boy of yesterday! বর্ত্তমানে হেমেন্দ্রনাথের বয়ক্রম মাত্র ২৯ বৎসর। তাঁহার নিকট যে সব অযাচিত প্রশংসাপত্র আসিয়াছে তাহা উল্লেখ করিলে এক খানা সুদীর্ঘ পঞ্জিকার আকার হইবে। সুদূরে তাঁহার কিরূপ আদর তাহা বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় জামনগরের মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ হেমেন্দ্রনাথকে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। রঞ্জিৎসিংহ অত্যন্ত চিত্রানুরাগী। তাঁহার প্রাসাদে বিদেশীয় বিখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত ২৫ লক্ষ টাকার উপর মূল্যের চিত্র আছে। তিনি লিখিয়াছেন: -

I am so much pleased with the work done by him and I assure you that lovers of arts on this side of Kattyawar appreciate his beautiful work. Hardly any painter in Bombay Presidency can compete with Mr. Mazumdar as regards his vivid style and beautiful and pleasing combination of various colours. I have come in contact with many good painters in Bombay and seen their work, but Mr. Mazumdar stands first among each and all of them

আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবি হইয়া চারুশিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন করুন—বাংলার মুখ, বাঙ্গালীর মুখ উজ্জল করুন—বিশ্বশিল্পসভায় বাঙ্গালীর নাম উজ্জল অক্ষরে অঙ্কিত হইয়া চিরগৌরবান্বিত থাকুক।

মনের হিসাব

[শ্রীসুরুচিবালা রায়]

সুধীরের কথা

— ১ —

কতখানি ব্যর্থতায়, কি তীব্র বেদনায়, আজকের এ সন্ধ্যেটা তোমার ওখানে কাটিয়ে এলাম, সে তুমি কি বুঝবে! আগুনের একটা ঝড়ো হাওয়া বুকের ভিতরটা যখন আমার পুড়িয়ে পুড়িয়ে বয়ে যাচ্ছিল, তুমি তখন নূতন গান শেখার আনন্দে, ভক্তের সপ্রশংস দৃষ্টিতে, আনন্দে--গর্ব্বে—দিশে-হারা, তোমার সে উজ্জ্বল মূর্ত্তি চোখে আমার কি রকম ঠেকছিল জানো? থাক্, লক্ষ্মী সে কথা আর বল্‌বো না! তোমার ঐ সাবানে-ঘসা চুলের উপর লাল ফিতা, আর জড়িপেড়ে সাদা মান্দ্রাজীর সাড়ি ব্লাউসে ঢাকা অপূর্ব্ব মূর্ত্তি-খানি মনে আমার কি-যে কামনা জাগিয়ে তুলেছিল, থাক্ রাণী, সে কথা খুলে আর না-ই বল্লাম!

তোমায় কতলোকে ভালবাসে, কতলোকে তোমায় চায়, তোমার অত গুণ, অত রূপ, লোকে যদি প্রশংসা কিছু করেই, সেকি তবে অন্যায়? নিশ্চয় নয়, আমার অতবড় যে হিংসুটে—সেও ওকথা বলতে পারবে না! তবে কি? কেন তবে মনের ভিতর এ জ্বালা? এ ছট্‌ফটানী কেন? কিসের অধিকারে?

কিসের অধিকার? কে জানে কিসের! কিন্তু এ ক'দিন তুমি মন দিয়ে যেটুকু শুধু মনে আমার তুলে দিয়েছিলে, সেটুকুর খবর বিশ্বের আর কেউ না জানুক, তুমি ত জান পাষাণী! মন তার সে অধিকার ভোলে নি, তাই সে বজ্র-নাদে চেঁচিয়ে উঠ্‌তে চায়, বাইরের লোকের অত প্রশংসা তোমাকে,—অত স্তুতিবাদ, তোমার একটুখানি প্রসন্নতার জন্যে অত লালায়িত সব,—এ কেন? রাণী আমার, আমার মনের নিখিলেশ যে তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে উঠে, আমি তার কি করি? সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ঠেকাতে গিয়ে, আমি যে আজ নিঃশক্তি হয়ে পড়েছি, আমার মনের নিখিলেশ কবে একদিন তার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হত বা আহত হয়ে তোমার ফিরে-পাওয়া প্রেমের বুকে ফিরে আসবে! হায়, কবে জানি না, কিন্তু তবু একাগ্র নীরব চিত্তে সে শুধু ঐ দিনটার প্রতীক্ষায় আজ বিশ্বের সন্দীপের কাছে তার আরাধনার দেবীকে ছেড়ে দিয়েছে। আশা আছে, একদিন সেদিন তার আসবেই! তা যদি না আসে— না:, তাও কি হয়, মানুষের মন যে ভগবানের কতবড় সত্য সৃষ্টি, সেকথা ভুলে গেলে কি আর মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব হোত?

— ২ —

সহরের প্রান্তভাগে খালের ধারের পথ—কুৎসিৎ কর্দ্দম্য অসভ্য রাস্তা, সহরের ভিতরের সভ্যতার বিকার এখানে নাই. আছে শুধু ছোট জাত ব্যবসায়ী মুসলমানের উচ্চ কলরবে কথোপকথন, আর আছে হিন্দুস্থানী মেয়েদের কোমরে কাপড় বাঁধিয়া, পরস্পরের দিকে গলা বাড়াইয়া ঝগড়া। বিশেষ কিছু নয়, অতি ক্ষুদ্র কারণ, কিন্তু তাহাতেই কথা বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে তাহাতে খুনোখুনির ব্যাপার হইয়া উঠে, কিন্তু এদিক দিয়া দেখিতে গেলে, এ একরকম ভালোই। কাল ঠিক এই—পথেই চলিতে, যে দুইজনের মধ্যে রক্তা-রক্তির উপক্রম দেখিয়া গিয়াছিলাম—আজ তাহারা ঘরের সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গায় বসিয়া, একই সঙ্গে গলা মিলাইয়া গান গাহিতেছে, মনের বিষ প্রাণ খুলিয়া ঢালিয়া দিয়া মন ইহাদের পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আর আমাদের ঘরের মেয়েদের মধ্যে কি দেখিতে পাই? এমন করিয়া গলা বাড়াইয়া, চীৎকার করিয়া ঝগড়া করিতে তাঁহারা পারেন না, হাতাহাতি মারামারি ত তাঁহাদের চিন্তাশক্তির অতীত,—কিন্তু বিষটুকু তাঁহাদের মনে চিরকাল সঞ্চিত থাকিয়া কেবল বর্দ্ধিতই হইতে থাকে—এইত আমাদের সভ্য এবং অসভ্য জাতের তারতম্য, মনের ভিতর গলদের

সীমা নাই, কিন্তু তাহাতেই আমাদের গর্ব্ব কত! পথ চলিতে চলিতে একটা কথা কাল বড় আমার মনে পড়িতেছিল। আচ্ছা এমন কেন হয়, অনেক জায়গায় অনেকদিন দেখিয়াছি পাঁচজন পুরুষ যেখানে স্বচ্ছন্দে পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে, দুইজন মাত্র নারীতেও তা পারে না কেন? কবির ভাষায়, যে মনের ভিতর কোমলতার নানারূপে বিকাশের কথা শুনিতে পাই, কুটিলতা কি সেখানেই সবচেয়ে বেশি?

খালের ধারে ধারে পথ—তীরের গায় গায় কতগুলি নৌকা বাঁধা, সুন্দর নয়, পানসী নয়, বড়লোকের সাজানো বজ্‌রা নয়—এ কেবল ব্যবসায়ীদের বস্তাভরা বিশ্রি কুৎসিৎ প্রকাণ্ড এক একটা নৌকা। কিন্তু তবু বেশ লাগিতেছে, জ্যোৎস্না-প্লাজলে ইহাদের জল তোলা এবং স্নানকরা ও কাপড় কাচার ঝুপঝাপ শব্দ—এবং নৌকার উপর উনুন ধরানোর ধুঁয়া—এ আমার বেশ লাগিতেছে,—সভ্যতার জগতে রুচি অনুযায়ী পরিমার্জ্জিত যে সৌন্দর্য্যের ধারা, সে শোভা আমার জন্ম নহে, দরিদ্র আমি, দারিদ্র্যের মাঝে যে নগ্ন সৌন্দর্য্যের প্রকাশ, তাই কি তা'ই আমার এত প্রিয়?

পাষাণী আমার, আজ একবার কাছে যাইতে আহ্বান করিয়াছ, এতকাল পরে কেন এ স্মরণ রাণী—? তোমাদের এন্‌গেজমেণ্টের ফুল কিনিয়া দিতে কি? হউক তা,—তবুও সে তোমার আহ্বান! আনন্দের আতিশয্যে একবার তাই আজ বায়স্কোপে যাওয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম, মনের আনন্দে দোকানে গিয়া খানকয়েক চপ এবং দুই কাপ চাএর সদ্ব্যবহার করিয়া রওনা হইলাম,—কিন্তু পথে চলিয়া মনটা কেমন করিয়া এমন বিকল হইয়া পড়িল,—ভগবান জানেন। কিন্তু সে দোষ তোমার নয়, আমারো নয়, রাণী আমার, সে দোষ আমার জন্ম নক্ষত্রের! ফিরিয়া রওনা হইলাম এইপথে, যেখানে দরিদ্র-প্রাণের সহজ কথার সহজ সুর! মনে হইল তাইত, আমার মত দুঃখীর আবার এ বিলাসের সুখ কেন?

পথে চলিয়াছি, আকাশে অগণ্য নক্ষত্ররাজি, যে যার ক্ষুদ্র জ্যোতিটুকু লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে পথ অন্যদিন দেহের অবসন্নতায় অত্যন্ত দীর্ঘ বোধ হয়, আজ যেন তাহা নিমেষেই ফুরাইয়া আসিতেছে—আজ যেন আর আকাশের তারা দেখিয়া সাধ মিটিতেছে না, নক্ষত্রের অক্ষর দিয়া আকাশময় তুমি যে সুন্দর চিঠিখানি আমাকে লিখিয়াছ, তাহাই পড়িতে পড়িতে পথ হাঁটিয়া চলিয়াছি।—এই পথচলায় একটা সত্যের সন্ধান আজ পাইলাম, নিজেকে এমনি করিয়া উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিবার যে একটা সার্থকতা আছে, আকাশের তারা আজ আমায় সে কথা বলিয়া দিল। এইযে চাওয়া নাই, পাওয়া নাই, শুধুই দেওয়া আর দেওয়া—এ দানের একটা গর্ব্ব আছে।

* * * *

রাণু আমার, মানুষের বুকে যত ব্যথা সেই পরিমাণে যদি মানুষ কাঁদিতে পারিত তাহা হইলে সেই কান্নার স্রোতে ভাসিয়া বিশ্ব এতদিনে উজাড় হইয়া যাইত। কিন্তু মানুষ যে বিশ্ববিধাতার কতবড় সৃষ্টি তখনই দেখিয়া অবাক হই, যখন দেখি, কত বড় বড় কান্নার 'সাইক্লোন' হাসির একটু মৃদু হাওয়ায় কোথায় উড়িয়া যায়। হৃদয় বলিয়া যে বড় একটা সত্য জিনিষ মানুষের আছে, সেটার প্রভাবেই মানুষ আপনি ব্যথার সৃষ্টি করে, আবার এই হৃদয়ের জোরেই মানুষ সবলে তাকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। তাই যদি না হইত, তবে এতবড় সব কাব্যের এতবড় বিজ্ঞানের সৃষ্টি কি করিয়া সংসারে হইত!

তুমি হাসিয়া বলিলে 'সুধীরদা, কি হয়েছে তোমার, দিনকে দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন? কেন এমন হয়েছ সুধীরদা, মেসে খাওয়া হয় না ভাল?

বুকটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলাম, চিরটা কাল ত মেসে খেয়েই মানুষ রাণী—

তা বটে, কিন্তু তখন ত কই এমন শুকোও নি। মেসের ভাতে কি এখন আর জোর নেই?

তখন হোত না, এখন কেন হয়? হাসিলাম, ডান হাত-খানি ধরিয়া এধারে ওধারে ঘুরাইয়া করুণ ব্যথিতস্বরে রাণী বলিল "এই কি তোমার হাত সুধীরদা? বাবাঃ, এত রোগা হয়ে গেছ!" হাসিলাম, উত্তর নাই—কি উত্তর দিব?

হাতের চাঁপাফুলটী রাণীর খোঁপে গাঁথিয়া বলিলাম, "ফেলে

দিয়ো না রাণী!" শান্ত দুইটি করুণ চোখ তুলিয়া রাণী আমার মুখের দিকে চাহিল, চোখদুটি তাহার কিসের ভাবে তখন এমন টলটল করিতেছিল? জল কি?—

মিঃ বোস সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "মিস দাস, সবাই হাঁ করে বসে আছে আপনার গান শুনবে বলে, আর এই বুঝি আপনার পাঁচমিনিটের সময় নেওয়া! বেশ চালাকী শিখেছেন ত!"

রাণী তাহার স্বভাব কোমল হাসি হাসিয়া বলিল "চালাকী নয়, চলুন না যাচ্ছি। এসো সুধীরদা,—"

মিঃ বোস একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। রাণী মৃদুকণ্ঠে বলিল "সুধীরদা ভাই, ভগবানকে খাজনা দেওয়া দেখেছ কখনো?"

"কি রকম?"

রাণী হাসিয়া বলিল "এই যেমন আমাকে দিয়ে হচ্ছে—"

"বুঝলুম না—"

"বুঝলে না? বাঃ, বড়লোক হয়েছি, ভদ্রবংশে জন্মেছি, সে বুঝি অমনি? ভগবানকে অত দয়ালু মনে করো না সুধীরদা, যেটুকু তিনি দেন তার ষোলগুণ তিনি আদায় করে নেন, জমিদাররা যেমন গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দেয়,—"

"দেয় বটে খাজনা, তা সেত তাদের পাওনা থেকেই পুষিয়ে যায়, ঘর থেকে ত বার করে দেয় না!"

না, তুমি জান না সুধীরদা, কত বড় বড় জমিদাররা খাজনা দিতে দিতে শুধু শুষে যান, পাওনার চেয়ে আদায় তাঁদের কত কম—ভেতরের খবর কে কবে রাখে সুধীরদা!"

* * * *

মনের ভিতর সুরাসুরের মন্থন চলিতেছিল—রক্তাম্বরা লক্ষ্মী ঠাকরুণ কখন হঠাৎ তাঁর আশ্বাসের পতাকা হাতে সম্মুখে আসিয়া আমার দাঁড়াইলেন; মনটা আমার তৃপ্তির পূর্ণতায় ভরিয়া উঠিল। সংসারে ব্যথা কিসের? ব্যথা আবার কি? কল্পনায় নিজেরই গড়া একটা মায়ার মূর্ত্তির পানে চাহিয়া মানুষ সমস্ত বিশ্বটাকেই কি করিয়া এমনভাবে অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে?—অভাব! অভাব আবার কিসের? বুকের ধনকে হাতের স্পর্শে না পাইয়াও সমস্ত বুক জুড়িয়াই যদি তাহাকে পাই, অভাব তবে কোথায় থাকে?

রাণু, তোমার ঐ হৃদয় শুষে খাজনা দেওয়ায় ভগবানের কিছু করুক বা নাই করুক, আমার বুকে এত বল কোথা হইতে আসিল? তোমার চোখের জলে আমার সমস্ত ব্যথা ধুইয়া গেল যে! আজ ত আর কোনো বিষাদ-রাগিনী মনে বাজে না, যেটুকু আমি পাইয়াছি, আমার এ জীবনকে তাহাই পূর্ণ করিয়া রাখুক।

সংসারে শুধু কান্নাটাই কি এত বড়? এত যে দুঃখী আমি, তবুত জীবনটাকে আমার তত অন্ধকার বোধ হইতেছে না! যতদিন বাঁচি বেশ মানুষের মত বাঁচিয়া যাই। এই যে পৃথিবীতে এতদিন বাঁচিয়া এতকিছু শিখিলাম, এতকিছু সম্ভোগ করিলাম, তার জন্য কোন দাবী কি সংসারের আমার কাছে নাই? সে ঋণ রাখিয়া শুধু যদি কান্নার জলে আপনাকে নিঃশেষে ধুইয়া ফেলি তবে এইযে পাপের ভরা আমারই জন্য জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া কেবল পূর্ণ হইয়াই উঠিবে, তাহাকে আমি ঠেকাইয়া রাখিব কিসের জোরে? ছিঃ, কান্না কি! পুরুষ মানুষের জন্য এই এতবড় মিথ্যাটার সৃষ্টি হয় নাই—হয় নাই বটে, কিন্তু যে শক্তির জোরে পুরুষ এই মিথ্যা জিনিষটাকে সবলে পিছনে সরাইয়া রাখিবে, সে শক্তি যে আসে, এই কান্না যাদের শোভা পায় সেই নারীর ভেতর হইতেই, ওই যে কোমল বুকের রেশমী সুতার বন্ধনটুকু শুধু এরই জোরেই যে সমস্ত বিশ্বশক্তি আজ দিনের পর দিন পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া আবিষ্কার করিয়া এই বহুযুগের প্রবীন পৃথিবীটাকে নূতন নূতন বেশে সাজাইতেছে।

হিংসাকে, দ্বেষকে মানুষ কত ছোটচোখে দেখে, কিন্তু আমিত ভাবিয়া দেখি এই হিংসা না থাকিলে মানুষ বড় হইতে পারিত না, একজনের চেয়ে অপরের বড় হইবার আকাঙ্খাটা মানুষের যদি না থাকিত, তবে কবে এই পৃথিবী গভীর একটা আলস্যে সৃষ্টির পদতলে মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়া থাকিত।

এই হিংসা, এই বিদ্বেষ আজ আমায় শক্তি দিক। অরুণ বোসের আকাঙ্খা ক্ষুদ্র, অতি ছোট, আমার রাণীর ঐ

তরুণ দেহলতা খানিরই উপর ওর যত লোভ—কিন্তু আমার মত ঐ প্রেমময় হৃদয়খানি কি সে কোনদিন পাইবে? আমি যাহা পাইয়াছি সমস্ত বিশ্বে যে তার দাম নাই রাণু। আমার, ঐ হৃদয়খানি তোমার এমনি সঞ্জিবীত যদি চিরকাল থাকে, আমার এই জীবনটার পক্ষে তাহাই যে যথেষ্ট,—তোমার ও প্রাণের রস আমার মুখের পেয়ালায় চিরকাল ভরিয়া থাকুক,—কার সাধ্য তবে আমায় পদানত করিয়া যাইবে!—জীবনে বড় হইব, নিশ্চয় হইব, আমার প্রাণ আছে, আশা আছে, উৎসাহ আছে, উল্লাস আছে, উদ্যম আছে, তারই পরিচয় দিয়া যাইব। কাঁদিব কেন? কাঁদিবে তাহারা, যাহারা পিছনে পড়িয়া থাকিবে, আমাদের ক্ষুদ্র জগতে কর্ম্ম-চঞ্চলতা কি কম?

পাপ পুণ্য আবার কি? শাস্ত্রেগড়া ও পাপ পুণ্য আমি মানি না, ও চিন্তা আমাকে কাজে অক্ষম করিয়া তোলে, আমার মনকে অবসন্ন করিয়া দেয়।

— ৩ —

মানুষ যখন তার প্রবৃত্তিকে সীমানা ছাড়াইয়া উঠিতে দেয়, তখন সেখানে শুভাশুভের, যোগাযোগের চেয়ে গোলযোগই হয় বেশি। নারী কোমল—সত্য, এই কোমল রূপেই সে সুন্দর তা'ও সত্য, কিন্তু এই কোমলতা সীমানাকে ছাপাইয়া যেদিন উঠে, সেদিন তার দুঃখের দিন।

বন্ধুবর অনিলকুমারের বালীগঞ্জের বাড়ীতে গিয়া সেদিন আমার এ শিক্ষা হইয়াছে। বন্ধুপত্নী শ্রীমতী রেখা আজ একবৎসরেরও অধিক, স্বামীর সংসারের গৃহিণী হইয়া আছে, কিন্তু বেচারী আজিও সংসার খানি ভালো করিয়া পাতিতেই পারে নাই, জানে ও না, মাতৃহীন সংসারে শিখিবার সুযোগ পায় নাই, এবং শিখিবার আগ্রহ কিংবা ইচ্ছাও নাই, মেয়েটীকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম; সে মোটেই সাংসারিক জীব নহে, অনিলকুমারও তথৈবচ—সুতরাং দুজনে মিলিয়া, কতগুলি ঝি চাকরূরূপ কল টিপিয়া সংসারের একটা কল চালাইতেছে, তাহাতে প্রাণের নিতান্ত অভাব।

এতদিন নানা জায়গায় ঘুরিয়া সংসারের যে দিকটা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, এখানে তার বিপরীতটাই দেখিলাম। দেখিলাম কোনটাতেই আশানুরূপ আনন্দ বা শান্তি নাই. দুইটা হচ্ছে দুই চরম অবস্থা, মানুষের যে কমনীয় শান্তি রেখাটুকু, তাহার সন্ধান এই দুই অবস্থার মাঝখানটীতেই বুঝি মিলে; কিন্তু তবু এই সব ভাব-রাজ্যের প্রাণীরা, অতিসংসারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীব,—কিন্তু শ্রেষ্ঠতম হয় তাহারাই—যাহারা ভাবের সহিত কর্ম্মের মিলন ঘটাইয়া চলে।

এইখানে, এই ইহাদের সঙ্গে আমার রাণীর তুলনা করিয়া আমি কত আনন্দ পাই। শিক্ষা তাহাকে নষ্ট করিতে পারে নাই, অহঙ্কারী করে নাই, শিক্ষা তাহার বদহজম হইয়া তাহাকে ফাজিল করে নাই. ন্যাকা করে নাই, এককথায় চরিত্রের মাঝে শিক্ষাকে সে পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়া প্রকৃতিকেই আয়ত্ব করিয়া নিয়াছে, প্রকৃতি তাহাকে আয়ত্ব করিতে পারে নাই।

রেখার দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, বেচারী অতি-মাত্রায় কোমল, অত্যন্ত ডেলিকেট, সে শুধু জানে ভালবাসিতে. ভালোবাসিয়া প্রিয়জনের জন্য প্রাণ দিতে, কিন্তু, ভালোবাসিয়া বিপদের বিরুদ্ধে লড়িতে সে জানে না।—মেয়েদের এই দিকটা নিয়া কাব্য লেখা চলে, কিন্তু সংসার করা চলে না। সংসার করা চলে তাদের নিয়াই,—যারা করুণায় কঠিন, স্নেহে শক্তিশালী, প্রেমে বিশ্ববিজয়ী। - নারীর এই রূপেই পুরুষের সঙ্গে তার প্রকৃত মিলন,—এই জন্যই বুঝি, যুগে যুগে, কালে কালে নারীর সেবিকা মূর্ত্তিটীকেই ভারত এমনই করিয়া অকৃত্রিম ভাবে পূজা করিয়া আসিয়াছে, তাই বুঝি, শুধু সংসার ক্ষেত্রে নয়, কর্ম্মক্ষেত্রে এবং ধর্ম্মক্ষেত্রেও এই মূর্ত্তিতেই নারী পুরুষের সহকর্ম্মিনী সহযোগিনী।

……ভাবিতে ব্যথা পাই, বুকে ভাঙ্গন ধরে, আমার রাণী আমার আদর্শের অনুরূপ,—আমার স্বর্গের সুষমা আমার কল্যাণী আর দুদিন পরে না কি বিলাসীর ঘরের উপকরণ মাত্র হইবে!… ..হায় জাত সর্ব্বস্ব হিন্দু,—এই যে একটী সরল রেখা, ব্রাহ্মণ কায়স্থরূপ দুইটী জাতির ভিতর দিয়া কোন আদি যুগ হইতে পরস্পরকে পরস্পর হইতে কত দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, এ রেখা নিঃশেষে মুছিয়া, সমস্ত ভেদাভেদ না মানিয়া, এই দুইটী জাতিকে এক করিয়া

দিতে পারে,—এমন শক্তিশালী এ বিশাল ভারতে কেউ কি নাই?…একটা কথা মনে হইয়াছিল, মনে হইতেই শিহরিয়া উঠিলাম,… সর্ব্বনাশ, এ কি নীচতা, সমাজের বুকে বসিয়া, প্রকাশ্যে তাহার সঙ্গে বিদ্রোহ করিয়া, আঘাত করিতে তাহাকে না-ই যদি সাহস পাই, দূরে পলায়ন করিয়া বুকে তাহার চিরকালের জন্য কলঙ্ক লেপন করিয়া যাইব, এতই কি কাপুরুষ আমি!—ছিঃ!

— ৪ —

রাণীর কথা

কাল সকালে আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল—আজ হতে আর দশদিনের দিন, আমার এই সাপের খোলস বদলে ফেলে নতুন বেশে আমায় সাজতে হবে,—তখন আর আমি মা বাবার আদরের মেয়েটী নই, বেথুনে-পড়া কলেজের মেয়েদের বন্ধু নই, আমার সুধীরদার সে রাণু নই,—আমার তখন কত বড় সম্মানের পদ, আমি তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী, আমি তখন মিসেস বোস! ভাবতে চমকে উঠি, নিজেকে শুদ্ধু ভয় পেয়ে যাই।

মানুষের উপর একটা ঘেন্নার ভাব এসেছে, যাদের মন বলে একটা জিনিষের কোন মূল্যই নেই, তাদের আর আছে কি! কিছু না—পৃথিবীটা কিছু-ই না,—কেবল কতগুলি টাকা কড়ি আর ফাঁকা সম্মানের পিণ্ড!—

আচ্ছা, একবার'টি বিদ্রোহ ঘোষণা কর্লে কেমন হয়? হায়, হাসি পায়,—বিদ্রোহ কর্ব্বে কারা? বাঙ্লার এই মরা নারীরা? সে কি এদের কাজ? কিন্তু এইটেই ভেবে আমার সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে, আর্য্য যুগের দেবী বলে আমরা যাঁদের পূজা করি, সেই দেবীদের কাজ যদি আমরা কর্ত্তে যাই, আমাদের তবে লোকে পিশাচী বলে কেন?

পিতামাতার বিবাহ সভার উৎসব ব্যর্থ করে দিয়ে রাতারাতি চিঠি লিখে রুক্মিণী দেবী পালিয়ে গেলেন তাঁর ভালোবাসার দেবতাটির সঙ্গে, ঊষাদেবী তাঁর নির্জ্জন নিরালা ঘরে, রাতের অন্ধকারকে ব্যর্থ করে দিয়ে, অনিরুদ্ধকে ডেকে নিলেন—সুভদ্রা দেবী তাঁর আজন্মের আত্মীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে, দিব্যি হেসে অর্জ্জুনের পাশে বসে চলে গেলেন সে কি পারি আমরা। সে পারতেন তাঁরাই—সে শোভাও পেত তাঁদেরি শুধু সে যুগ গেছে, সে যুগে ধনের চেয়ে, ঐশ্বর্য্যের চেয়ে মনের দামই ছিল বেশী,—সে যুগ গেল।

লোকে আমাদের বলে বটে, লেখাপড়া শিখে মেয়েরা সব স্বাধীন হয়েছেন, নিজে ইচ্ছে করে কোর্টসিপ্ করে তবে তাঁদের বিয়ে হয়! কিন্তু সে কথা ক জায়গায় সত্যি? নিজেদের টাকার ওজন করে, নিজেদের মান কুল সব বজায় রেখে পিতামাতার নির্দ্দেশ ক্রমে, তবে যে আমাদের নিজের মনকে বিকোতে হয়, কত ভাবে কতরকমে নিজেকে বিক্রী কর্ত্তে হয়, সে টা কে তাকিয়ে দেখে?

…মনটা এক একবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, আজই এ অধিকার স্থাপনের চেষ্টা কেন? আজই যার উপর এত সন্দেহ, এমন একটা অবিশ্বাসের ভাব, তাকে সত্যি ভালো বাস কতটুকু সেটুকু একবার জানলে হোত। তোমার চোখে মুখে শাসনের যে একটা তীব্র জ্যোতিঃ সে আমার সহ্য হয় না। এক একবার ভাবি সত্যি এ বিয়ে কি মানুষের সঙ্গে মানুষের, না কি বাবার আমার, ধন সম্পত্তি কুলশীলের সঙ্গে ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতার!

সুধীরদা আমার মুখের কেবল হাসিটাই দেখে, আমার মনের আনন্দটাকে শতধা হয়ে, আমার গানে হাসিতে, কথা বার্ত্তায়, সাজে সজ্জায় কেবল ফুটে বেরুতেই দেখে,—কিন্তু হায়, জানে না ত, কি করেই বা জান্‌বে, নারী হয়ে ত জন্মায় নি কখনো, এ হাসি এই গান, এ যে নারীর জীবনের কত বড় একটা পর্দ্দা, কত বড় আবরণ—

কাল দুপুরের গাড়ীতে, আশীর্ব্বাদের পরই সুধীরদা রিলিফে বেরিয়ে গেলেন, কোথায় কোথায় সব 'ফ্লাড' হয়ে গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারই তত্ত্বাবধানে। একবার বলেছিলুম,—আর নয়টা দিন থেকে একেবারে চিরবিদায় দিয়েই যাও না সুধীর দা,—সুধীরদা হেসে বল্লেন, না ভাই সব ভেসে যাচ্ছে,—অভাগাদের আর্ত্তনাদ এখানে শুদ্ধু শুন্‌তে পাচ্ছি, যেতেই যদি হবে, দেরী করা আর কেন, দেরীতে ক্ষতি বই লাভ ত কিছু হবেনা! আমি বল্লুম, "লাখে লাখে লোক ভেসে যাচ্ছে, তোমার ত ঐ দুখানি

হাত, ক'জনকে তুমি আটকাবে?" আবার তেমনি একটু হেসে সুধীরদা বল্লেন—"হাত বটে মাত্র দুখানিই আমার, কিন্তু, এই হাত দুখানি তুলেই একবারটি যদি ডাকি, লাখে লাখে হাত এগিয়ে আসবে রাণু,—বাংলাদেশের মানুষগুলোর মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাক্ বা নাই থাক্, ঐ হুজুগটুকু আছে বলেই অত শত বিপদেও দেশটা বেঁচে আছে, এ সব বিপদে, দুর্ভিক্ষের চাঁদা তুলতে বা এম্নি কিছুতে, লোককে এগুতে কি কিছু কম দেখেছ রাণী?" তারপর আবার একটু হেসে, গাল দুটো আমার একটু টিপে দিয়ে চোখে মুখে দুষ্টুমি ফুটিয়ে তুলে বল্লেন শুদ্ধ হাত দুখানি তুলে দেখালেই অত লাখে লাখে লোক ছুটে আসবে, কোন্ ম্যাজিষ্ট্রেটের শক্তি আমার চেয়ে বেশী রাণু?

তারপর সত্যি চলে গেলেন! মার অনুরোধ, বাবার কথা কিছুতে তাঁকে আটকে রাখতে পার্লে না। যাবার সময় একান্ত নিভৃতে মাথাটি পায়ের তলায় লুটিয়ে প্রণাম করে বল্লুম—"সুধীরদা আশীর্ব্বাদ করে যাও—"

ধীরকণ্ঠে বল্লেন—"কি আশীর্ব্বাদ রাণু?"

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছিল, কষ্টে বললুম "পরজন্মে যেন ঐ আমাদের পাশের খোলার বাড়ীগুলোর নাপিত ধোপা কি জেলেদের মেয়ে হয়ে জন্মাই।"

সহসা সুধীরদা দুইহাতে আমার মাথাটি টেনে তাঁর বুকে চেপে ধরলেন, আর তাঁর চোখ দুটি থেকে ঝর ঝর করে ফোটা কয়েক জল আমার গালের উপর গড়িয়ে পড়ল। তারপর চলে গেলেন, মিনিট দুই তিন সেই শূন্য পথটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ঘরে ফিরবার পথে প্রথমেই চোখে পড়ল দরজার কাছেই মিঃ বোস্‌কে,—হেসে বল্লেন,—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, চল একটু ছাতে যাই, কোথায় গিয়েছিলে নীচে?—'হাঁ, সুধীরদাকে গেটের কাছে পৌঁছে দিয়ে এলুম।'

— ৫ —

প্রায় বছর খানেক হোতে চলল এখানে আছি, 'ফেয়ারী হিলের' নীচে সুন্দর আমাদের বাংলোটী—চারপাশে গাছ পালা ফল ফুলের বাগানে ঘেরাও করা—বড় সুন্দর—বড় ভাল লাগে। সারাটী দিনই প্রায় কেবল আশে পাশে বন জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াই; ঠিক একলাটি নয়, হিন্দুস্থানী মেয়ে দুলিয়া থাকে আমার সঙ্গিনী। শুধু আজ নয়, আজ এই চারটী বছর ধরেই দুলিয়াই আমার সঙ্গহীন বিশ্রী জীবনটার একাকীত্ব ঘুচিয়ে আছে, পাড়ায় কিংবা কারো বাড়ীতে কখনো যাই না, উনি তা পছন্দ করেন না,—ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী, গরীবের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি! গরীবের সঙ্গে অত মেশামেশী কর্লে বড়লোকের সম্মান থাকে কোথায়!

তাই যথাসম্ভব প্রাণপণ এবং মনপণ করেও স্বামীর আমার এই সম্মানটুকু আমি বাঁচিয়ে চলেছি। কত দীন দুঃখী, কত রোগাতুর আর্ত্তের ক্রন্দন এক একবার কাণে ভেসে আসে—কাণ দুটোকে চেপে রেখে নিজেকে স্বামীর প্রাসাদের কোণে তাঁর দেওয়া সাজসজ্জা, দাসদাসী আভরণের নীচে চাপা দিয়ে রাখি। ভাবি, অভাব আমার কোথায়? এত সম্মান, এত ঐশ্বর্য্য আমার সহপাঠিকাদের মধ্যে কার আর হয়েছে! ঝি চাকর দ্বারোয়ান বেয়ারাগুলি শুদ্ধ 'মেমসাহেবের' একটা হুকুমের জন্য সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে—দেখি, ভাবি, আর মনে একটা হাসির আভাস দেখা দিয়েই কেন কি জানি কোথায় মিলিয়ে যায়। যাক, তবু বেশ আছি। আমার এ ফেয়ারী হিল, আমার এ কর্ণফুলীর জলস্রোত, আমার আশে পাশের এত সব ছোট ছোট পাহাড়,—এরা আমায় মুগ্ধ করে দেয়, পাগল করে দেয়। যে আপনাকে রিক্ত করে দিয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে মনে প্রাণে মিশে যায়, এ সৌন্দর্য্য ভোগ করা তারই সঙ্গে শুধু,—স্বামীর আমার সে অবসর কোথায়? দিন রাত যাঁর মন সম্মানের মোহে, যাঁর চোখ 'রূপেয়ার রূপে' ভরপুর—এ সৌন্দর্য্য তাঁর কি করিতে পারে!

— ৬ —

সুধীরের কথা

সুন্দর আমার জায়গাটি! শুনেছি কোন মুসলমান ফকির নাকি কবে এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাই এ স্থান মুসলমান ফকিরদের পুণ্যতীর্থ, পুণ্য ভবন। এ বন-ভবনে ভগবান আমার শেষ জীবনের শেষ ভারটুকু নাবাতে এনেছেন। সকালে সন্ধ্যায়, দিনে দুপুরে, রাত্রির আঁধারে

দরজার চৌকাঠটীতে বসে থাকি, আর কত কথা মনে পড়ে, কত কথাই ভাবি, - কিন্তু স্মৃতির সমুদ্র আলোড়ন করেও ব্যথার কথা দুই একটাও কই মনে ত পড়ে না! মনটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগাতে যাই, একটু ব্যথা বোধ হলে তৃপ্তি হোত বলে মনে হয়, কিন্তু হায়, ব্যথাত কই হয় না! একি এ জায়গার গুণে? কে জানে, তাই বা বুঝি হবে!

শুনেছি মুসলমান ফকিররা চাটগাঁয়ের এই প্রান্তে তাঁদের তপস্যার ক্ষেত্র করেছিলেন, এইখানে বসে তাঁরা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ কর্ত্তেন, তাই কি তাঁদের সেই পুণ্য জীবনের স্মৃতি, এখানকার আকাশে বাতাসে আজও এমনিভাবে মিশে আছে, যে কোন পাপবোধ কোন দুঃখবোধই এখানে এলে আর থাকে না!

… …ক্ষমা? সে অনেকদিনই করেছি। এ দেহটায়, এই মনটায় যত কিছু আঘাত এই চারিটী বছর ধরে ক্রমাগত কেবলই তুমি দিয়েছ অরুণ,—সে সব পরিষ্কার মনে আমি তোমার ক্ষমা করেছি। আমি ত জানি, পিশাচ কি মানুষ সহজে হয়? অনেক দুঃখেই হয়, কত দুঃখে তুমি অন্তরে অন্তরে নিজে পিশাচ হয়ে বসেছ, সে আমি জানি। প্রার্থনা করি—আজ জীবনের এই শেষ সীমানায় এসে এই প্রার্থনা শুধু করি—সুখী হও, অত দুঃখের অত কষ্টের তোমার নিবারণ হোক।

কিন্তু বন্ধু আমার, এইটে আমি কিছুতে ত ভুলতে পারি নে, নিজের স্ত্রীর নারীত্বের প্রতি তুমি কত অপমান করেছ, তাকে তুমি ভালোবাস না, তাকে তুমি শ্রদ্ধা কর না, তুমি ভালোবাস শুধু তার ঐ রূপৈশ্বর্য্যময়ী তরুণ দেহ-লতাটিকে, তার যৌবনকে—এ কথা ভাবলে এ অবশ মনটাও আমার শিউরে উঠে। যদি শুদ্ধ তার জন্যই তাকে ভালো-বাসতে, তবে কি এতদিনেও তার মন ফিরতো না?

আঁধার ঘনিয়ে আসছে, চোখদুটোও জলতে আরম্ভ হয়েছে। আজ কি তবে জ্বরটা এত সকালেই এলো? কে জানে, সন্ধ্যে কি তবে পার হয়ে গেছে? আমার রাণীর গাড়ী ত কই এদিক দিয়ে আজ আর গেলো না! ঠিক সূর্য্যাস্তের সময়টায় আকাশটা ওদিক দিয়ে যখন লাল হয়ে আসে, আমার রাণী তখন ও পাহাড়ের তলাটা দিয়ে ঘুরে বাড়ী ফিরে যায়, লাল আলো পড়ে' তার গোলাপী মুখখানি, তার কাণের দোদুল দুলদুটি, ব্লাউসের পাশ দিয়ে তার শুভ্র সুন্দর গলাখানি, ঘাড়টি মিনিট দুয়ের জন্য চোখের সামনে আমার লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ধরে ফুটে উঠে, চোখে যখন আর দেখতে পাই না, গাড়ীর চাকার ঘরঘর তখনও শুনি, চোখদুটি বন্ধ করে সমগ্র প্রাণমন তখন আমার এই কাণদুটির মূর্ত্তি ধরে একান্ত ভাবে তাই কেবল শোনে। তারপর সারারাত—সারাটি রাত কাণে আর ত কিছু ঢোকে না, খালি শুনি চাকার একটা বুকফাটা আর্ত্তনাদ ও আর্ত্তনাদ কা'র তা'ত আমি জানি, আমার রাণী যে তার সমস্ত পাদক্ষেপে তার সমস্ত কথাবার্ত্তায়, তার স্বল্প একটু হাসিতে, তার বুকের ঐ ঢিপঢিপ শব্দে, ঐ করুণ আর্ত্তনাদটা তার ফুটিয়ে চলে, সেকি আমি জানি না। আজ চার বছরের অদর্শন--তাতে কি? ভালোবাসা যে টেলিগ্রাফের তার—সে তারে তার সব খবর আমি পাই।

চোখে জল আগে কখনো আস্‌তো না, আজ দু'দিন তাও যেন একটু একটু আস্‌চে। গণা দিন ফুরিয়ে আসছে কিনা; তাই যখন মনে হয়, রাণু আমার অত কাছ দিয়ে যাবার সময়ও জেনে যায় না, সুধীরদা তার আজ কত কাছে,—তখন যেন ধৈর্য্য সীমার অনেকটা বাইরে চলে যায়। ইচ্ছে হয়—ইচ্ছে হয় ছুটে একবার কাছে গিয়ে বলি, রাণু আমার মিষ্টি আমার, সব—সবটুকু আমার, একটীবার চেয়ে দেখ, তোমার সুধীরদার আজ কি অবস্থাই হয়েছে!—কিন্তু না থাক, কি কাজ স্বামীর উপর তার আর অশ্রদ্ধা বাড়িয়ে!

উঃ, জ্বরটা আজ এমন করে হুহু করে কেবলি বেড়ে উঠছে কেন? বুকটা, হাত পা গুলো এমন করে কাঁপছে কেন আজ? কে জানে, অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে কি?——কিন্তু… সন্ধ্যে আজ কখন পার হয়ে গেল!—অসম্ভব, রাণীর গাড়ী আমার না গেলে সন্ধ্যে কি হ'তে পারে? ও আঁধার অম্‌নি, বাদলা দিন ত নয়. তবু বোধহয় আকাশ ভেঙ্গে জল আসছে!

(৭)

বাবুজি—

চমকে উঠে চোখ মেলে তাকালুম,—দোরে দাঁড়িয়ে

পাহাড়ী মেয়ে সোনা, প্রতিদিনকার মত একহাতে গরম দুধের বাটি, অন্যহাতে একটা ছোট পিতলের রেকাবীতে খানিকটা চিনি। চোখে আমার জল এলো, কতকাল—কতকাল আর এ ভোগ জোগাবে প্রভু! আর কতকাল এ শীর্ণ দেহটা শ্বাস প্রশ্বাসের ভার বয়ে বেড়াবে! কোথায় আজ আমার মা, আমার বাবা আজ কোথায়! আজ এ মরণ-শয্যায় কারুর হাতের একফোঁটা জল কি অদৃষ্টে আমার ছিল না? নইলে কোথাকার কে এই পাহাড়ী মেয়ে, কবে বুঝি একদিন একটা সাপের কামড় থেকে একে বাঁচিয়েছিলুম, তাই এই কৃতজ্ঞ পাহাড়ী পরিবার দুঃসময়ের কাজটুকু আমার করে দিচ্ছে। উনুনটায় আগুন দিয়ে নিজের হাতে দুটো চাল ফুটিয়ে নেবার জোরটুকুও দেহে আর এখন নেই, এদের হাতের এ সেবাটুকু যদি না পেতুম, এ জীবন-দীপ কবেই বুঝি তবে নিভে যেত!

বাবুজি, কাল রাত্রে তোমার বড্ড জর এসেছিলো ডেকে আর তুলিনি, দুধের বাটি তোমার তেমনি যে পড়ে আছে!—মাথাটি তুলে কষ্টে একবার পাশে তাকিয়ে দেখলুম, একটা বই দিয়ে দুধের বাটিটা ঢাকা, পাশে একটা গেলাসে জল, উপরের পাতলা কাগজের আবরণখানি তার হাওয়ায় উড়ে একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে আর গোটা চার পাঁচ ছোট ছোট মরা মাছি জলটার উপর ভাসছে—সারাটা দেহ আমার একবার শিউরে উঠে আপনি চোখদুটো বুঁজে আসলো, মাগো জর শান্তির সময়ে ভোরের দিকে ক'বার আজ এই জলটাই খেয়েছি!

বহুকষ্টে সোনার যত্নে মুখ ধুয়ে গরম দুধটা খেয়ে আবার আমার সেই চৌকাটটীতে এসে বসলুম,—হায় চোখদুটো যে আজ বড্ড ক্লান্ত, আজ যে আর চাইতে পাচ্ছি না, মোটে ত এই সকাল হয়েছে—সন্ধ্যার আরো কত দেরী!

* * * *

(৮)

বাবুজি—

কেন রে সোনা?

কি সুন্দর দুটো গোলাপ দেখ!

ক্লান্তিতে মেঝের উপর দেহটা এলিয়ে দিয়ে চৌকাটে মাথা রেখে পড়েছিলুম, ঘরের ভিতর ঢুকতে সাহস হয় না আমার, রাস্তার উপর দিয়ে আজ তিনদিন আমার অজ্ঞাতে কখন সন্ধ্যেটা বয়ে যায়, আজ তিনদিন আমার রাণীকে দেখি নি। কিন্তু হায় অবাধ্য চোখদুটো তাকাতে আর চায় না যে, খালি খালি মুদে আসে! সোনা সস্নেহে বল্লে, মাটিতে কেন বাবুজি, ওঠ চল, ঘরে আমি বিছানা পেতে দিচ্ছি।

চোখে জল আসিল, সামলে নিয়ে বল্লুম, বিছানা কি ওই মাদুরটা ত শুধু, তা এইখানেই পেতে দে সোনা, ঘরে আর যাব না।

কেন বাবুজি, আঃ আজ এই দুপুরেই তোমার এত জর এলো? গা যে পুড়ে যাচ্ছে বাবুজি, ডাক্তার বাবুকে খবর দিতে বলবো বাবাকে?

ভয় হোল, জরের ঘোরে চোখদুটো আচ্ছন্ন হয়ে আসছে যে অন্ধ হয়ে যাই যদি, না না, ওকথা আমি ভাবতে পারি না, রাণীকে দেখে আমার সাধ মেটে নি যে, কি করে আমি এখন মরবো, বুকে অতবড় অতৃপ্ত আশাটা নিয়ে? হায় রে মরণের দুয়ারে এসে জীবনটার উপর আজ এত মায়া? ডাক্তারের ওষুধের সে জোর কি নেই, যাতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চোখদুটীতে আমার সমান জ্যোতি রাখতে পারে?

ও গোলাপ দুটো কোথায় পেলি সোনা?

ম্যাজিষ্টর সা'বের বাড়ী বাবার সঙ্গে দুধ দিতে গেছলুম বাবুজি, মেমসাবের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছি।

আমার সারা প্রাণ লোভাতুর হয়ে ও ফুলদুটোর উপর ঝুঁকে পড়লো, কম্পিতকণ্ঠে বলে উঠলুম, ও ফুলদুটো আমায় দে সোনা, ও আমার, ও আমায় দে,—

"তোমার জন্তেই ত এনেছি বাবুজি, ওত তোমারি ফুল—"

সোনা চলে গেল, ফুল দুটোকে জোরে বুকের উপর চেপে ধরলুম, ও মেম সাহেবের ফুল? আমার রাণীর? আমার রাণীর ফুল কি এ দুটো?—ঘণ্টা দুই তিন পরে ডাক্তার বাবুর স্পর্শে যখন চোখ মেলে তাকালুম, তখন পাপড়ীগুলো খসে খসে বিছানা আমার ফুলে ফুলে ভরে আছে!—

(৯)

রাণী

পাহাড়ী মেয়ে সোনা নিত্য এসে বাগানে ফুল তুলে নিয়ে যেত, মিষ্টি মুখখানি দেখে তার কেমন একটা মায়া আমার জন্মাতো, ক'দিন ইচ্ছে হয়েছে ডেকে পরিচয় জিজ্ঞেস করি, কিন্তু করিনি, আমার স্বামীর তাতে সম্মানের লাঘব হয় যদি! সেদিন ছুলিয়া এসে বল্লে, মেমসাব, মেয়েটা গেটের ওখানে বসে কাঁদছে, দারোয়ান নাকি আজ তাকে আর ফুল নিতে দিলে না, আমি বল্লুম তার জন্তে কান্না? মেয়েটা'ত ভারী ন্তাকা, ছুলিয়া বল্লে না মেমসা'ব, মেয়েটা বলছে তার কে এক আপনার লোকের বড্ড অসুখ করেছে তারই জন্ম সে ফুল নিতে আসে।

তা ফুল কি আর এ বাগান ছাড়া আর কোথাও নেই? অসুখ করেছে ত অন্ত বাগান থেকে নিকগে না ফুল, ছুলিয়া হেসে বল্লে, সে বড়লোক রুগী মেমসা'ব, ম্যাজিষ্টর সাবের বাগানের ফুল না হ'লে অন্ত ফুল সে নেবে না।

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম বাঃ রে এ কেমন রুগী, ডাক্‌ত ছুলি মেয়েটাকে।

ফুল্লযৌবনা পাহাড়ী রূপসী সোনা এসে সামনে আমার দাঁড়াল, জিজ্ঞেস করলুম কি চাই সোনা? হাতদুখানি জোড় করে অনুনয়ে কণ্ঠস্বর ভরে নিয়ে ধীরস্বরে সে বল্‌লে, দু'টি গোলাপ ফুল শুধু ভিখ দাও মেমসা'ব—

কি কর্ব্বি? কি হবে ফুল দিয়ে? আর কারো বাগানে কি ফুল নেই?

তা আছে, তা থাক, কিন্তু তোমার বাগানের ফুল নইলে যে চলবে না মা-জি—

সে কিরে সোনা, বলত কেন?

তারপর কি যে বললে সে বুঝলুম নাত ভাল,—কে এ বাঙ্গালীবাবু ম্যাজিষ্টর সা'বের আদেশে কঠিন নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ কচ্ছে? মেয়েটা বল্লে বড় কঠিন রোগ মা'জি, ডাক্তার সাব বল্‌লে এ আর বাঁচ্‌বে না!—তুমিত ও কে চেনোনা মাজি, তোমায় কিন্তু বাবু চেনে, তোমার লাল ঘোড়ার গাড়ি দেখবার জন্তে দরজার উপর চৌকাটে মাথা দিয়ে বাবু—সহসা জিভ কেটে মেয়েটা থেকে গেল, কিছুতে আর—একটা কথা মুখ দিয়ে বার কর্ত্তে পারলুম নাত, শুধু বল্লে মাজি আর কিছু ত বল্‌তে পারবোনা, বাবু যে আমায় বারবার নিষেধ করে দিয়েছে,—বুঝলুম না কিছু, বুকটা শুধু টিপ টিপ কর্ত্তে লাগলো ঘরে গিয়ে টাটকা দুটো ফুলের তোড়া ফুলদানী শুদ্ধ তার হাতে দিয়ে বললুম নিয়ে যা সোণা, বলিস্ মেম সা'ব নিজের হাতে দিলে,—।

এক একবার মনে ব্যথা পেতুম, অত কাছে থেকেও সুধীরদা একটীবার আমায় দেখ্‌তে আসেন না,—আবার ভাবতুম, কি কাজ আর এসে, দূরে থেকে সুখে থাকুন, ভালো থাকুন, তাই আমার ভালো। মনটা তবু কেন এমন কচ্ছে? কোথায় আমার সুধীর দা, হায়রে কোথায় আমি তাঁর খোঁজ পাব!

(১০)

আমি কি জানি? মাগো, আমি কি জানি অত কথা? সুধীরদার উপর চিরকালের তোমার আক্রোশ, তুমি শেষকালে রাজার আদেশের নাম করে তাকে বন্দী করে তার জীবনটা শুদ্ধ নষ্ট করে দিয়ে রাগ মেটালে? হায় স্বামী, ইহপরকালের দেবতা তুমি, কি তোমায় বলবো আজ,—প্রাণপণে চেঁচিয়ে, শুধু এই কথা আজ বল্‌তে ইচ্ছে কচ্ছে, রাজার রাজ্যে এই সব স্বার্থপর বাঙ্গালী উচ্চ কর্ম্মচারীদের কাজের মাথায় অভিসম্পাৎ পড়ুক। যারা কাজ বোঝে না, কাজের দায়িত্ব নিয়ে, উচ্চ পদের গর্ব্বে অহঙ্কারে মানুষ বলে জ্ঞান যারা করে না, যারা রাজার আদেশ বলে, নিজেদের নীচ আদেশ শুধু প্রচার করে, তাদের কাজের মাথায় অভিসম্পাত পড়ুক,—পড়ুক!

হায়, সে তোমার কি করেছিল? কিছু না—কোনো অন্তায় কাজে, কোনো বিদ্রোহের কাজে, কোনোদিন সে যোগ দেয় নি, তবু তুমি তোমার নিজের আক্রোশ রাজার আদেশ বলেতার উপর মেটালে!—হায় আমার স্বামী, হায় আমার প্রভু, কি তোমায় বলবো!

* * *

সুধীরদা, আমি কি জানতুম, আমি কি জানতুম, আমার অত কাছটিতে থেকে তুমি নীরবে রোগের তাপে পুড়ে পুড়ে নিজের জীবনটাকে শুধু ক্ষয় করে দিচ্ছ—অপরাধ হয়েছিল তোমার, আমায় তুমি ভালোবেসেছিলে,—সে

ভালবাসায় কি ক্ষতি এঁ'র হয়েছিল, যার জন্যে তোমার জীবনটার উপর দিয়ে শুদ্ধ উনি এর প্রতিশোধ নিলেন!

সকালবেলা সেদিন সোণা এসে যখন সুধীরদার নাম লেখা একখানা কাগজ আমায় দিলে, তখন আমার বুঝতে আর দেরী হ'ল না,—ক'দিনের এত ছটফানি আমার এ জন্যেই বুঝি গেছে!

চা খেয়ে উনি ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, ধীর শান্ত ভাবে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কল্লুম,—সুধীর দা এখানে আছেন, তুমি তা জানতে? জানতুম এবং জানতুম না এর মাঝামাঝি এমন একটা কিছু উনি বল্লেন, যার ভাষা নেই কিন্তু যার মানে আমি বুঝলুম। বল্লুম, কেন গোপন কোরলে?—এখন ত সব জানলুম-ই কিন্তু জান্‌তে ত তুমি, কত তিনি আপনার লোক আমাদের ছিলেন, তাঁর এত অসুখের খবর টা একবার কেন তুমি আমায় দিলে না?

তাই বুঝি এখন তিনি অনুগ্রহ করে খবরটা পাঠিয়ে, তোমায় কৃতার্থ করে দিলেন?

নিশ্চয় নয়। সুধীরদা এত ছোট নন। সবাইকেই কেন নিজের মত ভাবো!

ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি বল্লেন, থাম রাগী, চুপ কর, আমার স্ত্রীকে কোন্ খবর দেওয়া উচিত বা অনুচিত, সে বুঝ্‌ব আমি, এত স্পর্দ্ধা কারুর নেই যে তা'ই নিয়ে কথা বল্‌বে।—

সহ্যের সীমা তিনি ছেড়ে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু, মেয়েমানুষ বলে, আমার মন কি সকল কিছুর সীমানা ছাড়া,—এ চার বছর মুখটি তুলে একটা কথা ত কোনদিন কই নি, কিন্তু আজ আর পার্‌লুম না,—বল্লুম, সে স্ত্রীর ও উচিত অনুচিত বোধ থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে তর্ক তোমার সঙ্গে আমি কর্‌বো না, এ টুকু শুধু জেনে রাখ সুধীরদা নিজে থেকে কোন পরিচয় আমায় কোনদিন পাঠায় নি, পাঠালে ত ভালোই হোত, কবেই জান্‌তে পাতুম। ঘরে তার এই কাগজ খানি পড়েছিল, মধু গোয়ালার মেয়ে পরিচয় জানবার জন্যে এইটে আমায় এনে দিলে।—

—বেশ, এখন, আমার এই ময়লাফেলবার ঝুড়িটায় কাগজখানা ফেলে তুমি বাইরে যাও, হাতে আমার অনেক কাজ, বাজে কথার আমার সময় নেই।

—বাজে কথা বলবার প্রবৃত্তি আমারো এখন নেই, এইটেই খালি বল্‌তে এলুম, আমি এখুনি সুধীরদাকে দেখ্‌তে যাচ্ছি,—

খবরের কাগজটা হাতে করে বেরুবার উপক্রম করে তিনি বল্লেন, 'অসম্ভব, কোন রাজদ্রোহীর বাড়ীতে আমার স্ত্রীকে আমি যেতে দিতে পারি নে।

বুক আমার কেঁপে উঠল, সর্ব্বনাশ, এ আদেশ লঙ্ঘন কর্ব্বার শক্তি ত আমার নেই,—সহসা দরজার সামনে তাঁর পায়ে পড়ে বল্‌লুম, 'শোন, শোন, অমনি করে চলে যেয়োনা, একটী কথা বলে যাও, মনে প্রাণে তুমিত ঠিক জান, রাজদ্রোহী সে নয়, তুমি শুধু তাকে রাগের মাথায় বন্দী করে রেখেচ। তা হোক্ তাই নিয়ে সে আমার কাছে নালিশ কর্ত্তে ত আসেনি, আর, তার সে সময়ও ত এখন নেই! সে এখন মরচে, একটীবার শুধু আমি তাকে দেখে আসি,—তুমি বল।—

অসম্ভব—বলে জোরে তাঁর পা তিনি সরিয়ে নিলেন।—ব্যথা পেয়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম,—মাথায় আমার তখন খুন চেপেছিল কি? কি জানি, কি! বল্‌লুম অসম্ভব? বেশ এই অসম্ভবকে আমি সম্ভব কর্ব্ব।—কোনদিন। কোনদিন তোমার কাছে কোন কিছু আমি চাই নি, আজ চেয়েছিলুম, তুমি দিলে না।—কিন্তু দিলে ভালোই কর্ত্তে, কেন না আমি যাবই।—আজ মরবার পথে সে আমায় কেড়ে নেবে বলে, তোমার জয় হয়েছে? সে ইচ্ছে যদি তার থাক্‌তোই, তুমি কোনদিন কি আমায় পেতে?—কিন্তু সে নীচ প্রবৃত্তি তার হয় নি,—আমায় তুমি যেতে দিলে না,—কিন্তু এখনই আমি যাব, ওগো, তুমি ত জান সে কতবড় একলা, মুখে জল-দেবার তার যে কেউ নেই—

রক্তবর্ণ চক্ষুদুটী তুলে, আমায় ভস্ম কর্ব্বার চেষ্টা করে তবে তিনি ধাক্কায় আমায় সরিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।—

—আর আমি?—অপমানিতা, প্রত্যাখ্যাতা আমি, জগতের ব্যর্থ জীবন আমি—ঘরে লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম।—এত কষ্ট জীবনে ক'জনের হয়, এমন পরীক্ষা জীবনে কার আসে!—

* * *

শেষ মুহূর্ত্তে—একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে কাছে গিয়ে পড়লাম, আকুল হয়ে চেঁচিয়ে ডাক্‌লাম—সুধীর দা, ও সুধীর দা, তোমার রাণু এসেছে দেখ,—শান্ত মুদিত চোখ দুটো একবার একটু কাঁপল, হাত দুটো একবার একটু নড়ল,—তারপর সব-সব শেষ!

ঘণ্টা তিন পরে ঘরে ফিরে আসতেই, বেয়ারা একখানা চিঠি দিলে লিখেছেন,—মফঃস্বলে চল্লাম কবে ফিরব ঠিক নেই, তুমি বাপের বাড়ী যাও,—কাপড় চোপড় ট্রাঙ্ক,—নিজের যা কিছু তোমার,—আমার এখানে কিছু যেন আর না থাকে।

* * *

তারপর এই চার বছর আজ, ভাগলপুরের এই গলিস স্কুলে চাকরী কচ্ছি,—কিন্তু একটা প্রশ্নের মীমাংসা, কিছুতেই ত আজো আমি কর্ত্তে পাল্লাম না,—মনু বড় না মন বড়!—

———

চূড়ান্ত

[একবিংশ শতাব্দী-নারী-চরিতম্‌-উপসংহার]

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বসু

নতুন কিছু করো

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
নাক-গুলো সব কাটো, কাণ গুলো সব ছাঁটো ;
পা গুলো সব উঁচু ক'রে মাথা দিয়ে হাঁটো ;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো ;
কিংবা চিৎপাত হ'য়ে—পা গুলো সব ছোড়ো ;
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন বাইসিকেলে চড়ো,
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
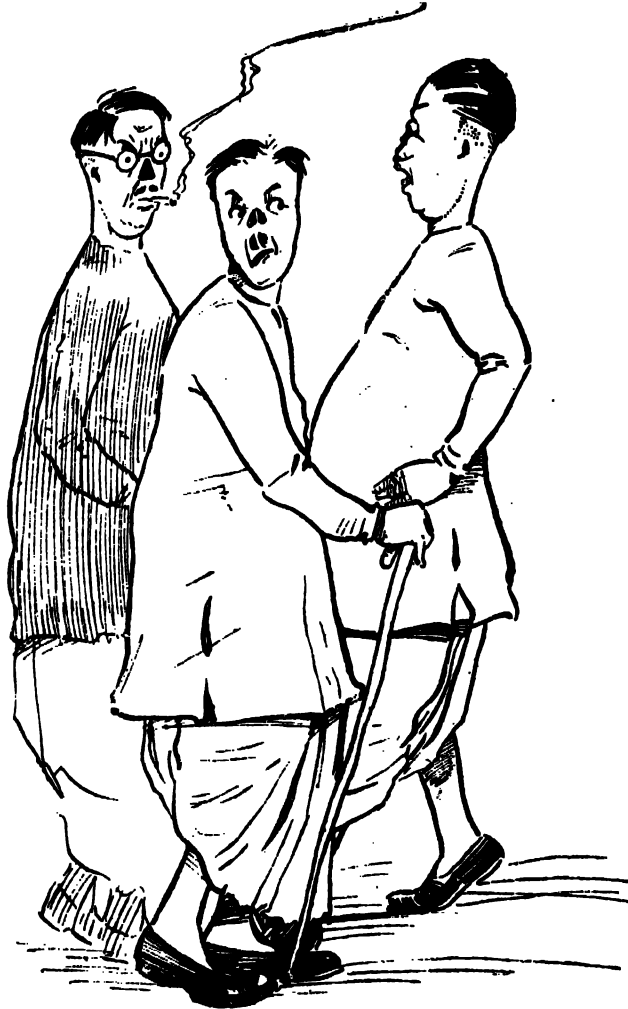
নাক গুলো সব কাটো, কাণ গুলো সব ছাঁটো।

ডাল ভাতের দফা কর সবাই রফা,
কর শীগ্‌গির ধুতিচাদর-নিবারিণী সভা ;
প্যাণ্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে ;
ধুতি চাদর হ'য়েছে যে নিতান্ত সেকেলে ;
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোষ্ট চপ্‌ ধরো ;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

পা গুলো সব উঁচু ক'রে মাথা দিয়ে হাঁটো।

কিংবা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো ;
হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে আমেরিকায় ছোটো ;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হ'য়ে না যাই, দেখো,—
খুব খানিক চেঁচাও, কিংবা খুব খানিক লেখো ;
বেন্, মিল্ ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো।

আর কিছু না পারো স্ত্রীদের ধ'রে মারো ;
কিংবা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো !
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক ;
বি-এ, এম্‌-এ, ঘোড়সোয়ার, যা একটা কিছু হোক্‌।
যা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুনতরো ;
—নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।

আর কিছু না পারো স্ত্রীদের ধ'রে মারো।

হ'য়েছি অধীর যত বঙ্গবীর ;
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির ;
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব,
মর্ব্বে, না হয় মর্ব্বে,—একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো, কিংবা নতুন রকম মরো ;—
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

কিংবা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভালো আরো !

এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির।

"পাহাড় থেকে পড়ো·········

… … … … …

নতুন রকম মরো।"

কলা দর্শন

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

মনের সুখে রম্ভা খাবে
এই ছিল সাধ মনে,
মুখে দিয়ে বেজায় খুসী
ভাই চাচা দুইজনে।

স্বরাজ্যদলের গাড়ী
এল অকস্মাৎ,
রইল ঝুলে কলার কাঁদি—
অমনি কুপোকাৎ!

ঝক্কি খেয়ে অক্কা পাবে,
রক্ষা যদি চাও—
হকু ভায়া দুঃখু রেখে
মক্কা চলে যাও।

অসহযোগী

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

প্রথম পরিচ্ছেদ

"এত ভীড় কিসের হারাধন? এত ভীড় কিসের?" এই বলিয়া পাঁচুলাল হারাধন মিস্ত্রীর দোকানের সামনের জনতা ঠেলিয়া একেবারে হারাধনের দোকান ঘরের মেঝেয় গিয়া দাঁড়াইল।

বর্ত্তমান্ মির্জ্জাপুর পার্কের উত্তর পশ্চিম কোণে হারাধনের কাঠের দোকান। হারাধন ছাত্রমহলে সুপরিচিত, কারণ তাহারি দোকানের কেওড়া কাঠের তক্তপোষ সব ছাত্রেরা বেশী পছন্দ করিত। হারাধনও এই কারণে ছাত্রগণের সকলের নাম না জানিলেও মুখ চিনিত। কিন্তু পাঁচুলালকে সে ভাল করিয়াই চিনিত। কারণ পাঁচুর দাদা কলিকাতার বিখ্যাত ঠিকাদার ও অর্ডার সাপ্লায়ার হরলাল চট্টোপাধ্যায় এই হারাধনের দোকান হইতেই, কাঠ-কাঠরার সব জিনিষ তৈরী করাইতেন। এইজন্য সে পাঁচুদের বৈঠকখানা গলিস্থ বাড়ীটি পর্য্যন্ত চিনিত। আর পাঁচুকে সে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি করিত, তাহার কারণ পাঁচু এম্-এ পাশ করিয়া হাকিম হইয়াছিল; এখন নন্-কো-অপারেশন্ (অসহযোগ) নীতিতে দীক্ষিত হইয়া হাকিমী পদে ইস্তফা দিয়া, খদ্দর পরিয়া পথে পথে খদ্দর ফেরি করে এবং দুইবার ভলান্টিয়ার দলের কাপ্তেন হওয়ায় জেলও খাটিয়াছে—তবু "স্বদেশী" ছাড়ে নাই। কাজেই পাঁচুকে আসিতে দেখিয়া হারাধন অকূলে কূল পাইল ও মহা সমাদরে আহ্বান করিল—"আসুন্ আসুন্ দাদাবাবু। এইদিকে আসুন্, এইদিকে আসুন্—এই টুলটায় বসুন্। এই সব সর'—সর'।"

লোকজন একটু নড়িল মাত্র, কিন্তু কেহই সরিল না, বরং আরও ঝুঁকিয়া পড়িল।

পাঁচুলাল ভিতরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সেযে কি বলিবে কি, করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কেবল বিহ্বলের মত ইহার উহার মুখপানে জিজ্ঞাসুভাবে চাহিতে লাগিল। কেহই কিছু বলিতে পারিল না।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, পাঁচু হারাধনকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি ব্যাপারটা বল তো হারাধন। আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এ মেয়েটি কে? এখানেই বা এল কি করে? কেই বা একে মারলে?"

এতক্ষণে সাহস পাইয়া হারাধন শিশুর মত উচ্চৈঃস্বরে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। পাঁচু তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"চেঁচিয়ে কেঁদে কোনও ফল হবে কি? কি ব্যাপারটাই একবার আমায় খোলাসা করে বল না ছাই! একে কি তুমিই মেরেছ নাকি?—"

"সেকি দাদাবাবু, আমি মারব কি! আমি কি কিছু জানি? দোকান বন্ধ কর্‌ব বলে' ঐ পাল্কীখানা ঘরে তুল্‌তে গিয়েই যত মুস্কিল বাধল। আমি গরীব মানুষ হুজুর, আমি কি জানি!"

একটি ফুট্‌ফুটে সুন্দর মেয়ে, বয়স প্রায় তের-চৌদ্দ বছর, রক্তাক্ত কলেবরে মৃতের মত মেঝেয় শুইয়া। গায়ে কোথাও আঘাতের চিহ্নও নজরে পড়িতেছে না, অথচ রক্তে কাপড় ও সেমিজটি একেবারে লাল হইয়া গিয়াছে। রক্তও তাজা, এখনও কালো হইয়া উঠে নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হারাধনের দোকান ঘরের মেঝেয় এই রক্তকাণ্ড, অথচ সে কিছুই জানে না—ব্যাপার জটিল কম নয়।

পাঁচুলাল বলিল—"এক্ষুণি পুলিশ এসে যে তোমায় ধরে' নিয়ে যাবে! লাশ যখন তোমার ঘরে—" বলিতে বলিতে হঠাৎ পাঁচু বালিকাটির হাত ধরিয়া নাড়ী অনুভব করিল।

নাড়ী নাকি খুব ক্ষীণভাবে চলিতেছিল। পাঁচু মুখ

তুলিয়াই জনতার সম্মুখে দণ্ডায়মান দর্শকদিগকে কাতর বিনয়ে কহিল—"মশায়, আপনারা কেউ চট্ করে একজন ডাক্তার ডাক্‌তে পারেন? যান্ না মশায়, দেরী কর্‌লে হয়তো মেয়েটিকে বাঁচান' যাবে না।"

লোক ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। নেপথ্যে শোনা গেল—'এই দুপুর রাত্রে ডাক্তার কে ডাকে বাবা?' 'চল হে রামু চল।' 'ও মশায় যান্‌না, একজন ডাক্তার ডেকে আনুন্ না? ঐ লাল বাড়ীটাতেই আছেন একজন এম্, বি' ইত্যাদি। ভীড় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। হারাধন ঠক্ ঠক্ করিয়া কেবল কাঁপিতেছিল—আর তাহার দুইচক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রুধারা বহিতেছিল।

পাঁচুলাল জনতা ভাঙ্গায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। হারাধনকে মেয়েটির মাথায় বাতাস করিতে বলিয়া, পাঁচু নিজেই ডাক্তার ডাকিতে গেল এবং অনতিবিলম্বেই একজন ডাক্তার লইয়া আসিল।

রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন "এই মেয়েটির উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে। হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল। আর কিছুক্ষণ বিলম্ব করলে হয়ত আর একে বাঁচানো যেতো না। আপনি খুব সময়ে আমায় পাকড়াও করেছেন।"

এ অপরিচিতা মেয়েটি কে? কোথায় বাড়ী? কি জাতি? কি করিয়া এখানে আসিল? কেহই কিছুই জানে না।

ডাক্তার বাবুর নিকটেই বাড়ী; বাড়ী হইতে তিনি তাড়াতাড়ি একখানি পরিষ্কার কাপড়, কিছু গরম দুধ, গরম জল ও ঔষধ আদি লইয়া আসিলেন। মেয়েটিকে মুছাইয়া পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া, তাহার গলায় খানিক গরম দুধ ঢালিয়া দিয়া, ফুঁড়িয়া এক পিচকারী ঔষধ তাহার শরীরে ঢুকাইয়া দিলেন। হারাধনের একখানি তক্তপোষের উপর তিনজনে ধরাধরি করিয়া বালিকাকে শোয়াইয়া, ডাক্তারবাবু একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া কপালের ঘাম মুছিলেন। পাঁচুলালও আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। হারাধনের মুখ অনেকটা প্রফুল্ল হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঢং করিয়া গির্জ্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। হারাধনের বিহ্বল ভাব অনেকটা কমিয়াছে দেখিয়া, পাঁচুলাল জিজ্ঞাসা করিল—

"এইবার বল'তো হারাধন, ব্যাপারখানা কি?"

হারাধন বলিল—"ঠিক সন্ধ্যের পর, প্রায় ন'টা আর কি, চার পাঁচজন লোক এসে বল্লে যে ঘণ্টাখানেকের জন্য পাল্কীটা একবার ভাড়া চায়। আমি বল্লাম বেশ নিয়ে যাও। তিন টাকা ভাড়া হ'ল। দু'টাকা আগাম দিয়ে, তারা পাল্কী নিয়ে চলে গেল।"

পাঁচু ও ডাক্তার বাবু এক সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোক গুলোকে চেন তুমি?"

হারাধন কহিল—"আজ্ঞে না বাবু, কাউকেই আমি তাদের চিনি না। এমন কতলোক আসে, পাল্কী নিয়ে যায়, আবার দিয়ে যায়, আমি আর কাকে চিনি বলুন? এই কোল্‌কাতা সহর—কে কাকে চেনে? তবে তারা উড়ে বেহারা নয়, বাঙ্গাল মোচলমান্ বলেই বোধ হ'ল।"

"আচ্ছা—আচ্ছা, তারপর?"

"আজ্ঞে তারপর আর কি, পাল্কী নিয়ে গেল। রাত প্রায় ১১টা কি ১১৷৷০টা পাল্কী ফেরৎ নিয়ে এল। বল্লে কোথায় রাখব? আমি ঐ দোকানের বাইরে ঐ খানটা দেখিয়ে দিয়ে বল্লাম—ঐ খানে রাখ। তারা পাল্কী নামিয়ে রেখে—বাকী এক টাকা ভাড়া শোধ করে দিয়ে চলে গেল। তারপর দোকান বন্ধ করবার সময়, পাল্কীখানা সরিয়ে একপাশ করে রাখতে গিয়ে দেখি যে বড্ড ভারী ঠেকে! দরজা দুটো আধকপাটে' করে দেওয়া ছিল। খুলেই দেখি এই লাশ! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—তাই শুনে লোক জড় হ'ল। লোকেরাই ধরাধরি করে মেয়েটাকে বের করে আমার মেঝেয় শোয়াল, আর দাদাবাবু আপনিও খানিকপরে এসে হাজির হলেন।"

রোগিণী অস্ফুট কাতরস্বরে 'ওঃ' করিয়া নড়িল। ডাক্তার বাবু তড়াক্ করিয়া উঠিয়া গিয়া নাড়ী ও বুক পরীক্ষা করিয়া একটা ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই

বালিকা নয়ন মেলিয়া ভীত চকিত দৃষ্টিতে চাহিল। পাঁচুলাল তখন রোগিণীর দেহে অগ্নির উত্তাপ দিতেছিল।

ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কেমন বোধ হচ্ছে তোমার?"

রোগিণীর মুখভাবে ও চাহনিতে একটা সকরুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল একটা নিদারুণ ভয়ে তাহার হৃৎপিণ্ড আবার ঢক্ ঢক্ করিয়া সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। ডাক্তার-বাবু কোমলস্বরে বলিলেন—"ভয় কি, কোনও ভয় নেই। চেয়ে দেখ, আমরা কে। তোমার অসুখ করেছে—তাই তোমায় আমরা ভাল কর্‌চি। আমাদিগকে কোনও লজ্জা বা ভয় করবার কারণ নেই। আমরা সব বুঝেছি। তুমি এখন নিরাপদ।"

বালিকার ভয় তবু গেল না। তাহার চক্ষু দুইটি ভীতি-বিহ্বল হইয়া কেবল এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল। নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়িতে লাগিল যেন সে হাঁফাইতেছিল।

ডাক্তারবাবু দেখিলেন যে রোগিণী এত ভয় পাইয়াছে যে তাহা শীঘ্র যাইবার নয়। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা মা, তুমি নির্ভয়ে ঘুমোও। কিছু বলতে হবে না।" এই বলিয়া আর একটি ঔষধ ফুঁড়িয়া দিয়া পাঁচুলালকে কি করিতে হইবে উপদেশ দিয়া তিনি রাত্রির মত বিদায় লইলেন।

হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া, আড়ি-মুড়ি ভাঙ্গিয়া হারাধন একটু গা গড়াইতে গিয়া অনতিবিলম্বেই তুমুল নাসিকাধ্বনি জুড়িয়া দিল। বিনিদ্র পাঁচুলাল নীরবে রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খুব ভোরেই ডাক্তারবাবু হারাধনের দোকানে আসিয়া উপস্থিত। পায়ে বাথশ্লীপার ও কাছাটি সম্মুখে কোঁচার উপর গোঁজা, গায়ে গেঞ্জি। রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন—

"তাই ত পাচুবাবু, আজকে যে আবার অন্য সব উপসর্গ দেখা দিয়েছে দেখ্‌চি। গোল বাধালে তা'হলে।"

পাঁচুলাল আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়া আর্ত্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি রকম? কি হয়েছে?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"জ্বর খুব প্রবল, ব্রেন্ (মস্তিষ্ক)ও ভাল নয়। অত্যাচারে হার্টতো খারাপ হয়েছেই…তাই ত …এত বড় "শক্"—আহা ছেলেমানুষ… হবারই তো কথা।"

পাঁচুলাল বলিল—"তবে উপায়?"

"উপায় আর কি, হাঁসপাতাল।"

পাঁচুলাল চিন্তিত হইয়া বলিল—"হাঁসপাতাল? হাঁসপাতাল ছাড়া কি আর উপায় নেই?"

ডাক্তার বাবু রোগিণীর চক্ষু নিরীক্ষণ করিতে করিতেই উত্তর দিলেন—"আর উপায় কৈ? রোগ ক্রমশ Serious (কঠিন) হচ্ছে, যদি সারে তো অনেক দিন সময় লাগ্‌বে। এ অবস্থায় এখানেও তো রাখা যায় না—Nurse (শুশ্রূষা) কর্‌বে কে বলুন?"

পাঁচুলাল কহিল—"তা তো বটেই—তবে হাঁসপাতাল গেলে যে আবার পুলিশ-কেশে পড়তে হবে। এর সম্বন্ধে যে আমরা কিছুই জানি না—এই যে মহাবিপদ।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তা-ও তো ঠিক। আচ্ছা—আসচি।" বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেলেন।

হারাধন ভীতিবিহ্বল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদাবাবু, তবে উপায়? আমি গরীব মানুষ—"

বাধা দিয়া পাঁচুলাল কহিল—"চারজন বেহারা নিয়ে এস। বাড়ী নিয়ে যাব।"

হারাধন অকূলে কূল পাইল। বেহারা আনিতে ছুটিল। ডাক্তার বাবু ঔষধ লইয়া পুনরায় আসিলেন।

ঔষধাদি খাওয়াইয়া, ফুঁড়িয়া, বস্ত্রাদি বদ্‌লাইয়া রোগিণীকে একটু গরম দুগ্ধ পান করাইয়া,—ডাক্তার বাবু উঠিলেন। হারাধনও চারিজন উড়িয়া বেহারা সহ পৌঁছিল।

রোগিণীকে ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে উঠাইয়া, পাঁচুলাল আগে আগে চলিল, পাল্কী আস্তে আস্তে তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

হারাধন "হরি রক্ষা কর্‌লে" বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে মুক্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, দোকানের মেঝেয় গোবর লেপিয়া অপবিত্রতা দূর করিতে মনোনিবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপর্য্যুপরি উনিশ দিন দিবারাত্রি জাগিয়া ও অক্লান্ত-ভাবে শুশ্রূষা করিয়া পাঁচুলাল রোগিণীকে আরাম করিল। আজ ডাক্তারবাবু ভাত দিতে বলিয়া গেলেন। রোগিণী নিরাময় ও বিপন্মুক্ত, কিন্তু বড় দুর্ব্বল।

এই অজ্ঞাত কুলশীলা, অত্যাচারিতা রুগ্না বালিকাকে গৃহে আনিয়া অবধি সংসারে এক মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

হরলাল ও পাঁচুলাল দুই সহোদর ভাই। হরলাল অপেক্ষা পাঁচু প্রায় দশ বৎসরের ছোট। পাঁচুর বয়স প্রায় পঁচিশ।

গৃহের কর্ত্তা নামে হরলাল থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে গৃহ ও গৃহকর্ত্তারও কর্ত্রী ছিলেন তাঁহার স্ত্রী পার্ব্বতী ঠাকুরাণী। বৃদ্ধা শাশুড়ী ঠাকুরাণী ছিলেন পুত্রবধূর নিকট তটস্থ। ভয়ে জোড়হস্ত—এমনি তাঁহার দাপ! পার্ব্বতীর বৃদ্ধা মাতাও এই পরিবার ভুক্তা।

হরলালের দুইটি কন্যা—বড় আভা ও ছোট বিভা, বয়স যথাক্রমে দশ ও আট এবং ছোট একটি পুত্র; তাহার বয়স পাঁচ, নাম জগন্নাথ, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মানসিকে জন্ম।

হরলাল লোকটি নিরীহ ভালমানুষ ও গোবেচারা হইলেও, কখনও পত্নীভীতি নিবন্ধন তিনি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। এই জন্য যখন তখন পার্ব্বতী ঠাকুরাণী তাঁহার স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতায় নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য অনেক সৎপরামর্শ দিতেন—কিন্তু হরলালের তাহাতে দোষ সংশোধন হইত না দেখিয়া তিনি এই স্বামীটিকে নাবালক শিশু ভাবিয়া তাড়না করিতেন। হরলাল বিনা বাক্যব্যয়ে বাহিরের ঘরে উঠিয়া গিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে ধূমপান করিতেন। স্ত্রীর সহিত উক্তরূপ অহিংস অসহযোগে (Non-violent Non-co-operation) সেই জন্য কোনও দিনই স্বামী-স্ত্রীতে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে নাই।

পার্ব্বতীর ধারণা যে অন্য সব অপেক্ষা স্বামীর উপর তাঁহার অধিকার কিছু অধিক, কারণ তাঁহারই পিতার অর্থে হরলাল বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন এবং পার্ব্বতীর পিতার অন্য কোনও সন্তান সন্ততির অভাবে, হরলালের পুত্র জগন্নাথই সব পাইয়াছে, শ্বশুর বাড়ীর প্রাপ্ত সম্পত্তি সব বিক্রয় করিয়া সেই অর্থেই হরলাল কলিকাতায় এই বাড়ীখানি কিনিয়াছেন, ছোট ভাইকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন এবং কাজকর্ম্ম করিয়া সংসার চালাইতেছেন। কাজেই পার্ব্বতীর ধারণা যে এই সংসার তাঁহারই অর্থে চালিত হইতেছে, তিনিই মালিক। তাঁহার স্বামী শাশুড়ী দেবর সকলেই তাঁহার আশ্রিত।

পাঁচুলাল যেদিন এই হতভাগিনী বালিকাকে লইয়া বাটী আসিল—সেদিন গৃহে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। গৃহে যখন এই অনাচারের বিরুদ্ধে পার্ব্বতীর পক্ষ হইতে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষনা করা হইল, তখন হরলাল বারান্দার কোণে মুখ ধুইতেছিলেন। পাঁচু গিয়া দাদাকে যাহা জানিত সকল কথা নিবেদন করিল। পার্শ্বে তোয়ালে হাতে করিয়া পার্ব্বতী দাঁড়াইয়াছিল, সেও শুনিল। শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—"ভদ্রলোকের বাড়ী কি এই সব আনে? ছি ছি ছি!"

গতরাত্রি হইতে অনুপস্থিত পুত্রের কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠিতা জননীও ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন এবং নীরবে সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলেন।

পাঁচু বলিল—"ভদ্রলোকের বাড়ী বলেই তো এনেছি বৌঠান্। ছোটলোকেই যে এই কাজ করেছে।"

পার্ব্বতী হুঙ্কার দিয়া বলিল—"আর ঢং কর্‌তে হবে না, আমার কত ভাগ্যে মাদুতে ক্ষুদুত্বে ঐ একটা পোকা—ওর যে এতে অমঙ্গল হবে। পাঁচটা পাশ করেছ, একথাটা বোঝ না?"

পাঁচু প্রসন্নভাবে বলিল—"ভগবানের এতে আশীর্ব্বাদই পাবে, বৌঠান্! তিনি পতিতপাবন—পতিতের সেবাই তাঁর সেবা।"

পার্ব্বতীর কথাগুলি ভাল ত লাগিলই না, বরং বিপরীত ফল হইল। তিনি তীব্র ঝঙ্কারে ঝাঁজিয়া উঠিলেন—"হাঁ, তাই বলে ঐ মোচলমানে জাত দিয়েছে, ঐ মেয়েটাকে সেবা কর্‌তে হবে? ওর ধিক্ জীবনে। ওকে গলা টিপে মেরে ফেল গে—বাঁচিয়ে আর কেন কেলেঙ্কারী বাড়াও ঠাকুরপো?

আর যদি ওর দুঃখে তোমার প্রাণ এমনি গলেই থাকে, তবে গলায় গেঁথে বাসাভাড়া করে ওকে রাখ গে। আমার এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় ওর ঠাঁই হবে না, বাড়ী ঢুকিয়েছ কি আমি খুনোখুনী করব, বলে রাখ্‌চি কিন্তু।"

পাঁচু বলিল—"সেকি কথা বৌঠান্‌!"

পার্ব্বতী বাধা দিয়া সপ্তমস্বরে গলা চড়াইয়া কহিলেন—"বলি চোখের মাথা তো খাও নাই, আমার দুই আইবুড় মেয়ে আছে, দেখ্‌চো? এসব পথের মড়া ঘরে আন্‌লে, ও দুটোর আর বিয়ে হবে কি? না আমাদের বাড়ী আর কোনও লোক খাওয়া দাওয়া করবে? তোমার কি? এ সংসার তো আর তোমার নয়, আমার! তুমি লেখাপড়া শিখে পাঁচ পাঁচটা পাশ করে—না, পাশ করে—ধিঙ্গি হয়েছ! আমার এতগুলো টাকাই জলে ফেল্লে। ভাল চাক্‌রী হ'ল—কোথা চাক্‌রী বাক্‌রী করবে, বিয়ে থা দোব, ঘরকন্না করবে—না গান্ধীর দলে ঢুকে চাক্‌রী ছেড়ে, চট্‌ পরে, ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছ—আর আমার ভাত মারচ দুবেলা। কে তোমার চিরকাল পিণ্ডি জোগাবে, বল তো?"

পাঁচুর মাতা অলক্ষ্যে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিলেন। ইত্যবসরে হরলাল কাপড় ছাড়িয়া "এস ভাই" বলিয়া পট্‌পট্‌ করিয়া নীচে নামিয়া গিয়া, বাইরে অতিথিদের জন্য যে একটি ঘর ছিল সেইটি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"এস সবাই মিলে নিয়ে গিয়ে ঐঘরে শোয়াই আগে।"

পাঁচুলাল তাহার ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃজায়া উভয়কেই বিলক্ষণ জানিত। এবং ঠিক এইরূপই যে ঘটিবে, তাহা সে পূর্ব্বেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল।

হরলাল কথা খুব কমই কহিতেন। রোগিণীকে শোয়াইয়া, ঝিকে ডাকিয়া ইহার জন্য একজন ঝি ঠিক করিয়া, উপরে গিয়া রোরুদ্যমানা চিৎকার-পরায়ণা পত্নীকে বলিলেন—"সকালবেলায় বেশী চেঁচিও না। নীচে বাইরের ঘরে রোগীর যা যা দরকার পাঁচু বলবে, সব যেন ঠিক ঠিক দেওয়া হয়। কোনও ত্রুটী না হয়। সাবধান।"

হরলালের মুখ গম্ভীর—আসন্ন বর্ষনোন্মত পুঞ্জীভূত ঘন কৃষ্ণ মেঘের মত, বিদ্যুৎগর্ভ—এখনই বিরাট গর্জ্জনে বিশ্বধ্বংসী বজ্রসৃষ্টি করিতে পারে।

প্রায় ১৬।১৭ বৎসর একত্র ঘরকন্না করায় আর কিছু শিখুন বা না শিখুন, পার্ব্বতী হরলালের কণ্ঠস্বর বিলক্ষণ চিনিতেন এবং তাঁহার রাগ কি রকম তাহাও বিশেষরূপে বুঝিতেন। জীবনে দুই একবার তাহা অনুভবও করিয়াছেন। তাই হঠাৎ হরলালের কথায় পার্ব্বতী একেবারে মন্ত্রাবিষ্টের মত স্তব্ধ হইয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"আচ্ছা।"

হরলাল কাজে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রথম পথ্যের পর পাছে রোগিণী ঘুমাইয়া পড়ে, এইজন্য তাহার কাছে বসিয়া গল্প করিতে পাঁচুলাল বাড়ীর সকলকেই অনুরোধ করিয়া যখন ব্যর্থ-কাম হইল, তখন সে নিজেই তাহার কাছে বসিয়া থাকিতে স্থির করিল।

রোগ যখন খুব বেশী ছিল, তখন পাঁচুলাল রোগিণীর কাছে সর্ব্বদাই থাকিত। কিন্তু যেমন পীড়া কমিতে লাগিল পাঁচুলালও এঘরে তেমনি বিরল হইয়া উঠিল। হরলাল রোগিণীর জন্য যে একজন ঝি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে-ই কাছে থাকিত। আর নিজে যখন তখন আসিয়া রোগিণীর কাছে বসিতেন ও খোঁজখবর করিতেন।

বেলা প্রায় ১১টা। আষাঢ় মাস—আকাশে খুব মেঘ করিয়াছিল। হরলাল কাজ হইতে বাড়ী আসিয়াই রোগিণীর ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাত খেয়েছ মা?"

রোগিণী বিছানায় বালিশে ঠেস্‌ দিয়া বসিয়াছিল। সে সসঙ্কোচে ও সলজ্জভাবে উত্তর দিল—"আজ্ঞে হাঁ।"

হরলাল চতুর্দ্দিকে চাহিয়া কাহাকেও না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ, ঘরে যে কেউ নেই? তুমি একলা থাক্‌লে তো ঘুমিয়ে পড়্‌বে মা। ঝি কোথা গেল?"

রোগিণী নীচেপানে চাহিয়া সবিনয়ে বলিল—"ঝি নাইতে খেতে গেছে। বলে গেছে তার ফিরতে আজ একটু দেরী হবে—তা আমি ঘুমুবো না। আপনি স্নানাহার করুন্‌ গে।"

হরলাল "পাঁচু" "পাঁচুলাল" করিয়া ডাকিতেই পাঁচুলাল

ছুটিয়া আসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি খেয়েছ?" পাঁচুলাল উত্তর দিল—"আজ্ঞে হাঁ।" হরলাল বলিলেন—"তুমি তবে এইখানে একটু বস, ঝির আসতে দেরী হবে। তোমার যদি কোনও কাজ থাকে, বাইরে যাও, তবে আমাকে ডেকে দিয়ে তবে যেও। যেন রোগীকে একলা ফেলে যেও না।" কথা কয়টি বলিয়াই কোনও উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া হরলাল উপরে চলিয়া গেলেন।

পাঁচুলাল আস্তে আস্তে আসিয়া ঘরে চেয়ারে বসিল। হাতে একখানি "অমৃতবাজার পত্রিকা" ছিল পড়িতে লাগিল।

রোগিণী আড়চোখে পাঁচুলালের পানে একবার তাকাইল—পাঁচু পাঠে তন্ময়। আবার চাহিল, আবার চক্ষু নামাইল আবার চাহিল, এবার আর চক্ষু ফিরিল না। সেও তন্ময় হইয়া পাঁচুলালের গৌর মুখখানির উপর সব ভুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ পাঁচুর সঙ্গে চারিচক্ষের মিলন হওয়ায় লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইতেই, পাঁচুলাল জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল কথা, তোমার পরিচয় তো নেওয়া হয় নাই!"

শরৎপ্রভাতে শেফালী শাখা নাড়া দিলে যেমন ঝরঝর করিয়া পুষ্পবৃষ্টি হয়, এই প্রশ্নে বালিকারও তেমনি অশ্রুবৃষ্টি হইল।

পাঁচুলাল কহিল—"তা কান্না কিসের? অসুখ তো ভাল হ'য়ে গেছে। এইবার একটু বল পেলেই তোমায় বাড়ী পাঠিয়ে দেব'খন্।"

কিশোরীর অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়িল। পাঁচুলাল ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না—বালিকা কেন কাঁদিতেছে।

সে তাই পুনরায় প্রশ্ন করিল—"তোমার নামটি কি?"

ধরাগলায় বালিকা উত্তর দিল—"শ্রীমতী সুষমা বালা দেবী।"

"তোমাদের বাড়ী?"

"আমাদের বাড়ী রংপুর জেলায় কুসুমপুর গ্রামে।"

"বাড়ীতে তোমার আর কে আছে?"

"আমার বাবা, মা, এক দিদি, দুই বোন্ ও একটি ছোট ভাই।"

"তোমার বাবার নাম কি? তিনি কি করেন?"

"আমার বাবার নাম শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তিনি যাজকতা আর পৌরহিত্য করে থাকেন। তিনি বড় গরীব।" বলিয়া সুষমা আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

পাঁচুলাল জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার দিদিদের সব বিয়ে হয়ে গেছে ত?"

সুষমা অবনতমস্তকে বাম তর্জ্জনীতে অঞ্চলাগ্র জড়াইতে জড়াইতে, নীরবে উত্তর দিল—"শুধু দিদিরই বিয়ে হয়েছিল কিন্তু বিয়ের ৮মাস পরেই তিনি বিধবা হয়েছেন।"

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে পাঁচুলাল অবগত হইল যে গোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি গরীব—যাজকতা ও পৌরহিত্য করিয়া যৎসামান্য তিনি পান্, তাহাতে তাঁহার সংসার অতি কষ্টে চলে। এই দারিদ্রতা নিবন্ধন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যাকে এক বৃদ্ধের সহিত বিবাহ দিয়া কোনও রকমে জাতি রক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। সুষমার ছোট ভগ্নী দুইটিও যথাক্রমে ১১ ও ৯ বৎসরের। ভাইটি মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স্ক।

পাঁচুলাল এই দুঃখী পরিবারের করুণ কাহিনী শুনিয়া মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

সুষমা এই পরদুঃখ-কাতর শান্ত সুন্দর যুবকের অকৃত্রিম সহৃদয়তায় কি যে বলিবে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া অন্তরে বড়ই অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। কৃতজ্ঞতার লজ্জায় সে যেন পলে পলে মরিতেছিল। তাহার নিদারুণ যন্ত্রণাতে, এ-যেন এক নূতন বেদনা ক্রমশঃ জমিয়া উঠিতেছিল। সে যতই চাপিতে প্রয়াস পাইতেছে, ততই তাহার অশ্রু বেগে ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাই সে নির্লজ্জের মত কেবলি আকুল হইয়া কি একটি কথা বলিবার জন্য পাঁচুলালের মুখপানে বারংবার চাহিতেছিল, কিন্তু মুখ কিছুতে ফুটিল না। কি কথা তাহা সে নিজেই ভাল বুঝে নাই, কিন্তু না-বুঝা সেই কথাটি বলিতে পারিলেই তাহার বুক হইতে মস্ত একটা বোঝা যেন নামিয়া যায়। এই অকথিত কথাটা একটা বড় কাঁটার মত তাহার প্রাণে বিঁধিয়া তাহাকে বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দুই ভাইয়ের এত স্নেহ এত যত্ন এত করুণা, এই কাঁটাটিকে যেন দিন দিন আরও শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিতেছিল। এই সোহাগ ও আদরে তাহার লজ্জা

সুগভীর ব্যথার মত দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছিল—এত সুখ এক অনির্ব্বচনীয় বেদনায় টন টন্ করিতে লাগিল।

পাঁচুলাল দেখিল, মেয়েটি সুশিক্ষিতা এবং ব্যবহার নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের মত নয়। বলিল—"কাল তোমার বাবাকে একখানা পত্র লিখে দিই, তা'হলে তিনি এসে তোমায় নিয়ে যান্।"

সুষমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র, কিছুই বলিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"তুমি কলিকাতায় এসে পড়লে কি করে মা?"

হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘরে হরলাল, তাঁহার মা ও পার্ব্বতী উপবিষ্ট, দুয়ারে পাঁচুলাল দাঁড়াইয়া।

সুষমা প্রশ্ন শুনিয়া চমকিত হইয়া অধোবদনে কাঁদিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না।

হরলালের মা বলিলেন—"কান্না কি? ছি মা—বল যা ঘটেছে, বল'—তাতে আর লজ্জা কি?"

সুষমা তবু নীরবে ফুলিতেছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"আমার বাবাকে আপনারা পত্র লিখেছিলেন, কোনও উত্তর এল?"

মা কি বলিতে যাইতেছিলেন, হরলাল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন—"না, এখনও কোনও উত্তর আসে নাই। তুমি বলতো মা কি ব্যাপারটা হয়েছিল? আমাদের কাছে কোনও কথা গোপন করে আর ফল কি? আমাদিগকে তোমার আপনার লোক মনে করতে কোনও আপত্তি আছে কি?"

সুষমা তাড়াতাড়ি অপরাধীর মত কম্পিতস্বরে সকরুণ মিনতিতে বলিল—"আপনাদের কাছে আবার গোপন? একথা মনেও করবেন না—আপনারা আমার প্রাণদাতা বাপ মা। তবে আমার মত হতভাগিনীকে না বাঁচালেই ভাল করতেন।"

মা বলিলেন—"তা সেকথা যাক্, তুমি ঘটনাটা বল দেখি।"

সুষমার সেকথা স্মরণ করিতেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল। সেই লজ্জার কথা, সেই সর্ব্বনাশের কথা তাহাকে নিজমুখে বলিতে হইবে! অথচ না বলিলেও নয়।

সুষমা কহিল—"সেদিন পূর্ণিমা। বাবা মাঝের গাঁয়ে সত্যনারায়ণ দিতে গিয়েছিলেন, ফিরুতে অনেক রাত্রি হবার কথা। মার ভয়ানক জ্বর, দিদি পূর্ণিমার উপোষ করে আমার ভাইটিকে নিয়েছিলেন, আমি রান্নাবান্না কোরে বোন্‌দের খাইয়ে, মাকে সাগু দিয়ে গ্রামের নদীতে গা ধুতে, আর এক কলসী জল আন্‌তে ঘাটে গেলাম। রাত্রি তখন প্রায় আটটা। ঘাট হতে কেবল পাড়ের উপর উঠেছি, আর দেখি আমাদের গাঁয়ের মুরাদ শেখ, আবুমোড়ল, কহিমুদ্দি আর ছমুমিঞা সেইখানে দাঁড়িয়ে। তা'দিকে দেখে আমার গাটা কেমন ছম্ ছম্ করে উঠ্‌ল কিন্তু কিছু বলবার আগেই, মুরাদ এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াল, আর আবু একটা হাত ধরুল—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, অমনি কহিমুদ্দি ও ছমু এসে, তাদের চাদরে করে আমার মুখ এমন করে বেঁধে ফেললে যে আর আমি টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করতে পারলাম না। এদের কাছে একখানা মস্ত ধারালো ছোরা ছিল—সেখানা আমার বুকের উপর ছুঁইয়ে তারা গর্জ্জে উঠল যদি চেঁচাবি তো এই, একেবারে। প্রাণের ভয়টাই তখন আমার বড্ড বেশী হল, আমি আর চেঁচাতে পারলাম না। ছুটে পালাতে গেলাম, দু'জন লাফিয়ে গিয়ে আমার বুকে পিঠে ও মুখে কিল চাপড় মেরে আমায় ধরে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেল্ল। আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল—আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তারপর জ্ঞান হয়ে দেখি দিন, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, কোন্ একটা গাঁয়ে ছোট একটা বাড়ীতে, এক ঘরে একখানা চাটাইয়ের উপর আমি শুয়ে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পালাব মনে করে যেমন ঘরের বার হয়েছি, অমনি দেখি দুয়ারে সেই পাষণ্ডরা বসে তামাক খাচ্ছে, আর কি জটলা করচে। তা'দিকে দেখে—আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। আমাকে দেখে তারা বাঘের মত লাফিয়ে এসে আমার টুঁটি চেপে ধরে বাড়ীর মধ্যে, সেই ঘরের মধ্যে বন্ধ করে, বাইরে হতে শিকল টেনে দিলে। কতক্ষণ পরে একটা আধবুড়ো মাগী আমার জন্য ডাল ভাত তরকারী এনে খাওয়াবার জন্যে কত সাধল—আমি তা স্পর্শও করলাম না—তাতে সে নানা কুকথা বলে শাসিয়ে বাইরে যেতেই দুপদাপ করে ঐ দস্যি চারজন আমার ঘরে এসে জবর দস্তি আমার

মুখে সেই ভাত ঢুকিয়ে দিলে। আমি থু থু করে তাদের মুখেই ফেলে দিলাম। তারা "এইবার জাত তো মেরেচি" বলে করতালি দিয়ে অট্টহাস্য করে উঠল। আমি প্রাণপণ চীৎকারে কত চেঁচালাম, কত কাঁদলাম, কত ভগবানকে ডাকলাম—কিন্তু কেহই আমায় সাহায্য করতে এল না।

"সন্ধ্যা লাগতেই আবার সেই মাগী ভাতের থালা নিয়ে এল, তাকে আমি যা মুখে এল তাই বলে গালাগাল দিলাম। সে রেগে বেরিয়ে গেল। তারপর সেই নরাধমরা এসে আমায় রাত দুপুর পর্য্যন্ত বিরক্ত করে বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেল।

"আমার নিস্তার নেই ভেবে শেষে পরণের কাপড় খুলে আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করলাম—গলায় ফাঁসি লাগল না। ভগবান্ আমায় মরেও নিষ্কৃতি পেতে দিলেন না।

"হঠাৎ শেষ রাত্রে দেখি সবাই আমায় হাঁটিয়ে নিয়ে কোথায় চল্‌ল। দুই দিন অনাহারে ও এই দুর্ঘটনায় পথের মধ্যেই আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাই। জেগে দেখি—আমি কল্‌কাতায়।

"ছোট একটা কুঠরীতে মেঝের উপর আমি শুয়ে। শরীর বড় দুর্ব্বল, তার উপর ভয়ানক বেদনা। উঠে বসতে পারি না—বসতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখি। চীৎকার করতে গেলাম, আওয়াজ বেরুলো না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ক্ষুধার চেয়ে পিপাসাই দেখলাম বড় প্রবল।

"মুরাদ এসে আমায় বোঝাতে লাগ্‌ল, যে আমি মুসলমান হয়ে যেন তাকে বিবাহ করি, কারণ আমি এখন কলিকাতায়। যদি আমি স্বেচ্ছায় রাজী না হই তবে, আমার উপর তাহারা জোর করে তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবে, আর তাদের ভাত একবার আমার মুখে যখন ঢুকেছে, তখন জাত তো গিয়েছেই ইত্যাদি। আমার শরীর তখন অবসন্ন, দুঃখে, ক্ষুধায় পিপাসায় আমি মৃতপ্রায়, তবুও তাকে আমি এক লাথি মার্‌লাম। সে তা বরদাস্ত না করে আমার বুকে এমন এক ঘুঁষি মার্‌ল যে আমার সর্ব্বশরীর একেবারে ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। কতখানি যে লাগ্‌ল তা বোঝবার আগেই আমার জ্ঞান লুপ্ত হ'ল।

"যখন চাইলুম, তখন দেখি রাত্রি, কত রাত্রি তা বল্‌তে পারি না। তখন আমি কথা বলতে পারি না। তারা অনেক অনুনয় বিনয়, অনুযোগ করে, গালিগালাজ আরম্ভ করলে, তাতেও আমি আত্মদান যখন কর্‌লাম না, তখন তারা চারপাঁচজন মরদ......"

সুষমা ফুঁকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হরলাল আপনার কোঁচার অগ্রভাগ দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"কেঁদোনা মা, এতে আর কি হয়েছে? তোমার কোনও দোষ নাই।" তাঁহার চক্ষুও জলে ভরিয়া উঠিল।

কিয়ৎক্ষণ সকলেই নীরব। সুষমা বলিল—"এর পর চক্ষু মেলেই দেখি, আপনার ভাই আমায় শেক্ দিচ্ছেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

"আর যখন কোনও উপায় নেই, তখন খৃষ্টান মিশন ছাড়া আর ওর গতি কি?"

হরলালের কথা শুনিয়া মাতা শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বামুনের ঘরের মেয়ে, যার-নাম-মেয়ে, রূপে-গুণে, কাজে কর্ম্মে লেখাপড়ায়, আহা, এমন মেয়েকে শেষে খৃষ্টান্ হতে হবে বাবা? আহা, মেয়ে তো নয়, যেন মা ভগবতী!"

পার্ব্বতী বলিলেন—"তা আর ভেবে কি হবে, বল? হিঁদুর ঘরে ও-মেয়ে তো আর নেবে না?"

হরলাল বলিলেন—"আমি ত কোনও কসুর করি নাই। চিঠি লিখলাম,—ওর বাপ লিখলেন যে সে মেয়ে মরেছে। ভাব্‌লাম যে তিনি আসল ব্যাপার হয় তো জানেন না—তাই নিজে গিয়ে সব বুঝিয়ে দিলাম। তাতে তিনি বল্‌লেন "মশায়, আমাদের এ পাড়া গাঁ। সে মেয়ে ঘরে নিলে আমাদের জাত যাবে। আমার আর দুইটি মেয়ের বিয়ে হবে না, আমার ছেলেও চিরকাল সমাজের বার হয়ে থাকবে। তা ছাড়া আমি গরীব, পরের বাড়ী যজমানি করে খাই—আমাকে লোকে আর ডাক্‌বে না। ফলে আমার সগুষ্টি উপোষ করে মর্‌তে হবে।"

হরলালের শাশুড়ী বলিলেন—"আ মরুক মিন্‌সে। মেয়ের চেয়ে তার খাওয়া বড় হ'ল! অমন পেটে আগুণ ধরিয়ে দিক্ গে। মেয়ের দোষ কি?"

হরলাল বলিলেন—"তা নয় মা, সে বেচারী কেঁদেই

সীবন-রতা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা

আকুল। কিন্তু পেটতো আর শোনে না, সমাজও এ বিষয়ে চোখ বোঁজা। কাজেই সে নাতোয়ান্ করে কি? বড়লোক হ'ত—সমাজ তার জন্যে ব্যবস্থাও অন্য রকম দিত। গরীবেরই তো যত অপরাধ। দুর্ব্বলকেই তো লোকে মারে—পৃথিবী যে শক্তের ভক্ত।"

পার্ব্বতীকে ও অন্যান্য বাড়ীর সকলকেই সুষমা ইতিমধ্যে হাত করিয়া ফেলিয়াছিল। যে যেমন তাহাকে তেমনি স্নেহ ভক্তি সেবা করিয়া আপনার দৈন্যে আপনি সর্ব্বদা অপরাধীর মত বিনয়ে সঙ্কোচে ও মিষ্ট ব্যবহারে সুষমা বাড়ীর লোকেদের যেমন হৃদয় জয় করিয়াছিল তেমনি ছেলে-দের ও সে একান্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। ছেলেরা নতুন দিদি বলিতে একেবারে অজ্ঞান। সুষমা ভিন্ন ছেলেদের নাওয়া খাওয়া শোওয়া কিছুই হইত না।

এমন কি পার্ব্বতী দেবী—যিনি এমন স্বামীর শাশুড়ীর ও দেবরের-ই তোয়াকা রাখেন না—তিনি পর্য্যন্ত সুষমাকে আর ছাড়িতে চাহেন না। ইহাতে লোকে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। যাহাকে বাড়ীর বহির্ব্বাটীতে স্থান দিতে সেদিন পার্ব্বতী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা করিয়াছিলেন, আজ বাড়ী হইতে তাহাকে বিদায় দিতে তিনি একেবারে নারাজ! মেয়েটা যাদু জানে নাকি?

সন্ধ্যার পর সকলে খোলাছাদে বসিয়া এইরূপ কথোপ-কথন হইতেছিল, এমন সময় পাঁচুলাল আসিয়া তথায় বসিল।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর বেরুবে না কি?"

পাঁচুলাল বলিল—"আজ্ঞে না।"

মা বলিলেন—"হাত পা ধো, বসলি যে? কিছু খা; কোন্ সকালে সেই দুটো নাকে মুখে গুঁজে বেরিয়েছিলি, বলতো তুই হলি কি?"

পাঁচুলাল একটু হাসিয়া উঠিয়া আপনার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সুষমা কক্ষমধ্যে শয্যা রচনা করিতেছে। পাঁচুলাল কক্ষের প্রবেশদ্বারে একটু দাঁড়াইল, সুষমা বাহির হইয়া গেল।

সুষমা আরোগ্যলাভ করার পর হইতে, প্রত্যেক ঘরের শ্রী ফিরিয়াছিল। সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত থাকিত, মায় জুতাগুলি পর্য্যন্ত ঝক্‌ঝক্ করিত।

সকালে বাহির হইবার আগে হরলালকে আর জুতা কাপড় জামা ছড়ি ছাতা খুঁজিতে হইত না। ছেলেদের আর ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড় পরিতে হয় না। কাহারও আর জামা বোতামহীন থাকে না। এখন প্রত্যেক বালিশেই ওয়াড় দেখা যাইতেছে। টেবিলে ধূলা জমে না। জানালায় জানালায় পরদা ঝুলিল। অথচ সংসারে এক পয়সা খরচ হইল না। সর্ব্বাপেক্ষা প্রীত হইলেন পার্ব্বতী, কারণ ছেলে মেয়েদের চিন্তা আর তাঁহাকে মোটেই করিতে হইত না।

প্রথম প্রথম সুষমা মায়ের ঘরে ঢুকিত না। কিন্তু মা তাহাকে অভয় দেওয়া অবধি মায়ের পূজার যোগাড় হইতে রান্নার যোগাড় পর্য্যন্ত আর তাঁহাকে কিছুই করিতে হইত না। মায়ের মালা জপ করার অনেক সুবিধা হওয়ায়, তিনি দিনরাত্রি সুষমাকে আশীর্ব্বাদে আশীর্ব্বাদে লজ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন।

মা ডাকিলেন "সুষমা, মা, পাঁচুকে খাবারটা রান্নাঘর হ'তে এনে দাও তো!"

সুষমা ছাদে আসিয়া বলিল—"দিয়েছি, উনি খাচ্ছেন।"

কথাটা কি জানি হঠাৎ সকলেরই বড় মিষ্ট লাগিল। সুষমা আভা ও বিভাকে পড়াইতে গেল। এই দুই মাসে মেয়েরা তো লেখাপড়া, শেলাই ও স্তব অনেকই শিখিয়াছে, ছোটখোকা জগন্নাথেরও বর্ণ পরিচয় শেষ হইয়া গিয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

হরলাল পাঁচুর ঘরে আসিয়া ধপাস্ করিয়া ঈজি চেয়ার খানায় বসিয়া পড়িল। পাঁচু জিজ্ঞাসা করিল—তামাক দেব দাদা?

হরলাল—"দাও" বলিয়া, ঈজি চেয়ারেই অঙ্গ এলাইয়া দিলেন।

একথা সেকথার পর, হরলাল বলিল "সুষমাকে খ্রীষ্টান্ মিশনে দেওয়াই স্থির করচি, কি বল পাঁচু?"

পাঁচু কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বলিল—"তা আপনার যা অভিরুচি।"

হরলাল বলিল—"এছাড়া আর কি করিতে পারি বল? চেষ্টাতো সবই করেছি—তুমি তো জান সবই।"

পাঁচু গড়্গড়ায় কলিকাটি বসাইয়া দাদার পাশে চেয়ারে বসিয়া বলিল—"আজ্ঞে হাঁ। আমাদের আর দোষ কি? আমরা তো চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। আমাদের কর্ত্তব্য করেছি।"

হরলাল বলিল—"আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করেছি, পাঁচু? তুমি এই কথা বল?"

পাঁচু হরলালের স্বরে বিস্মিত হইয়া দাদার মুখপানে চাহিল।

হরলাল বলিল—"এমন রূপবতী ও গুণবতী মেয়ে হাজারে একটা মেলে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাকে আমরা ত্যাগ করচি কেন? না সে নির্য্যাতিতা! যেহেতু তাকে আমরা রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্ব না, এই জন্য তাকে আমাদের হিন্দুসমাজ আর স্থান দেবেন না। আমরা পুরুষ, নারীকে রক্ষা কর্‌ব বলে তার ভার নিয়েছি, কিন্তু পারলাম না—দোষ কা'র, না ঐ নারীর! তোমাদের সমাজের এই শাস্ত্র! আর দোষও বড় সামান্য নয়, একবারে তাকে হত্যা করা নয়, জীবন্তে মাটীতে পুঁতে ফেলা—অর্থাৎ পরিত্যাগ করা! সে একটা কুকুর বিড়ালের চেয়েও ঘৃণ্য। কুকুর বাড়ীতে থাক্‌বে, সে নারীটি নয়। ওই যুঁই ফুলটির মত মেয়েটির আবার দোষ কোথায়, অপরাধ কি, একবার ভেবে দেখেছ? যে অবস্থার সঙ্গে ওই ছোট্ট মেয়েটি লড়াই করেছে সে অবস্থার সঙ্গে লড়াই করা কি কম বীরত্ব? ক'টা এমন পুরুষ পারে? লড়াই করতে গেলে আঘাত লাগেই—তারও লেগেছে, এই জন্যই কি সে পরিত্যাজ্য? সেই মহীয়সী নারী আহত বলেই তাকে পরিত্যাগ করতে হবে—এই কি আমাদের এখন কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম?"

পাঁচুর বিস্ময় চূড়ান্তে পৌঁছিল। স্বল্পভাষী, ভাবালেশ শূন্য অনমনীয়, হিসাবী তাহার দাদার এ কি ভাবান্তর! দাদার যে কি ইচ্ছা তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে নীরবে নিদারুণ বিস্ময়ে ভ্রাতার মুখপানে অপলক নেত্রে বিস্ফারিত নয়নে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

হরলাল বলিলেন—"তুমি নন্‌কো-অপারেটর হয়েছ, অসহযোগী হয়েছ,—দেশের শাসন তন্ত্রের বিরুদ্ধে। শাসন-তন্ত্র আমাদের বাইরের জিনিষ, সেটা শোধন কর্‌বার আগে, তোমার ভিতরের জিনিষ যা নৈলে জাতি বাঁচে না, সেই সমাজও ধর্ম্ম শোধন কর'না কেন ভাই? আগে বাঁচ, মানুষ হও, তারপর শাসনতন্ত্রের দোষগুণ বিচার কর্ত্তে বসো। এই সমাজের একজন হয়ে, তোমার বাঁচতে লজ্জা লাগে না?"

পাঁচুলাল সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কর্‌তে আজ্ঞা করেন তবে দাদা?"

হরলাল বলিলেন,—"এই হিন্দু সমাজের সঙ্গে আগে নন্‌কো-অপারেশন্ (অসহযোগ) কর। আগে তুমি নিজে ন্যায়বান্ সহৃদয় বিবেচক ও সত্যবাদী হও—তারপর অন্যকে তাই হ'তে উপদেশ দিও। বিদেশী বিধর্ম্মী রাজা তোমাদের উপর কি অন্যায় করে? আর যদি করে তো সেটা বরং স্বাভাবিক কিন্তু তুমি তোমার নিজের ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনের উপর কি কম অমানুষিক অত্যাচার করচ? ভেবে দেখ দেখি? তাই বল্‌ছি, আগে তোমার জাতীয় অন্যায়, পীড়ন, অত্যাচার বন্ধ কর,—তারপর যাইয়া দেশের রাষ্ট্রীয় দোষ সংশোধন করতে পার্‌বে এই অসহযোগী হ'য়ে।"

পাঁচুলাল কহিল—"আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, নিশ্চয়ই পারব।"

হরলাল উঠিয়া গেলেন।

পাঁচুলাল মোহাবিষ্টের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মাথার মধ্যে কথাগুলি একটা নূতন আলোক জ্বালাইয়া দিল।

অকস্মাৎ তাহার ঘরে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে তাহার চমক ভাঙ্গিল।

মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার কপালে চন্দনের ফোঁটা ও মাথায় ধান্য-দূর্ব্বার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। কক্ষান্তরে সজোরে শঙ্খধ্বনিতে আসন্ন উৎসবের সমারোহ ধ্বনিত হইল।

আভা ও বিভা আনন্দে সুষমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আহ্লাদে কোলাহল করিয়া উঠিল—"নতুন দিদি এইবার আমাদের কাকীমা হবেরে!"

বর্ষায়

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

শ্রাবন মাস। আজ কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বর্ষন চলিয়াছে। অবিচ্ছিন্ন অশ্রান্ত বৃষ্টিধারা একপ্রকার সকলকেই অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছে। বর্ষাঋতু পরিপূর্ণ গৌরবে কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া যেন প্রকৃতির সোহাগ-সম্ভোগ-লালসায়, ললিত ভঙ্গীতে চলিয়া পড়িয়াছে। দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞানহারা হইয়া অফুরন্ত ধারা স্রোত প্রবাহিত করিয়া উন্মাদ তরঙ্গ হিল্লোলে প্রকৃতির মধুময় স্নেহবক্ষে আনন্দ ধারার নির্ঝর মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সকল শোভা, সকল দৃশ্য, সকল শব্দ আজ ঐ একমাত্র বৃষ্টিধারা পতন শব্দের মধ্যে আত্মহারা হইয়া লয় পাইয়াছে। সকলের দৃষ্টি, সকলের আনন্দ, সকলের মন ঐ যে মুক্তাধারার স্ফটিকমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীর মত ধ্যান মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাপ-দগ্ধ, শুষ্ক পৃথ্বী, মরুবক্ষের আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া কাতর তৃষ্ণা মিটাইতে, সহস্র জিহ্বায় উর্দ্ধমুখে নিবিড়ঘন মসীবর্ণ মেঘ-মালার দিকে—কি আনন্দ, উৎফুল্ল, হর্ষ-রোমাঞ্চিত অন্তরে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। কালো মেঘের করুণ-বক্ষ চিরিয়া মাঝে মাঝে, দেবতার রোষাগ্নি বিদ্যুৎ-স্ফুরণে উদ্ভাসিত হইয়া জীব জন্তুর ভীতি সঞ্চার করিতেছে। প্রভাতের নব অরুণভাতি উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে ঝরিয়া বিশ্বপ্লাবিত করিবার অবসর পায় নাই। পূর্ব্ব গগন প্রান্ত হইতে কখন যে পশ্চিম সাগরে সে অন্তর্দ্ধান করিতেছে তাহার সন্ধান রাখা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গলার বাহিরে পশ্চিমে যে এত বর্ষা হইতে পারে এ ধারণা ছিল না। সুতরাং বর্ষার কর্দ্দমময় পথ, স্যাঁত স্যাঁতে ভিজা ভিজা বাতাস, অবসাদ, আলস্য, ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রত্যাশায় ছুটিয়া আসিলাম প্রবাসে। প্রবাসে আসিয়া যাহা পাইলাম, তাহা অপূর্ব্ব আনন্দভরা, মধুময় প্রকৃতীরাণীর সৌন্দর্য্য-বিভব—সত্য, কিন্তু এবার বাঙ্গলা ছাড়িয়া বাঙ্গলার বর্ষারাণীও সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল পরগণায় স্বাস্থ্যকর পর্ব্বত কঠিন কঙ্কর পরিপূর্ণ রসলেশহীন দেশে আসিয়া দর্শন দিলেন। এদেশের সাঁওতাল ভীল প্রথমটা মহা উল্লাস প্রকাশ করিয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করিল সত্য বটে, কারণ এতটা আশা, এতটা অনুগ্রহ, এতটা সৌভাগ্য স্বপ্নেও যে তাহারা কোনও দিন কল্পনা করিতে সাহস পায় নাই। অকস্মাৎ অযাচিত করুণাবন্যায় তাহারা উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কাজ, কর্ম্ম, ব্যবসা বাণিজ্য স্থগিত রাখিয়া, গৃহ ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া পড়িল। কোনও আকর্ষণই তাঁহাদের আটকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইল না। সে বিপুল উৎসাহ-স্রোতের মুখে কোন বাধাই টিকিতে পারিল না। পরিচয়, প্রভুত্ব, প্রত্যাশা, প্রতিবাদ, শেষে প্রার্থনা কোনটাই কাজ করিতে সক্ষম হইল না। অনুনয় বিনয়, সকল চেষ্টাই এবার নিদয় নিষ্ঠুর অভিনয় হইয়া পড়িল। কোন দিকেই তাহারা ফিরিয়া চাহিল না। শঙ্কা, সরম, সৌজন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া তাহারা বর্ষারাণীর প্রণয়-সম্ভাষনে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া ঘর ছাড়িয়া মাঠের পথে পরম উৎসাহে অবতীর্ণ হইয়া পড়িল।

তৃণলেশহীন, কঙ্কর-বর্ত্তুল, রসশুষ্ক কঠিন ক্ষেত্রগুলি বর্ষার প্রণয় ধারা সম্পাতে আনন্দ অন্তরে সহসা রসাস্বাদে গলিয়া ঢলিয়া পড়িল।

আমরা এমন দুর্দ্দিনে, জনসঙ্গীহীন প্রবাসে, নির্জ্জনে ভৃত্যহীন হইয়া মহাবিপদে পরিলাম। আমাদের বাড়ী হইতে সহর তিন মাইল পথ। একেবারে নীরব নিঃসঙ্গ পর্ব্বত পরিবেষ্টিত মাঠের মাঝখানে আমাদের প্রবাস আবাস। সহর হইতে বাজার আসিলে তবে রন্ধন ও আহার হইবে। এই অসহায় তরণীখানির কাণ্ডারি ছিল একমাত্র এদেশের ভৃত্য যে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া অনায়াসে এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বহিয়া আনিত আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অভাব সম্ভার।

সে ছিল আমাদের সংসার-রথের সম্মুখের চক্র। বর্ষায় বৃষ্টিধারা-মধ্যে সে যে আমাদের অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে পারিবে তাহা ত মনে করিবার মত কোনও কারণ পূর্ব্বে অভিজ্ঞতায় অদৃষ্টে পরিলক্ষিত হয় নাই। সারা বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদনের আশামঞ্জরি পরিত্যাগ করা কাহারও পক্ষে সহজসাধ্য নয় একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না সত্য, কিন্তু আমরা যে এতদিন ধরিয়া পরমুখাপেক্ষী, পর-সাহায্য-ভিখারী হইয়া পরম সুখে দিনাতিপাত করিয়া আসিয়াছি, এখন কেমন করিয়া সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া নিজ পায়ের উপর ভর দিয়া আত্মনির্ভর করিবার গৌরব দাবী করিতে পারি? সুতরাং হস্তপদ বিশিষ্ট হইলে কি হয়! মহামুস্কিলে পড়িয়া গেলাম। আকাশে ঘন নিবিড় মেঘ-মালা, চতুর্দ্দিকে মেঘের বিরামবিহীন বিচিত্র আনাগোনা। মাঠে জল থই থই করিতেছে। সর্ব্বদিকেই বালক, যুবা, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় পুরুষ নারী একসূত্রে মহা উৎসাহে বিপুল আনন্দে কাজে লাগিয়া গিয়াছে। গো-মহিষগুলি সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য করিয়া যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাঙায় উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে অমনি তাহাদের পৃষ্ঠদেশে পাচন বাড়ীর আঘাতে অস্থির হইয়া উঠিতেছে। তাহারাও মুখ বুঁজিয়া অনন্যোপায় সজল-করুণ দৃষ্টিতে পরিচালকের মুখের প্রতি চাহিয়া যথারীতি লাঙ্গল টানিয়া চলিতে বাধ্য হইতেছে। কোন উপায় যে নাই। কোন প্রতিকার করিবার মত শক্তি যে নাই। মুখ ফুটিয়া কথা বলিয়া অন্তরের ব্যথা জানাইবার মত ভাষা যে বিধাতা তাহাদের দেন নাই যাহার দ্বারা মানুষের মন সিক্ত হইতে পারে। তাহাদের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিবার মত অবস্থা বড় অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। কারণ দারুণ বর্ষার মধ্যে ভৃত্য-হীন প্রবাসে দিন চলা যে অচিরে বড়ই অসম্ভব হইয়া পড়িবে তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। দক্ষিণ হস্ত মুখে উঠিবার পথে শীঘ্রই ঘোর অশান্তি আন্দোলন অন্তঃপুর হইতে অনায়াসে বাহিরের দুয়ারে বিদ্রোহীর উপদ্রবের মত উপস্থিত হইবার আভাষ আসিতেছিল। দূরে বড় বড় শাল গাছগুলি বায়ুহিল্লোলে মাথা দুলাইয়া বিজ্ঞের মত বুঝি বর্ষার সহিত প্রেমালাপ করিতে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কালো মেঘের কোণে বৃষ্টিধৌত নবীন সবুজের যৌবন-দীপ্তি অপূর্ব্ব শ্রী লইয়া মন হরণ করিতেছিল। দেখিয়া দেখিয়া যেন তৃপ্তি হয় না, কেবলই দেখিবার ব্যাকুল আকাঙ্খা আকুল হইয়া উঠিতে থাকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখ-দৈন্য, হর্ষ বিষাদ সব ভুলিয়া কেবলই ঐ সবুজের সঙ্গে মিশিয়া আত্মহারা হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। সারাবিশ্ব যেন অস্তিত্ব হারাইয়া বৃষ্টিধারার মধ্যে আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। কেবল স্ফটিক-স্বচ্ছ জলধারার মধ্যে সবুজের যৌবন-দীপ্তি নয়ন মন আকর্ষণ করিতেছে। মাঝে মাঝে নবীন নীরদের নিবিড় আলিঙ্গন নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে হইতেছে।

ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, কচিৎ মাঝে মাঝে দুই একটি বৃদ্ধা—দুধ লইয়া বিক্রয় করিতে সহরে চলিতেছে। তরি-তরকারী শাকসব্জী লইয়া যাহারা নিত্য বিক্রয় করিতে এইপথে বাজারে যাইত তাহাদের সাক্ষাৎ একরূপ দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। একা বসিয়া বসিয়া মুক্ত জানালা-পথে বৃষ্টিঝরা দেখিতেছি। এক একবার প্রবলবেগে বৃষ্টি-ধারা নামিয়া সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। পাহাড়—পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, পথ প্রান্তর কিছুই নয়নগোচর হইতেছে না। চতুর্দ্দিক হইতে মেঘ নামিয়া যেন সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। বৃষ্টি এমন প্রবলবেগে প্রচুর পরিমাণে পড়িতেছে যেন মনে হইতেছে ধরাবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া লীলায়িত শুভ্র বাষ্পরাশি অভিনব গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই গতির লীলাভঙ্গি যেন মধুর ছন্দে-বন্দে অপূর্ব্ব সঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া আমার অন্তরে অজানা সুরের কি করুণ আহ্বান জাগাইয়া তুলিতেছে। হৃদয়ের স্পন্দন যেন এই-সুরে সুর মিলাইয়া এক হইয়া গিয়াছে। বাহিরের সকল শব্দ যেন কখন কোন মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। একটি মধুর সুরে যেন সারা বিশ্বের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া যে এমন অপূর্ব্ব মিলন অজ্ঞাতে ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ দিবার কোনও উপায় ভাবিয়া চিন্তিয়া খুঁজিয়া পাই নাই। প্রকৃতির সহিত মানবের কতখানি আত্মীয়তা এবং সে সম্বন্ধ যে তার রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জা, অণুপরমাণুর সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া আছে, তাহার সহিতই যে মানবের চিরদিন চিরপ্রিয় প্রণয়। এ সত্য বুঝি

এমন নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় না হইলে জানা যায় না! এ বিরহ যে অনন্ত ও জন্ম-জন্মান্তরের, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মানব নিজ সৃষ্ট, নব নব অভাবনীয় বিরহ-ব্যথায় সর্ব্বদা নিষ্পেষিত হইয়া কি নিদারুণ নিষ্ঠুর নির্য্যাতন না সহ্য করিয়া আসিতেছে! তাহার অন্তরের মধুর মিলন যে কোথায়? কোন পথে? কোন গানে? কোন সুরে? তাহার সন্ধান শত সহস্র বর্ষ ধরিয়া ধরার মলিন স্বার্থপরতার মধ্যে মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও পাইবে না। এ নিষ্ঠুর সত্য কে আমাদের বুঝাইয়া দিবে? তাই বুঝি প্রকৃতির মধুর আহ্বান এমন করুণ, এমন প্রাণস্পর্শী বলিয়া মনে হয়

এমন সময় হঠাৎ একটা পথহারা উদ্ভ্রান্ত বাতাস হাহাকার শব্দে আমার জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া সমস্ত জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া গেল। অকস্মাৎ উপদ্রবের মত আসিয়া যদিও তখনি চলিয়া গেল, সে কিন্তু পশ্চাতে ফেলিয়া গেল, বর্ষা-বারি-সিক্ত গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, কদম্ব, চামেলি, চাপা প্রভৃতি পুষ্পের মধুময় অপূর্ব্ব সৌরভ। বুঝিলাম সমস্ত বাতাস ভরিয়া আনন্দে এরা সব ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কাহারও আদর আহ্বানের নিমিত্ত কোন অপেক্ষাও করিতেছে না। সমস্ত বাগানটি জুড়িয়া যেন সবুজের মোহন মেলা বসিয়া গিয়াছে। বুঝি এখানে কোন নবাগত অতিথি আসিবে, তাহারই আগমন প্রতীক্ষায় আনন্দ উল্লাসে পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। তরুলতাগুলি পরস্পরের মধ্যে যৌবনের নবীন অনুরাগে, কি সোহাগে, না মৃদু অনিল স্পর্শে যেন অধীর হইয়া পড়িতেছে—যেন হাসিয়া লুটাপুটি খাইতেছে। বৃষ্টি সামান্য ধরিয়া আসিয়াছে মাত্র। টিপ্ টিপ্ করিয়া মাঝে মাঝে দুই এক বিন্দু বারি পড়িতেছে। আকাশের মেঘ রাজি যেন অল্প অল্প আলগা হইয়া পড়িয়াছে। সে জমাট ভাবটা যেন একটু তরল মত দেখাইতেছে। তাহা হইলেও চতুর্দ্দিকে খণ্ড খণ্ড মেঘ ছুটিতেছে। পাহাড়ের মাথাগুলির উপর তখনও মেঘ ঝুঁকিয়া পড়িয়া আছে। তথাপি তাহাদের দেখা যাইতেছে। এ অবস্থা যে বেশিক্ষণ থাকিবে এমন ভরসা বড় নাই। পথে দুই চারিজন লোক বাজারের দিকে এই সুযোগে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাগানের ছোটবড় গাছগুলির দিকে চাহিয়া কত কথাই মনে আসিতেছে। কাহারও জন্মস্থান বাঙ্গলার কোন সুদূর পল্লীগ্রামে, কেহ বা আসিয়াছে ভারতবর্ষের কোন এক প্রান্তসীমা হইতে; কেহ বা আসিয়াছে কোন এক তুষার সমাচ্ছন্ন পর্ব্বত বক্ষ হইতে; কোনটি বা আসিয়াছে বিশাল সমুদ্রের পরপার হইতে। ইহাদের সকলের জাতি বা ধর্ম্ম এক না হইলেও, একজনের পরিশ্রমে, চেষ্টায়, স্নেহে কেমন একস্থানে সকলে সমান অধিকারে-আবদ্ধ হইয়াছে। যেখানে বাগানের অধিকারীর যত্ন, স্নেহ, প্রীতি, প্রণয় আছে সেখানে তাহার নিযুক্ত মালীর পরিশ্রম ও চেষ্টা জয়যুক্ত হইয়া বৃক্ষাদির নয়ন বিমোহন সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এসকল ক্ষেত্রে মালিক অপেক্ষা মালীকে সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে এবং তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপূর্ব্ব যত্ন যেন শতদিক দিয়া এই সকল সবুজের সর্ব্বাঙ্গে উদ্ভাসিত করিয়া তাহারই যশঃগান গাহিতে থাকে। আবার যেখানে মালিকের দৃষ্টি নাই, সেখানে মালীর অবহেলায় ও অবজ্ঞায় ইহারা জীর্ণদেহে অনাদরে মরণোন্মুখ হইয়া পড়িয়া আছে।

কালমেঘের অভ্যন্তর হইতে একটা আলোর জ্যোতি সহসা সর্ব্বদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মেঘ যেন আরো একটু পাতলা দেখাইল। তরুণ অরুণের কনক রশ্মির ছটা মেঘের বক্ষের মধ্যেই তাহার সাড়া দিয়া অপ্রকাশ থাকিলেও তাহার আলোক-ধারা ধরা-বক্ষের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বাকি রহিল না। এই সময় দেখিলাম, পুষ্প-বিথিকায় নবীন অতিথির সমাগম হইল। নানাবিধ বর্ণে, বিচিত্র-চিত্রিত, অভূতপূর্ব্ব দর্শন প্রজাপতির দল আসিয়া প্রণয়িনীদের আকুল আগ্রহে কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া প্রেমালাপে বিভোর হইয়া পড়িল। কুসুম কুমারীগণ সরমশঙ্কায় নত হইয়া পড়িতে লাগিল। রসিক প্রজাপতিরদল কিন্তু বড়ই অন্যায় আচরণ করিতেছিল। কেবলই উড়িয়া উড়িয়া একুল হইতে আবার ও ফুলের মধুপানে উন্মত্ত হইয়া যেন একসঙ্গে সকলের সোহাগ লুটিয়া ফিরিতেছিল। সে কি অভিনব উৎসাহ! কি অনির্ব্বচনীয় রসালাপ!

লজ্জা অভিমানে কুসুম কুমারীগণ পরস্পরের প্রতি চাহিয়া বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িতে লাগিল। উচ্ছৃঙ্খল

প্রজাপতিগণের মধুপান-মত্ত-হৃদয় আনন্দ আবেশে ঢলিয়া পড়িতেছিল। এই প্রজাপতির দল কিন্তু অত্যন্ত অপরূপ সাজ-সজ্জা করিয়া আসিয়াছিল—রং বেরংএর অভিনব পরিচ্ছদ পরিয়া, কেহ কেবল সাদা সিল্কের পোষাকে অঙ্গ আবৃত করিয়াছিল কেহ সাদার উপর কালো ভেল্‌ভেটের বুটি দেওয়া—তাহার পাশে পাশে লালের ডোরা টানা পোষাকে। কোনটি বড় বেশী রকমের সৌখীন ছিল। তার আগাগোড়া চুনি'র মত লাল রংএর পোষাক—তাহার উপর মাঝে মাঝে পাকা সোণার কল্কী তোলা। একজনের পোষাক ছিল সোণালী রংএর, কিন্তু পাখা দুখানি ছিল সবুজ মখমলে আবৃত। একজন বোধহয় ইহাদের মধ্যে পুরাকালের প্রাচীন বিশিষ্ট বংশের বংশধর হইবেন, কেন না ইঁহার বিচিত্র পোষাকের পারিপাট্য দেখিলে স্তম্ভীত হইয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ অনিমেষ নয়নে, অক্লান্ত দৃষ্টিতে, সে সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আত্মবিস্মৃতি আসিয়া পড়ে। সে আসিয়াছিল রঙীন পাখায় বিচিত্র বর্ণ চিত্র করিয়া তাহার বাহার ধরে না; রামধনু বর্ণ সিল্কের পোষাকে সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত করিয়া। ফুল কুমারীগণ তাহার প্রতি আকুল দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। তাহার অপরূপ রূপভাতি দেখিয়া যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। নানাদেশ হইতে অতুল কল্পনাতীত সৌন্দর্য্য সম্পদ লইয়া ইহারা বর্ষাদিনের প্রভাতে সহসা ঘর ছাড়িয়া ফুলের সোহাগ লুটিয়া লইতে অভিযান করিয়াছিল। মনে হইল ইহারা সকলে বোধহয় এ পৃথিবীর নয়, স্বর্গরাজ্য হইতে মর্ত্তের কুসুম কাননে যেন কেলি করিতে আসিয়াছে! বর্ষার ভিজা বাতাসের স্কন্ধে আরোহন করিয়া শ্যামল শোভায়মান মর্ত্তে নামিয়া পড়িয়াছে। ইহাদের রূপের বর্ণনা করিবার মত শব্দ-সম্পদ আমার নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ ছিল খুব ছোট, কেহ ছিল মাঝারী রকমের, কেহ ছিল বেশ বড়। বিভিন্ন বর্ণের এত প্রজাপতি কোনদিন একসঙ্গে দেখিবার সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই।

দেখিলাম ইহাদের উন্মত্ততা যেমন বাড়িয়া উঠিল অমনি কোথা হইতে একদল বহুরূপী আসিয়া তাহাদের সুকুমার কমনীয় দেহগুলি অনায়াসে গিলিয়া খাইয়া ফেলিতে লাগিল। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার কি নির্ম্মম ভাবেই চিরদিন অকারণে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে—তাহা বর্ত্তমান ঘটনাটি দেখিয়া অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলাম। এই অত্যাচারে কুসুম-কলিকাদের অন্তর আতঙ্কে কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল। দারুণ মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত হইয়া মৃত্তিকা-নত হইয়া পড়িতেছিল। যখন প্রকৃতির রূপের বন্যায় মন আমার উধাও হইয়া ছুটিয়াছে, যখন সংসারের কোন সংবাদই মনে পড়িতেছে না—যখন কল্পনায় রঙীন নেশা কাটিয়া গিয়াছে, বাস্তবের অনুসরণে পুলকিত অন্তরে চলিয়াছি—তখন সহসা আমার সম্মুখে গৃহিণী স্ব-শরীরে আসিয়া দর্শন দিলেন। "মনে নেই যে ঘরে একটী দানা চাল নাই? এমন করে' বসে বসে ভাবলে ত আর পেট ভরবে না। জান ত চাকর নাই, যে সহর হতে চাল আনাব। ছাতাটা মাথায় দিয়ে একটু রাস্তার ধারে দাঁড়াও না—চাল পাবে এখন।"

এমন বর্ষার দিনটা, এমন প্রকৃতির পরিচয়টা এক মুহূর্ত্তে চালের অভাব নষ্ট করিয়া দিল! মানুষের সমস্ত চিন্তাই বুঝি এমনি এক একটি আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়! পথের ধারে, ছাতা মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়াছি মাত্র, এমন সময় দেখি একটী নবম বর্ষীয় বালক প্রায় সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে ভিজিতে ভিজিতে সহরাভিমুখে চলিয়াছে। হাতে একটী দুধের কেঁড়ে। মুখ খানি তার চিন্তাভারাবনত। জিজ্ঞাসা করিলাম—দুধ বিক্রি? 'না' বলিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, কাল রাত্রিতে তার বাবা বাড়ী আসে নাই, সে তার সংবাদ নিতে যাচ্ছে। বাবু, আমার বাবা ভাল আছে ত? তার জন্য দুধ নিয়ে যাচ্ছি। নিরক্ষর অশিক্ষিত সাঁওতাল বালকের মধ্যে কি পিতৃ-ভক্তি, কি অপূর্ব্ব সরলতা! বৃষ্টির জলে তার নয়নের জল মিশিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। প্রকৃতির নগ্ন ক্রোড়ে পালিত এই বালকের অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে মহিমান্বিত করিয়া তুলিল। মনে মনে বলিলাম "ভগবান, এই অকলঙ্ক সরল হৃদয় বালক যেন তার পিতাকে গিয়া সুস্থ ও ভাল দেখে।" প্রকাশ্যে আশ্বাস দিয়া বলিলাম "তোমার বাবা ভাল আছে, কোন ভাবনা নাই।" সে চলিয়া গেল। কিন্তু সেদিনের স্মৃতি আজও আমি ভুলিতে পারি নাই।

—লা

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত নহে)

(১)

বাজার হইতে উৎকৃষ্ট গল্দা-চিংড়ি আসিয়াছিল। নন্দলাল বলিয়াছিলেন রাত্রে যেন ভাল করিয়া কালিয়া রান্না হয়, সুস্থ-চিত্তে আহার করা যাইবে। গৃহিণী মানদাসুন্দরী কিন্তু 'শুভস্য শীঘ্রং' এই শাস্ত্র-বাক্য অনুসরণ করিয়া সকাল বেলাই উক্ত উপাদেয় আহার্য্য রন্ধন করিয়াছিলেন। কাল আফিস যাইতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, আজ রন্ধন হইতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; তাই ভোজনাসনে বসিয়া নন্দলাল আহার এবং অনুযোগ উভয়ই একসঙ্গে করিতেছিলেন। গল্দার কালিয়া যখন অতিরিক্ত গরম ছিল তখন শেষোক্ত ব্যাপারটাই বেশী করিতেছিলেন, শীতল হইয়া আসার পর হইতে প্রথমোক্ত ব্যাপারই বেশী করিতেছেন। আহার না করিয়া অফিস যাইলে গৃহিণী রুষ্ট হইবেন, এবং বিলম্ব করিয়া অফিস যাইলে রেজিষ্ট্রার বিরক্ত হইবেন। তদ্ভিন্ন সুরন্ধিত গল্দা-চিংড়ির প্রতি আসক্তি ত ছিলই।

এই ত্রিবিধ বিপদে নন্দলাল বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চিৎকার করিতে করিতে পুত্র সুকুমার গৃহে প্রবেশ করিল। "আমি দেখে নোব! আমি চাব্‌কে তার পিঠের চামড়া লাল করে দোব! আমি খেসারতের নালিশ করব! ছোটলোক! মীন! কাউয়ার্ড!"

উত্তপ্ত গলদার কালিয়া অপেক্ষাও এ সমস্যা অধিকতর দুরুহ মনে হওয়ায় নন্দলাল আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি আচমন শেষ করিয়া পুত্রের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "কে ছোটলোক?"

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সুকুমার বলিল, "ওই বিনয়টা! বিনেটা! ওটার নাম পর্য্যন্ত করতে আমার ঘেন্না করছে!"

"কেন, সে কি করেছে?"

ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়া তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া সুকুমার বলিল, "কি করেছে? পঞ্চাশজন লোকের সাক্ষাতে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছে!"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া নন্দলাল বলিলেন, "বিনয় গালাগাল দিয়েছে? কি বলেছে সে?"

সুকুমারের কলরবে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই সমবেত হইয়াছিল। ঔৎসুক্য-পীড়িতা ভগিনিগণের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া অর্থব্যঞ্জক দ্বিধা ভরে সুকুমার বলিল, "আমাকে —লা বলেছে!"

শুনিয়া সুকুমারের তিন ভগ্নীরই মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল,—বিশেষতঃ অবিবাহিতা তৃতীয়া মাধুরীর।

জ্যেষ্ঠ মোক্ষদা সরোষে বলিল, "কি আস্পর্দ্ধা!"

মধ্যমা মোহিনী তীব্রস্বরে বলিল, "অতি অসভ্য ত!"

কনিষ্ঠা মাধুরী কিছু বলিতে না পারিয়া অধিকতর লাল হইয়া গেল।

মানদাসুন্দরী বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি এবং তৎপদ্ধতিতে শিক্ষিত যুবকদিগের প্রতি নানাপ্রকার কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ যে এবম্বিধ শিক্ষায় কুশিক্ষিত না হইয়া প্রকৃত মনুষ্য হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে তাহা প্রতিপন্ন করিবার সুযোগ পাইলেন।

সময় এবং সাহসের অভাবে তদ্বিষয়ে কোনও প্রকার মতদ্বৈধ প্রকাশ না করিয়া নন্দলাল সুকুমারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "একেবারে অকারণে সে হঠাৎ এ-রকম গালাগাল দিয়ে বসল? তুমি তাকে কিছু বলনি?"

গৃহিণীর অভিমত সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি, বিশেষতঃ বিনয়ের প্রতি, নন্দলালের বৈমুখ্য ছিল না।

সুকুমার পুনরায় স্ফীত হইয়া উঠিল। "কারণ অকারণের ত কোনও কথা হচ্ছে না! সে এ-রকম ছোট-লোকের মত গালাগাল দেবে কেন? আমার অপরাধ, আমি বলেছিলাম যে চরকা ঘুরিয়ে স্বরাজ লাভ হবে যে বলে সে গাধা। ব্যস, অমনি সে বলে বসল, যে বলে হবে না সে গাধার —লা! দেখ দেখি স্পর্দ্ধা! কেন, আর কি গালাগাল ছিল না?"

নন্দলাল মনে-মনে বলিলেন, "দুটি ছিল; গরু আর বাঁদর! সেই-দুটি একসঙ্গে বলা উচিত ছিল।" মুখে বলিলেন, "গাধা বেশী খারাপ, না গাধার —লা বেশী খারাপ তা অঙ্ক কষেও বার করা শক্ত!" বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

(২)

কি করিয়া প্রতিশোধ লইবে তদ্বিষয়ে সুকুমার সমস্তদিন আস্ফালন করিয়া বেড়াইল।

মানদা বলিলেন, "সাত জন্মে ওর আর মুখ দেখিস নে!"

মোক্ষদা বলিল, "ওর সঙ্গে চিরকালের মত কথা বন্ধ করে দাও!"

মোহিনী বলিল, "ওর বাড়ীতে আর কখনও পদার্পণ করো না!"

মাধুরী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; এ-সকল দণ্ডের একটিও তাহার যথেষ্ট মনে হইল না. অথচ নিজেও যথোপযুক্ত কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল যে, বিবাহ-বর্ম্মে বর্ম্মিত তাহার দুই ভগিনীকে বিনয়ের অপমান-শর ততটা বিদ্ধ করিতে পারে নাই যতটা তাহাকে করিয়াছে! তাই বিনয়কে তাহার অপরাধের জন্য যাহাতে যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা ব্যগ্র হইয়া উঠিল; কিন্তু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার কোনও উপায়ই খুঁজিয়া না পাইয়া ক্রমশঃ অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল।

সমস্তদিনে অন্য কিছু স্থির করিতে না পারিয়া সুকুমার অবশেষে বিনয়কে একখানা চিঠি লিখিল। মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল যে যুদ্ধের পূর্ব্বে ঘোষণা পত্রের মত, অথবা নালিশের পূর্ব্বে নোটিসের মত, এই পত্র পরবর্ত্তী ক্রিয়ার অভিসূচনা মাত্র! ব্যাপারটা এই পত্রেই নিশ্চয় নিঃশেষ হইবে না!

(৩)

কিন্তু দিন দুই পরে একদিন দ্বিপ্রহরে যখন বিনয়ের নিকট হইতে সুকুমারের পত্রের উত্তর আসিল তখন পরিহাসের রঙে এতাবৎ যাহা রঙীন ছিল, সহসা তাহা সঙীন হইয়া উঠিল!

পত্রের কলেবর সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মর্ম্ম গভীর এবং ব্যাপক। বিনয় লিখিয়াছে যে, সুকুমারের পত্র পাঠ করিয়া পর্য্যন্ত সে মনে করিতেছে যে, ঘটনার দিবস সুকুমারকে গাধার —লা না বলিয়া গাধা লা বলাই উচিত ছিল, কারণ বুদ্ধি-গৌরবে এখন সুকুমারকে একটি অখণ্ড গাধা বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। সুকুমার সম্বন্ধে তাহার আর অধিক কিছু বলিবার নাই; কিন্তু, যেরূপেই হউক, সে যখন সুকুমারের ভগিনীত্রয়ের অসন্তোষ উৎপন্ন হইয়াছে তখন তাহাদের বিষয়ে একটা কিছু করা নিশ্চয়ই আবশ্যক। অতএব সে প্রথম দুইটির নিকট ক্ষমা এবং তৃতিয়টির নিকট পাণি ভিক্ষা করিতেছে। শেষোক্ত ব্যাপারে সকলেরই পক্ষে (তাহার নিজের পক্ষেও) সুবিধা হইবার কথা, কারণ তাহা হইলে বাংলাদেশের এবং বাংলাভাষার এই বিচিত্র দ্বিধা ব্যবহৃত শব্দটি ভিন্নার্থবাচক হইয়া বিচ্ছেদের পরিবর্ত্তে সন্ধিস্থাপনা করিয়া সকল দ্বন্দ্ব দূরীভূত করিবে। প্রস্তাবিত পরিণয় ব্যাপারে পণের কোনও কথা নাই, শুধু একটি ভিন্ন অর্থাৎ কল্পিত বাসরে সুকুমারকে সর্ব্বসমক্ষে বিনয়ের - লা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে!

চিঠি পড়ার পর সুকুমারের চক্ষু এবং মাধুরীর মুখ রক্ত-বর্ণ ধারণ করিল, এবং উত্তেজনায় প্রথমোক্তের দেহ এবং শেষোক্তের মন কাঁপিতে লাগিল!

মোক্ষদা ও মোহিনী কিন্তু ক্রোধের উচ্চস্তর হইতে অনেকটা নামিয়া আসিল। বিনয়ের মত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ক্ষমা-ভিক্ষা তাহাদের বয়সের তরুণতায়, নব আস্বাদ নূতন গৌরব বলিয়া মনে হইল। দাবীর অতিরিক্ত ডিক্রী পাইয়া তাহারা শান্ত হইয়া গেল।

১৩৩১ আশ্বিন ১৩৩১

৫	৬	
১২	১৩	
১৯	২০	২১
২৬	২৭	

আরও ৯ দিন আছে

পূজায়

চক্ষু রক্তবর্ণ এবং গোলাকার করিয়া সুকুমার বলিল, "এতবড় স্পর্দ্ধা যে গালাগাল দিয়ে তারপর আবার বোনের নাম জড়িয়ে সে ঠাট্টা করে! এর প্রতিশোধ তিনদিনের মধ্যে নোব তবে আমি—" কিন্তু তিনদিনের স্থলে পাছে চারদিন লাগিয়া যায় এই আশঙ্কায় শপথটা শেষ করিল না।

মোক্ষদা বলিল, "যা হোক, অন্যায় কাজ করেছে বলে এবার একটু আক্কেল হয়েছে!"

মোহিনী বলিল, "ক্ষমা চাওয়া হয়েছে, কিন্তু তবু আবার কত জোর!"

মাধুরী মনে-মনে বলিল, "জোর আবার খাটান হয়েছে আমার ওপর! কেন রে বাবু, আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি তা'ত জানি নে!"

সন্ধ্যার পর নন্দলাল জলযোগ করিলে সুকুমার বিনয়ের চিঠিখানা তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করিয়া গভীরস্বরে বলিল, "এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার হয়েছে।"

পত্রের শেষাংশ পাঠ করিতে করিতে নন্দলালের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পত্রখানা নিজের বাক্সের ভিতর রাখিয়া প্রসন্নস্বরে বলিলেন, "ব্যবস্থা তা হলে করে ফেল! শুভস্য শীঘ্রং! মাঘমাসের প্রথম লগ্নেই তা হলে শুভকর্ম্ম সারা যাক্!"

বিস্ফারিতনেত্রে সুকুমার বলিল, "আপনি ওই রাস্কেলটার সঙ্গে মাধীর বিয়ে দেবেন নাকি?"

শান্তস্বরে নন্দলাল কহিলেন, "নিশ্চয়ই!"

চিত্রার্পিতের মত ক্ষণকাল নন্দলালের দিকে একভাবে অবস্থিত থাকিয়া সুকুমার বলিল, "আমাকে এমন ভাবে অপমান করেছে, তবুও?"

নন্দলাল কহিলেন, "তবুও। আমি কি পাগল যে এমন পাত্র হাতে পেয়ে ছেড়ে দোব! বাজার দর হিসাবে এ পাত্র আটহাজার টাকার একটি পয়সা কমে হয় না!"

সুকুমার তর্জ্জন করিয়া বলিল, "আর বাসর ঘরে আমাকে হাতজোড় করে তাকে বলতে হবে যে আমি তার —লা?"

মাথা নাড়িয়া নন্দলাল বলিলেন, "আরে না, না, সেসব বলতে হবে না। আর বললেই বা এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? তখন ত আর সে কথা গালাগাল থাকবে না!"

নন্দলালের প্রতি তীব্রনেত্রে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সুকুমার বলিল, "ওর সঙ্গে মাধীর বিয়ের কথা যদি হয় তা'হলে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব।"

এ কথার উত্তর দেওয়া নন্দলাল নিষ্প্রয়োজন মনে করিলেন।

মোক্ষদা বলিল, "কিন্তু মন্দ হয় না দাদা! বিনা-পণে বিয়ে করে জব্দ হয়!"

মোহিনী বলিল, "তা ছাড়া বেচারা ক্ষমাও চেয়েছে!"

দ্বারান্তরালে মাধুরী মনে মনে বলিল, "তা ছাড়া বেচারা ত' আমাকে—!" সব কথাটা মনে-মনে বলিতেও বাধিয়া গিয়া তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

রন্ধন-শালায় গিয়া সুকুমার জননীর নিকট পিতার বিরুদ্ধে নালিশ করিল।

মানদা সুন্দরী তখন গলদা চিংড়ির দেহের নিকৃষ্ট অংশের সাহায্যে কোনও উৎকৃষ্ট তরকারী রাঁধিতে ব্যস্ত ছিলেন। পুত্রের অভিযোগ সম্পূর্ণ না শুনিয়া বলিলেন, "এ যে আমার কথা বাপু! ছোট বোনের বাসর-ঘরে বড় ভাই হয়ে ও-কথা বলতে যাবে কেন?"

সুকুমার ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তা'ছাড়া, আমার যে মা বিয়েতেই আপত্তি!"

পাক-পাত্রে পাক-যন্ত্র বিশেষ সজোরে নাড়িতে নাড়িতে দুঃখার্ত্তস্বরে মানদা কহিলেন, "সেত আমি জানিই রে আমার আস্তশ্রাদ্ধ না করে তুমি বিয়ে করবে না!"

বিরক্ত হইয়া সুকুমার বলিল, "আমার না! আমার না!"

যেন অদ্ভুত রকম একটা নূতন কথা শুনিলেন, এমনি বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের সহিত মানদাসুন্দরী বলিলেন, "তোমার না, তবে কার?" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অবলীলাক্রমে সমস্ত মনযোগ পাক-পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন।

"জানি নে কার!" বলিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বিরক্তিভরে সুকুমার প্রস্থান করিল।

* * * *

নন্দলাল কথাটাকে যতই পাকাপাকি করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন সুকুমার ততই ক্ষেপিয়া উঠিতে

লাগিল। বলিল, "মাধীকে জলে ফেলে দিয়ে আসব সে-ও ভাল, তবু বিনের সঙ্গে বিয়ে হতে দোব না!"

শুনিয়া মাধুরী মনে-মনে বলিল, "ভগবান আমাকে তোমার মত ভাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করুন!"

(৪)

সুকুমারের দ্বারা যতটা উপকার পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিক আর কিছু পাইবার প্রত্যাশা নাই বুঝিতে পারিয়া নন্দলাল স্বয়ং বিনয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাটা পাকা করিয়া আসিলেন।

পিতৃমাতৃহীনা সহোদরা আশাকে ডাকিয়া বিনয় বলিল, "সুকুমারকে যে—না কায়েম করতে হল আশা! পরিহাস শেষকালে ইতিহাসে দাঁড়াল!"

সমস্ত শুনিয়া আশা যৎপরোনাস্তি খুসী হইল, কিন্তু অলক্ষিতে সহসা কখন সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষুপ্রান্ত সজল হইয়া আসিল।

"কাঁদছিস কেন রে আশা?"

আশা হাসিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "কাঁদছি কই? হাসছি ত!"

(৫)

বিবাহের দিন বর-সভায় সুকুমারকে দেখা গেল না, বিবাহ স্থলেও নয়। বিনয় মনে-মনে হাসিয়া বলিল, "বোধহয় গো-শালায় গিয়ে বসে আছে!"

বাসরে বিনয় তাহার কৌতুক-লব্ধ বধূকে পার্শ্বে লইয়া সানন্দ-চিত্তে বাসর-রমণীগণের রহস্যালাপ উপভোগ করিতেছেন এমন সময়ে কলরব উঠিল সুকুমার আসিতেছে।

পরমুহূর্ত্তেই হাসিতে হাসিতে সুকুমার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং হাস্যোৎফুল্লমুখে বিনয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "বিনয় তোমার প্রার্থনা মত আমি সকলের সম্মুখে স্বীকার করছি যে তুমি আমার — না!"

এই বিপরীত কৌতুক-রঙ্গে পুলকিত হইয়া সমবেত রমণীগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

কলরব থামিলে স্মিতমুখে বিনয় বলিল, "আমার আপত্তি নেই, কারণ আমি ত' আর তোমার মত গাধা —না নই! তবে মনে থাকে যেন আমারও আইবড় বোন আছে।"

"কে?—আশা?"

"আশা।"

বিস্মিত হইয়া সুকুমার ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর হাঁটু গাড়িয়া বিনয়ের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া তাহার কর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আশা আছে তা'ত জানি; কিন্তু সেত আমার পক্ষে দুরাশা!"

বিনয়ও মৃদুস্বরে বলিল, "বিনা পণে যদি তাকে গ্রহণ করতে রাজী থাক তা হলে সে তোমার দুরাশা নয়, আশা।"

সুকুমার মৃদুকণ্ঠে বলিল, "শুধু বিনা-পণে নয় প্রাণপণে আমি তাকে গ্রহণ করতে রাজী আছি!"

সন্নিহিতা বধূ মনে-মনে বলিল, 'কিন্তু আমার বিরুদ্ধে ত' প্রাণপণে লাগা হয়েছিল!'

মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা হইলেও নিকটে যাহারা ছিল তাহারা কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল।

বাসরিকাদের মধ্যে একজন সম্পর্কে ঠানদিদি ছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "—নারা দেখছি নিজের নিজের বোন পার করবার জন্যে চক্রান্ত করেছিলেন!"

আবার একটা হাসির কলরোল উঠিল।

বিনয় বলিল, বোন পার করবার জন্যে বাংলাদেশে প্রাণান্ত করবার প্রথাই আছে; আমরা সে প্রথাটা তুলে দিয়ে চক্রান্তই চালাতে চাই।"

সুকুমার প্রস্থান করিলে মোক্ষদা বলিল, "এ-রকম চক্রান্তের ফলে বরের বাপের কিন্তু প্রাণান্ত হবে!"

মোহিনী বলিল, "কনের বাপের কিন্তু প্রাণ বাঁচবে!"

বিনয় বলিল, "তা ছাড়া বর নিজেকে মানুষ বলে মনে করতে পারবে।"

মাধুরী মনে-মনে বলিল, "তাছাড়া আর একজন বরকে দেবতা বলে ভাবতে পারবে!"

* * * *

পরদিন গৃহিণীর মুখে কথাটা শুনিয়া নন্দলাল মুখ বক্র

করিয়া বলিলেন, "এই দেখ আবার একটা ভজকট বাধালে! নিছক্ সুবিধা সংসারে হবার নয়!"

মানদা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তা কি করবে? লোকে কথায় বলে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে! তা নইলে তুমিই বা আজ এমন সোনার-চাঁদ জামাই পেলে কেমন করে?"

নন্দলাল আর কিছু বলিলেন না, শুধু মনে মনে কয়েক-বার—লা—লা বলিলেন। কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন বলা কঠিন! সম্ভবতঃ নিজেকেই বলিলেন, কারণ পুত্র বা জামাতাকে বলা সম্ভব নয়, এবং গৃহিণীর ভ্রাতৃবর্গকে স্মরণ করিবার কোনও কারণ ছিল।

* * * *

মাধুরীকে লইয়া গৃহে পৌছানর কিছুক্ষণ পরে বিনয় বলিল, "ওরে আশা, সুকুমার তোকে দুরাশা বলে মনে করে। আমি কিন্তু তাকে আশা দিয়ে এসেছি যে তুই দুরাশা নোস্, আশা!"

কতকটা বুঝিয়া এবং কতকটা না বুঝিয়া আরক্তমুখে আশা বলিল, "কি যে হেঁয়ালী করে বল কিছুই বুঝতে পারি নে!"

বিনয় হাসিতে হাসিতে বলিল, "কাল বাসর ঘরে সকলের সামনে সুকুমার আমাকে —লা বলেছে। আমিও কি করি, তার কাছে —লা কায়েম হয়ে এসেছি! জানিস ত সুকুমারের মতে কাউকে —লা বললে তার আইবড় বোনকে অপমান করা হয়! আর আমার মতে, সেই আইবড় বোনকে বিয়ে করলে সে অপমানের প্রতিকার করা হয়।" বলিয়া সলজ্জা মাধুরীর দিকে চাহিয়া বিনয় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

আশা একেবারে টক্ টকে হইয়া উঠিয়া বলিল, "যাও দাদা! কি যে বল তার ঠিক নেই!"

মাধুরী মৃদু-মৃদু হাসিতে হাসিতে আশার আরক্ত বর্ণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "সবই ঠিক আছে! জান না ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়?"

মাধুরীর কথা শুনিতে পাইয়া বিনয় হাসিতে হাসিতে বলিল। "শুনলি আশা?—তোর ভাই হোল ঢিল, আর নিজের ভাইটি হোল পাট্‌কেল!"

আশা ও মাধুরী হাসিতে লাগিল।
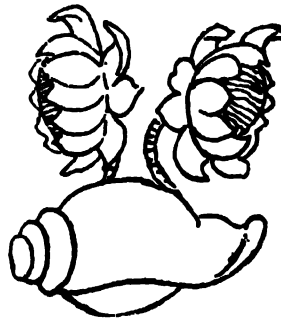
ক্ষণজন্মার আত্মকাহিনী

[শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন রচিচিত্রিত]

বসন্ত সমাগমে, কবিগণের হৃদয়কন্দরে ভাবের জমাট বরফ কল্পনার ২১০ ডিগ্রী উত্তাপে যখন গলিয়া ঝরণা ঝরিয়া পড়ে—অবশ্য কাগজে,—এবং শিল্পীগণের উর্ব্বর মস্তিষ্কে বহুপ্রকার অসম্ভব পরিকল্পনা ও বর্ণের আলিপনা খিচুড়ী

কল্পনার ২১০ ডিগ্রী উত্তাপে

পাকাইতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই সময় আমারও মনটা বড়ই উড়ু উড়ু করিয়া উঠে, (যেমন সকলেরই করিয়া থাকে) এবং আমিও অন্তরে বাহিরে কি যেন কি একটা অনুভব অনুভব করি, "ভাব যেন হৃদয়ে আর ধরিতেছে না, উথলিয়া যেন গ্রন্থ হইয়া বাহির হইতেছে"; কিন্তু সে সুযোগ শুধু রবিবার ছাড়া ঘটিয়া উঠেনা—কারণ, আমি আফিসের কেরাণী।

পাঠক! কেরাণী শুনিয়া চটিয়া গেলেন? ভূমিকায়, "বসন্তসমাগম", "হৃদয়কন্দর", "পরিকল্পনা", ইত্যাদি ভাল ভাল কথা পড়িয়া আপনারা ভাবিতেছিলেন, এইবার বোধ হয় কোনও ষোড়শী সুন্দরী নায়িকার আবির্ভাব হইবে! কিন্তু, তাহার পরিবর্ত্তে আসিলেন কি না, কেরাণী! ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হইবেন না পাঠক! কেরাণী দীর্ঘ ঈ-কারান্ত শব্দ, অতএব স্ত্রীলিঙ্গ—সুতরাং, নায়িকা! কিন্তু, কেরাণী একাধারেই নায়িকা ও নায়ক।

পূর্ণিমার চাঁদ দেখিলে অনেক বেকার প্রেমিক (অর্থাৎ নায়িকাহীন নায়ক) যেমন প্রেমোন্মাদব্যাধিগ্রস্ত হন, তেমনি প্রতিবার মলয় মারুতের নূতন হিল্লোলে আমার ও হৃদয় মধ্যে কাব্যসাগর কল্লোল করিয়া উঠে, এবং তাহার সঙ্গে কবিতা ছাপাইয়া ছাপার অক্ষরে নামটা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা বিষম বলবতী হয়! এ-হেন সুসময়ে কোন্ মৌন কবি বা নব্য লেখকের এ ইচ্ছা না হয়?

"ভাব যেন হৃদয়ে ধরিতেছে না, উথলিয়া যেন গ্রন্থ হইয়া বাহির হইতেছে"

করি! আমারও ইচ্ছা করে, "শতরঞ্চ বিছানো মেঝেতে" "ওয়েবষ্টার ডিক্সনারী মাথায় দিয়া" চুপ করিয়া শুইয়া থাকি, দশে আমার পরিচয় পাইবে, নগরে বাজারে আমার আলোচনা চলিবে, পথ দিয়া চলিয়া যাইলে, লোকে অবাক

হইয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিবে—"ঐ দেখ কেরাণী কবি!"—এ ইচ্ছা আমার বহুদিন হইতেই আছে। কিন্তু পাছে আমার উদয়ে, অপর কবিগণের, অর্থাৎ করুণা. কালিদাস, কুমুদ, গিরিজা (কুমার ও নাথ), জীবেন্দ্র, পরিমল, বসন্ত, যতীন্দ্র

কেরাণী কবি

(নাথ ও মোহন), রমণী, সত্যেন্দ্র (নামগুলি অকারাদিক্রমে লিখিলাম, বড় ছোট অনুসারে নহে) প্রভৃতির যশঃ ম্লান হইয়া যায়, তাই কেবল ভদ্রতার অনুরোধে এতদিন আত্মগোপন করিয়া ছিলাম। ভাল কাজ করি নাই!

ভূমিকা ক্রমশঃই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। ঐ যে প্রথমে বলিয়াছি, বসন্ত-সমাগমে অন্তরে বাহিরে কি যেন কী একটা অনুভব করি, তাই এই নূতন বসন্তে ভাবের স্রোতে এতদূর ভাসিয়া আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠকগণ, একটু ক্ষমা করিবেন, কারণ লেখকবৃন্দ অনেক সময়েই ভাবের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া, তাল ঠিক রাখিতে পারেন না। এইবার ভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া আসল কথা বলিতেছি। আপনারা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন:—

বন্ধুসমাজে কবি বলিয়া আমার যে একটা খ্যাতি আছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। শুধু ছাপার অক্ষরে আমার নাম উঠে নাই। কোন-কোনও বন্ধু অসূয়াপরবশ হইয়া কবির "ব"-এর স্থানে "প" বসাইয়া আমার অসাক্ষাতে আমায় বিদ্রুপ করেন বটে, কিন্তু ইহাতে আমি "মনে মনে ভারি চটি!" সে কথা যাউক। আমি যে কেমন কবি হইলাম তাহার একটু ইতিহাস এই স্থানে আপনাদের জানাইলে মন্দ হইবে না।

আফিসে আমাদের একটি বৃদ্ধ দপ্তরী আছে। লোকটি বেশ সুরসিক। একদিন টিফিনের ছুটিতে জল খাইবার ঘরে বসিয়া আপন মনে একটি উর্দ্দু গজল্ গাহিতেছিলাম,

দপ্তরী মিঞা

এমন সময় দেখিলাম, দপ্তরী বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। এই গানটি, আমি এক বন্ধুর বাড়ীতে গানের মজলিসে শুনিয়া শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিলাম। টিফিন ঘরে বসিয়া গানটি গাহিবার সময়, দপ্তরীকে বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে ইহা শুনাইবার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তাহার কাছে গিয়া গানটি একরকম করিয়া গাহিয়া দিলাম। দপ্তরীর বাড়ী ফরকাবাদ কি সেকেন্দ্রাবাদে শুনিয়াছিলাম, এবং সে যে এই উর্দ্দু গানটি শুনিয়া আমার শিক্ষার অত্যন্ত প্রশংসা করিবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না; কারণ মুসলমান না হইলে এ সব গানের মর্ম্ম অপর লোকে ত বুঝিতে পারিবে না!

দপ্তরী কিন্তু গানটি শুনিয়াই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হাত মুখ নাড়িয়া আমায় বলিল :—

"আরে হেরে লড়কেকা
আজব্ তারেকা খেল,
ছুছুন্দরকে শিরপর
চামেলীকা তেল্!"

এবং অপর কেরাণীগণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল—"দেখিয়েতো বাবুজী, ইয়ে বাবু মুঝ্‌কো বোলতে হ্যায়, 'তু মেরে পিয়ারী; ম্যয় তেরি খুবসুরতি দেখ্‌কর ছাতিপর পথল বৈঠায়া। তু মেরা না হোনেসে ম্যয় মর যাউঙ্গা!"

তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিল :—"ম্যয় বুড্‌ঢা হুঁ, মেরাসাথ্ এসা তফ্‌রী করনা নাহি চাহিয়ে। জারা সমঝ্‌কে গীত-উত্ গানা বাবু।" ইহা বলিয়াই সে ধীরপদে দপ্তরীখানার দিকে চলিয়া গেল। অতঃপর অপর কেরাণীগণ আমাকে লইয়া যে হাসি তামাসা জুড়িয়া দিল, তাহা প্রকাশ না করাই ভাল।

দিন দুই তিন পরে দপ্তরীকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ, সেদিন তুমি ঐ গান শুনিয়া চটিয়া গিয়াছিলে, তাহাতে আমার কোনও দোষ ছিল না। তোমার দিব্য—উহা যে প্রেমসঙ্গীত তাহা তখন আমি জানিতাম না—পরে অনুসন্ধানে জানিয়াছি। তা, তুমি কিছু মনে করিও না দপ্তরী মিঞা। তুমি যে সেই ছুছুন্দরকে তেল্, না কি এক কবিতা আমায় বলিয়াছিলে, বেশ কবিতাটি। উহা বোধ হয় কোনও বড় কবির রচনা? সেটি আর একবার বল ত। তাহার অর্থটা আমায় বুঝাইয়া দাও।" দপ্তরী বলিল - "তুম্‌হারা উয়া সমঝ্‌নেকা ইলম্ নেহি হ্যয়? কেয়া তাজ্জব! তুম্‌হারা করিনা দেখ্ কর ম্যয়ঁ নে উয়া বয়েৎ উস্ ঘড়ী বনায়া!" এবং ইহা বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে চলিয়া গেল।

আকাশের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া কবিতা রচনা করি নাই

আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, একজন দপ্তরী যদি মুখে মুখে ঐরূপ কবিতা রচনা করিতে পারে, তবে আমিও না পারিব কেন ?

সেইদিন হইতেই কেমন করিয়া যে আমার কবিতা-উৎসমুখের চাপা পাথরটি গড়াইয়া পড়িল তাহা আমি নিজেই ভাবিয়া বিস্মিত হই। সেই দিন হইতে আমি কবি হইলাম। এবং কিরূপ প্রতিভাবান কবি হইলাম, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় এই আত্মকাহিনীতে দিব। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, যে সমস্ত কবিতার অত্যল্প অংশ আপনারা এই কাহিনীতে উদ্ধৃত দেখিবেন, তাহা আমি মুখে মুখে—মনে রাখিবেন, মুখে মুখেই—রচনা করিয়াছি। আজকালকার কবিদের মত কাগজে লিখিয়া কাটকুট্ করিয়া, আকাশের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া, ইংরাজ, মুসলমান, বৈষ্ণব কবিগণের ভাব বদল সদল করিয়া রচনা করি নাই! রচনার সময়ে শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ ষ্টেনোগ্রাফার সেগুলি মিনিটে-দুইশত-কথা বেগে শর্টহ্যাণ্ডে নোট করিয়া লইয়াছে। আপনাদের অবগতির জন্য উক্ত শ্রীমান্ই বহুশ্রম স্বীকার করিয়া তাহার নোটবুক হইতে এই গুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়া আমায় দিয়াছে। তজ্জন্য আপনাদের পক্ষ হইতে তাহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

ইহার কিছুদিন পরেই একটি কুমারীকে দেখিয়া আমি প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিলাম। কবিগণ বিশ্বপ্রেমিক হইয়া থাকেন ইহা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, এবং তাঁহারা যে স্থান-কাল-পাত্র পাত্রী নির্ব্বিচারেই প্রেম বিতরণ করিয়া থাকেন তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। আপনারা জানিয়া রাখুন, আমি প্রেমে পড়িয়াছিলাম, কারণ আমিও যে কবি, এবং আমার চিত্ত-আত্মসাৎ-কারিণীর উদ্দেশে, আমি যে গানটি মুখে মুখেই রচনা করিয়াছিলাম (এবং ব্রজেন্দ্রনাথ নোট করিয়া লইয়াছিল) তাহা এই :—

আমি
বেণী-দোলান মেয়েটিকে
বড্ড ভালবাসি,
সেই পথে তাই সেই গলিতে
নিত্য যাই আসি।
রচেছি কতই তাহার নামে
পদ্য রাশি রাশি।
বিয়ে হ'লে সে খাওয়াবে মোরে
সদ্য রাঁধা খাসি।
তার বাবা যদিও বলেনি এ—
বলে আমার মাসি।
ও মোর দাদারে মনের খেদে
যাবই যাব কাশী।
হেঁহে বিয়ে যদি না করে মোরে,
ফেলব দাড়ী নাশি',
(গিয়ে) পাড়াগাঁয়ে বলদ কিনে,
হবই হ'ব চাষী!
ওহো তারে বড্ড ভালবাসি।

বেণী-দোলানো মেয়েটাকে বড্ড ভালবাসি"

গানটি শুনিয়া ব্রজেন্দ্র চিত্তহারা হইয়াছিল এবং অবিলম্বে আমার কবিত্বশক্তি চারিদিকে প্রচার করিয়া দিল। কিন্তু ইহার ফলে এই হইল যে কন্যার পিতা আমার নামে উকীলের চিঠি দিয়া আমাকে এইরূপ পদ্য গীত রচনা হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। হায় নীরস অরসিক—কুমারী-পিতা!

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই একদিন ঠাকুদাদাকে দেখিয়া আমি মুখে মুখে—পাঠক স্মরণ রাখিবেন মুখে মুখে - যাহা রচনা করিলাম তাহা এই ঃ—

ওহে ও ঠাকুরদাদা,
থান খানি বেশ সাদা,
পেটটি বড়ই নাদা,
বুঝি রোজ গাদা গাদা
এই চাল ছোলা আদা
খাও হে—উ ——

কিন্তু ইহা শেষ করিবার পূর্ব্বেই, ঠাকুরদাদা "ভ্যালা মোর দাদারে!" বলিয়া আমার কাণে হাত দিয়া আমার সহিত শ্যালক সম্বন্ধ পাতাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। এই কারণে আমি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া পরবর্ত্তী লাইনগুলি আর রচনা করি নাই।

কুমারীর পিতা উকীলের চিঠি দিয়াছেন

আর একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই আমার প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় আপনারা পাইবেন।

এক মেসে আমার যাতায়াত ছিল। সেখানে একদিন বর্ষার সন্ধ্যায় গিয়া দেখিলাম, ছেলেরা অপরের তক্ত সেই বাড়ীর বলিয়া লইয়াছে, এবং মহানন্দে মিষ্টান্ন ভক্ষণান্তর পাশা খেলিতেছে। ঘরের ভিতর একজন (গোঁফ সমেত) স্ত্রীলোক সাজিয়া, দাড়ীতে আঙুল দিয়া, "নয়না মে ঠার, চাটনি মিঠা বাত্" এইটুকু মাত্র কেবলি গাহিয়া নৃত্য করিতেছে, এবং ঘরের বাহিরে বারান্দায় আর একব্যক্তি স্ত্রীলোক সাজিয়া তাহারই অনুকরণে দাড়ীতে হাত দিয়া অতি তারস্বরে "হেসে নাও দুদিন বইত নয়," এই গানটি গাহিয়া তাণ্ডবে মাতিয়াছে! ইহা দেখিয়াই আমার প্রাণে তৎক্ষণাৎ ফীলিং আসিল, এবং—পাঠক স্মরণ রাখিবেন—মুখে মুখে আমি এইটি রচনা করিয়া ফেলিলাম ঃ—

ঘোর বর্ষায় আষাড়ে
মেষের শাবক বাসাড়ে
যত বেয়াদব পাশাড়ে
কি খেলচে খেলা চাষাড়ে!

যাহারা খেলিতেছিল, তাহারা শুনিতেই পাইল না, কারণ সে ক্রীড়া-চক্রব্যূহ হইতে পুনঃ পুনঃ ভীষণ শব্দ উঠিতেছিল—"বারো পাঞ্জা সতেরো," "একটা আড়ি মার ত পাশা," "তিনেড়ি" ইত্যাদি। কিন্তু ঘরের ভিতর যে নাচিতেছিল, সে আসিয়া সবেগে আমার গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল—"শূয়ার, আমাদের মেষ-শাবক বল্লি?" আমি বুঝাইবার বহু চেষ্টা করিলাম, মেষ-শাবক নয়, মেসের সাবক অর্থাৎ বাসক অর্থাৎ যাহারা মেসে বাস করে। বিদ্যাপতির নজির দিলাম, তিনি লিখিয়াছেন, "করী করে সোঁপল মালতী মাদ"—ওটা অবশ্য "দাম" (মালা), কবি "মাদ" লিখিয়াছেন। ওসব Poetical License!—কে কার কথা শোনে! এদিক ওদিক আকুল নয়নে চাহিয়া দেখিলাম, ব্রজেন্দ্রনাথ যদি

আসিয়া আমায় এ বিপদ হইতে উদ্ধার করে। সে আর আমি এক সঙ্গেই ত এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয় কবিতার শেষ চরণের সঙ্গেই সে দীর্ঘচরণে চম্পট প্রদান করিয়াছে।

সেবার বহু চেষ্টায় তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, মেসে যাতায়াত ত্যাগ করিলাম।

অতঃপর আমি আর "বেনাবনে" মুক্তা না ছড়াইয়া, কেবলমাত্র রসগ্রাহী বন্ধু ব্রজেন্দ্রকেই আমার কবিতা শুনাইতাম। সে তাহা শর্টহ্যাণ্ডে লিখিয়া লইত।

যে কবিতাগুলি আপনারা আগে পড়িলেন, সেগুলি যদিও বেশী বড় নয়, এবং অসম্পূর্ণও বটে—তবু ইহা হইতেই আপনারা আমার কবিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয়

ঘরের ভিতর একজন (গোঁফ সমেত) স্ত্রীলোক সাজিয়া "নয়নামে ঠার চাট্‌নি মিঠা বাত" এইটুকু কেবলই গাহিয়া নৃত্য করিতেছে, এবং বারান্দায় আর এক ব্যক্তি "হেসে নাও দুদিন বৈত নয়" এই গানটি গাহিয়া তাণ্ডবে মাতিয়াছে।

ক্রীড়া-ব্যূহ হইতে পুনঃ পুনঃ ভীষণ শব্দ উঠিতেছিল

পাইয়াছেন, তাহা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, চিত্রকরের অসম্পূর্ণ খস্‌ড়া আঁকা (Sketch) হইতেই তাহার প্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার এ কবিতাগুলি যে খস্‌ড়া সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিয়াছেন, এবং আপনারা যে বিশেষজ্ঞ, ইহাও আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি!

ব্রজেন্দ্রকে কবিতা শুনাইয়া এবং তাহার বাহবা পাইয়া ছিলাম ভাল, কিন্তু তাহারই বুদ্ধির দোষে বিপত্তি ঘটিল। কারণ, সে বলিল, "তোমার মেরিট্‌ যে-সে লোক বুঝতে পারবে না।" আমি অনেক আপত্তি করিয়া বলিলাম যে সম্পাদকগণ আমার কাছে ষ্টেনোগ্রাফার লইয়া আসুন, আমি মুখে মুখে রচনা করি, তাঁহারা উহা লিখাইয়া লইয়া কাগজে ছাপাইয়া দিন। আমি ত আর যে-সে কবি নই যে সাধিয়া কবিতা দিতে যাইব!

ব্রজেন্দ্র বলিল—উহা অদ্যতো সঙ্গত হয় না। অবশেষে তাহার আগ্রহাতিশয্যে আমি একজন মাসিক-সম্পাদকের সহিত দেখা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

একদিন অপরাহ্ণে সাজিয়া গুজিয়া সেই মাসিকের অফিসে গেলাম। বহুক্ষণ পরে ত্রিতলে সম্পাদকের ঘরে আমার ডাক পড়িল। উপরে গিয়া বিনীতভাবে তাঁহার টেবিলের পাশে দাঁড়াইলাম। মস্ত টেবিল। রাশিকৃত পাণ্ডুলিপি, বই, কাগজ অতি বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়ান। ডান দিকে একটা লেটাররয়াক্‌, বাঁ দিকে এক ডিবা পান, কৌটায় কিমাম, একটা ছোট পিক্‌দানী, সিগার-কেশ ইত্যাদি।

ঢিলা হাতা পাঞ্জাবী গায়ে, রোপসোল চটি পায়ে, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ-দেহ এক ব্যক্তি টেবিলে ঘাড় গুঁজিয়া কি লিখিতে ছিলেন। মুখে একটা বর্ম্মা চুরুট। অনুমানে বুঝিলাম ইনিই সম্পাদক। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বোকা পাঁঠার মত, তাঁহার একটু দাড়ীও ছিল!

তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই, আমার প্রাণে ভাবের প্রবল লহর উঠিতেছিল, এমন সময় তিনি লেখ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—আপনি কবি?

আমি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি। কবিতা এনেছেন?

আ। Surely—নিশ্চয়ই।

তি। নাম?

আ। "সাদৃশ্য"

তিনি একমিনিটকাল চুপ করিয়া থাকিলেন, মনে মনে বিড় বিড় করিয়া কি বলিলেন,—তাহার পর বলিলেন—"পড়ুন।"

যদিও ব্রজেন্দ্রনাথ আমার এই কবিতাটি তাহার নোটবুক হইতে লিপিবদ্ধ করিয়া এখানে আসিবার সময় আমার হাতে দিয়াছিল, তথাপি কাগজ দেখিয়া পড়াটা আমার প্রতিভার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলাম না।

আমি ঘরের এদিক ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে শর্টহ্যাণ্ড-রাইটার নাই ?"

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন—কেন ?

আমি বলিলাম আজ্ঞে, আমি ত নকলনবিশ কবি নই! আমি মুখে মুখে কবিতা রচনা করে' যাই। ২০০ বা ২৫০ কথা মিনিটে লিখে নিতে পারে, এমন একজন ষ্টেনোগ্রাফার না থাকলে আমার কবিতা লিপিবদ্ধ করবে কে? আমি ত আর যে-সে কবি নই!

সম্পাদক মহাশয় আমার মুখের দিকে একমিনিটকাল স্থিরভাবে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"আচ্ছা, আপনার কবিতা পড়ে' যান।"

পড়ে' যান! পড়ে' যান কি! মুখে মুখে রচনা করিয়া যান না বলিয়া, এই অভদ্রোচিত অনুরোধ! এই সমস্ত লোকগুলি বাজেকবির কবিতা পড়িয়া ও শুনিয়া এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা মুড়ীমিশ্রী এক দরের মনে করেন! যাহা হউক অভিমান পরিত্যাগ করিয়া লিখিত কাগজগুলি বাহির করিয়া আমি কবিতাটি পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় আমার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে এই সম্পাদকের অত্যন্ত পেত্নীর ভয় আছে, যেমন মনে পড়া, সেই বিষয় লইয়া তৎক্ষণাৎ একটা নূতনতর কবিতার আইডিয়া আমার মাথার ভিতর গজাইয়া উঠিল। তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া আরম্ভ করিলাম :—

পত্নী ও পেত্নী শুধু "এ" কারেতে ভিন্ন। তবে পেত্নী কিছু রসিকা, পত্নী সদা খিন্ন!

দুয়ের স্বভাব এক—ঐ নাকে কথা কয়,
কৌশলেতে পেলে মোদের দেখায় বড় ভয়!
সুযোগ পেলে দুজনাই কাঁধে করেন ভর,
প্রাণনাথই জানেন কিবা ঘটে অতঃপর!
সোহাগ সমান দুজনার কোথাও নাহি খুঁত,
পত্নী বলে—"প্রাণনাথ," পেত্নী—"প্রাণের ভূঁত!"

অনুমানে বুঝিলাম ইনিই সম্পাদক

দুয়ের মাঝে একটুখানি প্রভেদ কেহ পায়,
বলতে বড় লজ্জা আসে সবার কাছে তায়—
পেত্নী কাঁধে ভর করিলে, "রামের" নামে যায়,
পত্নী "পেলে" প্রাণনাথে, ছাড়ানো বিষম দায়!

এই লাইনটী শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ সম্পাদক মহাশয় একটি চাপা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"থামুন!"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন? থামব কেন? ডি, এল, রায়ও আজ অবধি এমন মনপ্রাণহারী কবিতা রচনা করতে পারেন নি! আপনি কষ্ট স্বীকার করে' আর একটু শুনলে বেশ বুঝতে পারবেন, এই কবিতাটী আপনার কাগজের যে সংখ্যায় বেরোবে, তিন রাত্রি না পোয়াতেই সে সংখ্যার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপার প্রয়োজন হবে।

সম্পাদক সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া শুধু বলিলে,—আপনি যেতে পারেন।

আমি বলিলাম—"আজ্ঞে, কবিতাটা লিখে রেখে-ছেন ত ?"

কোনও উত্তর নাই। আমি পুনরায় বলিলাম—"ধূয়াটা শেষ হয় নি এখনও, ধূয়াটা শুনবেন না ?"

কোনও উত্তর নাই। ঘরে চুরুটের বিকট গন্ধ।

ভয়ানক কাসি আসিতে লাগিল। আমার কাসি আসিলে হাঁচি আসে, আবার তাহা থামিতে চায় না। পাছে হাঁচির চোটে আমার ভাবের খেই হারাইয়া যায়, তাই কষ্টে কাসি চাপিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"ধূয়াটা শুনবেন না ?" তিনি কোনও কথা না বলিয়া, পার্শ্বস্থ ছেঁড়া-কাগজ-ফেলা টুকরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনার কবিতা ঐটের মধ্যে রেখে যান।" আমি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। পথে আসিতে আসিতে ভাবিলাম লোকটি হয় স্ত্রৈণ, নয়, অধিক মাত্রায় রুচি-বায়ু গ্রস্ত !

ইহার পর আমি বহু সম্পাদকের নিকট আমার রচনা শুনাইয়াছি এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যে এ দেশের মাসিকের কর্ণধারগণ একেবারে নিরেট। অত্যুৎকৃষ্ট কবিতার রসবোধ করিবার ক্ষমতা ইহাঁদের আদৌ নাই। ইহাঁরা কেবল নামে নাচেন !

আমার কবিত্ব এ দেশে ত কেহই বুঝিতে পারিল না ! হায়, দুর্ভাগা দেশ ! কিন্তু আমি যে শুধু কবি নই, চিত্রীও বটে, এ কথা ব্রজেন্দ্র ছাড়া আর কেহই জানিত না। এবার আমি দেখিব ছাপার অক্ষরে আমার নাম উঠে কি না ! ব্রজেন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমি কয়েক দিন হইতে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছি। বাল্যকালে আমি শ্লেটে পেন্সিল দিয়া এমন ছবি আঁকিতাম যে "স্যর" তাহার জন্য, আমার লেখা-পড়ায় অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া, অতীব ভীত হইয়া, আমার উপর বহু মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়া এই বিদ্যা হইতে নিরস্ত করিতে গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠ্যাবস্থায় চিত্রবিদ্যা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও আমি কেরাণীগিরিতে প্রবেশ করিয়া মাঝে মাঝে ছবি আঁকিয়া ব্রজেনকে দেখাইয়া চমৎকৃত করিয়া দিতাম !

এক দিনকার একটা ছবি আঁকার ঘটনা বলি—

আমাদের আফিসের বড় বাবু, একবার তাঁহার উপর-ওয়ালা সাহেবকে খুসী করিবার অভিপ্রায়ে নিজ গৃহিণীকে তাঁহার সঙ্গে মেম সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন, এবং ইহাও বলেন যে তাঁহাকে বুটজুতা ঘাগরা ইত্যাদি পরিয়া মেম সাজিয়া সাহেবের বাড়ী যাইতে হইবে। রন্ধনশালা হইতে সদ্যনিষ্ক্রান্তা গৃহিণী বাবুর

সম্পাদক মহাশয় পার্শ্বস্থ ছেঁড়া-কাগজ-টুকরীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—
"আপনার কবিতা ঐটের মধ্যে রেখে যান।"

রন্ধনশালা হইতে সদ্যনিক্রান্তা গৃহিণী অতি গড়াম্বরে নানাবিধ ঝঙ্কার করিয়া পরিশেষে বলিলেন—"মরণ আর কি !"

এই প্রস্তাব শুনিয়া, অতি চড়াস্বরে নানাবিধ বক্তার করিয়া তাহার শ্রীমদ্‌গতি ধরিয়াছে, এই মত প্রকাশ করেন, এবং পরিশেষে বলেন—"মরণ আর কি।"

এই ঘটনাটি আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়া তাহার একটি ছবি আঁকিয়া ব্রজেনকে দেখাই। ব্রজেন মুগ্ধ হইয়া, সেই ছবি বেনামী ডাকযোগে বড়বাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। তাহার পরদিন হইতেই একমাস আমাদের টিফিনের ছুটি বন্ধ ছিল, এবং সাহেবের কাছে কর্ম্মে অমনোযোগিতার জন্য আমাদের নামে বহু রিপোর্ট গিয়াছিল! ভাগ্যে অপর কেহ জানিত না ছবিটি কাহার আঁকা! তাহা হইলে আমার চাকুরিটি গিয়াছিল আর কি!

আমি যে কিরূপ চিত্রী, তাহা ব্রজেনই জানিত এবং সেই জন্য আমায় প্রায়ই বলিত—"দেখ, আজকাল ছবি আঁকার দিকে লোকের ভারি নজর পড়েছে। তুমি আবার ছবি আঁকতে আরম্ভ কর। একদিনেই তোমার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরবে।"

আমি কিন্তু এ কথায় বড় বিশেষ ভরসা পাইলাম না। কিন্তু সন্দেহ-দোলায় দুলিতে থাকিলেও ছবিই আঁকিতে আরম্ভ করিলাম। ব্রজেন এক বিষয়ে সাবধান করিয়াছিল। বলিয়াছিল "যদি নাম চাও, ভারতীয় চিত্রকলা আরম্ভ কর।"

আমিও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, আজকাল চিত্রকলার দিকে লোকের যে খুব দৃষ্টি পড়িয়াছে ইহা ঠিক, এবং ভারতীয় চিত্রকলার অভ্যুদয়ের সঙ্গে চিত্রাঙ্কনটাও যে সহজ হইয়া পড়িয়াছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। চাই শুধু ভাব—আর ভাব—নহিং বটু ভাব! বাস্তব একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবে। ভাব ত আমার যথেষ্টই আছে, তাহার অভাব ত কখনও আমার হয় নাই; আর বাস্তবটা, উহা ত ভুলিয়াই আছি,—তা না হইলে কি কবি হইতে পারিতাম!

আজ কয়দিন হইল আমি একখানি ছবি আঁকিয়াছি। সকলে দেখিয়া ধন্য ধন্য করিয়াছেন, এবং চিত্র-বিশেষজ্ঞ একজন সম্পাদকের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার নিকট ইহা লইয়া গিয়া দেখাইতে এবং তাঁহার কাগজে ইহা ছাপিতে দিয়া আসিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে আমি সেই ছবিখানি ঐ শিল্প বিশেষজ্ঞ সম্পাদকের কাছে লইয়া গেলাম। তিনি বহুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন—"আমার কাগজে চলবে না।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন?"

তিনি বলিলেন—"ছবিতে ভাব নাই।"

আমি ত একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। এ ছবিতে ভাব নাই! বলিলাম—"রাজ্ঞী বসে' পক্ষী নিরীক্ষণ করছেন, প্রাণে কত রকম ভাবতরঙ্গ উঠছে, ভাবের চোটে ত্রিভঙ্গ হয়ে পড়ছেন, বস্ত্রের বক্র রেখায় রেখায়

চিত্রখানি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইলাম

"রাজ্ঞী পক্ষী নিরীক্ষণ করিতেছেন"

চিন্তা চক্র ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হচ্ছে। কি কর-পদ-পল্লব! কি বসবার ভঙ্গী! কি ডমরুমধ্য কটি! নয়নের কি অপার্থিব দৃষ্টি, কি ভ্রূ, কি কমনীয় গঠন! ও হো হো, আমি নিজেই মোহিত হয়ে যাচ্ছি মশায়! আর আপনি বল্লেন এতে ভাব নেই!"

আমার কথা শুনিয়া সম্পাদক মহাশয় কয়েক মিনিট গম্ভীর হইয়া থাকিয়া বলিলেন—"রাজ্ঞী যদি পক্ষীই নিরীক্ষণ করছেন, তবে তাঁর মুখ পক্ষীর পিঞ্জরের দিকে নেই কেন?"

আমি সোৎসাহে বলিলাম—"ঐ—ঐ—ঐ-খানেই ত বাহাদুরী! বাস্তব ভুলে যান! বাস্তব ভুলে যান! আরও দেখুন, রাজ্ঞীর মুখ ত পিঞ্জরের দিকে নেই-ই, পিঞ্জরটিও রাজ্ঞীর পশ্চাতে; তবুও রাজ্ঞী পক্ষীই নিরীক্ষণ করছেন—অন্তরে অন্তরে নিরীক্ষণ করছেন! ওই ত ভারতীয় চিত্র-কলার প্রাণ! চিত্রের নামে কি করে মশায়, অন্তরের অন্ত-স্তম প্রদেশের ভাব বোঝবার চেষ্টা করুন।"

তিনি কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না! বলিলেন—"দেখুন, আপনি ওখানি ধরণী বাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে একবার দেখান। তিনি যদি বলেন যে ছবি ভাল হয়েছে তবে আমার কাগজে ছাপতে পারি।"

আমি এই কথায় বিষম অপমানিত বোধ করিয়া চিত্র-খানি তাঁহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লইলাম, এবং তৎক্ষণাৎ সেইস্থান পরিত্যাগ করিলাম।

পাঠকগণ! আমার এই অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রখানি একবার আপনাদিগকে না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনারাই যে ইহার রসবোধ করিতে পারিবেন, তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই, সেইজন্ত বহু ব্যয়ে ইহার হাফ্-টোন ব্লক করাইয়া এইখানে ছাপিয়া দিলাম। যদি আপনারা মূল চিত্রখানি দেখিতে চান, তাহা হইলে আপনাদের জন্ত একটু জলযোগের আয়োজন করিয়া রাখিতে পারি। আপনারা আসিবেন কি?

আমি এ দেশের সম্পাদকগণের যেরূপ পরিচয় প্রতিদিনই পাইতেছি তাহাতে বুঝিতেছি যে আমার চিত্রেরও সমাদর এদেশে হইবে না। নাঃ, আমার ছবিগুলি বিলাতে পাঠাইতে হইবে দেখিতেছি। কয়েক মাস পর আপনারা

ছাদের আলিসা ঠেসান দিয়া রোজই ভাবি

বিলাতের কাগজের **Art** ও **Music**এর পাতা খুলিয়া দেখিবেন।

এ দেশে আমার কবিতা ও ছবির কেন সমাদর হইল না, সেই কথাই এই কয়দিন হইতে আফিস হইতে ফিরিয়া ছাদের আলিসা ঠেসান দিয়া রোজই ভাবি।

হঠাৎ একদিন রবিবারে ব্রজেন ঝড়বেগে আমার কাছে আসিয়া বলিল—"শীঘ্র কাপড় বদলে' নাও, তোমায় বক্তৃতা দিতে যেতে হবে।"

আমি ত একেবারে অবাক! বলিলাম, "বক্তৃতা দিতে যেতে হবে? বক্তৃতা! ও কাজ ত কখনও করিনি! ও আমার দ্বারা হবে না!"

ব্রজেন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল "বাজে কথা রেখে দাও। তোমার ভিতর যে বহুমুখী প্রতিভা আছে, সেটার পরিচয় এবার সব লোকে পাবে। ছবি ও কবিতার আদর তোমার এখন হল না বলে অমন হতাশ হয়ে বসে থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই। সবুরে মেওয়া ফলে হে, সবুরে মেওয়া ফলে! তোমার খ্যাতির আর বড় বেশী বিলম্ব নেই।"

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, বক্তৃতায় জনসাধারণকে যেমন মুগ্ধ করা যায়, এমন আর কিছুতেই নয়। ব্রজেন বলিতে লাগিল, "জনসাধারণ বক্তাকে যেমন চেনে এমন আর কাউকে নয়। দেখ না সুরেন বাঁড়ুয্যে বক্তৃতা দিয়ে কি নামই করল। বিপিন পাল, পাঁচকড়ি, সুরেশ সমাজপতি—এঁদের দেখ, কেমন সর্ব্বজন-পরিচিত হয়ে পড়েছে। লোকে তোমাকে বক্তা বলে' একবার জানলে, তোমার মেরিট বুঝতে পারলে, তুমি কবিতাই লেখ, বা ছবিই আঁক, বা ছাই ভস্ম যাই কর, সমস্ত মাসিক পত্রিকা ও খবরের কাগজগুলি তোমার নামে পূর্ণ হয়ে যাবে। চারিদিকে তোমার ধন্ত ধন্ত পড়ে' যাবে। তখন তুমি যে কি হবে, তা আমি কল্পনাই করতে পারছিনে। ওঠো, ওঠো, এ সুযোগ ছেড়ো না। আমি সমস্তই বলে' কয়ে' ঠিক করে রেখেছি। আর তোমার যে বক্তৃতার ক্ষমতা আছে তা আমি তোমার মামার কাছ থেকে শুনেছি। ছেলেবেলায় তুমি নাকি গরুর ওপর এমন

বক্তৃতা করেছিলে যে বাড়ীর লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাতে কি ওরিজিন্যালিটিই ছিল!"

—বলিয়া ব্রজেন আবৃত্তি করিল—'গরু অতি ভাল জন্তু। ইহাদের মাথার দুইদিকে দুইটা কাঁটা আছে—তাহাকে শিং বলে। ইহাদের পেটের নীচে চারিটা বুড়া আঙুল আছে; সে গুলি ফুটো হইয়া এক রকম সাদা জিনিষ বাহির হয়, তাহা আমরা খাই। মা বলেন তাহা দুগ্ধ। অসুখের সময় উহা ক্রমাগত খাইতে দেয় বলিয়া একেবারেই ভাল লাগে না। এখনও খাইতে চাই না। গরুর শরীর আমাদের মতন নয়। উহা খুব বড় ও মোটা বালিসের মতন। গরুর চারিকোনে চারিটি ক্ষুর আছে' হা হা হাঃ, কি মৌলিকতা! কি ভাবমাধুর্য্য! কি বক্তৃতাই করেছিলে! তুমি একটা জিনিয়স! নাও, নাও, শীগ্‌গির ওঠ। আর দেরী নয়, তিনটে বাজে। ওঠ ওঠ, যেতে হবে এখনই।

ব্রজেনের উৎসাহে আমিও অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া কাপড় বদলাইতে যাইতেছি এমন সময় ব্রজেন বলিল "দেখ, গালের দুটো পাশ কামিয়ে দাড়ীটাকে বেশ ভদ্রস্থ করে নাও। আজ তোমার চেহারা দেখবার জন্যে কত নরনারী আকুল হয়ে উঠবে! আর দেখ, এক শিশি বেশ ভাল এসেন্স গায়ে মাখ, দাড়ীতে আর গোঁফে একটু হেনার আতর লাগিয়ে নাও।"

সুরেন্দ্র বন্দ্যোর বক্তৃতা

তখনই তাহার কথায় কামাইবার সরঞ্জাম বাহির করিয়া, মুখে সাবান ঘষিয়া প্রচণ্ড উৎসাহবেগে যেমন ক্ষুর টানিলাম, অমনি এক দিককার গোঁফ ও দাড়ীরও সেই দিককার আধখানা ক্ষুরের চোটে একেবারে উড়িয়া গেল! হায়! হায়! হায়! একি বিপদ হইল! চেহারাও সেই সঙ্গে এমন বদলাইয়া গেল, যে আমি যে সেই লোক, সেই কেরাণী কবি ও চিত্রকর, তাহা আর চিনিবার কাহারও সাধ্য রহিল না! ঐ যে সাহেবেরা বলেন Lady-killer—ঠিক তাহার মতন রমণীমোহন চেহারাই আমার ছিল! আমার কবিজনোচিত

প্রচণ্ড উৎসাহবেগে যেমন ক্ষুর টানিলাম, অমনি এক দিক্‌কার গোঁফ ও দাড়ীর
সেই দিককার আধখানা উড়িয়া গেল !

দাড়ী গোঁফ দেখিয়া কত লোকের হিংসা হইত। কত যত্ন, কত চেষ্টা করিয়া আমি যে কবির চেহারা করিয়াছিলাম, তাহা এক মিনিটে এমন বদলাইয়া গেল, যে আর আমাকে মোটেই চিনিবার যো রহিল না। সহৃদয় পাঠকগণ! আপনারা আমার সেই সুন্দর কার্ত্তিকের মত চেহারা দেখিয়াছেন, আর এখনকার এই চেহারাও দেখুন! ও হো হো হো—কি পরিবর্ত্তন! এ চেহারা লইয়া বক্তৃতা দিতে যাইবই বা কি প্রকারে, আফিসেই বা যাইব কেমন করিয়া? হায় হায়—আমি যে নিজেই আমাকে চিনিতে পারিতেছি না!

এখন কিছুদিনের সিক্‌-লিভ্‌ লইয়া পশ্চিমে কোনও নিভৃত পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়া, দাড়ী গোঁফ পূর্ব্বের ন্যায় না হওয়া পর্য্যন্ত, আপনাদের নিকট বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। হায়, কি কুক্ষণেই ব্রজেন্দ্রের কথায় বক্তৃতা দিবার জন্য নামিয়াছিলাম!*

ফ্লায়িং চেকার

[শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ]

সেবার যখন বেকার বসিয়া ছিলাম ঘরের কোণে,
নোয়াখালি এক 'কর্ম্মখালি' সে দেখিনু বিজ্ঞাপনে।
শ্রীমধুসূদন নাম জপ করি যাত্রা করিনু যবে—
গিন্নী আসিয়া কহিলেন—"দেখো চাকরী এবার হবে;
রোজ সন্ধ্যায় তুলসী তলায় ধূপ-দীপ জেলে বসা,
গিন্নী মানত সন্দেশ দিয়ে, কভু বা কুমড়ো শসা;
এত সব কি গো বৃথা যেতে পারে? ধর্ম্মে কি এত সবে?
তাই বলি—ওগো, দেখো এইবার চাকরী হবেই হবে।"

* * * *

জানিনা কাহার ভাগ্যের জোরে জুটিল চাকুরী খাসা,
শুধু কাজ নয়, থাকিবারও তরে মিলিল একটী বাসা।
রেল কোম্পানী! বেঁচে থাকো বাবা! তোমারি দয়ায় শেষে
ফ্লায়িং চেকার হইয়া এবার ঘুরিতেছি দেশে দেশে।

* * * *

এল আশ্বিন—কি ভিড়ের ঠেলা! যাত্রী বোঝাই গাড়ী,
স্কুল কলেজের ছোকরার দল চলেছে সবাই বাড়ী।
যত ভিড় হয় তত মনে হয়—এই ত আমার চাই,
ট্রাঙ্ক বাক্সেট্ ওজন করিয়া কেবলি extra পাই।
মোদের চাকরী বজায় রাখাটা বড় সোজা কাজ নয়,
বেতনের চেয়ে আয়ের মাত্রা দেড়া দেখাতেই হয়!
তাই ত আমরা সারারাত জেগে সবারে জাগিয়ে ফিরি,
চাকরী মোদের শুধু চেক্ করা—পথের দস্যুগিরি!

* * * *

চাঁদপুর ঘাটে ক্যাল্‌কাটা-মেল-ষ্টীমার ভিড়িল যবে,
চুমকুরি দিয়ে কহিনু "গিন্নী, এবার চলিনু তবে।"
গিন্নী কহিল—"এসো, তবে সেই কথাটা রাখিয়ো মনে,
পূজার সময় বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না কাহারো সনে;
জান তো সবাই কত আশা নিয়ে চলেছে যে যার বাড়ী,
পথের মাঝারে কোরো না জুলুম, হোয়ো না অত্যাচারী।"
আমি বলিলাম—"রাম সীতারাম, একি কথা বল আজ!
যার তরে করি চুরি সেই তুমি আমারে দিতেছ লাজ?
ফ্লায়িং চেকার, মোরা দুনিয়ারে থোড়াই কেয়ার করি,
পূজা মরসুমে তোমাদেরই তরে দু'হাতে পকেট ভরি।"

* * * *

চলে রেলগাড়ী উগারি উগারি কালো ধূম ঘনঘোর,
ঘড়ী খুলে দেখি রাত কিছু আছে—তখনো হয়নি ভোর।
একশো এগারো নম্বর গাড়ী (111) লোকে ও লগেজে ভরা,
মানুষের ঘাড়ে মানুষ—যেন সে কাঁঠাল-বোঝাই করা!
সেই গাড়ী যবে চেক্ করিবারে খুলেছি দরজাখানা—
হাঁ হাঁ করি যত ছোক্‌রার দল দিল আসি মোরে হানা;
সে হানা উপেখি' জোর করি যেই ভিতরে দিয়েছি পা,
অমনি ধাক্কা—দুনিয়া আঁধার—আর কিছু জানি না।
পরদিন যবে জ্ঞান ফিরে এল—চাহিয়া দেখিনু হায়,
ভাঙ্গা মাথা হ'তে কোটপ্যাণ্ট্ সব রক্তে ভাসিয়া যায়;
কোথা রেলগাড়ী, কোথা মোর বাড়ী, কোথায় পড়িয়া আছি!
গ্রামবাসী এসে করিল রক্ষা, তাই ত রয়েছি বাঁচি।
ঠিক তিন মাস কাটিল আমার হাঁসপাতালের ঘরে,
উড়ে গেল সব যাহা জমেছিল ফ্লায়িং চেকারী করে।

* * * *

পূজা চলে গেল। গিন্নী কহিল—"বেশ ত দিয়েছ ফাঁকি,
এক পয়সারও দিতে হ'ল নাকো মুড়ি কি চিড়ের চাকী।"
আমি কহিলাম—"আরে রাম রাম, একি কথা কও প্রিয়া!
ইচ্ছা করে কি ফাঁকি দেছি ভাব গাড়ী হ'তে পড়ি গিয়া?
তোমারি জন্য প্রাণ যেতে যেতে ফতুর হয়েছি আজ,
মিথ্যা বলিয়া দিয়ো না দুঃখ, দিয়ো না বিষম লাজ।

পূজা মরশুমে ফরমাস তব ছিল তো এবার ঢের,
মান্দ্রাজী শাড়ী, মুগার চাদর, সোণামুগ দশ সের,
দুই জোড়া শাখা, এক জোড়া দুল, একখানা নাকছাবি,
কস্তুরী-দেওয়া কাশ্মীর-জরদা করেছিলে তুমি দাবী—
কিছুই এবার হ'ল নাকো দেওয়া—কি করি, উপায় নাই,
বেঁচে আছি তাই রক্ষা—নতুবা কপালে পড়িত ছাই।"
গিন্নী বলিল—"বাট, বাট, বাট, ওকথা বলিতে আছে?
তুমি যে আমার ইহপরকাল—স্বর্গ আমার কাছে।
পূজার বায়না কিছু করিব না, করিব না কোন শোক,
আমার শঙ্খ, আমার সিঁদুর চির অক্ষয় হোক্।"

* * * * * *

সেই আশ্বিন এসেছে আবার এই বাংলার দ্বারে,
হাসে বনবীথি শ্বেত-শেফালির নির্ম্মল হাসি-হারে,
উড়ে চলে নীল আকাশ-সায়রে শুভ্র মেঘের দল,
প্রভাত-রবির কিরণে চিত্ত করে তুলে চঞ্চল,
মুক্তা ধবল হাসে ঢল ঢল শিশির বিন্দুগুলি,
সরোবর মাঝে ফুট কুমুদেরা ডাকে যেন হাত তুলি;

এল এল পূজা—দশভুজা মা'র আগমনী সবে গায়,
আকাশে বাতাসে কুসুমের বাসে আভাস ভাসিয়া যায়।

* * * *

বসে বসে ভাবি, আর খাই খাবি—কি করি না পাই ঠিক,
গিন্নীর সেই হাঁড়ীমুখ দেখে থাকে না দিক্‌বিদিক্;
পূজার বায়না এড়ানো যায় না যদি না গুঁড়ায় মাথা,
সেটা নহে তত সুবিধার মত—বড় লাগে তা'তে ব্যথা!

পূজা এসে গেল—ছেলেরা চলিল মহা উল্লাসে বাড়ী,
দেখি এইবার কিছু রোজগার করে যদি নিতে পারি;
ফ্লায়িং চেকারী অতি রকমারী চাক্‌রী—সে কথা ঠিক,
শুধু অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়াই চতুর্দ্দিক;
কিন্তু কি করি—দশভরি সোনা গিন্নী করিছে দাবী,
এবার পূজায় দিতেই হবে যে চুড়ী, নথ, নাক্‌ছাবি।

হায় রে গিন্নী! ফরমাস দিয়ে বসিছ খাটেতে গিয়ে,—
ফ্লায়িং চেকার মরে দুনিয়ার অভিসম্পাৎ নিয়ে।
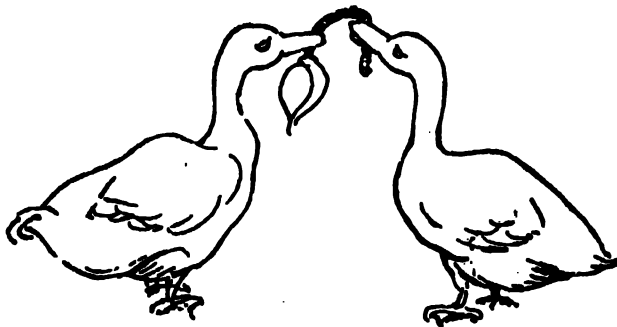
'লাভে' লোকসান

[শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ]

(১)

হোষ্টেলের মধ্যে হিরণের 'বাবু' বলিয়া একটা খ্যাতি আছে; এবং ঠাকুর চাকর হইতে সকলেই জানে সে খুব বড় লোকের ছেলে, কাজেই হোষ্টেলে কোন কিছু উপলক্ষে চাঁদার দরকার হইলে হিরণের চাঁদাটা অগ্রেই ফেলিয়া দিত, এবং সেটা যে খুব একটা বড় রকমের হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হিরণ 'খুব বড় লোকের ছেলে' নয়, তবে তার পিতা একজন অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী, সে মাতৃহীন এবং ডেপুটী বাবুর একমাত্র সন্তান, সুতরাং মাসে মাসে অন্য সকলের চেয়ে তার টাকাটা কিছু বেশী পরিমাণেই আসিত। এই বৎসরেই তাহার বি-এ দিবার কথা; কিন্তু তাহার পড়াশুনা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইত না, সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি কোন ফাঁকে সেটী সারিয়া লইতেন তাহা কেহই জানিত না। তাছাড়া, তার ধারণা এই যে, যাহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া 'পাশ' করে, তাহারা ভালকরিয়া 'পাশ' করিলেও, তাহাদের পাশের কোন মূল্য নাই। পক্ষান্তরে যাহারা না-পড়িয়া আড্ডা দিয়া কোন ক্রমে পাশ করে, তাহাদের পাশের বাহাদুরীই বেশী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবার আগ্রহই তাহার বেশী এবং দ্বিতীয় বিভাগে আই, এ পাশ করিলেও, তার এ অহঙ্কার এখনও যায় নাই যে, সে না-পড়িয়া পাশ করিয়াছে। হিরণ থাকে কলেজের হোষ্টেলে, সেখানে কতরকম কড়াকড়ি নিয়ম, যথা রাত্রি ৯টার সময় গেট বন্ধ হইবে, সুতরাং যেখানেই যাও ঐ সময়ের মধ্যে ফিরিতে হইবে। কিন্তু যে সমস্ত স্থানে গেলে, রাত্রি ৯টার মধ্যে ফেরা একেবারে অসম্ভব, মাসের মধ্যে অন্ততঃ চার পাঁচদিন হিরণ সে সব স্থানে গিয়া থাকে, এবং অবাধে রাত্রি ১টা কিম্বা তার পরেও ফিরিয়া থাকে, অর্থাৎ থিয়েটার যাওয়া তার একটা বাতিক ছিল, কোন থিয়েটারের কোন 'প্লে'ই তার বাদ যাইত না, এবং 'বঙ্গেবর্গী' ও 'কর্ণার্জ্জুন' সে নাকি পাঁচ ছয় বার দেখিয়াছে। রাত্রি ৯টার সময় গেট বন্ধ হইলেও সে যে এত রাত্রিতে ফিরিতে পারে, তার কারণ হোষ্টেলের এই কড়াকড়ি নিয়মের বাঁধন কোথায় কেমন করিয়া আলগা করিতে হয়, তাহা সে বেশ জানে। তার গান গাহিবার সখও ছিল, এবং একটা হারমোনিয়মও ছিল, তবে গলার মিষ্টতা এরূপ ছিল যে, হারমোনিয়মের সঙ্গে না গাহিলে তাহার গান অসহ্য বোধ হইত।

সম্মুখে বি-এ পরীক্ষা; কিন্তু 'বি-এ'র চিন্তার অপেক্ষা বিয়ের চিন্তাই তার এখন বেশী। তার বাবা তাঁর আত্মীয় স্বজনের কাছে বলিয়া রাখিয়াছেন, হিরণ বি-এ পরীক্ষা দিলেই তার বিবাহ দিবেন এবং এই জন্য তিনি অনেকস্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁর ইচ্ছা নিজেই পাত্রী পছন্দ করিবেন এবং আজকালকার ছেলেদের নিজে ক'নে দেখিয়া বিবাহ করা প্রথার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর পুত্রের মত অন্যরূপ;—সে বলে,— Shakespeare বলেছেন,

> "Let every eye negotiate for itself
> And trust no agent"

"আমি কারো চোখকে বিশ্বাস করি না, আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।" কারণ সে নভেল পড়িয়া পড়িয়া অনেকগুলি নায়িকার সংমিশ্রণে তাহার 'মানসী'র যে প্রতিমা কল্পনা করিয়াছিল, তেমনটী না হইলে সে বিবাহ করিবে না। সে চায় তাহার 'ওয়াইফ্' (ছাত্রদের মধ্যে আজকাল 'বাবা' ও 'স্ত্রী' শব্দ দুইটার একেবারেই প্রচলন নাই—উঁহাদের স্থানে যথাক্রমে 'ফাদার' ও 'ওয়াইফ' দখল করিয়াছে) সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, এবং সুগায়িকা হইবে, তার উপর যদি কবিতা লিখিতে পারে তবেত সোনায় সোহাগা!—

ফাল্গুন চৈত্র মাস বসন্তকাল, কবির কাছে ইহার কত আদর; কিন্তু ছাত্রদের কাছে এই বসন্তের আগমন মোটেই

প্রীতিপ্রদ নহে, কারণ এই ফাল্গুন চৈত্র মাসেই ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ যত সব পরীক্ষা! দেড়বৎসর ধরিয়া হিরণ কিছু করে নাই, এখন একটু আধটু না পড়িলে ত না-পড়িয়া-পাশ-করাও অসম্ভব, কাজেই হিরণ নোটের খাতাগুলি উল্টাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু একবার তাহার কাছে বিয়ের কথা তুলিলে আর রক্ষা নাই; নোটের খাতা বন্ধ করিয়া এমনি কবিত্বের ফোয়ারা সে ছুটাইয়া দিত, যে তাহার সামনে টেকা কঠিন। একদিন সন্ধ্যার সময় রাজেন্দ্র বলিয়া তাহার একবন্ধু হিরণকে বলিল, "আচ্ছা, হিরণবাবু, এই সামনের ব'শেখেই ত আপনার বিয়ে, মাঝে আর দুটো মাস মাত্র বাকী,—আচ্ছা আপনার যিনি ওয়াইফ্ হবেন তিনি এখন কি কচ্ছেন বলুন দেখি?" এই কথা শুনিবামাত্র হিরণকে আর সামলান দায়, ছুটিল তাহার আবেগময়ীবক্তৃতা :—

ওগো বন্ধু,

জানি না কোথায় সেযে, কিরূপ আকার!
কিন্তু সে যে আছে ঠিক জানি সুনিশ্চয়।
হয়ত সে প্রিয়া মোর বাঁধিয়া কবরী,
পরিয়া রঙিন সাড়ী,—উড়ায়ে আঁচল
মোটরে চড়িয়া কিম্বা হাঁকায়ে ব্রুহাম্
চলিয়াছে থিয়েটার দেখিবার তরে;
অথবা সে বসি কোন বাতায়নপথে
হারমোনিয়ম যোগে ধরিয়াছে গান,—
"দ্বার ভেঙে তুমি এস মোর কাছে—
ফিরিয়া যেয়ো না কভু।"
অথবা সে সুশীলা বালিকা
এলাইয়া বেহুতার চেয়ারের'পরে
পড়িছে নভেল,—আর
ভাবিতেছে সদা,—"কোন নায়িকার মত
হব প্রেমময়ী, কেমনে বানাব ভেড়া
স্বামী দেবতারে!"—
অহো—অহো—কোথা আছ বালা,
কবে মোর গলে দিবে কুসুমের মালা?

হাসি সামলাইতে না পারিয়া একবন্ধু বলিলেন "আচ্ছা, ধরুন, যদি পাড়াগাঁয়েই আপনার বিয়ে হয়, তা'হলে এখন আপনার প্রেমময়ী হয়ত পুকুর হ'তে কলসী কাঁকে করে' জল আনছে, না হয় দিদিমার কাছে শুয়ে পরীর গল্প শুনছে, না হয় মায়ের কাছে রান্নাঘরে ব'সে তরকারী কুটছে, কিম্বা ভাইবোনের সঙ্গে মারামারি করছে, আর যদিই পড়তে হয় ত, হয়, ঠাকুরমার ঝুলি' না হয় রামায়ণ—"

হিরণ বলিয়া উঠিল "আপনি আচ্ছা লোক দেখছি ত মশাই, আমার এমন কবিতাটায় বাধা দিয়ে দিলেন—বলেছি ত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আমি বিয়ে করবোই না!"

(২)

হোটেলের পাশেই মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসার ডাঃ বোসের বাড়ী। বোস্ মহাশয়ের একটী বিবাহ যোগ্যা কন্যা ছিল। কন্যাটী সুন্দরী নয় বলিয়া তিনি স্থির করিয়াছিলেন গানের টোপ্ দিয়া জামাই ধরিবেন, এইজন্য তিনি কন্যাটীর গানে উৎসাহ দিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তার গলায় মিষ্টতার একান্ত অভাব ছিল। হোটেলের ছেলেরা তার গানের জ্বালায় একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, কারণ একে ত তার কণ্ঠে বামাকণ্ঠসুলভ মিষ্টতার একান্ত অভাব, তার উপর রোজই এক গান,—"এ পৃথিবীতে কেউ ভাল ত বাসে না, এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না।"

একদিন হিরণ খাইবার সময় বলিল, "ওহে তোমরা ত তবু ভাল আছ, আমার ঘরের আবার নিতান্ত কাছে রোজই ঐ চীৎকার 'ভালবাসে না' – কি কল্লি বলত? পড়তে শুনতে আর দিলে না দেখ্‌ছি! ঐ গানের একটা কেউ জবাব লিখে দিতে পার 'ভালবাসবো, বাসবো, বাসবো' ব'লে—তা'হলে যদি অন্ততঃ গানটা বদলায়।"

যাহা হউক, তাহা আর করার দরকার হইল না, কারণ কয়েকদিন পরে ঐ বাড়ী হইতে অন্য একটী কণ্ঠের প্রকৃতই গানের মত গান শুনা যাইতে লাগিল। একটী সুন্দরী নূতন গায়িকা আসিয়া ঐ বাড়ীতে জুটিল;—হিরণের এখন বিরক্ত হওয়া দূরের কথা, সন্ধ্যা হইতেই নোটের খাতা সামনে খুলিয়া সে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া থাকিত। তাহার গানেই ও সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তার উপর একদিন মাঝি সে ঐ

নবাগতাকে আলুলায়িতকেশা সজ্জাতাভাবে দেখিয়া ফেলিয়াছিল! সে যখন গাহিত, "যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহেগো কভু, দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর কাছে,ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু—"তখন সত্য সত্যই হিরণের মনে হইত—Oh! Had I the wings of a dove! অথবা যদি জানালার গরাদে ভাঙিয়া ঐ গায়িকার ঘরে প্রবেশের উপায় থাকিত! হিরণ 'লাভে' পড়িল, তাহাতে লাভ হইল এই যে, তাহার পড়াশুনা মাথায় উঠিল। সকালে সন্ধ্যায় বাতায়নপথে চাহিয়া থাকাই তাহার কাজ দাঁড়াইল। হোষ্টেলের নিয়ম ছিল শুধু বিকেলবেলায় পাঁচটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হারমোনিয়ম বাজান বা গান গাওয়া চলিবে। হিরণ তাহার সুমধুর কণ্ঠের গান শুনাইয়া ঐ নবাগতাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিবার এমন সুযোগ হেলায় হারাইত না;—সে প্রতিদিনই গান ধরিত, অধিকাংশ দিনই এক গান—"আমি চিনি গো চিনিগো চিনিগো তোমারে, ওগো বিদেশিনী!"

হিরণের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল; পরীক্ষা সন্নিকট, কিন্তু তাহার পড়াশুনা কোথায়! আহারে রুচি কমিল, শরীর কৃশ হইতে লাগিল, থিয়েটার যাওয়া বন্ধ হইল, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াও কমিয়া গেল। হিরণের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু যোগেন, উভয়ের একগ্রামেই বাড়ী। একদিন সে যোগেনকে বলিয়া ফেলিল, "ভাই, তোমাকে সত্যি ক'রে বলছি, যদি বিয়েই করতে হয়, তবে এই মেয়েটাকেই আমি বিয়ে করবো, নইলে আমি বিয়ে করবো না—যার সঙ্গে আজীবন কাটাতে হবে, তার সঙ্গে যদি মনের মিলই না হ'ল তা'হলে জীবনে শান্তি পাওয়া অসম্ভব।" যোগেন বলিল, "তা'ত বুঝলাম, কিন্তু তোমার বাবা ত কত জায়গায় পাত্রী দেখছেন, যদি কোথাও কথা দিয়েই ফেলেন! আর তিনি যে-রকম রাশভারী লোক, তাঁর কাছে গিয়ে আমরা ত এ-কথা বলতে পারবো না যে, আপনার ছেলে কলকাতায় মেসের পাশে মেয়ে দেখে 'লভে' পড়েছে, তাকেই সে বিয়ে করবে, নইলে বিয়ে করবেই না—!"

কথাবার্ত্তা এইরূপই রহিল। যথাসময়ে হিরণ বি-এ পরীক্ষা দিল; তৎপরে হোষ্টেল বন্ধ হইল, এবং 'ঘরের ছেলে' সকলেই ঘরে ফিরিয়া গেল। যাবার সময় হিরণের বন্ধুরা বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল, "হিরণবাবু দেখবেন, নেমন্তন্নের 'লিষ্টে' যেন বাদ না পড়ি!"

(৩)

হিরণের বন্ধুরা বাড়ী পৌঁছিবার অল্পদিন পরেই একখানি করিয়া "শুভ বিবাহ" মার্কা গোলাপী খাম পাইল। তাহার মধ্যে দুইখানি নিমন্ত্রণ পত্র, একখানি হিরণের নিজ নামাঙ্কিত, আর একখানি তাহার পিতার নামাঙ্কিত। হিরণের বিবাহ হইবে গিরিডিতে। বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহে যাইবেন, তাঁহারা হিরণদের শ্রীরামপুরের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হিরণের এ বিবাহে খুব আহ্লাদ ছিল না; তাহার গ্রামবাসী বন্ধু যোগেনই জোর করিয়া নিমন্ত্রণপত্র ছাপাইয়াছে এবং সকলের নিকট পাঠাইয়াছে। তাহার উপরেই সকলের আপ্যায়নের ভার পড়িল, হিরণের বাবারও স্নেহপূর্ণ মধুর ব্যবহারে সকলে সন্তুষ্ট হইল। হিরণের বিমর্ষভাব দেখিয়া কেহ কেহ বলিল "দেখ, তোমার এ-রকম করাটা অন্যায়—তোমার মা নাই, তোমার বাবা তোমাকে এত ভালবাসেন, তিনি কি তোমার শত্রু যে একটা কুৎসিত মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দেবেন? তাঁরও ত পুত্রবধূ! হয়ত কলকাতার যে গানময়ীকে দেখে তুমি 'লাভে' পড়েছিলে, এটি তার চেয়েও সুন্দরী হ'তে পারে!"

হিরণ সখেদে উত্তর করিল, "আমি শুধু দেহের সৌন্দর্য্য চাই না, আমি চাই মনের সৌন্দর্য্য, যা' গানের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরোয়······যাক্, সেকথা ভেবেই বা আর এখন কি হবে!" বন্ধু বলিল—"এ ত তোমার অন্যায় ভাবনা—যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সে-ই যে গান গাইতে জানে না, তা-ই বা তোমাকে কে বললে? আর না-ই যদি জানে, শিখিয়ে নিলেও ত পারবে!"

* * * *

যথাসময়ে বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য বরযাত্রীসহ হিরণ গিরিডিতে পৌঁছিল।

শুভদৃষ্টির সময় দৃষ্টি বিনিময় করিতে গিয়া হিরণ চমকিয়া উঠিল। সে মনে করিল—সেকি স্বপ্ন দেখিতেছে! এযে সেই—ডাক্তার বোসের বাড়ী যাহাকে দেখিয়াছিল,

যাহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, এযে সেই। তাহার মন আহ্লাদ ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইল এবং ব্যাপারটা কি জানিবার জন্ত তাহার মন ছট্ফট্ করিতে লাগিল। কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করে! এখন শুধু দৃষ্টি বিনিময় হইল, যতক্ষণ না বাক্য বিনিময় হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার উদ্বেগ দূর হইবার যে কোন উপায় নাই! হিরণ যখন ছাঁদনাতলায় বসিল, যখন তাহার হাতের উপর কনের হাতটা চাপান হইল, তখন সে ভদ্রলোকের সামনেও যতদূর সম্ভব মাথাটা নীচু রাখিয়া এবং চোখটা তুলিয়া তাহার প্রিয়াকে দেখিতে লাগিল।

বন্ধুবান্ধবেরাও ক'নে দেখিয়া অবাক হইল, সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল "এযে সেই হে—ডাক্তার বোসের বাড়ীর সেই আলুলায়িত-কেশা গানময়ী। ব্যাপার কি? ওঃ! হিরণ যদি আগে এটা জানতে পারতো, তা'হলে বেচারা এতটা শুকিয়ে যেত না!"

পরদিন প্রাতে শোনা গেল, হিরণ বাসরে খুব খোস-মেজাজে ছিল এবং খুব গানও গাহিয়াছিল, তার মধ্যে "চিনি গো চিনি, চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী" গানটা ভাল করিয়াই গাহিয়াছিল।

হিরণ যখন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করিতে গেল, তখন সকলেই বলিল "কেমন হয়েছে ত, তোমার বাবা কি ক'রে তোমার মনের কথা বুঝলেন বল দেখি!" একজন বন্ধু বলিল, "দেখলে ত ভায়া, নিজে দেখে বিয়ে না করলেও মনের মতন স্ত্রী হয়—আমাদের বাবা বা অভিভাবকেরা আমাদের শত্রু নয় এবং তাঁরাও ক'নে দেখতে জানেন। এই দেখনা, তুমি যে এই মেয়েকে দেখেছিলে তা'ত তিনি জানতেন না, অথচ ঠিক তোমার পছন্দ মত তোমার বৌ হয়েছে কি-না বল?" হিরণ কি উত্তর দিবে! তাহার হাসি আর ধরে না!

* * * *

ফুলশয্যার রাত্রি ভিন্ন হিরণ ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সেই রাত্রিতে সে তাহার নবপরিণীতা শ্রীমতী ললিতা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছিল, তাহা এই—ললিতার পিতা গিরিডিতে অভ্রের ব্যবসা করেন, তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে হিরণের পিতার খুব বন্ধুত্ব—তিনিই হিরণের পিতার কাছে বন্ধু কন্তার সুখ্যাতি করিয়া বিবাহের কথা তোলেন, পরে হিরণের পিতা নিজে আসিয়া ললিতাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির করেন। কলিকাতার ডাক্তার বোস্ ললিতার মামা, ললিতা যখন মামার বাড়ীতে মাস দুই ছিল, সেই সময়েই সেই বাড়ীতে হিরণ ললিতার গান শুনিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিয়াছিল ও বলা বাহুল্য, 'লাভে' পড়িয়াছিল।

বিবাহের কিছুদিন পরে হিরণ 'যোড়ে' গিরিডি গেল। শালিকা-পরিবৃত হইয়া গান ও তাসে তাহার দিনগুলি কোন্ দিক দিয়া যে চলিয়া যাইতে লাগিল, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না—সে যেন এক স্বপ্নরাজ্যে! এই আনন্দের মধ্যে হঠাৎ একদিন নিরানন্দ আসিয়া দেখা দিল। সে দিনের গেজেটে বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে হিরণের নাম নাই। হিরণের শ্বশুর অবশ্য একটু বিমর্ষ হইলেন, কিন্তু তাহার শাশুড়ী স্বামীকে বলিলেন "বেঁচে থাক্, আসছে বারে পাশ করবে—বি-এ পাশ ত সোজা নয়, আমার মেজ ভাই—তিন বারের পর পাশ করেছে, তুমি নিজেও ত একবার ফেল করেছিলে, মনে নেই!" হিরণের মনে যে ইহাতে দুঃখ হয় নাই, তাহা বলা যায় না, তবে সে দুঃখকে আমল দিল না।

রাত্রিতে ললিতা হিরণকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফেল করলে কি ক'রে?" হিরণ বলিল, "শুধু গানে, প্রিয়ে গানে! তোমার সেই গান শুনে আমি যে 'লাভে' পড়লাম, পড়াশুনা কোথায় গেল! সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, তোমার মামার বাড়ীর জানালার দিকেই কেবল চেয়ে থাকতাম। তারপর, এখন তোমাকে 'লাভ' করেছি, ফেল্ ক'রে না হয় একটু 'লোকসানই' দিলাম; এ লোকসান আসছে বারে পুষিয়ে নেবো,...তুমি শুধু একবার সেই গানটি গাও "যদি গো আমার হৃদয় দুয়ার"...বলিয়াই হিরণ সুর ধরে আর কি! এমন সময় ললিতা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "আঃ, একটু আস্তে কথা কও না, দিদি বৌদিদিরা যে সব আড়ি পেতে আছে!"

দুর্জ্জয়নাথের দুর্গোৎসব

বা

স্বদেশী পাঁঠাবলি

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত]

উ হু—হু—হু বড়বৌ—হো—ও—বড়বৌ! হু——হু হু—হু—কোথা গেলে! হো—হো—হো—হো—হু—হু—হু—হু—হি—হি হি—হি—কোথা গেলে বড়বৌ!

"কিগো? এই যে ঘরে রইছি? কি বল না? আরও একখানা লেপ্ চাপা দোবো?"

হুঁঃ—আর কত লেপ্ চাপাবে বড়বৌ! থাক্ প্রথম ধরবার মুখে এইরকম হাড়ভাঙ্গা শীত্ হবেই! হু—হু—হু—হু! থাক্! দু'এক ঘণ্টা বাদে কাঁপুনিটা কম পড়বে এখন!

"ম্যালেরিয়া তো আশ্বিনের শেষে ধরে, এবার এমন গোড়াতেই ধরলো কেন গা?"

সে তোমার ম্যালোয়ারিই জানে! হু—হু—হু! এত সাবধানে থাকি আমি—হু—হু হু—হু—গাঁয়ের জমীদার আমি—ইহি—হি—হি—ক'ল্কাতা থেকে কলের জল আনিয়ে খাই আমি—হু—হু—হু—বড়বৌ—এত ফিট্‌ফাট্ পরিষ্কার ঝরিষ্কার আমি,—হু—হু—হু—হু—শালার ম্যালেরিয়া আমায় ছাড়লে না—আ—হা—হা—হা—হা! যাক্ চুলোয় যাক্! রঘুনাথ এল?

"ঠাকুরপো অনেকক্ষণ এসেছে! কেন গা—? ডাক্তারকে আবার ডাকতে ব'লব?"

চুলোয় যাক্ ডাক্তার! রঘুনাথকে ডাকো! কি হ'ল কি—একবার খবরও দিলে না! কি রকমটা কি সব! কে—ও! হু—হু—হু—হু!

"দাদা—আমি!"

তোমার ত আচ্ছা আক্কেল হে ভায়া! উহু—হু—হু! একবার খবরটাও কি আমায় দিতে নেই! হ্যা—হ্যা—হ্যাঁ—হ্যা—উঃ—হুঃ!

"আপনার বড্ড জ্বর দেখে আর কোনও খবর দিতে সাহস কল্লুম না। বেন্দা-কুমোর ঠাকুর গড়েনি আপনার!"

আরে ওতো জানি—শালা যে স্বরাজের দলে নাম লিখিয়েছে;—তার ওপর—হু—হু—হু—হু—আমি কৌন্সিলে স্বরাজের পক্ষে (মিনিষ্টার স্যালারির ব্যাপারে) ভোট না দিয়ে গবরমেণ্টের দলে ছিলুম বলে—(উ—হু—হু—হু—বড়বৌ—আর একটা লেপ টেপ্ থাকে তো চাপাও)! বুঝেছ রঘুনাথ—বেন্দা-শালা আমাকে শাসিয়েছিল—এবার পুজোর ঠাকুর গড়বে না!

"পাশের গ্রাম বাসদেবপুরের কুমোর উমেশ পাল ব্যাটা প্রথমে রাজি হয়েছিল! বিকেলবেলা ঠাকুর আনতে গিয়ে দেখি—ব্যাটাও মত বদ্‌লেছে!"

এখন উপায়? পৈতৃক পুজোটা বন্ধ হবে? হু—হু হু—হু—দুশো বছরের পুজো!

"নায়েব মশাইকে ক'লকাতায় কুমুরটুলিতে পাঠিয়েছি—এলো ব'লে! আপনি কোনও চিন্তা করবেন না!"

নায়েবকে পাঠিয়েছ? কলকাতায় পাঠিয়েছ? হে—হে—হে—হে—হাঃ—হাঃ—বেশ করেছ ভায়া! তবে আর ভাবনা কি? ঐঃ—ঐঃ—শোনো দিকি—শোনো দিকি—ঐঃ নায়েব ফিরেছে বুঝি!

"আজ্ঞে হ্যাঁ—তাঁরই গলা পাচ্ছি!"

যাও—যাও—হু—হু—হু—হু—রঘুনাথ যাও ভাই ঠাকুর তোলো—! বড়বৌ—যাও শাঁখটাঁক্ বাজাবার বন্দোবস্ত করগে—হে—হে—হে—হে!

"কি খবর গো নায়েব মশাই? ঠাকুর আন নি?"

"আনবো না কেন ছোটবাবু? মহেশতলায় বাজারের

কাছে সন্ধ্যের ঝোঁকে বদমায়েস্ ছোঁড়ারা ইট্ মেরে ঠাকুর গুঁড়ো করে দিয়েছে।"

"কি সর্ব্বনাশ! অ ঠাকুরপো! একি অলক্ষণ! ওগো শুনছ? ব্যাপার কি শুনছ?"

"থাক্ থাক্ বড়বৌ! দাদা বোধ হয় ঘুমিয়েছেন! জাগিয়ে কাজ নেই! নায়েব মশাই! একথা আর বাড়ীতে আপনি কারুর কাছে এখন প্রকাশ করবেন না! চলুন বাইরে যাই!"

"ওমা—কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো! গাঁয়ের ছোঁড়ারা হ'ল কি? ঠাকুর দেব্তা মানে না? যাই একবার মেজ পিসীর কাছে! ওগো ঘুমুলে নাকি?"

উঃ—উঃ—বড়বৌ! হু হু—হু—হু! চলে গেছ! যাও! বাঁচা গেল! আঃ—বড় চেঁচায় মাগী! ইহি—হি-হি! গেঁয়ো ব্যাটাদের এত বড় আস্পর্দ্ধা! জমীদার মানে না? সব ব্যাটাকে জব্দ করব! গবরমেণ্ট আমার দিকে, আমি কোনো শালাকে ভয় করি? সবাইকে মজা দেখাচ্ছি! তোর স্বরাজ দলের নিকুচি করেছে! হে—হে—হে—হে! হু—হু—হু—হু। কেয়া? কে? বেনদা? শালা কুমোর? আমার জমিতে বাস করে আমার সঙ্গে বাদ? কালই চাল্ কেটে তুলে দিচ্ছি—দাঁড়া ব্যাটা। কি? তোর দোষ নেই? স্বরাজ বাবুরা শাসিয়েছে? আচ্ছা—দেখা যাবে—কাল কোথায় মাথা গুঁজে থাক? একি? তোমরা—তোমরা আমার বাড়ীতে কেন? মজা দেখ্তে এসেছ? কি? তোমাদের দলে নাম না লেখালে পৈতৃক পূজো বন্ধ করাবে? বল কি? এই—এই—আমি উঠ্লুম। দূর তোর ম্যালেরিয়া! জমীদারের শরীরে ম্যালেরিয়া কি? এই ম্লেচ্ছ ব্যাটারা। এই আমি নিজে মাকে আন্তে চল্লুম। পৈতৃক পূজো বন্ধ হবে? আমি বেঁচে থাকতে? আমি দুর্জ্জয়নাথ মুখুয্যে। আমার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়—।

ভক্তি আছে যার—প্রাণটা কি তার? আমি মাকে আনবই। যেমন করে পারি—মাকে এনে পূজো করবই। এই চল্লুম! মাটিতে গড়া প্রতিমা নয়,—যখন বেরিয়েছি—কৈলাস থেকে সশরীরে মা'কে আনব। নিশ্চয়ই আনব! ভক্তি থাকলে লোকে মুক্তি পায়;—আমি মাকে পাবনা? এই চল্লুম।

বাঃ—মায়ের কি দয়া গো! মাটীতে হাঁট্তে হ'ল না। বেড়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছি! বোঁ-বোঁ শব্দে চলেছি। জয় মা দুর্গে—দুর্গতিনাশিনী! জয় মা সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে! বা—বা! কি চমৎকার হাওয়াতে ভর করে ফর্ ফর্ করে চলেছি! মিনিটে-মিনিটে—কত দেশ—কত মাঠ—কত ক্ষেত—কত নদী- কত পাহাড় পর্ব্বত পার হয়ে চলিছি। মার দয়া থাকলে কি না হয়। প্রাণে ভক্তি থাকলে দুনিয়ায় অসাধ্যসাধন হয়।

জয় দুর্গা! জয় কালী! জয় তারা! জয় অন্নপূর্ণা! জয় জগদ্ধাত্রী! জয় মা মঙ্গলচণ্ডী! মা—মা—মাগো এসেছি মা! তোমার দ্বারে অধম সন্তান আমি এসেছি মা! দেখা দাও! দয়া করে, তোমার মহাভক্ত কাঙালকে কৃপা করে দেখা দাও।

উঃ—কি শীত! ই—হি—হি—হি—হি—হিমালয় পর্ব্বত কিনা? বেজায় শীত। কন্কনে শীত হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। হু—হু—হু—হু—হু! হি—হি—হি হি—হি!

"গাঁজা খাও।"

এঁ্যা—কে? নন্দীদাদা? এস এস নমস্কার। খবর ভাল? চল দাদা-ভেতরে যাই! শীতে প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

"পাস্পোর্ট (Passport) আছে?"

এঁ্যা—সেকি? মার কাছে যাব,—মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনীর কাছে যাব—এখানে পাস্পোর্ট কি আবার? মার সঙ্গে ছেলে কি পাস্পোর্ট নিয়ে দেখা করে? এমন কথাওতো কোথাও শুনি নি!

"তা কি আবার? ব্রিটিসরাজের যা নিয়ম তা তুমি মেনে চ'লবে না? আর আমাদের এখানে যিনি রেসিডেণ্ট্ (Resident) আছেন তিনি আপত্তি করতে পারেন। আর বুঝ্তেই তো পাচ্ছ—আমরা ব্রিটিসরাজের মিত্র ভিন্ন শত্রু নই! তোমার জন্যে কি একটা মনোমালিন্য ঘটাব?"

এখন উপায়?

"নিরুপায়ের যা উপায় তাই। কিঞ্চিৎ কাঞ্চন মুদ্রা। যাকে ছোটলোকেরা তোমাদের দেশে "ঘুষ" বলে "

ও দাদা নগদ তো সঙ্গে করে তেমন কিছু আনি নি।

"চেক্ বই কাছে আছে?"

তা আছে। বেঙ্গল ন্যাশান্যাল্ ব্যাঙ্কের চেক্ বইখানা পকেটে আছে।

"ফাউন্টেন্ পেন (Fountain pen)?"

আছে দাদা।

"লেখো। বেয়ারার (Bearer) চেক্ দিও। ক্রশ্ বা অর্ডারি দিওনা যেন।"

নাও। পাঁচহাজার টাকা দিলুম। হবেনা?

"সকলের কি ওতে কুলোয়?"

কাজ হাসিল হ'লে খুসী করে যাব দাদা।

"এস। সদর বাড়ীতে নিয়ে যাই। মা এখন রান্নাঘরে। ছেলেপুলেদের খাওয়াচ্ছেন।"

বাঃ দিব্যি বৈঠকখানাটী তো? কার্ত্তিক দাদা বসেন বুঝি? কই? নন্দীদাদা কোথায় গেলে? ও বাবা—একি মূর্ত্তি রে? কে কে—কে বাবা তুমি?

"হ্যা—হ্যা—হ্যা—আমায় চেনো না? আমি যে ভিরিঙ্গি মশাই।"

বটে? আপনি? নমস্কার! ভাল আছেন? হাতে একতাড়া কাগজপত্র কি? হিমালয় এষ্টেটের?

"না। হিমালয় কাউন্সেলের বজেটের খসড়া! আমি হচ্ছি কাউন্সেলের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্।"

প্রেসিডেণ্ট্ কিনি?

"নন্দিদাদা।"

বটে—বটে। আমিও বাঙ্গালা কাউন্সেলের একজন মাল্দী।

"তোমাদের তো এখন ছুটী। আর বোধহয় কাউন্সেল বসছে না—কি বল?"

দরকার হলেই ব'সবে।

"বসা মানে কেলেঙ্কারী বাড়ানো—এইতো! আচ্ছা জব্দ করেছে স্বরাজ দল? কি বলছ?"

জব্দ আর ছাই করেছে! গবরমেণ্টের সঙ্গে পেরে উঠবে? ক'দিন?

"তা বটে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ তো বড় সোজা নয়! য়াল্লা করে তাদের বুকের পাটা খুব ব'লতে হবে! ঐ রে বাবা এঘরে আস্ছেন! চুপ-চুপ!"

বাবা আস্ছেন্—ভালই হয়েছে! আরে বাপ্ রে! ভয়ানক উগ্রমূর্ত্তি! ভীষণ চটেছেন! কি ব্যাপার! "তো ব্যাটাদের জ্বালায় আমায় দেশত্যাগী হ'তে হবে দেখ্ছি! কাল বিশবার করে বল্লুম—ওরে আমার আফিং ফুরিয়েছে! তা তো ব্যাটাদের আমার কথা আর গ্রাহ্যই হয় না! সব দূর করে দোবো! চাইনা—আমার লোকজন চাই না!

নন্দী। "আমি ভিরিঙ্গিকে আস্তে বলিছিলুম—"

ভৃ। "বাঃ! কখন্ বলেছিলে?"

বাবা। "এখন উপায় কি? তারকেশ্বর যেতে হবে। সেখানে এই ডামাডোলার বাজারে—কে আমার আফিং এনে দেয় বল্ দিনি?" ব্যোম বিশ্বনাথ! ট্যাঁকে আমার আফিংএর কৌটোটা আছে রে! তাড়াতাড়ি বাবার সামনে ধরি!

গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তৃত্বং গৃহনস্মাৎকৃতংজপং
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর!

অধমের আফিংটুকু গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন। "বেঁচে থাক বাবা! বড় প্রাণ রক্ষা করেছ! কে তুমি! এ পাড়ার লোক? না:—নতুন ভাড়াটে বুঝি?"

আজ্ঞে না দয়াময়! আমি দুর্জ্জয়নাথ মুখুর্য্যে। ডুগ্ গোপুরের জমীদার।

"কত আয়?"

আজ্ঞে - সে খবরে আপনার কি?

"আয়ের ওজন বুঝে খাতিরের বন্দোবস্ত হবে।"

তা—আপনার আশীর্ব্বাদে খরচ-খরচা বাদ—প্রায় হাজার পঞ্চাশ হবে।

"ওরে নন্দী—ওরে ভৃঙ্গি—বাবুকে একটু দেখিস্—শুনিস্? ভাল করে তামাক-টামাক দিস্। তাহ'লে—তুমি বোসো বাবা—আমি চল্লুম। গিন্নীর সঙ্গে দেখা কর্ব্বে বুঝি?"

আপনি কি তারকেশ্বরে চল্লেন্?

"যেতে হবে বইকি বাবা! নইলে এ সব হ্যাঙ্গামা পোহাবে কে? ঐ জন্যেই তো গাঁজা ছেড়ে আফিং

ধরেছি। গাঁজা খেয়ে ভোম্ হয়ে এতকাল পড়েছিলুম—কিছুই দেখ্‌তুম না—শুন্‌তুম না! বুদ্ধিশুদ্ধি একরকম লোপই পেয়েছিল ব'ল্‌তে হবে। সেই সুযোগে মোহান্ত প্রভুরা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে যা খুসী তাই করে নিয়েছে। দেখি যদি এবার কিছু ফিরে কর্ত্তে পারি! দেখ দিকি অবিচারটা! যার ধন তার ধন নয়—নেপোয় মারে দই! আমার বিষয়—আমার টাকাকড়ী—আমার জমীদারীর আয়,—আমারই সর্ব্বস্ব,—অথচ আমার ভোগে কিছুই আসে না,—আমার ছেলেপুলেরা,—আমার ভক্তরা,—আমার মেয়েরা আমারই চখের সাম্‌নে কষ্ট পায়—কি বল বাপু? এ সব অন্যায় নয়!"

আজ্ঞে—মাপ কর্ব্বেন—! যে কাজে স্বরাজদল আছে—সে কাজে আমার কোনও সহানুভূতি নেই!

হঠাৎ মন্দির প্রতিধ্বনিত করে বামাকণ্ঠে কে বলে উঠ্‌ল "কি বল্লি—নরাধম—পাপিষ্ঠ—নারকী—সয়তান, তোর স্বরাজ দলের ওপোর সহানুভূতি নেই? এত বড় কথা আমার গো-বেচারা স্বামীর মুখের ওপোর তুই ব'ল্‌তে সাহস্ করিস্"

এঁ্যা—মা? মা? মা দুর্গা? ওমা তুমি মা? এই যে মা! আহা-হা-মাগো-ধন্য আমি—ধন্য আমি! মা-মা—

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনে!
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবী দুর্গে দেবী নমোঽস্তুতে॥
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥

"রেখে দাও তোমার তোতা পাখীর মুখস্থ বুলি। ওতে আর আমি ভুলিনা। মান্ধাতার আমল থেকে শুনে আস্‌চি। অন্ন নেই—ভক্তি নেই—আন্তরিকতা নেই,—বাক্‌শুদ্ধি পর্য্যন্ত নেই। আমার সঙ্গে মস্করা করা বটে?

মা—মা! দোহাই মা—রাগ কোরোনা মা—অনেক আশায় তোমার দরজায় এসে পড়েছি! তোমায় আমার বাড়ী নিয়ে যাব! দোহাই মা—চল! তুমি যা কর্ত্তে বল্‌বে—তাই কর্ব্ব!

"কেন? আমায় নিতে এয়েছ কেন? আমায় একটা সংএর মতন দালানের ওপোর খাড়া করে—নিজেদের বড়মানুষি জাহির কর;—নাম বাজাবার ফিকির ওটা—তা কি বুঝিনা? ত্রেতায় রামচন্দ্র পূজো করেছিল ভক্তিভরে আমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিল রাক্ষসবধে শক্তিসঞ্চয়ের জন্য! তোরা কি শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আমায় পূজা কর্ত্তে চাস্ রে নরাধম? তোদের শক্তিসঞ্চয় কেবল স্বদেশীদের উৎপীড়ন কর্ব্বার জন্য! তোরা শক্তিপ্রয়োগ করিস্ কেবল অবলা রমণীদের ওপোর, জমিদারীর দুর্ব্বল নিরীহ কৃষকপ্রজাদের ওপোর,—বিপন্ন ঋণগ্রস্থ অধমর্ণদের ওপোর,—দুঃখিনী পতিগতপ্রাণা পত্নীদের ওপোর—! আমি সে পূজো কি নিই রে হতভাগ্য? তোরা কেরানীগিরি করিস্,—তোরা বিজাতিদের অর্থ দিয়ে তাদের ব্যবসার উন্নতি করিয়ে দিস্,—তোরা দেশের লোককে খেতে না দিয়ে বিদেশী বণিকদের আহার্য্য বিক্রয় করিস্,—তাদের জমী বিক্রয় করে পাটের কল (extensionএ) বাড়াতে সহায়তা করিস্,—স্বদেশীরা ব্যবসা কর্ত্তে গেলে—বাধা দিস্,—তোদের মুখ চাইব আমি? তোদের প্রতি বাৎসল্য দেখাব আমি? তোরা জাত ভাইকে দেখিস্ না,—স্বদেশ বুঝিস্ না,—আমার মহাত্মা ছেলে গান্ধীর উপদেশ গ্রাহ্য করিস্ না,—দেশবন্ধুর কথা উপেক্ষা করিস্,—প্রফুল্ল রায় আচার্য্যকে পাগল বলে উপহাস করিস্,—খদ্দর কাপড় ঘৃণা করিস্,—বিলাতি দ্রব্য ভিন্ন ব্যবহার করিস্ না,—হিন্দুনারীকে স্বেচ্ছাচারিণী কর্ত্তে চাস্,—অখাদ্য খেতে দ্বিধা বোধ করিস্ না,—তোরা আমায় নিয়ে গিয়ে দশের কাছে—দেশের কাছে মাটীর পুতুল ব'লে হাস্যাস্পদ করাতে চাস্,—আমি আর তোদের দেশে যাব? তোদের দেশে নারীনিগ্রহ হয়—তোরা চক্ষু বুঁজে থাকিস্,—দেশের লোক অনাহারে মরে,—ইচ্ছা কল্লেই তার প্রতীকার নিশ্চয়ই কর্ত্তে পারিস্,—তবু করিস্ না,—সেই তোদের মাঝখানে আমি গিয়ে লোক দেখানো পূজো নোবো,—এই তোদের উদ্দেশ্য? মূর্খ! যা—চলে যা—দূর হ—আর কখনো আমায় তোদের দেশে যেতে বলিস্ নে! আমি তোদের বহুদিন হ'ল ত্যাগ করিছি! তোদের মুখ দর্শন কর্ব্ব না!"

দোহাই মা—দোহাই মা—যেওনা—যেওনা দাঁড়াও—

দাঁড়াও। আমার একটা কথা শুনে যাও! হায়—হায়—কি হ'ল গো—কি সর্ব্বনাশ হ'ল! মা যে বড়ই বিরূপা হ'লেন? হায়—হায়,—বাবাও তো নেই দেখ্‌ছি! অ দাদা নন্দী! অ ভাই ভিঙ্গি! কোথায় গেলে? আমাকে এ অবস্থায় রেখে সত্যিই তোমরা পালালে? ও মা,—মা! একবার শোনো! একটী কথা শোনো! মা গো! অনেক দূর থেকে,—অনেক আশায় এসেছি—মা—একটীবার দেখা দাও—তারপর—! ওরে বাবা! এ কে রে? ভীষণ চেহারা? এই সারলে বাবা? বেঘোরে প্রাণটা গেল! আপনি—আপনি—তা-তা—আপনাকে তো চিন্‌তে—

"আমি মাদুর্গার চোরা? তুমি চোরার দেশের লোক হয়ে—চোরাকে চিন্‌তে পাল্লেনা হে? আশ্চর্য্য বটে!" হেঁ-হেঁ—হেঁ—আপনি আমাদের জাতভাই—চোরা মশাই? হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ—চিন্‌তে পারিনি চিন্‌তে পারিনি। তা আপনি যখন আছেন তখন আর ভাবনা কি?

"ভাবনা কিছুই নেই। তোমার ব্যক্তব্য যা-তা আমি জানি। আমাকে খুসী কল্লেই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হবে—তা বোধ হয় তুমি জান।"

তা জানি বইকি দাদা—তা জানি বই কি। তা বেশ—তোমার পাওনাগণ্ডা তো আগেই। চল ভাই—মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে চল,—আমি যথাসাধ্য তোমার পেট ভরাবার চেষ্টা কর্ব্ব।

"মাকে আমি নিয়ে যাবই—সে জন্ম তোমার চিন্তা নাই। বাংলাদেশে না গেলে—আমার চল্‌বে কিসে? অমন লুটের জায়গা বাইরের লোকের আর আছে? সেখানে যেতেই হবে। কিন্তু দেখ বাবা এবার মা যেতে পারেন,—যদি বলিদানের ব্যবস্থাটা মায়ের মনের মত হয়।"

যে আজ্ঞে দাদামণি—যে রকম বলিদান মা চাইবেন—সেই রকমই ব্যবস্থা হবে। পাঁটা,—ভ্যাড়া,—শশা,—কুমড়া,—আখ—মায় সুপুরী পর্য্যন্ত।

"ও সব বলিতে আর চলছে না। এবার বলির ব্যবস্থা আমরা কর্ব্ব—খাঁড়াও আমরা ধর্ব্ব। এ'তে রাজী আছ?"

নিশ্চয়—নিশ্চয়! সে তো সুখের কথা। কি কি বলি হবে, খরচাটা কি রকম পড়বে, জান্‌তে পারি কি?

"স্বদেশী পাঁটা বলি হবে। খরচা কেবল আমার "ফি" (Fee)টা। ব্যস্ তাহ'লেই যথেষ্ট। সে সব পৈতৃক কালের হাড় জির-জিরে পোণেমরা দেড় ছটাকী পাঁটা বলিতে মা আর তুষ্ট হচ্ছেন না, তা তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। ভাল, মনের মতন স্বদেশী বলি চাই—বুঝলে?"

যে আজ্ঞে। যে আজ্ঞে।

* * * *

ড্যাং—ড্যাড্যাং—ড্যাং ড্যাড্যাং—

ড্যাং—ড্যাড্যাং—ড্যাং ড্যাং অ্যা—ড্যাং।

সময় হ'য়ে এল। বলির সময় সন্নিকট—চোরা দাদা! খাঁড়া ধরে তো রইলে। বলির পাঁটা কই?

"ঐ যে (১, ২, ৩,) এক দুই তিন ইত্যাদি—ক্রমিক সংখ্যা (Serial number) দেওয়া টিকিট গলায় রয়েছে। যাও এক এক করে ধরে নিয়ে—মার সামনে হাড়কাঠে ফেল - আমি জয়-মা ব'ল কোপ করি।"

এ্যাঁ—সে কি? ওরা যে মানুষ?

"মানুষ কোথায়? ওরাই স্বদেশী পাঁটা। খবরদার, কথাটী না কয়ে এক এক করে নিয়ে এস। যাও মায়ের আজ্ঞা এখ্‌নি পালন কর নইলে—"

১ম বলি—ইনি কে?

"ইনি স্বদেশ দ্রোহী। কিসে স্বদেশীদের সর্ব্বনাশ হয়,—উন্নতির পথে বাধা পড়ে, এবং তাইতে গবরমেণ্টের কাছে খাতির বাড়ে, খেতাব পান, তাই উদ্দেশ্য। মারো কোপ—জয় মা।"

২য় বলি—ইনি কে?

এঁকে চেনো না? ইনি আগে ঘোর স্বদেশী ছিলেন,—খুব লেক্‌চার-টেকচার ঝেড়েছিলেন; এখন বুঝেছেন কলিতে গোরা পদই ভরসা! আবার গোরার বুটে লুটে পড়েছেন। মারো কোপ,—জয়-মা।"

৩য় বলি—ইনি কে?

"ইনি মহাপুরুষ। একেবারে পাহাড়ে রাম পাঁঠা। বাংলা দেশে একজন মস্ত বড় জমীদার। প্রজারা কাউকিলে

ইলেকশানে স্বরাজদলকে ভোট দিয়েছিল ব'লে,—লোক লাগিয়ে তাদের অনেকের ঘর জালিয়ে দিয়েছেন,—মেয়ে ছেলেদের বে-ইজ্জৎ করেছেন। মারো কোপ্—জয়-মা!"

৪র্থ বলি—ইনি কে?

"ইনি মস্ত পেটো মহাজন। দেশে ধানের চাষ উঠিয়ে দিয়ে কেবল পাট বুনাচ্ছেন—আর ইংরেজ খদ্দেরকে যোগাচ্ছেন। যে সব চাষারা পাট বুনে বুনে মর্ত্তে বসেছে—একবার তাদের দিকে ফিরেও দেখেন না। বরং তারা দাদন নেবার পর ম্যালেরিয়ায় অকর্ম্মণ্য হয়ে যদি কড়ার মত পাট বুন্‌তে না পারে—তাহ'লে তাদের যথাসর্ব্বস্ব বেচে দাদনের টাকা তো আদায় করে থানই, উপরন্তু চুক্তি ভঙ্গের (Breach of contract) এর জন্য মামলা করে গরীবদের জেলে দিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত নন্। মারো কোপ্—জয়-মা!"

৫ম বলি—ইনি কে?

"ইনি কল্‌কত্তার একজন বড় ব্যবসাদার। খদ্দর প্রচলন নিবারণ এঁর জীবনের মহাব্রত। কেবল বিলাতী বস্ত্র রাশি রাশি আম্‌দানি করছেন। শুধু কাপড়ের ব্যবসা নয়—এঁর মস্ত ঘিএর কারবার আছে। তাইতেই ইনি বড়লোক। একসের ঘিতে পাঁচসের চর্ব্বি মিশিয়ে দেশে অকাল মৃত্যুসংখ্যা বাড়াচ্ছেন। ঘুস্ দিয়ে সকলকে হাত করে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে কারবার চালাচ্ছেন। মারো কোপ্—জয়-মা।"

৬ষ্ঠ বলি—ইনি কে?

"ইনি ভয়ঙ্কর সুদখোর। কাপ্তেন ধরা—হ্যাণ্ডনোট কাটানো,—বড়ঘর—গেরোস্তঘর উৎসন্ন দেওয়া এঁর চলতি ব্যবসা মারো কোপ্—জয়-মা।"

৭ম বলি—ইনি কে?

"ইনি বংশের কুলাঙ্গার। মাগছেলে ভিক্ষে করে খায়—ইনি অবিদ্যে এবং তার ছেলে মেয়ে নিয়ে মহাব্যস্ত। মারো কোপ্—জয় মা।"

৮ম বলি—ইনি কে?

"ইনি মার্চ্চেন্ট অফিসের বড়বাবু! সাহেবের জুতো-লাথি খান—আর করজোড়ে কেবল বলেন—You my Father—mother! You give order,—I bring my mother-in-law! সজাগরি অফিসগুলো উচ্ছন্ন গেল,—কেরাণীদের দুর্দ্দশা বাড়লো—এই এঁদের মতন মূর্খ—অর্ব্বাচীনদের জন্য। মারো কোপ্—জয় মা।"

৯ম বলি—ইনি কে?

"ইনি একজন বাঙ্গালী যীশুখৃষ্ট। দেশের লোক দুঃখে অনাহারে মনোকষ্টে মচ্ছে—সেদিকে দৃক্‌পাত নেই। জেরুজালেম্ গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের প্রজাদের উদ্ধারে মহাব্যস্ত। প্রেম বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। মারো কোপ্—জয়-মা!"

১০ম বলি—ইনি কে?

"ইনি একজন মস্ত সাহিত্যিক। বলেন বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশ দত্ত, এরা লিখতেই জান্‌তো না। ইনি নূতন ধরণের সাহিত্য লিখে বাঙ্গালী সংসারের ছেলেমেয়েদের জন্য নূতন প্রেমের রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন! "প্রেম হলেই বেশ্যার মেয়েকে বিয়ে ক'রে নির্ব্বিবাদে ঘরে তোলা" বাঙ্গালী সমাজকে এই শিক্ষা দিতে আখাম্বা কলম ধরেছেন। মারো কোপ্—জয় মা।"

১১শ বলি—ইনি কে?

"ইনি রাঘব বোয়াল্ তেজস্কর সাহিত্যিক প্রবর। এঁর নায়িকা হল মাতৃস্বরূপিণী—নায়ক হল "পুত্রবৎ স্নেহপ্রতিম।" এঁর উদ্দেশ্য—মা বল—মাসী বল—খুড়ী বল—জ্যেঠাই বল—পিসী বল—ভগ্নী বল। প্রেম হ'লেই তাদের সঙ্গে জুটে যাবে—"মা মাসি জ্ঞান রাখ্‌বে না। চমৎকার; প্রেমের নূতন তথ্য আবিষ্কার। কলেজের তাবৎ প্রেমিক ছোক্‌রারা বুকে বজ্রের বল পেয়ে গেছে। বাঙ্গালী ভদ্রনারীদের মধ্যে সামাল্ সামাল্ রব উঠেছে। মারো কোপ্—জয়-মা।

১২শ বলি—ইনি কে?

"ইনি একজন নাট্যকার। বলেন' দীনবন্ধু, অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল—এরা নাটক লিখতেই জান্‌তো? কতকগুলো Trash রেখে গেছে। নাটক লিখি আমি আর ও পাড়ার বুড়ো পঞ্চানন্। নাটকের ভাব-ভাষা যদি বুঝ্‌তেই লোকে পার্ব্বে—তবে—সে আবার নাটক কি?" লাগাও কোপ্—জয় মা।

১৩শ বলি—ইনি কে?

"ইনি একজন প্রচণ্ড (Actor) অভিনেতা! ইনি

অভিনয় কল্লেই তামাম্ মেয়েছেলেদের ভেতর ইলেক্‌ট্রিসিটী (Electricity) পাস্ (Pass) কর্ত্তে থাকে। ইনি এমন্ অ্যাক্‌টো কর্ত্তে লেগেছেন—যে গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃত মিত্র, মহেন্দ্র বসু, অমর দত্ত—স্বর্গ থেকেও বাপ্ বাপ্ বলে পালাতে সুরু করেছেন। আর দানী কাণী সব ইঁদুরের গর্ত্তে ঢোকবার জোগাড় দেখছে। মারো কোপ্—জয় মা।"

১৪শ বলি—ইনি কে?

"ইনি থিয়েটারের মালিক। আহাম্মকের চূড়ামণি—অথচ মনে ভাবেন—নাট্যজগতের সমস্তই এঁর নখদর্পনে। গুণীর গুণ বুঝেও বোঝেন না,—কেবল চান্ খোসামোদ। মারো কোপ্—জয় মা।"

১৫শ বলি—ইনি কে?

"ইনি বরের বাপ্। ছেলের বিয়ে দিয়ে মেয়ের বাপকে পথে বসিয়েছেন। পূজোর তত্ত্ব কর্ত্তে পারেনি বলে—মেয়েরবাপের নামে মিথ্যে মকর্দ্দমা করে—তাকে জেলে দেবার সংকল্প করেছেন। মারো কোপ্—জয় মা।"

১৬শ বলি—ইনি কে?

"ইনি নব্য সম্পাদক। কাগজ চালাচ্ছেন কেবল যার ওপোর রাগ—তাকে গালাগালি দেবার জন্যে। এই স্বদেশীর যুগে, এই—একতার যুগে,—আপ্‌না—আপ্‌নির মধ্যে দলাদলি—ঝগ্‌ড়াবিবাদ বাঁধিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ কচ্ছেন। মারো কোপ্ জয় মা।"

না-না—দোহাই—দোহাই—একে মার্ব্বেন না—খাঁড়া এর ঘাড়ে ফেল্‌বেন্ না।

"আরে পাষণ্ড? বলিদানে বাধা?"

আজ্ঞে হ্যাঁ—একে মাল্লে,—এ আবার কাঁটামুণ্ডু জোড়া লাগিয়ে আপ্‌নাকে আমাকে এমনি গালাগাল্ ঝাড়তে সুরু কর্ব্বে যে মা দুর্গার হিমালয়ে বাস করা দুস্কর হয়ে উঠ্‌বে। আর আমার তো জমিদারী নিলামে চড়বে,এমনি এঁর কলমের জোর।

"আচ্ছা—একে রেহাই দিলুম। কিন্তু ১৭টা বলি চাই। ষোলোটী হয়েচে—জোড় রাখ্‌তে নেই—বিজোড় কর্ত্তে হবে। এখন বাকী তুই। চলে আয়—রে বেটা হাড়কাটে গলা। শো—"

এঁ্যা-এঁ্যা তা—তা—আমায় কেন। আমায় কেন। আমি পূজো কচ্ছি—আমি মাকে এনেছি—আমার পূজো খেয়ে-আমারই গলায় কোপ্?

"তোদের বাংলাদেশে—এই তো হ'ল মহাধর্ম্ম—কালের ধর্ম্ম—কলির ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম তোরাই শিখিয়েছিস্। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। চলে আয় ব্যাটা—কুলাঙ্গার। মাল্‌সী হয়েছ, প্রজাদের ভোট নিয়ে কাউন্সিলে ঢুকেছ,—স্বদেশের স্বরাজের উন্নতি কর্ব্ব বলে প্রতিজ্ঞা করে—কাউন্সিলে বসে স্বরাজের বিরুদ্ধে ভোট? শুয়ে পড়্ ব্যাটা শুয়ে পড়্।"

উঃ—গেলুম—গেলুম—রক্ষা কর মা—দুর্গে—দুর্গতিহরা—মা জগদম্বা—মা—সন্তানপালিকে—নিস্তারিণী—মা বরাভয়-করা,—মা অভয়া—রক্ষা কর মা—রক্ষা কর। অসুরের হাত থেকে আমায় রক্ষাকর। উঃ—ভীষণ খাঁড়া রক্তমাখা খাঁড়া—নবমী পূজোর দিন আমারই গলায় পোড়ছে মা। বাঁচাও—বাঁচাও—আর তোমায় কখনো আনব না মা তুমি ক্ষমা ঘেন্না করে—এখুনি সরে পড় মা। আর আমার পূজায় কাজ নেই।

"তথাস্তু। মাভৈ—মাভৈ। নিবৃত্ত হও অসুর বর। ওকে পরিত্যাগ কর। ও আমাকে বিদায় কর্ত্তে চাইছে? বাঙ্গালীরা আমায় চায় না,—এনেই বিদায় কর্ত্তে চায়। চারটি দিন ঘরে ঠাঁই দিতে কষ্ট হয়। চল—ছেলেমেয়েদের নিয়ে—আজই চলে যাই—আর ত্রিরাত্রি এ দেশে বাস করে কাজ নেই। চল—"

এঁ্যা সত্যিই—নবমীর দিন মাকে তাড়ালুম। মা চলে গেল। মা—মা—ঐ যে মা চলে গেল। ঐ যে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজ্‌ছে। মা মা—সত্যিই এ দেশে ত্রেরাত্র রইলি না? বাংলার অকল্যাণ সত্যিই তবে কর্ব্বি? ওঃ—কি হ'ল—কি হ'ল। এর মধ্যেই—তিনদিনের দিন বিসর্জ্জন? ওঃ—মা

"হ্যাঁ—গো—হ্যাঁ—এবার যে পাঁজিওলারা লিখেছে—তিনদিনের দিন বিজয়া দশমী। জরটা কমেছে? উঃ—কুল্ কুল্ করে ঘাম হ'চ্ছে। একটু উঠে বোসো। বছরকার দিন ভর সন্ধ্যেবেলা শুয়ে থেকোনা। একটু দুধ সাবু খাও।"

বড় বৌ-মা যে চলে গেল।

"মা আর এ বছর এ বাড়ীতে এলেন কই? ঘট পূজো করেই সেরেছি।"

এঁ্যা—মা আসেনি? হা—অদৃষ্ট?

(পতন ও মূর্চ্ছা; মূর্চ্ছা ভঙ্গে মুরগীর ঝোল ভক্ষণ)

বল্মীকি সংস্কার

["মডার্ণ" সীতার উদ্ভব-কাল]

বাল্মীকি—দোহাই বাবা! ঝকমারি করেছি তোমাদের কাছে এসে!—ছেড়ে দাও বাবা, প্রাণে বধ করো না বাবা।

নাট্য পরামাণিক।—আরে রও ঠাকুর! কামিয়ে দিচ্ছি তাতে এত ভয় কেন? আস্তো বুড়ো ছিলে এখন কেমন খাসাটি দেখতে হ'চ্ছে বল দেখি?—একদম French cut ক'রে দিয়েছি বুঝ্‌লে?—কেবল মাথাটা সাবান ক'ত্তে পারলেই হয়।

বাল্মিকী—(সভয়ে)—রাম! রাম!! রাম!!!

পূজার বাজার

[শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

আজ ১২ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন শীতের সন্ধ্যায় যশোর জেলা নিবাসী নন্দলাল কলিকাতায় আসিয়াছিল। গ্রামের মধ্যে তার বড় নাম যে তার মত সুচতুর বুদ্ধিমান, বিদ্বান তাদের গ্রামে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এ হেন নন্দলাল সেবার কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা দর্শনের যে অভিজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার টীকা, ভাষ্য এ দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষেও সমূলে নির্ম্মূল হইবার অবকাশ পায় নাই। কথায় আছে রক্ত বীজের বংশ যত মারিয়া ফেলিবে ততই বাড়িয়া উঠিবে—নন্দলালের কলিকাতার গল্প সেরূপ শেষ না হইয়া তাহার মস্তিষ্কের অভাবনীয় উদ্ভাবনা শক্তির ফলে নিত্য নব নব আকারে গজাইয়া উঠিতে থাকে। নন্দলাল সেবারে বড় দিনের সময় আসিয়াছিল। সুতরাং সারা কলিকাতাটা একরূপ চষিয়া ফেলিয়া তাহার সার সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। থিয়েটার দেখিয়া, গড়ের মাঠে ঘোড়ার নাচ দেখিয়া, বায়স্কোপে গিয়া, গঙ্গা স্নান করিয়া, কালী ঘাটে কালী দর্শন করিয়া, এমন কি হাওড়ার পোলের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া গঙ্গাবক্ষে সওদাগরী জাহাজ গুলিকে দেখিয়া কল্পনার চক্ষে বড় বড় যুদ্ধ জাহাজের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। জু গার্ডেন দেখিয়া নন্দলাল হাসিয়া বাঁচে না। তাহাদের দেশে শৃগাল, কুকুর, বিড়াল, ব্যাঙ, ইন্দুর, ছুঁচো, ব্যাঘ্র, সর্প কাক, কোকিল, বানর, হাজর, কুমীর সব ইংরাজ বাহাদুর ধরিয়া আনিয়া সহরের মাঝে, লাট বেলাট, মহারাজাদের আলিপুর নিবাসের কাছে এমন সুন্দর বাড়ীতে কি অপূর্ব্ব যত্নে না রাখিয়াছে! সারা জু-গার্ডেন ঘুরিয়া নন্দলাল একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল এবং মনে মনে ভাবিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে পূর্ব্ব জন্ম আর না মানিয়া চলে না। নইলে আমাদের দেশের কুকুর বেড়ালগুলো পথে, পাদাড়ে, বনে, জঙ্গলে পড়িয়া যাহাদের জীবন কাটাইতে হয় তাহারাও সহরে আসিয়া উন্নতির সৌধ শিখরে উঠিয়া গিয়াছে। পরম সুখে দিনাতিপাত করিতেছে! মরা জানোয়ার দেখিতে গিয়া নন্দলাল বুঝিয়াছিল দান, ধ্যান প্রভৃতি সৎকার্য্য করিলে তাহাদের স্মৃতি জগতে অটল অমর হইয়া থাকে। নচেৎ মরা জানোয়ার গুলির স্মৃতি এমন করিয়া ইংরাজ বাহাদুরের মত বুদ্ধিমান লোকেরা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে স্মৃতি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিবে কেন? হাইকোর্টের, উচ্চতা দেখিয়া বিচার যত সূক্ষ্ম হইবে বিচারালয় তত উচ্চ হইবে এ ধারণা নন্দলালের বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাই তার মনে হইত জেলা আদালত গুলিতে তেমন সূক্ষ্ম বিচার পাওয়া যায় না বলিয়াই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সহরের গগনভেদী উচ্চ বিচারালয়ে সাহায্য গ্রহণ করিতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসে।

এ হেন নন্দলাল যখন প্রচার করিল তিনি পূজার বাজার করিতে এবার কলিকাতায় আসিবেন তখন দলে দলে লোক আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। এক যুগ পরে নন্দলাল পুনরায় কলিকাতায় চলিয়াছে। তাহার যাত্রা যাতে জয়যুক্ত হয় সেজন্য অনেকেই ঠাকুর দেবতার কাছে পূজা মানসিক করিল। অনেকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল এবার যদি নন্দলালকে দুইচার দিন অধিক থাকিতে হয় তাহা যেন তিনি থাকিয়া কলিকাতার সমস্ত তথ্য জানিয়া আসেন। কেহ কেহ অনুরোধ করিল—পারেন ত তারকেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়া তারকেশ্বরের অবস্থাটা একবার দেখিয়া আসেন। তাহারা শুনিয়াছিল মোহন্তর সহিত দাঙ্গাহাঙ্গামায় বাবা তারকেশ্বর নাকি ভয় পাইয়া গা-ঢাকা দিয়াছিলেন! কথাটা কতদূর সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য তাহারা উদ্গ্রীব হইয়া থাকিবে। এমন আজগুবি অসম্ভব কথায় কোন দিক থেকে যদি কোন শিক্ষিত যুবা আপত্তি তোলে প্রতি উত্তরে তাহারা কালা-পাহাড়ের ভয়ে জগন্নাথ দেবের অন্তর্দ্ধান, আওরঙ্গজীবের ভয়ে গোবিন্দজীর পলায়ন এই সব ঐতিহাসিক নজীর দিয়ে

কথাটা যে মোটেই আজগুবি নয় তাহা প্রমাণ কর্ত্তে কুণ্ঠিত হয় না। যুক্তি তর্ক স্থলে একথা উঠতে পারে—তারা ছিল বিধর্ম্মী, হিন্দু দেবদেবী বিদ্বেষী। এ ক্ষেত্রে মোহান্তজী হিন্দু, হিন্দুধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি, তথাপি তাহার আচরণ দেবদ্বিজ বিদ্বেষী, সুতরাং ফলে একই।

নানা প্রকার অনুরোধ, উপরোধ, উপদেশ, আদেশ ও বহুবিধ সাজ সরঞ্জাম করিয়া পঞ্জিকা দেখিয়া এক দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে নন্দলাল কলিকাতা যাত্রা করিল। বুভুক্ষু ব্যক্তির ন্যায় গ্রামবাসীরা নন্দলালের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া রহিল। এবার নন্দলাল কলিকাতা হইতে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আসিবে যাহার গল্প শুনিয়া শেষ করিতে তাহাদের সারা জীবন কাটিয়া যাইবে। নন্দলাল গাড়ীতে উঠিবার সময় বলিয়া আসিয়াছিল প্রথম পত্রে সে তাহাদের জানাইবে—স্বরাজ কতদূর আসিয়া পৌছিয়াছে—কতটুকু আসিতে বাকি আছে এবং কতটুকু স্বরাজ হস্তগত হইয়াছে, তাহার ফলে সহরবাসী কোন ইন্দ্রিয়ে হাঁটিতেছে পায়ে বা হাতে তাহা জানাইতে সে কিছুতেই ভুলিবে না।

১২ বৎসর পরে নন্দলাল শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। কোথায় আসিল প্রথমে ঠিক করিতে পারিল না, তাহার পরিচিত পুরাতন ষ্টেশনটীর কোনও নিদর্শন সে খুঁজিয়া পাইল না। এ পরিবর্ত্তন তাহার দৃষ্টিতে অভিনব ঠেকিল। তখন দুই তিনটী প্লাটফরমের মধ্যে গাড়ী আসিয়া লাগিত। এখন সারবন্দি প্লাটফর্ম্ম, নানাবিধ মেল ও প্যাসেঞ্জার গাড়ী মুহুর্মুহু ছাড়িতেছে ও আসিতেছে, যাত্রীর জনস্রোত, রেলওয়ে কুলীর ভীড় নানা পথে নানা দিকে বাহির হইয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক প্লাটফরমের গেটের সম্মুখে জেলখানার ন্যায় লোহার বেড়ায় আটকান এবং সেখানে এক একখানি কাঠের হাত—কোন্ কোন্ গাড়ী কখন ছাড়িবে তাহার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ষ্টেশনের উপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নানাবিধ চায়ের, খাবারের, ফলের দোকান সহরের সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া যাত্রীগণকে সাদর আহ্বান করিতেছে। নন্দলালের দিকভ্রম হইয়া গেল, কোন পথে সে বাহির হইবে ঠিক করিতে পারিল না। একটী রেলওয়ে কুলীর মাথায় জিনিস পত্র তুলিয়া দিয়া তাহাকেই ব্যূহ-নির্গমের পথ নির্দ্দেশকের পদে বরণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মনে মনে বলিল - পরিবর্ত্তনশীল জগতে নিত্যই কত না পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র সহরের বাড়ীর দেওয়ালগুলির উপর দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। সে প্রথমেই পড়িল বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "নাচঘর"। ভাবিল পরিবর্ত্তনই যখন জগতের নিয়ম—এবার দেখিতেছি কলিকাতার সর্ব্ববিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—ষ্টেশন হইতেই সুরু। সেবার সে যাদুঘর দেখিয়া গিয়াছিল এবার নূতন নাচঘর দেখিবার আশায় আনন্দিত হইয়া উঠিল। একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল আর একখানি কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে (নবপর্য্যায়) "বৈকালী"। নন্দলাল জানিত বৈশাখ মাসেই বৈকালী হইয়া থাকে, কিন্তু স্বরাজের দিনে, পরিবর্ত্তনের যুগে আশ্বিন মাসের শরতের শুভ্র শেফালিকার স্নিগ্ধ গন্ধের মধ্যে নূতন বৈকালী আরম্ভ হইয়াছে—নতুবা নবপর্য্যায় বলিবে কেন? বৈকালী খাইয়া যাইবার সঙ্কল্প মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিল। আর একটু অগ্রসর হইতেই নন্দলাল হাসিয়া আকুল হইল—প্রতি বৎসরেই বর্ষান্তে শরৎকালে মহামায়ার আগমনের সুচনা করিয়া থাকে বিন্দু বিন্দু শিশির বিন্দু। প্রভাতের তরুণ আলোক সম্পাতে মহা আনন্দে হাসিয়া লুটোপুটি খাইয়া মায়ের আগমন বার্ত্তাই চিরদিন বহিয়া আনে এই শিশির সিক্ত শেফালির দল। কিন্তু একি ব্যাপার—পরিবর্ত্তন যে পরিপূর্ণ মাত্রায় উঠিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই নতুবা "শিশির" আবার কেমন করিয়া "সচিত্র" হইয়াছে।

পূর্ব্ববার আসিয়া সে যে মেসে উঠিয়াছিল এবার সে মেস অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইল। কারণ পথ ঘাট অট্টালিকা, যাহারা ছিল ক্ষুদ্র, তাহারা হইয়াছে বৃহৎ, প্রশস্ত ও পরিষ্কার। সে মনে মনে ঠিক করিল গ্রামের কোনও পরিচিত লোকের নিকট যাওয়া হইবে না—পাছে তাহার অনভিজ্ঞতার কথা দেশে প্রচার হইয়া পড়ে। সঙ্গী রেলওয়ে কুলিটি, খুব সুচতুর ছিল। বাবুকে সহরে একেবারে নূতন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবু, কোথায় যাবেন, নিকটেই ভাল হোটেল আছে সেইখানেই চলুন। নন্দলাল মনে মনে ঠিক করিল, কুলিটি

নিশ্চয়ই নিত্য কত নূতন লোককে এমনই হোটেলে তুলিয়া দিয়া যায়, সুতরাং তাহার পরামর্শ গ্রহণ করাই সমীচিন:। সে বলিল, যেটা সব চেয়ে ভাল হোটেল জানা আছে সেই-খানেই চল। কুলি বাবুর অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল – নন্দলাল হাঁ করিয়া পথের দুইধারে সুসজ্জিত দোকানগুলি দেখিতে দেখিতে চলিল। একটি দোকানের উপর লেখা আছে "Graduate Friends and Co"। ভাবিল এখানে নিশ্চয়ই কম খরচায় graduate করা হয়। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল "বান্ধব বস্ত্রালয়"। তখনি নন্দলালের মনে হইল সহরে স্বরাজ নিশ্চয় আসিয়াছে আর কাপড় কিনিয়া পরিতে হইবে না—সমস্ত বান্ধবেরাই এই বস্ত্রালয়ে বিনামূল্যে বস্ত্রাদি পাইবেন। ইতিমধ্যে কুলি একটু বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সে ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—বাবু তাড়াতাড়ি আসুন, আমার আরও কাজ আছে। নন্দলাল অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। এবার অনিচ্ছাসত্বেও তাহার দৃষ্টি একখানি রঙীন প্লাকার্ডের উপর পড়িল। সে কুলীর তিরস্কারসত্বেও এবার দাঁড়াইয়া পড়িল এবং ভাল করিয়া পড়িয়া লইল "এ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আপনার নিমন্ত্রণ"। নন্দলালের দৃঢ় বিশ্বাস হইল স্বরাজ নিশ্চয়ই হইয়াছে নতুবা প্লাকার্ড মারিয়া সারা সহরকে নিমন্ত্রণ করিবে কেন? বারলক্ষ সহরবাসীর বাড়ী বাড়ী গিয়াও নিমন্ত্রণ করা সম্ভবপর নয়। স্থির করিল সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণ রাখিতে যাওয়া যাইবে এবং এই বৃহৎ সদ অনুষ্ঠানের জন্য, অনুষ্ঠাতাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া আসিতেও ভুলিবে না। নন্দলাল দেখিল, সহরের বাড়ীর দেওয়ালগুলি একরূপ সাধারণের সম্পত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ তাহাদের বক্ষের উপর নানাবিধ বর্ণের চিত্র বিচিত্র রংয়ের বহুবিধ সম্ভব অসম্ভব পূজার পোষাক পরিচ্ছদে সহরের ব্যাবসায়িরা সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। ফুটপাতের উপর সামান্য জঞ্জাল পড়িলে করপোরেশনের মাথায় ভূমিকম্প হইয়া উঠে আর এই দেওয়ালগুলির উপর কি নির্মম ভীষণ অত্যাচারই না চলিতেছে!

নন্দলাল একটি চৌমাথায় আসিয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার চারিদিকে তীর্থের পাণ্ডার মত সংবাদ পত্র বিক্রেতার দল গগনভেদী চীৎকারে আক্রমণ করিল—Forward, Servant, দৈনিক বসুমতী, অবতার, জাগরণ, নবযুগ, বিজলী, আনন্দবাজার। নন্দলাল একসঙ্গে এতগুলি নাম শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে কিনিবে ভাবিয়া পাইল না। এই পথটুকু আসিতেই সে একরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কুলি যখন তাহাকে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করিল তখন সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া সে যখন বৈকালে বেড়া-ইতে বাহির হইবে ভাবিতেছিল তখন হোটেলের ম্যানেজার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এবেলা কি আহার করিবেন? নন্দলাল অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের কি এবেলা রান্না হইবে—নিমন্ত্রণ নাই? ম্যানে-জার আগন্তুকের মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন নিমন্ত্রণ কি! নন্দলাল একটু রাগিয়া বলিল, ৭॥ টার সময় এ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে সকলের যে নিমন্ত্রণ, আপনি জানেন না! বড়ই আশ্চর্য্য, আপনারা সহরে থাকেন—অথচ সহরের কোনও খবর রাখেন না। আমি নাচঘর দেখে নেমন্তন্ন সেরে বাসায় ফিরব ভেবে বেরুচ্ছি। ম্যানেজার এবার একটু গম্ভীর হইয়া উত্তর করিল, আজ্ঞে আপনি ভুল কচ্ছেন—যে নেমন্তন্নর কথা আপনি বলছেন—সেখানে ট্যাক্সী ভাড়া করে যেতে হবে ও নেমন্তন্নটা পেটের নয়, চোখের ও কানের, সুতরাং ওর উপর ভরসা করলে সেখানে যে "জীবন-যুদ্ধ" হবে তা আজকে রাত্রে আপনাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবে। নাচঘর দেখতে যাবার জিনিষ নয়—সেটা ঘরে বসে পড়বার জিনিস—ওটা সহরের নূতন, নবীন সংবাদ পত্র। নন্দলাল ভড়কাইয়া গেল – তাহার পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা তাহাকে সহস্র হস্ত পিছাইয়া আনিল। তাহার আর বৈকালে বাহির হওয়া হইল না, এবং বৈকালী খাওয়ার আশাও সে ত্যাগ করিল। বাসার চাকর দিয়া যতগুলি নূতন সংবাদপত্র আছে এক এক খানি কিনিয়া আনিয়া সহরের হালচালটা বুঝিয়া লইবার জন্য, ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে নন্দলাল প্রাতঃ ভ্রমণে বাহির হইল। রাস্তার দুইধারে নানাবিধ কেবিন, রেষ্টুরেন্ট হোটেল তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দলে দলে ছাত্র, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ এমন

কি স্থবির পর্য্যন্ত চা, কেক, বিস্কুট ডিম মাংস ভোজনে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। Hall for all nation এই কথাটি সেবার সে একমাত্র উইলসন হোটেলে দেখিয়া গিয়াছিল। এবার আসিয়া দেখিল গলিতে গলিতে পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই সর্ব্বজাতির সব অধিকার দিয়াছে- এই সকল কান-ধন্ত হোটেলগুলি। ইহাদেরই প্রসাদে কলিকাতার বড় বড় নামজাদা ডাক্তার, কবিরাজগণ আশাতিরিক্ত ফি বাড়াইয়া ঐশ্বর্য্যের অভিনবত্বে আত্মহারা হইয়া রহিয়াছে। সেখান হইতে সে গোলদীঘিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিল দেশের যুবকবৃন্দ নানাবিধ গল্পগুজবে আকাশে কল্পনার ফানুস উড়াইয়া মহাসুখে পিতৃপ্রদত্ত অর্থের সোপিগুকরণ করিতেছে।

সেখানে সে অবগত হইল অদ্য বৈকালে বড় বড় বক্তাগণ এখানে উপস্থিত হইয়া কেমন করিয়া হুজুগ জাগাইয়া রাখা যায় তাহারই একটি পরামর্শ করিবেন— সর্ব্ব সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। নন্দলালের কিছু কাপড় চোপড় কিনিবার প্রয়োজন ছিল, কোথায় কিনিবে ভাবিতেছিল—সহসা সম্মুখের একখানি দোকানের উপর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল—বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "সর্ব্ব রকম কাপড় পাওয়া যায়, দর নাই।" দোকানে ঢুকিতে গিয়া নন্দলাল ফিরিয়া আসিল "দর নাই" শব্দের অর্থ কি! কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা নিবাসী কোনও আত্মীয়ের নিকট হইতে একখানি নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছিল—সেই পত্রের তলদেশে বিশেষ দ্রষ্টব্যের মধ্যে লেখা ছিল "লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম।" নন্দলালের তাই মনে সন্দেহ হইল স্বরাজ্যের দিনে হয়ত কাপড়ের "দর নাই", বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। পাছে লোকে টাকা দিয়া ফেলে এ নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে "দর নাই" লিখিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সবিশেষ না জানিয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মূঢ়তাই প্রকাশ পাইবে।

ঘুরিতে ঘুরিতে নন্দলাল অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছিল, ফিরিবার মুখে সে দেখিল সহরে এক প্রকার নূতন গাড়ী আসিয়াছে, সেগুলি ঘোড়ার পরিবর্ত্তে "উন্নতির যুগে" মানুষে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—এ দৃশ্যটি নন্দলালের মনে বড়ই ব্যথা দিল।

বাসায় ফিরিয়া নন্দলাল আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিল। পুরাতন অভিজ্ঞতা লইয়া বর্ত্তমান সভ্যতার দিনে সহরের পথ হাঁটিতে সত্য সত্যই বেচারীর মনে মনে অবজ্ঞা হইতেছিল সকল দিক দিয়া বাধ বাধ ঠেকিতে ছিল। একবার ভাবিল ব্যাপার বড় সাংঘাতিক; চার বৎসরের পূর্ব্বে মোটর গাড়ীর উৎপাত এত অধিক ছিল না। এই সব দৈত্য প্রভাবান্বিত মোটর গাড়ীর আবির্ভাবে, অশ্বিনী কুমারদের প্রায় ছুটী হইয়া আসিতেছে। তাহারা যদিও বাঁচিয়াছে, কিন্তু সহরের সভ্যতা দেবী অশ্বের পরিবর্ত্তে প্রতিদিন বলি লইতেছেন মানুষ। নন্দলাল মোটরের দৌরাত্ম্য ও উপদ্রব দেখিয়া প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিতে পারিবে—কিনা অনেকবার ভাবিয়াছিল।

এতখানি উন্নতি যে সহরের হইয়াছে পল্লীগ্রামে বসিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া নন্দলাল ঠিক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যাহা হউক এখন যদি সে ফিরিয়া যায় তাহা হইলে দেশে মুখ দেখানো ভার হইয়া পড়িবে। মরি আর বাঁচি —'পূজার বাজার' করিয়া যাইতেই হইবে।

এই সময় একটী ভদ্রলোক হৈ হৈ করিতে করিতে করিতে বাসায় প্রবেশ করিলেন। সম্মুখে ম্যানেজারকে দেখিয়া বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ, চক্ষের নিমিষে ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেল—একটী এগার বছরের বালক মোটর চাপা পড়ে মারা গেল। মোটর খানাকে সবাই মিলে ধরে ফেল্লে বটে, কিন্তু তাতে ত আর ছেলে ফিরে আসবে না? বলেন কি মশাই এই লক্ষ্মীছাড়া গাড়ী গুলোর জ্বালায় পথে বেরুতে ভয় করে।

আর একজন বলিলেন - ট্রাম গাড়ি গুলাই বা কম কি? কাল যখন আফিস যাই, তখন একজন যোয়ান মদ্দ মিন্সে ছুটে ও ফুটপাত থেকে এ ফুটপাতে আসছিল এমন সময় এক দিকে হু হু করতে করতে এক খানা মোটর অন্য দিক থেকে মহাপ্রভু ট্রাম এসে তাকে একবারে স্বর্গে নিয়ে গেল। এমন ঘটনা ত প্রতিদিন ঘটছে।

নন্দলাল এক লম্ফে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অত্যন্ত ভয় বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, তা'হলে এমন দুই একজন লোক প্রতিদিন মরবে—বলুন?

দুই একজন, এ তো, বড় বেশী আশ্চর্য্য হবার মত কথা নয়? সকল সংবাদ কে আর রাখচে বলুন?

নন্দলাল ঠিক করিল, মান-সম্ভ্রম যায় যাক্—প্রাণ থাকিলে সব হইবে। আগামী কল্য দেশে ফিরিয়া যাইব।

সংবাদ পত্র পড়িয়া নন্দলাল বুঝিল যে অধুনা থিয়েটার গুলির উপর সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। তখনকার মত এখন আর অষ্ট আনা ব্যয় করিয়া নটীরনাচ দেখিবার সুবিধা নাই। এখন উন্নতির যুগ, আর্টের যুগ। এখন একটী অখণ্ড রজতমুদ্রার কম দর্শনী নাই। এ যুগে রঙ্গমঞ্চের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বসিবার স্থানের ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, গ্যালারি উঠিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে চেয়ার হইয়াছে। সরকার বাহাদুর আমাদের সখ্ দেখিয়া সখ্ করিয়া আমোদ কর সংস্থাপন করিয়াছেন, এখন আমোদ করিতে হইলে কর দিতে হয়। নন্দলাল ভাবিল উন্নতির চরম উদ্দেশ্য, নিশ্চয় নূতন নূতন কর ধার্য্য করা। অদূর ভবিষ্যতে যে চাল ডাল, নুন তেল আলু বেগুনের উপরও কর হইতে পারে—সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের কারণ নাই। সে দেখিয়া গিয়াছিল, যখন আমোদ-কর ছিল না, তখন মাত্র সপ্তাহে তিন দিন করিয়া থিয়েটার হইত। এখন সকল জিনিস যেমন দুর্ম্মূল্য হইয়া গিয়াছে, আমোদও বাড়িয়া গিয়াছে। আর্ট থিয়েটারের অনুকম্পায়-সপ্তাহে পাঁচ দিন করিয়া অভিনয় হইতেছে। একা "কর্ণার্জ্জুন" দেড়শত রজনী ক্রমান্বয়ে অভিনীত হইলেও প্রতি রজনীতে দর্শক ফিরিয়া যাইতেছে। এতে আর্ট থিয়েটার না দেখিয়া কেমন করিয়া দেশে ফিরিতে পারিব? দেশোদ্ধার করিবার জন্য কত লোক জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে, আর নন্দলাল কিনা "পূজার বাজার করিতে আসিয়া প্রাণভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে! "তার চেয়ে বল বোন মরা ভাল"—শেষে স্থির করিল পূজার বাজার না সারিয়া সে কিছুতেই ফিরিবে না। মরিতে হয়—তাও স্বীকার।

সে দিন সন্ধ্যায় পথে বাহির হইতেই নন্দলাল দেখিল, একখানি মোটর গাড়িতে একটী সাধু বসিয়া আছেন। পরিধেয় বস্ত্রখানি মাত্র গেরুয়া, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, চক্ষে সোণার চশমা, মাথায় পীতবর্ণ গরদের পাগড়ী, চরণে চমকদার রেশমী মোজা, অবশ্য পীতাভ; পায়ে পম্প-সু, হস্তে সংবাদ পত্র, মুখে সিগারেট, সাধু চালককে আদেশ করিলেন—আর্ট থিয়েটার চল। নন্দলাল অনুসন্ধানে বুঝিয়াছিল—পুরাতন সাধুরা এখন অচল, না-মঞ্জুর—ও বাতিল হইয়া গিয়াছে। লম্বা লম্বা জটা দেখিলে এখন লোকে ভয় পায়—মূর্চ্ছা যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সাধু মহলে যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সাধুতা লোপ পাইয়া অসাধুতাই তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে একথা নন্দলালের বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না। এখনকার সাধুরা ইংরাজি বলে, সংস্কৃত বলিতে না পারিলেও আসে যায় না। বক্তৃতা দিয়া দেশ মাতায়, শিষ্য বাড়ায়, অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করে। পরিবর্ত্তনশীল জগতে একটী নূতন সভ্য, শিক্ষিত সাধু সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহাদিগের কানে কথায় অত্যন্ত গরমিল। এই শিক্ষিত সাধু সম্প্রদায় (অবশ্য বর্ত্তমানে শিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝায়) অর্থোপার্জ্জনের ভদ্র কৌশলজাল বিস্তারে অসীম শক্তিশালী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাদিগের আচার ব্যাবহার নীতি পদ্ধতি, মান অভিমান গৃহীদিগকেও পরাজিত করিয়াছে। অনেকে এই সম্প্রদায়টিকে অর্থোপার্জ্জনের পক্ষে সহজ সরল মার্গ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। নন্দলাল ভাবিল ইহাদিগের জালে পড়িলে প্রাণ বাঁচাইয়া বাহির হওয়া কঠিন। অধিক দিন কলিকাতায় থাকিলে ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইতে পারে এমন একটা দুশ্চিন্তা তাহার মনের মধ্যে অহরহ আঘাত করিতে লাগিল। অল্পদূর অগ্রসর হইতেই দেখিল একদল স্ত্রীলোক পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া দোকানের সম্মুখে ফুটপাতের উপর দাঁড়াইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেছে। তাহাদের এই ভিক্ষা লব্ধ অর্থে নাকি তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ও মাদ্রাজ জলপ্লাবনের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ হইতেছে। "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" এ শঙ্কা আজ পথে নারী দেখিয়া নন্দলালের দূর হইল। সে ভাবিল ইহারা যাহারাই হোন, বঙ্গনারী হইয়া পথে বাহির হইতে সাহস করিয়াছেন যখন তখন নিশ্চয় স্বরাজ হইয়াছে। নন্দলাল ধার্ম্মিক লোক ছিল। সুতরাং মূল্য না দিয়া কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে তাহার মন উঠিল না; সে বরাবর বড়

বাজার পূজার বাজার করিতে চলিল। কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল, সহস্র স্বরাজ হইলেও ঐ বালুর দেশের মাড়োয়ারী বণিকগুলি একটি পয়সাও ছাড়িবে না। বিলাতী কাপড় বিক্রয় করিয়া, ঘিয়ে চর্ব্বি মিশাইয়া দেশের লোকের নিকট হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া, ভাবের ঘরে ফাঁকি দিবার জন্য ধর্ম্মের নামে ভাণ করিয়া লোকের চক্ষে ধুলা দিয়া, ধর্ম্মশালা গো-শালা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া পাপের হাত হইতে পরিত্রাণের আশায় সততার উচ্চ সিংহাসনখানি সর্ব্বদা দখল করিয়া বসিয়া আছে। চীৎপুর রোডের চৌমাথা পার হইয়া একখানি ছড়ির দোকানের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "Stick no bill". নন্দলালের এক গাছি ছড়ির প্রয়োজন ছিল কিন্তু কেনা হইল না—কারণ ছড়ির কোন মূল্য নাই—যখন ছড়ির দোকানের মাথার উপর স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে Stick no bill. নন্দলাল যখন হা করিয়া ছড়ির দোকানের দিকে চাহিয়াছিল তখন একজন পকেট-কাটা কাঁচির কতদূর উন্নতি হইয়াছে, হাত কতখানি সাফাই হইয়াছে তাহা নন্দলাল তখনি বুঝিতে পারিল যখন পূজার বাজার করিয়া মূল্য দিবার জন্য উদ্যত হইল। মাথায় হাত দিয়া সে বসিয়া পড়িল। কিরূপ বেমালুম পকেট কাটিয়া লইয়াছে তাহা দেখিয়া সে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। দোকানদার নন্দলালের অবস্থা দেখিয়া কাপড়গুলি সমস্ত উঠাইয়া লইল—এবং মুখখানি বিকৃত করিয়া বলিল—পূজার বাজার মশাই, একটু সাবধানে চলিতে হয়। আপনি দেখছি অজ পাড়াগেঁয়ে। কলকাতায় বুঝি কখনও আসেন নি নন্দলালের টাকা গিয়াছিল, সে শোক, দুঃখ সে বরদাস্ত করিয়াছিল একরূপে, কিন্তু অজ পাড়াগেঁয়ে এ অভিভাষণ তাহাকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিল। ২০৲টী টাকা ব্যাগে রাখিয়া গিয়াছিল—বাসায় আসিয়া হোটেলের পাওনা মিটাইয়া দিয়া সেই দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে কলিকাতা পরিত্যাগ করিল এবং মনে মনে স্থির করিয়া গেল দেশে পৌছিয়াই কৈলাসে একখানি Telegram করিবে "Do'nt come this year".

নিত্য রোগ শোক ব্যাধি পীড়িত নিরন্ন কঙ্কালসার বঙ্গবাসীর মুখ এবার নাই বা দেখিলে! সারা বৎসর ধরিয়া আমরা তোমার আশাপথ চাহিয়া থাকি, প্রতি বৎসরেই আশা করিয়া থাকি, সর্ব্বদুঃখহারিণী দুর্গতি নাশিনী, দনুজদলনী মা অম্বিকা আসিবেন; তাঁহার সন্তান আনন্দ হাস্যমুখে তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিবে, সে যে কত বড় আকাঙ্ক্ষা সে যে কত বড় আশা তাত তুমি জান, মা, তাই বলি যখন তা হবে না, তা হবার নয় তখন আর তোমার এসে কাজ নাই, তাই নন্দলালও প্রাণস্পর্শী দুঃখের জ্বালায় মনে মনে বলিয়াছিল—দেশে গিয়া টেলিগ্রাম করিব—"Dont come this year."

স্বামী পরিচয়

[শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম্‌-এ, বি-এল্‌]

যখন সঘন কুকুর গরজে শুনি সে দরজা নাড়া
সভয়ে মুছি-গো আঁচলে নয়ন, সুপ্ত সর্ব্ব পাড়া;
ভিক্ষু হরিবে প্রত্যাশা করি কাহার তাড়ন আমি
আমার জীবন-স্বামী সে যে গো, আমার হৃদয়-স্বামী।
পচাজলপূরিত ডোবার দুপাশে যখন শিয়াল ডাকে
রিক্ত ভূমিতে বিহ্বলি পেচক ঘূৎকার দিতে থাকে,
তখন শ্রবণে বাজে কাহার দুর্ম্মদ মাতলামি?
আমার জীবন-স্বামী সে যে গো আমার হৃদয়-স্বামী।

কামিজে কাপড়ে আননে গুম্ফে শিথিল সকল সাজে
তাহারি নেশাটি ভাসে নয়নে, তাহারি বিকট কাজে,
বমন করিয়া পড়ে ঘুরে সেই আমার চরণে থামি;
আমার জীবন স্বামী সে যে গো আমার হৃদয়-স্বামী!
কিছুকাল পরে হইব আবার দারুণ লাথির দামী
দেখিব মদির গন্ধি মুখেতে ভীষণ ভ্রূকুটীরাশি।
শুনিব তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে তুলিতেছে মাসী মামী;
আমার জীবন-স্বামী সে যে গো আমার হৃদয়-স্বামী।

সন্ধ্যার ফুল

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

তখন ছিলে সখি নতনয়ন চোখে
আড়ালে,
কনক প্রাতে যবে প্রথম আসি কাছে
দাঁড়ালে!
মধুপ মাতোয়ারা ভ্রমিত গুণ গুণি
ফিরিতেছিল দ্বারে তপন জাল বুনি
মলয় মুরছিয়া মরিত তনু বেড়ি
সাদরে—
গুণ্ঠ আধ টানি লুকাতে মুখখানি
কাতরে।
বিরহ তপভারে দয়িতে মিলাবারে
নয়ানে
নয়ন-পল্লব মুদিত; মগ্ন
ধেয়ানে!
দুয়ারে করহানি গেল যে কতবার
মুকুতা শুভ সিত তরল হিমহার,
পাপিয়া ফুকারিয়া; বিফল মুকুলিকা
ঝরিয়া,—
চরণে তৃণদল শয়ন সুকোমল
রচিয়া।

কেমনে গেল টুটি' মৌন সংকোচ
সাধনা,
হইলে বিকশিত মধুতে ভরি' চিত
কত না!
টুটিল সব বাধা লুটিল সবে মিলি
তোমার যাহা কিছু ছিল গো নিরিবিলি
নিলাজ রবিকর হইল খরতর
অসহ
ক্ষণিক ভুলে কেন বরিলে চির হেন
বিরহ!
উতলা হাওয়া এবে তোমারে পরিহাসে
দেখিয়া
শীর্ণ পাতাগুলি দীর্ণ কলিকায়
ঠেকিয়া!
তবুও দিনশেষে উর্দ্ধমুখে চাহি
আছ এ যার আশে আর সে হেথা নাহি
হাওয়ার তালে আসে তার সে ভালবাসা
পাবে কি?
পরতে পরতে এ তনুটি দিতে দিতে
র'বে কি?

একনিঃশ্বাস

অফিসের বড়সাহেব প্রাইভেট রুমে বসে আছেন। ঘড়িতে প্রায় চারটা বাজে—এমন সময় তোত্‌লা ছোট কেরাণী ফিস সেই ঘরে প্রবেশ করল। তার মুখের ভাব ভঙ্গি দেখে বড় সাহেব এমন ভাবে চাইলেন যা'কে বলে প্রশ্নসূচক চাওয়া। সেই নীরব প্রশ্নের টানে ফিস সাহেবের মুখ থেকে বেরিয়ে এল তার যা বলবার ছিল সেই গোটা কতক কথা কেঁপে কেঁপে—জড়িয়ে জড়িয়ে.........

সা-সা-স্যার—আমি এ-এ এক সপ্তার ছু-ছু-ছুটী চাই.........

ছুটী! ...কেন?.........

এ-এ-এই......আমার স্ত্রীর ব-ব-বড্ড ইয়ে হ'য়েছে......তাই ভে-ভে-ভেবেছি ওঁকে চে-চে-চেঞ্জে নিয়ে যা-যা-যা-যা.........

কোথায় যাবে ঠিক করেছ?

ম-ম-মনে করেছি দি-দি-দিল্লী.........

এঁ্যা! বলে কিরে!...দিল্লী যাবে!...সে আবার একটা চেঞ্জ নাকি!...

তা-তা-তা ও'র ইচ্ছে কিছু দিন প-প-পশ্চিমে.........তা ছাড়া পুরোণো ও-ও-ওইতিহাসিক রা-রা রা-রাজধানীটা.........

বটে! মিসেস্ ফিসের অসুখ! কই-কিছু ত জানি না! কাল আমরা দুজনে মিলে যে ইম্পীরিয়াল রেষ্টোরাঁতে খেয়ে পিক্‌চার প্যালেসে পেরিল্‌স্ অফ পলিন্ দেখে এলুম—কই, মিসেস্ ফিস ও চেঞ্জে যাবার নামটাও করেন নি!......

ফিসের মেজাজ গরম হ'য়ে উঠল। বড় সাহেবকে একটা না-দিলেই-নয় গোছের সেলাম ঠুকে ঠকাঠক্ জুতার শব্দ তুলে ছুটে বাইরে চলে গেল এবং আপন মনে বিড় বিড় করে বক্‌তে লাগ্‌ল—আ-আ-আচ্ছা মনিবের পাল্লায়ই প-প-পড়া গেছে বাবা! ও-ও-ওস্তাদ কেই কম নয় বাবা! আমি যে আদৌ বি-বি-বিয়েই ক ক-করি নি!......

দুইদিক

ছাত্রদের পড়াচ্ছেন—

"মাতৃবৎ পরদারেষু"

এদিকে—

রাস্তায় চোখ টক্ টক্
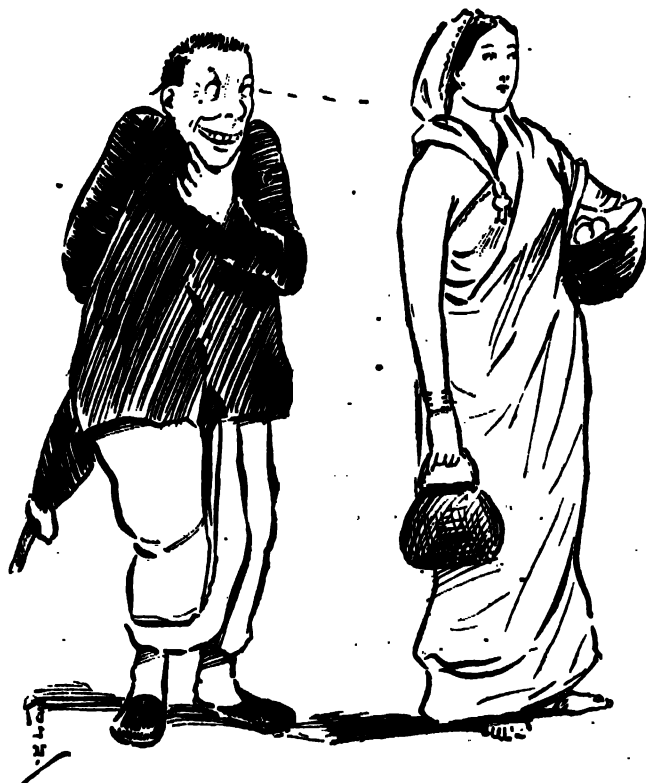
জিভ্ লক্ লক্……

আশ্রয়

[শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার]

(১)

নলিনীর বাড়ীতে রাজমিস্ত্রী লাগিয়াছে।

নিজের ঘরখানি ছাড়িয়া নলিনী পূর্বদিকের ঘরটা কতক মতক সাফ করাইয়া লইয়া আসিয়া বসিল। তাহার জন্মাবধি এই ঘরখানিকে সে গুদামঘররূপেই ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছে। অব্যবহার্য্য, ভাঙ্গা চোরা, জিনিষপত্র যা কিছু এইখানেই গাদা করা থাকিত। আজ সাফ-সোফ্ করাইলেও বদ্ধঘরের আঁধার ও দুর্গন্ধ গেল না, নলিনী রামলালকে ডাকিয়া ঘরে ধুনা দিতে বলিল।

নলিনী সহরের একটি নাম-করা গণিকা। সুন্দরী না হইলেও তাহার চেহারার মধ্যে মাদকতা ছিল। যৌবন সীমা অতিক্রম না করিলেও অকালে কাল তাহার উপর একটা প্রৌঢ়ত্বের ছোপ টানিয়া দিয়াছে, নিজ চেষ্টায় যতখানি সম্ভব নলিনী সেটাকে গোপন রাখিতেই যত্ন করে। এই ত সবে সকাল হইয়াছে, ইহারই মধ্যে সে স্নান করিয়া লইয়াছে; মাথার সামনের চুলগুলিকে আঁচড়াইয়া পাতায় পরিণত করিয়াছে; একটি ফুল-কাটা সায়া ও জরির কাজ-করা মইয়ের উপর কস্তাপাড় শাড়ীখানিকে নব্যধরণে ঘুরাইয়া পরিয়াছে। দেহে অলঙ্কার বাহুল্য নাই; হাতে দুইগাছি চুড়ী; কাণে দুইটা ফুল; নাকে একটা হীরার নাক-ছাবি। নলিনীর দক্ষিণ-ললাটে একটি জল-পটি। বিগত যাত্রের এক দুঃখময় ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে।

রামলাল ধুনুচিতে টিকা ধরাইয়া ধুনা দিয়া গেল। নলিনী সোফায় বসিয়া বামহস্তে একখানি উপন্যাস ধরিয়া পড়িতে লাগিল; ডানহাতে তালপাতার পাখা নাড়িয়া ধুনুচির ধোঁয়া ঘরময় উড়াইয়া দিল। নলিনী পাঠে মগ্ন ছিল, ঘর যে ধুঁয়ায় ভরিয়া গিয়াছে, তা সে দেখে নাই; চোখ দু'টা জ্বালা করিতে, মুখ তুলিয়া ঘরের অবস্থাটা দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দক্ষিণ দিকের জানালা দু'টা খুলিয়া দিল।

শেষের জানালাটি খুলিতেই নলিনী অন্ধের দৃষ্টিলাভের মত স্তব্ধ হইয়া গেল। এ কোন্ স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলিয়া তাহার চক্ষু দু'টাকে ধাঁধাইয়া দিল!

পাশের বাড়ীটার একটি সুসজ্জিত কক্ষে এক সুখী-দম্পতীর প্রণয়-লীলা চলিতেছিল। একটি উনিশ কুড়ি বছরের সুন্দরী যুবতী খাটের উপর অর্দ্ধশায়িত ভাবে শুইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে; আর মাটিতে বসিয়া সুদর্শন একটি যুবা অনিমেষে তাহার মুখের পানে চাহিয়া যেন বিশ্বের মধু নিঃশেষ করিয়া লইতেছে। নলিনী ভুলিয়া গেল যে এদিকের জানালাটি জন্মে কখনও খোলা হয় নাই; তাহার মা মৃত্যুর পূর্বে বারবার করিয়া মানা করিয়া দিয়াছিল; আজ সেকথা তাহার মনে ছিল না। ভুলিয়া গিয়া নলিনী প্রস্তর মূর্ত্তিটির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

সে ঘরখানির সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। দেওয়ালে-দেওয়ালে তার ছবি, আর্শি, ব্রাকেটে পুতুল, মূর্ত্তি, ফোটোগ্রাফ; কড়িতে কড়িতে আলোর স্তবক; খাটের চারিধার বেড়িয়া ঝুমকা-লতার মত থরে থরে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; ফুলগুলি কিছু ম্লান, শুষ্ক। নলিনী দেখিয়াই বুঝিল, সন্ধ্যায় ইহারা সদ্যঃ ফোটা, সুন্দর ছিল; নিশাজাগরণে তাহাদের অম্লান সৌন্দর্য্য হ্রাস পাইয়াছে। নলিনী নয়ন ফিরাইতে পারিল না।

কিয়ৎকাল কাটিয়া গেল। হাস্যমুখী যুবতী কথা কহিল —আচ্ছা, এ তোমার কি পাগলামো—বলত! বলছি উঠে এসে বোস, তা নয়, মাটীতে বসে ছিঃ!—যুবতী তাহার শুভ্র-নিটোল হাতখানি বাড়াইয়া যুবকের হাত ধরিল। যুবকের তন্ময়তা তাহাতেও ভাঙ্গিল না দেখিয়া, যুবতী উঠিয়া বসিয়া যুবকের মুখখানি তুলিয়া ধরিল, গণ্ডে একটি চুম্বন করিয়া বলিল—ছিঃ, ওতে যে আমার অপরাধ হয়! ওঠ!

যুবক হাসিয়া বলিলেন—অপরাধ কিসের রুক্মিণী?

কিসের কি গো! মা গো, আমি রইলুম উপুরে বসে, আর তুমি থাকবে নীচে! অপরাধ হবে না!

আচ্ছা, ঐদিকে দেখ-দেখি!—বলিয়া যুবক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে এদিকের দেওয়াল দেখাইয়া দিলেন।

রুক্মিণী হাসিয়া বলিল—ওঁরা যে দেবতা! ওঁরা যা করিবেন, মানুষের কি তা সাজে গা! উঠে এস।

আমার যে উঠতে ইচ্ছা হয় না রুক্মা। যুগ যুগান্ত এমনি ধারা করে' তোমার পায়ের নীচে বসে তোমার মুখ দেখেই কাটিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়।

রুক্মিণী এবার কৃত্রিম কোপের সহিত বলিয়া উঠিল—না বাবু এমন ধারা কর যদি ত তুমি কাল থেকে আপিস বেরিয়ো। ও আমার ভাল লাগে না।

প্রেমের কলহ, প্রেমের ক্রোধ, কিন্তু যুবকের মুখখানি তাহাতেই ম্লান হইয়া আসিল; চক্ষু দু'টি যেন ছলছলে হইয়া উঠিল। যুবক অভিমানভরা কণ্ঠে কহিলেন—আমি বাড়ী না থাকলেই তুমি ভাল থাক রুক্মা?

রুক্মিণী প্রিয়তমের করুণ কণ্ঠস্বরে ব্যথা পাইয়া নামিয়া আসিয়া দুহাতে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তা ত থাকিই গো!—যুবতী মুখে এই কথা বলিল বটে! কিন্তু সে-যে থাকিতে পারে না, এক মুহূর্ত্তের অদর্শনও যে তাহার পক্ষে অসহ্য হয়—তাহা তাহার সমস্ত অন্তঃকরণটাই বলিয়া উঠিল। রুক্মিণী প্রিয়মুখ চুম্বন করিয়া বলিল—নিজেও পাগল হবে, আমাকেও পাগল করবে তবে ছাড়বে! আচ্ছা সত্যিই যদি তোমায় আপিস আদালত করতে হো'ত—কি করতে?

যুবক হাসিয়া বলিলেন—আপিস পালাতুম!

কি খেতে?

চন্দ্রের সুধা।

সে আবার কিগো!...

দেখাচ্ছি—বলিয়া যুবক মুখোত্তোলন করিয়াছেন, ঝি পর্দাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল—মা চা'র জল হয়েছে।

যাচ্ছি আমি, তুই যা—বলিয়া রুক্মিণী দাঁড়াইয়া উঠিল। যুবক তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—চন্দ্রের সুধা...

সে পরে হবে'খন, চায়ের সুধা ত এখন পান করবে এস!—দু'টি যেন বেলাপহত-সমুদ্র-তরঙ্গ. বেলায় পড়িয়া, মিশাইয়া গেল।

নলিনীর চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া আসিল; কপালের ক্ষতস্থানটা টন টন করিয়া উঠিল; মনে হইল রাত্রের মত আবার বুঝি রক্তক্ষরণ হইতেছে, সে ভীষণ দৃশ্যের কথা মনে পড়িতে নলিনীর মাথাটা ঘুরিয়া গেল; দুহাতে কপালটাকে চাপিয়া ধরিয়া ত্রস্তপদে নলিনী সোফার হাতায় মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল।

কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের জন্য! পরমুহূর্ত্তেই কিছুক্ষণ আগের দেখা দম্পতির দাম্পত্যচিত্রখানি নলিনীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়পটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অজ্ঞাতে নলিনীর পা দুখানি তাহাকে আবার সেই জানালার কাছে লইয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ শব্দ হইল—বৌদি!

বেগাহত অশ্বিনীর ন্যায় নলিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল। স্বপ্ন, মোহ, মাধুর্য্য, নিমেষে সব টুটিয়া গেল। নলিনী ফিরিয়া আসিয়া সোফায় বসিতে বসিতে বলিল—বস ঠাকুরপো!

"কপালটা কেমন আছে বৌদি?"

"কি জানি কেমন আছে, বোধ হয় সেরে গেছে!"

"একটুর জন্যে বৌদি, কি-কাণ্ডটাই হল বলুন ত! জানেনই ত রাগি মানুষ অত-করে বলছে, গেলাসটা মুখে ঠেকিয়ে নামিয়ে রাখলেই ত হত। যাক্, বোধ হয় অনুতাপ হয়েছে, আমায় বলে পাঠালেন তোমায় বলতে—রান্নাবাড়া এইখানেই কর, আজ খাবেন।"

এই প্রস্তাবে ও বিগত রাত্রের দুঃখময় কাহিনী স্মরণে নলিনীর আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। বলিল—আজ এখানে কি করে হবে ঠাকুরপো? বাড়ীতে মিস্ত্রি লেগেছে, কোথায় কি হয় ঠিক নেই।

"মিস্ত্রী লেগেছে বুঝি?"

"নইলে এ ঘরে আসব কেন?"

"তা'হলে কি বলবো?"

নলিনী এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল; তারপর বলিল—না ভাই কাজ নেই, যাহয় করে করবই এখন।

'তা হ'লে আমি এখন যাই। সেই সময় বাবুর সঙ্গে আসবো অখন।"

"তুমিও খাবে ঠাকুরপো'?

"আচ্ছা" বলিয়া লোকটী চলিয়া গেল।

হায় রে পোড়া পেট! এই পেটের জন্য ইচ্ছা নাই, অনিচ্ছা নাই, প্রবৃত্তি নাই, অপ্রবৃত্তি নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, কি লাঞ্ছনা, কি অত্যাচারই না সহ্য করতে হয়! কাল সারা রাত্রি জাগরণ-ক্লান্ত দেহটাকে বিশ্রাম দিতেই বদ্ধ-পরিকর ছিল কিন্তু হায়, এই পোড়া পেট যাহার অনুগ্রহ-দত্ত অর্থে চলিতেছে তাহার বিরাগ ভাজনের ভয়েই কাতর, ক্লিষ্ট দেহটাকে আবার কার্য্যক্ষম করিয়া লইতে হইতেছে। হায়, এপোড়া পেটের ভাবনাটা যদি না থাকিত!

রান্নাবান্নার আয়োজন করিতে নলিনী উঠিয়া পড়িল। যাইবার আগেই একবার সেই জানালাটার সম্মুখে না আসিয়া পারিল না; যুবক ডান হাতে সেলফ-সেভিং ক্ষুরখানি ধরিয়া হাস্যমুখে বসিয়া আছেন; রুক্মিণী সাবানের তুলিটী তাহার গালের উপর ধীরে ধীরে বুলাইয়া দিতেছে।

নলিনী ক্ষিপ্রপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

(২)

রান্নাবান্নার ফাঁকে ফাঁকে নলিনীর মনটা কেবলই সেই জানালার ধারে ধারে আসিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছিল। কিন্তু নির্ম্মল আকাশের চন্দ্রালোক যেমন মাদকতা আনে, পাশের সেই গৃহস্থ বাড়ীর সেই দৃশ্যটা তেমনিই নলিনীর মনে মত্ততার সৃষ্টি করিতেছিল। কোথা ছিল এতদিন এ নয়নাভিরাম দৃশ্য! কোথা ছিল অজানা এ স্বর্গ-রাজ্য রে! নলিনী সব ভুলিয়া ইহারই চিন্তায় মাতিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সব ভুলিয়া, সব ফেলিয়া ঐ সুখ-স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে পড়িয়া পড়িয়াই তাহার এ অবহ জীবনটির যবনিকা ফেলিয়া দেয়। আজ তাহার মন চাহিল, চক্ষু মুদিয়া কেবলই তাহাদের কথা ভাবে, যাহারা আজ তার অন্ধ চক্ষের দৃষ্টি খুলিয়া দিয়াছে; পাষাণ-চাপা বাসনা রাশির দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কি সুখী ঐ দম্পতী!

নীচে অনেকগুলা লোকের পদশব্দ শ্রুত হইল; নলিনীর বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। নারকী সে, স্বর্গ-চিন্তার সুযোগ তার মিলিবে কোথা হইতে! নলিনী দাঁড়াইয়া উঠিল। ভাঙ্গা বুক আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল, সমস্ত দেহ যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল কিন্তু মুখের হাসিটি নলিনীর ঘুচিল না। এই হাসিই যে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্য, বিক্রেয়, ইহার অভাব হইলে তাহার জীবনেরও অবসান ঘটিবে যে! নলিনী হাসিমুখে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

দেহের খরিদ্দার মনের খবর রাখে না। তাহারা নিজ মনেই মদ ঢালিল, খাইল, গ্লাস ভরিয়া নলিনীর হাতে দিল; নলিনী গ্লাসটা না লইয়া বলিল—আমাকে আজ মাপ কর, আমার শরীর ভাল নেই।

নলিনীর বাবু বিশাল দেহখানি তাকিয়ায় হেলাইয়া দিয়া ভ্রুকুটি কুটিলমুখে বলিল—কি হয়েছে কি?

নলিনী বলিল—অসুখ করেছে।

অসুখটা কি শুনি?

আঘাতকারীর মুখে এ প্রশ্ন শুনিয়া নলিনীর অঙ্গ জলিয়া উঠিল; শুনে কি হ'বে?—রুক্ষস্বরে কথাটা বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাবু এতখানি উপেক্ষা সহিতে পারিল না; গরম হইয়া উঠিল; অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া একজন পার্শ্বচরের পানে চাহিল। এতখানি অপমান কি-ভাবে সহ্য করবে সে-যেন ভাবিয়াই পাইতেছিল না।

পার্শ্বচর তাহার দৃষ্টি অবহেলা করিয়াই বাহির হইয়া গেল; দুই মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—আছে।

বাবু স-পারিষদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কেহ বোতল লইল, সোডা লইল, সিগারেটের কৌটা লইল, ছড়ি জুতায় তৈরী হইয়া, বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বাবু বলিলেন—অসুখ করেছে, শুয়ে থাক, আমরা চল্লুম, প্রভার ঘরে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করব।

নলিনী কাঠের মত শক্ত হইয়া বলিল যাও।

বাবু এ-কথাতে আরও গরম হইয়া উঠিল; বলিল—বটে রে হারামজাদি! বড্ড মেজাজ হয়েছে যে দেখছি। আচ্ছা দেখা যাবে, কতদিন থাকে এ গুমোর।

পারিষদবর্গ বাহির হইয়া গেল। বাবু জুতা পরিতেছে, নলিনী তাহার সামনে আসিয়া বলিল—যাও, কিন্তু আর আসতে পাবে না।

আর আসব না।

বেশ। বলিয়া নলিনী শয্যায় ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল।

বাবু তখনি আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল—মনে থাকে যেন, এ মাসের একটী পয়সাও পাবে না।

এ-মাসের পাব না কেন? আজ ত মাসের ২৭শে। ২৬ দিনের টাকা আমার পাওনা। কালও তোমার অত্যাচার সইছি,—নলিনী তাহার কপালের ক্ষতস্থানটা দেখাইল। কাল রাত্রে সে মদ খাইতে চাহে নাই, বাবু গ্লাস ছুড়িয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল; নলিনীর বরাত ভাল বলিতে হইবে, আর একটু এ-দিক ওদিকে লাগিলেই প্রাণান্ত হইত!

একটি পয়সা আর নয়।—বলিয়া বাবু চলিয়া গেল।

চুলায় যাক্ তোমার পয়সা—নলিনী শয্যায় মুখ ঢাকিল।

প্রায় তিনশত টাকা! কিন্তু নলিনী তার জন্য দুঃখ করিল না; কষ্ট অনুভব করিল না। আশ্চর্য্য, অথচ এই টাকার জন্য অভাগিনী না করিয়াছে কি? জীবনকে জীবন মনে করে নাই; দেহকে দেহ বলিয়া ভাবে নাই; পাপ পুণ্য ছিল না; ন্যায়-অন্যায় বুঝিত না; ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার-রহিত হইয়া এই টাকার জন্যই জ্ঞান হওয়াবধি ছুটাছুটি করিয়াছে সে! আর আজ! এতগুলা টাকা পাইবে না, নিশ্চিত পাইবে না জানিয়াও নলিনী এতটুকু দুঃখিত হইল না। হয়ত এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারিবে না; বিশেষ করিয়া রূপব্যবসায়িনীরা ভাবিবেন, এ নিতান্তই গল্প কথা; নিতান্তই অসার, মূল্যহীন। কিন্তু এ সত্য-কথা! অর্থের চেয়ে বড় সম্পৎ কিছু একটা নলিনী পাইয়াছিল; অলঙ্কার বস্ত্র, আসবাব—তার চেয়েও মূল্যবান সামগ্রী তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; মদের চেয়েও মাদকতাপূর্ণ; নেশার চেয়েও আবেশময় অমৃতের সন্ধান নলিনী পাইয়াছিল। মরুভূমে মরীচিকা-মত, অন্ধকার রাত্রে আলেয়ার আলোর মত সে অমৃত-উৎস নলিনীকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতেছিল। মদ না খাইয়া মাতাল; নেশা না করিয়া আবেশময় রঙীন চোখে নলিনী শয্যা ছাড়িয়া উঠিল। কম্পিত মৃদু হস্তে জানালাটা খুলিয়া দিয়া, দাঁড়াইল।

আহা রে! এ কি দৃশ্য! নলিনীর দেহখানি কাঁপিয়া উঠিল; সে দেওয়ালটা ধরিয়া দাঁড়াইল।

ঘুমঘোরে অচেতন দুইটি দেহ কিন্তু অভিন্ন। নিদ্রার ঘোরেও তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে দূরে নয়, অতি নিকটে, আত্মায়-আত্মায় নিগূঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া তাহারা নিদ্রাসুখমগ্ন। মুখে তৃপ্তির অসামান্য ঔজ্জ্বল্য, মুদ্রিত নেত্র-পল্লবে স্থির শান্তি বিরাজিত, দুইখানি সুকোমল দেহে যেন প্রেম-জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িয়া এক স্বপ্নময়, কুহকময়, মায়াময় রাজ্যের সৃষ্টি করিতেছে। নলিনী আর দেখিতে পারিল না; এতসুখ, এত শান্তি যে এ কঠিন ধরার বুকের উপর এমন করিয়া বর্ষার ধারার মত অবিরল ধারেও বহিতে পারে, ইহা যেন তাহার মস্তিষ্ক কল্পনা, ধারণাই করিতে পারিল না। নলিনী জানালাটা বন্ধ করিতে যাইবে, পিছন হইতে তাহার বাবু আসিয়া পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। নলিনীর হাত কাঁপিয়া গেল। তবু সে দুইহাতে জানালাটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিল।

বাবু বলিল—খোল-না সুন্দরী! আমরাও না হয় একটু দেখলুম।

কি দেখবে?

তুমি যা দেখছিলে।

আমি!...

হ্যাগো হ্যা তুমি! বলি, শিকার জুটেছে না-কি?

নলিনীর মাথায় আগুন জ্বলিল; সে আগুনের ঝাঁজ তাহার জিভেও আসিয়া পৌঁছিল। নলিনী অগ্নিতেজে বলিয়া উঠিল ভদ্রলোকের বাড়ী!

বাবু বলিল—তোমাদের শিকার—ছোটলোকের বাড়ীতে জোটে কখনও! খোল, খোল, দেখি-না শিকারটি কেমন! বাবু নলিনীর হাতের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া জানালাটি খুলিতে গেল। নলিনী বুক দিয়া জানালাটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এ আমি কিছুতেই খুলতে দোব না।

দেবে না?

না।

তবে রে

নলিনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—আমায়

কেন তুমি আমার ঘরে ঢুকেছ? শীগ্গির বেরিয়ে যাও, নইলে আমি চেঁচিয়ে পাশের বাড়ীর লোক ডাকব।

লোক আমার কি করবে!—বাবু ভীষণ জোরে হাস্য করিতে লাগিল।

কি করবে তখন বুঝবে! আমার মায়ের বাবুকে ওরাই কেটে ফেলেছিল, চেঁচামেচি করার জন্যে। তাই ও জানালা বন্ধ থাকে!

বাবু ভয় পাইয়া জানালা ছাড়িয়া দিল।

নলিনী ছিটকিনীটি বন্ধ করিয়া দিয়া, এদিকে ফিরিয়া বলিল—আবার তুমি এখানে কেন!

বাবু করুণকণ্ঠে বলিল—রাগ করছ কেন নলিনী...

নলিনী দৃপ্তকণ্ঠে বলিল—রাগ নয়।

তবে?

তবেও কিছু নেই আর;—নলিনী নেই!

বাবু দু'হাত বাড়াইয়া নলিনীকে ধরিতে গেল; বলিল—এই যে আমার নলিনী!

তুমি যাবে না ত! দেখবে?—তাহার চোখ মুখ দিয়া আগুন ছুটিতেছিল। একমাত্র হত্যাকারীর মুখ-চোখের চেহারা সেইরকম দেখা যায়।

নলিনী বলিল—খবর্দার! আমার নাম ধরে ডেকো না। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—বলিয়া সে দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—যাও!

বাবু দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করিল না। বাহির হইয়া গেল।

নলিনী দ্বারটি বন্ধ করিয়া আবার সেই জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল; তারপর ধীরে ধীরে জানালা খুলিয়া দিল।

কোথাকার কোন্ শারদ-আকাশের এক ঝলক জ্যোৎস্না, কোন্ ফেনিল সমুদ্রের একটা উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ নলিনীর হৃদয়তট আলোকিত করিয়া তুলিল, ভাসাইয়া দিল। নলিনী নিশ্চল মূর্ত্তিটির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বামী নিদ্রাঘোরে অচেতন, মেয়েটি একখানি পশমের ঝালর দেওয়া পাখা লইয়া বীজন করিতেছে। সেবা, স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা যেন মেয়েটির সুকোমল দেহ লতাটি জড়াইয়া রহিয়াছে। অসীম একাগ্রতা তাহার আননে, নিরলস হাতখানি স্নেহ-রসে সঞ্চালিত; চোখ দুটি হইতে কোমলতা যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। কি সুন্দর! এতখানি রাত হইয়াছে, স্বামী নিদ্রিত, তবুও মেয়েটির চোখে ঘুম নাই; একটুখানি আলস্য-ও নাই—কি সুন্দর!

আরও আশ্চর্য্য এই, নেটের মশারির উপরেই রৌপ্যসম শুভ্র ফলক বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক পাখা ঝুলিতেছে; সেখানিকে না চালাইয়া, মেয়েটি জাগিয়া বসিয়া পাখা করিতেছে কেন? পাখাটি কি খারাপ হইয়াছে? তাই যদি হইয়া থাকে, স্বামী ত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এখন ত মেয়েটি শুইলেই শুইতে পারে! এখন পাখা করার আর কি দরকার!

দরকার থাক্ আর নাই থাক্, নলিনী চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। এই অনাবশ্যক কর্ম্মের মধ্যে নারীর যে নারীত্ব, কমনীয়ত্ব, হৃদয়ালুতা ফুটিয়া ছিল, তাহা অল্পে-অল্পে নলিনীর হৃদয় মনে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। এতখানি নিষ্ঠা, একাগ্রতা, তন্ময়তা নারী-হৃদয়ের যে সুগভীর পরিচয় দিতেছে, নলিনী সে পরিচয়ে যেন একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল।

মেয়েটি পাখাখানিকে টিপয়ের উপর রাখিয়া শয্যা ত্যাগ করিল; দেওয়ালের গায়ের সুইচ টিপিয়া বড় আলোটা নিবাইয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সবুজ রঙের আলো জ্বলিয়া উঠিয়া, ঘর খানিকে যেন স্বপ্নময় করিয়া তুলিল। তারপরেই একটা সোঁ সোঁ ধ্বনি উত্থিত হইল। নলিনী চাহিয়া দেখিল, মশারীর উপরের পাখাখানি ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেয়েটি আলনার কাছে দাঁড়াইয়া জামাটি খুলিয়া, আলনায় টাঙ্গাইয়া রাখিল, কুঁজা কাৎ করিয়া কাচের গ্লাসে জল ঢালিয়া, পান করিল, ধীর পাদক্ষেপে শয্যায় প্রবেশ করিল।

বর্ষার জ্যোৎস্না-টি যেমন পৃথিবীকে এক আধ-আলো আধ-আঁধারের মায়ায় ঘিরিয়া রাখে, দম্পতীর ঘরটিও তেমনি এক মায়ায় ঘিরিয়া ফেলিল। স্বল্প নীলালোকে খাটখানি, মশারিটি, শয্যাশায়িত দম্পতীর নিদ্রালস স্থিরমূর্ত্তি দুইটি—সব যেন মায়া! সব যেন স্বপ্ন!—নলিনী জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। মানুষের শয়ন-কক্ষ এত সুন্দর, মানুষের জীবন

এমন স্বপ্নময় ও হয়! নলিনী চমকিয়া উঠিল, তাহার চোখে জল! ওরে তার কঠিন, কঠোর দেহের চক্ষু দু'টো, তোদের মধ্যেও জল ছিল! এযে অসম্ভব কাণ্ড!—কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যাশ্রয় করিয়া নলিনী চক্ষু মুছিল, চক্ষু মুদিল।

পরদিন রাজমিস্ত্রি টাকা চাইতে আসিল; মজুরের রোজ মিটাইবে। নলিনী ফর্দ আনিতে বলিল। মিস্ত্রি ফর্দ আনিয়াছিল, ফর্দ দেখিয়া নলিনী বলিল—দু'টো ঘর কলি ফিরিয়েছ যোটে, তারই জন্ম এত!

মিস্ত্রি বাজারে জিনিষপত্র কিরূপ মহার্ঘ্য হইয়াছে, আগে যে জিনিষের দাম ছিল দুই পয়সা, তাহাই এখন দুই আনা মূল্যে বিকাইতেছে, সে আজ বিশ ত্রিশ বৎসর এই কর্ম করিতেছে, এমন 'অরাজকতা' জীবনে দেখে নাই, প্রভৃতি বলিয়া গৃহ-স্বামিনীর বিশ্বাস-জন্মাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

নলিনী বলিল—আর কাজ করে তোমাদের দরকার নেই, যাও।

মিস্ত্রি কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর যতরকমে পারিল, নিজপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিল; নলিনী বলিল—না,না,আর আমার বাড়ী সারাবার দরকার নেই।—বলিয়া সে চাকরকে ডাকিয়া একখানা একশ' টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া মিস্ত্রির প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে বলিয়া, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ঝি অনেকক্ষণ ঠেলাঠেলি করিয়া দ্বার খোলা পাইয়া বলিল—তোমার ঘর ত ঠিক হয়ে গেছে মা; বল ত জিনিষ-পত্তর সব তুলে গুছিয়ে নিই।

নলিনী এই অনাবশ্যক প্রশ্নের জন্ম এত তাগিদের অর্থ নির্ণয় করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইল; বলিল—একটা কাজও কি বাছা নিজে থেকে তোমাদের করতে নেই! সব আমাকে বলে দিতে হ'বে, তবে হবে!

কথাগুলা খুব সামান্ত কিন্তু এমন ভাবে ও স্বরে উচ্চারিত হইল যে ঝি মাগী তাহাতে ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারিল না। মৃদুকণ্ঠে দুঃখটাকে প্রকাশ করিতে করিতে প্রস্থান করিতেই, নলিনী জানালাটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। খুলিবে কি খুলিবে না ভাবিতে ভাবিতে তাহার হাত বদ্ধ জানালার অর্গল স্পর্শ করিল; পরমুহূর্ত্তেই জানালা খুলিয়া গেল।

বা রে! এ আবার কি অভিনয়! একপিঠ এলোচুলে, রাঙা পাড় গরদের সাটী পরিধানে, গললগ্ন বাসে মেয়েটি একরাশ ফুল লইয়া তাহার স্বামীর পা পূজা করিতেছে। স্বামীর মুখখানি নলিনী স্পষ্ট দেখিতে পাইল, বধূটির মুখ অন্তদিকে ছিল, দেখিতে পাইল না। তাহার বাহুদুইটির অবস্থান দেখিয়াই নলিনী বুঝিতে পারিল, স্বামীর পা দু'খানি তাহার কোলের উপরে আছে, হাতের দুইমুষ্টির পুষ্পরাশি সেইখানেই উৎসৃষ্ট হইবার প্রতীক্ষা করিতেছে। এ কি অসম্ভব ছেলেমানুষী ছেলে-খেলা ইহারা করিতেছে! স্ত্রী স্বামীর পা পূজা করে—নলিনী এ সংবাদ জানে। কিন্তু এমন আড়ম্বর করিয়া ফুল-জল লইয়া যে কোন মেয়ে এমন অভিনয় করিতে পারে—তাহা সে ধারণাতেও আনিতে পারিত না। সে জানিত, সে পূজা হয় হৃদয়-বনের কুসুম-অর্ঘ্যে, বাহিরে তাহার অভিনয় হয় না; কিন্তু ইহাদের সবই বিপরীত!

হঠাৎ যুবকের অসীম বিশ্বাস-ভরা স্থির ধীর মুখখানি, তাহার আনত, স্নেহ-ভরা দৃষ্টি নলিনীর চোখে পড়িয়া গেল। যুবক যেন বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান হারাইয়া ঐ পূজা গ্রহণেই মগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার চোখ দু'টি পূজারিণীর ভক্তি-বিকম্পিত হাত দু'খানি ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছে না—একি অভিনয়! না, অভিনয় এ হইতেই পারে না! এত প্রাণ, এত সজীবতা অভিনয়ে সম্ভবে না! নলিনী স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল, মাটীর দেবতার পায়ে উৎসৃষ্ট ভক্তের প্রদত্ত কুসুমরাশি দেবতা যেমন কেবলমাত্র চক্ষু দ্বারাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, এই জাগ্রত দেবতাটিও ভক্ত-নিবেদিত পুষ্প তেমনি চোখের দৃষ্টিতেই গ্রহণ করিলেন; মেয়েটিও পূজা সাঙ্গ করিয়া পাথরের দেবতার পায়ে নত হইয়া প্রণাম করিয়া, পদধূলি মস্তকে, জিহ্বায় ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, দেবতা নীরব, নিশ্চল, পাষাণবৎ। তারপর মেয়েটি ফুলগুলি কুড়াইয়া লইয়া ক্ষণেকের তরে কোথায় চলিয়া গেল, একঘটি জল লইয়া ফিরিয়া স্বামীর পা দু'খানি ধোয়াইয়া আলুলায়িত

কেশপাশে মুছাইয়া দিল; স্বহস্তে মখমলের চটিজুতাটি আনিয়া পরাইয়া দিল,—পাষাণ যেন প্রাণ পাইল, স্বামী দু'হাতে প্রিয়াকে বুকে টানিয়া তাহার মুখে, তাহার চোখে, তাহার মাথায় অজস্র চুম্বন করিলেন। প্রিয়তমাও প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করিল না।

সামনের টেবিলে খাবার সাজান ছিল, দু'জনে এক সঙ্গে খাইতে বসিল, যে খাবার ছিল, তাহা খাইতে দুইটা প্রাণীর দশটা মিনিট সময়ও লাগিবার কথা নয় কিন্তু তাহারা সেই খাবারই এক ঘণ্টা ধরিয়া খাইল—পাণ চিবাইতে চিবাইতে সোফায় আসিয়া বসিল!

ইহারা কে গো! দিন রাত্রি এমন মুখোমুখী করিয়া থাকে কি করিয়া গো! এক দণ্ড কেহ যেন অন্য দিকে চাহিতে চায় না, চাহিতে পারে না! কপোত কপোতীকেও যে হার মানাইল দেখি! এ কি মানুষে পারে! বিধাতা ইহাদের কি গড়িয়াছেন, হায় গো! এমন সৃষ্টি ছাড়া নর-নারী কেহ কখন কোথাও দেখিয়াছে কি! নলিনী আশ্চর্য্য হইয়া যায় যে ভালও ত লাগে ছাই! দিন নাই রাত নাই, সকাল-নাই, সন্ধ্যা নাই, কর্ম্ম নাই, অবসর নাই, বিরাম নাই, অবসাদ নাই--এমন করিয়া থাকিতে মানুষে পারে? ক্ষেপিয়া যায় না? পাগল হইয়া উঠে না—অবাক!

ঝি খবর দিল, নলিনীর ঘরের পাখা-বাতির তার জোড়া দিতে হইবে, ইলেক্‌ট্রি মিস্ত্রির দরকার, হুকুম পাইলে সে বিডিন ষ্ট্রিটে যাইয়া ব্যবস্থা করিয়া আসে। নলিনী হাঁ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া ছিল; বলিল—মিস্ত্রি কি হবে?

ঝি বক্তব্য পুনরাবৃত্ত করিল।

নলিনী—ও—বলিয়া ওদিকে ফিরিতে আবার সেই দৃশ্য দেখিল, ঝিকে বলিল—ও ঘরে দরকার নেই, আমি এই ঘরেই থাকব ঝি!

এই ঘরে! ম্যাগো...

নলিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিল—তোদের কাছে ম্যাগো হতে পারে, এ ঘর আমার মার ঘর—তা জানিস্, ম্যাগো নয়!

আমি কি আর মোদের জন্যে কিছু বলছি বাছা! এই ঘরে তোমার বাবু বসবে কেন?

নলিনী জিজ্ঞাসিল—বসবে না?

তুমি যে অবাক করলে মা! এই নোংরা ঘরে আবার কেউ বসে!

তুই আমায় বাঁচালি ঝি!

ঝি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল; নলিনী তাহা বুঝিয়া, একটু হাসিল; দুই পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল আর বাবু না আসাই ভাল ঝি! এইবার মনের আনন্দে একটু ধর্ম্মে কর্ম্মে মন দিতে পারা যাবে!

তাহাদের জীবনের ইহাই যে স্বাভাবিক গতি, তাহা ঝি ভালরূপেই জানিত, তাহার মত দরিদ্রের কথা স্বতন্ত্র, পাণের দোকান অথবা লোকের বাড়ীতে পরিচারিকার কাজ ইহাই পেশা হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু দিনকাল থাকিতে যাহারা দুই পয়সা করিতে পারিয়াছে এবং বহুবিধ উপসর্গের হাত এড়াইয়া সেটাকে জমাইয়া রাখিতে পারিয়াছে তাহারা শেষ বয়সে পরমোৎসাহে ধর্ম্ম-কার্য্যেই তৎপর হইয়া উঠে। সারা জীবনের পাপ-মহাপাপ শেষের সামান্য কয়টা দিনে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার আগ্রহ অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠে! কিন্তু নলিনীর কি এখনি সে 'শেষ সময়' আসিয়াছে গা? এখনই যে তাহার জীবনের, যৌবনের দীপ্ত মধ্যাহ্নকাল!

ঝি দুই দণ্ড অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল—অবাক করলে বাছা তুমি! এই কি তোমার ধম্মো করার সময়?

নলিনী সন্তুষ্টচিত্তে কহিল-ধর্ম্ম কর্ম্মের কি সময় অসময় আছে ঝি!

ঝির মুখখানি অসম্ভব রকমের গম্ভীর ও ম্লান হইয়া উঠিতে দেখিয়া নলিনী সান্ত্বনার স্বরে বলিল—তুই ভাবিস্ নে ঝি, বৃন্দাবনে আমি যাব না, ঘরেই থাকব।

এ সংবাদে ঝি আশ্বস্ত হইল কি-না বুঝা গেল না, বলিল—উনুনে আগুন দিয়েছি; রান্নাবান্না কি হবে?

আমি যাচ্ছি তুই যা!—বলিয়া নলিনী জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল; জানালা খোলাই ছিল, নলিনী তাহাতে চক্ষু রাখিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! কেহই নাই! আজই এই-প্রথম নলিনী এই দম্পতীকে ঘর ছাড়া দেখিতে পাইল। ইহাতে কেন গ্লানি না নলিনীর

মনটি যেন আনন্দিত হইল। মেঘমুক্ত চন্দ্রমার মত তাহার মুখখানি হসিত হইয়া উঠিল। আস্তে আস্তে জানালাটি বন্ধ করিয়া সে পাকশালায় চলিয়া গেল।

পরের সুখ পরমানন্দে সহিতে অনেকেই পারে না। নলিনী বোধ হয় তাহাদেরই—একজন।

(৪)

তাহার এক মাসী ছিলেন। তাঁহার পূর্বকালের সহিত আমাদের পরিচয় নাই, উত্তরকালে তিনি গলায় তুলসীর মালা, হাতে ঝুলি ও অঙ্গে নামাবলী ধরিয়া পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন এবং একখানি বড় বাড়ী লইয়া বাড়ীওয়ালী হইয়া বসিয়াছেন। তিনি এবং নলিনী উভয়েই জানিতেন তাঁহার যথাসর্বস্বের উত্তরাধিকারী নলিনীই। তাই তিনি সময়ে অসময়ে নলিনীকে শাসন করিতে আসিতেন; নলিনীও তাঁহাকে ভক্তিতে না না হৌক, ভয়ে মানিয়া চলিত। তিনি আসিলেই যতক্ষণ না যান্, নলিনী সন্ত্রস্ত থাকিত।

আজ তেমনি একটা দিন।

আজ বাড়ীতে পা দিয়াই মাসী উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধরিলেন। নলিনীর মতিগতির পৃষ্ঠে সহস্র সম্মার্জনীর আঘাত করিয়া যদি এখনি নলিনী তাহার শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া গিয়া বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া পত্র লিখিয়া আসিতে অনুরোধ না জানায় তবে একটা কুরুক্ষেত্রের আশু সম্ভাবনা জানাইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া অলস-ক্ষণে গজরাজের মত অনাবশ্যক ভাবে অঙ্গ দুলাইতে লাগিলেন। নলিনী শ্রান্ত ছিল, প্রতিবাদ করিতে পারিল না। মাসী কি কি লিখিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন। অগত্যা নলিনী চিঠি লিখিল, ভাষা মাসীর মনের মত না হইলেও মাসী চিঠি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও চিঠিখানি লইয়া আবার কাল আসিবার সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন। বাবুই যে মাসীকে সুপারিশ ধরিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা নলিনী অনেক আগেই বুঝিয়াছিল। লোকটার উপর ঘৃণা তাহার আরও বাড়িয়া গেল। তাহার নিষ্করুণ আচরণ, তাহার প্রাণহীন ভালবাসা, ইন্দ্রিয়-সুখ-সর্বস্ব-প্রেম—নলিনীর কাছে একেবারে বিষের মত বোধ হইতে লাগিল। নিজের হাতে চিঠি লিখিয়াছে, সেই চিঠি লইয়া সে যখন আসিয়া দাঁড়াইবে, নলিনী তাহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, ভাবিতেই তাহার গা রি রি করিয়া উঠিল। এই কক্ষে, এই শয্যায়, এই বাহুর বেষ্টনে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, মনে হইতেই সে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিল।

আর কোথাও নয়—সেই ঘরে, সেই জানালার ধারে!

একি গো! এই যে শূন্য বিহারিণী প্রেম-ময়ী আজ ধরায় নামিয়াছে, নলিনীখুসী হইল। মেয়েটি বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে, স্বামী কাছে নাই। নলিনী মনশ্চক্ষে দেখিল, প্রেমের নদীতে, প্রেমের অনুকূল প্রবাহে যে প্রেম-তরণীখানি, প্রেম-পাইলে ভর করিয়া তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, আজ মাটীর জগতের সঙ্গে তাহার সংঘাত লাগিয়া গিয়াছে! নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু ঘটিয়াছে যাহাতে চিরানন্দময়ীর চোখেও বান ডাকিয়াছে! ইহাই ত স্বাভাবিক, এতদিন যে হয় নাই কেন—ইহাই আশ্চর্য্য!

মেয়েটি কান্নার ভিতরেও সচকিত ছিল, জানালা খোলার ক্ষুদ্র শব্দটুকুতে সে চমকিয়া চক্ষু চাহিল, দুইটি রক্তজবা যেন গঙ্গার জলে ভাসিয়া উঠিল। একবার চারিদিক চাহিয়া মেয়েটি আবার হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বালিশে মুখ রাখিল। নলিনীর মনে হইল, আজ পৃথিবীতে তাহার একজন সমদুঃখী জুটিয়াছে। আজ তাহার সমদুঃখী সে—যাহার সুখের অবধি ছিল না, মূর্ত্তিমতী সুখের মত যে নলিনীর সামনে এতোদিন মায়া বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল; যাহার সুখের অপরিমেয় ভর নলিনী সহিতে পারিত না, যাহাকে দেখিলে নলিনীর চক্ষে জল আসিত, বুকের মধ্যে তুফাণ গর্জিয়া উঠিত, যে তাহার চিরদিনের প্রিয় জীবন ধারাকে বিস্বাদ তিক্ত করিয়া দিয়াছিল, যাহার সুখের বাতাস, তৃপ্তির নিশ্বাস নলিনীর সর্ব অঙ্গে বিরক্তি জাগাইয়া দিয়াছিল, সে আজ তাহারই মত ক্রন্দনরতা, সম দুঃখী; সমান ব্যথিত!

মেয়েটি আবার উঠিয়া বসিল, কাপড়ে চক্ষু মুছিল। ক্ষতস্থানে হাত দিলে, রগড়াইলে নূতন করিয়া যেমন পুঁজ রক্ত বাহির হইয়া পড়ে, শুষ্ক চক্ষু হইতে আবার প্রবলবেগে জল গড়াইয়া পড়িল; মেয়েটি পুনরায় চক্ষু মার্জনা করিল, আবার অশ্রু ঝরিল। শয্যা হইতে উঠিয়া সে বুক-কেসের

সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; বহি বাহির করিয়া পড়িতে বসিল, হঠাৎ তাহার মাথাটা পুস্তকের উপর ঢলিয়া পড়িল, বোধহয় চোখের জলে পাতা ভিজিয়া গেল, মেয়েটি বইখানাকে ফেলিয়া দিয়া দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কম্পিত বেতসলতার মত তাহার দেহটি মাটীতে লুটাইয়া পড়িল; কাপড় চোপড়ের দিকে লক্ষ্য নাই, মেয়েটি বিস্রস্ত বসনে সেই খানেই পড়িয়া রহিল।

নলিনীর ইচ্ছা হইতেছিল, মেয়েটিকে ডাকে, ডাকিয়া বলে—ভাই, তোমার আমার সমান দুঃখ, সমান ব্যথা! পুরুষের ব্যবহারই এই, তাহারা কেবল নারীকে কষ্টই দিতে জানে। যতক্ষণ তাহার প্রয়োজন, ততক্ষণ আদর, তারপর বাসি ফুলটির মত ফিরিয়াও চাহে না। তুমি ছেলেমানুষ, কোমল কচি প্রাণ তোমার, তাই তুমি কাঁদ, আমি তাহাদের জন্ম কাঁদি না; তাহারা না আসিলেই আমি ভাল থাকি, সুখী হই! নলিনী কথাকটা বলিবার জন্ম অনেক চেষ্টা করিল, দু'একবার জড়িতকণ্ঠে—ভাই—বলিয়া ডাকিলও কিন্তু সে স্বর জানালার বাহিরে গেল না, কণ্ঠও অধিকতর উচ্চগ্রামে উঠিল না। ব্যর্থকাম হইয়া নলিনী জানালা ছাড়িয়া চলিয়া আসিল।

নীচে কাহার পদশব্দ শোনা গেল,—নলিনী কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ঘৃণায় বিরক্তিতে মনটা তাহার বিদ্রোহ করিয়া উঠিল, নিশ্চয়ই সে আসিতেছে; মাসীর চিঠিখানি হাতে লইয়া, তাহারই চুর্ণীকৃত দর্পে হাসিতে হাসিতে আসিতেছে নলিনী ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল; না!—সে নয়; সেঁকরা। নলিনী অনেকদিন আগে একগাছা বিছা হার সারাইতে দিয়াছিল। ফেরত দিবার ধার্য্য দিনের তিনমাস পরে সেঁকরা তাহাই ফেরত দিতে আসিল। নলিনীর তাহা মনে ছিল না, তাগাদাও সে দেয় নাই, স্বর্ণকার তজ্জন্ম খুসী ছিল। নলিনীর সামনে ওজন করিয়া, বুঝাইয়া দিয়া সেঁকরা চলিয়া গেল। নলিনী হার গাছাকে হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ও বাড়ীতে,—একটি বর্ষিয়সী রমণী আসিয়া মেয়েটির লুণ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়াছে; সস্নেহে, সযত্নে ধীরে ধীরে মেয়েটির গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। বর্ষিয়সী রমণী যে ঐ সুন্দরী যুবতীর আত্মীয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। কি অসীম স্নেহের স্নিগ্ধ ছায়া তাঁহার মুখে; কি অসীম পরিতৃপ্তির ভারে চক্ষুদু'টি আনত। মেয়েটি আর কাঁদিতেছে না, শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া শুইয়া আছে। রমণী যে সকল কথা বলিতেছে, তাহাই নীরবে শ্রবণ করিতেছে।—নলিনীর গা-টা কেমন যেন ছম ছম করিয়া উঠিল। দৃশ্যটা স্বাভাবিক বলিয়া মনে করাও যেন শক্ত বোধ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গেই এই অপরিচিতা সুন্দরীর জন্ম তাহার মনটি কাঁদিয়া উঠিল, নলিনী এই অমঙ্গল চিন্তার স্রোত রুদ্ধ করিতেই জানালা হইতে সরিয়া আসিল।

ঝি খবর দিল—বাবু!

নলিনী বলিল—বসাগে।

যাইব কি—যাইব—না ভাবিতে একমিনিট সময় মাত্র অতিবাহিত করিয়া, নলিনী শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। বাবু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই নলিনী বলিল—আপনি মাসীর বাড়ী গেছলেন?

বাবুর মুখ শুকাইয়া উঠিল।

নলিনী বলিল—মাসী আমার গার্জেন নয়, তা বোধহয় আপনি জানেন না, কেমন?

বাবু কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই নলিনী বলিল—কিন্তু দিনের বেলা কেন? সন্ধ্যের পর আসবেন।

বাবু সস্নেহে বলিল-তাই আস্‌ব! নলিনী, তুমি রাগ করনি ত?

রাগ? না।

তাহ'লে একটি কাজ কর?

নলিনী ভয়ে ভয়ে বলিল—কি?

এই আংটি-টা পর।

নলিনী বলিল—দিন। আংটিটা হাতে লইয়া সে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিয়া অনামিকায় পরিল। সুন্দর আংটি, হীরাখানির জ্যোতিঃ অসাধারণ।

বাবু বলিল—সন্ধ্যের পরেই আস্‌ব!

হুঁ!

বাবু চলিয়া গেল; নলিনী এ ঘরে আসিয়া জানালাটা ধরিয়া দাঁড়াইতেই চক্ষু তাহার অন্ধ হইয়া গেল। ঐ-যে কপোত

ফিরিয়া আসিয়াছে, কপোত-কপোতী আবার তেমনি মুখো-মুখী করিয়া বসিয়া আছে। মুখের হাসিতে দুইটি হৃদয় উজ্জল; শান্তির সুবাতাসে কক্ষ সুরভিত।

নলিনী কাণ পাতিয়া শুনিল, যুবক বলিতেছে, আমি কি ইচ্ছে করে' দেরী করতে পারি রুক্মা? আমি কি জানিনে যে এক মুহূর্ত্ত দেরীও আমার রুক্মার কাছে অসহ্য! কি করি বল, বন্ধুটির সঙ্গে দশ বছর পরে দেখা, খুব ভাল অবস্থার লোক, পথে আমারই কাছে ভিক্ষা চাইতে এল, দেখে সামলাতে পারলুম না। তার বাড়ী গিয়ে, তার ছেলে-পুলেকে খাইয়ে কাপড় পরিয়ে, কাল এসে তাদের একটা পাকা রকম বন্দোবস্ত করে দেব বলে তবে আস্‌তে পেলুম! কাল তোমাকেও নিয়ে যাব বলে এসেছি; রুক্মা, যখন কলেজে পড়তুম এই নগেনই ছিল আমার সব চেয়ে বড় বন্ধু! আজ তার যে দশা দেখ্‌লুম, সে আর কি তোমায় বলবো রুক্মা! কাল তুমি যাবে ত?

যাব।

নগেনের স্ত্রী তোমায় পেলে বড় খুসী হবে। কতবার করে যে আজ তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছে তা বলবার নয়। তারই জন্যে ত এত দেরী হল!

মেয়েটি বলিয়া উঠিল—চোদ্দো বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, এতক্ষণ ছাড়াছাড়ি আর হয়েছে কখনও?

যুবক বলিল—না।

মেয়েটি কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—আর খানিক দেরী হলে আমি বাঁচতুম না!—সে স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নলিনীর পা টলিয়া গেল! তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিয়া সে একটা চৌকীতে বসিয়া পড়িল! নলিনী নিজেই কীর্ত্তনে গাহিত—

"তিলেক না দেখে, হায়
বুঝি প্রাণ বাহিরায়—
বাহিরায় গো!"

এ-যে তাই! কবির রচিত সঙ্গীত যে এমন সত্য হইতে পারে, তাহা তাহার জানা ছিল না। মাত্র কয় ঘণ্টার বিচ্ছেদ তাহাতেই এই!

নলিনী বসিয়া থাকিতে পারিল না, শুইয়া পড়িল। আর তাহাকে একাকী পাইয়া রাজ্যের চিন্তা আসিয়া তাহাকে বেড়া জালে ঘিরিয়া ফেলিল।

হায় হায়! ঐ মেয়েটাকে সে তাহারই সমদুঃখী ভাবিয়া সুখ পাইয়াছিল; তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিল, কাঁদিয়া ছিল। এখন তাহার দুঃখের পরিমাপ করিতে গিয়া নলিনীর ইচ্ছা হইল নিজের মাথাটাকে ঠুকিয়া ছেঁচিয়া কুটি কুটি করিয়া ফেলে। এই দুঃখী মেয়েটার বাসস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া নলিনী দিশেহারা হইয়া গেল। পৃথিবীর মাটীতে তাহাকে দেখিতে পাইল না; পৃথিবীর বাহিরে, বহু উচ্চে, যেখানে দৃষ্টি চলে না, সেই স্বপ্নময়, মায়াময় স্বর্গ-রাজ্যে মেয়েটি যেন স্বর্গের সুধা পান করিয়া ফুল্লমনে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে! নলিনী ধারণা করিতে পারিল না, কি সে ভালবাসা দু'দণ্ডের বিচ্ছেদ-ও যাহাতে সহিতে পারে না; কি সে সৃষ্টি লয়-করা আকর্ষণ, যাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লোপ করিয়া দেয়! নলিনী জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল।

তাহার জীবন! লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, পরপদদলিত জীবন তাহার! এ সুখের আস্বাদ ত মুহূর্ত্তের তরেও পায় নাই; বিচ্ছেদে এত কাতরতা, কাতরতায় এত সুখ, এত আনন্দ, এত তৃপ্তি—এ-যে কল্পনার অতীত, এ যে স্বপ্নেও অদেখা, এ-যে ধারণাতে অজানা!

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, ঝি ডাকিল, মা!

নলিনী মুখ তুলিল।

বাবু!

ওরে ব্যগ্রতা ক'রি তোর, আজ যেতে বল্‌। বল—কাল আস্‌তে!

ঝি চলিয়া গেল!

নলিনীর মনে পড়িল, তাহার নিজ জীবনের কথা! কি প্রভেদ তাহাতে আর ঐ দেওয়ালের বাহিরের ঘরের সেই মেয়েটিতে! অথচ দু'জনেই এক, সে'ও নারী, এ'ও নারী; সুন্দরী, যুবতী দুজনেই! উভয়ের স্রষ্টা এক ঈশ্বর! অথচ কোথায় স্বর্গ আর কোথায় এই রসাতল!

ঝির সঙ্গে বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল—নলিনী!

আজ না, আজ না—কাল আসবেন, কাল! দোহাই!—নলিনী মুখে কাপড় গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

নলিনী!

আবার কেন!—

একটা কথা!

কাল!

দেওয়ালের ওদিকের ঘরের মেয়েটা তাহার প্রিয়ের আসিতে একটু দেরী হইয়াছিল বলিয়া নয়নাশ্রুতে ধরাখানি ভিজাইয়া দিয়াছিল, আর সে—!

নলিনী অন্ধকারে হাঁতড়াইয়া জানালা খুলিয়া ফেলিল।

মেয়েটি বলিতেছে, আগেকার কালে যারা সহমরণে যেত, তারা বেশ পরকালে গিয়েও একসঙ্গে থাকতে পেত না?

স্বামী এ সমস্যার কি উত্তর দিলেন, নলিনী তাহা শুনিল না, ঝপাৎ করিয়া জানালা বন্ধ করিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন নলিনীকে আর গৃহে দেখা গেল না। এক সপ্তাহ পরে কুচবিহার-কুঞ্জ, বৃন্দাবনধাম এই ঠিকানা হইতে ঝির নামে পত্র আসিল, নলিনী আশ্রয় পাইয়াছে, কলিকাতায় তাহার যাহা কিছু আছে, সে ঝিকে দিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে পাশের বাড়ির বৌয়ের কুশলসহ পত্র দিতে অনুরোধ করিয়াছে।

বিজয়া

কি হলো নবমীনিশি হৈলো অবসান, গো!
বিশাল ডমরু, ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে
প্রাণ গো।

কি কহিব মনো দুঃখ
গৌরী পানে চেয়ে দেখ,
মায়ের মলিন হয়েছে অতি ও বিধু বয়ান
ভিখারি ত্রিশূলধারী যা চাহে তা দিতে পারি বরঞ্চ
জীবন চাহে তাহা করি দান।
কে জানে কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত
আমি ভাবিয়ে ভবের রীত, হয়েছি পাষাণ গো॥
পরাণ থাকিতে কায়, গৌরী কি পাঠান যায়
মিছে আকিঞ্চন কেন, করে ত্রিলোচন
কমলাকান্তেরে লৈয়ে, কহ হরে বুঝাইয়ে,
হর, আপনি রাখিলে রহে, আপনার মান গো॥

রেবতী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা

বেলা [বড়]—শ্রীমতী ননীবালা (গুয়া)

বেলা [ছোট]—শ্রীমতী রাধারাণী

চুণী—শ্রীমতী শশীমুখী

মাধুরী—একটি নিখুঁত ছবি

কি কি অভিনব দৃশ্যাবলী দেখিবেন :—

ত্রিতল বাড়ীর ছাদ হইতে, দড়ির মইয়ের সাহায্যে ঘুমন্ত বেলাকে স্কন্ধে লইয়া পলায়ণপর মেঘনাদের নিম্নে অবতরণ। গরুর গাড়ীর তলা হইতে ভগবান দাসের গাড়োয়ানকে উদ্ধার। কাশীর দীপমালা সজ্জিত গঙ্গাবক্ষ। ইত্যাদি ইত্যাদি—

"জীবন-যুদ্ধ" অভিনয়ের কতকগুলি দৃশ্য দেখুন :—

কারা-পলায়িত মেঘনাদ
[মেঘনাদ—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে]
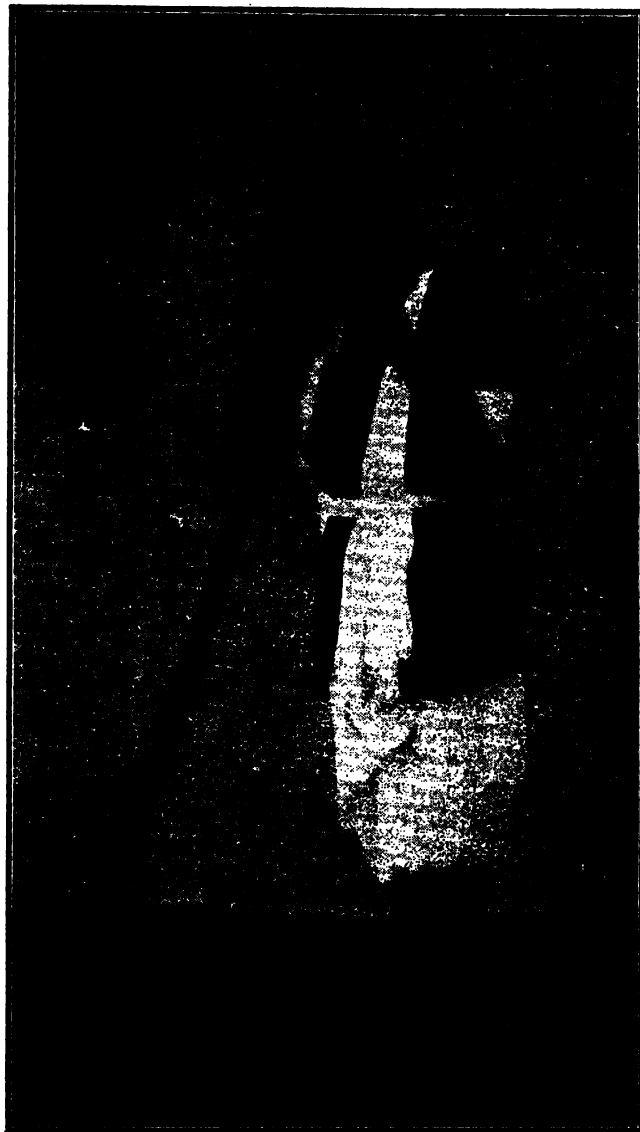
অনাথনাথ—

…তোমাকে আমি সেই পুণ্যময়ের পদে অর্পণ করলাম।

[অনাথনাথ—শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী]

দারোগা প্রতাপচাঁদ

—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে

রমানাথ, রেবতী ও প্রকাণ্ড জলপূর্ণ বাল্‌তী হস্তে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা বেলা।
[রমানাথ—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু),
রেবতী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, বেলা—শ্রীমতী রাধারাণী]

ভগবানদাসের প্রবল পেষণে দারোগা প্রতাপচাঁদের
হাত হইতে পিস্তল খসিয়া পড়িল।

ঘুমন্ত বেলাকে স্কন্ধে লইয়া দড়ির মইয়ের সাহায্যে ত্রিতল বাড়ীর ছাদ হইতে মেঘনাদের পলায়ন।

ষ্টারে "প্রফুল্ল"

ষ্টারে মহাসমারোহে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক প্রফুল্ল অভিনীত হচ্ছে।

যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

——তাঁহার এই ভূমিকায় নূতন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।——

রমেশের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী

সুরেশের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়

শিবনাথের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পীতাম্বরের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত

ভজহরির ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

জ্ঞানদার ভূমিকায়—শ্রীযুক্তা কুসুমকুমারী

প্রফুল্লের ভূমিকায়—শ্রীযুক্তা নীহারবালা

জগমণির ভূমিকায়—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী

প্রভৃতি সকলেই চমৎকার অভিনয় করেছেন।

"আর্ট থিয়েটারের সাজসজ্জা, দৃশ্যপটের ত কথাই নেই;

এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আমরা বহুকাল দেখি নাই।"

প্রফুল্লের খানকতক ছবি 'শিশিরের' পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া গেল।

যোগেশের ভূমিকায়—নাট্যাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
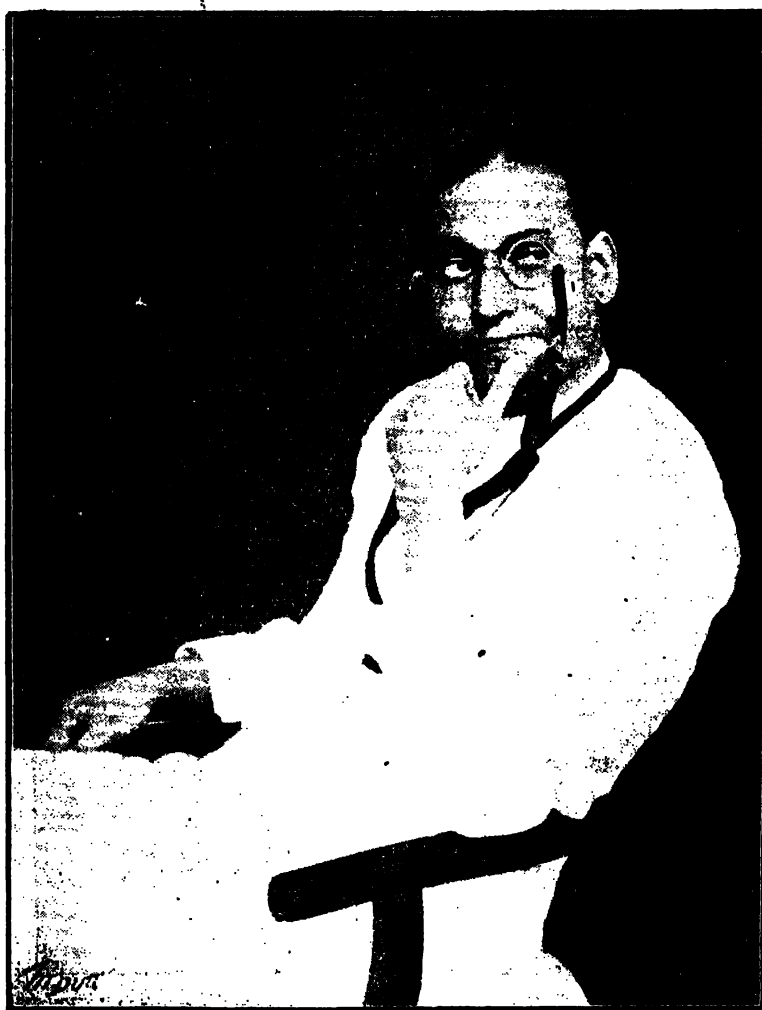
রমেশের ভূমিকায়—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

সুরেশের ভূমিকায়—শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভজহরির ভূমিকায়—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

প্রফুল্লের ভূমিকায়—শ্রীমতী নীহারবালা

রমেশের ভূমিকায়—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও প্রফুল্লের ভূমিকায়—শ্রীমতী নীহারবালা

রমেশ—"তবে মর্‌"।

বরষা নিশীথে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার সেন

নিবেদন

সচিত্র শিশিরের জীবনের প্রথম বর্ষ পূর্ণ হইল। সচিত্র শিশির আগামী সংখ্যা হইতে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে। নিজের মুখে বলা শোভা পায় না, তবুও এ-টুকু বলিবার প্রলোভন আমরা কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছি না যে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণ একবাক্যে সচিত্র শিশিরের প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ, মানসী, বসুমতী, বঙ্গবাণী, ভারতী, যমুনা প্রভৃতির সম্পাদকগণ সচিত্র শিশিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আমাদের ধন্য করিয়াছেন।

বঙ্গের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাগণ রচনাদির দ্বারা আমাদের প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। প্রভাতকুমারের মত গল্প-লেখক বাঙ্গালায়—ভারতে নাই, তাঁহার কয়েকটি লেখা সচিত্র শিশিরে মুদ্রিত হইয়াছে। দীনেশচন্দ্র, জলধর, সৌরীন্দ্রমোহন, ফকিরচন্দ্র, গিরীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিত ও যশস্বী লেখকগণের রচনা সচিত্র শিশিরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। আগামী বর্ষেও করিবে।

চিত্রকরগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, হেমেন্দ্রনাথ, ভবানীচরণ প্রভৃতির চিত্র নিয়মিত প্রকাশিত হইয়াছে। সতীশ সিংহ, ভুবন মুখোপাধ্যায়, বিনয়কৃষ্ণ বসু প্রভৃতির চিত্রও সচিত্র শিশিরের সম্পদ।

বঙ্গের অধিকাংশ লেখিকা সচিত্র শিশিরকে স্নেহ-চক্ষে দেখেন; তাঁহাদের রচনা সচিত্র শিশিরে বেশী প্রকাশিত হইয়াছে; পরেও হইবে।

উপরন্তু

এবার হইতে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ঈশানী ও কল্যানী নামে একখানি সুদীর্ঘ উপন্যাস আগামী সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় আগামী বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে সাহিত্য বিষয়ক রত্ন-সমূহ আহরণ করিয়া সচিত্র শিশিরের পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিবেন। তাঁহার সংগ্রহ অসাধারণ। বঙ্গ-ভাষা-ভাষী যে অনেক নূতন ও মূল্যবান বস্তুর সন্ধান পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ ছাড়া

আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটীই থাকিবে না। সচিত্র শিশিরকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করাই ত আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের সম্বল, চেষ্টা; আপনাদের নিকট কামনা— সহানুভূতি; জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা—সাফল্য।

অলমিতি বিস্তরেণ—

নিবেদক

সম্পাদক, সচিত্র শিশির।

আগামী দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা আগামী সপ্তাহে গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট ভি-পিতে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া একখানি কার্ডে লিখিয়া জানাইলে পরম বাধিত হইব।—কর্ম্মকর্ত্তা, সঃ শিঃ।

প্রথম বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　১৫ই কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৩১ সাল।　　[শেষ সপ্তাহ

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মাজীর প্রায়োপবেশনের শেষ দিন (৮ই অক্টোবর) বেলা ১০টার সময় এই আলোক চিত্রখানি গৃহীত হইয়াছিল। চিত্রে দেখা যাইতেছে, একুশদিন উপবাসের পর মহাত্মার দেহের ওজন লওয়া হইতেছে। উপবাসের পূর্ব্বে মহাত্মাজীর দেহের ওজন ছিল, ১০১ পাউণ্ড অর্থাৎ ১মন সওয়া দশ সের—এই দিনের ওজনে দেখা গেল ৮৮ পাউণ্ড অর্থাৎ ১মন সাড়ে চার সের। একুশদিনে মহাত্মার দৈহিক-ভার সওয়া ছ'সের কমিয়াছে।

হায়দ্রাবাদ—সিন্ধের "হিন্দু" আফিসের
শ্রীযুক্ত কেস্তুমল টি, ঝানগিয়ানির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পড়ুয়ে খোকা

(১)
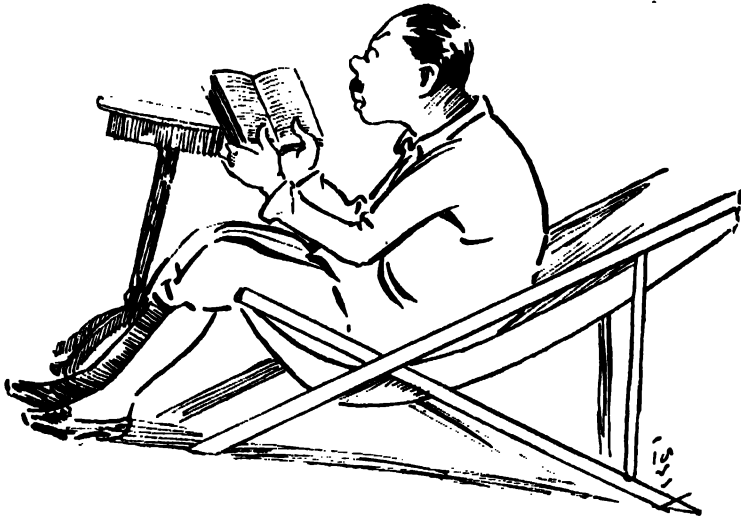
খোকার বাবা পুস্তক পাঠ করিতেছেন।

(২)
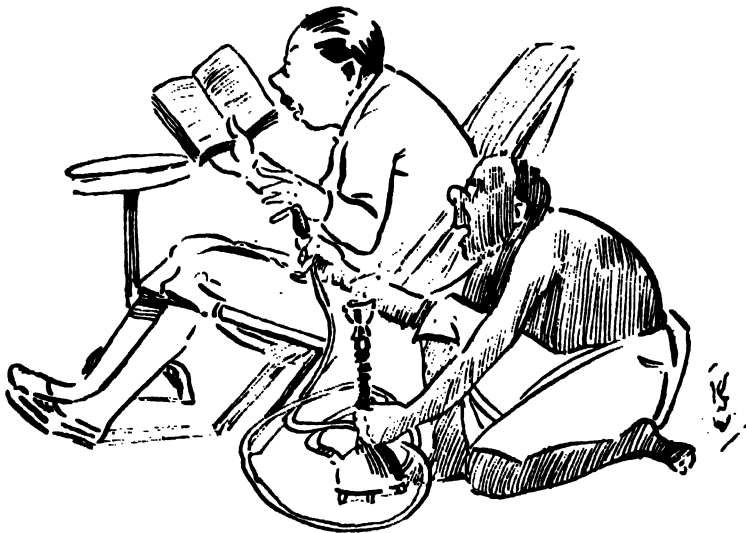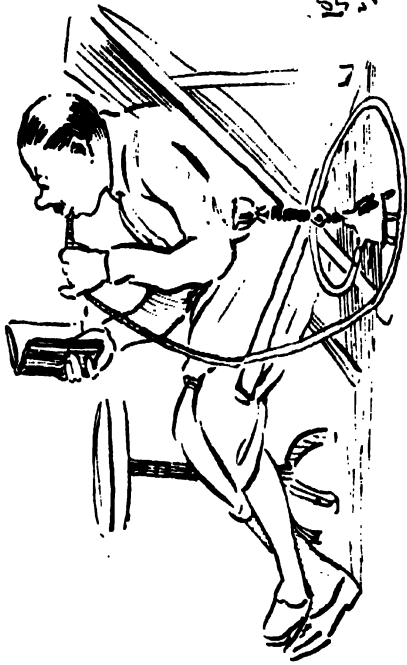
ঝি। বাবু গো ভাত…
বাবু। (বীরদর্পে) হুঁ হুঁ—
ঝি। ও বাবা!

(৪)

(৫)

হুঁ-হুঁ জমিয়া উঠিয়াছে।

(৭)

(৬)

ঝি। ওগো মাগো, বাবুর একি কাণ্ড হল গো! (চম্পট)

গৃহিণী। বলি তোমার আক্কেলটা কি বল ত!
(মাষ্টার মহাশয়: পড়িতে বলে; পরজীবনে যিনি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পান, তিনি তাহা ত্যাগ করিতে বলেন।)

(৭)

"ভেরি নাইস্"

(৯)

বাবু পায়খানায় চলিয়াছেন।

[গৃহিণী। (স্বগতঃ) ছেলেবেলায় এ চাড় ছিল কোথায় গা!]

(৮)

গৃহিণী। আ গেলো যা, খাবার—খাবার!

(১০)

বাবু ক্ষৌরি হইতেছেন।

(১১)

জামা গায়ে দিলেন।

(১৩)
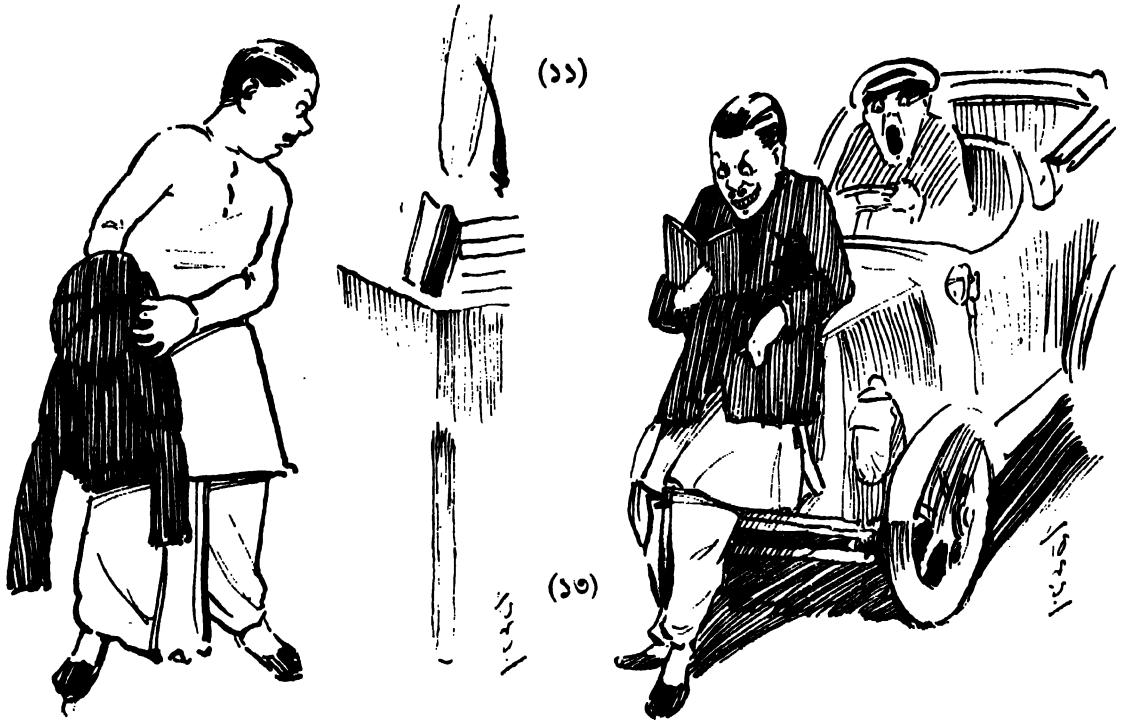
বাবু ভাবিলেন, একটা চেয়ার-টেবিল হইবে—ঠেস্ দিলেন

(১২)

বাবু—রাস্তায়।

(১৪) চালক অনন্তোপায় হইয়া পিছু হটিল, আর বাবু পপাত হইলেন !

(১৫) "আহা মশাই ! বড্ড লেগেছে বোধ হয় !"

(১৬) বাবু বাড়ী ফিরিলেন।

(১৭) ফিরিয়া…

(১৮)

নিশীথে ।

(১৯)
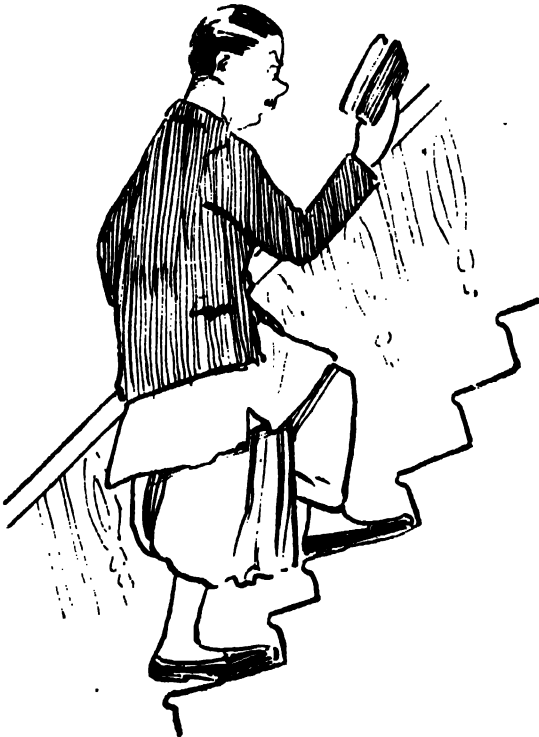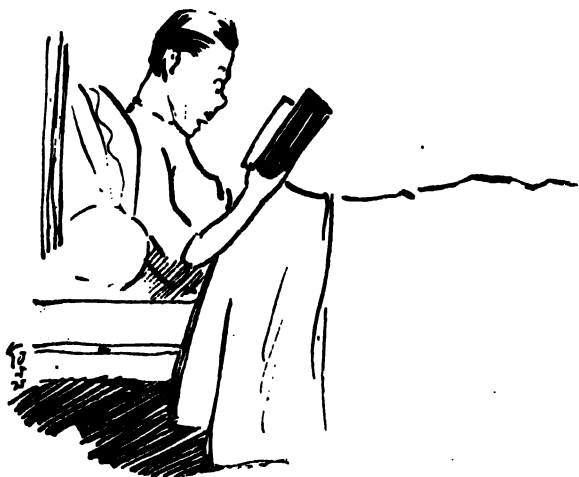
"দুঃ শালার বই ! বিয়ে হোল না ? ড্যাম্—"
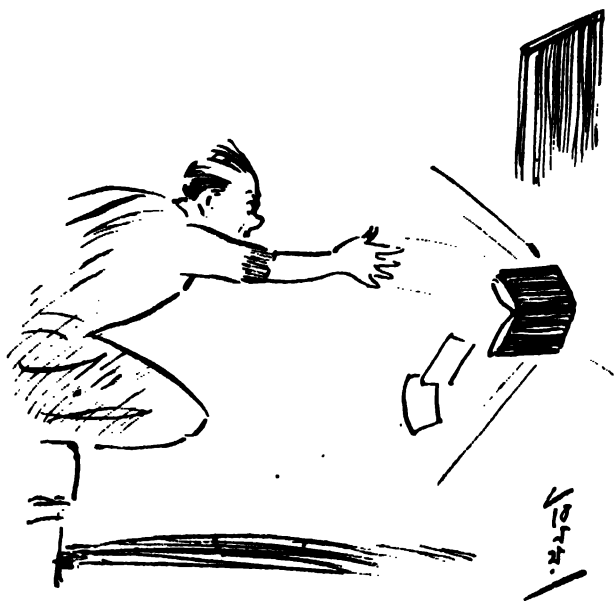
(২০)

এঃ লাইব্রেরীর বই যে ! ফাইন করবে রে বাবা !
অ গিন্নি, গিন্নী, একটু কাই আনতে পার ?"

নির্ব্বোধের মহত্ব

[রায় সাহেব শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

(১)

মানব-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। কাহার মধ্যে কি শক্তি বা প্রকৃতি নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে?

নন্-কো-অপারেশনের জন্মের বহু পূর্ব্বে, এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টিরও পূর্ব্বে অনঙ্গমোহন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিয়াছিল যে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলের অপেক্ষাও স্বাধীনতা-নাশক এবং দেশের স্কুল সমূহের শিক্ষা-পদ্ধতি সেঁকো বিষের অপেক্ষা মারাত্মক। অনঙ্গর বিদ্যা-তরণী তাহাকে মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে উত্তীর্ণ করাইয়া দিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে জিওমেট্রি, অ্যাল্‌জেব্রা ও সংস্কৃতের ভারে অতিশয় মন্থর-গতি হইয়া গেল। পরীক্ষায় নকল ও প্রোমোশনের সময় কান্না-কাটি করিয়াও চতুর্থ শ্রেণী উত্তীর্ণ হইতে অনঙ্গর দুই বৎসর লাগিল, তাহার পর তৃতীয় শ্রেণীতেও দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিদ্যা-তরণীর আর অগ্রসর হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এদিকে অনঙ্গর বয়স আঠার বৎসর হইয়া আসিল।

অনঙ্গর বিশ্বাস যে জিওমেট্রি অ্যালজেব্রা ও সংস্কৃতের অকেজো বোঝা নামাইয়া দিলেই তাহার বিদ্যাতরীখানি তাহার ইংরাজি-জ্ঞানের পালের ভরে তর-তর করিয়া "ভেসে যাবে রঙ্গে।" কিন্তু স্কুলরূপী অচলায়তনে নির্দ্দিষ্ট পাঠের ব্যতিক্রম হইবায় জো নাই, আবার রুদ্ররূপী বাপ এমনি অবুঝ যে স্কুল ছাড়িতে দেয় না। বাপ কামিনীমোহনের নামটি যেমন মোলায়েম স্বভাবটি ঠিক তাহার বিপরীত। কামিনীমোহনের নূতন ছাতাটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল কিরূপে ও অনঙ্গর পৃষ্ঠদেশে কি করিয়া কালশিরা পড়িল—যাক্, ওসব পরের কথায় আমাদের দরকার কি? অনঙ্গর মানহানি না করিয়া মাত্র এইটুকু বলা যাইতে পারে যে কামিনীমোহন ছাতাটি হাতে করিয়া কোথা যাইবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময় অনঙ্গ আসিয়া প্রস্তাব করিয়াছিল যে সে স্কুল ছাড়িয়া বাড়ীতে বসিয়া পড়াশুনা করিবে, এবং ইহার পরেই না কি দেখা যায় যে কামিনীমোহনের ছাতাটি ভাঙ্গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছে ও অনঙ্গর পিঠে কালশিরা পড়িয়াছে। এ ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরে কামিনীমোহন বড়ই দুঃখবোধ করিয়াছিল—ছাতাটির জন্য, ছেলের জন্য নহে।

কামিনীমোহন প্রায় প্রত্যহ কোন না কোন উপলক্ষ করিয়া ঘূর্ণিত লোচনে কঠোরস্বরে মুখভঙ্গি করিয়া ছেলেকে বলেন "লেখাপড়া করিস না, খাইবি কি করিয়া?" ইহা হইতে অনঙ্গর ধারণা হইয়াছে যে সে যদি উপার্জ্জনের একটা উপায় করিতে পারে তবেই বাপ তাহাকে লেখাপড়া হইতে অব্যাহতি দিবে নচেৎ নয়। যত দিন যাইতেছে উপার্জ্জনের উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য অনঙ্গ ততই অধীর হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। তাহার বিশ্বাস যে জিওমেট্রি, অ্যালজেব্রা ও সংস্কৃত ছাড়া জগতে এমন কিছু নাই যাহাতে লাগাইয়া দিলে সে কৃতকার্য্য হইতে না পারে। নিজের বুদ্ধিশক্তির বা কার্য্যদক্ষতার যে কোন গলদ আছে এ কথা তাহার মনে হইত না। কিন্তু ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জের নিকট পাঞ্জাশ গ্রামে তাহার বাড়ী, সেখানে কর্ম্মক্ষেত্রই বা কোথা আর সাহায্যই বা করিবে কে?

স্কুলে ও বাড়ীতে লাঞ্ছনা অনঙ্গর অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে শীঘ্রই অন্য কোন ব্যবস্থা না করিতে পারিলে সে কোনও দূর গ্রামে যাইয়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইয়া বসিবে। কোন ডাক্তারের পুত্রের সহিত ভাব করিয়া সে একটা ভাঙ্গা কাঠের ষ্টেথিস্কোপ সংগ্রহ করিয়া কাজ অনেকটা আগাইয়া রাখিয়াছে। তাহার বাপের একটি ছোট হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স আছে

এবং একখানি সরল হোমিওপ্যাথি শিক্ষা পুস্তক আছে। ইচ্ছা হইলেই অনঙ্গ এই সরঞ্জামগুলি লইয়া এবং বাপের টিনের প্যাঁটরা ভাঙ্গিয়া মাস দুই তিনের খোরাকীর টাকা সংগ্রহ করিয়া বাহির হইয়া পড়িতে পারে।

কিন্তু আসলে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হওয়াটা তাহার মনঃপূত নহে। সে এমন একটা বৃত্তি চায় যাহাতে তাহার ইংরাজী বলিবার ক্ষমতা ও সাহেবী চাল-চলন কাজে লাগাইতে পারে। একবার ফুল্লীগঞ্জে কোন অবৈতনিক নাট্য সমাজের অভিনীত নীলদর্পন নাটকে রোগ সাহেব উড্ সাহেব প্রভৃতি সাহেবদের অভিনয় দেখিয়া তাহার মন মজে। সেই অভিনয় হইতে সে খাস সাহেবদের আদব-কায়দা আয়ত্ব করিয়া লইয়াছে এবং তদবধি একনিষ্ঠ হইয়া ইংরাজী বলা অভ্যাস করিতেছে। স্কুলে আর কিছু করুক না করুক, ডিবেটিং ক্লাবের কোন মিটিং তাহার ফাঁক যায় না। সে শুনিয়াছে যে না ভাবিয়া চিন্তিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া যাওয়াই ইংরাজী-কথনে দক্ষতা লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। প্রথম প্রথম তাড়াতাড়ি বলিতে যাইয়া সে কথা ওলট-পালট করিয়া ফেলিত। একবার ডিবেটিং ক্লাবে গরু প্রবন্ধে বক্তৃতায় সে "আমাদের বাড়ীর গরু" বুঝাইতে "our home of cows" বলিয়া ফেলিয়াছিল। এখন আর ওরূপ ভুল হয় না এবং ইংরাজী বলিতে একটুও আটকায় না। সাধিলেই সিদ্ধি।

অনঙ্গর বড় সাধ যে তাহার ইংরাজী বলার ও সাহেবী আদব কায়দার জোরে কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়া বাপকে অবাক করিয়া দেয়, তখন বাপ তাহার কদর বুঝিতে পারে। কিন্তু পোড়া পাজাশে সেরূপ কর্ম্মক্ষেত্র নাই, এমন কি প্রাণ খুলিয়া তাহার এলেম দুইটি ব্যবহার করে এমন সুবিধাও নাই।

(২)

সুবিধা জুটিয়া গেল।

পাজাশ হইতে ফুল্লীগঞ্জ নৌকায় এক ঘণ্টার পথ, অনঙ্গ প্রত্যহ নৌকাযোগে ফুল্লীগঞ্জ স্কুলে যাতায়াত করে। ফুল্লীগঞ্জে সেবাষ্টিয়ান নামে এক ফিরিঙ্গি বা নেটিব ক্রিষ্টান পোষ্টমাষ্টার আসিল। এক দিন পোষ্টকার্ড কিনিতে যাইয়া অনঙ্গ নূতন পোষ্টমাষ্টার সেবাষ্টিয়ানকে দেখিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্টতা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিল, এবং বাড়ি হইতে কলা কাঁঠাল পাতক্ষীর প্রভৃতি আনিয়া উপহার দিয়া অল্প দিনের মধ্যে পোষ্টমাষ্টারের সহিত আলাপ জমাইয়া ফেলিল। স্কুলের পরে ও স্কুল হইতে পলাইয়া অনঙ্গ পোষ্ট আফিসে যাইয়া সেবাষ্টিয়ানের সঙ্গসুখ লাভ করে। তাহার সহিত অনঙ্গ কিরূপ ইংরাজি কথা বলে তাহার নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

সেবাষ্টিয়ান ইংরাজিতে বলিল "ম্যান, এস লুডো খেলা যাক।"—প্রতি কথার পূর্ব্বে সকলকে ম্যান্ বলিয়া সম্বোধন করা তাহার অভ্যাস।

অনঙ্গ বলিল "I cant play ludo but I can play দফা" (দফা = দাবা)—দাবার ইংরাজি প্রতিশব্দটা অনঙ্গর মনে আসিল না।

সেবাষ্টিয়ান জিজ্ঞাসা করিল "দফা? দফা কি রকম খেলা?"

অনঙ্গ বলিল "ক্যাঞ্চিউ প্লে দফা? দফা ইজ্ এ গুড গ্যাম্ (game) of which the Indians are boast or rather proud of।"

অনঙ্গ শুনিয়াছে যে সাহেবরা "can't you" "don't you" বলিতে "t"-র স্থানে "চ" উচ্চারণ করে। এ কথাটা তাহার বড় মনে লাগিয়াছে তাই সে সুবিধা পাইলেই "ক্যাঞ্চিউ" "ডোঞ্চিউ" কথার প্রয়োগ করে। বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সভায় সে একবার ভিদ্যিয়াসাগর বলিয়াছিল।

কালো ফিরিঙ্গীর স্বভাব অনুসারে সেবাষ্টিয়ান নিজের বড়াই করিয়া নানা মিথ্যা গল্প করিত—বিশেষত যখন মদ পেটে পড়িত। সে বলিত যে তাহার পিতামহ একজন জেনারেল ছিল সেজন্য এখনও বড় সাহেব মহলে সেবাষ্টিয়ানের কত খাতির, ব্রেহাম কোম্পানীর ঢাকার এজেণ্ট ম্যাক্নীল সাহেব তাহার সহিত দেখা হইলেই নিজের সিগার-কেস হইতে চুরুট খাইতে দেন। আবার বলিত বাঙ্গালীরা ভীরু, কোন বিষয়ে কোন স্বাধীনতা নাই, এমন কি বিবাহ করিবে বাপ-মায়ের পছন্দ অনুসারে। হুঃ, সেবাষ্টিয়ান জগতে কাহাকেও কেয়ার করে না। অমুক উপলক্ষে সে উপরওয়ালা-

দের হুকুম অগ্রাহ্য করিয়াছিল, অমুক ঘটনায় কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিল। তাহার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সে যাহা খুসী করিতে পারে, স্বয়ং কুইনেরও সাধ্য নাই তাহাকে বাধা দেয়।

অনঙ্গ এই সকল কথা হাঁ করিয়া গিলিত ও নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে মনে আক্রোশে দগ্ধ হইত। তাহার মনের অবস্থা যখন এইরূপ তখন এক দিন স্কুলে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে নর শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে "নরস্তি" হয় বলায় পণ্ডিত মহাশয় কাছে আসিয়া "বুড়ো বলদ, নরস্তি ?" বলিয়া তাহার মাথাটি তিন বার দেয়ালে ঠুকিয়া দিলেন, ক্লাসশুদ্ধ ছাত্র হাসিয়া অস্থির হইল—তাহারা সকলেই অনঙ্গর অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। ইহাতে অনঙ্গ একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল, কি করিয়া এ লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তাহা মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল। তখন তাহার মাথার নিকট কাণ পাতিয়া শুনিলে গভীর চিন্তায় অনভ্যস্ত তাহার মস্তিষ্কের মরিচা-পড়া কল-কব্জার ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ বোধ হয় শুনিতে পাওয়া যাইত।

হঠাৎ একটি চমৎকার প্ল্যান তাহার মাথায় আসিল। পোষ্টমাষ্টার সেবাষ্টিয়ানের সঙ্গে তাহার এক ভগ্নী ছিল সেই তাহার রান্না-বান্না করিত ও ঘর-সংসার দেখিত। ভগ্নীটির নাম মেরিয়া, তাহার বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর হইবে, সেবাষ্টিয়ানের মতই সে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার উপর তাহার শরীরটি অত্যন্ত কৃশ ও শুষ্ক, ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটির একটি ট্যারা, হনু অত্যুচ্চ এবং মুখ শৃগালের মুখের ন্যায় সূচাল। মেরিয়ার বদন-মণ্ডলে সর্ব্বদা বিষম অসন্তোষ ও বিরক্তির ভাব লাগিয়া রহিয়াছে। কেহ কখনও তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করে নাই এবং ভাই ভগ্নী এখন বুঝিয়াছে যে তাহার বিবাহের সম্ভাবনা খুব কম। তাহার বিবাহ না হইলে সেবাষ্টিয়ানও বিবাহ করিতে পারে না, কারণ ভগ্নী ও স্ত্রী দুই জনকে ভরণ পোষণ করে সেবাষ্টিয়ানের সে ক্ষমতা নাই। ভগ্নী মেরিয়াকে সেবাষ্টিয়ান আপদ বালাই জ্ঞান করে এবং দুই জনে নিত্য কলহ হয়। অনঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছে যে ভাই-ভগ্নীর মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব বর্ত্তমান এবং মেরিয়া প্রায় গুম হইয়া থাকে, বড় একটা কথাবার্ত্তা বলে না।

মেরিয়ার উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তির জন্য অনঙ্গ তাহাকে একটু ভয় ভয় করিত, তাহার কাছে ঘেঁসিতে চাহিত না। সেদিন কিন্তু স্কুলের পর সেবাষ্টিয়ানের বাসায় আসিয়া সে যাচিয়া মেরিয়ার সহিত আলাপ সুরু করিয়া দিল এবং দিন দুই তিন সাধ্যমত তাহার তোয়াজ করিতে চেষ্টা করিল। তাহার পর একদিন—হাঁ পাঠক মহাশয়, আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহাই ঠিক—অনঙ্গ মেরিয়াকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল। পাঠক মহোদয় কুশাগ্র বুদ্ধি, তিনি অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে অনঙ্গ লভে পড়িয়া এ প্রস্তাব করে নাই। বেচারির ও সব বালাই নাই, সে বার্ডসাই কি তামাক পর্য্যন্ত খায় না। এ বিষয়ে তাহার মনের ভাব ও প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহাও সে মেরিয়া ও সেবাষ্টিয়ানের নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করে নাই। সে তাহাদের স্পষ্টই বলিল যে সেবাষ্টিয়ান যদি তাহার পরিচিত বড় সাহেবদের কাহাকেও বলিয়া তাহার উপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দেয় তাহা হইলে সে ক্রিশ্চান হইয়া মেরিয়াকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে। সে ইহাও বুঝাইয়া দিল যে সে কুড়ি পঁচিশ টাকা মাহিনার চাকরির কাঙ্গাল নহে, অন্য কোন স্বাধীন পেশা অবলম্বন করিতে চায়।

সেবাষ্টিয়ান ও মেরিয়া যখন বুঝিল যে অনঙ্গ ঠাট্টা করিতেছে না এবং তাহার মাথা খারাপ হয় নাই তখন তাহারা আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, কিন্তু প্রকাশ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না। সেবাষ্টিয়ান প্রস্তাব করিল যে অনঙ্গ আগে ক্রিশ্চান ধর্ম্ম গ্রহণ করুক তাহার পর রোজগারের পন্থা নিরূপণ করা যাইবে, কিন্তু অনঙ্গ জিদ করিয়া বলিল যে আগে তাহার অর্থোপার্জ্জনের উপায় ঠিক করিয়া না দিলে সে কখনও ক্রিশ্চান হইবে না, বিবাহ করা তো দূরের কথা। সে বুঝাইয়া দিল যে ক্রিশ্চান হইলেই সে বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইবে সুতরাং তাহার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা আগে দরকার।

অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল যে অনঙ্গর জন্য সেবাষ্টিয়ান সুবিখ্যাত ব্রেহাম কোম্পানীর ঢাকার এজেণ্ট ম্যাক্নীল সাহেবকে চিঠি লিখিবে এবং অনঙ্গ সেই চিঠি লইয়া ঢাকা যাইয়া ম্যাক্নীল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ

করিবে। কয়েকদিন পরে সরস্বতী পূজা ও পূজার রাত্রে ছাত্রদের নাটক অভিনয় হয়। সে উপলক্ষে অনঙ্গ সারা দিন রাত বাহিরে থাকিলেও বাপ কোন আপত্তি করিবে না, সেই সুযোগে সে ঢাকা যাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে। ইহাও স্থির হইল যে ম্যাক্‌নীল সাহেবের নিকট অনঙ্গ পাটের দালালীর কর্ম্ম প্রার্থনা করিবে। এটি সেবাষ্টিয়ানের প্রস্তাব! অনঙ্গ পাটের দালাল কাহাকে বলে তাহা জানিত না এবং broker কথার অর্থ না জানায় প্রথমে এ প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল যে ভদ্র-সন্তান হইয়া সে পাট কাটিতে পারিবে না, তাহার পর সেবাষ্টিয়ান যখন বুঝাইয়া দিল যে কথাটা jute breaker নয় jute broker এবং broker অর্থে দালাল, তখন সে খুসী হইয়া রাজি হইল।

ম্যাক্‌নীল সাহেব প্রকৃতই একজন গণ্যমান্য বড় সাহেব, তিনি সুপ্রসিদ্ধ গ্রেহাম কোম্পানির পাটের কারবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি। সেবাষ্টিয়ান যখন ঢাকা ডাকঘরে কাজ করিত সে সময় কি করিয়া সে ম্যাক্‌নীল সাহেবের নজরে পড়ে, সে অবধি সে তাঁহাকে তাহার মুরুব্বি জ্ঞান করে। চিঠিতে সেবাষ্টিয়ান তাঁহাকে "Honoured and Respected Sir" বলিয়া সম্বোধন করিল, ইহা হইতেই বুঝা যাইবে ম্যাক্‌নীল সাহেবের সহিত তাহার কিরূপ সম্পর্ক।

(৩)

পাঠক মহাশয়, আপনি যদি এই পর্য্যন্ত পড়িয়া গল্পটি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলেন "স্কুল-বয়ের ছেবলামি ও বালকোচিত রসিকতা লইয়া আবার গল্প! রাবিশ্" তাহা হইলে আপনার দোষ দেওয়া যায় না। তবে এইটুকু বলিতে চাই যে অনঙ্গর মত নির্ব্বোধ বালকের মধ্যেও যে মনস্তত্ত্বের গভীর তথ্য লুকাইত থাকিতে পারে না এমন কোন কথা নাই। কাহার মধ্যে কি শক্তি বা প্রকৃতি নিহিত আছে তাহা সকল সময় লোকের কার্য্যাবলী বা চেহারা হইতে বুঝা যায় না। অন্যে বুঝিতে পারা দূরে থাক, এমন দেখিয়াছি যে ঘটনার সংঘাতে কাহারও মধ্যে হঠাৎ একটা বিশেষ শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে যাহার অস্তিত্বের কথা সে নিজেই জানিত না। নিতান্ত গোবেচারি ভাল মানুষ লোককে অসাধারণ চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচয় দিতে দেখিয়াছি, আবার একই ব্যক্তির কার্য্যকলাপে সামান্য সামান্য বিষয়ে হীনতা এবং অন্য বিষয়ে মহানুভবতা প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছি। বাস্তব জগতে এরূপ প্রহেলিকা বিরল নহে।——ঐ দেখুন, গল্প লিখিতে বসিয়া বাজে কথা বলিতেছি। বুড়া মানুষের দোষই এই, একটা কথা বলিতে পাঁচটা অবান্তর কথা আনিয়া ফেলে, বকিতে আরম্ভ করিলে আর থামিতে চায় না।

শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। অনঙ্গ কি পরিয়া ম্যাক্‌নীল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে তাহা লইয়া গোল বাধিল। ভব্য-যুক্ত পরিচ্ছদ না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না কিন্তু অনঙ্গর ভব্য-যুক্ত কোন কাপড় চোপড় নাই, যাহা আছে তাহা পরিয়া স্কুলে যাইতেই লজ্জা করে। নিতান্ত দায়ে পড়িয়া সেবাষ্টিয়ান তাহার নিজের এক প্রস্থ পোষাক—জুতা হইতে হ্যাট পর্য্যন্ত—অনঙ্গকে পরাইয়া দিল। একে গরীব ফিরিঙ্গির পুরাতন পরিচ্ছদ, তদুপরি অনঙ্গ ও সেবাষ্টিয়ানের দেহায়তন সমান নহে, তাহার উপর আবার ইংরাজি বেশের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া অনঙ্গ অপরূপ সাহেবী ঠাটে চলিতে লাগিল—সাজসজ্জা ও হাবভাবে তাহাকে অনেকটা চার্লি চ্যাপলিনের মত দেখিতে হইল। গোপনে ঢাকাগামী ষ্টীমারে উঠিতে হওয়ায় অনঙ্গর বড় দুঃখ হইল যে পরিচিত কেহ তাহাকে এই সাহেবী পরিচ্ছদে দেখিতে পাইল না। ষ্টীমারে সে যেখানে সেখানে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া যাত্রীদের মনযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল। অবশেষে কয়েকজন গোয়ালার সম্মুখে ত্রিভঙ্গমুরারী হইয়া কাঁচা আলকাতরা লাগান রেলিং ঠেস দিয়া দাঁড়াইতে তাহার কোটের সম্মুখের অনেকটা স্থান আলকাতরা চিত্রিত হইয়া গেল, তখন তাহার দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল সেবাষ্টিয়ানের কাছে কোট নষ্ট করার কি কৈফিয়ৎ দিবে।

ঢাকায় ম্যাক্‌নীল সাহেবের বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়া সেবাষ্টিয়ানের শিক্ষা অনুসারে সে তাহার নাম-লেখা একখণ্ড কাগজ ও সেবাষ্টিয়ানের পত্রখানি সাহেবের কাছে পাঠাইয়া দিল। সাহেব তখন চা খাইয়া ক্লাবে যাইবার উপক্রম

করিতেছিলেন, তাঁহার ডগ্-কার্ট হাজির ছিল—তখন মোটর-কারের সৃষ্টি হয় নাই।

সাহেব ডাকিয়া পাঠাইতে সে "গুড্ নাইট্ সার" বলিয়া তাঁহার কাছে যাইয়া দাঁড়াইল—সে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া ছিল বিকাল বেলা গুড্ মর্ণিং না বলিয়া বসে। অনঙ্গর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সাহেবের হাসি পাইল, তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া অনঙ্গর কুণ্ঠিত ভাবটা একেবারে কাটিয়া গেল। সাহেব যখন তাহাকে বসিতে বলিলেন তখন সে নীলদর্পন অভিনয়ে সাহেবদের কায়দা স্মরণ করিয়া জাঁকাইয়া চেয়ারে বসিল—চেয়ারে প্রায় অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় হেলান দিয়া দুইটি পা বেশ ফাঁক করিয়া যতদূর সম্ভব সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দিল। তাহার হ্যাটটি বরাবর মাথাতেই আছে।

না, পাঠক মহাশয়, ইহা অতি-রঞ্জন নহে। আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি একটি খাস ক্যাল্‌কেশিয়ান যুবক কর্ম্মপ্রার্থী কলিকাতার কোন আফিসের বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া ঠিক এইভাবে চলিয়াছিল।

অনঙ্গর ভাগ্য ভাল যে সাহেবটি কৌতুক-প্রিয়, তাহার ভঙ্গী দেখিয়া সাহেবের বড় আমোদ বোধ হইল। তিনি বলিলেন "So you want a job" (তুমি কর্ম্ম চাও বটে ?)

সাহেব হড়্‌বড়্ করিয়া কি বলিল অনঙ্গ কিছুই বুঝিল না, সে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল। সাহেব বুঝিলেন যে সে তাঁহার কথা বুঝিতে পারে নাই তাই তিনি এখন হইতে ধীরে ধীরে প্রত্যেক কথা স্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন।

সে কি কাজ চায় জিজ্ঞাসা করায় অনঙ্গ বলিল যে সে jute breaker এর কাজ পাইতে ইচ্ছা করে—তাড়াতাড়ি ইংরাজী বলার পণ রক্ষা করিতে যাইয়া broker কথাটা ভাবিয়া বলিবার অবসর পাইল না।

সাহেবের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা দুষ্কর হইল, তিনি হাসি চাপিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বাড়ী কোথা বাবু ?"

অনঙ্গ চট্ করিয়া বলিল "pangs"—পাঙ্গাশের বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ নিশ্চয়ই pangs হইবে।

সাহেব বলিলেন ""Pangs ? What a funny name. Where is that ? (প্যাংস ? কি অদ্ভুত নাম। সে কোথা ?)

এইবার সাহেবকে তাহার ইংরাজী কথা শুনাইবার সুবিধা হইল। "ডোণ্টিউ Know Pangs" বলিয়া আরম্ভ করিয়া সে তাহাদের গ্রামের অবস্থান সাহেবকে বুঝাইয়া দিল।

আরও একটু রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে সাহেব অনঙ্গর পোষাকে আলকাৎরার দাগের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "তোমার কোটে ও কিসের রং লাগিয়াছে বাবু ?"

মুহূর্ত্তমাত্রও চিন্তা না করিয়া অনঙ্গ বলিল "অ্যাল্‌-ক্যাটোরা।"

দেশী আলকাতরা কথাটি সাহেব জানিতেন, কৌতুকে তাঁহার চক্ষু নাচিতে লাগিল। তাহার পর ঘড়ির দিকে চাহিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "বাবু, তোমার বয়স কম, এখন তোমার জন্য কিছু করিতে পারিব না, চার পাচ বছর পরে আসিলে তোমার কোন উপায় হয় কি-না দেখিতে পারি। সেবাষ্টিয়ানকে বলিও যে আমার কাছে তোমাকে পাঠান তাহার উচিত হয় নাই। এখন প্রস্থান কর।"

হতাশ হৃদয়ে অনঙ্গ ফিরিয়া আসিল।

(৪)

ইহার পর একদিন অনঙ্গ স্কুলের পর বাড়ী যাইবে বলিয়া নৌকায় উঠিতে যাইতেছে এমন সময় ডাক-হরকরা তাহার হাতে একখানা কাগজ দিল তাহাতে লেখা "তুমি এখনই আসিয়া আমার সহিত দেখা করিবে, জরুরি কথা আছে—মেরিয়া।" অনঙ্গ ভাবিল হয়তো তাহার কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে সেবাষ্টিয়ান কোন নূতন মতলব ঠিক করিয়াছে। মাঝিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে পোষ্টআফিসে চলিল।

একই বাড়ীতে ডাকঘর ও পোষ্টমাষ্টারের বাসা। বাড়ীর সম্মুখস্থ একটি ঘরে আফিস, তাহার সংলগ্ন ঘরটিতে পোষ্ট-মাষ্টার শয়ন করে, তাহার পর একটা ঘরে পোষ্টমাষ্টারের ও তাহার ভগ্নীর জিনিষ-পত্র ও কাপড় চোপড় থাকে, তাহার

পরের ঘর মেরিয়ার শয়নগৃহ, তাহার পর বৈঠকখানা। বাহিরের লোক পোষ্টমাষ্টারের বাসায় যাইতে হইলে বাড়ীর পশ্চাতের দরজা দিয়া এই বৈঠকখানায় উপস্থিত হয়।

অনঙ্গ যখন পোষ্টমাষ্টারের বাসায় পৌছিল তখন প্রায় সন্ধ্যা ছয়টা, শীতকালের বেলা, অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। বিকাল তিনটার সময় ডাক যায়, তাহার পর আর বড় কাজ-কর্ম্ম থাকে না পাঁচটার সময় সেবাষ্টিয়ান আফিস বন্ধ করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসে। বৈঠকখানায় ঢুকিয়া কিন্তু অনঙ্গ সেবাষ্টিয়ানকে দেখিতে পাইল না, সে দেখিল মেরিয়া একা ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতেছে।

অনঙ্গকে দেখিয়াই মেরিয়া তাহার কাছে আসিয়া কোন-রূপ ভূমিকা না করিয়া উত্তেজিতস্বরে কহিল "কত টাকা পেলে তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজী আছ?"

বিস্মিত হইয়া অনঙ্গ দেখিল মেরিয়ার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতেছে, তাহার বক্ষ উঠিতেছে পড়িতেছে। মেরিয়ার কথায় ও ভাবে অনঙ্গ থতমত খাইয়া গেল, সে মেরিয়ার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

মেরিয়া অসহিষ্ণু ভাবে বলিল "চুপ করে আছ কেন? বল না কত টাকা পেলে আমাকে বিয়ে করে এই নরক থেকে উদ্ধার করতে পার?"

ব্যাপারখানা অনঙ্গ কিছুই বুঝিতে পারিল না। নগদ কত টাকা পাইলে সে মেরিয়াকে বিবাহ করিতে পারে তাহা সে কখনও মনে ভাবে নাই। সে কি জবাব দিবে?

মেরিয়া আবার তাড়া দিতে সে বলিয়া উঠিল "হাজার টাকা।" তাহার মনে হইল হাজার টাকা অনেক টাকা।

মেরিয়া বলিল "বেশ কথা। আমি তিন হাজার টাকা জোগাড় করেছি, এই দেখ নোটের তাড়া। চল, বাহির হইয়া পড়ি। ময়মনসিংহ-এর দিকে এক জায়গায় যাইব, সেখানে যাইয়া আমি বিবাহের ব্যবস্থা করিব, তোমাকে কিছু করিতে হইবে না।"

অনঙ্গর মাথা ঘুরিয়া গেল। তিন হাজার টাকা তাহার পক্ষে স্বপ্নাতীত ধন। সে বলিয়া উঠিল "আমি এখনি যেতে রাজি আছি। কিন্তু সেবাষ্টিয়ান কোথা"

মেরিয়া ঘৃণার সহিত কহিল "সেবাষ্টিয়ান? সে মদ খেয়ে মড়ার মত ঘুমুচ্ছে। তার নাম আমার কাছে কোরো না। সে রোজ আমায় গালাগালি দিত, বাড়ি থেকে চলে যেতে বলত। তুমি ম্যাক্‌নীল সাহেবের কাছ হতে নিষ্ফল হয়ে ফেরবার পর থেকে সে রোজ সন্ধ্যাবেলা মদ খেয়ে আমায় মারতে আরম্ভ করেছে। কাল রাত্রে আমায় লাথি মেরে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, আমি সমস্ত রাত্রি বারান্দায় বসে কাটিয়েছি।" বলিতে বলিতে মেরিয়ার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ছাত্রাবস্থায় প্রায় সকলেই ভাবপ্রবণ হয় এবং প্রায় সকলের মনেই অত্যাচারের প্রতিকার ও অসাধ্য সাধন করার স্পৃহা থাকে, থাকে না কেবল সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও সকল দিক দেখিয়া বিবেচনা করার প্রবৃত্তি। মেরিয়ার প্রতি করুণায় অনঙ্গর মন গলিয়া গেল, তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য মন ঝুঁকিয়া পড়িল।

অনঙ্গর পরম আকাঙ্ক্ষার ধন মুক্তিলাভ, তাহার নিত্য দুঃখময় জীবন হইতে নিষ্কৃতির উপায়, কল্পনাতিরিক্ত টাকা যাহার দ্বারা সে বোধ হয় চির-জীবন সুখে কাটাইতে পারে—এই সকল অমূল্য দান হস্তে লইয়া বিপন্ন মেম সাহেব তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। আজ যদি কোন দেবতা অনঙ্গর নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিতেন "অনঙ্গ, তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তাহা হইলে সে ইহার অধিক কিছু চাহিতে পারিত না। আনন্দে তাহার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, সে মেরিয়াকে বলিল "আমি তোমার কথায় খুব রাজি আছি। কি করতে হবে বল।"

"চল, এক খানা নৌকা ভাড়া করে ময়মনসিং এর দিকে যাই। কাল সকালে যখন আমার ভাইয়ের নেশা ছুটবে আর দেখবে আমি নেই তখন ভাববে আমি ঢাকায় গেছি কারণ ঢাকায় আমাদের পরিচিত লোক আছে, সুতরাং ঐ দিকেই খোঁজ করবে। আমরা কিন্তু যাব বিপরীত দিকে। কাল তোমার বন্ধু কি রকম পাগলের মত ছুটোছুটি করবে আর নিজের চুল ছিড়বে আমার দেখতে ইচ্ছা করছে।"

অনঙ্গর মনে খটকা বাধিল। মেরিয়ার অন্তর্ধানে সেবা-ষ্টিয়ান খুসী হইবার কথা, সে পাগলের মত ছুটাছুটি করিবে ও

চুল ছিঁড়িবে কেন ? সে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার অভাবে সেবাষ্টিয়ান পাগল হয়ে যাবে ?"

মেরিয়া বলিল "আমার অভাবে নয়, আমার সঙ্গে ডাক-ঘরের তিন হাজার টাকা অন্তর্ধান হয়ে যাবে বলে। তোমার মনের ভাব না জেনে এ কথাটা বলা উচিত নয় বলে এতক্ষণ বলি নি, তুমি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছ বলে এখন বলছি। কথাটা তোমার জানা দরকার কারণ গোড়া থেকেই আমাদের দুজনকে সাবধানে চলতে হবে। আমি সেবাষ্টিয়ানকে মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলে ডাকঘরের লোহার সিন্দুক থেকে এই তিন হাজার টাকা বার করে নিয়েছি। সয়তান আমার প্রতি যেমন দুর্ব্যবহার করেছে তার প্রতিফল পাবে, চাকরি তো যাবেই, উপরন্তু জেলেও যেতে পারে।" এই বলিয়া মেরিয়া ক্রূর হাসি হাসিল।

অনঙ্গ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া দৃঢ়-স্বরে বলিল "তবে আমি এর মধ্যে থাকব না, তোমার সঙ্গে যাব না।

দ্রুতপদে অনঙ্গর কাছে আসিয়া মেরিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল "কেন ? ভয় করছে ? আমি বলছি ধরা পড়বার কোন ভয় নেই। কাল যখন সেবাষ্টিয়ান টাকা যাওয়ার কথা জানবে ততক্ষণে আমরা এমন জায়গায় পৌঁছাব যার কথা কারো মনেই হবে না। তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।"

অনঙ্গ সতেজে বলিল "ধরা পড়বার ভয়ের জন্য আমি বলছি না। তোমার প্রস্তাবে আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। আমি চুরির সংশ্রবে থাকতে চাই না। আমি চল্লাম।"

কঠিন মুষ্টিতে অনঙ্গর বাহু চাপিয়া ধরিয়া মেরিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল "ও, তুমি বড় সাধু। সে দিন না সেবাষ্টিয়ানের কাছে বলছিলে যে তোমার বাপের বাক্স ভেঙ্গে টাকা নিয়ে কোথা গিয়ে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করবে ?"

ইহার সদুত্তর অনঙ্গর মনে হইল না। বাপের বাক্স হইতে গোটা পঞ্চাশ টাকা লইয়া রোজগারের চেষ্টায় যাওয়া ও সরকারি আফিস হইতে কয়েক হাজার টাকা চুরি করিয়া পলায়ন করার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি তাহার হইল না। সে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

মেরিয়া বলিল "তুমি যখন এই চুরির কথা জানতে পেরেছ তখন তোমায় কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি আমার কথায় রাজি না হলে কি হবে জান ? আমি সকলকে বলব যে তুমি টাকাটা চুরি করেছ। তুমি এখানে ঘন ঘন আসতে তা সকলে জানে এবং সেবাষ্টিয়ান দু চার বার তোমার সাক্ষাতে লোহার সিন্দুকে টাকা তুলে রেখেছে, তোমার টাকার দরকার, তুমি বাপের বাক্স ভেঙ্গে টাকা নেবার মৎলব করেছিলে এ সব বিষয়ে আমরা সাক্ষ্য দেব। ব্যাপারটি বেশ করে বুঝে বল আমার সঙ্গে যাবে কি না।"

অনঙ্গর চক্ষুস্থির। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, হাত-পা কাঁপিতে লাগিল।

ঔষধ ধরিয়াছে বুঝিয়া মেরিয়া বলিতে লাগিল "অন্য দিকে দেখ,তুমি আমার কথা মতন কাজ করলে খাসা আরামে জীবন কাটাতে পারবে। কেমন, রাজি আছ ?"

অনেক ক্ষণ ভাবিয়া অনঙ্গ কম্পিত স্বরে বলিল "আচ্ছা, তুমি যা বলছ তাই করব। তুমি তো প্রস্তুত ?"

"হাঁ, চল।"

অনঙ্গ কহিল "দাঁড়াও, একটা কথা আছে। আমি ধুতি পরে তোমার সঙ্গে গেলে নৌকার মাঝিরা সন্দেহ করবে, হয়তো আমাদের নিয়ে যেতেই চাইবে না। আমি সেবাষ্টিয়ানের একটা পোষাক পরে নি।„

"ঠিক বলেছ, তোমার ইংরাজি পোষাক পরে যাওয়াই নিরাপদ। ও ঘরে গিয়ে পোষাক বদলে এস।"

কথাবার্ত্তা হইতেছিল বসিবার ঘরে। সে ঘরের পর মেরিয়ার কামরা, তাহার পরের কামরায় কাপড় চোপড় ও জিনিস-পত্র থাকে, তাহার পর সেবাষ্টিয়ানের ঘর। অনঙ্গ বৈঠকখানা হইতে মেরিয়ার ঘরের মধ্য দিয়া জিনিস পত্রের কামরায় ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল, সে কামরা দিয়া সেবাষ্টিয়ানের ঘরে উপস্থিত হইয়া তাহারও দরজা বন্ধ করিল। সেবাষ্টিয়ান চিৎ হইয়া হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া হাঁ করিয়া নাক ডাকাইতেছে। বারান্দায় বালতিতে জল ছিল, অনঙ্গ তাড়াতাড়ি তাহা আনিয়া সেই এক বালতি বরফের মত ঠাণ্ডা জল সেবাষ্টিয়ানের মাথা ও মুখের উপর ঢালিয়া দিয়াই হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। সেবাষ্টিয়ান ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, মুখে চাপা থাকায় চীৎকার করিতে

পারিল না। অনঙ্গ তাহাকে ধরিয়া প্রাণপণে ঝাঁকানি দিতে দিতে চাপাগলায় বলিতে লাগিল "সেবাষ্টিয়ান, সেবাষ্টিয়ান, আমি অনঙ্গ। শোন, মেরিয়া পোষ্ট আফিসের লোহার সিন্দুক থেকে তিন হাজার টাকা বার করে নিয়ে পালাচ্ছে।"

সেবাষ্টিয়ান প্রথমটা হতবুদ্ধি হইয়া গেলেও পোষ্ট আফিসের টাকা চুরির কথাটা তাহার মগজে পৌছিতেই তাহায় নেশা আশ্চর্য্য রকম তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেল; অনঙ্গ তাহাকে ধরিয়া মাঝের দুই ঘরের দরজা খুলিয়া বসিবার ঘর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিল।

হঠাৎ সেবাষ্টিয়ানকে দেখিয়া মেরিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেল, সেবাষ্টিয়ান তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া নোটের তাড়া কাড়িয়া লইল। ভাই-ভগ্নীর এই মধুর মিলন-দৃশ্য অনঙ্গ বেশীক্ষণ উপভোগ করিতে পারিল না, কারণ মেরিয়া উচ্চৈঃস্বরে "বিশ্বাসঘাতক শয়তান" বলিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল। অনঙ্গ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া একেবারে রাস্তায় যাইয়া উপস্থিত হইল।

পোষ্ট মাষ্টারের বাসায় গোলমাল শুনিয়া দুই একজন পথচারী থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অনঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইতে তাহাদের একজনের ঘাড়ে পড়িল। অনঙ্গ সভয়ে দেখিল লোকটি তাহাদের প্রতিবেশী মুকুন্দ ভাদুড়ি। ভাদুড়ি মহাশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পোষ্ট মাষ্টারের বাসায় কিসের গোলমাল এবং সেই বা রাত্রি বেলা সেখানে কি করিতেছিল। অনঙ্গ অম্লানবদনে বলিল যে গোলমাল শুনিয়া সে পোষ্ট মাষ্টারের বাসায় ঢুকিয়া পড়িয়াছিল সেজন্য মেমটা তাহাকে তাড়া করিয়া আসিয়াছে। সে ভাদুড়ি মহাশয়কে কাকুতি মিনতি করিয়া অনুরোধ করিল তাহার বাবাকে যেন এ ঘটনার কথা না বলেন, বলিলে সে বড় বিপদে পড়িবে!

অনঙ্গ জানিত না কত বড় বিপদ হইতে সে আজ রক্ষা পাইল। মেরিয়ার মৎলব ছিল টাকা চুরির সম্পূর্ণ দোষ অনঙ্গর ঘাড়ে চাপাইয়া নিজে টাকা লইয়া সরিয়া পড়িবে। এই উদ্দেশ্যেই সে অনঙ্গকে নিরুদ্দেশ হইবার জন্য জেদ করিয়াছিল।

(৫)

মুকুন্দ ভাদুড়ি মামলা বাজিতে ওস্তাদ এবং কুটিল মকদ্দমা ও বিবাদ বিসংবাদে জমিদার মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত। প্রত্যহ প্রাতে ৯৷৷০ টার সময় তিনি একখণ্ড কাপড়ে বাঁধা কতকগুলি কাগজ পত্র লইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে, কাণে একটি খড়কে গুঁজিয়া, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিয়া আদালতে বাহির হন অথবা জমিদার বাড়ী গমন করেন এবং সন্ধ্যার পর জমিদার-বাটী হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। মামলা করিয়া তাঁহার চুল পাকিয়া গেল, আজ অনঙ্গর মত একটা ছোঁড়া মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে ভুলাইবে? পোষ্ট আফিসের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি যাহা ভাবিবার তাহা ভাবিলেন এবং সে রাত্রিতে অনঙ্গকে আশ্বাস দিয়াও পরদিন প্রাতে খড়ম পায়ে অনঙ্গদের বাড়ী আসিয়া তাহার বাপের নিকট অনঙ্গর কীর্ত্তির কথা বলিয়া দিলেন।

সেদিন অনঙ্গর যে শাস্তি ভোগ হইল তাহা বলিবার নহে। সে বালক নহে, তাহার আত্মসম্মান জ্ঞান ধীরে ধীরে ফুটিতেছিল ইদানীং সেবাষ্টিয়ানের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার আত্মসম্মান জ্ঞান দ্রুত বাড়িয়া গিয়াছিল। এতদিন অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান সে নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া আসিয়াছে কিন্তু আজিকার নির্য্যাতনে তাহার অন্তরাত্মা আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং তাহার ফলে অনঙ্গর বাহ্যিক শান্ত স্বভাবের আবরণ ভেদ করিয়া পৈত্রিক উগ্রপ্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিল! মুকুন্দ ভাদুড়ির প্রতি তাহার প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্রোধ জন্মিল, তাহার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। অনঙ্গ দৃঢ় সঙ্কল্প করিল যে আজ সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ভাদুড়ি যখন নদীতীরের রাস্তা দিয়া বাড়ী ফিরিবে তখন এই অপমানের প্রতিশোধ লইবে—সন্ধ্যার অন্ধকারে সে লাঠি লইয়া নদীর পাড়ের নীচে লুকাইয়া থাকিবে এবং ভাদুড়ি সেখান দিয়া যাইবার সময় তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া নিশ্চয় তাহার ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া দিবে।

গ্রামে মুকুন্দ ভাদুড়ির সুনাম ছিল না এবং তাহার কূট চক্রান্ত ও মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে গ্রামের মধ্যে ও বাহিরে তাহার শত্রুর অভাব ছিল না। সম্প্রতি জমিদার মহাশয়

মুকুন্দর সহায়তায় কয়েকজন দুর্দ্দান্ত মুসলমান ও হিন্দু প্রজাকে একটা চর হইতে উচ্ছেদ সাধন করায় সেই প্রজারা মুকুন্দর উপর খড়্গহস্ত হইয়া আছে এবং শুনা যাইতেছে যে তাহারা প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিতেছে। এ জন্য আজকাল জমিদার মহাশয়ের দুইজন পাইক সর্ব্বদা মুকুন্দের সঙ্গে সঙ্গে থাকে! এ খবর অনঙ্গ জানিত না, জানিলে সে মুকুন্দকে প্রহার করিবার জন্য নদীকূলে ওৎ পাতিয়া থাকিত না।

নদীর ধার দিয়া রাস্তা, রাস্তা হইতে কুড়ি পাঁচশ হাত ব্যবধানে মুকুন্দর বাড়ী। নদীর পাড় অনুচ্চ, জলের ধারে দাঁড়াইলে রাস্তার অনেকটা দেখা যায়। পাছে রাস্তা হইতে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে অনঙ্গ নদীর পাড়ের নীচে বসিয়া আছে, তাহার হাতে একগাছা প্রকাণ্ড পাকা লাঠি। তাহার মাথার কাছে পাড়ের উপর একটা ঝোপ, সে মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঝোপের আড়াল হইতে দেখিতেছে দূরে মুকুন্দ আসিতেছে কি না।

মুকুন্দর বাড়ী ও রাস্তার মধ্যে একটা ঘন বাঁশবন, বাঁশবনের মধ্য দিয়া একটা সরু পথ মুকুন্দর বাড়ীর দরজা হইতে সরকারি রাস্তায় পড়িয়াছে, রাস্তার পরই নদী।

অনঙ্গ বসিয়া আছে এমন সময় মুকুন্দর বাড়ীর দরজা খোলার শব্দ শুনিয়া সে কাণ পাতিয়া রহিল! সে শুনিতে পাইল মুকুন্দর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কে দুইজন কথা বলিতে বলিতে রাস্তার দিকে আসিতেছে। তাহারা নিকটবর্ত্তি হইলে তাহাদের কথা ও গলার স্বর হইতে অনঙ্গ বুঝিল যে মুকুন্দর যুবতী কন্যা পদ্মাবতী তাহার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে নদীতে আসিতেছে। স্ত্রীলোক ঘাটে আসিতেছে এ সময় তাহার ঘাটের কাছে থাকা উচিত নয় অথচ সে যদি স্থান ত্যাগ করে তাহা হইলে মুকুন্দর ঠ্যাং ভাঙ্গিবার আশা ত্যাগ করিতে হয় এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সে বিষম বিরক্ত হইল। মুকুন্দকে লগুড়াঘাতের পরিবর্ত্তে তাহার কন্যা ও পুত্রকে দুই একটা চড় চাপড় দেওয়া যায় কি না—এমনি একটা কথা তাহার মনে হইয়াছে এমন সময় সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা চিরিয়া স্ত্রী কণ্ঠের তীব্র চীৎকার শোনা গেল, তাহার পর রাস্তার উপর ধস্তাধস্তির আওয়াজ হইতে লাগিল। অনঙ্গ লাফাইয়া উঠিয়া ঝোপের আড়াল হইতে দেখিল যে রাস্তার উপর তিনজন ইতর শ্রেণীর ষণ্ডা লোক পদ্মাবতীর মুখে গামছা বাঁধিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে পদ্মাবতীর ছোট ভাই—"ওরে আমার দিদিকে ডাকাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে রে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেই আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন নির্ম্মমভাবে তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া কঠোরস্বরে শাসাইল "ফের যদি টুঁ শব্দ করবি তাহলে তোর পেটের মধ্যে এই সড়কি চালিয়ে দেব" এবং এক ধাক্কা দিয়া তাহাকে বাঁশবনের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহার পর চতুর্দ্দিকে চাহিয়া সে উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া কহিল "কে কোথা আছিস সকলে শুনে রাখ, আমরা তিন মরদ পাঁচ হাতিয়ারবন্দ, যে শালা আমাদের কাছে এগুবে তাকে জাহান্নমে পাঠাব!" পদ্মাবতী ও তাহার ভ্রাতার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া যে দুই চারিজন লোক ছুটিয়া আসিয়াছিল তাহারা বেগতিক দেখিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল। দুর্ব্বৃত্তেরা পদ্মাবতীকে টানিয়া লইয়া বাঁশবনের পরই একটা সুবিস্তীর্ণ ধান ক্ষেতের দিকে অগ্রসর হইল!

ঝোপের আড়াল হইতে অনঙ্গ সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। সে স্পষ্ট দেখিল তিনজন ডাকাতেরই কাছে শাণিত অস্ত্র আছে এবং ইহাও বুঝিল যে ইহারা বাধা পাইলে খুন করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিবে না। কয়েক জন গ্রামবাসী ভয়ে পলাইয়া গেল তাহাও সে স্বচক্ষে দেখিল। সে নিজে কোন দিন ব্যায়াম-চর্চ্চা করে নাই এবং সাহসী বা ডানপিটে বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল না! কিন্তু চক্ষের উপর অসহায় স্ত্রীলোকের প্রতি এই ভয়ঙ্কর অত্যাচার দেখিয়া অনঙ্গ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গেল। দুর্ব্বৃত্তদের অস্ত্রশস্ত্র ও ভীতি প্রদর্শনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মুকুন্দর প্রতি নিজের বিষম আক্রোশ ভুলিয়া সে এক লম্ফে পাড়ের উপর উঠিয়া ছুটিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে অতর্কিতে একজন গুণ্ডার মাথায় প্রচণ্ড লাঠির আঘাত করিল। লোকটার মাথা দুফাঁক হইয়া গেল, সে "বাপ" বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্য দুইজন গুণ্ডা পদ্মাবতীকে ছাড়িয়া দিয়া অনঙ্গর দিকে ফিরিতেই সে "পদ্মাদিদি পালান" "পদ্মাদিদি পালান"

বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে দ্বিতীয় গুণ্ডার মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি চালাইল। কিন্তু সে লাঠিখেলার কৌশল জানিত না লাঠি চালাইতে অভ্যস্তও নয়, দ্বিতীয় গুণ্ডা ক্ষিপ্র হস্তে লাঠি ধরিয়া লইয়া এমন এক হ্যাঁচ্‌কা টান দিল যে অনঙ্গ লাঠি ছাড়িয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় গুণ্ডা তাহার বুক লক্ষ্য করিয়া ছুরি চালাইল। সৌভাগ্য ক্রমে সে সময়ে অনঙ্গ পতনোন্মুখ অবস্থা হইতে টাল সামলাইতে ছিল তাই ছুরি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া তাহার উরুতে বিদ্ধ হইল। আর রক্ষা নাই বুঝিয়া অনঙ্গ আহত ব্যাঘ্রের মত হঠাৎ নিকটস্থ গুণ্ডার উপর ঝাঁপাইয়া পাড়য়া প্রাণপণে তাহার নাক কামড়াইয়া ধরিল। লোকটা এরূপ অশাস্ত্রীয় আক্রমণ ও যুদ্ধবিধির জন্য প্রস্তুত ছিল না বালয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, বিকট চীৎকার করিয়া অনঙ্গকে জড়াইয়া ধরিয়া মাটিতে পড়িয়া এবং দুই জনে আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

এমন সময় একজন লণ্ঠন-বাহী ভৃত্য ও দুই জন পাইক সমভিব্যাহারে স্বয়ং মুকুন্দ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুকুন্দ তাহার কন্যা-হরণের কথা কিছুই জানে না, সে জমিদার বাটি হইতে ঘরে ফিরিতেছিল, পথিমধ্যে গোলমাল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহারা আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই অক্ষত-দেহ গুণ্ডাটা রণে ভঙ্গ দিয়া ধানক্ষেতের ভিতর দিয়া পলায়ন করিল এবং দ্বিতীয় গুণ্ডাটা অনঙ্গর বাহুপাশ ও নাসিকাগ্রাস হইতে নিজেকে সবলে মুক্ত করিয়া সঙ্গীর অনুসরণ করিল। মুকুন্দ আসিয়া দেখিল এক ধারে পদ্মাবতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, নিকটে একটা গুণ্ডার মত লোক বিদীর্ণ মস্তকে পড়িয়া কাৎরাইতেছে এবং অনতিদূরে অনঙ্গ রক্তাক্ত কলেবরে অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া আপনার মনে বকিতেছে "পদ্মাদিদি পালান, পদ্মাদিদি পালান।"

অনঙ্গের উরুদেশে গভীর ক্ষত হইয়াছিল এবং প্রচুর রক্তস্রাব ও উৎকট মানসিক উত্তেজনার ফলে তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পনের কুড়ি দিন হাসপাতালে কাটাইয়া সে অবশেষে আরোগ্য লাভ করিল।

অনঙ্গর বীরত্বের কাহিনী চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল ও সংবাদ পত্রে যথেষ্ট আলোচিত হইল। কিন্তু পদ্মাবতী-উদ্ধারের পূর্ব্বে সে কি অভিসন্ধিতে নদী তীরে গিয়াছিল এবং মুকুন্দ ভাদুড়ি তাহার প্রতি কিরূপ অন্যায় করিয়াছিল সে সকল কথা কেহ না জানায় অনঙ্গর অন্তঃকরণ যে কত উচ্চ ও তাহার প্রকৃতি কত মহৎ তাহা লোকে জানিলও না বুঝিলও না। অনঙ্গ নিজে ইহা উপলব্ধি করিয়াছিল কি না সন্দেহ। সে হাসপাতাল হইতে বাড়ী ফিরিলে যখন ভাদুড়ি মহাশয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া নিজের অঙ্গুষ্ঠে উপবীত জড়াইয়া অনঙ্গর মাথার উপর হাত রাখিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন "বাবা, তুমি আমার ও আমার মেয়ের প্রাণ, ইজ্জৎ, মান সব রক্ষা করেছ", তখন অনঙ্গ সতৃষ্ণ নয়নে মুকুন্দ ভাদুড়ির পদদ্বয় নিরীক্ষণ করিতে করিতে মনে মনে বলিল "হালা, বগবান নি তোর ঠ্যাং দুটারে বাচাইছে" (শালা, ভগবানই তোর ঠ্যাং দুটোকে বাঁচিয়েছেন) !

শ্রেষ্ঠ কে ? যে জানিয়া মহৎ কার্য্য করে, অথবা অজ্ঞাতসারে যাহার মহত্ত্ব ফুটিয়া ওঠে ? যে দুর্নামের ভয়ে লোভ সম্বরণ করে, না যে হীন ও নিন্দাভাজন হইয়াও বিবেক বশতঃ দুর্জ্জয় লোভ দমন করে ? যে সুশিক্ষিত যোদ্ধা উত্তেজনাপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে গৌরবলাভ করে, না যে আত্মরক্ষায় অনভ্যস্ত হইয়াও পরের জন্য সশস্ত্র দস্যুদের আক্রমণ করে ?

প্রাচীন মিশরের দেবদেবী

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(৪৫শ সপ্তাহ দেখুন)

[শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ বি-এস্-সি]

ওসিরিস্ আইসিস্ ও হোরাস্ ছাড়া আর একদল মনুষ্যাকৃতি দেবতা মিশরে বেশ প্রতিষ্ঠা গেড়েছিলেন। এঁদের নাম, আমন, মাত ও খেঁসু। আমন দেবই এই দলের প্রধান দেবতা;—এঁর ভক্তের সংখ্যা আমন ওয়েসিসেই বেশী ছিল। মাত মাতৃত্বের দেবী অর্থাৎ জগজ্জননী। খেঁসু ভ্রমণশীল চন্দ্রদেব। ওসিরিস্, আইসিস্ ও হোরাস দেবতাদের সঙ্গে আমন, মাত ও খেঁসু দেবতাদের অনেকটা মিল দেখা যায়।

হোরাস্ দেবতার বাজমুখো মূর্ত্তি

[illegible] দেব আ[illegible] মূর্ত্তি

[illegible]

সূর্য্যদেবতা রা
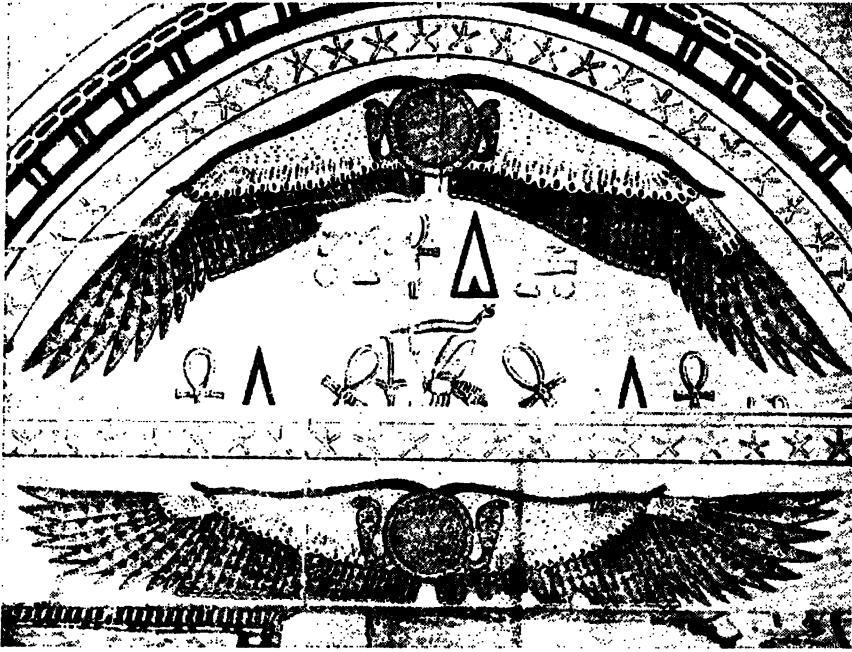
খৃঃ পূর্ব্ব ১০০০ বছরের পর থেকে-আর একদল নূতন দেবতার উদ্ভব মিশরে হয়; এই নূতন দেবতাগুলি এক একটী প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিমূর্ত্তি ;—এইখানেই আগেকার দেবতাগুলির সঙ্গে এদের তফাৎ। এই নূতন দেবতাদের

চন্দ্রদেবতা থথ

সয়তান দেবতা সেট

মধ্যে সূর্য্যদেবতা "রা" প্রধান। এ ছাড়া উষার দেবতা খেপেরা, সন্ধ্যার দেবতা আটন; চন্দ্রের দেবতা থথ্, তারার দেবতা অরিয়ন্ এই দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য! সূর্য্যদেবতা রা একাধারে সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা ও বিনাশকর্ত্তা। একটী

তারার দেবতা অরিয়ণ

গোল সূর্য্যমূর্ত্তির দুইদিকে দুটী ডানা, দুটী ভেড়ার শিং আর দুটী সাপ আঁকা ;—এই হচ্ছে মোটামুটী "রা" দেবতার মূর্ত্তি! সাপ দুটি ধ্বংশের চিহ্ন ;—ডানা দুটী আশ্রিত-রক্ষার চিহ্ন আর ভেড়ার শিং দুটী সৃজনের চিহ্ন। এই সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা মিশরে অনেকদিন চলেছিল। খৃষ্টের প্রায় ১৪০০ বছর আগে রাজা আখ্‌নাটন একবার এর বদলে নিরাকার তেজোময় সূর্য্যের পূজা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেছিলেন ;—কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই সে সব বন্ধ হয়ে যায়।

খৃঃ পূর্ব্ব ৫৮০০ বছরের পর থেকে আবার কতকগুলি নূতন দেবতার পূজা আরম্ভ হয়! এই দেবতাগুলিকে

মেম্ফিস্ নগরের দেবতা টাহ্

এক একটী বিশেষ গুণের আধার বলে কল্পনা করা হ'ত ;— এই হিসাবে এগুলি সূর্য্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক দেবতাদের থেকে ভিন্ন। এই দলের দেবতাদের মধ্যে টাহ্, সেখমেত, নেফারটেম এবং ইম্‌হোটেপ প্রসিদ্ধ। টাহ্ সৃষ্টিকর্ত্তা, হাতে এর রাজদণ্ড—সুতরাং এই দলের প্রধান দেবতা ;— মেম্ফিস্ নগরেই এর ভক্ত সব চেয়ে বেশী ছিল। টাহের স্ত্রী সেখমেত ; পাঠকপাঠিকাদের বোধ হয় মনে আছে যে জানোয়ার মুখো দেবতাদের যুগে সেখমেতকে সিংহমুখী বলে কল্পনা করা হ'ত। নেফারটেম্ কৃষির দেবতা ; এঁর মূর্ত্তির মাথায় একটী আধফোটা পদ্মফুল। ইম্‌হোটেপ হচ্ছেন দেবতাদের চিকিৎসক—হাতে তাঁর একখানা পুঁথি।

·হে·র পুত্র নেফা·ে ম

··· ··· ···

ইনি আমাদের অশ্বিনীকুমারের পড়্‌সী। এ ছাড়া আরও দুটী দেবতা মিশরের স্থানে স্থানে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করে'ছিলেন। একজন জগৎপিতা মিন্; আর একজন জগৎ-মাতা হাথর। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম যুগে দেবী হাথর ম্যাডোনা রূপে পূজা পেয়েছিলেন।

প্রাচীন মিশরের প্রধান দেবদেবীদের কথা উপরে বলা গেল;—এ ছাড়া ছোট ছোট দেবদেবী আরও অনেক ছিলেন। এই সব দেবদেবীদের সম্বন্ধে গল্প গাঁথাও অনেক প্রচলিত আছে; আমার এই ছোট প্রবন্ধে সে সব কথা বলবার অবকাশ নেই। তাই শুধু আমাদের দেশের দেশদেবীদের সঙ্গে এই স্থানের হরেক রকম দেবদেবীদের একটু তুলনা মূলক পরিচয় দিয়েই প্রবন্ধ শেষ করলুম!

শ্রীগুরবে নমঃ

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

উষর মরুতে বহাইলা যেই শান্ত শীতল সলিল ধারা
কণ্টক তরু করুণায় যাঁর ফল ফুল ভারে হইল হারা
উদ্ধত উঁচু শৈল-সমাজ এ শির যাঁহার চরণে লুটে
যাঁহার কৃপায় নূতন দৃষ্টি ফুটিল অন্ধ নয়ন পুটে
শম দাতা সেই সদা নামরূপ নামময়, লহ প্রণাম মম
আমি অভাজন, ওগো মহাজন নর-নারায়ণ গুরুরে নম।

যে নাম শ্রবণে হল পবিত্র চির আচরিত পাপ শরীর,
স্তম্ভিত হল ইন্দ্রিয়গণ, চিতে এল স্রোত ভোগবতীর,
যেই জ্ঞান আর বুদ্ধি তর্কে প্রচার করেছি নাস্তিকতা
কোন্ মনীষীর নয়ন নিপাতে নিমেষে সে সব পলাল' কোথা—
নামদাতা সেই সদা নামরূপ নামময়, লহ প্রণাম মম
আমি অভাজন, ওগো মহাজন নর-নারায়ণ গুরুরে নম।

এ কি যাদু তব হে মহাপুরুষ, শক্তি তোমার চমৎকার -
বিনামূলে নিছ' নিজ মাথা পেতে এত পাতকীর পাপের ভার
অবিশ্বাসীরে বিশ্বাস দিয়ে খুলিয়া দিতেছ জ্ঞানের আঁখ
শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ হয়, কে করায় মোর হৃদয়ে থাকি?
নামদাতা সেই সদা নামরূপ নামময়, লহ প্রণাম মম
আমি অভাজন, ওগো মহাজন নর-নারায়ণ গুরুরে নম।

আকাশে বাতাসে বাজে কার বাঁশি ঘন ঘন অই শুনা যে যায়
চিত্তে নিত্য রস-রাসলীলা, বাজিছে নূপুর কে গান গায়?
একি আনন্দ বিরাটছন্দ একি এ গন্ধ ভুবনে আজ!
ওরে খৃষ্টান হিন্দু যবন নিয়ে যা'রে নাম না করি ব্যাজ
শম দাতা সেই সদা নামরূপ নামময় লহ' প্রণাম মম
আমি অভাজন, ওগো মহাজন নর-নারায়ণ গুরুরে নম।

নূতন যুগ

(উপন্যাস)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

মোহিত মেয়েটিকে তাহার হাতে অর্পণ করিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইয়া বিদায় লইল।

পরদিন দুপুরে দীপিকা মেয়েটীর মাথা লইয়া বসিয়া ছিল। তাহাকে আজ সাবান মাখাইয়া গায়ের গন্ধ ও ময়লা গুলা দূর করিয়াছে, এখন মাথাটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারিলেই হয়। পরণে তাহার পরিষ্কার একখানা কাপড় উঠিয়াছে, মেয়েটী বাঁচিয়া গিয়াছে!

খট খট, খট খট খড়মের শব্দে চারিদিক কাঁপাইয়া নগেন্দ্রনাথ নামিয়া আসিলেন, তাঁহার গম্ভীর আরক্ত মুখখানার পানে চাহিয়া দীপিকা একটু সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

"বউ দি—"

নতমুখে দীপিকা বলিল "তিনি ঘরে আছেন. ডাকব কি?"

নগেন্দ্র নাথ তাহার কথার উত্তর না দিয়া গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া বিন্দুবাসিনী উঠিতেছিলেন "এই যে, আমি যাচ্ছিলুম ঠাকুর পো। এসো, বসো।"

তিনি মেঝেয় আসন পাতিয়া দিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র নাথ বসিলেন না তেমনই গর্জ্জনের স্বরে বলিলেন "এসব তোমাদের কি রকম ব্যবহার আমি তাই শুধু জানতে চাই। আমাদের জমীদার কাল তাঁর বাড়ী চণ্ডীপাঠ করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, কাল আমি বাড়ী ছিলুম না অমনি তোমরা এককাণ্ড বাধিয়ে বসেছ?"

শান্তস্বরে বিন্দুবাসিনী বলিলেন "কি কাণ্ড বাধিয়েছি?"

"আবার বলছ কি কাণ্ড বাধিয়েছি? তুমি হিন্দু তা জানি, আমি তোমায় ঠাট্টা করেই খৃষ্টান বলি কারণ অনেক গুলো আচার ব্যবহার তোমার তাদের মতই, বড় একটা কিছু মানতে চাও না। কিন্তু তাই বলে সত্যিই যে তুমি এমন ধারা একটা কাণ্ড করে বসবে তা আমি কখনো ভাবি নি। তোমার বোনঝিটীর বাপ ধরি নে, ওতো আসলে খৃষ্টান, আমার জামাইটাও হয়েছে তেমনি, তা হোক গিয়ে মেয়ে আর পাঠাচ্ছি নে, জামাইকেও আর ঘরে ঢুকতে দিচ্ছি নে, অমন ম্লেচ্ছাচার আমার কাছে চলবে না। তারা দুটোতে যা হউক করুক গিয়ে, তুমি কি বলে তাতে মত দিলে, তুমি কেমন করে ওই অস্পৃশ্যটাকে তুলে নিলে? ছি: ছি:, জাত জন্ম কিছু আর রাখলে না, হিন্দুর নাম একেবারেই ডুবালে। একটা কথা শোনো বউ দি, হিন্দু হয়ে সমাজের মধ্যে থেকেও যে এই সব অনাচার চালাবে এ আমার বড় অসহ্য, তার চেয়ে এক কাজ—,"

বাধা দিয়া বিন্দুবাসিনী একটু তীব্র ভাবেই বলিলেন "কার সমাজ আছে ঠাকুর পো, আমায় সমাজ হতে তাড়িয়ে দেছ তো তোমরাই। দেশ হতে আমায় চির নির্ব্বাসিতা করেছ, দেশে রাষ্ট্র করেছ আমি বিধর্ম্মী, আমি খৃষ্টান। আজ সমাজের ভয় আমায় দেখাতে এসেছ ঠাকুর পো, আমার সমাজ কোথায়, আমার জাত কোথায়? তোমরা আমায় কতখানি দূরে রেখেছ সেটা আগে ভেবে দেখ, যে ঘরে ঠাকুর রয়েছে সে ঘরের দরজার বাইরে আমায় দাঁড়াতে হয়, তোমাদের রান্না ঘরে, তুলসীতলায় যাবার অধিকার আমায় দেছ কি, তবে আজ সমাজের দাবি ধর্ম্মের দাবি করতে আমার কাছে এসেছ কেন?"

অভিমানে দুঃখে ক্ষোভে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল

নরম হইয়া গিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "সত্যি—অস্বীকার করছিনে, কিন্তু আমাদের কাছে থেকেও এতটা দূরে গেছ শুধু তোমার নিজের আচারে ব্যবহারে। এই যে অস্পৃশ্যতা মেয়েটাকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করলে, এটা কি রকম কাজ হয়েছে ভাব দেখি? তুমি শাস্ত্র মান না, ধর্ম্ম মান না, নিজের মতে যেটা ভাল সেইটেই করে যাচ্ছো।"

"হাঁা, সত্যিই তাই, নিজের মনে যেটা ভাল বুঝছি তাই করে যাচ্ছি; তোমাদের কিছু নিচ্ছিনে এ কথা বলো না। ধর্ম্ম সেই একই, জাতিও সেই একই—

কঠোর হাসিয়া নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "হাসালে বউ দি, জাতি এক, তুমি ব্রাহ্মণ, সকল জাতের পূজনীয়া, আর ওই মেয়েটী সকলের ঘৃণ্য চণ্ডাল সেটা মনে কর।"

বিন্দুবাসিনী স্থির কণ্ঠে বলিলেন "মনে আমি অনেক দিন আগেই করেছি, আজ তোমার কথা শুনে মনে করব না নূতন করে। আমি যা সত্য বলে জেনেছি তাই ধরে থাকব তোমাদের কথায় আমি ফিরব না। আমি মেয়েটীকে তার জীবনকালের জন্যে নিয়েছি, তাকে কুড়িয়ে নিয়েছি আর বুক হতে নামাতে পারব না।"

উদ্ধত ক্রোধে নগেন্দ্রনাথ বলিলেন "স্পষ্ট তাই বল। তবে মেয়েটীকেই নিয়ে থাকো, আমাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। বাধ্য হয়ে আমাদের আজই চলে যেতে হবে, এ রকম সত্যিকার ম্লেচ্ছের ঘরে ব্রাহ্মণের জায়গা নেই।"

তেমনিই স্থির কণ্ঠে বিন্দুবাসিনী বলিলেন "তাই যদি ভাল বিবেচনা কর চলে যেতে পার, আমার তাতে একটুও আপত্তি নেই। আমি তোমাদের কাছ হতে বরাবরই এমনি দূরে আছি ঠাকুর পো, বরাবর থাকবও, তোমরা তোমাদের জাতির অহঙ্কার নিয়ে দূরে সরে থেকো, এই জাতিহারার কাছে এসো না, এতে তোমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হবে। সত্যি ঠাকুর পো, এ রোগটা শুধু তোমারই নেই, অনেকেরই আছে। যেটা আগে গুণগত ছিল সেই ব্রাহ্মণত্ব তোমরা এখন বংশগত করে নেছ, তাই চণ্ডালের অধম হয়েও ব্রাহ্মণ আজও ব্রাহ্মণ। গলায় কতকগুলো সুতো ঝুলালেই কি ব্রাহ্মণ হতে পারা যায় ঠাকুর পো, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মালেই কি ব্রাহ্মণ হতে পারা যায়? যে গুণে ব্রাহ্মণ একদিন সমাজ স্থাপন করে সমাজের উপরে আসন নিয়েছিল, আজ সে গুণ তার নেই তবুও সে তেমনি উপরেই থাকতে চায়, যাহার দৃষ্টি পড়ে আছে নীচের দিকে, কেমন করে নিজের পেট ভরাবে তাই। না আর বল্‌তে চাই নে ঠাকুর পো, জাতির পতন দেখছি, বুঝছিও—কাদের দোষে জাতি আজ দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে, তবুও কিছু বলব না। তুমি আমার বাড়ী থাকবে না, আজই চলে যেতে চাও, বেশ, বিকেলেই চলে যেও।"

সত্যই সেই দিন বৈকালে ধর্ম্মভীরু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নগেন্দ্রনাথ পত্নী পুত্র কন্যা লইয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় অনেক উপদেশ দিয়া গেলেন বিন্দুবাসিনী তাহা শুনিয়া গেলেন মাত্র।

(১১)

রাত্রে সন্ধ্যা স্বামীর মুখে যে গন্ধ পাইয়াছিল তাহাতে সে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছিতার ন্যায় পড়িয়া রহিল, স্বামীকে একটা কথাও বলিল না।

এ কি দারুণ অধঃপতন তাহার স্বামীর, কে তাহার দেবতা স্বামীকে এই অধঃপতনের পথে লইয়া গেল? তাহার স্বামী কি দুঃখে মদ খাইতে শিখিলেন?

সন্ধ্যা সমস্ত রাত্রি চোখের জলে বালিস ভিজাইল, হায়রে তাহার স্বামী মাতাল, যে মাতালকে সে চিরকাল ঘৃণা করে, যে মাতাল দেখিলে সে ভয় পায়, তাহার স্বামী সেই মাতাল। ভগবান, সন্ধ্যার সেই উচ্চ হৃদয়, চিরসংযত, চির হাস্যময় স্বামী কোথায় গেল?

কিন্তু সন্ধ্যা জানে না তাহার স্বামীর পান-দোষ অনেক দিন আগেই ঘটিয়াছে, পাছে সন্ধ্যা জানিতে পারে তাই যে দিন সে মদ খাইত সে দিন সন্ধ্যাকে গৃহে আসিতে নিষেধ করিয়া দিত।

হতভাগ্য সে, পত্নীর অফুরন্ত প্রেম, মায়ের স্নেহ, অসীম সম্পত্তি, বিদ্যা, কিছুই তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই, দিন দিন তাহার বুকের জ্বালা বেশী অনুভূত হইতেছিল,

বন্ধুদের পরামর্শে সে তাই জ্বালা জুড়াইতে মদ ধরিয়াছিল। সে দিনের মাত্রাটা কিছু বেশী হইয়াই পড়িয়াছিল, নিজেকে সে দিন গোপন রাখিতে পারে নাই, সন্ধ্যা তাই স্বামীর পরিচয় পাইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে আগে ঘুম ভাঙিয়া গেল শিরীষের। খোলা জানালা পথে প্রভাতের আলো ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, শিরীষ দেখিল মেঝের উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছে সন্ধ্যা। সারারাত্রি অকূল ভাবনা-সাগরে সে কূল পায় নাই, কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই শেষ রাত্রিটাতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মুখখানা তাহার বড় বিষণ্ণ।

লজ্জায় শিরীষ আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িল, 'সন্ধ্যা উঠিবার আগেই বাহির হইয়া যাইতে পারিলে সে বাঁচে। সন্ধ্যাকে এ মুখ সে দেখাইবে কি করিয়া? সন্ধ্যা যখন দুইটী চোখ তুলিয়া তাহার মুখের উপর রাখিবে, উঃ, তখন কি বলিবে সে!

অনেক বেলায় সন্ধ্যার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল শিরীষ গৃহে নাই, কখন বাহির হইয়া গিয়াছে।

আজ সারাদিন সে শিরীষের দেখা পাইল না, লজ্জিত শিরীষ দুপুরেও বাড়ীর ভিতরে আসিল না। সমস্ত দিনটা সন্ধ্যার কি ভাবে কাটিয়া গেল তাহা জানে শুধু সেই। সে কিছুতেই মন নিবিষ্ট করিতে পারিল না। বোনা, সেলাই, পড়া কিছুই ভাল লাগিল না; তাহার মনের মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছিল কেবল দারুণ বেদনা, সব ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহার কিছুই সার্থকতা লাভ করিতে পারিল না। খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া খানিক বাহিরের পানে চাহিল, আকাশ দেখিল, জলস্রোত দেখিল, কিন্তু আজ এ সবের মধ্যে কিছুমাত্র বৈচিত্র ছিল না, সবই যেন একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনটাই যে একঘেয়ে নূতনত্ব তাহার মধ্যেই নাই, বাহিরে নূতনত্ব সে পাইবে কোথায়?

সন্ধ্যা ভাবিতে লাগিল তাহার আগাগোড়া জীবনের কথা, নারী যেমন প্রার্থনা করে তাহার স্বামী ঠিক তেমনই হইয়াছিল, কি পাপ করিয়াছিল সে তাই তাহার স্বামী এমন করিয়া অধঃপতনের পথে নামিয়া গেল।

জ্ঞানহীনা কিশোরী সে, সে ভাবিতে পারিল না স্বামী নিজেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, সে তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে না। তাহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল সে স্বামীর মনের মত হইতে পারে নাই তাই রাগ করিয়াই তাহার স্বামী অধঃপতনের পথে নামিয়া যাইতেছে।

অনেক রাত্রে শিরীষ গৃহে আসিল, সে ভাবিয়াছিল প্রতিদিন সন্ধ্যা যেমন ঘুমাইয়া পড়ে আজও তেমনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সন্ধ্যাকে তখনও বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, ধীরে ধীরে বিছানায় গিয়া বসিল, একটা কথাও বলিতে পারিল না।

সন্ধ্যা নতমুখে বসিয়াছিল, তাহার দুইটী চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সেও একটা কথা বলিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শিরীষ ডাকিল—"সন্ধ্যা—"

সন্ধ্যা অশ্রুসজলনেত্র একবার তুলিয়াই নত করিল।

শিরীষ বলিল "আজ এখনও ঘুমাও নি সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা শুধু মাথা নাড়িল, বাষ্পে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, সে একটা শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

শিরীষ তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়া পড়িল, স্নেহের স্বরে বলিল "আমার সঙ্গে কথা বলছো না কেন সন্ধ্যা আমার পরে রাগ করেছ কি?

"রাগ,"—সন্ধ্যা গোপনে চোখ মুছিল, "না, রাগ করব কেন? তুমি দেবতা, তোমার 'পরে আমি কখনও রাগ কর্ত্তে পারি?"

শিরীষ হাসিয়া ফেলিল, বলিল "হ্যাঁ, দেবতাই বটে, ঠিক দেবতার মতই আচরণ আমার, তুমি আমার কাছ হতে ব্যবহারও পাচ্ছো তেমনি।"

সন্ধ্যা বিকৃতকণ্ঠে বলিল "হ্যাঁ তুমি দেবতা। আমরা ছোটবেলা হতে যা শুনে আস্‌ছি তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। একটা মাটীর পুতুলকে দেবতা বলতে পারি, জীবন্ত মানুষকে দেবতা বলতে পারব না কেন? এই দেশের সতী সীতা বেহুলা সাবিত্রী সবাই স্বামীকে দেবতা বলে পূজো করেছেন, আমিও আমার স্বামীকে দেবতা বলে পূজো করি। সত্যি দেবতা কখনও চোখে দেখি নি, স্বামীর মধ্যে সেই সত্যি দেবতাকে পেয়েছি, এই দেবতার পূজো করেই প্রাণে তৃপ্তি পেয়েছি কিন্তু মাটির ঠাকুরকে পূজো করে কখনও

তৃপ্তি পাই নি। তুমি যাই কর, আমি চিরকাল তোমায় এমনি দেবতা বলেই জানব, এমনি করেই তোমায় পূজো করব।"

সে স্বামীর বুকের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ক্ষুদ্র বালিকার মতই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

একি প্রেম, একি ভক্তি শিরীষ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে যে একটি ছোট মেয়ে, এমন জ্ঞানের কথা সে পাইল কোথায়, এমন প্রেম সে পাইল কোথা হইতে? হিন্দুনারীর আদর্শ তাহার সম্মুখে, ইহার কাছে তাহার সকল তর্ক নীরব হইয়া যায় যে, তাহার প্রবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সে বাহিরের সব কথা ভুলিয়া যায়। হিন্দুর মেয়ের এই ভক্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠে, স্বামীর পায়ে সে নিঃশেষে নিজের সবটা দান করিয়া ফেলে। সত্যই এ সীতা সতীর দেশ, এখানে মেয়েরা স্বামীকে দেবতা বলিয়াই জানে, পূজা করে। ভালবাসার গান ইহারাই গায়, জয়লাভ ইহারাই করিয়াছে।

মনে পড়িল দীপিকার কথা। সে স্বামীকে ভক্তি দিতে পারে নাই, ভালবাসিতে পারে নাই, বিবাহের আগে সে আত্মদান করিয়া ফেলিয়াছিল, তবু সেই স্বামীরই স্ত্রী সে, তবু সে আর কাহারও হইতে পারিবে না। নিজের দেহকে সে রক্ষা করিবেই, স্বামীকেই দেহের ঈশ্বর বলিয়া মানিবে, সে সীতা সাবিত্রীর দেশে জন্মিয়া তাঁহাদের তুল্য হইতে পারে নাই তাই তাহার জীবন শ্মশান হইয়া গিয়াছে, তাহার যৌবনের আনন্দ শুকাইয়া গিয়াছে। সে পাইতে চায় কাহাকে, যে তাহার হইতে পারিবে না, তাহার এই উন্মাদ চিত্তবৃত্তিকে স্পষ্ট ধিকার দিয়া চলিয়া গেল তাহাকে, আর যে তাহাকে দেবতা ভাবিয়া পা দু'খানা জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে তাহাকে পাইতে চায় না।

"সন্ধ্যা, ওঠো, মুখ তোলো, আমার একটি কথা শোন। তোমায় যে কথা বরাবর গোপন করে এসেছি আজ সেই কথাটা তোমায় বলব, শুনলে তুমি আমায় ঘৃণা করবে, তাই আমি চাই, এই পরানুরক্ত মাতাল দুশ্চরিত্রকে তুমি এতটা ভক্তি করবে ভালবাসবে, তোমার এটা কর্ত্তব্য কাজ মনে করতে পার, তুমি নিঃশেষে তোমার দান করে যেতে পার, কিন্তু আমি এত হৃদয়হীন এখনও হইনি যে তোমার সবটাই নিয়ে নেব, ডাকাতের মত লুঠ করে। আগুনের মত তোমায় পুড়িয়ে ছাই করব, তোমায় কিছু ফিরে দেব না। সমুদ্রের মত উদার মহান হৃদয় বলে আমায় ধারণা করেছ কিন্তু সে তোমার ভুল ধারণা সন্ধ্যা। সমুদ্র যা নিয়ে যায়, তাই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়, কিন্তু আমি আগুন বলে তোমার যা তা নিয়েই যাই, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলি, কিছু দিতে পারি নি। আমার কথা শোন সন্ধ্যা, আমি তোমায় কতদূর প্রতারণা করেছি সেটা জানো আগে তারপর—"

সন্ধ্যা তাহাকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ওগো না, না, আমায় সেসব কোন কথা বলো না, আমি শুনতে পারব না, আমার বড় ভয় হচ্ছে।"

জোর করিয়া তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া শিরীষ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "শুনবে না বললেই কি হবে সন্ধ্যা, তোমায় শুনতেই হবে, জানতেই হবে। শোনো, আজ দীপিকাকে—

"ওগো, তোমার পায়ে পড়ি বোল না, আমার সন্দেহকে সত্যে পরিণত করো না।"

শিরীষ বলিল "কিন্তু এই সত্য বরাবরই আছে সন্ধ্যা, তাই সন্দেহ জেগেছিল তোমার প্রাণে। এ আজকালের কথা নয়, বহুকাল আগে হতে তাকে আমি ভালবাসি! তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়, কিন্তু বাবা মা কিছুতেই মত দেন নি, তাঁরাই তোমায় আমার সামনে ধরেন। বড্ড ভুল করলুম, সুন্দর দেখে ভুলে গেলুম, আমি তোমায় বিয়ে করলুম কিন্তু সুখী হতে পারি নি সন্ধ্যা, কারণ যথার্থই আমি প্রাণ ঢেলে তাকে ভালবেসেছিলুম, সেও তেমনি আমায় ভালবেসেছিল। আমার বিয়ের পরে তার বিয়ে হল এক দুশ্চরিত্র মাতালের সঙ্গে, লোকটা তাকে প্রহার করতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় নি। এরপর যেদিন আমার নাম করে সে দীপিকাকে অপমান করে, সেই প্রকৃত ভালবাসার অপমান দীপিকা সহতে পারে নি। দেহটা সে তার স্বামীকে দিয়েছিল কিন্তু আমাকে সে যা দিয়েছিল তা কেউ পেতে পারে না আর যথার্থই তা স্বর্গীয়। সেই স্বর্গীয় ভালবাসাকে তার স্বামী এমন কুৎসিতভাবে চিত্রিত করে, যাতে সে এখানে চলে এল। আমার চোখের সামনে সে যখন এলো, আমি চমকে উঠলুম,

সেও বিবর্ণ হয়ে গেল, তবু বাধ্য হয়ে উদরান্নের জন্তে সে আমারই দাসী হল। যেখানে সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হবে আশা করেছিল, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সেখানে সে বেতনভোগিনী দাসী হল। কতটা সে সহ্য করেছে দেখেছ সন্ধ্যা, তার উদার হৃদয়খানার কথা একবার ভেবে দেখ। তারপর একদিনকার কথা বলি সন্ধ্যা, হৃদয়ের বেগ দমন করতে পারি নি, তাকে বলে ফেললুম মনের কথা; যদি সে রাজি হতো, তুমি আমায় কি তোমার কাছে পেতে? তাকে নিয়ে আমি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্তে কোথাও চলে যেতুম, তারপর ফিরে এসে তাকে নিজের স্ত্রীর মতই রাখতুম; কিন্তু সে ঘৃণাভরে আমার এ ঘৃণিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে, সে আমায় জানালে ভালবাসা যথার্থ স্বর্গের জিনিষ, একে ধারণা করতে পারা যায় কিন্তু উপভোগ করতে পারা যায় না। মনে বড় দুঃখ হল, নিজের পরে রাগ হল, তাই আমি অধঃপতনের পথে চলেছি। বুঝতে পারছি কার পরে রাগ করছি, সে আমার কে? সে আমার সামনে হতে চিরকালের জন্তেই চলে গেল, বলে গেছে আর আসবে না, কেন না আমায় সে আর বিশ্বাস করতে পারে না। আমি আমার ভালবাসার অপমান করেছি, তাকে অপমান করেছি। বহু ঘৃণায় মদের মাত্রা বাড়িয়েছি, এ ঘৃণিত জীবনে মদ খেলেই থাকি ভাল, নচেৎ শান্তি নেই সন্ধ্যা। কাঁদছ সন্ধ্যা, হ্যাঁ কাঁদো। তোমার দেবোপম স্বামীকে চিনতে পেরে বুঝছো কি করেছ, এ দেবতা নয়, পিশাচ। তোমার সঙ্গে কেবল প্রতারণা করেছি, আর করবার ইচ্ছে নেই, আর করব না।"

সে স্তব্ধ হইয়া গেল, সন্ধ্যা তেমনিভাবে তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। নিশিথ রাতের একঘেয়ে সোঁ সোঁ শব্দ কাণে আসিতে লাগিল, বাড়ীখানায় তখন কোথাও শব্দ নাই।

"সন্ধ্যা—"

সন্ধ্যা মুখ তুলিল।

"ওগো, হও তুমি তাই, নিজেকে পিশাচ বলেই ভাব, আমার চোখে তুমি দেবতা। আমার বুক তোমার নিষ্ঠুর পদাঘাতে ভেঙ্গে ফেলে দাও, আমি সেই রক্তবিন্দু দিয়ে তবু তোমায় পূজা করব। তোমার যে সব আছে, আমার যে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই গো।"

কিশোরী শিরীষের পা দুখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

(ক্রমশঃ)

চিত্রকর

[শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া]

সে আঁকত ছবি।

তার সাথী তার সামনে দাঁড়াত, ব'সত,—তার কল্পনার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হোয়ে। তাদের বন্ধনের সাক্ষী শিশুটী রংয়ের তুলি নিয়ে খেলা করে—

* * * *

ছবি ছিল তার প্রাণ। তাকে সে তার নির্ব্বাক ভাষা দিয়ে সজীব কোরে তুলত;—আর সে ভাষা আসত তার তুলিকার সূক্ষ্ম রেখায় রেখায়।

* * * *

একদিন তার সাথী ছিল ক্লান্ত—অবসন্ন—রুগ্ন, ব্যথায় ভরে উঠেছিল দেহ-মন কিন্তু সে চায় ক্লান্ত-ব্যথার প্রতিমূর্ত্তি গড়তে। তাই তার সাথীকে বসিয়েছিল এক শুষ্ক নদীতটে—ম্লান সাঁঝের আলোয়। তার সাথীর মুখের পাণ্ডুর ভাব সচল করে তুলেছিল—তার তুলিকে।.........দিন যায়।......

* * * *

সেদিন বর্ষার রাত্রি। জ্যোৎস্না ভেসে উঠ্‌ছিল মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। রুগ্ন সাথী আর রুগ্ন শিশুকে কোলে নিয়ে—বসেছিল উন্মুক্ত বাতায়নের নীচে। মেঘান্তরিত জ্যোৎস্নালোক তাদের উপর খেলা করছিল আর মাঝে মাঝে তাদের মিলিত অশ্রু বাইরের অশ্রুর সঙ্গে মিশ্‌তে ছুটে আসছিল। কিন্তু চিত্রকরের তুলিকা চলেছিল বিরাম না নিয়ে।.........রোগক্লিষ্ট মাতার অস্ফুট কাতরোক্তি তার কাছে একবার বাধা দিতে চেষ্টা ক'রলে; কিন্তু সে বাধা প্রত্যাহত হ'য়ে ফিরে এল—তার একাগ্রতার কাছে।.........

সে যে চিত্রকর।.........

হঠাৎ তার মুখে এক অপরিসীম আনন্দের হাসি ফুটে উঠ্‌ল......তার ছবি সম্পূর্ণ হয়েছে। আলোর কাছে সে ছুটে গিয়ে দেখ্‌লে চন্দ্রমা তেমনি স্পষ্ট, উজ্জ্বল,—মেঘ কেটে যাচ্ছে। আর...... ..

তার সাথী তাদের বন্ধনের সাক্ষীটিকে পর্য্যন্ত নিয়ে পালিয়ে গেছে—কোন্ এক অজানা জগতে।

* * * *

তখনও তার মুখে হাসি—সে হাসি সার্থকতার।

একরাত্রির রোমান্স

[শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়]

বাঙ্গালীর জীবনে রোমান্সের সুযোগ বড় ঘটে না, যদিও আমার ভাগ্যে একরাত্রির জন্য জুটেছিল। তাও আবার এখানে নয়, বিলাতে।

সেদিন ছিল কুয়াসার রাত্রি। লণ্ডন সহরের কুয়াসা যে কিরূপ ভীষণ তা যিনি না দেখেছেন তার পক্ষে বুঝা কঠিন। শীতও ছিল ভয়ানক তাই ওভারকোটটা গায়ে জড়ায়েও হিমের চোটে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। আপাদমস্তক গরম কাপড়ে আচ্ছাদিত করে শুধু চোখ দু'টি খোলা রেখে চল্‌তে হয়েছিল কিন্তু সেই কুয়াসার আবরণ ভেদ করে পথ দেখা ত দূরের কথা, রাস্তার উজ্জ্বল আলোগুলাও ঝাপসা ঠেকছিল। কিন্তু উপায় নেই, আমার যে সমপাঠী বন্ধুর বাসায় ভোজ খেতে গিয়েছিলুম তিনি আদর আপ্যায়নের ত্রুটি করেন নি, কিন্তু সে দেশের আতিথ্যের বহর এত ব্যাপক নহে যে অতিথির রাত্রিবাসের ব্যবস্থাও গৃহস্থকেই করতে হবে।

রাস্তায় তখন জনপ্রাণীর সাড়াও ছিল না। মাঝে মাঝে দুই একটি নিশাচরজীবের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল কিন্তু তারা কেউ বা দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কারণ চলতে গেলে পা টলে, আর কেউ বা নর্দ্দামায় পড়ে সুখ শয্যার স্বপ্ন দেখছে।

কতকদূর যেয়েই আমারও পা অবশ হয়ে এল। একটু জিরিয়ে নেবার জন্য আমি একটা বাড়ীর দরজায় গিয়ে উঠলুম। সিঁড়ির ধাপের উপর যেয়ে একটু বসতেই আমার পেছনে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। চোখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখলুম আমার পশ্চাতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এক সশরীরি মূর্ত্তি। আমার অবস্থা তখন মোটেই নিরাপদ মনে হল না—কারণ রাত দুপুরে কোনও অপরিচিত লোক সাধু উদ্দেশ্যে কারও বাড়ীর দোরগোড়ায় বসে থাকে না। যা হোক আমি সপ্রতিভভাবে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিতেই সে মিহিস্বরে বলল, "চুপ!"

চুপ না করে আমার গত্যন্তর ছিল না। তখন সেই মূর্ত্তি আমার কাছে এসে তার কোমল বাহুবল্লরী দিয়ে আমার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরল। তরুণী ধীরভাবে বললে, "জন, আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। এখানে কথা বলা নিরাপদ নয়, চল রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।"

কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় দেখবার জন্য আমিও এই প্রস্তাবে গররাজী হলুম না। তরুণীর অনুরোধে কত লোক সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, আগুনে পুড়ে মরেছে, তার তুলনায় অজ্ঞাত অভিসারে যাত্রা ত কিছুই কঠিন নহে। তরুণী আমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে বল্‌তে লাগল, "বুড়ো ত কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। চাই না আমি তাঁর ধন-দৌলত এবার আমার পথ আমাকেই খুঁজে নিতে হবে। তুমিত এমন মুখচোরা যে সাহস করে তার কাছে আমাকে চাইতে পারবে না। এখন তুমি আমাকে নিয়ে ফ্রান্সে পালিয়ে যেতে রাজী আছ কি-না, তাই আমি জানতে চাই।"

যদিও এইরূপ দুঃসাহসিক কাজে আমার মোটেই স্ফূর্ত্তি ছিল না, তবু মনে করলুম এমতাবস্থায় স্রোতের সাথে ভেসে চলাই ভাল। তাই আমি সংক্ষেপে বললুম "হাঁ।" তরুণী নিজের খেয়ালে এতটা মস্‌গুল ছিল যে আমার দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখ্‌ল না,—আমার অপরিচিত কণ্ঠস্বরও লক্ষ্য করল না। সে আপন মনে বকে চল্‌ল, "আমি সব ঠিক করে রেখেছি। আমার যে সব গহনাপত্র আছে, তা বিক্রী করে ছ'মাস আমাদের বেশ চল্‌বে। তারপর তুমি যে সুন্দর ছবি আঁকতে পার, প্যারীতে যেয়ে জীবিকা অর্জ্জন করা তোমার পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না। এখন শুভস্য

শীঘ্রং— কাল রাতে ঠিক এমন সময়ে তৈয়ার থাকব। তুমি একখানা গাড়ী করে গলির মোড়ে দাঁড়াবে। আমি এসে ঠিক উঠ্‌ব।"

আমি গলার স্বর সংযত করে বললুম, "বেশ।"

তরুণী বলল, "আজ তুমি এত দেরী করে এলে, দেখ কাল যেন এমন না হয়। আমি ত ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিলুম যে তুমি বুঝি এলে না। আজ বারোটার সময় গোপনে তোমার সাথে দেখা হবে কথা তা কখন বারোটা উৎরে গেল। দেখো, কাল যেন এমনটি না হয়।"

আমি বললুম, "না।"

তরুণী বলল, "অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি এখন আসি। আজ এমন জমাট কুয়াসা হয়েছে - পথঘাটও চোখে পড়ে না। এস তবে—" এই বলে তরুণী তার ব্যগ্র ওষ্ঠাধর খানি আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

আমি দেখলুম এতদূর এগিয়ে এসে পেছু-পা হওয়া শোভা পায় না। তরুণীর পিপাসাতুর অধর-কোরকে একটি মৃদু চুম্বন এঁকে দিলুম। তরুণী তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আবেগের সহিত আমার কর পীড়ন করে তার বাড়ীর দিকে ফিরে গেল। আমিও ততক্ষণে আমার বাসায় পৌঁছলুম। সেই রাতে যে আমার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়েছিল তা না বললেও চলে। পরদিন তরুণীর সহিত জন বেচারীর যখন সাক্ষাৎ হবে তখন তার অবস্থা যে কি শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে, তা কল্পনা করতেও আমার সাহস হয় না।

প্রলাপ

বিজয়া দশমীর পর আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ। আমরা সকলকে স্নেহ সম্ভাষণ জানাইতেছি; দোষ ত্রুটীর মার্জনা চাহিতেছি। শরতের এই শুভ্র প্রভাতে আমরা আমাদের পরিচিত-অপরিচিত বন্ধু-সজ্জনের কুশল কামনা করিতেছি।

আমরা দেশের মঙ্গল চাহি; দেশবাসীর মঙ্গলে দেশের মঙ্গল, দেশবাসীর মঙ্গল নিয়ত কামনা করি। ভগবান আমাদের মনে সাহস দিন, বাহুতে শক্তি দিন, হৃদয়ে ভক্তি দিন, আমরা যেন দেশের মঙ্গল সাধিতে পারি; পরস্পরের মঙ্গল করিতে পারি।

আমরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রার্থনা করি। আমি হিন্দু, আমি যেখানে জন্মিয়াছি, আমার বাড়ীর সামনে ঐ যে ছোট্ট খোলার ঘরখানি, যাহার মধ্যে ক্ষুদ্র এক মুসলমান পরিবার বাস করে, তাহারাও সেই দেশেই জন্মিয়াছে। তাহার জননী যে দেশের জল-বায়ু-অন্নে দেহে ধারণ করিয়া তাহাকে স্তন্য দিয়াছেন, আমার জননীও সেই দেশের সেই জল-বায়ু অন্নে দেহ ধরিয়া আমাকেও অমৃত পান করাইয়াছেন। আমাদের পথ এক, আমাদের গতি এক, আমাদের লক্ষ্য এক—তবে কেন এ বিভিন্নতা? কেন এ দ্বন্দ্ব বিবাদ!

আমরা ছুঁৎমার্গের বিরোধী। আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, আমরা এক, আমরা সমান, আমাদের মনের ভাব—এইরূপ হয়, ইহাই আমরা চাই।

আমরা স্বদেশজাত বস্ত্র পরিধান করি! রাজনৈতিক সংস্রব না রাখিয়াও আমরা স্বদেশী বস্ত্র পরিধান করিতে পারি। বিলাত হইতে বহুবিধ খাদ্য আসে, আমাদের ব্যবহারের জন্য আমরা তাহা গ্রহণ করি না, আমার দেশের শাক অন্নই আমার খাদ্য; তেমনি বিলাতী বস্ত্র আসে-আসুক, আমার দেশে যখন বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, তখন তাহাই কেন না আমরা ব্যবহার করি!

কথা-কয়টা মনে আসিল, বলিলাম। বলিলাম আজ, কেননা, আজ আদরের কথা, আব্দারের কথা বলিবারই দিন। বাঙ্গালায় বিজয়া দশমীর মত আর একটা দিন নাই; আর একটা উৎসব নাই। শত্রু-মিত্র এক, এই একটা দিনের শান্তি-বারিই কেবলমাত্র করিতে পারে!

সচিত্র শিশির

প্রথম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

১৩৩১

২৭শে বৈশাখ হইতে ১৫ই কার্ত্তিক ১৩৩১

সম্পাদক
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রকাশক—
শিশির পাবলিশিং হাউস্
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

১ম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড।

২৬শ হইতে ৫০ সপ্তাহ

সাময়িক প্রসঙ্গ

[illegible] সেদিন গবর্ণমেণ্ট সত্তর আশীজন কংগ্রেস কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার [illegible]। কেন করিয়াছেন—কি তাহাদের অপরাধ, তাহাদের বিরুদ্ধে [illegible] পাওয়া গিয়াছে—তাহা তাঁহারাই জানেন। শক্তিশালী শাসক [illegible] শাসিত জাতির নিকট কারণ ব্যক্ত করেন নাই; করার দরকার [illegible] নাই। এ দেশবাসী তাহাদের বিচার-বুদ্ধি সম্যকরূপে প্রয়োগ [illegible] গ্রেপ্তারের মর্ম্ম ধরিতে পারে নাই।

[illegible] ছিল স্থির, শান্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের বেগ দেশের সর্ব্বত্র [illegible] নেতৃগণ রাজনৈতিক আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া দেশের হিন্দু-[illegible] সমস্যা লইয়াই বিব্রত, উষ্মা কুত্রাপিও প্রকাশ পায় নাই, [illegible] চিহ্নও নাই—এমন সময় এরূপ ধর-পাকড়ের কথা মনে করাও [illegible] ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঠিক এই সময়েই তাঁহাদের অমোঘ অস্ত্র [illegible] করিয়া দেশের কতকগুলি লোককে ধৃত করিলেন।

[illegible] বলিয়াছেন যে, তাঁহারা দেশে বিপ্লবের সূচনা দেখিতে [illegible]। বিপ্লববাদী দলের অস্তিত্ব তাঁহারা জানিয়াছেন। তাহাদের [illegible] পরও প্রমাণ তাঁহাদের হস্তগত। কিন্তু কোথায় তাঁহারা বিপ্লবের [illegible] দেখিলেন, তাহাদের অস্তিত্ব কোথায় ও কার্য্য-কলাপের কি অকাট্য [illegible] তাহাদের করগত হইয়াছে, তাহা বলেন নাই। ধৃত ব্যক্তিগণকে [illegible] সাধারণ আইন অনুসারে বিচারালয়েও হাজির করিতেও রাজী [illegible]।

[illegible] মজা বড় মন্দ নয়! তুমি তোমার মনগড়া অপরাধের জন্য [illegible] গ্রেপ্তার করিবে, জেলে পচাইয়া মারিবে, অন্তরীণ দিবে, [illegible] প্রেরণ করিবে. অথচ আমার অপরাধ কি, তাহা আমি জানিতে [illegible]! আমার অপরাধ তুমি জানিলে, আর কেহই জানিল না, [illegible] আমায় শাস্তি লইতে হইবে! আইনের দ্বার ত সকলের জন্যই [illegible], আমি অপরাধ করিয়া থাকি, তাহার ত বিচার-শক্তি আছে, [illegible] তাহার হাতে তুলিয়া দাও। আমি দোষী হই, আইন অন্ধ নয়, [illegible] আমার প্রাপ্য দিবেই! আমি নির্দ্দোষী হই, আইন ত অন্ধ নয়, [illegible] দেখিবে, আমার প্রাপ্য তখনও সেই আমাকে দিবে।

[illegible] রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিডিং একটি ঘোষণা-পত্র জারি করিয়া [illegible] যে বাঙ্গালায় যে রাজনৈতিক বিপ্লববাদী দলের আবির্ভাব [illegible] বর্ণমেণ্ট তাহা জানিতে পারিয়াছেন। এই বিপ্লববাদীরা খুন, [illegible] তি, সরকারী কর্ম্মচারীগণকে হত্যা করিবার উদ্যোগ আয়োজন [illegible] গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দমন করিবার জন্য এক নূতন বিধি গঠিত [illegible]। এই নূতন বিধিটি গত শনিবারের কলিকাতা গেজেটে [illegible] এবং সেইদিনই বাঙ্গালায় ধর-পাকড়ের প্রবল বন্যা বহিয়াছে।

[illegible] যত সাক্ষ্য প্রমাণই হস্তগত করিয়া রাখুন-না কেন, প্রকাশ্য আদালতে বিচারকের সম্মুখে যতক্ষণ না সে সকল প্রকাশ করিতেছেন, ধৃত ব্যক্তিকে যতক্ষণ না তাহার নিজ পক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতেছেন ততক্ষণ তাঁহাদের কথা বেদবাক্য বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিবে না। সর্ব্বসাধারণ তাহাদের অপরাধের কথা জানিতে চায়, গবর্ণমেণ্ট তাহা জানান, নতুবা তাহাদের অপরাধ সম্বন্ধে কোন কথাই কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

ইহাতে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি করিবার কারণই বা থাকিতে পারে? তাঁহারা যাহাদের অপরাধী বলিয়া ধৃত করিয়াছেন, যাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণাদি হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদের আদালতে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি ওঠে কেন? গবর্ণমেণ্ট কি তবে সন্দেহ করেন, ন্যায়-বিচারে তাঁহাদের করধৃত 'প্রমাণাদির টিঁকিবার পক্ষে সন্দেহ আছে? গবর্ণমেণ্ট কি তবে মনে করেন, আদালতের বিচার সূক্ষ্ম ও সত্য নহে? গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট করিয়া বলুন, তাঁহারা কোনটা ঠিক মনে করেন? আদালত অসত্য না তাঁহাদের করগত প্রমাণাদি অসত্য? আমরা বিশেষ করিয়া ভারত-ভাগ্য বিধাতা লর্ড রিডিংকে এই প্রশ্ন করিতেছি।

রাজনৈতিক আন্দোলনকে অচল ও শক্তিহীন করিবার উদ্দেশ্যে [illegible] জনমতের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আরও [illegible] করিয়াছেন; এখনও করিতেছেন; আশা করা যায় [illegible] তাহাই করিবেন। শক্তিমান জাতির পক্ষে দুর্ব্বলদমন [illegible] কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করিতে গবর্ণমেণ্টের কোন কষ্ট ত নাই-ই বরং খুবই সহজ। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কি এখনও জানিতে বাকী আছে যে এই দমন নীতি প্রয়োগের ফলে দেশে অশান্তি ও অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠে? গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে তাহা দেখিয়াছেন। এবং ইহাও তাঁহাদের অজানা নাই যে আজ পর্য্যন্ত কোন শক্তিশালী শাসকই দমননীতির বলে জনমতকে দলিতে বা ক্ষুব্ধ দেশবাসীকে শান্ত ও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কোন দূর দেশে যাইতে হইবে না অথবা বেশী পুরাতন ইতিহাসের পৃষ্ঠাও খুলিতে হইবে না, এই দেশের ও অদূর অতীত কালের ঘটনাই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত করিবে। ভারতগবর্ণমেণ্ট রাওলট আইন চালাইয়াছিলেন, ফল কি হইয়াছিল? পাঞ্জাবের লোম হর্ষণ হত্যাকাণ্ড, অসহযোগ আন্দোলনের উদ্ভব কি এই দমন-নীতি হইতেই হয় নাই? গবর্ণমেণ্ট যে এ সকল কথা জানেন না, তা নয়, খুবই জানেন; কারণ আইন উঠাইয়া দিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়া ছিলেন। আজ আবার কেন যে গবর্ণমেণ্ট সে সকল কথা ভুলিতে বসিয়াছেন, বুঝিলাম না। নির্য্যাতনের ফল কখন শুভ হইতে পারে না; অত্যাচার—মানুষকে, মানুষকে শুধু বলি কেন, প্রাণবিশিষ্ট কোন জীবকেই শান্ত করিতে পারে না।

ভারত গবর্ণমেণ্ট এখনও অবহিত হোন, অশান্তি টানিয়া আনিবেন না।

কলিকাতা।

২৩শে ভাদ্র, ১৩৩১।

পরম প্রীতিভাজন "সচিত্র শিশির" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

প্রিয়দর্শনেষু—

আপনার ৭ই ভাদ্রের সুপ্রসিদ্ধ "সচিত্র শিশিরে" আমার কুড়িয়ে পাওয়া গানটী (কলিকাতাবাসী উচ্চশিক্ষিত বাঙালী যুবকের গান) মুদ্রিত করিয়া আমাকে যারপর নাই বাধিত করিয়াছেন। আবার গত কল্য সকাল ৭টার সময়—অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে—আমি যখন ভবানীপুরে স্বনামধন্য স্বর্গগত আশুবাবুর বাড়ী যাইতেছিলাম তখন একস্থানের একটা পাশের গাদা হইতে একখানা অর্দ্ধছিন্ন ক্ষুদ্র পুরাণো খাতা কুড়াইয়া পাই। খা[illegible] কাহারো নাম ধাম দেখিলাম না—দেখিলাম [illegible] মজাদারি হাতে লেখা গান ও কবিতা। সু[illegible] এক একটী করিয়া আপনার প্রসিদ্ধ পত্রে[illegible] হস্তে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। সম্প্রতি [illegible] একটী কবিতা পাঠাইলাম! যুক্তি সঙ্গত বি[illegible] চিঠি ও কবিতা উভয়ই মুদ্রিত করিয়া [illegible] কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিবেন। আপনার [illegible] প্রার্থনীয়। ইতি—

ভবদী[illegible]

(কবিগু[illegible]

শ্রীআশুতোষ [illegible]

নিবেদন

[illegible] লেখাপড়া, লও মা আজি কাড়ি,
[illegible]র (Degree) খানা কর ভস্মসাৎ—
টিউসন নিয়ে সন্ধ্যা সকাল ফিরি বাড়ি, বাড়ি—
তবু নাহি জোটে পেটের ভাত।
হায়রে কবে হোঁচট খেয়ে
পড়্‌ব পথে—থাকব 'চেয়ে'—
মা বল্‌তে আর হবে নাক'—হব' কুপোকাৎ।

শিখেচি যা' লেখাপড়া, লও মা আজি কাড়ি,
ডিগ্‌রি খানা কর ভস্মসাৎ—
আমার চেয়ে সুখে আছে মেথর মুচি হাড়ি
হা অদৃষ্ট, সকলি বরাত্‌!
আমাদের ঐ 'পশো' চাকি
পড়্‌ল বা' কি, শিখ্‌ল বা কি
আজ অফিসের বড় বাবু—পাচ্চে ছশো সাত।

শিখেচি যা' লেখাপড়া, লও মা আজি [illegible]
'ডিগ্‌রি' খানাই কর্‌ব সর্ব্বনাশ, [illegible]
আর ত এখন দাঁড়ি পাল্লা ধর্‌তে নাহি পা[illegible]
লাঙ্গল ধরে' কর্‌তে নারি চাষ,
ভিক্ষা নাহি কর্‌তে পারি,
আত্মহত্যাও কর্‌তে নারি,
সুতরাং আমার খাটতেই হবে—আমি বি, [illegible]

শিখেচি যা' লেখাপড়া, লও মা আজি [illegible]
'ডিগ্‌রি' খানাই কর্‌ল সর্ব্বনাশ—
সবার চেয়ে উঞ্ছ-বৃত্তি ইস্‌কুল মা[illegible]
ও ছাই কাজে অভাব বারমাস।
তাই বলি গো' আল্‌মা মিটার (Alm[illegible]
পুত্র সহ যাও ছারেখার—
হাজার হাজার বিড়ির দোকান করুক তো[illegible]

* কবিগুণাকরের বরাত ভাল, প্রায়ই তিনি কিছু[illegible] পাইতেছেন! আমাদের বরাতে কখন কিছু জুটে না[illegible]